"তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি
মোর গান হানি।"

শ্রীমতী মণিকা দেবী

করকমলে

"সমস্ত জীবনভোর
দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আসিবে যে শ্রেষ্ঠ দিনগুলি
কণ্ঠহারে
গেঁথে দিব তা'রে
যে-দুর্লভ রাত্রি মম
বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাত সম।"

নিবেদন

এই গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল দশ বৎসর আগে, ১৩৫৯ সালের শ্রাবণ মাসে, এবং কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কালের মধ্যেই দুই হাজার সংখ্যার সংস্করণ শেষ হইয়া গিয়াছিল। আমার যৌবনারম্ভের এই রচনার আয়ু আর বিস্তৃত করিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু অগণিত সহৃদয় পাঠকের, এবং সেই হেতু গ্রন্থ প্রকাশকদের ক্রমবর্ধমান তাড়নায় আজ দশ বৎসর পর আবার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সুযোগে আবার আমার বৃহৎ সহৃদয় পাঠকগোষ্ঠীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এ-গ্রন্থের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের রচনাকাল ১৩৩২ হইতে ১৩৮২ সালের মধ্যে, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৮এ ; বাকী এক তৃতীয়াংশ ১৩৫০'র রচনা। সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাসার রূপের খুব বেশি না হইলেও কিছু কিছু অদলবদল ঘটিয়াছে ; আজ নূতন করিয়া নিজকে প্রকাশ করিতে হইলে নিশ্চয়ই একটু অন্যধরনে আমার বক্তব্য উপস্থিত করিতাম। সেজন্য নূতন গ্রন্থরচনার প্রয়োজন হইত। এমন একটি ইচ্ছা অনেকদিনই মনের মধ্যে সযত্নে লালন করিতেছি। কিন্তু, ভাগ্য বিরূপ, তেমন সময় ও সুযোগ আর কিছুতেই জুটিতেছে না। দ্বিতীয়ত, আমার গ্রন্থ প্রকাশের পর, গত বিশবছরের মধ্যে, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য, জিজ্ঞাসা ও আলোচনার প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে, এবং আমার এই গ্রন্থধৃত পর্ববিভাগ, আলোচনার রীতিপদ্ধতি ও সমাজতত্ত্বসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণভাবে লেখক ও পাঠকসমাজে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। এইজন্য মনে হইয়াছিল, আমার এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন আর নাই। কিন্তু পাঠক ও গ্রন্থবিক্রেতাদের মতামত তার বিপরীত, এবং প্রধানত তাঁদের ইচ্ছায়ই এই পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই উপলক্ষে "নিউ এজ পাবলিশার্স"-এর কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সিংহ রায় মহাশয়কে আমার সানন্দ ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম ছাড়া এ-গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ সম্ভব হইত না।

পূর্বতন মুদ্রণ ও সংস্করণগুলির "রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন" অধ্যায়টি বর্তমান সংস্করণে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যায়টি সম্বন্ধে একটু আপত্তি আমার বরাবরই ছিল, এবার আর ইহা কিছুতেই গ্রন্থভুক্ত রাখিতে ইচ্ছা হইল না। প্রথম অধ্যায় 'কবি রবীন্দ্রনাথে' কিছু যোগ কিছু বিয়োগ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় 'কাব্যপ্রবাহের' গোড়ায় কিছু বিয়োগ করা হইয়াছে। অন্যত্র উল্লেখযোগ্য অদলবদল কিছুই করা হয় নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ মুদ্রণ দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল ; বর্তমান সংস্করণ প্রথম সংস্করণের ন্যায় একটি খণ্ডে একই আকারে প্রকাশিত হইল। পাঠকদের পক্ষে বোধ হয় ইহাই সুবিধাজনক।

প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণেরও নাম-সূচী সংকলন করিয়া দিয়াছেন শ্রীমতী মণিকা দেবী। আবার বলি, তাঁহার সঙ্গে আমার যে-সম্বন্ধ তাহা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। ইতি ২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৯

৬৮।৪এ, পূর্ণদাস রোড
প্রসাদ-ভবন, কলিকাতা-২৯

বিনয়াবনত
নীহাররঞ্জন রায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পর এই গ্রন্থেব দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ ছয় মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। সুদীর্ঘ আড়াই বৎসরের মধ্যে নূতন আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করা নানা কারণেই সম্ভব হয় নাই। বাঙ্গালী পাঠক এই ধবনেব গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনায় এতটা আগ্রহ দেখাইবেন, এই আশা আমার ছিল না। বস্তুত, প্রসিদ্ধনামা লেখকেব গল্প-উপন্যাস ছাড়া বাংলা সাহিত্যে অন্য কোনও গ্রন্থের এতটা সৌভাগ্য হইতে পারে বলিযা আমার জানা ছিল না। আমি জানি, ইহার কারণ আমার রচনার গুণাগুণ নয়,- যথার্থ কাবণ আমার রচনাব বিষয়বস্তু। যে-গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সাহিত্য সে-গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের আগ্রহের বস্তু যদি হইয়া থাকে, তাহাতে আমার কৃতিত্বের কিছু নাই। তবু, বাঙালী পাঠক রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করিয়া আমার গ্রন্থের প্রতি যে আশাতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের প্রতি আমাব সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাংলা দেশের প্রায় সকল বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক, মাসিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায়ই এই গ্রন্থের সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে; কেহ কেহ সম্পাদকীয় অথবা বিশেষ প্রবন্ধ দ্বারাও এই গ্রন্থকে সম্মানিত করিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচকেরা অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, এবং সেই প্রসঙ্গে এমন উক্তিও করিয়াছেন যাহা আমি অত্যুক্তি বলিয়াই মনে করি। একাধিক সমালোচক আমার কোনও কোনও মতামত সম্বন্ধে আপত্তিও জানাইয়াছেন; বর্তমান সংস্করণে যথাস্থানে আমি তাঁহাদের বিচারযোগ্য বক্তব্যগুলির আলোচনা এবং আমার বক্তব্যের পুনর্বিচার করিয়াছি। মাত্র একটি মাসিক পত্রিকার সমালোচনায় লেখকের কিছু শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাঁহার অশ্রদ্ধেয় উক্তিগুলির কোনও আলোচনা আমি করি নাই, সে সব উক্তি ও মতামত আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারপদ্ধতির বাইরে। তাহা ছাড়া, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, সেখানে আলোচনার কোনও মূল্য আছে বলিয়া মনে করি না। ভাল হউক, মন্দ হউক, সমালোচকদের কোনও দায়িত্বসম্পন্ন উক্তিই আমি উপেক্ষা করি নাই; সকলের সকল উক্তিই আমার কাজে লাগিয়াছে, এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমি উপকৃত হইয়াছি। ইহাদের সকলেব প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ। সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে মতের অমিল বড কথা নয়, তাহাতে আমার দুঃখ কিছু নাই। বরং এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থবিবৃত সাহিত্যসমালোচনার সূত্র, প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি অবলম্বনে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য, বিশেষভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনায় যে সজাগ প্রয়াস আরব্ধ হইয়াছে, তাহা আমার পক্ষে আত্মপ্রসাদের বস্তু।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যেদিন প্রকাশিত হইয়াছিল সেদিন পঁচিশে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালের শেষ জন্মদিন। সেদিন একখণ্ড গ্রন্থ তাঁহার হাতে সমর্পণ করিবার সোভাগ্য আমার হইয়াছিল, আজ সে সৌভাগ্য পুনরাবর্তনের কোনও উপায় নাই। প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্র-সাহিত্যেব যে কয়টি প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যেকটিই ছিল অসম্পূর্ণ, রবীন্দ্রবৃত্ত তখনও পূর্ণ হয় নাই, একটু দূর হইতে সে-বৃত্তটি সম্পূর্ণ দেখিবার সুযোগও ছিল না। আজ সে-বৃত্ত পূর্ণ; তাহাকে সম্যক্ সম্পূর্ণ

দেখিতে পাইতেছি, একথা বলা এখনও কঠিন, হয়ত এখনও অসম্ভব। তবু আমার প্রসঙ্গ ক'টি অসম্পূর্ণ রাখিবার যুক্তি অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে বর্তমান সংস্করণে কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস এই চারিটি প্রসঙ্গেই কবিগুরুর আমৃত্যু সমগ্র সৃষ্টি আমার আলোচনাগত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। শুধু তাহাই নয়, প্রথম অধ্যায়ে তাঁহার কবি-মানসের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবন-দেবতা প্রত্যয়ের প্রকৃতি, এবং অন্য চারিটি অধ্যায়ে নানাসূত্রে, নানা প্রসঙ্গে তাঁহার সৃষ্টিমানসের রহস্যপ্রকৃতি আরও বিস্তৃতভাবে উদ্‌ঘাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই সব কারণে গ্রন্থের কলেবর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে দ্বিতীয় সংস্করণ দুইটি পৃথক পৃথক খণ্ডে প্রকাশ করা প্রয়োজন হইল। বলা বাহুল্য এত শীঘ্র দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না; ইচ্ছা ছিল যদি কোনও দিন দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে হয়, একেবারে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া গুছাইয়াই করিব; কিন্তু যতটা সময় ও সুযোগ পাইলে তাহা সম্ভব হইত নানা বিচিত্র কর্মবিপাক ও বৈপরীত্যে তাহা হইল না। যতটুকু পারিয়াছি তাহাই পাঠকের হাতে তুলিয়া দিলাম। তবু, রবীন্দ্র-সৃষ্টিমানসের একটা সমগ্র পরিচয় পাওয়ার সহায়তা খানিকটা ত হইবে।

আমি জানি, এবং অনেক সমালোচকও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আমি সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আমার আলোচনার বিষয়ীভূত করি নাই; আমার গ্রন্থে তাঁহার গান, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধাবলী, চিঠিপত্র ইত্যাদির আলোচনা করা উচিত ছিল। এই অভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সম্বন্ধে প্রথম হইতেই আমি যথেষ্ট সজাগ ছিলাম, কিন্তু একটি খণ্ডে সুবিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমস্ত প্রসঙ্গ আলোচনার স্থান এবং সুযোগ ছিল না। প্রথম সংস্করণ বাহির হইবার পর ইচ্ছা ছিল আর একটি খণ্ডে এই সব প্রসঙ্গের আলোচনা উত্থাপন করিব, কিছু কিছু প্রয়াসও করিয়াছিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইল, এবং তাহাই দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। কাজেই তৃতীয় আর একটি খণ্ডের প্রয়োজনীয়তা এখনও রহিল। সে-খণ্ড রচনাধীন। তাহাতে থাকিবে, (১) প্রবন্ধমালা; (২) চিঠিপত্র, (৩) শিশু-সাহিত্য, (৪) গীত-বিতান; (৫) কাব্যের আঙ্গিক; (৬) গদ্য বিকাশের ধারা; (৭) রবীন্দ্র-সাহিত্য ও বাঙালী সমাজ। তবে, কবে এই তৃতীয় খণ্ড পাঠকের হাতে পৌছাইতে পারিব তাহার প্রতিশ্রুতি আজ কিছুতেই দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রথম সংস্করণের কোনও কোনও সমালোচনায় লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কেহ কেহ ভুল বুঝিয়াছিলেন। হয়ত, আমিই আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা সুস্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই। এক কথায়, আমার উদ্দেশ্য, দেশ ও কালের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-মানসের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন। তাহা করিতে গিয়া বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আমার আলোচনার বিষয়ীভূত করিতে হইয়াছে, এবং সে আলোচনাও আবার একটি বিশেষ রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী। এই উদ্দেশ্য ও আলোচনার রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে বর্তমান সংস্করণে 'কাব্যপ্রবাহ' নিবন্ধের গোড়াতেই একটু বিস্তৃততর ব্যাখ্যা করিয়াছি। সবিনয়ে তাহার প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

বর্তমান সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় ঢুকিয়াছিল দুই বৎসর আগে। মুদ্রণকার্য অনেকদূর অগ্রসর হইবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও কাগজ সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময় রাজরোষে আমি কারাগারে বন্দী হইলাম, এবং

প্রায় এক বৎসর কাটিল বন্দীদশায়। মুক্তিলাভের পর বিশ্ববিদ্যালয় আবার কাগজ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াও যখন ব্যর্থকাম হইলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার প্রার্থনাক্রমে অন্যত্র গ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুমতি দান করিলেন। স্বল্পকালের মধ্যেই "দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড" ও তাহার সুযোগ্য কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সাগ্রহে ও সোৎসাহে এই সুদীর্ঘ গ্রন্থপ্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার দিনেও তিনি কয়েকমাসের মধ্যেই মুদ্রণ ও গ্রন্থন-কার্য সম্পন্ন করিয়া দেওয়াতে আজ আমার পক্ষে দ্বিতীয় সংস্করণ আমার সহৃদয় পাঠকবর্গের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইল। "দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড" গ্রন্থপ্রকাশ-ব্যাপারে ইতিমধ্যেই সুরুচি ও প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় দিয়া লেখক ও প্রকাশক সমাজে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা আমার ধন্যবাদার্হ।

বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে আমি সর্বতোভাবে যাঁহার কাছে সহায়তা ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ণধার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। আমার সকল প্রকার সাহিত্যপ্রচেষ্টায় তাঁহার উৎসাহ আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না। বস্তুত, তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য, এবং তাঁহার প্রতি কোনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশই যথেষ্ট বলিয়া আমি মনে করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ও আমার প্রতি সর্বদাই যথেষ্ট স্নেহ ও আনুকূল্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।

মুদ্রণ পরীক্ষা কার্যে আমি অত্যন্ত অপটু। প্রকাশকের যথেষ্ট ও যথাসাধ্য সাহায্য এবং আনুকূল্য সত্ত্বেও এবারও কিছু কিছু ভুল থাকিয়াই গেল, তবে আশা করি কোনটাই খুব কিছু মারাত্মক নয়। এই সংস্করণের নাম-সূচী সংকলন করিয়াছেন আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান সুধীররঞ্জন দাশ। তাঁহাকে সস্নেহ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যে-শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় আমি এই রবীন্দ্র-পূজা করিয়াছি, এই গ্রন্থ যদি সেই শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার কিছুমাত্র অংশও পাঠকচিত্তে সঞ্চার করিতে পারে, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ বোধ করিব।

ইতি, ২২শে শ্রাবণ, ১৩৫১

বিনয়াবনত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় **নীহাররঞ্জন রায়**

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের আশি বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। বাঙ্গালী ও ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি আজও আমাদের মধ্যে বর্তমান। জরা তাঁহার বলিষ্ঠ মন ও চিত্তকে জীর্ণ করিতে পারে নাই, ক্ষীয়মাণ দেহের শাসন নাশন উপেক্ষা করিয়া তাঁহার বুদ্ধি ও কল্পনা আজও থাকিয়া থাকিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে।

পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া এই দুর্জয় প্রদীপ্ত প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের চক্রবর্তিক্ষেত্রে জ্যোতি বিকীরণ করিতেছে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জীবনের সকল স্তরের সকল জ্ঞান ও কর্মে, ধ্যান ও ধারণায়, চিন্তা ও আদর্শে, আচার ও ব্যবহারে তাঁহার অপরিমেয় দান ও প্রদীপ্ত প্রতিভার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। একথা আজ আর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

আমার এই গ্রন্থ সেই দান ও সেই সূর্যকবোজ্জ্বল কবিপ্রতিভার সমগ্র পরিচয় দিবার স্পর্ধা রাখে না। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠে যাঁহারা আনন্দলাভ করেন, সেই সাহিত্য-তীর্থে পরিক্রমা করিয়া যাঁহারা অন্তরে তৃপ্তিলাভ করেন, আমি সেই সহস্রের একজন। যে চংক্রম-পথ ধরিয়া আমি এই তীর্থ-পরিক্রমা করিয়াছি, সে পথই একমাত্র পথ এ-দাবি করিবার মতন স্পর্ধাও আমার নাই। তবু, এই পথ ধরিয়া তীর্থদেবতার সন্ধান পাইয়াছি বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। গত পনের বৎসর ধরিয়া নানাস্থানে নানাভাবে আমি আমার এই পথশ্রমের আনন্দ, তীর্থ-সান্নিধ্যের আনন্দ কিছু কিছু ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিছু ছাপার অক্ষরে পাঠকজনের গোচর হইয়াছে নানা সাময়িক পত্রের পাতায়, কিন্তু অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় গোপন ছিল। আজ দীর্ঘকাল পর কবি যখন জরায় আক্রান্ত তখন মনে হইল, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে যত আনন্দ প্রতিদিন আহরণ করিয়াছি, এখনও করিতেছি, সেই অপরিমেয় আনন্দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনও চেষ্টাই এ-যাবৎ করা হয় নাই। এই গ্রন্থ আমার সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষীণতম প্রয়াস মাত্র।

রবীন্দ্র-সাহিত্যসাধনার সকলদিক এই গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। যে-সব দিক আলোচিত হইয়াছে তাহাও অসম্পূর্ণ, কারণ একান্ত অধুনাতন রচনাগুলি ইচ্ছা করিয়াই আমি এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করি নাই। কাব্যপ্রবাহের আলোচনায় "পূরবী"তে (১৩৩১), ছোটগল্পে 'নামঞ্জুর গল্পে' (১৩৩২), নাটকে "রক্তকরবী"তে (১৩৩১) এবং উপন্যাসে "শেষের কবিতা"য় (১৩৩৫) পৌঁছিয়াই ছেদ টানিয়াছি। কোনও ক্ষেত্রেই ছেদের বিশেষ কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই, সাধারণভাবে এইটুকুই শুধু বলিতে পারি, একান্ত সাম্প্রতিক রচনাগুলি সম্বন্ধে সমসাময়িক মানসদৃষ্টি কতকটা আচ্ছন্ন থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। সেই আশঙ্কায় আমি সে চেষ্টা করি নাই। "কবি রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি আমি সূচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছি এই কারণে যে, এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সমস্ত গ্রন্থের কুঞ্চিকা বলিয়া আমি মনে করি। "রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন" প্রবন্ধটি এই গ্রন্থে না থাকিলেই ভাল হইত, বন্ধুপ্রীতির দাবিতে ইহাকে স্থান দিতে হইয়াছে। অন্য চারিটি ছোটবড় অধ্যায়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে কয়টি দিক আলোচিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সবিনয়ে পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করি। আমার আলোচনা

কালানুক্রমিক; রবীন্দ্র-মানসের ও রবীন্দ্রসাহিত্যের বিবর্তন এই কালানুক্রমিক পাঠ ও আলোচনা ছাড়া সম্পূর্ণ বুদ্ধিগোচর হয় না বলিয়া আমার বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত, আমি সর্বত্রই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, কবির ব্যক্তিজীবন ও সমসাময়িক সমাজেতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। আমার ধারণা, এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া দেখিলে রবীন্দ্র-মানস ও রবীন্দ্র-সাহিত্য বুঝিবার সুবিধা হয়। কলাকৌশলের আলোচনা আমি ততটুকুই করিয়াছি যতটুকু রবীন্দ্র-কবিমানসকে বুঝিবার জন্য প্রয়োজন, যতটুকু রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাব ও রসানুভূতির সহায়তা করে।

এই সুদীর্ঘ-রচনায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অনেকের নিকট হইতেই ঋণগ্রহণ করিয়াছি। রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া কতদিন কতজনের সঙ্গে কতরকম আলোচনা হইয়াছে; কাহার কোন্ চিন্তা ও ধারণা কি ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছি তাহার হিসাব রাখি নাই। প্রত্যক্ষ ঋণ যাঁহাদের নিকট লইয়াছি সর্বত্রই তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাদিগকে, এবং পরোক্ষ ঋণ যাহাদের নিকট লইয়াছি তাঁহাদেব সকলকে আমার সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই গ্রন্থের 'প্রুফ' দেখিতে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীমতী মণিকা দেবী। তিনিই বিষয়-সূচী এবং নাম-সূচীও সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ তাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনও অবকাশ নাই।

অনেকগুলি ভুল ত্রুটি রহিয়া গেল; তাহা কিছু অনবধানতা বশত, কিছু হয়ত অজ্ঞতায়। স্বল্পজ্ঞান লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ধারিত বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করিতে গিয়াও কিছু গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছি। ভাষার শৈথিল্যও হয়ত স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সব ভুলের সমস্ত অপরাধই আমার, এবং তাহার জন্য পাঠকের তিরস্কার সহ্য করিতেই হইবে, সমালোচকের ত কথাই নাই। তবে আশা করি, এই জাতীয় ভুল যাহা আছে তাহার কোনটিই খুব মারাত্মক নয়, এবং আমার বক্তব্য তাহাতে আহত বা আচ্ছন্ন হয় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আনুকূল্য ছাড়া এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইবার গৌরব লাভ করিতে পারিত না। ইঁহাদের উভয়ের নিকট আমি স্নেহঋণে আবদ্ধ, একথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

শ্রীসরস্বতী প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় দুই বৎসর ধরিয়া আমার অনেক উৎপাত সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাকেও সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ইতি, ১লা বৈশাখ, ১৩৪৮

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিনয়াবনত
নীহাররঞ্জন রায়

বিষয়-সূচী

উপাদান এবং কবিচিত্তে ভারতীয় ঐতিহ্যের আবেদন—মানব-মহিমার ভারতীয় রূপের ও ধর্মের প্রতি কবিচিত্তের বিশেষ আকর্ষণ—ঐতিহ্য অবগাহন—সমসাময়িক সমাজমানস—"কল্পনা"য় কবিচিত্তের দুই ধারা—কবির সৃষ্টি প্রচেষ্টাকে নামাঙ্কিত করিবার বিপদ—গভীর জীবনদ্বন্দ্ব—নূতন মহাজীবনের আহ্বানের স্বীকার—'বর্ষশেষ' 'রাত্রি' প্রভৃতি কবিতা—"ক্ষণিকা"য় ক্ষণিককালের সহজ সাধনা—দুইদিকের টানে স্পর্শকাতর চিত্তের বেদনা—"ক্ষণিকা"র ছন্দরূপ—প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময় জীবন হইতে একান্ত বিদায়—(৬) "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে ভারতীয় মহিমার গভীরতর প্রকাশ—স্বদেশ-চেতনা—অধ্যাত্ম চেতনা ও অধ্যাত্মাদর্শ—সংসার নিরপেক্ষ সাধনা নয়—সহজ উপলব্ধির সূচনা—ভাবোন্মাদ মত্ততার প্রতি বিরাগ—বীর্য ও জ্যোতি, জ্ঞান ও কর্মময় ভক্তি—মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শের সাধনা—বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার সঙ্গে পার্থক্য—"স্মরণ" কাব্যে ব্যক্তিগত শোকের নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি—মৃত্যুর মাধুরী জীবনের মধ্যে বিস্তৃত—"শিশু"র কবিতা শিশুর মুখের বা মনের কথা নয়, শিশুর মনের সহজ খেয়াল কবির মনে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় পরম রহস্যে রূপান্তরিত—"উৎসর্গ"—"খেয়া" ও সমসাময়িক বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্র—পারিবারিক জীবনে মৃত্যুর হানা—"নৈবেদ্য"-গ্রন্থের সঙ্গে "খেয়া"র যোগ—রূপক-রহস্য—বাহিরের কর্মময় জীবন ও ভিতরের ভাবময় আত্মগত অনুভূতি—"খেয়া"র কাব্যমূল্য—"খেয়া"য় কবি খেয়াপার হইলেন—নবজন্মলাভের সূচনা—(৭) কবিমানসের নূতন রূপ—অধ্যাত্ম-জীবনে দীক্ষা—"গীতাঞ্জলি"তে সাধনার কথা, বেদনার কথা, সংগ্রামের কথা—ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথ—মধ্যযুগীয় কবি-সাধকদের সঙ্গে রবীন্দ্র-অধ্যাত্মাদর্শের পার্থক্য—রবীন্দ্র-কবিমানসের মৌলিকত্ব—নিসর্গ-সাধনের গানগুলির কাব্য-মূল্য বেশি—বৈষ্ণব পদকর্তাদের সঙ্গে তুলনা—উপনিষদের অধ্যাত্মযোগ ও রবীন্দ্রাদর্শ—"গীতাঞ্জলি"র সুর—"গীতাঞ্জলি" অসমাপ্ত সাধনার কাব্য—"গীতিমাল্য" ও "গীতালীতে" সাধনার পরিণতি—ভাবগত-সাধনার সহজ মুক্ত আনন্দ ও আরাম, তৃপ্তি, শান্তি ও শক্তি—"গীতিমাল্য" "গীতালি" শ্রেষ্ঠতর কাব্য—ভাগবত-সাধনার পরিপূর্ণতা একটি পথের শেষ—কবি ত পথের শেষ চাহেন নাই—পুরাতন ধূলিময় ধরণীর স্বর্গভূমির প্রতি নূতন প্রেমের জাগরণ—(৮) নূতন পথের আহ্বান—কবির ব্যক্তিজীবন ও সমসাময়িক সমাজ-জীবনে তাহার কারণ অনুসন্ধান—যৌবনের নূতন বোধন ও "বলাকা"—"বলাকা"র গভীরতর সুর—পূর্বজীবনের যৌবন-পূজায় ও পরিণত জীবনের যৌবন-পূজায় পার্থক্য—সমাজচেতনা ও চিত্তের এই ভাবপরিবর্তন—যৌবনের জয়গান "বলাকা"র শেষ কথা নয়, মূল কথাও নয়—"বলাকা" গতিরাগের কাব্য—এই গতিরাগ কোনও তত্ত্ব নয়, তত্ত্ব হিসাবে "বলাকা" বিচার্যও নয়—'ছবি', 'শা-জাহান', 'তাজমহল', 'চঞ্চলা', 'বলাকা'—গতিই কি একমাত্র সত্য?—গতিবেগ হইতে মুক্তি—মৃত্যুচিন্তা—মৃত্যু-বিরহের সান্ত্বনা—মৃত্যুযজ্ঞের সার্থকতা—"বলাকা"র প্রেম, নিসর্গ, সৌন্দর্য ও অন্তর-রহস্যগত কাব্যমণ্ডল—অধ্যাত্ম-প্রত্যয় ও আত্ম-প্রত্যয়ের দৃঢ়তা—মুক্তির আনন্দ—মাটি মায়ের আহ্বান—"পলাতকা"য় মাটির স্বর্গের ঠিকানা—পুরাতন জীবনের নূতন অভিব্যক্তি—সমাজ-চেতনার পরিচয়—"শিশু ভোলানাথ" ও মানসিক নির্লিপ্ততা—"লিপিকা" এবং কাব্যের নূতন রূপ—"শিশু ভোলানাথ" ও "লিপিকা"র কাব্য-মূল্য—(৯) "পূরবী"র সৃষ্টিউৎস—"পূরবী"র মূল সুর—হারাইয়া যাওয়া দিনগুলির জন্য দুঃখবোধ—'মাটির ডাক', 'লীলা সঙ্গিনী', 'বকুল বনের পাখি'—'তপোভঙ্গ' কবিতায় কবির নিজের তপস্যা-ভঙ্গ—"পূরবী"র ছন্দজগৎ—'ক্ষণিকা', 'কৃতজ্ঞ', 'বৈতরণী'—"লেখন"—"বৈকালী"—"মহুয়া"র উৎস—"মহুয়া"র উন্মাদন গন্ধ—

কবি রবীন্দ্রনাথ

এক

বহুদিন আগে বাংলা দেশের এক প্রতিভাবান মনীষীর বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি উক্তি শুনিয়াছিলাম। সে উক্তিটি এখন আর যথাযথ মনে নাই, মোটামুটি তিনি এই ধরনের একটি কথা বলিয়াছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান সুলেখক, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাশীল দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথ আদর্শ নৈষ্ঠিক গৃহস্থ, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঋষি।' যথাযথভাবে কথাটি আমি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার কথা বলিতে গিয়া লেখক তাঁহার ঋষিত্বকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, এই কথাটা মনে আছে। ইহা কিছু অস্বাভাবিকও নয়। কারণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ, উপনিষদের ভাবরসপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ, "গীতাঞ্জলি"র রবীন্দ্রনাথ, অসংখ্য ধর্মসংগীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, "মানুষের ধর্ম"-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, এবং পরম সুরসিক তত্ত্বজ্ঞ রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলিয়া মনে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। যে আত্মমগ্ন ধ্যান দৃষ্টি, যে পরম জ্ঞান ও প্রতিভা, যে দিব্য বৈরাগ্য, এবং সর্বোপরি যে বিরাট ব্যক্তিত্ব আমাদের ভারতীয় ঋষিত্বের আদর্শকে মহীয়ান করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অল্পবিস্তর সঞ্চারিত হইয়াছে। সত্যই, রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলিলে অত্যুক্তি কিছু করা হয় না। তবু, বলিতে ইচ্ছা হয়, সব কিছু ছাড়িয়া, সব কিছুর উপরে, সব কিছুর মূলে রবীন্দ্রনাথ কবি। তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী, একথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যতখানি সত্য, বর্তমান জগতে আর কোনও মানুষের পক্ষেই হয়ত ততখানি সত্য নয়, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার সকল দিক ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাঁহার কবি প্রতিভা। পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ, ঋষি রবীন্দ্রনাথকেও ম্লান করিয়াছেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা তাঁহার অন্তর্নিহিত সত্তার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু বলিয়া মনে করিতে পারি না। কাব্যে সংগীতে-গল্পে-নাট্যে উপন্যাসে তিনি যেমন করিয়া আপনার অভিজ্ঞতার আবেগকে প্রকাশ করিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টায়, শিক্ষাদান ও প্রচারে, তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও ব্যাখ্যায়, অধ্যাত্মবোধ এবং তাহার প্রকাশও তিনি তেমন করিয়াই নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রকাশ কোনও নূতন জ্ঞানলাভের প্রেরণায় বা প্রয়োজনের তাড়নায় নয়। বিশ্বজীবনের বিচিত্র বিকাশের সঙ্গে মানুষের একটা নিবিড় যোগ আছে; বুদ্ধির সাহায্যে, জ্ঞানের প্রেরণায় এ-সম্বন্ধকে কেহ জানিতে চায়, প্রয়োজনের তাড়নায় এ-সম্বন্ধকে কেহ দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে চায়। কিন্তু এই-জাতীয় চেষ্টার বাহিরেও একটা চেষ্টা মানুষের আছে; মানুষ চায় এই সম্বন্ধটিকে, এই নিবিড় সংযোগের রসটিকে ভোগ করিতে, জানিতে নয়—পাইতে,

অনুভব করিতে। এই ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির প্রেরণাই কবি ও শিল্পীকে রূপসৃষ্টি, রসসৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত করে, তাঁহার নিদ্রিত চৈতন্যকে প্রকাশের তাড়নায় ব্যাকুল করিয়া তোলে। নানা যুগের নানা দেশের ইতিহাস যে কাব্যে-সংগীতে-চিত্রে-ভাস্কর্যে পুষ্পিত ও অলংকৃত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই অনুভূতির আবেগ, প্রকাশের প্রেরণা, নিজের সত্তার আনন্দবেদনাবোধকে বিকশিত করিবার ব্যাকুল প্রয়াস। এই যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের রসকে ভোগ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার মনে যে অভিজ্ঞতার আবেগ জাগিয়াছে, তাহারই ফলে তিনি অদ্বিতীয় রূপস্রষ্টা, অদ্বিতীয় কবি। তাঁহার এই কবি-মানস, বস্তুত সকল প্রকার রূপ-মানসের মূলে আছে এই রসভোগের ইচ্ছা, অনুভূতির প্রেরণা, প্রকাশের প্রেরণা,—জ্ঞানের প্রেরণা নয়, প্রয়োজনের তাড়না নয়।

একদিন রবীন্দ্রনাথ—তখন তাঁহার বয়স কুড়ি কি একুশ বৎসর হইবে—কলিকাতায় সদর স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক অপূর্ব সুমহান প্রত্যয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। সেই সকাল বেলায় এক জ্যোতির্ময় মুহূর্তে মানুষের সঙ্গে বিশ্বজীবনের, বিশ্বপ্রকৃতির সত্য সম্বন্ধটিকে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন; পরবর্তী জীবনে কাব্যে-গানে-কর্মে-চিন্তায় এই প্রত্যয়টি কত ভাবে ও কত রূপে যে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যয়-ভাবনার দিক হইতে, অধ্যাত্মবোধের দিক হইতে এই প্রত্যয়টির একটি বিশেষ মূল্য আছে, এবং ইহা চিন্তাজগতের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের এ-প্রত্যয় কিছু তত্ত্বচিন্তা অথবা অধ্যাত্মবোধের ফল নয়, একটি অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক অনুভূতির ফলেই এই সত্যকে তিনি জানিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কাছে কিছু "তত্ত্বও নয়, বিজ্ঞানও নয়, কোন প্রকার কাজের জিনিসও নয়, তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মত অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা আর কোনো বুদ্ধিসাধ্য জিনিস মিলাইয়া দিতে পার তো দাও, কিন্তু সেটা গৌণ" ("জীবনস্মৃতি")। কবিধর্মের, সৃজন-প্রতিভার ইহাই স্বরূপ; এবং এই স্বরূপটিই রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টায় ব্যক্ত হইয়াছে। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের এই কবি-মানস কি ভাবে অঙ্কুর ফুঁড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, "জীবনস্মৃতি" হইতে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় একটু উদ্ধৃত করিলেই ইহার স্বরূপটি বুঝা যাইবে—

"নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে এক মনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে, সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম, স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে—মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে-জিনিসটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে সেটা নিতান্তই ছেলেমানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে, তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি * * * আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই, কিন্তু তাহা অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে।"

শুধু ছেলেবেলায়ই নয়, পরবর্তী সমগ্র জীবনেও তাঁহার এই বিশিষ্ট কবিপ্রকৃতিই জয়যুক্ত হইয়াছে। এক একটা জিনিস এক এক সময়ে তাঁহার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে, এবং তাহারই ফলে তিনি সেই জিনিসকে ভোগ করিয়াছেন, পাইয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন; কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা, চিন্তা দ্বারা তাহাকে জানিতে অথবা প্রয়োজনের খাতিরে

তাহাকে একান্ত করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। নিজেই তিনি বলেন, "অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাহার সকল খবর আসিয়া পৌঁছায় না।" আসল কথা রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার গড়নটা কবির গড়ন, সাহিত্যিকের গড়ন, যখনই বিশ্বজীবনের কোনও কিছু তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, তখনই তিনি কাব্যে, গানে, বিচিত্র কর্মে ও চিন্তায় আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, আর কিছুরই অপেক্ষা রাখেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই কবি, রূপকার, রসস্রষ্টা; তাঁহার সমগ্র জীবনের দৃষ্টি কবির দৃষ্টি। জগৎ ও জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন—কোনও বিশিষ্ট-প্রত্যয়ভাবনা অথবা চিন্তাধারার ভিতর দিয়া ততটা নয়, যতটা নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়া। তাঁহার অসংখ্য গান ও কবিতার কথা ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনের উপাসনা ও উপদেশ, নানান তত্ত্ব ও চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া যে বিশিষ্ট সাহিত্যরাজ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে বিহার করিলেও সহজেই বুঝা যায়, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ ও জীবনের মধ্যে যাহা রসের, যাহা অনুভূতির সেইদিকেই তাঁহার কবিচিত্তের সহজ গতি। অনেক সুমহান সত্যের ইঙ্গিত হয়ত তিনি পাইয়াছেন, তাঁহার রচিত বিভিন্ন সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে তাহা প্রকাশও পাইয়াছে; কিন্তু এই পাওয়া বা প্রকাশ কোন চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়া অথবা তত্ত্বের তন্তুজাল বুনিয়া বুনিয়া নয়, জ্ঞানের সুদুর্গম পথের যাত্রী হইয়া নয়—অন্তরের সহজ অনুভূতির বিপুল ঐশ্বর্য দিয়া, রসিকচিত্তের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া। যে-যুক্তিপর্যায়, যে-প্রমাণমালা, যে-বিচারের ভিতর দিয়া একটি তত্ত্বের, একটি সত্যের সন্ধান আমরা পাই, রবীন্দ্রনাথ তেমন করিয়া তাহার সন্ধান পান নাই। বিশ্বজীবনের অনেক নিগূঢ় রহস্য, অনেক দুর্লভ দুরধিগম্য সত্যই তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, এবং তিনি তাঁহার অননুকরণীয় কবিজনোচিত ভাবে ও ভাষায় তাহা প্রকাশও করিয়াছেন। যুক্তি-শৃঙ্খলা বলিতে যাহা বুঝি, মনন-ক্রিয়ার পারম্পর্য বলিতে যাহা বুঝি, তাঁহার প্রকাশের মধ্যে হয়ত সর্বত্র তাহা নাই, যে সরস উপমা-সাদৃশ্য তাঁহার রচনার একটা বিশেষ ভঙ্গি, তাহা হয়ত সর্বত্র সত্যও নয়, অকাট্য যুক্তি দিয়া হয়ত সব সময় তাহার প্রতিষ্ঠাও করা যায় না; কিন্তু সমস্ত যুক্তিকে অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের মধ্যে যাহার অনুভূতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত দেখা দেয়, যাহার বোধ কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, অন্তরের মধ্যে যাহার স্পর্শ সূর্যালোকের মত স্পষ্ট, সেখানে তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবির অন্তরকে যাহা নাড়া দিয়াছে, পাঠকের অন্তরকেও তাহা নাড়া না দিয়া পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের যে-কোনও বিশিষ্ট চিন্তাধারার পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে, এই কবিপ্রকৃতির প্রকৃত রূপটি কি।

সৌন্দর্যের মূল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ প্রত্যয় আছে; যে-কেহ তাঁহার সাহিত্য ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তিনিই এই বিশেষ প্রত্যয়টির খবর জানেন। "প্রভাত সংগীত" রচনার সঙ্গে সঙ্গে ইহার খবর সর্বপ্রথম আমরা পাই; সূচনাটি কি করিয়া হইল, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহা বলিতেছেন,

> "সামান্য কিছু করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে-গতি বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনও লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ-সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমগ্রকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহ-চাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। * * * এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাহার একটি সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই।

একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুর্ণ বস্তুপুর্ণ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপুর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটি অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশ কাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে।" ("জীবনস্মৃতি")

এই উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে যাহা অস্পষ্ট, সেই অনুভূতিই ক্রমে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া একটা বিশেষ প্রত্যয়ের রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাই পরবর্তী জীবনের 'ক্রিয়েটিভ য়ুনিটি'। পরবর্তী জীবনে সমস্ত সৃষ্টির মূলে এক বিরাট সৌন্দর্যময় ঐক্যানুভূতির কথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যধর্মের মূলেও রহিয়াছে এই সৌন্দর্যময় ঐক্যানুভূতি—'ক্রিয়েটিভ য়ুনিটি'র কথা। ইহাকে এখন আপাতদৃষ্টিতে আমরা কবির সুদীর্ঘ চিন্তাধারাপ্রসূত একটা বিশেষ মতবাদ বলিয়া দেখি। এ মতবাদ সত্য কি না, ইহার বিরুদ্ধ মতবাদ কিছু আছে কি না, ইহা বিচারযোগ্য কি না, সে বিচার স্বতন্ত্র। কিন্তু একটা বিশেষ মতবাদ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, যে বিশেষ জ্ঞান ও তত্ত্বচিন্তার ফল বলিয়া জানি, রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্যরহস্য, এই সৃষ্টি-রহস্যকে আমি তেমন কিছু মতবাদ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই অনুভূতি-লব্ধ প্রত্যয়কে নানা যুক্তি নানা বিচারের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু মূলত ইহা একটা আনন্দানুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যকে দেখিবার একটা সহজ দৃষ্টি, বিশ্বজীবনের রসকে ভোগ করিবার একটা বিশেষ ভঙ্গি, নিজের মধ্যকার আনন্দানুভূতির আবেগকে প্রকাশ করিবার একটা বিশেষ রীতি।

সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের যোগের মধ্যে একটি নিগূঢ় সুনিবিড় সম্বন্ধের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত সত্য, এবং এই অনুভূতিও রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটা বিশেষ মতবাদের রূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহা যে একান্তই কবিগুরুর নিজস্ব তাহা নহে; আমাদের দেশের প্রাচীন মননধারার মধ্যে হয়ত এই প্রত্যয়ের পরিচয় আছে। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ইহা একটা বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিচার্য তাহা নহে। এই মতবাদের সঙ্গেই আবার রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার রহস্যও জড়িত; কিন্তু তাহাও আলোচ্য নয়। বলিবার কথা এই যে, এই সীমা-অসীমের সম্বন্ধ, এই জীবনদেবতার রহস্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ইহা কিছু তত্ত্ব বা মতবাদ নয়, কোন প্রকার ধর্মের সূত্র নয়, শুদ্ধ অনাবিল অনুভূতি মাত্র। অসীম আকাশ আঙিনার ক্ষুদ্র আকাশের মধ্যে ধরা দেয়, ততটুকুর মধ্যেই তাহার বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠে; আবার এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন আকাশই সুবিস্তৃত আকাশের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া পরিপুর্ণতা লাভ করে। বিশ্বজীবন আমাদের ব্যক্তিজীবনের মধ্যে ধরা দিয়া তবে তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি লাভ করে, সেই আমাদের ব্যক্তিজীবনই আবার বিশ্বজীবনের মধ্যে নিজেকে বিসর্পিত করিয়া নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে চায়। এমনি করিয়াই সীমায় অসীমে, খণ্ডে পূর্ণে, ব্যক্তিজীবনে বিশ্বজীবনে একটি অশেষ অপরূপ চিরন্তন লীলা চলিয়াছে; এই লীলাই সৃষ্টির সৌন্দর্য, ইহাই আনন্দ। এই সৌন্দর্য, এই আনন্দ, ইহার পরিপুর্ণ রসটিকে রবীন্দ্রনাথ আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন, একটি অপূর্ব সুগভীর রহস্যরূপে অনুভব করিয়াছেন। তত্ত্ব হয়ত ইহার মধ্যে আছে, তত্ত্বের আকারে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে একাধিকবার ব্যক্তও করিয়াছেন; কিন্তু, আমার ধারণা, সে

শুধু তাঁহার কবিপ্রকৃতির সহজ বোধ ও অনুভূতিকে যুক্তি ও প্রমাণের মধ্যে, চিন্তা ও জ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দান করিবার জন্য। তাহা তাঁহার নিজের জন্য ততটা নহে, যতটা পরের কাছে এই অনুভূতিকে বোধ্য ও জ্ঞানলভ্য করিবার জন্য। তাঁহার জীবনদেবতার রহস্যও মূলত এইরকম একটি ভাবানুভূতি এবং তাহাকেই তিনি নিজের অন্তরের মধ্যে পরম রমণীয় করিয়া রসের আধার করিয়া পাইয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ও সুগভীর অধ্যাত্মবোধের মূলেও আছে এই বিশেষ কবিপ্রকৃতি—রসের ক্ষুধা, ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির ক্ষুধা। তিনি যে এক শুভ্র নিরঞ্জন অদ্বিতীয় দেবতার স্পর্শ বারংবার হৃদয়ের মধ্যে লাভ করিয়াছেন, যাঁহার লীলায় তাঁহার কবিজীবন অপূর্ব ভাবরসে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং যাঁহার প্রকাশ তাঁহার অন্তরের মধ্যে সূর্যালোকের মত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নিরঞ্জন দেবতাকেও তিনি পাইয়াছেন তাঁহার কবিহৃদয়ের অনুভূতির মধ্যে, নানা ভাবে, নানা রূপে —কখনও তিনি দেবতা, কখনও বন্ধু, কখনও সখা, কখনও লীলাসাথী। যৌগিক সাধনার বন্ধুর দুর্গম পথে তাঁহার দেবতা আসেন নাই, কোন বিশেষ ধর্মাচরণের অপেক্ষাও তিনি রাখেন নাই, বহু শাস্ত্রচর্চা, বহু ধ্যান-নিদিধ্যাসন, বহু জ্ঞানের পথেও সে-দেবতার পদচিহ্ন পড়ে নাই, 'ন মেধয়া, ন বহুধা শ্রুতেন,' তিনি আসিয়াছেন তাঁহার সহজ অনুভবের মধ্যে। দেবতাকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়াছেন বলিব না,—বলিব তাঁহাকে তিনি পাইয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন, প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিষদের অনুরক্ত রসিক পাঠক রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ্-তত্ত্বের মধ্যে বিচরণ করিবার আগ্রহ বড় দেখি না; দেখি, তিনি ডুব দিয়াছেন রসসমুদ্রের অতলে, সেখানে কোন তত্ত্ব নাই, কোন বিচার নাই, বিরোধ নাই। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ যখন উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন, তখন সে-ব্যাখ্যায় উপনিষদ্-তত্ত্ব ততটা পাই না, যতটা পাই উপনিষদের আপ্তবাক্যকে উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিজের মর্মের উপলব্ধির কথা। উপনিষদের ঋষিবাক্য তখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ও ভাবে রূপান্তরিত হইয়া, অনুভূতি দ্বারা প্রাণবন্ত হইয়া অপূর্ব কাব্য হইয়া উঠে। জ্ঞানের সমস্ত পুঁজি নাড়িয়া বিচার করিয়া, বিবেচনা করিয়া যাহার সন্ধান আমাদের কাছে কিছুতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে না, তাহা তাঁহার কাছে ধরা দেয় অত্যন্ত সহজে, তাহা এক মুহূর্তে তাঁহার রসের ক্ষুধা, ভোগের ক্ষুধা, জীবনাভিজ্ঞতার ক্ষুধাকে তৃপ্তিতে ভরিয়া দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রকাশ জীবনের মধ্যে অপূর্ব রসে ও সৌন্দর্যে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে।

একদিন রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের, তথা ভারতবর্ষের, রাষ্ট্রীয় জীবনযজ্ঞে পুরোহিতের কাজ করিয়াছিলেন, স্বদেশী-মন্ত্রের তিনিই ছিলেন উদ্গাতা। বাংলা দেশে তখন একটা সুবৃহৎ ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল, তেমন জোয়ার বুঝি এ-দেশে ইতিপূর্বে কখনও আসে নাই, সাম্প্রতিক কালে তেমন ভাবে বাংলা দেশ বুঝি আর কখনও আন্দোলিত হয় নাই। সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ ভগীরথের মত বাংলা দেশের উপর দিয়া ভাগীরথীর ধারা বহাইয়া দিলেন। বিজয়ার দিনের আহ্বান শুনিয়া সমস্ত দেশ মাতিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে স্বদেশীসমাজ গড়িয়া উঠিল, ভিক্ষুকবৃত্তি ছাড়িয়া দেশ নিজের দিকে মুখ ফিরাইল; এ-সমস্ত তাঁহারই প্রেরণা পাইয়া। গানে-কবিতায়-প্রবন্ধে-বক্তৃতায় বাংলা দেশ যেন তাঁহার মুখে ভাষা পাইল। কিন্তু, কেন তিনি এমন করিলেন, কেন তিনি নিজের ঘরে শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে তৃপ্ত হইয়া রহিলেন না, এ-কথাটা বোঝা প্রয়োজন। আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না, কোন প্রয়োজনের তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয়-

যজ্ঞে পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা তাঁহার অন্তর্নিহিত আবেগ-সত্তার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা মাত্র। তাঁহার জীবনের মূলে আছে অনুভূতির আবেগ, প্রকাশের চেষ্টা, নিজের আনন্দবেদনাবোধকে বিকশিত করিবার ব্যাকুল প্রয়াস। বাংলা দেশের স্বদেশী-যজ্ঞ এক সময় তাঁহার অন্তরকে খুব একটা নাড়া দিয়াছিল, বিশ্বজীবনের এই খণ্ড ও সাময়িক বিকাশটি তাঁহার অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, এবং তাহার ফলে তিনি অন্তরের মধ্যে সুবৃহৎ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার রসের ক্ষুধা, ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির প্রেরণা এবং অন্তরের আনন্দবেদনাবোধকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুল আগ্রহ মনের মধ্যে জাগিয়াছিল। এই হিসাবে স্বদেশী যজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্য তাঁহার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার একটা কর্মরূপ। যেদিন এই অনুভূতির আবেগ মিটিয়া গেল, আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা তৃপ্তিলাভ করিল, সেদিন তিনি এক মুহূর্তেই যজ্ঞের পৌরোহিত্য-পদ পরিত্যাগ করিলেন। একথা বলা চলিবে না যে, রাষ্ট্রান্দোলনের ক্ষেত্রে দেশের সেবায়, দেশের শৃঙ্খলমোচনে তাঁহার সাহায্যের আর প্রয়োজন ছিল না; সে-প্রয়োজন তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ত সে-প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করেন নাই,—নিজের সৃষ্টির আনন্দকে, আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকেই রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন।

আজ পূর্ণ এক যুগ ধরিয়া দেশে আবার আর এক জাতীয়-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, বহু লোক জীবন দিয়া, সেবা দিয়া, ক্ষতি দিয়া, অর্থ দিয়া প্রাণ দিয়া যে-যজ্ঞে আহুতি দিতেছে। সকলেই জানেন, এই নূতন জাতীয়-যজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের যোগ তেমন নাই; তাঁহার অন্তরাত্মা ইহাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণও করিতে পারে নাই। অনেকেই ইহাতে আশ্চর্যবোধ করেন, অনেকেই এ জন্য তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, দুঃখবোধ করিয়াছেন, দেশকে স্বদেশমন্ত্রে একদিন যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার এই ব্যবহার শোভা পায় না, এ-কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। আমার মনে হয়, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, এবং এই ব্যবহার কিছু অশোভনও নয়। নিজের কাছে এ ব্যাপারে তিনি একান্তভাবে খাঁটি, মিথ্যাচরণের লেশমাত্র কোথাও নাই। আমি এইমাত্র বলিয়াছি, স্বদেশী যজ্ঞের পৌরোহিত্য রবীন্দ্রনাথ যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল তাঁহার আত্মবিকাশের ইচ্ছা, প্রকাশের প্রেরণা, অন্তরের আনন্দবোধকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুল আগ্রহ। কবিপ্রকৃতির ইহাই স্বরূপ। স্বদেশী যজ্ঞ তাঁহার নিজেকে ব্যক্ত করিবার একটা সুমহান সুযোগ দান করিয়াছিল, সেইজন্যই সেই যজ্ঞকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া রবীন্দ্রনাথের তখনকার জীবনে এক সাড়া পড়িয়াছিল, কাব্যে-গানে-গল্পে-প্রবন্ধে বক্তৃতায় তাঁহার প্রতিভা তখন বাঁধ ভাঙা দুকূলছাপা নদীর মত ছাপাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে-অনুভূতির প্রেরণা বহুদিন মিটিয়াছে, রাষ্ট্রীয় জীবন যজ্ঞে আহুতি দিয়া আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা বহুদিন তৃপ্তিলাভ করিয়াছে, এবং তাহার আনন্দ জীবনকে নূতনভাবে অভিব্যক্তিও দান করিয়াছে। আজ আর সেই অনুভূতির প্রেরণা, সেই প্রকাশের ইচ্ছাকে ভোগ করিবার আগ্রহও তাঁহার নাই, বিশ্বজীবনের সেই ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাও আর তিনি অনুভব করেন না। সেইজন্যই আজিকার অসহযোগ-যজ্ঞ তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিল না, তাঁহার অন্তরের সত্তাকে নূতন চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিল না, সে-চৈতন্য বহুদিন আগে হইতেই উদ্বোধিত হইয়া গিয়াছে। আজ তিনি বিশ্বজীবনের অন্যতর বৃহত্তর বিস্তৃততর ক্ষেত্রে অনুভূতির ক্ষুধা মিটাইতেছেন,

আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা অন্যতর যজ্ঞক্ষেত্রে তৃপ্তিলাভ করিতেছে; আনন্দের রসভোগের ক্ষেত্র আজ আর রাষ্ট্রীয় যজ্ঞক্ষেত্র নয়। পঁচিশ বৎসর আগেকার রবীন্দ্রনাথকে আজ পঁচিশ বৎসর পরে ফিরিয়া পাইতে চাহিলে আমাদের মূঢ়তাই প্রকাশ পাইবে। কারণ, কবিধর্মের স্বরূপই এই যে, কবি একবার যে-রস, যে-রহস্য, যে-ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন, ঠিক সেই রস, সেই রহস্য সেই ভাবেই আবার আস্বাদন করিবার আগ্রহ আর তাঁহার জাগে না। সেই Heraclitus-এর কথা—"a man cannot bathe twice in the same river।" অথচ এ-কথা বলিতে পারিব না যে, বাংলা দেশের স্বদেশী-যজ্ঞের চেয়ে আজিকার নিখিল ভারতের অসহযোগ-যজ্ঞ কিছু ছোট জিনিস; আদর্শের দিক হইতে, ত্যাগের দিক হইতে, মর্মবেদনার গভীরতার দিক হইতে, সংগ্রামের কঠোরতার দিক হইতে অসহযোগ-যজ্ঞ বাংলার স্বদেশী যজ্ঞ অপেক্ষা কিছু কম শ্রদ্ধেয় নয়; আন্দোলনের ব্যাপ্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে সমগ্র ভারতবর্ষ—আসমুদ্র হিমাচল—এমন করিয়া পূর্বে আর কখনও আন্দোলিত হইয়াছে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত নাই। সাধারণ যুক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে, এ-যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিবার অধিকার কাহারও যদি থাকিয়া থাকে তবে তাহা রবীন্দ্রনাথেরই; তিনিই ত তাঁহার 'স্বদেশীসমাজে' সর্বপ্রথম অসহযোগ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, গুর্জর-সিংহের গর্জন তখনও শুনা যায় নাই। কিন্তু, এ ত আমাদের সহজবুদ্ধি, স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির কথা নয়; ইহা কবিপ্রকৃতির স্বরূপটিকে, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসটিকে বুঝিবার কথা। মতামতের কোনও অমিল অথবা বিরোধের জন্য তিনি এ-যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেন নাই, এই দেশব্যাপী সুবৃহৎ জীবনান্দোলন হইতে দূরে রহিয়াছেন, এ-কথা আমি মনে করিতে পারিতেছি না। তিনি নিজে অবশ্য একাধিকবার বলিয়াছেন, খদ্দর ও চরকার মন্ত্র তাঁহার ভাল লাগে নাই; নেতিবাচক এই আন্দোলনের প্রারম্ভিক সন্ন্যাস-কাঠিন্যও হয়ত তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই কিন্তু এ-সমস্তই গৌণ ভাবনা, উত্তর ধারণা; আসল কথা, স্বদেশী-যজ্ঞের রবীন্দ্রনাথ আর উত্তরজীবনের রবীন্দ্রনাথ এক মানুষ নহেন, এক রবীন্দ্রনাথ আর এক রবীন্দ্রনাথকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন।

আশঙ্কা হয়, এইখানে ভুল বুঝিবার একটু অবসর হয়ত থাকিয়া গেল। অনেকে বলিবেন, রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশী আন্দোলন হইতে একদিন সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার কারণ দেশব্যাপী উগ্রস্বাদেশিকতার বিস্তার, স্বদেশী আন্দোলনের শোচনীয় পরিণতি। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। উগ্র স্বাদেশিকতার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ কোনও দিনই ছিলেন না; কবির কৈশোরকালের রচনাতেও তাহার প্রমাণ আছে। অথচ স্বদেশ-সাধনা এবং স্বদেশের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার জীবনকে জ্যোতির্দীপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, সে-জীবনকে অপূর্ব গৌরব ও মহিমা দান করিয়াছে। সেই হেতু, একথা আমি কখনও বলিতেছি না, পরবর্তী জীবনে স্বদেশ-সাধনার ক্ষেত্র তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিংবা স্বদেশ-সাধনার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগে কখনও তিনি বিরত ছিলেন। তৎসত্ত্বেও একথা সত্য, স্বদেশী যুগের পরে জীবনে আর তিনি কখনও রাষ্ট্র-যজ্ঞে আহুতি দান করেন নাই, কিংবা আমাদের দেশের পরবর্তী কোনও রাষ্ট্রসাধনাই অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আত্মপ্রকাশের ইচ্ছায় তাঁহাকে ব্যাকুল করে নাই, যে-ভাবে করিয়াছিল স্বদেশী যুগের রাষ্ট্রসাধনা। ইহার প্রমাণের জন্য খুব বেশি অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। একটু মনোযোগের সহিত যদি সেই যুগের

রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও রচনাসূচী এবং ভাব ও কল্পনাপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলেই দেখা যাইবে, অসহযোগ-যজ্ঞ যুগের অথবা তাহারও পরবর্তী সংঘর্ষ যুগের রবীন্দ্র-রচনাসূচী এবং ভাবপ্রকৃতি ও আবেগ-গভীরতা তুলনায় কত বিভিন্ন, কত স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত। রাষ্ট্রীয় যজ্ঞক্ষেত্র স্বদেশী যুগে যে-ভাবে তাঁহার বোধ ও বুদ্ধিকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল, ভাবকল্পনাকে উৎসারিত করিয়াছিল, পরবর্তী যুগে আর কখনও তাহা করে নাই, এ-কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্র-রচনাবলীই তাহার সাক্ষ্য দিবে, রাষ্ট্রীয় কর্মকৃতির তুলনার কথা না-ই তুলিলাম। সেই জন্যই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় জীবন-যজ্ঞে আহুতি দিয়া আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সেই একবারই তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে; পরবর্তী জীবনে দ্বিতীয়বার আর সেই অভিজ্ঞতার প্রবাহে স্নান করিবার ইচ্ছা কবির হয় নাই; তিনি তাহা হইতে বারবার দূরে থাকিতেই চাহিয়াছেন, যদিও কখনও কখনও বাহিরের প্রয়োজনে তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম-প্রবাহের ঘাটে পদক্ষেপ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও পরমুহূর্তেই আবার তিনি সরিয়াও দাঁড়াইয়াছেন। তবে এ-কথার অর্থ এই নয় যে, তিনি স্বদেশ-সাধনার ক্ষেত্রই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; আমি আগেই বলিয়াছি, সে-সাধনার বিরতি জীবনে কখনও হয় নাই। যাহাই হউক রাষ্ট্রীয় জীবন-যজ্ঞে আর আমরা তাঁহাকে পাই নাই বলিয়া দুঃখ করা মূর্খতা মাত্র এবং তাঁহাকে এ-জন্য দোষী করা একান্ত অন্যায়ও বটে। রবীন্দ্রনাথের সত্য ও যথার্থ কবিপ্রকৃতির কথা জানিলে আমরা হয় ত তাহা করিতামও না। কারণ, কবিপ্রকৃতির স্বরূপই এই প্রকার। কবি হইতেছেন বিচিত্রের দূত, চঞ্চলের লীলা-সহচর। এক যজ্ঞক্ষেত্র হইতে অন্য যজ্ঞক্ষেত্রে, এক রূপ হইতে অন্যরূপে, এক ভাব হইতে অন্য ভাবে, এক রহস্য হইতে অন্য রহস্যে তাঁহার চিরন্তন লীলাভিসার চলিয়াছে। চলিষ্ণু সেই প্রকৃতি এক রসের আধার হইতে অন্য রসের আধারে ডুব দিয়া তাহার চিরন্তন সম্ভোগের ক্ষুধা, অনুভূতির আবেগ, প্রকাশের কামনা মিটাইতেছে, এবং তাহার আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা বিচিত্র সৃষ্টিতে রূপায়িত হইতেছে।

আর একদিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের তপোবনে শিশু বালকদের শিক্ষার জন্য এক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজ তাহা শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম করিতে চলিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকাদের শিক্ষাব্যাপারে এমন 'এক্সপেরিমেণ্ট' বাংলা দেশে আর কোথাও হয় নাই, ভারতবর্ষেও খুব বেশি হইয়াছে বলিয়া জানি না। প্রকৃতির অবাধ উন্মুক্ত লীলার মধ্যে প্রকাশের অপূর্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে সুকুমার প্রাণগুলি যে স্বেচ্ছা-বিকাশের আনন্দ লাভ করে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষার প্রথম সূচনা কত সহজ, কত স্বাভাবিক, জীবনের বিকাশ কত সুন্দর'। তিনি বালকবালিকাদের জন্য এক সময় 'সিলেবাস'ও হয়ত প্রণয়ন করিয়াছেন, নিজে পড়াইয়াছেন, এমন কি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছেন, প্রশ্নপত্রও প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই কর্মপ্রচেষ্টার মূলে ইহারা অত্যন্ত গৌণ, মূলত তিনি বিশ্বজীবনের লীলার মধ্যে তরুণ মনের যে প্রথম আনন্দ তাহাকে উদ্বোধিত করিয়া সেইটিই ভোগ করিতে চাহিয়াছেন। বুদ্ধির উষার সঙ্গে সঙ্গে এই বালকবালিকা তরুণতরুণীদল যে প্রকৃতির ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া বিচিত্রভাবে নিজেদের প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে কবির চিত্তই আনন্দে উদ্বোধিত হইয়াছে। এইখানেও তাঁহার কবিপ্রকৃতিরই জয়। ইহাদের সম্মিলিত জীবনধারাকেও তিনি একটি সমগ্র কবিতা করিয়া রচনা করিয়াছেন। এই যে আশ্রমপ্রাঙ্গণে নৃত্যগীত ও বিচিত্র উৎসবের লীলায় ঋতুতে

ঋতুতে প্রাণের উৎসবে ইহারা মাতিয়া উঠে, ইহাদের জীবনের প্রকাশের এই যে সুন্দর সুঠাম রূপ, ইহার মধ্যেও ত রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির অভিব্যক্তিই আমি দেখিতে পাই। শিক্ষাসমস্যার কি মীমাংসা এখানে হইয়াছে বা হয় নাই, শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় সম্বন্ধে এ-বিচার গৌণ। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণের একটি অপূর্ব প্রকাশ; বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র আনন্দলীলাকে শিশুজীবনে কি করিয়া সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহাদের আনন্দকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া নিজের অন্তরের রসভোগের ক্ষুধাকে, আনন্দ-প্রকাশের ব্যাকুলতাকে, অনুভূতির অতৃপ্তিকে সৃষ্টির কার্যে উদ্বুদ্ধ করা যায়, শান্তিনিকেতন তাহারই পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন,

"এই আশ্রমের কর্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক তাই আমার; এর যন্ত্রের দিক যন্ত্রীরা চালনা করেছেন। মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম। সেই জন্যেই তার রূপভূমিকার উদ্দেশে একটি তপোবন খুঁজেছি। নগরের ইটকাঠের মধ্যে নয়, নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গণে, এই সুকুমার বালকবালিকাদের লীলা-সহচর হতে চেয়েছিলাম। এই আশ্রমে প্রাণসম্মিলনের যে কল্যাণময় সুন্দর রূপ জেগে উঠেছে, সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ।. এর বাইরের কাজও কিছু প্রবর্তন করেছি, কিন্তু সেখানে আমার চরম স্থান নয়, এর যেখানটিতে রূপ সেইখানটিতে আমি। * * * এখানে আমি শিশুদের যে গ্রাস করেছি, সেটা গৌণ— প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভরূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি-সূচনায় যে উষারুণ দীপ্তি, যে নবোদ্গত অঙ্কুর, তাকেই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস না হলে আইনকানুনের জঞ্জাল নিয়ে আমায় মরতে হতো। এই সব বাইরের কাজ গৌণ। * * * কিন্তু লীলাময়ের লীলায় ছন্দ মিলিয়ে শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে কখনো ছুটি দিয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করবার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা।" ("প্রবাসী," ক্রোড়পত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮; সপ্ততিতম জন্মোৎসবে কবির অভিভাষণ।)

ঠিক এই ভাবেই বিশ্বভারতীতে ও শ্রীনিকেতনে সকল নিয়মকানুন, কাজকর্ম সব কিছুর বাইরে যেটুকু প্রকাশের দিক, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ, 'যেখানটিতে রূপ সেইখানটিতে আমি'। বিশ্বভারতীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি সর্বদেশের সর্বজাতির, মহামানবের মিলনতীর্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার বহুদিনের একটি আনন্দস্বপ্নকে সেখানে রূপ দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার এই কর্মচেষ্টা কতখানি সার্থক হইয়াছে বা হয় নাই সে-বিচারের কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু যে-স্বপ্ন, যে-আদর্শকে তিনি বিশ্বভারতীতে রূপ দিতে চাহিয়াছেন, তাহা যে প্রকাশের প্রেরণায় ব্যাকুল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সমগ্র বিশ্বের শিক্ষার ও সংস্কৃতির যাঁহারা গুরু, তাঁহারা সকলে আসিয়া একটি যজ্ঞক্ষেত্রে মিলিতেছেন, মন্ত্র নিতেছেন, দিতেছেন—বিশ্বজীবনের কত বড় আনন্দের ইহা প্রকাশ। এই আনন্দকেই রবীন্দ্রনাথ রূপ দিতে চাহিয়াছেন। এখানে প্রাচ্যবিদ্যার যে-আলোচনা হইতেছে, এখানে কলাভবনে যে-স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রদীপটি জ্বালা হইয়াছে, যে-বিচিত্র গ্রন্থরাজি এখানে আহৃত হইয়াছে, সে-সমস্তই বিশ্বমানবের বিচিত্র আনন্দাভিব্যক্তির রূপ। ইহার বিচিত্র বিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক অঙ্গ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাই, কিন্তু পশ্চাতে যে একটি সমগ্র রূপ আছে, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ। এই রূপটির মূলে আছে তাঁহার মহামানবের ঐক্যানুভূতির ক্ষুধা, রসভোগের ক্ষুধা, প্রকাশের ক্ষুধা। শ্রীনিকেতনেও তাই। এখানকার পশুশালায়, শস্যক্ষেত্রে, মাঠের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে হয়ত রবীন্দ্রনাথ নাই, কিন্তু ইহার সব কিছুর পশ্চাতে একটি সমগ্র রূপ আছে, সে-রূপ শ্রীর, লক্ষ্মীর; এই লক্ষ্মীর রূপই রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ের আনন্দকে উদ্বোধিত করিয়াছে। মাটির মধ্যে গাছের মধ্যে বিশ্বজীবনের মাধুর্য ও আনন্দের প্রকাশ তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাহাকেই তিনি এখানে রূপ দান করিয়াছেন

গাছের বীজ মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হয়; বীজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে-ব্যাকুলতা আছে, তাহাই তাহাকে গাছে রূপান্তরিত করে। শ্রীনিকেতনে যে-জিনিসটি রূপ পাইয়াছে—পল্লীশ্রীর রূপ, গ্রামলক্ষ্মীর রূপ—তাহার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এই আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছিলেন, এবং এই অনুভূতির প্রেরণাই এই ভাবে নিজকে ব্যক্ত করিয়াছে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে স্নিগ্ধ মঙ্গলানুষ্ঠানের ভিতর আশ্রমে যে বৃক্ষরোপণ উৎসব, হলকর্ষণ উৎসব ইত্যাদি তিনি করিয়া থাকেন, তাহার অনুষ্ঠানের সৌন্দর্যই যে শুধু উপভোগ্য তাহা নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির এই সবিশেষ পরিচয়টিও তাহার মধ্যে আছে।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার দুই চারিটির মূলে তাঁহার কবিপ্রকৃতির স্বরূপটি ধরিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাঁহার এই কবিমানস যে শুধু তাঁহার চিন্তা ও কর্মচেষ্টার মধ্যেই জয়যুক্ত হইয়াছে তাহা নয়। তাঁহার সর্বপ্রকার রচনায়, কি 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'য়, কি সমাজ ও রাষ্ট্রবিষয়ে বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে, কি 'বাতায়নিকের পত্রে', কি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্মে', কি চিঠিপত্রে, কি তত্ত্বব্যাখ্যায়, কি সাহিত্য-বিচার ও ব্যাখ্যানে, সর্বত্রই ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গিতে তাঁহার বিশেষ কবিপ্রকৃতিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়কে যুক্তি দ্বারা, প্রমাণের সাহায্যে বুঝাইতে বা উপস্থিত করিতে চেষ্টা তিনি ততটা করেন না, যতটা করেন তাঁহার সহজ বোধশক্তিকে, অনুভূতিকে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে তাঁহার অপূর্ব ভাবের অপরূপ ভাষার জাদুর সাহায্যে শ্রোতা ও পাঠকের একেবারে অন্তরের অন্তঃপুরে ঠেলিয়া দিতে; মনে হয়, ইহাই ত যুক্তি, ইহাই ত প্রমাণ! বুদ্ধি যেন স্তব্ধ হইয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সাড়া পাইতে দেরি হয় না—সমস্ত ব্যাপারটা যেন একেবারে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। সরস ও অনায়াসলব্ধ উপমা এবং অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁহার মত কৃতিত্ব আর কাহারও আছে বলিয়া জানি না; ইহারাই যেন সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া বুদ্ধিকে নিবস্ত্র করিয়া দেয়! সুগভীর চিন্তাশীল রচনায় এমন কাব্যগুণের পরিচয় বোধ হয় অতুলনীয়। যে-কোনও রচনা পড়িলেই একথা বুঝিতে বাকি থাকে না যে, ইহার লেখকের ভিতরকার গড়ন সাহিত্যিকের গড়ন, ভিতরকার রূপ কবির রূপ।

কিন্তু দৃষ্টান্ত উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। তবে, ভয় হয়, একটু ভুল বুঝিবার কারণ হয়ত থাকিয়া গেল। একথা যেন কেহ মনে না করেন, রবীন্দ্রনাথ কবি, কবিকুলগুরু ছাড়া আর কিছুই নহেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী—এ-কথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যতখানি সত্য, আজিকার পৃথিবীর আর কোনও সাম্প্রতিক মানুষের পক্ষেই তাহা ততখানি সত্য হয়ত নয়। কত বিচিত্র দিকে তাঁহার প্রতিভা বিকাশ লাভ করিয়াছে, কোন্ দিক ছাপাইয়া কোন্ দিকটি যে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হঠাৎ কিছু ধারণাই হয়ত করা যায় না। একথা সত্য যে, কোনও নির্দিষ্ট এক এক দিকে কাহারও প্রতিভার দীপ্তি হয়ত রবীন্দ্রনাথকেও ম্লান করিয়াছে, কিন্তু সৃষ্টি, চিন্তা ও কর্মের সকল দিকে কাহারও প্রতিভা এমন অম্লান দীপ্তি লাভ করিয়াছে, পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত বর্তমান কালে আর ত দেখি না। বাংলা দেশের সমতলক্ষেত্রে তিনি যেন উত্তুঙ্গ গৌরীশংকরের সূর্যকরোজ্জ্বল শুভ্র শিখরের মত দাঁড়াইয়া আছেন; সে-শিখরের উচ্চতাকে খর্ব করিতে পারে, এমন আর কেহ নাই। সেই দুরারোহ শিখরের তলদেশে দাঁড়াইয়া আমরা শুধু পুলকে, স্তব্ধ-বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকি। আমাদের

জাতীয় জীবনে, বিশেষ করিয়া আমাদের বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত জীবনধারায় তিনি ভাগীরথী-প্রবাহের সঞ্চার করিয়াছেন। যে-জীবন ঘরের দাওয়ায়, পুকুরপাড়ে, বটের ছায়ে কাটিতেছিল, বৃহৎ পৃথিবীর জীবনস্রোতের সঙ্গে তিনি তাহার সংযোগ সাধন করিয়াছেন। তিনি বাংলা-ভাষা-সরস্বতীর লজ্জা ও জড়তা ঘুচাইয়া তাহার মধ্যে সুনিপুণ নৃত্যের গতি ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, এবং বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান পাইবার মত মর্যাদা দান করিয়াছেন। ইহাই শুধু নয়। বাঙালীর জীবনে একটি সুকুমার রুচি ও অনুভূতি, একটি শ্রী ও সৌন্দর্যের চেতনা, এবং তাহার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় একটি সুকুমার সৌষ্ঠব সৃষ্টির সচেতন চেষ্টা তিনি জাগাইয়াছেন। কিন্তু এ ত গেল বাংলা দেশের কথা। সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনেও তাঁহার প্রভাবের পরিমাণ কম নয়। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রজীবনের নবজাগ্রত চৈতন্যের মূলে রহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ, একথা সকলেই জানেন; আমিও আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি। আর ভারতবর্ষের শিক্ষা, সাধনা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তিনি যেমন করিয়া তাঁহার জীবনে ও কর্মে রূপদান করিয়াছেন, এমন আর কে করিয়াছে? ভারতবর্ষের বাহিরে বিশ্বসভ্যতায়ও তিনি যাহা দান করিলেন, তাহার মূল্য কিছু কম নয়। কিন্তু এইখানেই তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রতিভার বিকাশ শেষ হইয়া যায় নাই; আমাদের দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, পল্লীশ্রীর সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে, দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার দানের কথা সকলেই জানেন। ভারতবর্ষের সাধনা ও ইতিহাসের মর্মস্থলকে তিনি আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, সুকঠিন দার্শনিকতত্ত্বের রহস্য তিনি আমাদের কাছে নিকটতর করিয়াছেন, মানুষের সঙ্গে বিশ্বজীবনের নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্বন্ধকে তিনি আমাদের কাছে সহজ করিয়াছেন, এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সাহায্যে সৃষ্টির বিচিত্রতাকে একান্তভাবে উপভোগ করিয়াও তাহাকে এক শুভ্র নিরঞ্জনের মধ্যে উপলব্ধি করিবার যে-রহস্য, তাহা আমাদের কাছে নিকটতর করিয়াছেন। কিন্তু এই যে বিচিত্র চিন্তা ও কর্মের প্রবাহ, বিচিত্র প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মকে যখন একটু দূর হইতে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখি, কেবলই মনে হয়, এই সব-কিছুর মধ্যে যে-রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমরা পাই—তিনি কবি, কবিকুলচূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ। আমার কেবলই মনে হয়, কবি রবীন্দ্রনাথই তাঁহার বিচিত্র চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার জনক। তাঁহার জ্ঞানরাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য, তাঁহার বুদ্ধি ও চিন্তার দীপ্তি বর্তমান পৃথিবীর জ্ঞান ও চিন্তার জগৎটিকে আলোকিত করিয়াছে। কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁহার মত অক্লান্তকর্মী কয়জন? পরিণত বার্ধক্যেও কি তাঁহার কর্মচেষ্টার কোন বিরাম কেহ দেখিয়াছে? আর এই কর্মপ্রচেষ্টাও ত কিছু গতানুগতিক পথ ধরিয়া নয়; এখানেও তাঁহার দুর্জয় প্রদীপ্ত প্রতিভার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। কিন্তু, আমি চেষ্টা করিলাম তাঁহার জীবন ও কর্মকে একটা সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিতে—সকল বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও কর্মকে দূর হইতে এক করিয়া। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন,

"নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। * * * নানা থানা ক'রে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে * * * আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার কাছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানাজনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। * * *" ("প্রবাসী," ক্রোড়পত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮; সপ্ততিতম জন্মোৎসবে কবির অভিভাষণ।)

যাহা হউক, এই সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিলে কখনও ভুল হইবার কারণ নাই যে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমান জগতের চিন্তাবীর ও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠদের অন্যতম, বিশ্বমানবের সুদীর্ঘ যাত্রাপথের যাঁহারা অগ্রণী তাঁহাদের তিনি অন্যতম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও আমাদের মনের মধ্যে জুড়িয়া বসিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সকলের উপরে রবীন্দ্রনাথ কবি, কবিকুলগুরু।

ভালই হইল যে, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ কবি। আমাদের সর্বপ্রথম কবি হইতেছেন ঋষি বাল্মীকি। আর, আমাদের শাস্ত্রেও কবির যে-সংজ্ঞা বারবার দেওয়া হইয়াছে সে-সংজ্ঞা ত ঋষি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বুঝি-বা তাহার চেয়েও বেশি, বুঝি-বা কবিকে ঋষি অপেক্ষাও বড় আসনই দেওয়া হইয়াছে। কবি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

ত্রীণি ছন্দাংসি কবয়ো বি যে তিরে
পুরুরূপং দর্শতং বিশ্ব চক্ষণম
অপো বাতা ওষধয়স
তান্যেকস্মিন্ ভুবন অর্পিতানি।

কবিগণ তিনটি ছন্দের সাধনা করেন। এক এই ভুবনেই এই তিনটি ছন্দ অর্পিত (প্রতিষ্ঠিত)। আরও বলা হইয়াছে, কবি হইতেছেন, জরা-মৃত্যু রহিত, কবিই আমাদের রক্ষা করেন তাঁহার দিব্য কাব্য দ্বারা।

পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদ্ উতোত্তরাং
কবিঃ কাব্যেন পরিপাহি
সখা সখায়ম্ অজরো জরিম্ণে
মর্ত্ত্যাঁ অমর্ত্যস্ত্বং নঃ।

পশ্চাতে সম্মুখে, নিচে উপরে, হে কবি, তোমার কাব্যের দ্বারা তুমি আমাদের রক্ষা কর। সখা যেমন সখাকে রক্ষা করে, তেমনই হে অজর, হে অমৃত, জরাগ্রস্ত আমাদিগকে, মরণশীল আমাদিগকে তুমি রক্ষা কর। কবি হইতেছেন নিত্য নবীন, তিনি (চির) যুবা, বিশ্বারূপাণি জনয়ন্, বিশ্বরূপ রচনা করিতে করিতে তিনি চলেন। তিনি সকল মর্মের মরমী, সকল রহস্যের সন্ধান একমাত্র তিনিই জানেন।

অমূত্র সন্নিহ বেত্থেতঃ সংস্তানি পশ্যসি

এখানে বাস করিয়া তুমি ওখানকার (মর্ম) জান, ওখানে থাকিয়া এখানকার (লীলারহস্য) তুমি দেখিতে পাও। কবি যিনি, বিশ্বচিত্তের তিনি দূত, একটি মাত্র লোকে বাস করিয়া সর্বলোকের রহস্য তিনি জানিতে পান, দেখিতে পান। যে-রস ও রহস্যের প্রেম ও সৌন্দর্যের, শোক ও বেদনার, দুঃখ ও আনন্দের দৃষ্টি দিয়া এই বিশ্বজীবনকে আমরা পাই ও ভোগ করি, সে-দৃষ্টি কবিই আমাদের দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই কবি।

দুই

রবীন্দ্র-কবিমানস অতিশয় আত্মসচেতন। কিশোর বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ জানিতেন, তিনি কবি, কবি ছাড়া আর কিছুই নহেন; সেই বয়সের কাব্যেই এই স্বীকারোক্তি আছে যে কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনাই তাঁহার জীবনের সর্বোচ্চ বিধিদত্ত অধিকার।

উত্তরকালে তাঁহার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে, এবং তিনি তাঁহার জীবন ও সাধনাকে অঞ্জলি করিয়া কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদ-দৃষ্টির সম্মুখেই তুলিয়া ধরিয়াছেন; মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁহার এই একান্ত স্বতন্ত্র আত্মপরায়ণ সাধনা হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। আজ সুদীর্ঘ সাধনার শেষে এ-কথায় আমরা কিছু বিস্ময়বোধ করি না; কিন্তু, কবিজীবনের যৌবন-বসন্তোৎসব শেষ হইয়া গিয়া যখন তাঁহার 'দ্রাক্ষা-কুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল' ধরিয়াছে, যখন তিনি স্থির নিশ্চয় জানিয়াছেন, শতবর্ষ পরেও সকৌতূহলে তাঁহার কাব্য পঠিত হইবে, মনে রাখা প্রয়োজন, তখনও তাঁহার স্বদেশবাসী সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জবনের উন্মাদনরসে আকৃষ্ট হয় নাই, "মানসী-সোনার তরী-চিত্রা"র রসমাধুর্যে উতলা হয় নাই। শুধু সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস, আত্মপরিতৃপ্তি মাত্র সম্বল করিয়া তিনি বহুদিন একান্ত একক ও নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র ও আত্মপরায়ণ কবিজীবন যাপন করিয়াছেন, এবং পরেও, যাহা কবিধর্মের অন্যতম লক্ষণ, সেই নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণভাবে কোনও দিনই ঘুচে নাই। ঘুচে যে নাই তাহার কারণ রবীন্দ্র-কবি-প্রকৃতির মধ্যেও অনেকাংশে নিহিত; সে-কথা পরে বলিতেছি। আপাতত ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই জাতীয় সহায়হীন, নিভৃত নিঃসঙ্গ কাব্যসাধনার তুলনা বিরল। উত্তর জীবনে অবশ্য স্বদেশ ও বিদেশবাসীর সকৃতজ্ঞ আনন্দ-প্রসাদ লাভ তাঁহার ঘটিয়াছিল, এবং 'মহিমালক্ষ্মী প্রসন্নবদনে মন্দ হাসিয়া বরমাল্যখানি ভক্তকণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার করপদ্মপরশনে সর্ব দুঃখ-গ্লানি, সর্ব অমঙ্গল শান্ত হইয়াছিল'; কিন্তু অন্তরের নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্র্য কবির কখনও ঘুচে নাই। কাব্যলক্ষ্মীর সাধনায় 'নিজ অন্তরপ্রদীপখানি' জ্বালাইয়া সর্বদাই তিনি একক ও স্বতন্ত্র; এই অন্তর-প্রদীপখানির আলোকই তাঁহার একমাত্র আলোক, আর কোনও নির্দেশের বশ্যতাই তিনি স্বীকার করেন নাই। বিচিত্র প্রত্যয়ের শাসন তাঁহার কাব্যে আছে, বিচিত্র নিয়তি-নিয়ম, বিচিত্র প্রয়োজন-চেতনা, বিচিত্র সংসার-সমাজ-রাষ্ট্র-ভাবনার শাসনও নাই, এমন বলা চলে না; কিন্তু তাহার সমস্তই তাঁহার কবি-প্রাণের স্বধর্মের অনুগত। এই বিচিত্র প্রত্যয় ও ভাবনা-শাসন বারবার নানা বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে, কবিকল্পনাকে নানা স্ববিরোধী প্রেরণায় চঞ্চল ও বিপর্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু কোনও বিরোধকেই তিনি স্বীকার করেন নাই, কোনও শাসনকেই একান্ত করিয়া মানিয়া লন নাই। সকল বিরোধ ও বেসুরকে বশ করাই তাঁহার কাব্য ও জীবনসাধনার মূলমন্ত্র; এ-মন্ত্র কখনও তিনি বিস্মৃত হন নাই। কবিকল্পনা বহুক্ষেত্রে স্বভাবতই অন্তর্মুখী, আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মভাবপরায়ণ; রবীন্দ্রনাথেও তাহাই, কিন্তু তাঁহার কবিমানস সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পারিপার্শ্বিক-সচেতন, তাঁহার বাস্তবানুভূতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর, বোধ ও বুদ্ধিও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও প্রখর। অনেকে রবীন্দ্র-কাব্যসাধনাকে মিস্টিক সাধনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার চেয়ে মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। রবীন্দ্র-কবিকল্পনায় অস্পষ্ট কুহেলিকাচ্ছন্ন কিছু নাই। তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধি অনাবৃত, তাঁহার মানস অতি সচেতন; তাঁহার সাধনা নয়ন ভরিয়া রূপ ও অরূপকে দেখা, সর্বেন্দ্রিয় দিয়া তাহাকে ভোগ করা। তিনি আঁখি মুদিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাধনা করেন নাই; করিলে তিনি ত কবিই হইতে পারিতেন না। রূপাতীত স্পর্শাতীতকে বহিরিন্দ্রিয় দিয়া দেখা, স্পর্শ করাই ত রবীন্দ্র-কবির সাধনা; সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কবিত্বের অনন্যপূর্ব অনন্যসাধারণ গৌরব। মিস্টিকের সাধনা আর রবীন্দ্রকবির সাধনা, এ দু'য়ে কোথাও কোনও মিল নাই। সেই জন্যই এই বস্তুজগৎ বা বিশ্বজীবনের ধ্যান যে-সব

প্রত্যয় বা ভাবনা তাঁহার চিত্তে জাগাইয়াছে, যে-সব নিয়তি-নিয়মের সংস্কার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের তিনি জ্ঞানের বা তত্ত্বচিন্তার বিষয় করেন নাই, রসপানের বিষয় করিয়াছেন। রূপধ্যান, রসপানই তাঁহার প্রকৃতি, এবং সেই জন্যই তিনি কবি। রূপ ও রসবৈচিত্র্যের আস্বাদনই সেইজন্য রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠকের আকাঙ্ক্ষার বস্তু, বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্যের জ্ঞান গৌণ, পরোক্ষ।

কিন্তু, বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্যের চেতনার স্থান কি রবীন্দ্র-কাব্যসাধনায় একেবারেই নাই? নিশ্চয়ই আছে। যে মুহূর্তে বলিয়াছি, বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্যকে তিনি রসপানের বিষয় করিয়াছেন সচেতন কবিমানস লইয়া, সেই মুহূর্তেই একথাও স্বীকার করা হইয়াছে। তাঁহার কবিকল্পনা যতই অন্তর্মুখী ও আত্মভাবপরায়ণ হউক না কেন, যতই স্বতন্ত্র হউক না কেন, কবির সচেতন মানস বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্য সম্বন্ধে তাঁহাকে একান্তভাবে উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। তিনি ত আজীবন তাহাদের রূপধ্যান রসপানই করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কিছু একান্তভাবে নিজের স্বপ্নমায়াসৃষ্ট জীবজগৎ-বিচ্যুত গজদন্তকক্ষের স্বেচ্ছাবন্দীশালায় বসিয়া নয়। বস্তুত তাহা সম্ভবও নয়; যে-মুহূর্তে কবি বা লেখক বস্তুবিশ্বকে রূপধ্যান রসপানের বিষয় করেন, সেই মুহূর্তেই একধরনের বস্তুচেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিকেরা বলেন. কাব্যের জগৎ বস্তুর জগৎ নয়, অলৌকিক মায়ার জগৎ; কিন্তু এমন যে মায়া তাহাও ত বস্তুনিরপেক্ষ হইতে পারে না, সে ত অসম্ভব। কাজেই একান্তভাবে বস্তুনিরপেক্ষ কাব্যও হইতে পারে না। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লৌকিক মন ও জীবনরূপ বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সার্থক কাব্যের কল্পনাই করা যায় না। সভ্য সামাজিক মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে লৌকিক মন ও জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া একান্তে বাস করা অসম্ভব, মন ও জীবনের উপর বিশ্বজাগতিক বস্তুপরিবেশের সূক্ষ্ম ও জটিল ক্রিয়ার প্রভাব কেহই একেবারে বিলোপ করিয়া দিতে পারেন না; অন্তত বস্তুর রূপ রস লইয়াই যাঁহাদের লীলা সেই কবিরা কিছুতেই পারেন না—অতি সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির প্রকাশেও তাহা সম্ভব নয়। তবে, যে-সব কবি বা লেখকের মন ও দৃষ্টি লৌকিক মন ও জীবনবস্তুর বস্তুপরতা বা বস্তুধর্ম সম্বন্ধে সচেতন তাঁহাদের রচিত সাহিত্যের ধারা বেগবান ও স্রোতবহুল হইবার সম্ভাবনা বেশি; যাঁহাদের তাহা নাই বা যে-পরিমাণে কম সেই পরিমাণে তাঁহাদের রচিত সাহিত্যের ধারা ক্ষীণ ও শীর্ণ হইতে বাধ্য। তাহার পর কোন্‌টা সার্থক ও মহৎ সাহিত্য আর কোন্‌টা নয়, তাহার বিচার অবশ্যই নির্ভর করিবে কাব্যজিজ্ঞাসাগত মূল নির্দেশকে স্বীকার করিয়া,—তাহা নির্ভর করিবে বহুলাংশে রচয়িতার সৃষ্টি-প্রতিভার উপর।

কিন্তু, যেহেতু রবীন্দ্র-কবিকল্পনা অতিশয় অন্তর্মুখী, স্বতন্ত্র এবং আত্মকেন্দ্রিক সেই হেতু তাঁহার বস্তুচেতনাও অত্যন্ত অন্তর্মুখী, কল্পনা-নির্ভর এবং আত্মভাবনা দ্বারা জারিত, বস্তুর বস্তুধর্ম স্বীয় কবিধর্মের অধীন; বস্তুর বস্তুপরতা হইতে ভাবানুভূতির প্রকাশ শুধু যে বহু-দূরে তাহাই নয়, বস্তুও কখনও কখনও আপাতদৃষ্টিতে অনুপস্থিত বলিয়াই মনে হয়। বিশেষ 'মুড' বা বিশেষ ভাবানুভূতির 'লিরিক' কবিতায় তাহা হওয়ার সুযোগও বেশি। বস্তুর বস্তুধর্ম গল্প-উপন্যাস-নাটকে যতটা সহজে সংক্রামিত হইবার, সুসংবদ্ধ হইয়া পরিস্ফুট হইবার সুযোগ আছে, লিরিক কবিতায় সে-সুযোগ অপেক্ষাকৃত অনেক কম। বিশেষত যাঁহাদের

কবিকল্পনা অন্তর্মুখী ও আত্মভাবপরায়ণ, তাঁহাদের বস্তুচেতনা, স্বতন্ত্র ও অন্তর্মুখী কবিকল্পনার প্রেরণায়, অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত রূপ ধারণ করে, বস্তুধর্মের প্রতি সহজ প্রত্যক্ষ অনুরাগ তাঁহাদের চিত্তে ভাবানুভূতির প্রেরণা সঞ্চার করে না। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবিজীবনে ঠিক তাহাই হইয়াছিল। বস্তুচেতনা সর্বত্রই উপস্থিত; স্বীয় অন্তর্মুখী ভাবকল্পনার বহুল ও বিচিত্র ক্রমের ভিতর দিয়া জারিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা কঠিন নয়। কিন্তু বস্তুচেতনামাত্রই ত বস্তুধর্মের সজ্ঞান বোধ নয়; বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্যের পশ্চাতে প্রত্যেক পৃথক বস্তু বা দৃশ্যের গতি-পরিণতির অমোঘ নিয়ম, আবর্তন-বিবর্তন-ধারার ঐতিহাসিক পর্যায় সতত ক্রিয়াশীল, তাহাই বস্তুর বস্তুধর্ম। বস্তুর সঙ্গে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে বস্তুধর্মের সজ্ঞান অনুভূতি জন্মায়, এবং কবিকল্পনার মধ্যে তাহা রূপে ও রসে সঞ্চারিত হয়। এই বস্তুধর্মের সজ্ঞান অনুভূতি রবীন্দ্র-কাব্যে বহুদিন দেখা যায় নাই, যদিও বস্তুচেতনার অনুপস্থিতি তাঁহার কাব্যে কোনও দিনই ছিল না। বস্তুধর্মের স্পর্শ যে তাঁহার কাব্যে ছিল না, তাঁহার একক, নিঃসঙ্গ ও একান্ত স্বতন্ত্র জীবন যে দ্বন্দ্বমুখর সংগ্রামক্ষুব্ধ বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে মুখামুখি পরিচয়ের সুযোগ তাঁহাকে দেয় নাই তাহা তিনি জানিতেন; যৌবনেই তাঁহার আত্মসচেতন কবি-চিত্তে তাহা ধরা পড়িয়াছিল। এবং সেজন্য মাঝে মাঝে তাঁহার স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম কবিচিত্তে একটা নিদারুণ অস্বস্তিও দেখা দিত। যে-জীবনদৃশ্য তাঁহার চোখের সম্মুখে বিস্তৃত ছিল সে-দৃশ্য একটি দীপ্তিহীন, কর্মহীন, আশাহীন, পরবশ বাঙালী জীবনের; এ-দৃশ্য তাঁহার একান্ত স্বাতন্ত্র্যবোধকে আঘাত না করিয়া পারে নাই, ইহার জন্য তাঁহার ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা ছিল না। এ-দৃশ্যকে তিনি কখনও ব্যঙ্গ-কষাঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন, কখনও আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!" কখনও কখনও নিজের অন্তর্মুখী, আত্মপরায়ণ ও স্বতন্ত্র ভাবকল্পনার জীবনে নিজেই লজ্জিত হইয়া বলিয়াছেন,

> এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
> হে কল্পনে রঙ্গময়ী, দুলায়োনা সমীরে সমীরে
> তরঙ্গে তরঙ্গে আর। ভুলায়োনা মোহিনী মায়ায়
> বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
> রেখোনা বসায়ে আর।

কিন্তু বলিলে কি হইবে! কবির কবিধর্মের প্রেরণা যে বস্তুধর্মবোধের প্রয়োজন-চেতনা হইতে বড়, অধিকতর শক্তিশালী। কাজেই লিরিক আবেশবিহ্বলতার মধ্যেও কবিধর্ম বশে তাঁহাকে বলিতে হইল,

> দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
> মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
> তাঁর কাছে, জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
> জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানিনা কে। চিনি নাই তারে—
> শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
> চলেছে মানবযাত্রী, যুগ হতে যুগান্তর পানে
> ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
> অন্তরপ্রদীপ খানি। * * *
> তারপর দীর্ঘপথশেষে
> জীবনযাত্রা অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে

উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্ন বদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্বদুঃখগ্লানি
সর্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন.
মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব প্রেমতৃষা।

যে-ভাষায়ই ব্যক্ত হউক না কেন, এই দেবী, এই মহিমালক্ষ্মী, এই বিশ্বপ্রিয়া কবিরই কাব্যলক্ষ্মী, এবং আবেশারম্ভের মুহূর্তে যে রঙ্গময়ী কল্পনার হাত হইতে কবি মুক্ত হইতে চাহিয়াছেন আবেশবিহ্বলতার চরম মুহূর্তে সেই স্বতন্ত্র আত্মকেন্দ্রিক ভাবকল্পনার জগতেই তিনি নিজেকে তুলিয়া ধরিলেন। স্বীয় কবিধর্মের বশ্যতাই তাঁহার একমাত্র প্রেম; সেই প্রেমেই জীবনের সর্বপ্রেমতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি তিনি কামনা করিলেন, এবং তাঁহার কামনা পরিপূর্ণ সার্থকতাও লাভ করিল, ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম।

কিন্তু, উত্তরকালে বস্তুধর্মের সজ্ঞান অনুভূতিও কবিচিত্তে জাগিয়াছিল। বস্তুর ঐতিহাসিক গতি-পরিণতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি সজাগ হইয়াছিলেন, এবং কাব্যে তাহা রূপাশ্রিত রসাশ্রিত হইয়া দেখাও দিয়াছিল। তবে, তাহার জন্য কবিকে সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল; সেই নূতন অনুভূতির সঞ্চার তিনি লাভ করিয়াছিলেন জীবনের গোধূলিসন্ধ্যায়। সে-কথা এই গ্রন্থেই অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

একধরনের বস্তুচেতনা বরাবরই কবির ছিল, এ-কথা বলিয়াছি। বস্তুধর্মের অনুভূতি হইতে তাহা যতই পৃথক হউক, কবির এই বস্তুচেতনা অন্তর্মুখী ও আত্মভাবপরায়ণ কবিকল্পনা দ্বারা যতই রঞ্জিত হউক না কেন, তাহা যে পরোক্ষে বস্তুধর্মের জ্ঞান ও অনুভূতি পাঠকচিত্তের নিকটতর করিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্যে ত সর্বত্রই কবির ভাবানুভূতি প্রকাশের উৎস ও আশ্রয়, ইহা ত প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। ধরা যাক্, 'সোনার তরী' (গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা) বা 'বলাকা' (সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা) জাতীয় একান্ত স্বতন্ত্র আত্মভাবপরায়ণ অন্তর্মুখী কবিকল্পনাগত কবিতা। দু'টি কবিতাই যে বস্তুবিশ্বের সদা-বহমান ধারার দুই মুহূর্তের দু'টি চলচ্চিত্রচ্ছায়া এ সম্বন্ধে ত সন্দেহ নাই, অবশ্য খুব সূক্ষ্ম ও আকস্মিক, প্রায় অরূপ-অপরূপকে রূপের মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা। তবুও তাহারা যে বস্তুবিশ্বেরই রূপ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যে কবির একান্ত অন্তর্মুখী ও স্বতন্ত্র কবিকল্পনা দ্বারা রঞ্জিত ও রূপান্তরিত, এ-কথা কি করিয়া অস্বীকার করি? কিন্তু, তাহাতে ক্ষতি কি? বস্তুবিশ্বের যে-দু'টি খণ্ড দুই সুবর্ণ মুহূর্তে এক অপরূপ রূপে রসে রঞ্জিত ও রূপান্তরিত হইয়া আমাদের ভাবদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল তাহাও ত বস্তুর অন্যতম রূপ, এবং এই রূপও ত বস্তুধর্মের চেতনা আমাদের বোধ ও অনুভূতির নিকটতর করে, এই রূপও ত একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তিন

কাব্যসাধনাই রবীন্দ্রনাথের আজীবন সাধনা, এবং কাব্যসাধনাই তাঁহার জীবনসাধনাও বটে। তাঁহার জীবন ও কাব্য এ-দুইই এক অথচ এ-দু'য়ের একত্ব এত অনন্যসাধারণ যে তাহাতে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। অপরূপ অরূপকে রূপের মধ্যে বাঁধিবার, এবং রূপেব মধ্য দিয়া অরূপেরই আরাধনা করিবার যে-সাধনা তিনি কাব্যে করিয়াছেন, জীবনেও তাঁহার সেই সাধনারই বিস্তার, তাঁহার ভাবজীবন ও ব্যবহারিক জীবন দুইই যেন একসূত্রে গাঁথা। কাব্যই যাঁহার জীবনসাধনার একতম ও প্রধানতম পন্থা, তাঁহার জীবনে ইহার অন্যথা হইবার উপায়ও ছিল না। বিচিত্র বর্ণসম্ভারে রবীন্দ্র-সাহিত্য বর্ণময়, বিচিত্র ভাবপ্রসঙ্গে সমৃদ্ধ, বিচিত্র ও অভিনব রেখায় লীলায়িত। মানব-চৈতন্যের কত জটিল, গভীব ও ব্যাপক স্বপ্ন-কল্পনা, ভয়-ভাবনা, জিজ্ঞাসা-আকূতি, আনন্দ-বেদনা, কত বিচিত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি বং ও রেখাব সীমাহীন অপরূপ কারুকুশলতায় সেই সাহিত্য স্বপ্রকাশ। এই অপরূপ লীলা-বৈচিত্র্যই এক মুহূর্তে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া দেয়, কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যের গভীরে যে সুরটি ধ্বনিত, তাহা একটু স্থিরচিত্তে কান পাতিয়া শুনিতে পারিলে তখন বুঝা যাইবে, যত বিচিত্র বহু রূপময় হউক না কেন সেই সাহিত্য, তাহার সাধনমন্ত্র মূলত ও মুখ্যত একটি। সে মন্ত্র অপরূপ অরূপকে ভাব, ভাষা ও ছন্দের রূপের মধ্যে বাঁধিবার এবং সেই রূপের মধ্যে অরূপের আরাধনা করিবার মন্ত্র। আমি কোনও গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা বলিতেছি না, একান্তই এই বস্তুবিশ্ব ও জীবনদৃশ্যের রূপ-অরূপের কথাই বলিতেছি। দেশকালধৃত বস্তু ও জীবন-স্রোতের বিচিত্র রূপের মধ্যে তিনি আত্মগত অন্তর্মুখী অসংখ্য ও বিচিত্র ভাবকল্পনার অরূপ অপরূপ অনুভূতিগুলিকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন ভাষা ও ছন্দের সাহায্যে, সেই অসংখ্য বিচিত্র রূপেব চলচ্ছায়া তিনি নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছেন, প্রাণ ভরিয়া তাহার বসপান করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপের মধ্য দিয়াই তিনি আবার অরূপ অপরূপকেই নয়নপ্রাণের আরও নিকটতর করিয়া লাভ করিয়াছেন। রূপে অরূপে নিত্য এই লীলা প্রাণ ভরিয়া দেখা, দেখার আনন্দে দেহচিত্তমন রাঙাইয়া তোলা এবং ভাষা ও ছন্দে সেই আনন্দ গাঁথিয়া যাওয়া, ইহাই রবীন্দ্র-কবিকীর্তি, ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবন-সাধনা। অরূপের জন্য জগৎ ও জীবন নিরপেক্ষ, দেশ ও কাল নিরপেক্ষ, রুদ্ধেন্দ্রিয়দ্বার, নিমীলিত-নয়ন, সর্বরূপরাগবর্জিত ধ্যানসাধনা কবি রবীন্দ্রনাথের সাধনা নয়, তাঁহার সাধনাও ভাবাত্মক অরূপেরই সাধনা, কিন্তু সে-সাধনপন্থা দেশ ও কালের, জগৎ ও জীবনের বিচিত্র রূপের প্রেক্ষাপটে ইন্দ্রিয়ের যত বাসনা কামনা আনন্দ বেদনা, আত্মার যত আকূতি আকুলতা সব কিছু প্রতিফলিত করিয়া ভাষা ও ছন্দের মধ্যে অরূপের বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করা। মানব-চেতনার বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র রেখার, বিচিত্র রসের, বিচিত্র বাসনার যেমন কোনও সীমা নাই, তেমনই বস্তুবিশ্ব ও জীবনদৃশ্যের প্রেক্ষাপটে তাহাদের বিচিত্র রূপেরও কোন সীমা নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য তাই এত বিচিত্র।

বলিলাম, বস্তুবিশ্বের রূপদর্পণে অরূপের লীলা চিত্ত ভরিয়া দেখাই কবির সাধনা। কিন্তু এই দেখা দেশ ও কালের, জগৎ ও জীবনের পরিধির মধ্যেই শুধু আবদ্ধ হইয়া নাই, তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে অতিক্রম করিয়াও গিয়াছে। আগেই বলিয়াছি, রবীন্দ্র-কবিকল্পনা একান্ত অন্তর্মুখী ও আত্মভাবপরায়ণ; এই ধরনের একান্ত স্বতন্ত্র, আপন ভাব-

বিভোর কবিকল্পনার কাছে সমস্ত রূপই ত বন্ধন, এবং বন্ধন মাত্রই তাঁহার মুক্ত, অবাধ, আত্মপরিতৃপ্ত, আত্মভাববিমুগ্ধ কল্পনার গতিকে ব্যাহত করে। সেই জন্য, প্রতি মুহূর্তেই যে তিনি রূপবন্ধনকে স্বীকার করেন, তাহার কারণ, রূপবন্ধনকে স্বীকার না করিলে যে ভাবকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না। আবার, প্রতি মুহূর্তেই যে তিনি বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া যান, তাহার কারণ, অতিক্রম করিতে না পারিলে যে আত্মতৃপ্ত অন্তর্মুখী ভাবকল্পনার গতি থামিয়া যাইবে। সেইজন্য প্রতি মুহূর্তেই তিনি নিজে বন্ধনমোহ সৃষ্টি করেন রূপতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য, 'আমি যে বন্দী হতে সন্ধি করি সবার কাছে', বস্তুবন্ধনের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ না করিলে যে রূপকে ধরা ছোঁয়া যায় না। কিন্তু কবিকল্পনা ত আবার 'নিজের কাছে নিজের গানের সুরে বাঁধা, সে গানের রক্তে এড়িয়ে চলার ছন্দ'; এমন কবিকল্পনাকে 'বাঁধবি তোরা, সে বাঁধন কি তোদের আছে?'

কবি নিজে এ-সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন। কতবার কতভাবে যে তিনি বন্ধন-মুক্তির কামনা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু গভীর গম্ভীর স্বীকারোক্তি আছে "পুরবীর" 'সাবিত্রী' কবিতায়—

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কে-ই বা সে জানে।
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে।
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা,
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হোক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা—
না বাঁধুক মোরে।
তারা সবে মিলে থাক অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণবর্ষণে।
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীরগুঞ্জন-কলরবে
উপলঘর্ষণে।
ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।
তার পরে যেন তারা সব ছায়া দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে॥

বস্তুবিশ্ব বা জীবনদৃশ্যের সকল বিচিত্র রূপ তিনি নয়ন ভরিয়া দেখিবেন, আকণ্ঠ পান করিবেন, কিন্তু কোনও রূপই তাঁহাকে বাঁধিবে না, কোনও চিহ্ন কেহ রাখিয়া যাইবে না, সমস্ত অপরূপ রূপের কল্পনা পরমুহূর্তে মুছিয়া সরিয়া যাইবে, ইহাই কবির একান্ত কামনা।

এই ধরনের কবিমানস সত্যই একটু অদ্ভুত, অভূতপূর্ব, এবং তাহা বলিয়াই রবীন্দ্র-কাব্য কিছু বিশেষ নীতি-নিয়মের সংস্কার বা কোনও বিশেষ প্রত্যক্ষ, দেশকালবদ্ধ প্রয়োজন-চেতনা বা জীবন-ভাবনা দ্বারা বুঝিতে পারা বা পরীক্ষা করিতে পারা যায় না; করিতে গেলেই তাহার কাব্যরস কোথায় যে উড়িয়া যায়, কি করিয়া যেন হারাইয়া যায়। রবীন্দ্র-কাব্য বন্ধনমুক্তির কাব্য, বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া নয়, তাহারই হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, অথচ তাহাকে এড়াইয়া। কোনও বিশেষ ভাববন্ধন,

কোনও বিশেষ ভাবনা-বন্ধনই রবীন্দ্র কাব্যকে পূর্বাপর বাঁধিতে পারে নাই, এবং রবীন্দ্রকাব্যের সাহায্যে দেশকাল-ধৃত, একান্ত বস্তুগত, প্রয়োজনগত, পূর্বাপরযুক্তি-সামঞ্জস্যগত কোনও সুনির্দিষ্ট জীবন-ভাবনা বা জীবনাদর্শ গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়, বোধ হয় উচিতও নয়।

ইহাই যাঁহার কবিকল্পনার ধর্ম, তাঁহার অন্তরতম কবিপ্রাণ যে বিরাগী প্রাণ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? রবীন্দ্র-কাব্যের মূল রাগিণীও তাই বিবাগিনী রাগিণী। একটি পরম ঔদাসীন্য তাঁহার সমস্ত কবিকীর্তি জুড়িয়া ব্যাপ্ত। কতবার কতভাবে কত অসংখ্য ক্ষণিক মোহের মধ্যে তিনি নিজেকে জড়াইয়াছেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই মোহ মুক্তি রূপে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সেই মোহাসক্তি হইতে নিজেকে তিনি দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। কোনও বিশেষ কেন্দ্রে তাঁহার কোনও আসক্তি নাই, আকর্ষণ নাই, সকলই ক্ষণিক মোহের ক্রীড়নক, ক্ষণিক রূপধ্যানের রসপানের বস্তু,—যতক্ষণ যাহাকে প্রয়োজন ততক্ষণ তাহাকে সঙ্গে রাখিয়াছেন, পরক্ষণেই তাহাকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া দিয়া পরম ঔদাসীন্যে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কোনও বস্তু বা ভাবকেন্দ্রের প্রতিই যাঁহার পূর্বাপর কোনও বিশেষ আসক্তি বা আকর্ষণ নাই, শুধু তাঁহার ভাবজীবন নয়, ব্যক্তিগত অন্তরজীবনও যে একক ও নিঃসঙ্গ হইবে, স্বতন্ত্র ও আত্মকেন্দ্রিক হইবে তাহাতে ত আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ব্যক্তিগত জীবনে যাঁহারা কবিকে জানিয়াছেন, তাঁহারা একথাও জানেন, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ভক্তশিষ্য পরিবৃত থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ছিলেন একক ও নিঃসঙ্গ, সর্বদাই স্বতন্ত্র ও আত্মকেন্দ্রিক; যে-কোনও মুহূর্তে নিজকে তিনি নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইতে পারিতেন; বিচিত্র জনকোলাহলের মধ্যেও হঠাৎ নিজের অন্তরের আড়ালের মধ্যে ঢুকিয়া পরিবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তিনি যেমন ভালবাসিয়াছেন, তেমনই ভালবাসা পাইয়াছেন, কিন্তু কোনও বিশেষ স্নেহ-ভালবাসার পাত্রপাত্রীদের উপর তাঁহার কোনও আসক্তি ছিল না, একটি পরম ঔদাসীন্য যেন তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। ব্যক্তিগত জীবনে মর্মান্তিক শোকতাপ তিনি অনেক পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার মর্মান্তিক প্রকাশ কেহ কখনও দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। দুঃসহ শোকেও তিনি এত স্বতন্ত্র ও আত্মভাবপরায়ণ যে দ্বিতীয় কোনও মনের বা চিত্তের সঙ্গে যোগ সেই মুহূর্তেও তিনি কামনা করেন নাই। বাহিরে তিনি দশজনের একজন, আন্তরজীবনে তিনি একক, একান্ত নিঃসঙ্গ; নিজের ভাবকল্পনা, প্রত্যয়ভাবনা লইয়া তিনি একান্তই স্বতন্ত্র ও অন্তর্মুখী—সেখানে তাঁহাকে সঙ্গ দান করিবার জন্য কাহাকেও তিনি আহ্বান করেন নাই। বস্তুবিশ্ব বা জীবন-দৃশ্যের সকল কিছুর উপর একটি পরমপ্রীতিময় ঔদাসীন্য না থাকিলে ইহা কিছুতেই সম্ভব হইত না। কবির কাব্যে ও জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রীতিময় পরম ঔদাসীন্য, এই বিবাগী প্রাণের ধর্ম একান্তই স্বপ্রকাশ।

রবীন্দ্র-কাব্য বস্তুকেন্দ্রিক বস্তুধর্মবশ রচনা নয়: কবির নিজস্ব ভাবকল্পনা ও রসানুভূতি হইতে কিছুতেই সে-কাব্যকে বিচ্যুত করা চলে না, উচিতও নয়। এই কল্পনা ও অনুভূতি অন্তর্মুখী ও আত্মকেন্দ্রিক, এ-কথা বারবার আগেই বলিয়াছি; তাহার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিকল্পনা বস্তুর বাস্তবরূপ বা বস্তুধর্ম অতিক্রম করিয়া যায়, তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু শুধু তাহাই নয়; কবিকল্পনা যে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া মুক্তি পায়, স্বতন্ত্র ও অন্তর্মুখী প্রেরণার ফলে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর স্বরূপকেও অতিক্রম করে এবং চক্ষের পলকে তাহা অবিশেষ নৈর্ব্যক্তিক

বস্তু-উত্তর রসপরিবেশের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়। যে সুনিবিড় ব্যক্তিগত আত্মগত ভাবকল্পনা লিরিক কবিতার প্রাণধর্ম, সেই একান্ত আন্তরিক প্রাণধর্মের বেগ ও আবেগ নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশের মধ্যে যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করিতে পারে না। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা কিংবা শোকের কবিতা সর্বত্র যথেষ্ট ব্যক্তিচেতনাঘন ও স্পর্শসুনিবিড় নয়। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ মূলত ব্যক্তি ও বস্তু অতিক্রান্ত লোকোত্তর জীবনরসের কবি; তাই বস্তু ও ব্যক্তির যাহা প্রতিদিনের বাস্তব রূপ তাহাকে তিনি আত্মপ্রেমে শোধিত, ভাবকল্পনায় রঞ্জিত এবং প্রত্যয়-ভাবনায় জারিত করিয়া, বহু ক্রমের ভিতর দিয়া তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রবীন্দ্র-কবিকল্পনার ইহাই বৈশিষ্ট্য।

চার

রবীন্দ্র কাব্যলোকের মধ্যে যাঁহাদের গতিবিধি আছে তাঁহারাই এ-কথা জানেন, কবি তাঁহার চারিদিকে ভাব-কল্পনার একটি বিশিষ্ট জগতের মধ্যে চিরকাল বিহার করিয়া, কোনও নির্দিষ্ট ভাব-উৎস হইতে রস আহরণ করিয়া অধিককাল তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত কত বিচিত্র ভাবরাজ্যের ভিতর দিয়া যে কবিচিত্তের যাত্রা, সে-যাত্রা কোনও কালে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া সমাপ্তি লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কবির চঞ্চল চলিষ্ণু চিত্ত কোথাও এক নির্দিষ্ট স্থানে অধিক দিন বাস করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই; ইহা তাঁহার জীবনে যেমন সত্য, কাব্যেও তেমনই সত্য। সত্য বলিতে কি, তাঁহার কাব্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, অথবা জীবনকে কাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কোনও উপায় নাই। অন্যান্য কবিদের পক্ষে যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁহার জীবনের বাহিরে তাঁহার কাব্যের কোনও অস্তিত্বই নাই; কাব্যই তাঁহার জীবনের গভীরতম সত্তা, তাঁহার অন্তর্নিহিত চৈতন্য, * এবং যেহেতু তাঁহার জীবন গতিবেগে চঞ্চল, তাঁহার কবি-মানসও সেই হেতু চলার আবেগে স্পন্দিত—

> চিরকাল ধ'রে দিবস চলিছে
> দিবসের অনুগামী
> শুধু আমি নিজ বেগ সামালিতে নারি
> ছুটেছি দিবস যামী।

---

* "রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সেই সেই অবস্থায় রচিত তাঁহার কাব্যের এমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে তাঁহার কাব্যকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবনের কথা কিছু কিছু জানা দরকার হয়; আর কোনো কবির জীবন নিজ কাব্যের ধারাকে একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলে নাই। কবির জীবনের বড় বড় পরিবর্তনগুলি প্রথম কাব্যের মধ্য দিয়া নিগূঢ় ইঙ্গিত মাত্রে প্রতিফলিত হইয়া শেষে জীবনের ঘটনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। * * কোনো কবির কাব্য যে তাঁহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা করিয়া তুলিয়াছে, এবং সেই কাব্য যে জীবনের সচেতন কর্তৃত্বের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই, এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর কোনো কবির জীবনে ঘটিয়াছে কিনা জানি না। সেইজন্যই অন্য সকল কবির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনায় সময়ে তাঁহার জীবনের কথা বেশি করিয়া পাড়িতে হয়।" (অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্যপরিক্রমা," ২য় সং ১৫৭-৫৮ পৃঃ)

কবি নিজের বেগ নিজেই সামলাইতে না পারিয়া যেমন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার কাব্যেও তিনি তেমনই ভাব ও কল্পনার আবেগে বারংবার ভাব হইতে ভাবান্তরে পাড়ি জমাইয়াছেন। কবি যখন "মানসী"র কবিতা রচনায় ব্যাপৃত তখন তিনি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে একটি পত্রে (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ ; ২৪ মে, ১৮৯৭) লিখিতেছেন,

"আজকাল যেসকল কবিতা লিখছি, তা ছবি ও গান থেকে এত তফাত যে, আমি ভাবি আমার লেখায় আর কোনও পরিণতি হচ্ছে না, ক্রমাগতই পরিবর্তন চলেচে। আমি বেশ অনুভব করতে পারচি, আমি যেন আর একটা পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এ-রকম আর কতকাল চলবে, তাই ভাবি। অবশেষে একটা জায়গা তো পাব, যেটা বিশেষরূপে আমারই জায়গা। অবিশ্রাম পরিবর্তন দেখলে ভয় হয় যে, এতকাল ধরে এতগুলো যে লিখলুম, সেগুলো কিছুই হয়ত টিকবে না—আমার নিজের যেটা যথার্থ চরম অভিব্যক্তি, সেটা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এগুলো কেবল tentative ভাবে আছে।" ("রবীন্দ্র জীবনী," ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সং, ২১৫-১৬ পৃঃ)

এই যে পরিণতি হইতেছে না বলিয়া কবির আক্ষেপ, এ আক্ষেপ অর্থহীন। "মানসী"তে তিনি যে পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই পরিবর্তনের সন্ধিস্থল কবির জীবনে বার বার আসিয়াছে ; এবং এই ক্রমাগত পরিবর্তনই তাঁহার কবিজীবনকে পরম পরিণতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে ; অথবা একটু অন্যভাবে বলিতে পারা যায়, এই ক্রমাগত পরিবর্তনই পরম পরিণতি। যে অবিরাম পরিবর্তন দেখিয়া কবি ভীত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার কাব্যকে অপূর্ব জীবনৈশ্বর্য দান করিয়াছে, এবং এই অবিরাম পরিবর্তনের ভিতরই কবিজীবনের চরম অভিব্যক্তি লাভও ঘটিয়াছে।

পাঁচ

রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠ এক দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ কবিমানস ও কবিকীর্তির মানদণ্ডে রবীন্দ্র-সাহিত্য তৌল করা প্রায় একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে ; তাহার সমগ্রতা পরিমাপ করা আরও অসম্ভব। এই বিরাট কবিকীর্তির মূলে যে জাগ্রত চৈতন্যের লীলা আছে, প্রতিভার যে দিব্য ক্রীড়া আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা হয়ত কঠিন না-ও হইতে পারে, কিন্তু কাব্যরসিক পাঠকের কাছে এই বিশ্লেষণের মূল্য হয়ত খুব বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিকীর্তির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে এক মহারণ্যের, যে-অরণ্য লতাগুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহামহীরুহের ঐশ্বর্যে শুধু বৈচিত্র্যময়ই নয়, শুধু বিচিত্র রঙে ও রসে প্রাণবন্তই নয়, ভাব-গাম্ভীর্যে এবং আয়তন-বিরাটতায় মহীয়ানও বটে। কিন্তু সেই বিরাট অরণ্যের মধ্যে একবার ঢুকিয়া পড়িলে তখন বিচ্ছিন্ন লতা-পাদপগুলিই মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, প্রত্যেক পৃথক তরুলতা পৃথক পৃথক ভাবেই চিত্ত চক্ষুকে আকর্ষণ করে, মহারণ্য তখন তাহার সমগ্রতা হারায়, তাহার ভাব-গাম্ভীর্য তখন চিত্তগোচর হয় না। আবার বাহির হইতে সমগ্রভাবে যখন সেই মহাটবী চিত্ত ও চক্ষুর গোচর হয়, তখন প্রত্যেক পৃথক পৃথক লতাগুল্ম ও মহীরুহ তাহার রঙের বৈচিত্র্য রসের বৈশিষ্ট্য হারায়। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠক মাত্রই বিরাট কবিকীর্তির মূলে একটি নিগূঢ় নিয়ম বা মূল সুর আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা কিছু অস্বাভাবিকও নয়, অসম্ভব ত নয়ই। কিন্তু বিপদ এই, সেই মূল সুরটির অথবা নিগূঢ় নিয়মটির স্থূল সুনির্দিষ্ট পথরেখা ধরিয়া যদি আমরা রবীন্দ্র-রচারণ্যের ভিতর সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে কবির সৃষ্টি-প্রাচুর্যের মধ্যে যে অগণিত রং ও বিচিত্র রসের লীলা উপরে নিচে দক্ষিণে বামে ছন্দিত ও নন্দিত তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব; এমন কি যে সব অস্পষ্ট ও সুকুমার পদরেখা স্থূল রেখাটির সমান্তরালে চলিয়াছে কিংবা তাহাকে নানা দিকে নানা ভাবে স্পর্শ করিয়া অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে তাহাদের আভাস না পাইতে পারি। প্রত্যেক মহৎ প্রতিভা, বৃহৎ জীবনের মধ্যেই একটা কালক্রমিক বিকাশ, বিবর্তনের একটা ধারা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র-কবিকীর্তির মধ্যে এই বিকাশ, এই বিবর্তন-ধারা অত্যন্ত স্পষ্ট। যাঁহারা কাল-ক্রমানুযায়ী রবীন্দ্র-সাহিত্য মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই এ-কথা জানেন; এমন কি এই বিবর্তন-ধারাটি না জানিলে না বুঝিলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সম্যক উপলব্ধিও হয় না। এই কালক্রমিক বিকাশ, এই বিবর্তন-ধারার সঙ্গে পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা, কিন্তু পূর্বাহ্নেই এ কথা জানিয়া রাখা ভাল যে, এই পরিচয়ই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, ইহা স্থূল পথরেখার নির্দেশ মাত্র। ইহাও জানিয়া রাখা ভাল যে, এই বিবর্তন-ধারা সর্বত্র এক নহে, রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কবিজীবন সর্বত্র একই ধারা অনুসরণ করিয়া চলে নাই, জীবনের এক এক পর্যায়ে তাঁহার কবিমানস এক একটি ভাববন্ধন স্বীকার করিয়াছে, আবার কিছুদিন পর সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনাকে সবলে মুক্ত করিয়াছে—মুক্ত করিয়াছে আবার নূতন করিয়া নূতন ভাববন্ধনে বাঁধা পড়িবার জন্য। এই বন্ধন-মুক্তি এবং মুক্তি-বন্ধনের প্রেরণাই, অন্য দিক হইতে বলিতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি, তাঁহার কবিধর্ম, তাঁহার কবিজীবনের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। এই যে বন্ধন ও মুক্তি, মুক্তি ও বন্ধন, আমি আগেই বলিয়াছি, ইহার কোনও পরিণতি নাই, ক্রমাগত পরিবর্তনই ইহার পরিণতি। কবি নিজেও তাহা জানেন,—তিনি জানেন তাঁহার এই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কোথাও শেষ হইবার নয়, শুধু 'পথ চলাতেই তাঁহার আনন্দ'। নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে নানা ছলে এ-কথা বার বার তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। তবু, তবু আবার বার-বার নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে নানা ছলে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,

> আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?
> বলো কোন পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
> যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
> তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী,
> বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে তোমার মনে।
> নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
> অকুল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
> দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন কোণে।
> কী আছে হোথায়—চলেছি কিসের অন্বেষণে।

রবীন্দ্র-কাব্যে এই প্রশ্নও অশেষ, ইহার উত্তরও অশেষ। বস্তুত রবীন্দ্র কবিজীবনের যাহা ধর্ম, তাহাতে এ-প্রশ্নের শেষ কখনও হইতে পারে না, ইহার উত্তরেরও কোনও শেষ হইতে পারে না।

রবীন্দ্র-কাব্যপাঠের আর একটি প্রধান অন্তরায়, আমাদের মনে কাব্যের মধ্যে তত্ত্বান্বেষণের সহজাত সংস্কার, বিশেষ ভাবে রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে। কাব্য তত্ত্ববিরহিত হইতে পারে কি পারে না, এ-প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করা অবান্তর ; রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে তত্ত্বের শাসন আছে কি নাই সে-জিজ্ঞাসার আলোচনারও প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠে তত্ত্বান্বেষণ-প্রচেষ্টা প্রবল হইয়া উঠিলে তাহাতে যে পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, আমি শুধু তাহারই ইঙ্গিত করিতে চাই। কবির রচনায় তত্ত্ব নাই, তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাই, এ-কথা আমি বলি না, কেহই বলিবেন না,—কিন্তু সে-তত্ত্ব অনুভূত প্রত্যয় মাত্র এবং কবির কবিমানসকে অতিক্রম করিয়া সে-তত্ত্বের, সে-জিজ্ঞাসার কোনও মূল্য নাই ; সে-তত্ত্ব কবির কাব্য-নিরপেক্ষ নয়, কাব্যের বাহিরে তাহার কোনও সত্তা নাই। এ-কথা বলিতেছি এই জন্য যে, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে, কোনও নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট প্রত্যয়-শাসন তাহার মধ্যে খুব বেশি নাই, বরং মনে হইবে যে, তত্ত্বকে তাঁহার কাব্য যতটুকু আশ্রয় করিয়াছে তাহা অত্যন্ত গৌণ, তাহা শুধু তাঁহার কবিমানসের মুক্ত স্বাধীন বিহারের জন্যই, তাহার রস ও রহস্য কবিমানসের বিচিত্র লীলা প্রকাশ করিতে সহায়তা করিয়াছে মাত্র। তত্ত্ব তাঁহার কাব্যের উপজীব্য নয়, এই মুক্ত স্বাধীন স্বচ্ছন্দ লীলাই প্রধান উপজীব্য। তাঁহার জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে এই কথাই সত্য। মৃত্যু সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, দুঃখ সম্বন্ধে, এবং অন্যান্য আরও অনেক কিছু সম্বন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনেক তত্ত্বের ইঙ্গিত ও নির্দেশ পাওয়া যায়, এবং একাধিক রবীন্দ্র-রচনা-পাঠক এক একটি তত্ত্বের সূত্র ধরিয়া কবির কবিতা কালানুক্রমিক সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে কেহ কেহ কোনও কোনও তত্ত্বের একটা ক্রমবিকাশের ধারা আবিষ্কার করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। আমি নিজেও একাধিকবার সে-প্রয়াস করিয়াছি। এ-জাতীয় প্রয়াসকে আমি মিথ্যা বা নিরর্থক বলি না ; তবে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের সত্য পরিচয় এ-ভাবে পাওয়া যায় না, যাইতে পারে না। রবীন্দ্র-কাব্য সহস্রদ্যুতি ; কোনও একটি নির্দিষ্ট আলোকরেখার দিক হইতে দেখিলে হীরকখণ্ডের অসংখ্য বিচিত্র দ্যুতি যেমন নয়নগোচর হয় না, তেমনি বিশেষ কোনও একটি তত্ত্বের দিক হইতে রবীন্দ্র-কাব্য পাঠ করিলে তাহার অসংখ্য রং ও রেখার বৈচিত্র্য, প্রাণরসের প্রাচুর্য, কবিমানসের স্বচ্ছন্দ লীলা, কিছুই আমাদের চিত্তগোচর হয় না। পাঠকের সমগ্র দৃষ্টি তাহাতে ব্যাহত হয়, রসোপলব্ধির ব্যাঘাত হয়, এবং তাহার ফলে কবি ও তাঁহার সৃষ্টি দুইই কিছুটা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠে এই বিশ্বাসই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ, গতি ও পরিণতি মন্থর। তাহার ইতিহাস জৈব। গাছ যেমন ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়, ধীরে ধীরে বাড়ে, ফলে ফুলে পল্লবে নিজেকে সমৃদ্ধ করে, ধীরে ধীরে বৃহৎ বনস্পতির আকার ধারণ করে এবং নিজের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে বিরাট মহীরুহের রূপ লইয়া বনভূমির বিরাট সম্রাট হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিণতিও তেমনই ধীর ও মন্থর এবং একান্তই জৈব। একদিন হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া তিনি সকলকে চমকাইয়া দেন নাই ; প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া সে-প্রতিভার বিকাশ, বিস্তার ও পরিণতি : শেষ পর্যন্ত তিনি নব নব ফল-ফুলপল্লবে নিজেকে বিকশিত করিয়া গিয়াছেন। আর, বিকাশ, গতি ও পরিণতি যেমন, সে প্রতিভার বিলয়ও তেমনই ; তাহাও যেন প্রাকৃতিক নিয়মের মতই। একদিনেই

হঠাৎ তাহার বিলয় ঘটে নাই ; সে-বিলয়ও ঘটিয়াছে ধীরে ধীরে সকলের অনুস্রীয়মান দৃষ্টির সম্মুখে। প্রতিভার এইরূপ জৈব, নিশ্চিত ও মন্থর বিবর্তন সাহিত্যের ইতিহাসে বড় বিরল। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিবর্তন-ইতিহাস তাই আনন্দিত বিস্ময় উৎপাদন না করিয়া পারে না ; সমগ্র ভাবে দেখিলে সে-ইতিহাসে আকস্মিকতার স্থান বড় একটা কোথাও নাই। বিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তর, প্রত্যেকটি পর্যায়, প্রত্যেকটি পথ-রেখার গতি সুস্পষ্ট, প্রত্যেকটি ইঙ্গিতের সূচনা, গতি ও পরিণতি যেন প্রাকৃতিক নিয়মাধীন। তাঁহার প্রতিভার যাত্রা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করিয়াই সূত্রপাত ; কাব্যে কালিদাস ও বৈষ্ণব কবিদের বাণী, ভঙ্গি ও ঐতিহ্য এবং বিহারীলাল ; গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ; কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি তাঁহাদের অতিক্রম করিলেন ; এই অতিক্রমণের ইতিহাসের প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্ট। তারপর নিজেকে যখন নিজে আবিষ্কার করিলেন তখনও হঠাৎ তাঁহার সমস্ত সম্ভাবনা একদিনে দেখা দিল না ; ধীরে ধীরে যেমন ভাবকল্পনার বিরাট বৈচিত্র্যে বিকশিত হইতে লাগিল, অনুভূতি যেমন ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম, গভীর ও ব্যাপক হইতে লাগিল, কাব্যের আঙ্গিক ও গদ্যের বিবর্তনও তেমনি ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল ; প্রত্যেকটির সূচনা ও সর্বশেষ পরিণতির মধ্যে বিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাস। এই ইতিহাসটি রসিক-চিত্তে নিকটতর করা রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য। বস্তুত, কালানুক্রমিক রবীন্দ্র-রচনাবলী ধারাবাহিক ভাবে পাঠ করিলে ভাবপ্রসঙ্গ ও আঙ্গিকের, ভাবকল্পনা ও অনুভূতির ঐতিহাসিক পারম্পর্য এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই কারণেই বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্যে কোথাও পুনরাবৃত্তি নাই ; তাঁহার প্রত্যেকটি কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ রীতি ও বিষয়বস্তুতে স্বতন্ত্র। কোনও বিশেষ রীতি সার্থক বা সুন্দর হইয়াছে বলিয়াই তিনি তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকেন নাই বা তাহার পুনরাবৃত্তি করেন নাই। জীবদেহ ত কখনও পুনরাবৃত্তি করে না, রবীন্দ্রনাথও কখনও আত্মানুকরণ করেন নাই। নিত্য নূতন রীতি যেমন তিনি আহরণ করিয়াছেন, বিষয়বস্তু এবং ভাবপ্রসঙ্গও তাঁহার তেমনই নূতন। এই জৈব চিরনূতনত্বই তাঁহার সাহিত্যের পরম বিস্ময়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি তাহা বিশেষভাবে কবির ভাবপ্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তুর জৈবরীতির বিবর্তন-ধারাগত। ইহা ছাড়া অন্য রীতি নাই, এ-কথা বলি না ; কিন্তু কোনও কবির রচনা ঐতিহাসিক সমগ্রতায় দেখিবার ও দেখাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া আমি মনে করি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই ঐতিহাসিক সমগ্ররূপের কথা আমরা অনেক সময়ই ভুলিয়া যাই। খণ্ড খণ্ড কবিতা, খণ্ড খণ্ড রচনার বিশেষ সৌন্দর্য ও রসমাধুর্য আছেই, সে রসোপভোগের উপায় ও পথও আছে, তাহার প্রয়োজনও আছে। কিন্তু তাহাতে কোনও কবির, বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের মতন বিচিত্র কবিপ্রতিভার, বিরাট কবিমানসের ঐতিহাসিক সমগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং তাহা পাওয়া না গেলে খণ্ড খণ্ড কবিতার পরিপূর্ণ রসোপলব্ধিও সহজ ও সুগম হয় না। প্রত্যেক খণ্ড বস্তুই অখণ্ড সমগ্রতার মধ্যে বিধৃত ; প্রত্যেক খণ্ড কবিতা বা খণ্ড কাব্যগ্রন্থও তেমনই কবিমানসের, কবিকল্পনার বিরাট প্রেক্ষাপটের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত ; তাহা হইতে বিচ্যুত করিয়া রসোপভোগ সম্ভব নয়, এ-কথা বলি না ; কিন্তু তাহাতে সমস্ত রসতাৎপর্যটুকু ধরা পড়ে না, রসচেতনা তাহার সমগ্রতা হারায়। এই সমগ্রতাটুকু পাঠকচিত্তের নিকটতর করা সাহিত্য-সমালোচকের একটি প্রধান দায় ও কর্তব্য।

রবীন্দ্র-কাব্যের বিস্তৃতি, বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতা ত সর্বজনবিদিত; তাহা কোনও যুক্তিপ্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, এবং তাঁহার প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য যে তাঁহার মহৎ ও বিরাট কবিযশের অন্যতম হেতু তাহারও পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এই বহুমুখী অভিব্যক্তির মধ্যে যে-ভাবসত্তা প্রতিমুহূর্তে দীপ্যমান তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধিতাও আছে পদে পদে; কবিকল্পনায় তাহা থাকিতে বাধ্য, কিন্তু ঐতিহাসিক সমগ্রতায় রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ করিলে সমস্ত বিরোধের একটা সুসমঞ্জস ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়, বিরোধের স্বরূপ চিত্তের নিকটতর হয়, খণ্ড খণ্ড মিলন, বিরোধ ও বিকার একটি অখণ্ড সমগ্র রসচেতনার অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন বুঝা যায়, ইহার কোনটিই আকস্মিক নয়, ভাবকল্পনার বা মানসচেতনার যুক্তির বহির্ভূত নয়। রসোপলব্ধির রসোপভোগের জন্যও পাঠকচিত্তে এই বোধের প্রয়োজন আছে। মানবচেতনার অসংখ্য স্তরে, অপরিমিত সীমা রবীন্দ্রনাথ স্পর্শ করিয়াছেন, উদ্ভাসিত ও প্রস্ফুটিত করিয়াছেন; বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সীমায় তাঁহার ভাবকল্পনা ও কবিমানস বিভিন্ন রূপে ও রসে প্রকাশমান। একই বস্তু সম্বন্ধে এক মুহূর্তে তাঁহার যে-দৃষ্টি ও মন ক্রিয়াশীল, অন্য মুহূর্তে হয়ত তাহার বিপরীত, এক সময়ে আদর্শবাদী, একান্ত অন্তর্মুখী কল্পনানির্ভর, অন্য সময়ে প্রত্যক্ষানুগামী। যেখানে একই বস্তু সম্বন্ধে এই দৃষ্টি সেখানে বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে ভাবকল্পনার ও কবিমানসের বিভিন্ন দৃষ্টি ত থাকিবেই; তাহা কিছু দৃষ্টান্তের অপেক্ষা রাখে না, এবং তাহা হইতেও বাধ্য; রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার ধর্মই ত এইরূপ। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও ঐতিহাসিক সমগ্রতার প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক পৃথক ভাবকল্পনার ও মানসচেতনার একটা প্রাকৃতিক ধারাবাহিকতার যুক্তি আছে; সমগ্রতা হইতে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্ত করিয়া দেখিলে তাহার রসতাৎপর্য ক্ষুণ্ন হয়, কবিমানসের স্বরূপোপলব্ধিও দূরে সরিয়া যায়। জৈব প্রকৃতির জীবন-বিকাশের মধ্যে যেমন বিরোধ ও বিভিন্নতা প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই হইয়া থাকে রবীন্দ্র-ভাবসত্তার বিকাশের মধ্যেও তেমনই বিরোধ ও বিভিন্নতা ঐতিহাসিক যুক্তি-নিয়মাধীন; বিবর্তনের অন্তর্নিহিত নিয়তি-নিয়মের বশ।

ছয়

এখানে আমার এই গ্রন্থের আলোচনা-রীতি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রাসঙ্গিক। সাহিত্যালোচনার বিভিন্ন রীতির সঙ্গে আমরা বহুকাল পরিচিত। তাহাদের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতার আলোচনা না করিয়াও ভারতীয় কাব্যজিজ্ঞাসার ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া বলা যায়, সাহিত্য রসোপভোগের, রসোপলব্ধির বস্তু। এই রসোপভোগের ও উপলব্ধির জন্যই লোকে সাহিত্য পাঠ করিয়া থাকে। রস কি বস্তু, তাহা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা ভারতীয় কাব্যজিজ্ঞাসুরা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ইতিমূলক কোনও সংজ্ঞা কেহ দিতে পারেন নাই, যদিও নেতিমূলক সংজ্ঞার অভাব ঘটে নাই। ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা, রূপ ও রীতি, কথা ও ছন্দ, বস্তু ভাবপ্রসঙ্গ, নানা মানসিক ও বাহ্যিক উপাদান, ঐতিহ্য ও সংস্কার, বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-চেতনা, নানা প্রয়োজন-চেতনা নানা নিয়তি-নিয়ম-চেতনা প্রভৃতি অনেক কিছু জড়াজড়ি করিয়া সাহিত্যদেহে বাস করে। এই সব-কিছুকে আশ্রয়

করিয়া, সব কিছুর মর্মভেদ করিয়া, সব-কিছু জড়াইয়া থাকে রচয়িতার ব্যক্তিগত ভাবকল্পনা ও মানসচেতনা; এই দু'য়ের রসায়নে সাহিত্যরসের উদ্ভব। অথচ সেই রস উল্লিখিত বস্তু-উপাদানগুলির কোনও একটির মধ্যে বা তাহাদের কোনও যৌগিক সংমিশ্রণের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যদিও তাহাদের প্রত্যেকটিই আবার রসোদ্বোধনের সহায়ক। তাহাদের অবলম্বন না করিলে আবার স্রষ্টার ভাবকল্পনা বা মানসচেতনার কোনও ক্রিয়াই কল্পনা করা যায় না। ফলে এই দাঁড়ায় যে, কোনও সার্থক সাহিত্য রচনার উদ্বোধিত রস যে কি বস্তু তাহা কেহই অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া দিতে পারেন না। তবে, কি কি বস্তু-উপদানে, স্রষ্টার ভাবকল্পনার ও মানসচেতনার কি ধর্মে ও প্রকৃতিতে রস-উদ্বোধিত হইয়াছে, মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে রসিক সমালোচক তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারেন, দেখাইবার সার্থকতা এই যে তাহাতে বিশেষ রচনার রসোপলব্ধি পাঠকচিত্তের নিকটতর হয়, এবং রসোপভোগ সহজতর হয়। সমালোচনার এই রীতি বহুল-প্রচলিত।

আর একটি রীতিও একেবারে অপ্রচলিত নয়। প্রত্যেক সার্থক সাহিত্যপাঠেই পাঠকের চিত্তে কতকগুলি তাৎক্ষণিক একান্ত ব্যক্তিগত মানস-প্রতিক্রিয়াগত ভাবানুভূতি সঞ্চারিত হয়; তাহা একান্ত অনুরাগেরও হইতে পারে, বিরাগেরও হইতে পারে। এই প্রতি-ক্রিয়াগত ভাবানুভূতির স্পষ্টতা বা তীব্রতা নির্ভর করে পাঠকের ব্যক্তিগত চিত্ত-সমৃদ্ধির উপর। সে যাহাই হউক, সেই পাঠকের যদি ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা থাকে, অর্থাৎ তিনি যদি নিজে সাহিত্য-রচয়িতা হন তাহা হইলে তিনি ব্যক্তিগত মানস-প্রতিক্রিয়াগত ভাবানুভূতিকে অন্য পাঠকের চিত্তে সংক্রামিত করিয়া দিতে পারেন আবার নূতন করিয়া রসোদ্বোধনের সাহায্য; তাহার সঙ্গে সমালোচ্য কাব্যের বা কবিতার উদ্বোধিত রসের এক বস্তুগত সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সম্বন্ধ না ও থাকিতে পারে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ নিজে, এলিয়ট প্রভৃতি অনেক বিদেশী লেখক ও কবি এই রীতি অবলম্বন করিয়া সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিজে "শকুন্তলা" নাটকের যে-আলোচনা করিয়াছেন তাহা কতকটা এই জাতীয়। কিন্তু নাটকটির কথা ছাড়িয়া দিয়াও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা'-আলোচনা আর এক নূতন সৃষ্টি। তাঁহার 'মেঘদূত'-কবিতাও ত এক নূতন "মেঘদূত" সৃষ্টি। এই ধরণের আলোচনার সার্থকতা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যেহেতু আমি সাহিত্য-স্রষ্টা নই, আমি এই রীতিতে আলোচনাও করি নাই।

আমার উদ্দেশ্য বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনা ও কবিমানসের ধর্ম, প্রকৃতি ও স্বরূপটিকে জানা, এবং আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত তাহা পাঠককে জানান। বস্তুত, শুধু 'কাব্য-প্রবাহ' নিবন্ধ নয়, এই গ্রন্থের সব নিবন্ধগুলির উদ্দেশ্য তাহাই, এবং তাহা জানাই রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠের ভূমিকা। ভাবকল্পনা ও মানসচেতনার ধর্ম, প্রকৃতি ও স্বরূপ জানিবার অন্যতর উপায়ের অস্তিত্ব হয় ত আছে, আমি তাহা না জানিয়া স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করিতেছি না; তবে রসোপভোগ ও রসোপলব্ধি সহজ ও সুগম করিবার জন্য আমি যে-উপায় সার্থক ও ফলপ্রসূ মনে করিয়াছি, সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছি। এই উপায় সব নিবন্ধগুলিতেই সমভাবে অনুসৃত।

প্রথমত, সর্বত্রই আমার আলোচনা কালানুক্রমিক; পরম্পরাগত ঐতিহাসিক সমগ্রতার অনুধ্যানই আমার লক্ষ্য, কারণ, তাহাতে ভাবকল্পনা ও মানসচেতনার

সমগ্র রূপটি সহজে ধরা পড়ে। দ্বিতীয়ত, আমার আলোচনা প্রসঙ্গগত, ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইলে বলা উচিত, বাহ্যিক ও মানসিক বস্তুপ্রসঙ্গগত। এই বাহ্যিক ও মানসিক বস্তুপ্রসঙ্গের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ভাবকল্পনা ও মানস-চেতনার যে নিরন্তর রূপান্তর তাঁহাই সার্থকতর শব্দের অভাবে বলিতে পারি, ভাবপ্রসঙ্গ। কাজেই এই ভাবপ্রসঙ্গের পরিচয়ের মধ্যেই ভাবকল্পনা ও মানসচেতনার স্বরূপের পরিচয়ও নিহিত; আর কোনও কিছুর মধ্যেই সে-পরিচয় পাওয়া যাইবে না। এবং যেহেতু আমার আলোচনা ইতিপরম্পরাগত, সেইহেতু আমার ভাবপ্রসঙ্গ-পরিচয়ও ধারাবাহিক। এ-উপায় ছাড়া আর কি উপায়েই বা ভাবকল্পনা বা মানসচেতনার গতি ধরা পড়িবে?

এই রীতি ও কাঠামো স্মরণে রাখিয়া আমি রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিক্রমা করিয়াছি। এবং তাহা করিতে গিয়া বাহ্যিক ও মানসিক বস্তুপ্রসঙ্গত অনেক তথ্যের আলোচনাই আমাকে করিতে হইয়াছে। কবির ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবন, তাঁহার জীবনাদর্শ ও তৎসংপৃক্ত বিচিত্র প্রত্যয়ভাবনা সমসাময়িক ব্যক্তি ও সমাজচেতনা এবং কবিকল্পনায় তাহার রূপান্তর, ঐতিহ্য ও সংস্কারবোধ, নানা নিয়তি-নিয়মের শাসন, নানা ধ্যান-ধারণা এবং মানসচেতনায় তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি অনেক কিছুই আসিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে; কারণ এ সমস্তই কবিকল্পনা ও মানসচেতনার অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের সব-কিছু মিলিয়া তাঁহার সমগ্র কবিদৃষ্টির রূপ। সেই দৃষ্টির পরিচয় না জানিলে কাব্যরসোপভোগ ও উপলব্ধি দূরে থাকিতে বাধ্য। এই বিশিষ্ট স্বতন্ত্র কবিদৃষ্টিই বিশেষ ছন্দের, বিশেষ আঙ্গিকের, বিশেষ ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার, বিশেষ রীতির, এক কথায়, বিশেষ কাব্যরূপ আশ্রয়ের মূলে। ইহারা একান্তই ভাবকল্পনা ও মানসচেতনার, এক কথায়, কবির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে, সুতরাং ইহাদের আলোচনা গৌণ। বস্তুত ভাবানুভূতি ও মননপ্রকৃতির বাহিরে কাব্যরূপের সার্থক অস্তিত্ব কিছু নাই। তবু ইহাদের আলোচনার সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, কারণ সেই আলোচনার ভিতর দিয়া ভাবকল্পনা, মননপ্রকৃতি ও মানসচেতনার স্বরূপ কিছুটা ধরিতে পারা কঠিন নয়। আমার বর্তমান আলোচনায় তাহার স্থান যে বেশী নাই তাহার একমাত্র কারণ, একসঙ্গে সব কথা কেহ বলিতে পারেন না, বলিবার যোগ্যতাও হয়ত রাখেন না; তাহা ছাড়া লেখককেও পুঁথির ও পত্রপৃষ্ঠার সীমা মানিয়া চলিতেই হয়।

কাব্য প্রবাহ

এক

যে পরিবার-পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম সে পরিবার-পরিবেশ উনবিংশ শতকের মধ্যপাদের বাংলাদেশের মধ্যে বিধৃত। তাহার রাজধানী কলিকাতা, যে-কলিকাতা ইংরেজ বণিক-রাজের সৃষ্টি। সেই কলিকাতার প্রধানতম বাণিজ্য-রাজপথ চিৎপুর রোডের এপাশে ওপাশে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন পারিবারিক বাসগৃহ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার শিক্ষায় দীক্ষায় শীলে শালীনতায় ধ্যানে ধারণায় বেশে ভূষায় আচারে ব্যবহারে তখন বাংলাদেশের চলমান সামাজিক জীবনস্রোতের বাহিরে। ক্ষীয়মান ভারতীয় মুসলমানী সংস্কৃতির বাহ্যিক সৌষ্ঠব-শালীনতার সঙ্গে শান্ত সমাহিত আবেগবিরল ঔপনিষদিক, প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতবর্ষের ধ্যান ও চিন্তার একটি অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছিল এই পরিবারে। শুধু তাহাই নয়; এই মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে ছিল ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকদের নিভৃত অথচ অবাধ সঞ্চরণ, এবং সমস্ত কিছু জড়াইয়া গভীর স্বদেশপ্রীতির একটি মৃদুমন্দ সৌরভ। অথচ এই অপূর্ব পরিবেশ তদানীন্তন বাংলাদেশের সাধারণ সামাজিক জীবনের পরিবেশ নয়। তাহার উপর, ঠাকুর-পরিবার পিরালী ব্রাহ্মণ-পরিবার; তাঁহাদের বৈবাহিক ও সামাজিক আদান-প্রদান-সম্বন্ধ ছিল সীমাবদ্ধ, এবং এই কারণে ঠাকুর পরিবারের স্থান ছিল বাংলার বৃহত্তম সামাজিক জীবনের এক পাশে। তাহারও উপর আবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন প্রবর্তিত ধর্মসাধনার অনুগামী। এই সমস্ত কারণের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে ঠাকুর-পরিবারে একটা স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠিয়াছিল : বাংলাদেশের সাধারণ সামাজিক জীবনস্রোতের সঙ্গে এই পরিবারের বিশেষ কোনও গভীর যোগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহাদের পরিবারের এই স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সজ্ঞান ছিলেন। যৌবন-মধ্যাহ্নে, ১৯০১ সালের জুলাই মাসে, স্ত্রীর নিকট এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের পরিবারের শিক্ষা রুচি অভ্যাস ভাষা ও ভাব অন্য সমস্ত বাঙালী পরিবার থেকে স্বতন্ত্র"। সেই পরিবারে রবীন্দ্রনাথ যখন জন্ম লইলেন তখন যাহা কিছু পুরাতন কালের চালচলন পালপার্বণ ইত্যাদি এতকাল ছিল তাহাও বিদায় হইয়া গিয়াছে; বস্তুত তখন পুরাতন কালই প্রায় বিদায় লইয়াছে, নূতন একটি কাল জন্মগ্রহণ করিতেছে, এবং সেই কালের বাতাস এই পরিবারেই প্রথম আসিয়া লাগিতেছে। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভাবে ও ভাষায়ই এই অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য-পরিবেশের কথা শোনা যাইতে পারে।—

"যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। শহরের বাইরে শহরতলীর মতো চারিদিকে প্রতিবেশীর ঘরবাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধেনি।

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত বড় সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল, বর্শা ও মরচে পড়া তলোয়ার-খাটানো দেউড়ি, ঠাকুর দালান, তিন চারটে উঠোন, সদর অন্দরের বাগান, সংবৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্ব যুগের নানা পালপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে-সজ্জায়

তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সত্ত বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র এখনো এসে পৌঁছেনি।

এ বাড়ি থেকে এ-দেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে তেমনই পূর্বতন ধনের স্রোতও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্য-দীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহন শেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিক্ষা। * * *

নিরালয় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক মহাদেশ থেকে দূরবচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। * * *"

(সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে ছাত্রছাত্রীর সংবর্ধনার উত্তরে কবির প্রতিভাষণ)

এই দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং বাল্য ও কৈশোর পরিবেশ। এই পরিবেশেও তদানীন্তন অভিজাত পরিবারের স্বাতন্ত্র্য। বাড়িতে লোকজন প্রচুর, বৃহৎ পরিবার, এবং সে-পরিবারের কর্তা দেবেন্দ্রনাথ। তাঁহার আদেশ ও নির্দেশ কিছু নাই, কিন্তু আদর্শ অমোঘ; সেই আদর্শ সকলের মনে। অসংখ্য পরিজন, কিন্তু প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট স্থান, কেহ কাহারও সীমা লঙ্ঘন করে না। রবীন্দ্রনাথ সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, ভৃত্যরাজতন্ত্রের মধ্যে তাঁহার অশনবসন, চলনবলন; পড়াশুনা গৃহশিক্ষকের হাতে, গানবাজনা, শরীরচর্চা তাহারও আবশ্যিক ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সমস্তই সুনিয়ন্ত্রিত, শাসনে নয় কিন্তু নিয়ম-সংযমে আঁটসাঁট করিয়া বাঁধা। বাড়িতে মজলিসেরও অভাব নাই, সেখানে গানবাজনা, নাট্যাভিনয়, কাব্যচর্চা, স্বদেশচর্চা, দেশোদ্ধারের পরিকল্পনা, এমন কি গুপ্তসভারও স্থান আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও সেখানে তিনি আদৃত। অবাধ আনন্দের অবকাশ আছে কিন্তু তাহা হইলেও সমস্তই নিয়মে সংযমে নিয়ন্ত্রিত। "ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল।" বৃহৎ পরিবারের সর্বত্রই এই শান্তি, সর্বত্রই একটা সুবিস্তৃত অবকাশ। কলিকাতা শহরের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত জীবনে তখন আজিকার দিনের ব্যস্ততা ঢুকিয়া পড়ে নাই, সে-জীবন তখনও অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিশ্চঞ্চল। দেবেন্দ্রনাথের পরিবার তাহার মধ্যে আরও শান্ত, আরও নিশ্চঞ্চল।—

"কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধা হয়নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেলকলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়েনি। ইমারত অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেল বেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরনার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি বেহারার হাঁই-হুঁই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেইও হাঁক। সন্ধ্যেবেলায় জ্বলতো তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।"

(সপ্ততিতম জয়ন্তী-উৎসবে ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনার উত্তরে কবির প্রতিভাষণ)

সত্যই, বালক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের শান্ত, অবকাশবহুল, স্বতন্ত্র পরিবারের এক কোণের মানুষ, একলা, একঘরে, কবির নিজের কথায়, "* * * * সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হালকা * * *!"

আমি যে ইতিপূর্বেই বার বার কবির একান্ত স্বতন্ত্র, অন্তর্মুখী, আত্মভাবপরায়ণ

কবি-কল্পনার কথা বলিয়াছি তাহার মূল এই বাল্য, কৈশোরের জীবনভূমিকার মধ্যে নিহিত, এ-কথা অনুমান করা বোধ হয় কঠিন নয়।

যাহাই হউক, যে-পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোর কাটিয়াছে তাহা কিন্তু কাব্যাভাসের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল। ঠাকুরবাড়ি তখন গান, কাব্য ও সাহিত্য চর্চার প্রধানতম কেন্দ্রস্থল, এবং বিদ্যালয়ের প্রতি বীতরাগ রবীন্দ্রনাথ, পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাই, এই গান, কাব্য ও সাহিত্য চর্চার মধ্যে তিনি আপনার তৃপ্তি অন্বেষণে ব্যাপৃত। তের বৎসর বয়সেই গৃহ-শিক্ষকের সাহায্যে "কুমার-সম্ভব," "শকুন্তলা," "ম্যাকবেথ," বিদ্যাপতির পদাবলী ইত্যাদি পড়া হইয়া গিয়াছে। শুধু পড়া নয়, অধীত বিষয় কবিতায় তর্জমার চেষ্টাও চলিতেছে, কিছু কিছু কাব্য-রচনাও আরম্ভ হইয়াছে। নিজের বাড়িতে স্বর্ণকুমারী, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনাপাঠ ও আলোচনা এক দিকে, অন্য দিকে বিহারীলালের গীতি-কাব্য ক্রমশ বালকচিত্তে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তাহা ছাড়া, যে-সময়টা একা একা আছেন তখন বসিয়া বসিয়া কল্পলোকের স্বপ্নজাল বুনিতেছেন বালকসুলভ বিলাস-মোহে; এই স্বপ্নজাল অধিকাংশই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া, কিশোর বয়সের কুয়াশাচ্ছন্ন হৃদয়বৃত্তিগুলিকে লইয়া। কতকটা এই রকম পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চর্চার সূত্রপাত হইল।

"এই লেখাগুলো যেমনই হোক, এর পেছনে একটা ভূমিকা আছে—সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, * * * বাড়ির শাসনও তার হালকা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমায় কোনো বাঁধন পরাননি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্কের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। * * * শুরু হলো আমার ভাঙা ছন্দে টুকরো কাব্যের পালা, উল্কাবৃষ্টির মতো, বালকের যা তা এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি। রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত।"

দুই

পৃথ্বিরাজ-পরাজয় (১২৭৯)
বনফুল (১২২৮-৮৩র, ১২৮৬প্র)
কবি-কাহিনী (১২৮৪র, ১২৮৫প্র)
শৈশব সংগীত (১২৮৪-৮৭র, ১২৯১প্র)
বাল্মীকি-প্রতিভা (১২৮৭প্র)
ভগ্নহৃদয় (১২৮৭র, ১২৮৮প্র)
কালমৃগয়া (১২৮৯প্র)
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১২৯১প্র)
সন্ধ্যা-সংগীত (১২৮৮প্র)
প্রভাত সংগীত (১২৯০প্র)

এগার কি বার হইতে আঠার উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত যত কাব্য অথবা কাব্যনাট্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা কম নয়। কাব্য, গীতিকাব্য, কাব্যোপন্যাস, কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য গাথা ইত্যাদি সাহিত্য-রচনার সকল দিকেই কিশোর কবিচিত্ত আকৃষ্ট

হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" এবং "বাল্মীকি প্রতিভা"ই কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া টিকিয়া আছে ; আর বাকি

"...সমস্তই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে গেলেও ঐতিহাসিকের নাগালের বাহিরে যায় নাই। অনুসন্ধান করিলে সেগুলো এখনো পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যই মহাকাল সেগুলি বিনাশ করিয়াছে—কারণ সাহিত্য হিসাবে সেগুলি নগণ্য।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী' ১ম খণ্ড, ৫১ পৃঃ বিশ্বভারতী, সং ১৩৪০)

প্রভাতবাবুর এই উক্তি যথার্থ! এগুলি যে কখনও মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় বাঙালী পাঠকের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এবং এখনও যে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে কোনও কোনও রচনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এজন্য কবি নিজে অত্যন্ত লজ্জিত! "জীবন-স্মৃতি"তে, "সঞ্চয়িতা"র ভূমিকায়, নানা পত্রালাপে এবং অধুনা "অচলিত সংগ্রহ রচনাবলী"র ভূমিকায় তিনি বারংবার এই লজ্জা ও সংকোচ স্বীকার করিয়াছেন, এবং অপরিণত বয়সের এই রচনাগুলিকে অত্যন্ত নির্মমভাবে কশাঘাত করিয়াছেন। কবি নিজের প্রতি এতটা কঠোর না হইলেও পারিতেন! "পৃথ্বীরাজ-পরাজয়" বাদ দিলে বাকি কয়েকটি রচনা তদানীন্তন বাংলা-কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একেবারে নগণ্য নয়। মধুসূদন 'পয়ার পায়ের বেড়ি' ভাঙিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত এক বিহারীলাল ছাড়া আর কেহ বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর ছন্দজড়িমা ঘুচাইতে পারেন নাই, কিংবা গীতিকবিতার অপূর্ব সম্ভাবনার স্বপ্ন কোনও কবিকে চঞ্চল করে নাই। বিহারীলালই বোধ হয় সর্বপ্রথম বাংলা কাব্যে একটি নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন, এবং বিহারীলালের প্রেরণা পাইয়া সেই ধারায় রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের উন্মেষ হইল। এই কথার প্রমাণ কবির এই কৈশোর কাব্যাভ্যাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া পরবর্তী জীবনে যে-সব ভাব ও কল্পনা কবিকে আবেগ-চঞ্চল করিয়াছে, তাঁহার জীবন ও কাব্যকে নানা ভাবে নানা রূপে স্পর্শ করিয়াছে, তাহাদের দুই-একটির আভাসও এই রচনাগুলির ভিতর লক্ষ্য করা যায়। তবে তাহা আভাস মাত্রই, শ্রুত অথবা অধীত বাক্যমাত্রই, তখনও তাহারা অনুভব-ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই, কিংবা সার্থক কাব্যরূপও লাভ করে নাই।

"বনফুল" কাব্যে একটি গল্প। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির যে সুগভীর সম্বন্ধ পরবর্তী জীবনে ও কাব্যে রবীন্দ্র-কাব্য-জিজ্ঞাসার একটা বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে, এই কাব্যোপন্যাসে তাহার আভাস আছে। লিরিক প্রতিভার উন্মেষও ইহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

"কবি-কাহিনী" ও "বনফুলে"র মত ট্র্যাজিক্ রোমান্স। যে-ঐশ্বর্য, যে-মাধুর্য মানুষের করায়ত্ত, সেই নিকটের ঐশ্বর্য অথবা মাধুর্যের মূল্য না বুঝিয়া অথবা অবহেলায় নিকটে ছাড়িয়া মানুষ দূরে যায়, ঐশ্বর্য ধূলিমুষ্টি জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, মাধুর্যকে তুচ্ছ করে, অথচ দূরে গিয়া পশ্চাতের জন্য মন কাঁদিয়া উঠে, তখন নিকটের নাগাল আর পাওয়া যায় না, দূরও মনকে শান্তি দিতে পারে না—এই ভাবটি রবীন্দ্র-কাব্যে বহু স্থানে বহু ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিশোর বয়সের "কবি-কাহিনী"তে তাহার অস্পষ্ট আভাস আছে। তাহা ছাড়া যে-বিশ্বজীবন, বিশ্বপ্রেম তাঁহার পরবর্তী জীবন ও কাব্যকে একটি নূতন রূপ দান করিয়াছে তাহারও খুব বিস্তৃত আভাস এই রচনাটিতে ধরিতে পাওয়া যায়। কিন্তু

তাহা শুধু, আমি আগেই বলিয়াছি, শ্রুত বা অধীত বাক্য মাত্র, অনুভূত প্রত্যয় নয় রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলিতেছেন,

"ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়, বলিতে খুব সহজ। নিজের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহা বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্তকর করিয়া তোলা অনিবার্য।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ১৫৭ পৃঃ)

কিন্তু এই যে 'বিশ্বপ্রেমের ঘটা' এই কাব্যটিতে দেখা যায় তাহার কারণটুকু জানা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কাটিয়াছিল ভৃত্যরাজতন্ত্রের শাসনের মধ্যে, তাহার মধ্যে স্নেহ-মায়া-ভালবাসা কিছুই ছিল না। কিশোর-চিত্তের বিচিত্র বর্ণের হৃদয়লীলার খবর সেখানে কেহ লইত না, স্নেহে প্রীতিতে সহানুভূতিতে অথবা সহজবোধের সাহায্যে সেই লীলাকে স্পর্শ করিবার কেহ ছিল না। কিশোর-চিত্তকে বাধ্য হইয়াই তখন আপনার মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, একটা 'বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করা ছাড়া তাহার আর কিছু উপায় ছিল না। মনের এই অবস্থায় তিল তাল হইয়া উঠে, সুখ-দুঃখের অনুভূতি স্বপ্ন অথবা কল্পনামাত্র হইলেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া দেখা দেয়, এবং 'যাহা স্বতই বৃহৎ তাহা বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্তকর করিয়া তোলা অনিবার্য।' রবীন্দ্রনাথ কদাচিৎ বাড়ির বাহিরে যাইতে পারিতেন, সময় সময় যখন সুযোগ ঘটিত তখন কোনও ভৃত্য অথবা কর্মচারী সঙ্গে যাইত। বাহিরের এই জগৎ তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল বলিলেই চলে। বিশ্বজগতের সঙ্গে তাঁহার শৈশব ও কৈশোরের যে সম্বন্ধ তাহা শুধু দরজা-জানলার ফাঁকে ফাঁকে; সেই ফাঁক দিয়াই এই আলো-বাতাস, রৌদ্র-বৃষ্টি, আকাশ ও মাটি, লতা, গাছ, পশু, পক্ষী, মানুষ, রূপ-রস-গন্ধ তাঁহাকে স্পর্শমাত্র করিয়া যাইত, কিন্তু ইহাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ তাঁহার ছিল না। বিশ্বপ্রকৃতি

"যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না,—সেইজন্ত প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং ১৪ পৃঃ)।

প্রভাতবাবু যথার্থ ই বলিয়াছেন,

"রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কথা স্মরণ করিলে মনে হয় যে বালক রবীন্দ্রনাথ 'কবি-কাহিনী'র মধ্যে কল্পনার সাহায্যে নিজের অনেক অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়া লইয়াছেন।" ("রবীন্দ্র-জীবনী", বিশ্বভারতী, সং ১ম খণ্ড, ৬৩ পৃঃ)

ঠিক এই কারণেই, কবির কৈশোরের সব কয়টি রচনাই 'বস্তুহীন ভিত্তিহীন', উচ্ছ্বাসের বাষ্পে ভরা, এবং সবগুলিই ট্র্যাজেডি। এই বয়সটাই তো স্পর্শচঞ্চল চিত্তের পক্ষে দুঃখ-বিলাসের বয়স, এবং রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর যে-ভাবে কাটিয়াছে, তাহাতে এই দুঃখ-বিলাসের আকর্ষণ আরও প্রবল হইবারই কথা।

কিন্তু "কবি-কাহিনী" অথবা এই বয়সের অন্যান্য রচনার ভাব যাহাই হউক ইহাদের মধ্যে দুইটি জিনিষ সহজেই লক্ষ্য করা যায়: একটি কবির হৃদয়বৃত্তির সৌকুমার্য ও কল্পনার অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি, আর একটি তাঁহার লিরিক প্রতিভা। যে লিরিক প্রতিভা উত্তর-জীবনে রবীন্দ্রনাথকে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে তাহার পরিচয় এই রচনাগুলি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

"রুদ্রচণ্ড" একটি ক্ষুদ্র নাটিকা, একটু মেলোড্রামাটিক, এবং ইহার কাব্যমূল্যও খুব বেশি নয়। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ "ভগ্নহৃদয়" নামে একটি গীতিকাব্য রচনা করেন; ইহার কাব্যমূল্য উপেক্ষা করা যায় না। "ভগ্নহৃদয়" নাটকাকারে লিখিত, কিন্তু কেহ পাছে ইহাকে নাটক বলিয়া ভুল করেন সেইজন্য কবি ভূমিকাতেই লিখিয়াছেন,

"নিম্নলিখিত কাব্যটিকে কাহারও যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত; তাহাতে ফুল ফুটে, কিন্তু সে-ফুলের সঙ্গে শিকড়, কাণ্ড, শাখা, পত্র, কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা আবশ্যক। নিম্নলিখিত কাব্যটি ফুলের তোড়া। গাছের আর সমস্ত বাদ দিয়া কেবলমাত্র ফুলগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে।" ("ভারতী", ১২৮৭, কার্তিক, ৩৩৬ পৃঃ)

"ভগ্নহৃদয়" লেখা আরম্ভ হইয়াছিল প্রথম বিলাত-প্রবাস কালে, দেশে ফিরিয়া আসার পর শেষ করা হয়। যে কৈশোর কবিধর্মের প্রকাশ "কবিকাহিনী"তে আমরা দেখিতে পাই, তাহা "ভগ্নহৃদয়"-কাব্যেও সুস্পষ্ট। এই বয়সের সব ক'টি রচনাই হৃদয়োচ্ছ্বাসের বাষ্পে আচ্ছন্ন, সে-কথা ত আগেই বলিয়াছি: "ভগ্নহৃদয়ে" এই উচ্ছ্বাস যেন আরও ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও হৃদয়াবেগ অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট, এখনও তাহা মূর্তি-গ্রহণ করেন নাই। কবি নিজেই বলিতেছেন,

"ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মত কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগুবি হয়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়—আমার আশে পাশে সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলে একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পলোকের খুব তীব্র সুখ-দুঃখও স্বপ্নের সুখ-দুঃখের মত। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল—তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠতো।" (জনৈক বন্ধুর নিকট পত্র, "জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ১৮৭ পৃঃ)

মনের এই অবস্থার পরিচয় অন্যত্র কবি নিজেই দিতেছেন,

"বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা না আমার না আর কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লিখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল বাষ্প আছে—বাষ্পভরা বুদবুদরাশি, সেই আবেগের কোমলতা অলস কল্পনার আবর্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগ বগ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদেরও অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু, সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।" ('জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী সং, ১৩৬ পৃঃ)

এমন সত্য ও সুন্দর আত্মবিশ্লেষণ কোনও কবি নিজের কাব্য-সম্বন্ধে করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

চিত্তের যে অস্পষ্ট অপরিস্ফুট হৃদয়াবেগ হইতে "কবিকাহিনী", "রুদ্রচণ্ড" অথবা "ভগ্নহৃদয়ে"র সৃষ্টি ঠিক অনুরূপ অবস্থার মধ্যেই "শৈশব-সংগীতে"রও সৃষ্টি। "শৈশব-সংগীতে"র কবিতাগুলি অনেকগুলিই গাথা-জাতীয়, এবং এই গাথাগুলি এবং অন্যান্য কবিতাগুলি কবির আঠারো হইতে কুড়ি বৎসরের মধ্যে লেখা। এগুলিও উচ্ছ্বাসের বাষ্পে ভরা, এবং গাথাগুলি প্রায় সবই ট্র্যাজেডি। বোঝা যাইতেছে "বনফুল", "কবিকাহিনী", "রুদ্রচণ্ড", "ভগ্নহৃদয়ে"র সঙ্গে "শৈশব-সংগীত"ও একই পর্যায়ের রচনা, একই চিত্তধারার সৃষ্টি। এই ধারা চলিয়াছে "সন্ধ্যা-সংগীত" পর্যন্ত, এবং "শৈশব-সংগীত" ও "সন্ধ্যা-সংগীত" যাঁহারা একটু অভিনিবেশে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন এই দুই রচনার মধ্যে একটা খুব নিবিড় ভাব-ঐক্য আছে। কাব্যসৃষ্টির দিক হইতে "সন্ধ্যা-সংগীত" সার্থকতর, এ-কথা সত্য, কিন্তু তাহা কিছু ভাবৈশ্বর্যের জন্য নয়, চিত্তসমৃদ্ধির জন্য নয়; বরং যে অস্পষ্ট অপরিস্ফুট হৃদয়াবেগ পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়, "সন্ধ্যা-সংগীতে" তাহা সমভাবেই বিদ্যমান, যে হৃদয়-অরণ্যের মধ্যে কবি ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছেন সে-অরণ্য এখনও তেমনই গহন, তেমনই গভীর। তবু "শৈশব-সংগীতে"র সঙ্গে "সন্ধ্যা-সংগীতে"র পার্থক্য একটা আছে, কিন্তু সে-পার্থক্য শুধু প্রকাশ-ভঙ্গীর, কাব্যরূপের। প্রভাতবাবুও বলিতেছেন, "শৈশব-সংগীত"

'সন্ধ্যা-সংগীত'এর অব্যবহিত পূর্বের রচনা। 'সন্ধ্যা-সংগীত'এর সঙ্গে তফাত শুধু বলিবার ভঙ্গিতেই প্রধান। * * * 'বনফুল' হইতে 'ভগ্নহৃদয়' পর্যন্ত কাব্যোপন্যাসগুলি 'শৈশব-সংগীতে'র কবিতাগুলি 'সন্ধ্যা-সংগীত'এর সোপান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে ভাবের বিচ্ছেদ টানা কঠিন, যথার্থ পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে, 'সন্ধ্যা-সংগীত'এর বলিবার ভঙ্গিতে, সে ভঙ্গি তাঁহার নিজস্ব।" (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সং, ১০০-১০১ পৃঃ)

যত উচ্ছ্বাসের বাষ্পে ভরা, যত শিথিল, যত বাক্‌বহুল বর্ণনার আতিশয্য, যত কাহিনীগত অসংগতি, যত দীর্ঘ অতিশয়োক্তি, যত বয়স্কের অভিমান, যত অন্ধ অনুকরণ, এই কৈশোর কাব্য-প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে থাকুক না কেন,—এবং তাহা যে আছে অস্বীকার করিবার উপায় নাই—তৎসত্ত্বেও এই অপরিণত কাব্যগুলির মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রাথমিক দীপ্তি ও মাধুর্য ধরা পড়ে অতি সহজেই; এবং শুধু তাহাই নয়, উত্তর-জীবনে কবির প্রাণ-ধর্মের যে-প্রকৃতি তাহারও প্রথম সূচনা এই কৈশোর কাব্যসাধনার মধ্যে নিহিত। আমাদের এই বস্তুসংসার, বিশ্বপ্রকৃতি, মানবজীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রত্যয় উত্তর-জীবনে আমরা সুস্পষ্ট ধরিতে পারি; আশ্চর্যের বিষয়, সেই সুপরিচিত প্রত্যয়-ভাবনাগুলির প্রাথমিক উন্মেষ এই কাব্যগ্রন্থগুলির ভিতরই প্রথম ধরা পড়ে। নিসর্গ-প্রকৃতিকে কবি কোন-দিনই কতকগুলি উপকরণের আধার-রূপে কল্পনা করেন নাই; তাহার ভিতর মানবিক সত্তার উপলব্ধি তাঁহার কবিপ্রাণের ধর্ম। বস্তুসংসারের বিচিত্র রূপকে তিনি কখনও তাহাদের নিছক বস্তুধর্মে বুদ্ধিগম্য করেন নাই; তাহাদের পশ্চাতে কোনও অদৃশ্য অনির্বচনীয় শক্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল, সেই শক্তির লীলা তিনি কবিকল্পনায় অনুভব করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে, বস্তুদৃষ্টিতে মানুষে মানুষে যে দ্বন্দ্ব বিরোধ, মানব-সম্বন্ধের যে-বৈপরীত্য তাহাকেও তিনি বরাবরই অবিশ্বাসের, অসংগতির দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন; মৈত্রীবোধই

মানবসম্বন্ধের নিগূঢ় প্রেরণা, এই বিশ্বাসই তাঁহার জীবন-দর্শনের অন্তর্গত। ইহাদের প্রত্যেকটির প্রাথমিক কবিকল্পনার রূপ এই কৈশোর-কাব্যপ্রচেষ্টার মধ্যে মিলিবে। উত্তর-জীবনেও ইহাদের মৌলিক প্রকৃতি একই। এই প্রাথমিক রূপের দৃষ্টান্ত "কবিকাহিনী" হইতে আরম্ভ করিয়া "সন্ধ্যা-সংগীত" পর্যন্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া এই কৈশোর রচনাগুলির সাহিত্যিক মূল্যও একেবারে নগণ্য নয়। যে আবেগময় সুর, যে গীতধ্বনি, যে অব্যাহত গতিচ্ছন্দ রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্য, যে অবারিত মুক্তপক্ষ কল্পনা ও তাহার একান্ত স্বতন্ত্র অন্তর্মুখী প্রকৃতি রবীন্দ্র-গীতি-কবিতার ধর্ম তাহারও প্রথম উন্মেষ ইহাদের মধ্যে পরিস্ফুট। অনেক কবিতাখণ্ডের বাক্ ও বর্ণ-বহুল প্রকৃতি-বর্ণনা, তাহাদের সুর ও ধ্বনি, ছন্দ ও বাক্‌ভঙ্গি অনেক সময়ই যৌবনোন্মেষ ও পরিণত-যৌবনের রবীন্দ্র-কাব্যের অনেক ছবি, অনেক খণ্ড, অনেক সৌরভ স্মরণে জাগাইয়া তোলে; এই সব কৈশোর প্রচেষ্টার মধ্যে যৌবনের পূর্বধ্বনি শোনা যায়, বিশেষ ভাবে সুরে ও ধ্বনিতে এবং ছন্দের অবারিত গতিতে।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, নিজস্ব রসানুভূতি দ্বারা আপ্লুত ও আচ্ছন্ন, ব্যক্তিগত, আত্মগত মনের সুরধ্বনিময় যে-প্রকাশকে আমরা 'লিরিক্' বা গীতি-কবিতা বলি, রবীন্দ্রনাথের মন ও কল্পনা তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল কি করিয়া? বাংলা কাব্য-সাহিত্য তখন মাইকেল হেম-নবীনের প্রতাপদীপ্ত রাজত্ব; তাহার অব্যবহিত আগেকার কাব্যিক আবহাওয়ার এক দিকে ভারতচন্দ্র, অন্য দিকে ঈশ্বর গুপ্ত, আর লোকস্তরে নিধুবাবু, দাশরথি রায় ইত্যাদি। হেম-নবীনের কথা ছাড়িয়াই না হয় দিলাম, কিন্তু মধুসূদনের প্রদীপ্ত কাব্য-প্রতিভা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল না, অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ভারতচন্দ্র-ঈশ্বর গুপ্তের আবেশে তিনি মুগ্ধ হইলেন না, এ-তথ্য অন্যতম সাহিত্যিক বিস্ময়। ঠাকুরবাড়িতে গান, কাব্য ও সাহিত্যালোচনার যে-মজলিস বসিত সেখানে ইহাদের চর্চা ছিল না এমন নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চর্চা চলিত বৈষ্ণব কবিতার, সমসাময়িক ইংরেজি রোম্যান্টিক গীতিকাব্যের এবং পরিবারের প্রিয়কবি বিহারীলালের। আদর্শ ও উদ্দেশ্য মূলক, উপাখ্যানগত, সমষ্টি মনের কল্পনাগত যে-কাব্য মাইকেল-হেম-নবীনের দান, বা লোকপুরাণগত, বাকচাতুর্যময় যে-কাব্য ভারতচন্দ্র-ঈশ্বর গুপ্তের দান, তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতা, সমসাময়িক ইংরেজি গীতি-কবিতা বা বিহারীলালের গীতিকাব্যের একটি জাতিগত, প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। কি বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনায়, কি সমসাময়িক ইংরেজি কাব্যে কি বিহারীলালের কাব্যে একক মনের যে-অনুভূতি, ব্যক্তিগত প্রাণের যে-স্পন্দন সংগীতের সুরে ছন্দের ধ্বনিতে ধরা যায়, বাংলা সাহিত্যের কাব্য-ঐতিহ্যের অন্যত্র কোথাও তাহা ছিল না। কিশোর-রবীন্দ্রনাথের একক স্বতন্ত্র ব্যক্তিচিত্তে যে কাব্য-ঐতিহ্য, যে কাব্যপ্রকৃতি নূতন এক উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিল তাহা গীতিকাব্যের এই একক মনের অনুভূতি, ব্যক্তিগত প্রাণের স্পন্দন। এই গীতিকাব্যিক উন্মাদনা লালিত ও বর্ধিত হইবার সুযোগ পাইল বিহারীলালের নৈকট্যে, "বঙ্গসুন্দরী" ও "সারদামঙ্গলে"র কাব্যছায়ায়। বিহারীলালকে যে রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অনেকটা বিনয়নম্র স্বীকৃতি হইলেও একেবারে অসার্থক নয়। কবির কৈশোর কাব্যপ্রচেষ্টাগুলির ভিতর বিহারীলালের নিজস্ব দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গি, আত্মকেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও অবশ্য স্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ প্রাথমিক উন্মেষেই অধিকতর গীতময়, ধ্বনিবহুল এবং গতিছন্দময়। "বনফুল" বা "শৈশব-সংগীতে"র যে কোনও

গাথা "সারদামঙ্গলে"র পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলেই তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি হইবে না।

"ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" কবির ষোল বছর বয়সের লেখা, "কবিকাহিনী" রচনারও আগে। এই রচনাটি কবির কিশোর বয়সের অন্যান্য কাব্য-রচনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং সেই হেতু পৃথকভাবে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত।

এই কিশোর বয়সে বিহারীলাল একদিকে তাঁহার আদর্শ ছিলেন, আমরা দেখিয়াছি; কবির মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল বিহারীলালের মত কবি হইবার, কতকটা বিহারীলালের অনুকরণই দেখা যায় তাঁহার "কবিকাহিনী", "রুদ্রচণ্ড", "শৈশব-সংগীত", "ভগ্নহৃদয়" প্রভৃতি রচনাগুলিতে, বিশেষভাবে ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গিতে। কিন্তু আর একদিকে প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলীও তরুণ চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছিল; তাঁহাদের ভাষা ও ছন্দ কিশোর কবির স্পর্শকাতর সুকুমার মনকে অভিভূত করিয়াছিল, এবং বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে কবিতা রচনা করিবার একটা প্রবল ইচ্ছার সঞ্চার করিয়াছিল। এই ইচ্ছার মধ্যেই "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"র সৃষ্টি। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে কম কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা শৈশবেই শুরু হইয়াছিল।

"শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড় করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ্য বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি-অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ১২১ পৃঃ)

শৈশবেই এমন করিয়া বৈষ্ণব পদাবলী যিনি পড়িয়াছিলেন, উত্তর-জীবনের কাব্যে ভাবে ও ভাষায়, ছন্দে ও কল্পনায় বৈষ্ণব পদকর্তাদের স্পর্শ লাগিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এ-পদগুলির মধ্যে কবি যে ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য, কল্পনার যে মুক্তি, যে বিচিত্র চিত্রসৃষ্টি, যে নিবিড় ভাবোপলব্ধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কিশোর কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল; বৈষ্ণব-কবিতার ভাষার সহজ ললিতগতি এবং গীতিমাধুর্যও তাঁহার কবিপ্রাণে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল—উত্তরজীবনে কখনও তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই, এবং লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে কবির সমগ্র কবিজীবনে এই বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রভাব তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বস্তুত, একমাত্র কালিদাস ছাড়া ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিদের মধ্যে এই বৈষ্ণব পদকর্তাদের মত আর কেহই রবীন্দ্রনাথের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্র-কাব্য যে একান্তই গীতধর্মী, একান্ত স্বতন্ত্র ও আত্মগত, তাহার মূলে এই বৈষ্ণব পদকর্তারা নাই, এ-কথা বলা অত্যন্ত কঠিন। যাহা হউক, উত্তর-কালে রবীন্দ্রনাথ "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" সম্বন্ধে যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত কঠোর, এবং বোধ হয়, অন্যায়ও বটে। ভানুসিংহ ছদ্মনাম, এবং এই ছদ্মনামে অনেকেই প্রতারিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কবি বলিতেছেন,

"ভানুসিংহ যিনিই হোন তাঁহার লেখা যদি বর্তমানে আমার হাতে পড়িত আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না এ

কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটি কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে উহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ গলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজ কালকার সস্তা অর্গানের বিলাতি টুংটাং মাত্র।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ১৪৫-৪৬ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিদের ছন্দ, ভঙ্গি, কলাকৌশল ঠিকই আয়ত্ত করিয়াছিলেন; সেই দিক দিয়া ভানুসিংহের দ্বারা যাঁহারা প্রতারিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের খুব অপরাধী করা যায় না। বিষয়-নির্বাচনেও তিনি পদকর্তাদের সার্থক অনুকরণ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণের আপাতনিষ্ঠুর লীলা, রাধার বিরহ-দুঃখ, অন্ধকার বৃষ্টিমুখরিত শ্রাবণ রজনী, তরঙ্গিত যমুনা, বাঁশির সুর, অভিসার, মিলন, কুঞ্জবন কিছুই বাদ পড়ে নাই; পরিবেশ সৃষ্টির দিক হইতে কোন ত্রুটি নাই। 'নিদ-মেঘপর স্বপন-বিজলি সম রাধা বিলসিত হাসি'—ষোল বৎসর বয়সের কবির হাতে এই ছবি ও উপমা সুন্দর, সন্দেহ কি? তাহা ছাড়া, দু'চারটি পদ আছে যাহা যে-কোনও বয়সের কবির পক্ষে গৌরব করিবার মতন; 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ যামিনীরে', 'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান' ইত্যাদি পদ ত 'বাজাইয়া কষিয়া' দেখিলেও মেকি বলিয়া ধরা পড়িবার সম্ভাবনা কম। তবে, বৈষ্ণব পদকর্তাদের একটা জিনিস রবীন্দ্রনাথ সে-বয়সে ধরিতে পারেন নাই, কারণ তাহা অনুকরণ করা যায় না। তাহা তাঁহাদের অনুভবঘন প্রত্যয়, তাঁহাদের ভাবের অকৃত্রিমতা। আমি বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, তাঁহার এই বয়সের সমস্ত রচনাই ভাবহীন, বস্তুহীন, কল্পলোকের সৃষ্টি। "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"ও তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ পদকর্তাদের বহির্দিকটাই দেখিয়াছিলেন এবং সেই বহির্দিক তাঁহার মত প্রতিভার পক্ষে অনুকরণ করা কঠিন ছিল না; কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্লোকের মধ্যে তিনি তখনও প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" অন্য সকল দিক দিয়া সার্থক হইলেও কবিমনের সত্য পরিচয় ইহাতে নাই; নিজের কবিমানস এখনও অনাবিষ্কৃত। ইহার অন্যথা কি করিয়া হইবে? কবির কাব্য-রচনা এই বয়সে এখনও অনুকরণের পর্যায় অতিক্রম করিতে পারে নাই। কবি এখনও নিজের মধ্যে নিজ অবরুদ্ধ; বাহিরের স্পর্শ যতটুকু আসিয়া লাগিতেছে তাহাতে বাহিরকে জানিবার ও বুঝিবার, তাহার রহস্যের অন্তরে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হইতেছে না, বরং নিজের মধ্যেই অবরুদ্ধ হইয়া আবর্তের সৃষ্টি করিতেছে; এখনও হৃদয়-অরণ্যের মধ্যেই কবি ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছেন।

এই অনুকরণের পর্যায় তিনি অতিক্রম করিলেন "সন্ধ্যা-সংগীতে", যদিও অবরুদ্ধ অবস্থাটা সেখানে একেবারে কাটিয়া যায় নাই। "সন্ধ্যা-সংগীতে"ই সর্বপ্রথম কবি অন্য কবিদের রচিত 'কবিতার শাসন হইতে চিরমুক্তি লাভ করিলেন,' তাঁহার 'মনের মধ্যে ফাঁকা একটা আনন্দের আবেগ আসিল'। এই যে অন্য কবিতার শাসন হইতে মুক্তি, এই মুক্তিই ক্রমশ তাঁহাকে মনের অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তির দিকে, হৃদয়-অরণ্য হইতে মুক্তির দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। খানিকটা মুক্তিলাভ "সন্ধ্যা-সংগীতে" ঘটিল বটে, কিন্তু যথার্থ মুক্তিলাভ ঘটিল "সন্ধ্যা-সংগীত" অতিক্রম করিয়া "প্রভাত-সংগীতে"। সেই জন্য মোহিতবাবু-সম্পাদিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে "সন্ধ্যা-সংগীতে"র

কবিতাগুলিকে যে 'হৃদয়-অরণ্য' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, তাহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না।

কারণ, "সন্ধ্যা-সংগীতে"ও কবির ভাব ও কল্পনা অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট, এখনও 'ভাবহীন বস্তুহীন' কল্পলোকের রাজত্বই চলিতেছে। দুঃখ-বিলাস এখনও কবিকে পরিত্যাগ করে নাই।

কিন্তু "সন্ধ্যা-সংগীতে"র ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গি নূতন ; কবির পূর্ববর্তী কবিতাগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কাব্য-রচনার যে-রীতি ও সংস্কারের মধ্যে কবি এতকাল আবদ্ধ ছিলেন তাহা এখন খসিয়া পড়িয়া গেল, এবং তিনি নিজস্ব রীতি ও কলা-কৌশলের সন্ধান পাইলেন। একটা স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার মধ্যে তাঁহার কাব্য মুক্তি পাইল। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই এই মুক্তির আবেগানন্দ সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।

"* * * বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলীতে বর্জন করা হইয়াছে—কেবল সন্ধ্যা-সংগীতে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা [মোহিতবাবু-সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থাবলীর] হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

"* * * যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্য রচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে সব কবিতা ভালবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি, তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল।

"* * * দুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।

"* * * এই সংকীর্ণতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন একটা খালের মতো সিধা চলে না—আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানামূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম কিন্তু এখন লেশমাত্র সংকোচ বোধ হইল না।

"বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে-ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রা মূলক * * *। তিনমাত্রা জিনিসটা দুইমাত্রার মতো চৌকা নহে, তাহা গোলার মতো গোল, এইজন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়, তাহার এই বেগবান গতির নৃত্য যেন ঘন ঘন ঝংকারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। * * * সন্ধ্যা-সংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিলাম।

"* * * কোনো প্রকার পূর্ব সংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে-জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। * * * হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম আমার হাতে শৃঙ্খল পরান নাই।

"* * * কাব্য-হিসাবে সন্ধ্যা-সংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ, ভাষা, ভাব, মূর্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ২০৮-১২ পৃঃ)

যাহা হউক, এইটুকু বোঝা গেল, ছন্দের দিক হইতে, বহিরঙ্গের দিক হইতে "সন্ধ্যা-সংগীতে"ই কবির চিত্ত পূর্বসংস্কার হইতে মুক্তি পাইল, কবি নিজেকে নিজে আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু হৃদয়-অরণ্য হইতে মুক্তিলাভ এখনও ঘটিল না। "সন্ধ্যা-সংগীতে"র কবিতাগুলি পাঠ করিলেই দেখা যাইবে, কবির সমস্ত চিত্ত ব্যথাভারাক্রান্ত, অজানা দুঃখভারে পীড়িত। কবিতাগুলির নামই তাহার প্রমাণ—'তারকার আত্মহত্যা', 'আশার

নৈরাশ্য', 'পরিত্যক্ত,' 'সুখের বিলাপ', 'দুঃখ আবাহন,' 'অসহ্য ভালোবাসা', 'হলাহল', 'পরাজয় সংগীত' ইত্যাদি। 'সন্ধ্যা' কবিতায়—

ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়।
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়।

অথবা 'আশার নৈরাশ্য' কবিতায়—

বলো, আশা বসি মোর চিতে,
'আরো দুঃখ হইবে বহিতে,
হৃদয়ের যে-প্রদেশ হয়েছিল ভগ্নশেষ
আর যারে হত না সহিতে
আবার নূতন প্রাণ পেয়ে
সেও পুন থাকিবে দহিতে।'

অথবা 'পরিত্যক্ত' কবিতায়—

চলে গেল সকলেই চলে গেল গো
বুক শুধু ভেঙে গেল দলে গেল গো।

অথবা 'দুঃখ আবাহন' কবিতায়—

আয়, দুঃখ, আয় তুই
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ
হৃদয়ে আয়রে তুই হৃদয়ের ধন।

যে দুঃখ-বিলাসের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই "সন্ধ্যা-সংগীতে"র সমস্ত কবিতার সুর; কিন্তু ইহাকে শুধু দুঃখ-বিলাসই বা কি করিয়া বলি? অস্পষ্টতার একটা বেদনা আছে; অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি মনের মধ্যে ব্যথার আবর্ত ঘোলাইয়া তোলে। ইহা শুধু বিলাস মাত্র নয়; ইহা মনের একটা বিশেষ অবস্থায় সত্য, এবং সেই হেতু ইহার মূল্যও আছে। "সন্ধ্যা-সংগীতে"র

"* * * মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কিনা মূল্য নাই বলিয়া তর্ক করা চলিতে পারে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না? কেন না কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়—ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। অতএব হৃদয়ের অব্যক্ত আকুতিকে ব্যক্ত করায় পাপ নাই—যত অপরাধ ব্যক্ত করিতে না পারার দিকে। মানুষের মধ্যে একটি দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে-মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভালো করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ায় বেদনায় মানস প্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না—ইহার বর্ণনা নাই—এইজন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে—তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ

কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যা-সংগীতে যে-বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। * * *"

যাহাই হউক, "সন্ধ্যা-সংগীতে"র শেষের কয়েকটি কবিতায় দেখা যাইতেছে, মনের এই অবস্থার সঙ্গে কবিচিত্তের একটা সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। কবি এই ব্যথা-ভারাক্রান্ত জীবন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 'দুঃখের কঠোরতা' মাঝে মাঝে ঘুচিতেছে, মাঝে মাঝে মন শান্ত হইতেছে, বিহঙ্গের গান, তটিনীর কথা, 'বসন্তের কুসুমের মেলা' মাঝে মাঝে ভাল লাগিতেছে, অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে মন মাঝে মাঝে মুক্ত হইয়া বাহিরের জগতের স্পর্শ লাভ করিতেছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে সব ঢাকিয়া যাইতেছে। এই দুঃখময়ীকে আর তিনি চাহেন না, অস্পষ্টতা অপরিস্ফুটতার বেদনায় ভাবাক্রান্ত দিনগুলি আর তাঁহার ভাল লাগে না, তিনি এইবার বহির্জগতের স্পর্শলাভের জন্য ব্যগ্র। দুঃখময়ীকে তিনি বিদায় দিতে চাহিতেছেন,—

যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিও না—নিও না কেড়ে
নিও না নিও না মন মোর
সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিও না মোরে,
ছিঁড়ো না এ প্রাণের ডোর।
আবার হারাই যদি এই গিরি, এই নদী,
মেঘ বায়ু কানন নির্ঝর,
আবার স্বপন ছুটে একেবারে যায় টুটে,
এ আমায় গোধূলির ঘর,
আবার আশ্রয় হারা ঘুরে ঘুরে হই সারা
ঝটিকার মেঘ খণ্ড সম,
দুঃখের বিদ্যুৎফণা ভীষণ ভুজঙ্গ এক
পোষণ করিয়া বক্ষে মম—
তা হলে এ জনমে নিরাশ্রয় এ জীবনে
ভাঙা ঘর আর গড়িবে না
ভাঙা হৃদি আর জুড়িবে না।

বারবার কবি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আর এই দুঃখময়ীর কাছে পরাজয় তিনি স্বীকার করিবেন না, বারবার তাহার প্রতিজ্ঞা টুটিতেছে। তবু প্রাণপণ প্রয়াস করিয়া বাচিতেই হইবে, এইবার ফিরিয়া জগতের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কবি নিজেকেই নিজে বলিতেছেন,—

জাগ জাগ জাগ ওরে গ্রাসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া
আকাশ-গরাসী তার কায়া।
গেল তোর চন্দ্র সূর্য গেল তোর গ্রহ তারা,
গেল তোর আত্ম আর পর,
এই বেলা প্রাণপণ কর।
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিসনে আর
যাহা পাস আঁকড়িয়া ধর
সম্মুখে অসীম পারাবার। ("সন্ধ্যা-সংগীত")

'সংগ্রাম সংগীত' কবিতায় এই ভাব আরও প্রবল হইয়াছে, সংগ্রামের সংকল্প জাগিয়াছে মনে।*

হৃদয়ের সাথে আজি
করিব রে করিব সংগ্রাম।
এতদিন কিছু না করিনু
এত দিনে বসে রহিলাম
আজি এই হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম। ("সন্ধ্যা-সংগীত")

এই সংগ্রামে কবির চিত্ত মথিত হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি জয়ী হইলেন। তাহার সংবাদ পাওয়া গেল "প্রভাত-সংগীতে"।

সূচনাটা আরম্ভ হইল "সন্ধ্যা-সংগীতে"র শেষের দিক হইতেই—হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রাম যখন আরম্ভ হইল তখনই সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়িয়া গেল, একটা নূতন চিত্তজগতের প্রথম অরুণোদয় দেখা দিতেছে। "প্রভাত-সংগীতে"র প্রথম কবিতা "আবাহন সংগীত"; এই কবিতাটির প্রথম দিকে "সন্ধ্যা-সংগীতে"র সুর ধ্বনিত হইতেছে,—

নিজের নিশ্বাসে কুয়াশা ঘনায়ে
ঢেকেছে নিজের কায়া,
পথ আঁধারিয়া পড়েছে সম্মুখে
নিজের দেহের ছায়া

* * *

মুখেতে রয়েছে আঁধার পুঁজিয়া
নয়নে জ্বলিছে বিষ
সাপের মতন কুটিল হাসিটি
লুকানো তাহার বিষ। ("প্রভাত-সংগীত")

কিন্তু শেষের দিকে কবি এক নূতন জগতের আহ্বান শুনিতে পাইতেছেন, বিশ্বজীবন, তাঁহাকে ডাক দিতেছে,—

ওরে শোন ওই ডাকিছে সবাই
বাহির হইয়া আয়। ("প্রভাত-সংগীত")

প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া "একটি একটি করিয়া সন্ধ্যা-সংগীত লিখিতেছি, এমন সময় আমার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা কী উলট-পালট হইয়া গেল।" এই উলট-পালটটাই "সন্ধ্যা-সংগীত" ও তাহার পূর্ববর্তী কবিজীবন হইতে "প্রভাত-সংগীত" ও তাহার পরবর্তী কবিজীবনের যে সুগভীর পার্থক্য তাহার কারণ; তবে এই উলট-পালট 'হঠাৎ' হয় নাই, একদিনে হয় নাই। আমি এই একটু আগেই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, মনের অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার একটা প্রবল প্রয়াস "সন্ধ্যা-সংগীতে"র শেষের দিকেই আরম্ভ হইয়াছে, এবং একটির পর একটি কবিতায় চিত্তের এই সংগ্রাম অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 'কোথা গো প্রভাত রবি-কর' বলিয়া "সন্ধ্যা-সংগীতে"র শেষের দিকে একটা ক্রন্দন 'আমি-হারা' কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে, অন্যান্য কবিতায়ও আছে; ইহার অর্থ এই যে, প্রভাতের রবির কর একদিন প্রাণে আসিয়া প্রবেশ করিবে, কবি

* "সেই সময়কার একটি গদ্যেও এই ভাবের আভাস পাই। প্রবন্ধটির নাম আত্মসংসর্গ।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী" বিশ্বভারতী, ১ম খণ্ড, ১২৪ পৃঃ)

তাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছেন—তারপর সেই দিনটি সত্যই আসিল, সে আনন্দের আবেগ কবি কিছুতেই আর নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, চমকিত হইয়া গাহিয়া উঠিলেন

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর। (প্রভাত-সংগীত)

"প্রভাত-সংগীতে"র (১২৮৯—৯০) দ্বিতীয় কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'; এই কবিতাটিতেই "প্রভাত-সংগীতে"র কবিজীবনের মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। মোহিতবাবু-সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থাবলীতে এই কবিতাটিকে যে 'নিষ্ক্রমণ' বিভাগে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহার ইঙ্গিত সার্থক। "সন্ধ্যা-সংগীতে"র হৃদয়-অরণ্য হইতে কবির নিষ্ক্রমণ লাভ যে ঘটিল তাহার পরিচয় আমরা পাইলাম 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। রবীন্দ্র-কাব্যে এমন কতকগুলি বিশেষ কবিতা আছে যাহা বিশেষভাবে কবিজীবনের এক একটি নূতন অধ্যায়ের সূচক; 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' তেমন একটি কবিতা। মনের কোন্ অবস্থা হইতে এই কবিতাটির এবং "প্রভাত-সংগীতে"র অন্যান্য কবিতার সৃষ্টি হইল তাহা কবি নিজেই অতি সুন্দর করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

"একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্ণের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেওয়ালগুলি পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল একি কেবল সায়াহ্নের আলোক-সম্পাতের একটি যাদুমাত্র? কখনই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে—আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা কিছুতে দেখিতে, শুনিতেছিলাম, সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমিই সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। * * * এমন সময় আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম তাহা আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই। সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ এবং সৌন্দর্য সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। * * * আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত, সকলেই যেন নিখিল-সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গ-লীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। * * *

"সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এখন মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটি সমষ্টিকে দেখিতাম। * * * এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,—

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

"আরো কিছু অধিক বয়সে, প্রভাত-সংগীত সম্বন্ধে একটা পত্র লিখিয়াছিলাম, সেটার এক অংশ এখানে উদ্ধৃত করি।—

"জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্ব প্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়। * * * ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায় মনটা যথার্থ কি চায় এবং কি চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়-বাষ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন করে জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোন কিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়। প্রভাত-সংগীতে আমার অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেইজন্যে ওটাতে আর কোন কিছুর বাছবিচার নেই।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ২২৬-৩৬ পৃঃ)

এই নূতন অভিজ্ঞতা হইতে "প্রভাত-সংগীতে"র সৃষ্টি। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, হৃদয়-অরণ্যের অন্ধকার হইতে, কৈশোরের একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ভাববিলাস হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া কবি বস্তুময় ভাবময় সত্য ও সার্থক বিশ্বজীবনের আনন্দানুভূতির জগতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উত্তর-কালে তাহার কবিমানস যে বিপুল জগতের রস ও রহস্যের মধ্যে স্বেচ্ছাবিহার করিবে সে-জগতের সিংহদ্বার তিনি অতিক্রম করিলেন। "প্রভাত-সংগীতে"র কবিতাগুলি বিচিত্র বিপুল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ভবিষ্যৎ তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিল, সবেগে সবলে অতীত জীবনের সমস্ত কুজ্ঝটিকা ছিন্ন-ভিন্ন দীর্ণ কীর্ণ করিয়া। প্রথম যৌবনের মুক্তির আবেগ হইতে উত্থিত এই কবিতাগুলিতে অত্যুক্তি যথেষ্ট, মানসিক স্বাস্থ্যের উদ্দামতা সুস্পষ্ট, নবদীক্ষার উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ; সেই হিসাবে কবিতাগুলি কাব্য-হিসাবে কতকটা দুর্বল। কবি এখনও প্রকৃত স্রষ্টা হইয়া উঠেন নাই; সৃষ্টির আবেগ শুধু তাহার মনে জাগিয়াছে; বিপুল একটি কবিপ্রাণ প্রথম আলোর স্পর্শে শুধু উদ্বেলিত হইয়াছে মাত্র, সত্য স্থির গাম্ভীর্য লাভ করিতে পারে নাই।

'আহ্বান সংগীত' কবিতাটিতে এই নূতন অভিজ্ঞতার প্রথম সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অতীতের দুঃখভারাক্রান্ত কুয়াশাচ্ছন্ন জীবন একান্ত মিথ্যা, এই বোধ তাহার মনে জাগিয়াছে; কবিকে কে যেন বলিতেছে,

আর কতদিন কাটিবে এমন
সময় যে চলে যায়।
ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই
বাহির হইয়া আয়!

তারপর একদিন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হইয়া গেল। সেদিন কবি নিজেকে আর সংবরণ করিতে পারিলেন না, কোনই 'বাছবিচার' আর রহিল না। শুধু কথায়ই যে তাহা প্রকাশ পাইল, তাহা নয়, কবিতার ছন্দেও তাহা ফুটিয়া উঠিল, যেমন উদ্দাম উচ্ছ্বসিত বল্গাবিহীন আবেগ, যেমন বর্ণ ও বর্ণনার আতিশয্য, তেমনই উদ্দাম উচ্ছ্বসিত ছন্দ।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান

না জানি কেন রে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,

ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

* * *

সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন?
একটি পাখির আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন।

* * *

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।

('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', "প্রভাত-সংগীত")

তারপর 'প্রভাত-উৎসব', 'অনন্ত জীবন', 'অনন্ত মরণ', 'পুনর্মিলন', 'প্রতিধ্বনি', 'মহাস্বপ্ন', 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' প্রভৃতি কবিতায় এই কথাটাই বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি কবিতায় (যেমন 'অনন্ত জীবন', 'অনন্ত মরণ', 'প্রতিধ্বনি', 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়') কবির একটি নূতন দিক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তাহা তাঁহার সুগভীর বিজ্ঞান-বোধ। বর্তমান জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে পুরাণ গল্পের একটা অপূর্ব সামঞ্জস্যের মধ্যে কবির প্রাণ একটা আশ্রয় সৃষ্টি করিয়াছে; সৃষ্টি ও জীবন-রহস্য সম্বন্ধেও একটা সুগভীর দৃষ্টি এই কবিতা কয়টির ভিতর সুস্পষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে, কবি যে নিজেকে নিজে খুঁজিয়া পাইয়াছেন, নিজের বোধ যে জাগিয়াছে, একটা নূতন জগতে যে তিনি জাগিয়াছেন সেই কথাটাই এই কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে ধরা পড়ে। কবি যে বলিতেছেন, বিশ্বজগতের খণ্ড খণ্ড দৃশ্যকে, বস্তুকে 'আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম', সেই কথাটাই এই কবিতাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। 'পুনর্মিলন' কবিতাটি অতীতের স্মৃতি বিজড়িত; সেই স্মৃতির সঙ্গে বর্তমান জীবনের যোগ তিনি সন্ধান করিতেছেন। একদিন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয় নামক এক বিশাল অরণ্যে তিনি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন; "প্রভাত-সংগীতে" আসিয়া আবার প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার পুনর্মিলন ঘটিয়াছে—এই কথাটিই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পর "জীবনস্মৃতিতে"ও তাহার পুনরুক্তি করিয়াছেন।

"আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরে নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। * * * তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল, তখন বাহিরের জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে বিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল—চেতনা তখন আমাদের ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। * * অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধদ্বার জানিনা কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম, তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতার পরিচয় পাইলাম। * * এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাত-সংগীতে যখন আবার পাইলাম, তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল।........." ("জীবন-স্মৃতি," বিশ্বভারতী, ২৩৬-৩৮ পৃঃ)

'প্রতিধ্বনি' কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই "জীবনস্মৃতি"তে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন ("জীবনস্মৃতি," বিশ্বভারতী, ২৩১—৩৫ পৃঃ)। অতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই।

আসল কথা এই যে চিত্তের ভিতর কতকগুলি নূতন ভাব তাহাদের সমস্ত নূতন আবেগ লইয়া উপস্থিত, কিন্তু যে ভাষা ও ছন্দের সাহায্যে নিয়ম সংযমের ভিতর তাহাদের বাঁধিয়া একটা সার্থক রূপ দিতে পারা যায় তাহা এখনও কবির আয়ত্ত হয় নাই। এক কথায় ভাব রসমূর্তি পরিগ্রহ করে নাই; কাজেই "প্রভাত-সংগীতে"র রচনা অপরিস্ফুট; মনন-ক্রিয়ার কিছু কিছু পরিচয় কোনও কোনও কবিতায় আছে, কিন্তু তাহা অপরিণত; সুতরাং ভাব যাহাই হউক কাব্য হিসাবে তাহাদের মূল্য খুব বেশি নয়। বস্তুত, কবি নিজেই বলিয়াছেন, "কড়ি ও কোমলে"র পূর্বে কাব্যের ভাষা তাঁহার কাছে ধরা দেয় নাই।

যাহাই হউক, "প্রভাত-সংগীতে" একটা পর্ব শেষ হইয়া গেল। শৈশব হইতে যে হৃদয়ারণ্যের মধ্যে কবি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার নিষ্ক্রমণ লাভ ঘটিল; বাহিরের বিচিত্র এই বিশ্বজগতের অর্গল তাঁহার নিকট মুক্ত হইল, এবং প্রথমটায় সদ্য মুক্তির আনন্দ উচ্ছ্বাসাতিশয্যের ভিতর দিয়া নিজেকে যেন কতকটা অতিমাত্রায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। এখন হইতে কবিজীবনের নূতন পালা, নূতন পর্যায় আরম্ভ হইবে; একটির পর একটি করিয়া কবি নিজের সৃষ্টিকে নিজেই বারংবার অতিক্রম করিয়া যাইবেন। সত্য ও সার্থক কবিজীবন এখন হইতেই আরম্ভ হইবে, এবং এক এক নূতন ভাবপর্যায়ের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-মানসকে স্ফুট হইতে স্ফুটতর করিবেন।

তিন

ছবি ও গান	(১২৯০)
কড়ি ও কোমল	(১২৯৩)
মানসী	(১২৯৭)
চিত্রাঙ্গদা	(১২৯৯)

যে বৃহত্তর বিশ্বজীবনের সিংহদ্বারের প্রবেশমুখে "প্রভাত-সংগীত" রচিত হইয়াছিল, সেই বিশ্বজীবনের সঙ্গে কবিমানসের নিবিড়তর পরিচয় ধীরে ধীরে শুরু হইল "ছবি ও গান" হইতে। ইহার কিছু দিন আগে কারোয়ারের সমুদ্রতীরে আসিয়া কবি "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামে একটি কাব্য-নাটিকা রচনা করিয়াছেন। এই নাটিকাটি কথার তুলিতে আঁকা ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়; টুকরা টুকরা ছবি যেন একটি মালায় গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। "ছবি ও গান"ও ঠিক এই কথার রেখায় টানা ছবি। এই রচনাগুলিও আরম্ভ হইয়াছিল কারোয়ারের সমুদ্রতীরেই। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া

"চৌরংগীর নিকটবর্তী সারকুলার রোডের একটি বাগান বাড়িতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বসতি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতালার জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার বড় ভালো লাগিত, সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো মনে হইত।

"নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনা পরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু না, এক একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা।

"* * নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই "ছবি ও গান"এ আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন সাদা কথাকেও গভীর করিয়া তোলে, তেমনি কোন একটা সামান্য উপলক্ষ লইয়া সেইটিকে হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা "ছবিও গান" এ ফুটিয়াছে। না, ঠিক তাহা নহে। নিজের মনের তারটা যখন সুরে বাঁধা থাকে তখনই বিশ্ব-সংগীতের ঝংকার সকল জায়গা হইতে উঠিয়া তাহাতে অনুরণন তোলে। সেইদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরের কিছু তুচ্ছ ছিল না। * * *" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ২৫১—২৫৩ পৃঃ)

"ছবি ও গানে"র অধিকাংশ কবিতা বাহিরে যাহা কিছু কবি দেখিতেছেন তাহাকে কথার রেখায় ধরিয়া এক একটি ছবি রচনার চেষ্টা, কবির নবজাগ্রত চৈতন্যের প্রথম চিত্রলিপি। শুধু দৃষ্টিভঙ্গিমার নূতনত্বে নয়, ছন্দকৌশলের দিক হইতেও কবি নূতন ক্ষমতা অর্জন করিয়াছেন; একটা স্বতঃউচ্ছ্বসিত আনন্দও কবিতাগুলির মধ্যে সুপরিস্ফুট। উনত্রিশ বৎসর বয়সে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট একটি পত্রে কবি "ছবি ও গান" সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

"* * * আমার "ছবি ও গান" আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম, তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ, এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভব করেছ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। * * * আমার সমস্ত শরীরে মনে নব যৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল। * * * কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিমাণ কিছু ছিল না। * * * সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনও আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। "ছবি ও গান" পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে উঠে, এমন আমার কোনো পুরানো লেখায় হয় না। * * *" (৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭। ২১ মে ১৮৯০; সবুজপত্র, ১৩২৪, শ্রাবণ, ২৩৬—৩৯ পৃঃ)

জীবন-সায়াহ্নে কবি "ছবি ও গান" সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন; এ-মন্তব্যের সঙ্গে পাঠকের দ্বিমতের কোন কারণ নাই।

"এটা বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবে মিলেছে। ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনির্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ বকে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো-আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে, কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয়নি তো।

"কবি সংসারের ভিতরে তখনো প্রবেশ করেনি, তখনো সে বাতায়ন-বাসী। দূর থেকে যার আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের রেশ মিলিয়ে দেয়। এর কোনো-কোনোটা চোখে দেখা এক টুকরো ছবি পেনসিলে আঁকা, রবারে ঘষে দেওয়া, আর কোনো কোনোটা সম্পূর্ণ বানানো। মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয়নি। কিন্তু সহজ হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেইজন্যে চলতিভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষা ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হলো। ছবি ও গান, কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, "ছবি ও গান" উপলক্ষে কবির মন্তব্য, ১০৪ পৃঃ)

কিন্তু বসিয়া ছবি দেখা, টুকরা টুকরা করিয়া কথায় ছবি ও গানের মালা গাঁথিয়া তোলা বোধ হয় মনকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছিল না। বৃহত্তর সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা মনের মধ্যে আবেগের সৃষ্টি করিতেছিল। এই চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল গল্পে প্রবন্ধে মসীযুদ্ধে ও বিদ্রূপ রচনায়। মানব-জীবনের সকল দিক দিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিবার একটি আকুলতা মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে; এখন আর মন শুধু-জানালার ধারে বসিয়া আপন মনে বিচিত্রদৃশ্যের ছবি আঁকিয়াই তৃপ্ত থাকিতে চাহিতেছে না। ইতিমধ্যে দুই-দুইটা মৃত্যু আসিয়া কবির জীবনে একটা নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন অনুভূতি দান করিয়া গেল; জীবনের সঙ্গে কবির একটা গভীর পরিচয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়া গেল। কিছুদিনের জন্য একটা বৈরাগ্য কবিচিত্তকে অধিকার করিয়াছিল।

"সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীর রূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারে চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটা মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন; মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ২৭৩ পৃঃ)

যেমন করিয়াই হউক, এই মৃত্যুর ভিতর দিয়া কবি বৃহত্তর জীবন-লোকে উত্তীর্ণ হইলেন; 'উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘর' তাঁহাকে 'ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডি'র ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল। এখন হইতে মানবজীবনের বিচিত্র রঙ্গলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতে আরম্ভ করিল; "কড়ি ও কোমলে"র নানান কবিতার ভিতর দিয়া এই কথাটাই নানা প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে। মানব-জীবনের বিচিত্র লীলা রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার এবং তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা "কড়ি ও কোমলে"র কবিতাগুলির মর্মকথা এবং এই মর্মকথাটি ব্যক্ত হইয়াছে গ্রন্থের প্রথম কবিতাগুলিতেই।

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। ('প্রাণ')

সত্যই, কবির কবিতা এখন বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বস্তুবিশ্বের প্রতি উন্মীলিত নয়ন লইয়া মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—

"এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পরে দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু মাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, শানাইয়ের বাঁশিতে বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।

"কড়ি ও কোমল" মানুষের জীবন-নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্য সভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।" ("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ২৭৮—৭৯ পৃঃ)

কিন্তু মানুষের জীবন-নিকেতনের রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য কবিচিত্তে এমন আকুলতা জাগিল কেন? কবি নিজেই বলিতেছেন,—

"* * যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল সুখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলা ঘরের প্রাণটা কাঁদে।

"যে মৃদু নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্নতন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে সেখানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে এমন একটা অবসাদে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অবসাদের জড়িমা হইতে বাহির হইবার জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। * *

"মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম দূরবর্তী। কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, * * তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, * * তাহা কেবলি জীবনের উপর চাপিয়া চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

"* * * আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ।

তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রং নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

"এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেশির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মত হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙা গড়া, কত জয় পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন।"

("জীবনস্মৃতি", বিশ্বভারতী সং, ২৮২—৮৫ পৃঃ)

"কড়ি ও কোমলে"র প্রথম কবিতা তারিখ হিসাবে প্রথম রচনা নয়; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই কবিতাটির মধ্যে "কড়ি ও কোমলে"র মর্মবাণীটি ব্যক্ত হইয়াছে, এবং এই কারণেই সম্পাদন-কর্তা আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় ইহাকেই পুরোভাগে স্থান দিয়াছিলেন। পরিবারের মধ্যে উপরি উপরি দুইটি মৃত্যু কবিকে গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছিল, একথা আগেই বলিয়াছি; কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি তাঁহার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে শুধু কিছু দিনের জন্যই। সুখ হউক, দুঃখ হউক যে কোন ভাব অথবা অনুভূতি হউক কোনও কিছুই কবিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে না; তিনি যে তাহা ভুলিয়া যান, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কবিচিত্ত তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায়। কবি জীবনের কোন অবস্থাকেই চরম ও পরম বলিয়া স্বীকার করেন না। উত্তর-জীবনেও মৃত্যুশোক বার বার তাঁহার জীবনকে আঘাত করিয়াছে, কিন্তু নিদারুণ দুঃখও তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই; একটা অপার অগাধ নির্লিপ্ততার মধ্যে তাঁহার চিত্ত সহজেই যেন আশ্রয় খুঁজিয়া পায়, মৃত্যুকে বার বার তিনি অস্বীকার করেন, বার বার শুধু জীবনকেই ফিরিয়া পাইবার জন্য। সেই জন্যই "কড়ি ও কোমলে"র কবিতাগুলিতে বার বার জীবনের আহ্বানই শুনিতে পাওয়া যায়, মৃত্যুকে, পুরাতনকে বার বার তিনি পিছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিতেছেন,—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই। ('প্রাণ')

অথবা,

হেথা হতে যাও, পুরাতন,
হেথা হতে যাও, পুরাতন,
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে। ('পুরাতন')

অথবা,

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চলে
রবির কিরণ সুধা আকাশে উথলে।
স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন প্রেমের মিলনে কাঁপে
আনন্দ বিদ্যুৎ-আলো নাচে। ('যোগিয়া')

কিন্তু এই জীবনের পথ মৃত্যুকে এড়াইয়া নয়; মৃত্যুর নিবিড় ভাবকল্পনা লইয়া। বস্তুত, নিবিড় মৃত্যুভাবনার প্রথম সূচনা এই "কড়ি ও কোমল" গ্রন্থেই, এবং উত্তর-জীবনে নানা ভাবে নানা রূপে সেই ভাবনার প্রকাশ।

যাহাই হউক, মানবের মাঝে, 'জীবন্ত হৃদয়ের মাঝে' কবি যেদিন স্থান পাইতে চাহিলেন, তখনই খণ্ড খণ্ড জীবনের মূল্য তাঁহার কাছে আর কিছু রহিল না; জীবনের সমগ্রতার মধ্যে যে বিচিত্র-রসলীলা দিকে দিকে উৎসারিত হইতেছে, তাহাই তাঁহার কবিচিত্তকে একান্ত করিয়া টানিতে লাগিল। "কড়ি ও কোমলে" সেইজন্য জীবনের এই বিচিত্রতার সন্ধান পাওয়া যায়, যৌবনের বিচিত্র স্বপ্ন, প্রেম, প্রকৃতি, নারী, সৌন্দর্য-রহস্য, শিশুজীবন, স্বদেশ, জীবনের গভীর তাৎপর্য কিছুই কবিচিত্তের স্পর্শ হইতে বাদ পড়ে নাই। 'বঙ্গবাসীর প্রতি', 'আহ্বানগীত' প্রভৃতি কবিতায় স্বদেশ সম্বন্ধে যে গভীর বেদনা ও অনুরাগ এবং যে অনন্যসাধারণ ভাবের ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বাংলা ভাষায় এই জাতীয় কবিতায় বিরল। বান্দোরা হইতে (ইন্দিরা দেবীর নিকট) লিখিত কয়েকটি পত্র-কবিতায় জীবনের গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে কবির ভাব ও ভাবনা ব্যক্তিগত আন্তরিকতার স্পর্শে অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু কি এই জাতীয় কবিতা, কি শিশু-জীবন সম্বন্ধীয় কবিতা, কি প্রেম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গান ও কবিতা, সর্বত্রই লাগিয়াছে কবির যৌবনস্বপ্নের স্পর্শ।

> আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
> ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।
> পরাণে পুলক বিকশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
> যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস।
> শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।
> মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল মুকুলে,
> কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
> যেন কোন উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে। ('যৌবন-স্বপ্ন')

এই যৌবন-স্বপ্নই কবিমানসকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করিয়াছে যাহার ফলে "কড়ি ও কোমলে"র কবিতাগুলিতে কবির সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রথম আভাস লক্ষ্য করা যায়; এজন্যই সকল ভাব, সকল রূপ, সকল রস দেখিতেছি, কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। এই যৌবন-স্বপ্নই কবিকে সৌন্দর্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে—সে-সৌন্দর্য নারীদেহে, সে-সৌন্দর্য প্রকৃতিতে, সে-সৌন্দর্য ভোগে ও মিলনে, প্রেমে ও বিরহে। ভুবনের প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি উন্মুক্ত প্রসারে এই সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হইতেছে বলিয়াই কবি মরিতে চাহেন না, মানুষের মাঝে তিনি বাঁচিয়া থাকিতে চান। এইজন্যই নারীদেহের সৌন্দর্য কবির কাছে তুচ্ছ ত নয়ই, বরং পরম রমণীয়, পরম উপভোগ্য, দেহের মিলনও পরম কাম্য। কারণ দেহের মিলন না হইলে ত দেহের আকর্ষণ হইতে মুক্তি নাই। কিছুদিন পরে লেখা একটি পত্রে কবি নিজেও বলিতেছেন,

> "* * * যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে—কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত—কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষে পাওয়া যায় না। * * *" ("ছিন্ন পত্র", বিশ্বভারতী)

তা ছাড়া যৌবনের প্রথম স্বপ্ন প্রথম আকাঙ্ক্ষাই ত ভোগের স্বপ্ন, ভোগের আকাঙ্ক্ষা; জীবন যদি সত্য হয়, যৌবন যদি সত্য হয়, তাহার ভোগাকাঙ্ক্ষাও সত্য, কামনা-বাসনাও

সত্য। 'স্তন', 'চুম্বন', 'বিবসনা', 'বাহু', 'দেহের মিলন', 'তনু', 'পূর্ণ মিলন', 'বন্দী' প্রভৃতি কবিতায় এই ভোগবাসনা সৌন্দর্যধারায় সিক্ত হইয়া অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে।

ফেল গো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল।
পর শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
সুর বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কোমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা। ('বিবসনা')

অথবা,

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ সুধায় করে পরান পাগল।

* * * * *

হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির। ('স্তন')

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা বিহার-ভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্তভূমি করেছে উজ্জ্বল।
ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
দেব-শিশু মানবের ঐ মাতৃভূমি। ('স্তন' ২)

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে।
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি-দিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন। ('দেহের মিলন')

প্রভৃতি কবিতায় সর্বত্রই একটা ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু এটিও লক্ষ্য করিবার যে এই ভোগাকাঙ্ক্ষাও কতকটা রোম্যান্টিক, যৌনাকর্ষণ হইতে ভাবগত আকর্ষণই প্রবল। বিবসনা নারীর দেহে তিনি 'লাজহীন পবিত্রতার' সন্ধান করিতেছেন, নারীর স্তন-সুমেরুকে কবি 'দেবশিশু মানবের মাতৃভূমি' বলিয়া কল্পনা করিতেছেন, দেহের সায়রের মধ্যে তিনি ডুব দিতে চাহেন হৃদয়কে স্পর্শ করিবার জন্য, তনুদেহের দিকে চাহিয়া কবির দৃষ্টি দূরে অতীত জীবনের স্মৃতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়—দেহের জন্যই দেহের আকর্ষণ কোথাও উদগ্র হইয়া দেখা দেয় না; ভোগ-বাসনাও যেন সৌন্দর্য-সৌরভের সঙ্গে মিশিয়া বাতাসে সঞ্চারিত হইয়া যায়, বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ হইতে চায় না। এই একান্ত রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উত্তর-কবিজীবনে "সোনার তরী",

"চিত্রা", "চৈতালী"তে আমরা দেখিব, এই একান্ত ভাবধর্মী রোম্যান্টিক দৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যকে একটি শুচিশুভ্র সংযম দান করিয়াছে। দীর্ঘ অভিসারের পর বার বার তিনি দেহসায়রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই দেহভোগাকাঙ্ক্ষাকে বৃহত্তর সৌন্দর্য-ভোগাকাঙ্ক্ষার মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, বস্তুদেহ ভাবদেহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এই রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিরই আর একটা দিক "কড়ি ও কোমলে"র অন্য কয়েকটি কবিতাতে দেখা যায়। কবির চিরবিরহী চিত্ত বাহুলতার বন্ধনে পূর্ণ মিলনের মধ্যেও যেন অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, একটা ঔদাস্য যেন কবিচিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে, দেহসম্ভোগের মধ্যে যেন তৃপ্তি নাই, বাসনার ফাঁদ হইতে কবিচিত্ত মুক্তি পাইতে চায়। দেহের পরিপূর্ণ মিলন ত দুরাশার স্বপ্ন মাত্র ('পূর্ণ মিলন'), বাহুপাশ-বন্ধন ত চিত্তের বন্দীদশা ('বন্দী'), দেহের মোহ, ভোগবাসনার মোহ কয়দিন থাকে, 'এ মায়া মিলায়' ('মোহ'), প্রেম যে ভোগবাসনার বিষনিশ্বাসে তিলে তিলে মরিয়া যায় ('পবিত্র প্রেম'), দেহসম্ভোগের কুসুম-শয়ন ত স্বপ্নরাজ্যের মরীচিকা, সে ত যে কোনও মুহূর্তে মিলাইয়া যায় ('মরীচিকা')—এ ভোগবাসনার জীবন হইতে কবিচিত্ত মুক্তি চাহে; জাগ্রত হৃদয়, বৃহত্তর জীবনের জন্য কবিচিত্তে আকাঙ্ক্ষা জাগে ('স্বপ্নরুদ্ধ', 'অক্ষমতা', 'জাগিবার চেষ্টা' প্রভৃতি কবিতা), স্বদেশের 'আহ্বান গীত', জীবনের গভীর সার্থকতার ইঙ্গিত তাহাকে আকর্ষণ করে, 'শেষ কথা'টি বলিবার জন্য মন তখন আকুল হইয়া উঠে। কত কথা ত বলা হইল, অসংখ্য আবেগ ও আকৃতি অসংখ্য ভাবে প্রকাশ করা হইল, তবু শেষ কথাটি যেন বলা হইল না।

মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
*　　*　　*　　*
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশার
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে,
*　　*　　*　　*
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।　　　('শেষ কথা')

কিন্তু শেষ কথা কি কিছু আছে; শেষ কথা যদি বলা হইয়া যাইত তাহা হইলে ত কবি কবেই নীরব হইয়া যাইতেন। "শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?"—পরবর্তী জীবনে কবি এই কথাই বার বার নানা ভাষায় বলিয়াছেন। এক ভাবপর্যায়ের সীমা শেষ হইয়া যায়, এই শেষের মধ্যে যে অশেষ আছে তাহা কবিকে নূতন পর্যায়ের সীমায় টানিতে থাকে; রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাস এই অশেষকে শেষ করিয়া প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টার ইতিহাস। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে, নানা বিচিত্র অনুভবের ভিতর দিয়া তিনি অসীমের, অরূপের, অশেষের বিচিত্র রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন, করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যতই তিনি বলিয়াছেন যত চেষ্টাই তিনি করিয়াছেন, শেষ কিছুতেই আর হয় নাই, হইবার নয়।

কিন্তু "কড়ি ও কোমলে"ও কবি স্ব-প্রতিষ্ঠ হইতে পারেন নাই; তাঁহার কাব্য এখনও সত্য ও সার্থক সৃষ্টি হইতে পারে নাই। ছন্দের উপর যথেচ্ছ অধিকার এখনও জন্মায় নাই। এই আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় লাভ ঘটিল "মানসী"তে। "মানসী"তেই তিনি সর্বপ্রথম

নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হইলেন, এবং তাঁহার প্রদীপ্ত কবিপ্রতিভার প্রথম উন্মেষ লক্ষ্য করা গেল। কি প্রেম, কি নিসর্গ, সব কিছু সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি তাহা এই সময় হইতেই একটা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিল, তিনি মানস-সুন্দরীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। "মানসী"র নিসর্গ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, সুতীব্র অনুভূতি, সুগভীর ভাবগাম্ভীর্য এবং অপূর্ব ছন্দসম্পদে সমৃদ্ধ। 'সিন্ধুতরঙ্গ', 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় যে ভাবও ধ্বনি গাম্ভীর্য, চিন্তার যে গভীরতা, মনের যে উন্মুক্ত প্রসার এবং যে সবল কল্পনার ঐশ্বর্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পূর্ববর্তী কোনও কবিতাতেই দেখা যায় না, এবং পরবর্তী কালে "সোনার তরী," "চিত্রা," "চৈতালী," "কল্পনা" "বলাকা" ও "পুরবী"তে এই গুণগুলিই বিচিত্র ও ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শব্দ নির্বাচনের ক্ষমতা, ধ্বনি ও ছন্দকে হাতের ক্রীড়নক করিয়া নিজের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, কথার তুলিতে ছবি আঁকিবার ক্ষমতা সমস্তই "মানসী"র অধিকাংশ কবিতায় অপূর্ব নৈপুণ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; 'কুহুধ্বনি', 'বধূ' 'অপেক্ষা', 'একাল ও সেকাল' প্রভৃতি কবিতা তাহার প্রমাণ। তাহা ছাড়া এই জাতীয় কবিতায় কবিহৃদয়ের যে সুগভীর সহানুভূতি, প্রকৃতির সঙ্গে যে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ প্রথম লক্ষ্য করা যায় তাহাই পরবর্তী জীবনে আরও ব্যাপক, আরও সমৃদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসকে অপরূপ সম্পদ দান করিয়াছে। বস্তুত, "মানসী"ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক কাব্যসৃষ্টি; এবং এই কাব্যেই উত্তর-জীবনের রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবপ্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তুগুলি ধরা পড়িয়াছে।'

"মানসী"র কবিতাগুলি ১২৯৪ বৈশাখ হইতে ১২৯৭ কার্তিকের মধ্যে লেখা এবং অধিকাংশ কবিতাই গাজিপুরের নির্জনবাসে রচিত। প্রথম কবিতা 'উপহার' ১২৯৭ বৈশাখের রচনা, কিন্তু এই কবিতাটিতেই "মানসী"র এবং পরবর্তী কবি-জীবনের মর্মবাণীটি ব্যক্ত হইয়াছে,—

নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিন রাত।
* * * * *
এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা। ('উপহার')

বিশ্ব-জীবনের তরঙ্গাঘাত প্রতিমুহূর্তে কবিচিত্তকে স্পর্শ করিতেছে, এবং তাহার ফলে যে বিচিত্র অনুভূতি জন্মলাভ করিতেছে, কবি তাহাকেই বাণীরূপ দান করিতেছেন— ইহাই রবীন্দ্র-কবিজীবনের ইতিহাস। এই বাণীরূপই তাঁহার মানসী-প্রতিমা। অনন্ত কাল ও অনন্ত বিশ্ব-জীবন রবীন্দ্র-কবিচিত্তের পটভূমি; তাঁহার কবিমানস খণ্ড বস্তুকে খণ্ড জীবনকে লইয়া সৃষ্টি সূচনা করে, কিন্তু মুহূর্তেই তাহা ব্যাপ্ত হইয়া যায় অনন্ত কালের মধ্যে, বিশ্বজীবনের অসীমতার মধ্যে,—

জগতের মর্ম হতে মোর মর্মস্থলে
আনিতেছে জীবন-লহরী। ('জীবন মধ্যাহ্ন')

অথবা

> বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন-কুহরে
> মঙ্গল আনন্দ ধ্বনি বাজে। ('জীবন-মধ্যাহ্ন')

ঠিক এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ কবিতায় যে উদার নিখিল ব্যাপ্তি, যে সুগভীর গাম্ভীর্য, যে সর্বানুভূতি ও বিশ্ববোধ লক্ষ্য করা যায়, এবং তাহার ফলে এই জাতীয় কবিতাগুলি যে রূপ ও রস-সমৃদ্ধি লাভ করে তাহা কবির প্রেমের কবিতায় অথবা দেশ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় না। "মানসী"তে এই তিন জাতীয় কবিতাই আছে, কিন্তু রসিক পাঠক তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, নিসর্গ কবিতাগুলির সঙ্গে অন্য জাতীয় কবিতাগুলির রসসমৃদ্ধির তুলনাই হইতে পারে না। পরবর্তী কবিজীবনে এই কথার আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। "মানসী"র প্রেমের কবিতাগুলিতে এবং পরবর্তী জীবনের প্রেমের কবিতায়ও প্রেমের বিচিত্র লীলারহস্যের পরিচয় যে নাই, তাহা নহে, কিন্তু যেহেতু সেই প্রেম কায়া-নৈকট্য হারাইয়া, বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, সেই হেতুই এই প্রেমের রসনিবিড়তা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহার ঘন মাধুর্য নিসর্গ সৌরভের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। মানবচিত্ত তাহাতে রসাবেশে মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু প্রেমাস্পদকে পাইবার অথবা ভোগ করিবার আগ্রহে উদ্বেল হইয়া উঠে না, ভাবলোকের আসঙ্গ লিপ্সায়ই প্রেম চরিতার্থতা লাভ করে। ঠিক এই কারণেই, কীট্স অথবা চণ্ডীদাসকে আমরা যে হিসাবে প্রেমের কবি বলি, রবীন্দ্রনাথকে সেই হিসাবে প্রেমের কবি বলিতে পারি না। অথচ যে দৃষ্টিভঙ্গির জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা রসনিবিড় হইয়া উঠিতে পারে না, সেই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তাঁহার নিসর্গ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি অপরূপ রসঘন মূর্তি লাভ করে। এই জাতীয় কবিতাগুলিতে যে মুহূর্তে বিশ্বের নিশ্বাস আসিয়া লাগে সেই মুহূর্তেই কবিতাগুলি অপূর্ব অনির্বচনীয় রূপলোকে রসলোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

এই নিসর্গ কথাটি কোনও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, শুধু প্রকৃতি বুঝিতেছি না। মানুষ, পৃথিবী, মানবজীবন, বিশ্বজীবন, সৌন্দর্য সমস্তই এই নিসর্গের অন্তর্গত, এবং ব্যাপক অর্থে প্রেমও। কিন্তু প্রেমের কবিতা বলিতে এখানে যাহা বুঝিতেছি তাহা শুধু আমাদের জড় জগতের নরনারীর দেহ-আত্মাকে লইয়া যে লীলা তাহাই বুঝিতেছি, এবং সেই অর্থেই শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে উপরের কথাগুলি প্রযোজ্য।

এই দেহ-আত্মাকে লইয়া প্রেমলীলার খুব গভীর পরিচয় যে "মানসী'র কবিতাগুলিতে আছে, এমন কথা বলা যায় না। 'ভুলভাঙা' 'বিরহানল,' 'বিচ্ছেদের শান্তি,' 'ক্ষণিক মিলন,' 'সংশয়ের আবেগ,' 'নারীর উক্তি,' 'পুরুষের উক্তি,' 'গুপ্তপ্রেম,' 'ব্যক্তপ্রেম,' 'নিষ্ফল প্রয়াস,' 'সুরদাসের প্রার্থনা বা আঁখির অপরাধ,' 'হৃদয়ের ধন,' 'পূর্বকালে,' 'অনন্ত প্রেম' প্রভৃতি কবিতায় এই প্রেমলীলার সহজ অথচ বিচিত্র অনুভূতির পরিচয় কবিচিত্তের তরঙ্গিত ভাবধারায় রূপান্তরিত হইয়া অপূর্ব গীতমাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'নিষ্ফল কামনা' এবং এই কবিতাটির মধ্যেই কবিচিত্তের রোম্যান্টিক ভাবকল্পনা যেন দানা বাঁধিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

> "বৃথা এ ক্রন্দন।
> বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা
> * * * *

বৃথা এ ক্রন্দন।
হায় রে দুরাশা,
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো—
হাসিটুকু কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু, প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কি দুঃসাহস।
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম,
পারিবি মিটাতে জীবনের অনন্ত অভাব?

* * *

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে, অতি সঙ্গোপনে
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে, জীবনে মরণে,
শত ঋতু আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি—
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান
ভালবাসো প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই। ('নিষ্ফল কামনা')

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলা সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা, ইহাই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি। ভোগবাসনা মানুষের মনে মোহ উৎপন্ন করে, মোহ হইতে জাগে বিভ্রম, এই বিভ্রম মানবের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে ম্লান করিয়া দেয়, বৃহতের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করে। কাজেই 'নিবাও বাসনা-বহ্নি'। প্রেম অনন্ত, নরনারীর দেহ-আত্মার লীলার মধ্যে তাহার খণ্ড অংশ মাত্র প্রকাশ পায়, তাহারই মধ্যে একান্ত ভাবে ডুবিয়া গেলে প্রেমের সমগ্রতা উপলব্ধি করা যায় না। এই খণ্ড প্রেম হইতে মুক্তি চাই; বাসনার আবেগ এবং মুক্তির কামনা এই দুইয়ের হর্ষে ও ব্যথায় কবিচিত্ত আন্দোলিত। অনন্ত প্রেম চাই, সেই প্রেমকে পাইতে হইলে নরনারীর দেহ-আত্মার লীলার শুধু সৌরভটুকু আহরণ কর, সৌন্দর্য-বিকাশটুকু দেখ, মধুটুকু পান কর, কিন্তু প্রেমাস্পদকে একান্ত করিয়া চাহিও না। খণ্ড প্রেমে তৃপ্তি পাইবে না, পাওয়ার জন্য ক্রন্দন বৃথা, 'বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা' 'জীবনের

অনন্ত অভাব' আমাদের এই খণ্ড প্রেম দ্বারা মিটান যায় না। এই কথাই, এই দৃষ্টিভঙ্গিই "মানসী"র কবিতাগুলিতে নানা ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। "কড়ি ও কোমলে" এই দৃষ্টিভঙ্গির আভাস আমরা পাইয়াছি; "মানসী"তে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল। অজিতবাবু সত্যই বলিয়াছেন,

"* * মানসীর প্রেমের কবিতাগুলিতে যদিও জীবনের খুব গভীরতায় পরিচয় আছে * * তথাপি সে প্রেম যে জীবনের সব নয়, তাহাকে যে চরম করিয়া তোলা চলে না, এমন একটি ভাব মানসীর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে বারংবার প্রকাশ পাইয়াছে।" (অজিতকুমার চক্রবর্তী, "রবীন্দ্রনাথ")

যে-দুইটি নরনারীর প্রেম চিরদিবসের অনন্ত প্রেমের মধ্যে অবসান লাভ করে, যে প্রেমের মধ্যে 'সকল প্রেমের স্মৃতি, সকল কালের সকল কবির গীতি' আসিয়া আশ্রয় লয়, যে প্রেমের মধ্যে আসিয়া মেশে নিখিলের সুখ, নিখিলের দুঃখ, নিখিলের প্রাণের প্রীতি, সেই দেহ-আত্মার প্রেম কতকটা নিবিড়তা হারাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

স্বদেশ এবং আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের অনুভূতি হইতেও "মানসী"র কয়েকটি কবিতা জন্মলাভ করিয়াছে। 'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', 'গুরু গোবিন্দ', 'নব বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ', 'ধর্ম-প্রচার' প্রভৃতি কবিতাগুলিকে এ পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। এই ধরনের কবিতা "কড়ি ও কোমলে"ও কিছু কিছু আছে। আমাদের খণ্ড-খণ্ড-করা ধীর মন্থর গতানুগতিক জীবনযাত্রার ছন্দ কবি-চিত্তকে কখনও আকর্ষণ করিতে পারে নাই; আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের মিথ্যা আড়ম্বর, কাপুরুষতা, চিত্তের দৈন্য, ভিক্ষার প্রবৃত্তি, মূঢ় নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতিও তিনি কখনও সহ্য করিতে পারেন নাই—নানা প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, বক্তৃতায় তিনি সর্বদা তাহা অকুণ্ঠচিত্তে ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেক সময় দেশবাসী তাহা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু কবি যাহা অনুভব করিয়াছেন, নির্ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। সমসাময়িক কাব্য-রচনায়ও তাহার ছাপ পড়িয়াছে। কিন্তু "মানসী"তে দেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবন সম্বন্ধে কবির গভীর দরদ ও সহানুভূতি এখনও সার্থক কল্পনা ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির মধ্যে আসন লাভ করিতে পারে নাই; এখনও শুধু তিনি লঘু বিদ্রূপ ব্যঙ্গের ভিতর দিয়াই আমাদের স্বদেশবাসীর ক্ষুদ্রতা নীচতা ত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তবু 'দুরন্ত আশা'র মধ্যে একটা সত্য ও গভীর অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কবিতাটির মধ্যে একটা দুঃখ-বরণের আকাঙ্ক্ষা, দুঃসাধ্য ব্রত-উদ্‌যাপনের আনন্দ বৃহত্তর জীবনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার একটা দুর্দম বাসনা, একটা সুস্থ সবল উন্মুখ অসভ্য জীবন-যাপন করিবার ইচ্ছা কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ১২৯২, ৩১এ জ্যৈষ্ঠের লেখা একটি পত্রেও এই ভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে ("ছিন্নপত্র," বিশ্বভারতী, ১৩৭ পৃঃ)।

"মানসী"র নিসর্গ কবিতাগুলির মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিতে হইল, কারণ, এই কবিতাগুলির ভিতরই রবীন্দ্রনাথের কবিমানস সত্য ও সার্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই কবিতাগুলিতে ছন্দ ও ধ্বনি-সম্পদ, শব্দচয়ন নৈপুণ্য, এবং কথার তুলিতে ছবি আঁকার ক্ষমতার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। রসিক পাঠক যাঁহারা 'একাল ও সেকাল', 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কবি যেন এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রাচীন যুগের নিসর্গমণিকোঠার রহস্য-কুঞ্চিকাটির সন্ধান আমাদের দিয়াছেন; কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, রামায়ণ-মহাভারতের জগৎ যেন মন্ত্রবলে আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে নূতন রসে ও ভাবে অভিষিক্ত হইয়া।

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী ('একাল ও সেকাল')

অথবা,

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়। ('বর্ষার দিনে')

অথবা,

"বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্"— ('বধূ')

অথবা,

প্রখর মধ্যাহ্ন-তাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনল-শ্বসনা। ('কুহুধ্বনি')

অথবা,

সকাল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়। ('অপেক্ষা')

অথবা,

আমি কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথ-নিবিড় চুলে। ('ভালো করে বলে যাও')

অথবা,

অকূল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন তরণী। ('বিদায়')

প্রভৃতি কবিতার যে শান্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য, যে করুণ কোমল সুকুমার শ্রী, নিসর্গের যে অনির্বচনীয় রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের অতুলনীয় সম্পদ, ইহাই রবীন্দ্র-কবিতার মূল ঐশ্বর্য।

কিন্তু নিসর্গের শান্ত মধুর কান্ত রূপ রচনাতেই রবীন্দ্র-প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নাই; তাহার রুদ্র রূপ, মমতাহীন, নিষ্ঠুর রূপও কবিচিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে, এবং পরবর্তী জীবনে নিসর্গের এই দিকটার যে পরিচয় "বলাকা" অথবা "পূরবী"তে দেখা যায়, তাহার প্রথম আভাস মানসীর 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'প্রকৃতির প্রতি', 'সিন্ধুতরঙ্গ' প্রভৃতি কবিতায় পাওয়া যাইতেছে। "মানসী"র এই জাতীয় কবিতাগুলিতেও কবির অদ্ভুত শব্দচিত্র রচনার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়; 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

"মানসী"তে দেখিতেছি, নরনারীর দেহ আত্মার লীলা, নিসর্গের বিচিত্র সৌন্দর্যমাধুর্য, স্বদেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবন সব কিছুই কবিচিত্তকে স্পর্শ করিতেছে, কিন্তু সব কিছুর ভিতরেই যেন কবিচিত্ত একটু ব্যথায় বেদনায় ভারাক্রান্ত। প্রেমাস্পদের হৃদয় যে শুধু দেহের মধ্যে ধরা যায় না, এই ভাবানুভূতি যে-সব কবিতায় প্রকাশ পাইতেছে, তাহার মধ্যে কোথায় যেন একটু বেদনাবোধ আছে; স্বদেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবনের যে সমস্ত ত্রুটি ও দৈন্যকে তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও একটু বেদনাবোধ প্রচ্ছন্ন আছে বই কি। নিসর্গ কবিতাগুলির মধ্যেও তাহা বাদ পড়ে নাই।

শুধু এই বেদনাবোধ নয়, যাহা কিছু তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতেছে, নরনারীর

দেহ-আত্মার লীলা, নিসর্গের কান্ত মধুর প্রেম, সব কিছু হইতে মুক্তি পাইবার একটা আকুলতা "মানসী"র কয়েকটি কবিতায় দেখা যায়। একটা বৃহত্তর জীবনের মধ্যে দুঃখবরণের জন্য, একটা দুর্দম উন্মুক্ত জীবনের জন্য ব্যাকুলতা 'দুরন্ত আশা' কবিতাটিতে সুস্পষ্ট, ইহা আগেই বলিয়াছি। যে প্রেম 'জীবনমরণময় সুগভীর কথা' বলিবার জন্য ব্যাকুল, সেই প্রেমও যেন কবিকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না ; নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যময় কাব্যময় জীবনের মধ্যে কবি আর আনন্দ পাইতেছেন না, এই সংকীর্ণ রুদ্ধ জীবন যেন তাঁহাকে পীড়িত করিতেছে। এই ধরনের বস্তুহীন ভাব-কল্পনার জীবনে কবি অতৃপ্ত, এবং এই অতৃপ্তি অনেক কবিতায়ই লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সব চেয়ে সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে 'ভৈরবী গান' কবিতাটিতে। বৃহত্তর জীবনের প্রখর দহন, নিষ্ঠুর আঘাত, পাষাণ কঠিন পথ তিনি কামনা করিতেছেন—অশ্রুসজল ভৈরবী গান আর তাঁহার ভাল লাগিতেছে না।

> ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
> নিঠুর আঘাত চরণে।
> যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন সরণে।
> যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
> সুখ আছে সেই মরণে। ('ভৈরবী গান')

কিন্তু "মানসী"তে যে দেহ-আত্মার প্রেমলীলায় কবি অতৃপ্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেই প্রেমলীলাই "চিত্রাঙ্গদা"র উপজীব্য। "চিত্রাঙ্গদা"র দেহসম্পর্কঘটিত নীতি-দুর্নীতি লইয়া নানা আলোচনা একসময় হইয়াছিল, কিন্তু সে-আলোচনা সাহিত্য-রসালোচনার বিষয়ীভূত নহে। সাহিত্য-রসাভিব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে "চিত্রাঙ্গদা" যৌবন ও প্রেম-লীলার অপূর্ব গীতিকাব্য, এবং এই গীতিকাব্যে দেহ-আত্মার প্রেমলীলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাই অপূর্ব রূপ ও রসমাধুর্যে অভিষিক্ত হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। গীতিকাব্য বলিলাম এই জন্য যে, "চিত্রাঙ্গদা"র বহিরঙ্গ অর্থাৎ সাহিত্যাকৃতিই শুধু কাব্য-নাটিকার, উহার সাহিত্য-লক্ষণ গীতিকাব্যের। উত্তরকালে লিখিত 'কচ ও দেবযানী' যেমন বিশুদ্ধ গীতিকাব্য-লক্ষণাক্রান্ত, "চিত্রাঙ্গদা"ও তেমনই গীতিকাব্যধর্মী ; নাটকীয় চরিত্ররীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও উহা নাট্যলক্ষণাশ্রয়ী নহে।

নরনারীর প্রেমলীলা দেহকেই প্রথম কামনা করে, আকর্ষণ করে, মোহাক্রান্ত হইয়া দেহকেই একান্ত করিয়া পাইতে চায়, ইহা একান্ত সত্য ; দেহধর্মের মূল্য নাই, একথা বলা চলে না! কিন্তু যে প্রেম দেহসর্বস্ব হইয়া উঠে, তাহাতে তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই, সে প্রেম মিথ্যা। দেহ যেমন সত্য, মনও তেমনই সত্য, আত্মাও সত্য তেমনই ; দেহগত প্রেম যেমন সত্য, দেহোত্তীর্ণ দেহাতিরিক্ত প্রেমও তেমনই সত্য। এক মন, আত্মা, হৃদয়, দেহকে অতিক্রম করিয়া আর এক মন, আত্মা, হৃদয়কে পাইতে চায়, স্পর্শ করিতে চায়, এবং তাহা যখন পারে তখনই প্রেমাস্পদকে পূর্ণভাবে জানা যায়, পাওয়া যায়, ভোগ করা যায়। দেহগত প্রেম খণ্ডপ্রেম, তাহা ক্ষণিক, দেহ-আত্মার প্রেম পূর্ণ প্রেম, তাহা নিত্য। অর্জুন যখন এই নিত্য পূর্ণ প্রেমের পরিচয় পাইলেন তখন তিনি ধন্য হইলেন, চিত্রাঙ্গদার নারীজন্মও সার্থক হইল ; শাশ্বত নরের সঙ্গে শাশ্বত নারীর মিলন হইল। ইহাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি, দেহ-আত্মার এই প্রেম-ভাবনাই রবীন্দ্রচিত্তকে অধিকার করিয়াছে, এবং বার বার নানাস্থানে নানাভাবে এই ভাবনাই বিচিত্র-রূপে ও রসে তিনি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

কিন্তু "চিত্রাঙ্গদা" তত্ত্বসর্বস্ব তো নয়ই, বরং ইহার সৌন্দর্য ও রসমাধুর্য সমস্ত তত্ত্বকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত তত্ত্ব ইহার রসের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। হৃদয়-রহস্যের যে বিচিত্র ও গভীর পরিচয়, সৌন্দর্যপ্রকাশের যে রসঘন রূপ "চিত্রাঙ্গদা"য় অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে যৌন-ভাবনাগত, সমাজ-ভাবনাগত নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন অবান্তর। অতি সুন্দর, অতি মধুর, অতি গভীর ভাবদ্যোতক খণ্ড খণ্ড অংশ উদ্ধৃত করিয়াও "চিত্রাঙ্গদা"র কাব্যমাধুর্যের পরিচয় দেওয়া যায় না; অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা, মদন ও বসন্তের কথোপকথনের ভিতর দিয়া দুইটি হৃদয়ের যে-রহস্য স্তরে স্তরে প্রকাশ পাইয়াছে, যে-ব্যঞ্জনা ও অর্থগরিমা তাহাদের বাক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, শব্দচয়নে, ধ্বনি-মাধুর্যে এবং ভাব-সংযমে যে নৈপুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহারা সকলে মিলিয়া "চিত্রাঙ্গদা"কে যে পূর্ণ অখণ্ড রসরূপ দান করিয়াছে তাহার পরিচয় কোনও খণ্ড-অংশে পাওয়া কঠিন। এমন কি

> হায়, আমারে করিল
> অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা
> মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
> ক্ষণস্থায়ী।

অথবা,

> এই যে সংগীত
> শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্ত সমীরে
> এই মোর বহুভাগ্য।

অথবা,

> গৃহে নিয়ে যাবে? বলো না গৃহের কথা
> গৃহ চির বরষের; নিত্য যাহা থাকে তাই
> গৃহে নিয়ে যেয়ো।

অথবা,

> বাহুবন্ধে
> এসো বন্দী করি দোঁহে দোঁহা প্রণয়ের
> সুধাময় চিরপরাজয়।

অথবা,

> যখন প্রথম
> তারে দেখিলাম, যেন মুহূর্তের মাঝে
> অনন্ত বসন্ত পশিল হৃদয়ে। বড়
> ইচ্ছা হয়েছিল, সে যৌবন-সমীরণে
> সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
> অপূর্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
> লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন।

ইত্যাদি অংশেও নয়।

নরনারীর যে প্রেমলীলা "চিত্রাঙ্গদা"র উপজীব্য, সেই প্রেমলীলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রসচেতনা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে কবির ব্যক্তিগত কল্পমানসের ইঙ্গিত স্পষ্টতর হইতে পারে।

এই খণ্ড কাব্যটির নায়ক অর্জুন বা নায়িকা চিত্রাঙ্গদা কোনও বিশেষ ব্যক্তি নয়, দুইজনই প্রতীকরূপে কল্পিত। চিত্রাঙ্গদা সমগ্র নারীজাতির কথাই বলিতেছে, এবং ক্ষণকালের জন্য হইলেও অর্জুন ভাবপ্রবণ সৌন্দর্যলালসাহত পুরুষের প্রতীক। কাজেই নায়ক বা নায়িকা

কেহই সামাজিক নীতি-নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নয় ; সেইজন্যই যৌন-সমস্যার সমাধান বা কোনও সামাজিক আদর্শও "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন-চেতনার প্রকাশ এই কাব্যে খুঁজিলে ভুল করা হইবে। তাহা ছাড়া, এই ধরনের প্রয়োজন চেতনা রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী আত্মকেন্দ্রিক বাস্তববিমুখ কবিকল্পনার বিরোধী। কিন্তু প্রেম ত ব্যক্তিকে আশ্রয় না করিয়া, ব্যক্তির দেহ-আত্মাকে আশ্রয় না করিয়া উদ্দীপিত হইতে পারে না ; কাজেই ব্যক্তিরূপেই অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা কল্পনার সৃষ্টি। চিত্রাঙ্গদার ব্যক্তিদেহেই অর্জুনের সম্ভোগতৃপ্তি এবং ব্যক্তি-চিত্রাঙ্গদার অন্তরঙ্গ-উপলব্ধিতেই তাহার পরিণতি।

নরনারীর প্রেমলীলার বিকাশ ও পরিণতির একটা যুক্তি রবীন্দ্র-কবিকল্পনায় কি রূপ লইয়াছে তাহার কিছু পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই "কড়ি ও কোমল" ও "মানসী"তে দেখিয়াছি। পুনরুক্তি না করিয়া "চিত্রাঙ্গদা"য় এ বিষয়ে যে-যুক্তি স্বপ্রকাশ তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবির বক্তব্য, চিত্রাঙ্গদা নিজে কুরূপা, কঠোরা, পুরুষধর্মিণী নারী, কিন্তু প্রথম পার্থ-দর্শনেই তাহার সুপ্ত নারীত্ব জাগিয়াছে। অর্জুন কিন্তু চিত্রাঙ্গদার বাহিরের রূপটাই দেখিল এবং দেখিয়া আকৃষ্ট বোধ করিল না। আহত চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের নিকট হইতে রূপ ও যৌবন ধার করিল—ধার করিল অর্জুনকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই। তাহার কামনা সার্থকও হইল। অর্জুন সেই ধার করা বাহিরের রূপে প্রলুব্ধ হইয়া চিত্রাঙ্গদার দেহভোগ করিল ; চিত্রাঙ্গদাও সেই দেহসম্ভোগের অসহ্য পুলকে আনন্দে বিবশ হইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই চিত্রাঙ্গদার মনে হইল অর্জুন, তাহার অন্তরঙ্গকে চাহে নাই, পায়ও নাই, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের রূপ ও যৌবনসৌন্দর্যের প্রতি তাহার ধিক্কার জাগিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অর্জুনের বাহুবন্ধনের দেহবন্ধনের মধ্যে বার বার ধরা দিতে সে সংকুচিত হইল না। এদিকে, একান্ত লালসানির্ভর একান্ত দেহনির্ভর জীবনে একদিন অর্জুনের তৃষ্ণা মিটিয়া গেল, সত্যকার চিত্রাঙ্গদাকে জানিবার জন্য সে উন্মুখ হইল। চিত্রাঙ্গদাও তখন ধারকরা বাহিরের রূপ ও যৌবন দূরে ফেলিয়া দিয়া অন্তরের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া অর্জুনের সম্মুখীন হইল, এবং তখনই সম্ভব হইল দুই জনের পূর্ণতর সার্থকতর মিলন। ইহাই রবীন্দ্র-কল্পনার যুক্তি।

"চিত্রাঙ্গদায়" কবিকল্পনার এই যুক্তি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কবি নিজেই জীবন-সায়াহ্নে একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার উদ্ধৃতি অবান্তর নয়।

"অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছু কাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তাদের রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফল সম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হলো সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমের পক্ষে মহৎলাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানে আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মল প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

"এ ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গে মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার

কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেকদিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া বলে এক নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।" ("রবীন্দ্র-রচনাবলী", ৩য় খণ্ড, "চিত্রাঙ্গদার সূচনা", ১৬০ পৃঃ)

যাহা হউক, কবি-কল্পনার এই যুক্তির মধ্যে জীবনদর্শনের একটি প্রশ্ন নিহিত। ইতিপূর্বে "কড়ি ও কোমল" এবং "মানসী"-আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কল্পনা ব্যক্তির কায়া-নিরপেক্ষ, দেহভাবনাবিচ্যুত কামনা-বাসনার উর্ধ্বে! দেহকে একেবারে অস্বীকার করা হয় না সত্য, কিন্তু দেহভাবনা, রূপবাসনা এক মুহূর্তে ভাবলোকে রূপান্তরিত হইয়া যায়; স্বতন্ত্র আত্মকেন্দ্রিক রসপ্রেরণার বশে প্রেম ও ভালবাসা ব্যক্তির একটি ভাবমূর্তিকে আশ্রয় করে এবং তাহাকেই সার্থক জীবনাদর্শ ও পূর্ণতর জীবনদর্শন বলিয়া ঘোষণা করে। এই জীবনাদর্শে ও জীবনদর্শনে দেহ ও আত্মার, অর্থাৎ জীবনসত্তার ভিতর ও বাহির এই দুইয়ের পৃথক অস্তিত্বের কল্পনা অনিবার্য, দুইয়ের মধ্যে একটা বিরোধ-কল্পনাও সমান অনিবার্য। সেই পৃথক অস্তিত্ব ও বিরোধ রবীন্দ্রনাথের উত্তর জীবনের অনেক রচনাতেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এ কথা সত্য যে, নানা আধারে, নানা বিষয়বস্তুর অবলম্বনে এই কল্পনার বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন ভঙ্গি, কিন্তু মূলত ইহার প্রকৃতি একই; দেহ ও আত্মার ধর্মের বিরোধ-বৈপরীত্যের কল্পনা, পৃথক অস্তিত্বের কল্পনা সর্বদাই উপস্থিত এবং দেহধর্মের উপরে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া আত্মার প্রেমের অস্তিত্ব এমন কি তাহার জয়-ঘোষণাও কবিকল্পনার অন্তর্গত। স্বল্পায়তন, ব্যক্তিসম্পর্কহীন, একান্ত ভাবাশ্রয়ী গীতিকবিতায় নরনারীর প্রেমলীলার এই আদর্শ ও দর্শন সহজেই একটি অখণ্ড রসমূর্তি ধারণ করে; যে বিরোধ-বৈপরীত্যের কথা বলিয়াছি তাহা সেক্ষেত্রে কিছু বাধা বা অসংগতির সৃষ্টি করে না, অন্তত পাঠকের তাহা চিত্তগোচর হয় না। কিন্তু এই প্রেমলীলাই যেখানে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, যেখানে বিশেষ ঘটনা-সংস্থানের ভিতর দিয়া সেই লীলা বিকশিত হয়, বিশেষ বিশেষ চরিত্র ও ঘটনাগুলিকে আশ্রয় করিয়া নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে, যেমন "চিত্রাঙ্গদা"য় করিয়াছে, সেখানে প্রেমলীলা সম্বন্ধে কবির স্বতন্ত্র আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা ও ভাবাদর্শ জীবনধর্মের সঙ্গে যে বিরোধ সৃষ্টি করে, তাহাতে প্রেমলীলায় দেহ ও আত্মার পৃথক অস্তিত্বের কল্পনাগত উপরোক্ত জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শনের খণ্ডতা ও অপূর্ণতা ধরা পড়িয়া যায়। "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যে তাহার পরিচয় উপস্থিত। কথাটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট; কুরূপা কঠোরা বলিয়া অর্জুন বিরূপ। চিত্রাঙ্গদা রূপ ও যৌবন ধার করিয়া নিজের দেহকে সমৃদ্ধ করিল অর্জুনকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য। অর্জুন প্রলুব্ধ হইল এবং চিত্রাঙ্গদার দেহে তাহার সম্ভোগ তৃপ্ত হইল। চিত্রাঙ্গদা কিন্তু প্রথম হইতেই জানে অর্জুন মিথ্যার উপাসনাই করিতেছে, যথার্থ চিত্রাঙ্গদার স্বরূপ সে কামনা করিতেছে না, তাহার অস্তিত্বের খবরও হয়ত সে জানে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের 'তৃষার্ত কম্পিত' কামনার আলিঙ্গনে নিজেকে স্বেচ্ছায় ধরা দিল, ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াও পারিল না, পারা সম্ভবও নয়—

> হায়, হায়, সে কি ফিরাইতে পারি। সেই
> থরথর ব্যাকুলতা বীর-হৃদয়ের,
> তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গ নিশ্বাসী
> হোমাগ্নি শিখার মতো; সেই নয়নের

দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে কেড়ে
নিতে আসিছে আমায় ; উন্মত্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া,
তাহার ক্রন্দন ধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন
যায় শুনা। এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি ?

যাহাই হউক, তাহার ফলে

শুনিলাম, "প্রিয়ে প্রিয়তমে !"
গম্ভীর আহ্বানে, মোর এক দেহমাঝে
জন্ম জন্ম শত জন্ম উঠিল জাগিয়া।
কহিলাম "লহ লহ যাহা কিছু আছে
সব লহ জীবন-বল্লভ।" দুই বাহু
দিলাম বাড়ায়ে।—চন্দ্র অস্ত গেল বনে,
অন্ধকারে কাঁপিল মেদিনী। স্বর্গ মর্ত্য
দেশকাল দুঃখ সুখ জীবন মরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

কিন্তু প্রায় পরমূহূর্তেই চিত্রাঙ্গদা মদনকে বলিল,

কারে, দেব, করাইলে পান ! কার তৃষা
মিটাইলে। সে চুম্বন, সে প্রেমসংগম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে-অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকার সম, সে তো মোর নহে।
বহুকাল সাধনার এক দণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে মিলন
কে লইল লুটি, আমারে বঞ্চিত করি।

স্পষ্টতই দেখা যায়, চিত্রাঙ্গদা সমস্ত দেহ চিত্তমন দিয়া অর্জুনসঙ্গসুখ উপভোগ করিতেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও বুঝিতেছে যে, যে-দেহ এই সুখ উপভোগ করিতেছে সে-দেহ তাহার দেহ নহে, যে নিবিড় মিলনে তাহার দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছে সেই পরম দুর্লভ মিলন তাহার 'আমি'কে বঞ্চিত করিতেছে। এ কথা দুর্বোধ্য নয় যে, যে রূপ-যৌবন তাহার দেহকে আশ্রয় করিয়াছে সে-রূপযৌবন ধার করা, তাহা বাহিরের বস্তু ; সেই হেতু তাহার প্রতি চিত্রাঙ্গদার ঈর্ষা ও আক্রোশ প্রবল, তাহাকে সে ঘৃণা করে। কিন্তু দেহ তাহার নিজের, তাহা ত সে ধার করে নাই ; সেই দেহেই তাহার 'আমি'র, তাহার গভীরতর সত্তার বাস, সেই দেহের প্রতি অণু প্রতি রক্তবিন্দু জুড়িয়াই ত আত্মার, অর্থাৎ গভীরতর সত্তার বিস্তৃতি। এবং, সেই জন্যই দেহসুখ যখন সে ভোগ করিতেছে তখন সে শুধু দেহ দিয়াই ভোগ করিতেছে না, সমস্ত গভীরতম সত্তা দিয়াই ভোগ করিতেছে। আত্মদানধর্মী প্রেমের লীলাই এইরূপ, আত্মবিস্মরণই প্রেমের ধর্ম। অথচ,

আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশ্যধিক্কার বেগে
অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন

পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষাতীর্থ
বাসরশয্যায় ; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর।

ধার করা রূপ-যৌবনের সতিনত্ব কল্পনা কিছু অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয় ; কিন্তু, নিজের দেহ, যে-দেহ পরিপূর্ণ সত্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেই দেহের পরিপূর্ণ মিলন-সম্ভোগেও আত্মা দূরে দাঁড়াইয়া দেহের সতিনত্ব কল্পনা করিতেছে, ইহা যে বস্তুধর্ম জীবন্ন-ধর্ম বিরোধী। এই স্বাতন্ত্র্য, এই পৃথক অস্তিত্ব, এই বিরোধ-কল্পনা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' কল্পনা মাত্র ; ইহা আত্মাভিমান ও আত্মস্বাতন্ত্র্যের কল্পনা, আত্মদানধর্মী প্রেমের কল্পনা নয়। এই জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শন খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ; অখণ্ড জীবনদর্শনে দেহ-আত্মার কোন বিরোধ নাই, একটি আর একটিকে পূর্ণতা দান করে, একটি আর একটির অপেক্ষা রাখে, একজনের সুখে আর একজন সুখী হয়। দুইয়ের ভারসাম্য অনেক সময় নষ্ট হয়, ব্যাহত হয়, আঘাতে প্রত্যাঘাতে বিপর্যস্ত হয় ; কিন্তু জীবনধর্মের অমোঘ নিয়মেই তাহা ভারসাম্য ফিরিয়া পাইতে চায়। সেই প্রয়াসই ত প্রেমলীলা। এই লীলায় সতিন-কল্পনার স্থান কোথায় ? "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যের পরিণতিই সেই তারতম্য প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত, কিন্তু সেই পরিণতিতে পৌঁছিবার জন্য প্রেমবিকাশের আদি ও মধ্য স্তরে দেহকে আত্মার সতিন বলিয়া কল্পনা করা জীবনধর্মের বিরোধিতা। চিত্রাঙ্গদার দেহ-সেতু অবলম্বন করিয়াই ত অর্জুন সম্পূর্ণ চিত্রাঙ্গদাকে পাইল, চিত্রাঙ্গদাও ত নিজের দেহের অসহ্য পুলকের ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ অর্জুনকে পাইল, সম্পূর্ণ নিজেকে দিল, অথচ সেই দেহকেই সে করিয়াছিল অস্বীকার, তাহাকেই দিয়াছিল নৈরাশ্য-ধিক্কার। এই কল্পনা যদি রসিক পাঠকেরও সংস্কারে বাধে তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় কি ? কারণ ইহা ত সামাজিক নীতি-দুর্নীতির সংস্কার নয়, প্রয়োজন-চেতনার সংস্কার নয়, ইহা যে জীবনের গভীরতম সত্যের সংস্কার, ইহা যে জীবনরসরসিকের সংস্কার! এইজন্যই কি অধ্যাপক রোলো "চিত্রাঙ্গদা" আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "Surely this is heresy both to beauty and to love" ?

কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও, বাস্তববিমুখ, আত্মভাবনাকেন্দ্রিক, স্বতন্ত্র ও অন্তর্মুখী কবি-কল্পনায় ইহা সম্ভব হইল। সম্ভব হইল শুধু কবির ব্যক্তিগত একান্ত স্বতন্ত্র, ভাবসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ফলে, সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ঐকান্তিক প্রত্যয়ের এবং বহুলাংশে খণ্ড খণ্ড স্তবকের অতি সুন্দর অর্থব্যঞ্জক উক্তির, নাটকীয় সংস্থানের এবং সমগ্র কাব্যটির অনবদ্য নির্মাণ-কৌশলের ফলে। ভাবানুভূতির সূক্ষ্মতা, বর্ণনার গৌরব, কামনা-বাসনার মৃদু ও তীব্র সৌরভ, চিত্রমহিমা এবং ভাবব্যঞ্জনা "চিত্রাঙ্গদা"কে অপরূপ কাব্যমূল্য দান করিয়াছে। সত্যই "চিত্রাঙ্গদা"র কাব্যমহিমার দীপ্তিতে নরনারীর প্রেমরহস্য আলোকিত।

চার

সোনার তরী (১২৯৮—১৩০০)
বিদায় অভিশাপ (১৩০০)
চিত্রা (১৩০০—১৩০২)
চৈতালি (১৩০২—১৩০৩)

"মানসী" ও "চিত্রাঙ্গদা"য় প্রেম ও সৌন্দর্যকে দেহোত্তীর্ণ করিয়া বৃহত্তর প্রেমলীলার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে পূর্ণ ও অখণ্ডরূপে পাইবার যে আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত আমরা পাই, তাহা সমসাময়িক "রাজা ও রানী" নাটকেও লক্ষ্য করা যায়। এই আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা লাভ করিল "সোনার তরী," "চিত্রা," ও "চৈতালি"তে, এবং পরবর্তী কয়েকটি কাব্যে। এই কাব্য কয়টিতে, বিশেষভাবে "সোনার তরী" ও "চিত্রা"য় দেহোত্তর প্রেম ও পরিপূর্ণ বিশ্বসৌন্দর্যানুভূতি অপূর্ব গরিমায় ও অনির্বচনীয় ভাব-গভীরতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সময়ের রচনা হইতে প্রথমেই যে জিনিসটি আপনি ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা হইতেছে মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মবোধ, কবির একান্ত তন্ময় দৃষ্টি, নিবিড় নিসর্গসম্ভোগ। সৃষ্টির অতি তুচ্ছতম জিনিসও কবির দৃষ্টি এড়াইতেছে না, সকল কিছুর মধ্যেই তিনি অপরিসীম প্রেম ও সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিতে পাইতেছেন, সকল পদার্থ মিলিয়া তাঁহার প্রাণে এক অপরূপ মায়ালোক সৃজন করিতেছে। কিন্তু শুধু এইটুকু মাত্র যদি হইত তবে ভাল করিয়া বুঝিবার তেমন কিছু হয় ত থাকিত না। এই ব্যাপকতর প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গভীরতম সত্য অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া আছে। প্রেম ও সৌন্দর্য শুধু কবি-কল্পনায় ভাসিয়া বেড়াইবার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া পক্ষ গুটাইয়া 'বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা, বহু দিবসের সুখ দুঃখ আঁকা, লক্ষ যুগের সংগীতমাখা' এই সুন্দরী ধরণীর উপর স্থির হইয়া বসিয়াছে। সর্বত্র সকল প্রেম, সকল সৌন্দর্য বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার তীব্র চেষ্টা ও আবেগ। জীবনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করিতে না পারিলে সকল প্রেম, সকল সৌন্দর্য, সকল অনুভূতি যে ব্যর্থ হইয়া যায়; তাই "সোনার তরী," "চিত্রা," "চৈতালি," এবং পরবর্তী কালের "কল্পনা" "ক্ষণিকা" প্রভৃতি কাব্য কয়খানি জুড়িয়া সকল বৈচিত্র্যকে এক করিবার, খণ্ড খণ্ড সমস্ত ভাব, চিন্তা ও অনুভূতির কবিত্বময় গভীর তত্ত্বরহস্যটি আবিষ্কার করিয়া তাহাকে এক অখণ্ডরূপে প্রকাশ করিবার, সকল বিচ্ছিন্ন আনন্দ, সৌন্দর্য ও প্রেমের অন্তর্গূঢ় মহিমা উপলব্ধি করিবার, তাহাকে ভাবময় রূপে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করিবার, সমস্ত প্রেম ও সৌন্দর্যকে ভোগলিপ্সা ও পার্থিব আনন্দ হইতে বিচ্যুত করিয়া সম্পূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' মূর্তিতে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিবার সার্থক চেষ্টায় ভরিয়া উঠিয়াছে। "সোনার তরী" ও "চিত্রা" কাব্যেই তাহার জীবন নিজের মনের বস্তুহীন কল্পনার মধ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বস্তুময় বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের দৈনন্দিন জীবনের রূপও এক নূতন সৌন্দর্যময় আনন্দময়রূপে কবির চোখে ধরা পড়িল; শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান সবল কল্পনা ও গভীরতর ভাব-রহস্যে সমৃদ্ধিলাভ করিল। বাক্য, পদ ও শব্দ ভাব-ব্যঞ্জনায় অনির্বচনীয় হইয়া উঠিল; ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির মূল্য যেন কবি এই প্রথম আবিষ্কার করিলেন।

শুধু ভাবসমৃদ্ধিই এই কাব্য কয়খানির একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় তাহা নহে। যে ছন্দ ও

অপূর্ব শব্দচয়ননৈপুণ্যকে আশ্রয় করিয়া এই ভাব রূপলাভ করিয়াছে, তাহাতেও এই সমৃদ্ধি সুপরিস্ফুট। ছন্দের যে তারল্য এতকাল কবিকে চঞ্চল তালে নাচাইয়াছে, যে অনির্দিষ্ট রূপ তাঁহাকে এতকাল স্থির হইতে দেয় নাই, সে চঞ্চলতা, সে-অস্থিরতা, এখন নিবৃত্তি লাভ করিয়া সর্বত্র একটা শান্ত সংযম ও অপূর্ব ধ্বনির গাম্ভীর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। "সোনার তরী"র 'পরশপাথর,' 'যেতে নাহি দিব,' 'সমুদ্রের প্রতি,' 'মানস-সুন্দরী,' 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতায়, "চিত্রা"র 'প্রেমের অভিষেক,' 'এবার ফিরাও মোরে,' 'উর্বশী,' 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি কবিতায়, "চৈতালি"র সনেটগুলিতে, "কাহিনী"র কবিতাগুলিতে, "কল্পনা"র 'অসময়', 'দুঃসময়,' 'অশেষ,' 'বর্ষশেষ,' 'বৈশাখ' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে এবং এই যুগের আরও অনেক কবিতায় এমন একটা সংযত শক্তি ও গাম্ভীর্য আপনি ধরা দিয়াছে যাহা পূর্বে কোথাও খুঁজিয়া পাই না। জীবনের নূতন দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের এই অনির্বচনীয় ভঙ্গিমা কবি নিজে সৃষ্টি করিলেন, এবং দুইয়ে মিলিয়া এই সময়ের কবি-জীবন অপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করিল। এই যুগের যে-কোনও কাব্য পাঠ করিলেই রসিক পাঠকের মনে হইবে, কবি নিজের শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, এবং সে-শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন। বস্তুত রূপৈশ্বর্যে, আনন্দোল্লাসে, আবেগময় বর্ণনায়, ভাবরহস্যে, মনন শক্তিতে, ধ্বনির গভীরতায়, ছন্দগরিমায়, কল্পনার সবলতায়, প্রতিভার দীপ্তিতে, এমন কি সংযমহীন বর্ণনার আতিশয্যে রবীন্দ্রনাথের এই যুগের কবিজীবন যে অখণ্ড সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিয়াছে তাহার তুলনা পরবর্তী কালের "বলাকা" ও "পুরবী"র কবি-জীবন ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

কিন্তু অপূর্ব অনির্বচনীয় এই কাব্যলোক হইতেও, উত্তর জীবনে আমরা দেখিব, কবি একদিন স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন; রসমাধুর্যে কানায় কানায় ভরা এই কবি-জীবনও তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। কোন্ ভাবলোকে এই যৌবন ও সৌন্দর্য-সম্পদ বন্দী হইয়াছিল, এবং পরে "বলাকা" ও "পুরবী"তে নূতন দানে, নূতন ভাবতত্ত্বে ও নূতন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হইয়া কি করিয়া তাহা মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা ক্রমশ পাইব।

"সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি"র যুগকে কেহ কেহ জীবনদেবতা ভাব-প্রত্যয়ের যুগ বলিয়া থাকেন, এবং এই বই কয়টির অনেক কবিতাতেই তাঁহারা এই ভাব-প্রত্যয়ের প্রকাশ দেখিয়া থাকেন। জীবন-দেবতা ভাব-প্রত্যয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র আমি করিয়াছি এবং সেই প্রসঙ্গে এই ভাবরহস্যের উৎস যে কোথায় তাহাও কতকটা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে এইটুকু শুধু বক্তব্য যে, এই ভাব-প্রত্যয় এই যুগেরই বৈশিষ্ট্য নয়; বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের উৎসই এই ভাব-রহস্য। যে-নিসর্গানুভূতি "সন্ধ্যা-সংগীত" হইতে আরম্ভ করিয়া "মানসী," "চিত্রাঙ্গদা" পর্যন্ত তাঁহার কাব্যে প্রাণরস সঞ্চার করিয়াছে, সেই নিসর্গানুভূতিই যত সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, জীবনদেবতার ভাবরহস্যও তত নিবিড়, সত্য, সার্থক ও গভীর হইয়াছে। "সোনার তরী" অপেক্ষাও "চিত্রা"য় "চৈতালি"তে ও "কল্পনা"য় ইহার স্পষ্টতর গভীরতর পরিচয় আছে। এই ভাব-প্রত্যয়ের সৌন্দর্য ও রহস্য পরবর্তীকালে কখনও রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসকে পরিত্যাগ করে নাই। "খেয়া", "গীতাঞ্জলি", "গীতিমাল্য", "গীতালি"তে তাহা তাঁহার সুগভীর অধ্যাত্ম রসানুভূতির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে মাত্র এবং ক্রমশ তাঁহার সমগ্র কাব্য-চেতনার অংশ হইয়া পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। (জীবনদেবতা শুধু তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী মাত্র হইয়া থাকেন নাই, তিনি কবির সঙ্গে একাসনে বসিয়া, এক

চিত্তাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র জীবন, সমগ্র জগতকে রূপদান করিতেছেন। এই ভাব-প্রত্যয় কতটুকু যৌক্তিক, কতখানি বিজ্ঞানগ্রাহ্য রবীন্দ্র-কাব্যালোচনার দিক হইতে সে প্রশ্ন অবান্তর; তবে কালানুক্রমিক রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করিলে এই কথাই সত্য মনে হয় যে, সুনিবিড় নিসর্গানুভূতিই জীবনদেবতা ভাব-প্রত্যয়ের মূলে; এবং এই অনুভূতি সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই "সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি"র কবিতাগুলিতে, বিশেষ-ভাবে যে-সব কবিতায় মানব-জীবন ও প্রকৃতির, ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে নিসর্গের, সুগভীর রহস্য বিচিত্রভাবে সবল কল্পনায় এবং গভীর প্রেম ও আত্মীয়তায় প্রকাশ পাইয়াছে সেই সব কবিতাই এই যুগের কবিমানসকে অপূর্ব দীপ্তিদান করিয়াছে। এই জন্যই এই যুগের নিসর্গ কবিতাগুলি শুধু অনির্বচনীয় অবর্ণনীয় প্রকৃতি-চিত্র অঙ্কন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অনুভূতি সত্য ও নিবিড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মধ্যে একটা সুগভীর প্রেম, একটা করুণ কোমলতা, একটা বেদনানন্দোজ্জ্বল দীপ্তিও সহজেই সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানব একাত্ম হইয়া গিয়াছে, একের সুখ ও দুঃখ, বেদনা ও আনন্দ, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্যের কাছে সত্য ও নিবিড়, একের সৌন্দর্য ও প্রেম অন্যের ভাব-ভাবনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং দুইএ মিলিয়া এক অনির্বচনীয় অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষের প্রেম মুহূর্তে নিসর্গের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া যায়, নিসর্গের যত অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, যত দৃশ্য, যত কথা, যত গান মানুষ সব কিছুকে নিজের মধ্যে প্রেমে টানিয়া লয়, তাহার সঙ্গে ব্যথায় ও আনন্দে জড়াইয়া বাঁধে—কবির এই অনুভূত প্রত্যয়ই "সোনার তরী" হইতে আরম্ভ করিয়া "কল্পনা" পর্যন্ত এবং পরে "বলাকা" ও "পূরবী"তে অপূর্ব ভাবে ও সৌন্দর্যে ব্যক্ত হইয়াছে। যে সমস্ত কবিতা এই গ্রন্থগুলিকে তাহাদের কাব্য-মূল্য দান করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই এই উক্তির প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

'সোনার তরী' কবিতাটি লইয়া তত্ত্বালোচনা এত বেশি হইয়াছে যে, তাহার আবর্তে পড়িয়া পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেও খানিকটা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস করিয়াছেন—হয়ত তত্ত্বান্বেষী পাঠকদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। শ্রাবণের ঘনবর্ষা, দুকূলভরা খরস্রোতা নদী, দ্রুতবহমান তরী, দুই তীরের বৃষ্টিমুখর কাশ-বাঁশ-সুপারির বন, তীরের উপর কাটা ধানের স্তূপ, কর্মরত নগ্নগাত্র বৃষ্টিস্নাত কৃষককুলের নিরলস ব্যস্ততা, ধান-বোঝাই নৌকা সমস্ত মিলিয়া মানুষের প্রাণে এক অব্যক্ত আকুলতার সৃষ্টি করে; তাহার সঙ্গে আসিয়া মেশে বর্ষার চিরন্তন সুগভীর বেদনা, এবং দুইএ মিলিয়া স্পর্শকাতর চিত্তে এক অপরূপ বেদনাপ্লুত রস ও সৌন্দর্যের অপূর্ব রাগিণী সৃষ্টি করে। সে রাগিণীই 'সোনার তরী' কবিতাটিতে ধরা পড়িয়াছে। ইহার কাছে তত্ত্ব অবান্তর। তত্ত্ব নাই—এ কথা বলি না, কিন্তু যেটুকু আছে তাহা তুচ্ছ। এই সুনিবিড় রাগিণী যাঁহারা কবি-হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, মানুষ চায় তাহার সমস্ত সঞ্চিত ধন ও ঐশ্বর্য, এমন কি নিজেকেও ইহার কাছে বিসর্জন দিতে, ইহার হাতে তুলিয়া দিতে; এমন ভাব-মুহূর্ত মানুষের জীবনে আসে। কিন্তু মানুষ সব দিতে পারে না; সমস্ত ধন, সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষে তুলিয়া দিবার পরও মনে হয়, কোথায় যেন কি এখনও নিজেকে ভারগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; তখন সে নিজেকে চায় একান্ত ভাবে দান করিতে, কিন্তু মধুর নিষ্ঠুর প্রকৃতি মানুষের সে দান গ্রহণ করেন না; মানুষ তখন নিজের ভার লইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠে।

যত চাও তত লও তরণী 'পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে,
এখন আমারে লহ করুণা করে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ-গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি,—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

এই যে শূন্য নদীর তীরে একা পড়িয়া থাকার বেদনা, মানুষ যে নিজেকে একান্ত করিয়া দান করিতে পারে না, সে যে কোন কোন ভাব-মুহূর্তে মনে করে নিষ্ঠুর প্রকৃতি তাহার সঞ্চিত ঐশ্বর্য লইয়া যায়, তাহাকে লয় না, ইহা ত কোনও তত্ত্ব নয়, অনুভূত ভাব মাত্র, হয় ত যে-মুহূর্তের অনুভূতির মধ্যে এই প্রত্যয় ধরা দিয়াছে পরমুহূর্তের অনুভূতির মধ্যে আর তাহা নাই। কাজেই তত্ত্ব-প্রত্যয় লইয়া বিব্রত হইবার কারণও নাই; কবি যে বিব্রত হইয়াছেন তাহার প্রমাণও কবিতায় নাই। কিন্তু এই অতৃপ্তি ও বেদনাটুকু জীবনের অমোঘ সত্য, এবং এই সুগভীর বেদনা শ্রাবণবর্ষার চিরন্তন বেদনার সঙ্গে মিলিয়া 'সোনার তরী' সৃষ্টি করিয়াছে। কাব্যরস ও সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য ইহাই যদি যথেষ্ট মনে না হয়, তাহা হইলে তত্ত্ব কতটুকু সাহায্য করিবে! 'সোনার তরী' নিসর্গের অনুভূতিই আমাদের কাছে নিকটতর করিতেছে; মানুষের চিত্তরহস্য তাহার ভাব ও অনুভূতি যে নিসর্গানুভূতির সঙ্গে, নিসর্গ রহস্যের সঙ্গে কতখানি একাত্ম, রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত এই উপলব্ধিই আমাদের মনে জাগাইতেছে। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের দিক হইতে এই কথাটুকুই আমাদের জানিবার; 'সোনার তরী' কবিতা, অথবা এই যুগের অন্যান্য নিসর্গ কবিতাগুলি যে শুধু শব্দচিত্র মাত্র নয় এইটুকুই বুঝিবার।

'শৈশব সন্ধ্যা', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', 'তোমরা ও আমরা' প্রভৃতি কবিতাকেও ব্যাপকভাবে নিসর্গ কবিতা বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে যে অপরূপ সৌন্দর্য-চিত্র আছে তাহা সেইখানেই শেষ হইয়া যায় না, মানুষের চিত্তরহস্যের সঙ্গে এই সৌন্দর্য-সম্বন্ধের মধ্যেই এই জাতীয় কবিতাগুলির কাব্য-মূল্য। এই যে মানুষের সঙ্গে নিসর্গের একাত্মতা, প্রেম, সৌন্দর্য, নিসর্গের যাহা কিছু একান্ত কামনার মানুষই তাহার মূল্য নিরূপণ করে, মানুষের জন্যই তাহার যত মূল্য, এমন কি দেবতার জন্য মানুষের প্রেম যে অনন্তকাল ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া আছে, নিসর্গের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আছে তাহাও মানুষের উপভোগের জন্যই, এই কথাই 'বৈষ্ণব-কবিতা'য় ব্যক্ত হইয়াছে। মানুষের প্রেম, মানুষের ভালবাসা, মানুষেব বেদনাই যে নিসর্গের অমোঘ সত্য, মৃত্যু এবং বিচ্ছেদকেও তাহা যে অপরূপ অর্থদান করে, মানুষকে তুচ্ছ অথবা মহিমান্বিত করে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে 'যেতে নাহি দিব' এবং 'প্রতীক্ষা' কবিতায়। নিসর্গের অমোঘ সত্য এবং মানবলোকের একটি সকরুণ মুহূর্ত দুই-এ মিলিয়া যে কি অনির্বচনীয় কাব্যরূপ লাভ করিতে পারে, 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি

তাহার প্রমাণ, ইহার তুলনা বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশি নাই। প্রকৃতির সঙ্গে সুগভীর একাত্মতা প্রকাশ পাইয়াছে 'মানস-সুন্দরী' 'বসুন্ধরা' 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায়, এবং তাহার আনন্দোল্লাস, আবেগোচ্ছ্বাস অপূর্ব ছন্দে ও ধ্বনিতে উৎসারিত হইয়াছে 'বিশ্বনৃত্য' ও 'ঝুলন' কবিতায়।

উল্লিখিত কবিতাগুলির প্রত্যেকটিই এমন এক একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অনবদ্য সৃষ্টি যে, অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ইহাদের ব্যাখ্যার অতীত, বর্ণনার অতীত, বচনের অতীত রস ও সৌন্দর্যের পরিচয় দিবার ব্যর্থ চেষ্টা আমি করিব না।

এই যে নিবিড় নিসর্গ-সম্ভোগ এই নিসর্গের সঙ্গে মানবহৃদয়ের প্রতি মুহূর্তের একটা নিবিড় আত্মীয়তার উপলব্ধি, এই দুইএ মিলিয়া "সোনার তরী" ও "চিত্রা"র কবিতাগুলিকে এমন সরস, রমণীয় ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত এমন তন্ময় হইয়া দেখা, এবং শুধু দেখা নয়, দেখার আনন্দে দেহ চিত্ত মন রাঙাইয়া বসাইয়া তোলা এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত বাণীবন্যায় নিজেকে ভাসাইয়া দেওয়া, গীতচ্ছন্দে নূপুর বাজাইয়া নানা ভঙ্গিতে নাচিয়া ছুটিয়া চলা, এমন অপূর্ব ভাবোন্মাদনা এই পর্বের পরে আর দেখা যাইবে না। কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে কত বিচিত্র বর্ণের ও গন্ধের ছবি যে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, একটির পর একটি যেন মালা গাঁথিয়া চলিয়াছে। এই চিত্ররূপ যে শুধু 'যেতে নাহি দিব' বা 'মানস সুন্দরী' প্রভৃতি কবিতারই বৈশিষ্ট্য তাহা নয়; মায়াময় স্বপ্নময় সুকোমল চিত্রমোহে এই দুটি গ্রন্থের প্রায় সব কবিতাই আমাদের অভিভূত করিয়া দেয়। আর, সেই চিত্ররূপ একান্তই পদ্মাবিধৌত সুবিস্তীর্ণ সৈকত বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামল সরস রূপ। সেই রূপকে আশ্রয় করিয়াই অরূপের অনির্বচনীয়ের যত কিছু আভাস ও ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত ও আকুতি। ছবির পর ছবি, উপমার পর উপমা, রঙের পর রং, আবেগে উত্তাপে উচ্ছ্বাসে যেন দুর্বার গতির শোভাযাত্রায় চলিয়াছে—একদিকে এই অপরূপ নিসর্গ-সম্ভোগ, আর একদিকে মানবজীবনের বিচিত্র স্পন্দনে নিজের মধ্যে নিবিড় স্পন্দনানুভূতি। যে মানুষের জীবন ছিল আড়ালে, যাহার সম্বন্ধে চিত্তের সজাগ অনুভূতি এতদিন বিশেষ ছিল না, আজ যেন পদ্মার দুই তীর হইতে সেই মানবজীবন কবিচিত্তের অর্গল দুই হাতে ঠেলিয়া মুক্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল, মানুষ তাহার হৃদয়মনের নিকটতর হইল। একদিকে যেমন 'সোনার তরী', 'মানস সুন্দরী', অন্যদিকে তেমনই 'যেতে নাহি দিব', 'বৈষ্ণব কবিতা'। তারপর মানুষে আর প্রকৃতিতে যোগাযোগ ঘটিতে আর এতটুকু দেরি হইল না। এই মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় যোগের, প্রগাঢ় আত্মীয়তাবোধের পরিচয়, পদ্মাবিধৌত বাংলার বাহির ও অন্তরের পরিচয়, তাহার দুই তীরের স্পন্দমান মানব হৃদয়ের পরিচয় একসূত্রে গাঁথা হইয়া আছে শুধু "সোনার তরী"তেই নয়, আরও সুস্পষ্ট রেখায় আঁকা আছে "ছিন্নপত্রে", কবির অসংখ্য ছোট গল্পে। বস্তুত, যদি বলি "সোনার তরী" পদ্মারই কাব্য, তাহা হইলে কিছু অন্যায় বলা যায় না। পদ্মা তাঁহার চিত্তে যে রসপ্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে তাহারই তো বাণীরূপ "সোনার তরী"। কবি নিজেই বলিতে-ছন

"* * * বাংলা দেশের নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুড়ে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলা দেশকে ত বলতে পারিনে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে-উদ্বোধন তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম।

"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খর রৌদ্রতাপে,

শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের ছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হলো আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের কলস ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে। * * *"

রবীন্দ্র-রচনাবলী, (৩য় খণ্ড, সোনার তরীর সূচনা ৫-৬ পৃঃ)

তারপর এই ফসল উঠিয়াছে "চিত্রা" ও কতকটা "চৈতালি" কাব্যেও, কিন্তু আরও স্পর্শগোচর হইয়া ধরা দিয়াছে ছোটগল্পে। এই সমতট বাংলার বুকে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ নিসর্গজীবন এবং মানবজীবন, এই দুইটিকে একসঙ্গে গাঁথিলেন। এ দুইএর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এক নূতন আত্মগত সূক্ষ্ম অপ্রত্যক্ষ কল্পভাবনার জগৎ সূচিত হইল।

"সোনার তরী"তে যে কবিমানসের পরিচয় আমরা পাইলাম, নিসর্গ-সাধনার যে আভাস পাইলাম, সে-সাধনা এখনও যথেষ্ট গভীরতা লাভ করে নাই ; করে নাই যে তাহার প্রমাণ কবি নিজেই দিতেছেন "সোনার তরী"র সর্বশেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রায়'। কবিচিত্ত যে সোনার তরীর পিছু লইয়াছে, নিসর্গ-সাধনার যে পথে নামিয়াছে, সে পথ কোথায় শেষ হইবে, সে সোনার তরী কোন্ পারে ভিড়িবে ?

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী,
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী !
* * *
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকুল সিন্ধু উঠেছে আকুলি
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন কোণে।
কী আছে হোথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে। ('নিরুদ্দেশ যাত্রা')

"চিত্রা"য় মনে হইতেছে এ পথের শেষ কবি পাইয়াছেন; সোনার তরী পারে আসিয়া ভিড়িয়াছে, কিসের অন্বেষণে তিনি চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি জানিয়াছেন। নিসর্গের সঙ্গে একাত্মবোধ সম্পূর্ণ হইয়াছে ; যে দ্বিধা, যে সংশয়, যে অনিশ্চয়তা "সোনার তরী"র কবিতাগুলিতে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, "চিত্রা"য় তাহা আর নাই। একটা সহজ সুখ, সরল আনন্দ, পরম স্থৈর্য ও নিশ্চয়তা "চিত্রা"র কবিতাগুলিকে আশ্রয় করিয়াছে ; 'সুখ', 'জ্যোৎস্নারাত্রে', 'প্রেমের অভিষেক', 'সন্ধ্যা', 'পূর্ণিমা', 'সিন্ধুপারে' প্রভৃতি কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে। এই একান্ত একাত্মবোধ যখন সম্পূর্ণ হইল, তখন কি যে জাদু কবিচিত্তকে রূপান্তরিত করিল, তাহা কবি নিজেও জানেন না, তিনি শুধু জানেন, 'সুখের ব্যথায় তাঁহার বুক তখন কাঁপে', 'তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায় চিত্ত মাতিয়া উঠে', 'অসীম বিরহ

অপার বাসনা বিশ্ববেদনা তাঁহার বুকে বাজে', সমস্ত কিছুই তাঁহার কাছে কৌতুকময়ী অন্তর্যামীর অপরূপ কৌতুক বলিয়া মনে হয়—

এ কী কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ,
মিশায়ে আপন সুরে।
* * *
বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত,
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।
সে মায়ামুরতি কী কহিছে বাণী,
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন। ('অন্তর্যামী,' "চিত্রা")

'রহস্যে নিমগন' শুধু কবি নহেন, তাঁহার অগণিত পাঠকও। কি জাদু যে কবি-চিত্তকে স্পর্শ করিল, কবি-মানস যে কি অপরূপ রূপান্তর লাভ করিল, যাহার ফলে ভাষা ও ছন্দ পাইল নূতন রূপ ও প্রাণরস, প্রতিমা হইল নূতন, এই সংগীত, এই লাবণ্য এই ক্রন্দন কোথা হইতে অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। এ কি অপরূপ বিস্ময়! কিন্তু বিস্ময় যাহাই হউক, নিসর্গের সঙ্গে এই একান্ত পরিপূর্ণ একাত্মবোধের ফলেই আমরা পাইলাম 'উর্বশী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'বিজয়িনী', '১৪০০ শাল' প্রভৃতির মত কবিতা। ব্যাখ্যার অতীত, বিশ্লেষণের অতীত এই সব রচনার রস ও সৌন্দর্য ভাষায় কতটুকু প্রকাশ করা যায়, অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া কতটুকু দেখানো যায়? 'উর্বশী'তে কবি মোহিনী নারী দেহবিচ্যুত নির্বস্তুক সৌন্দর্যের স্তব করিয়াছেন, নিছক অনাবিল সৌন্দর্যকে সমস্ত প্রয়োজনের, সমস্ত মানব-সম্বন্ধের বিকার হইতে ঊর্ধ্বে তুলিয়া তাহার পূজা করিয়াছেন। উর্বশী পূর্ণ সৌন্দর্যের প্রতিমা, বিস্ময় ও আনন্দের পরিপূর্ণ সৃষ্টি, তাহার দ্যুতি বৈদিক অতীত হইতে বর্তমান অতিক্রম করিয়া সীমাহীন অনাগত ভবিষ্যতের কল্পনার মধ্যে বিস্তৃত, বহু যুগ সঞ্চিত বহু কবিঋষি-উদ্গাত স্মৃতি তাহার সঙ্গে জড়িত, মানবের চিরন্তন প্রেম ও সৌন্দর্য-বাসনার মধ্যে তাহার স্মৃতি বিধৃত। সৌন্দর্যের যে অনির্বচনীয়তা উর্বশীর মধ্যে আমরা তাহার রূপ প্রত্যক্ষ করি, এবং সেই মোহিনী মাধুরীকে বাহু-বন্ধনের মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করি। কিন্তু এ কথা কবি জানেন, এবং আমরাও জানি

ফিরিবে না, ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী
* * *
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে ('উর্বশী')

কিন্তু এ হইল কবিতার অর্থ মাত্র; এই অর্থের মধ্যে রস কোথায়, সৌন্দর্য কোথায়? তাহারা যে রহিয়াছে অর্থ ছাড়াইয়া, অথচ ছন্দ, শব্দ ও বাক্যের অপরূপ ব্যঞ্জনার মধ্যে, অনির্বচনীয় চিত্র-সৃষ্টির মধ্যে, অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে, যে পুরাণ-স্মৃতি ইহার ফাঁকে ফাঁকে ধরা দিয়াছে তাহার মধ্যে, যে অপরূপ শব্দচয়ন-নৈপুণ্য ইহাতে আছে তাহার মধ্যে, সবল কল্পনার মধ্যে, সমস্ত কবিতাটির মধ্যে যে মোহ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্যে।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে।

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতিলঘুভার।
অখিল মানস স্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী
হে স্বপ্নসঙ্গিনী।

ইহার সৌন্দর্য-বিশ্লেষণের স্পর্ধা আমি রাখি না।

উপরে "চিত্রা"র যে সমস্ত কবিতার নাম আমি করিয়াছি সে সমস্ত এবং অন্যান্য আরও অনেক কবিতায় কবির নিসর্গানুভূতির পূর্ণ পরিচয় যে-কোন রসিক পাঠকের কাছেই ধরা পড়িবে। "চিত্রা"র সমস্ত কাব্য-জীবন জুড়িয়া রবীন্দ্রনাথ নিসর্গের সঙ্গে একাত্মতাজাত প্রেম ও সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করিলেন; "সোনার তরী" হইতেই তাহা আরম্ভ হইয়াছিল, "চিত্রা"য় আসিয়া তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিল। যে অনুভূত প্রত্যয় কবির সমস্ত জীবনকে এমন সম্পদ ঐশ্বর্য দান করিল, সেই সত্যই তো কবির অন্তরতম জীবন-দেবতা। একটা সমগ্র কাব্যযুগ ব্যাপিয়া কবি এই অন্তরতমের সন্ধান লাভ করিলেন, এবং তাঁহার জীবন প্রেম ও সৌন্দর্যে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু যে অন্তরতমের অনুভূতি তিনি পাইলেন, সেই অন্তরতম কি কবির সঙ্গ লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কামনা-বাসনা কি মিটিয়াছে, অন্তরতম কি পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, এ প্রশ্ন কোন এক ভাব-মুহূর্তে কবির চিত্তে জাগিয়াছে।

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।
* * *
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা,
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মুরতি নিত্যনব।
আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভাল হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম, আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে।
* * *
মানস কুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবনবনে।

('জীবন-দেবতা')

অন্তরতমের সকল তিয়াষ মিটিয়াছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর কবি স্বয়ং; কারণ "চিত্রা"য় দেখিতেছি কবির নিজের সকল প্রেম ও সৌন্দর্যতৃষ্ণা মিটিয়াছে, তাঁহার কবিমানস পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার জীবন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে; "সন্ধ্যা-সংগীতে"র কুয়াশাচ্ছন্ন জীবনের পরে "প্রভাত-সংগীত" হইতে আরম্ভ করিয়া যে পথে কবি-চিত্তের যাত্রা শুরু হইয়াছিল স্তরে স্তরে বিচিত্র অভিজ্ঞতার, বিচিত্র অনুভূতির ভিতর দিয়া সে পথের শেষে আসিয়া তিনি পৌঁছিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। প্রেম-সাধনা সৌন্দর্য-সাধনার জীবন পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।) এবং সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলিয়াই কবির নিজের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে, নিজের শক্তি-সম্বন্ধে তিনি সচেতন হইয়াছেন, তিনি যে যুগোত্তর জীবনোত্তর কবি তাহা তিনি জানিয়াছেন, অনাগত ভবিষ্যতের কবির সঙ্গে, অনাগত জীবনের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা যে নিবিড় ও গভীর তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রমাণ, '১৪০০ শাল' কবিতা।

আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে,
আজি হতে শত বর্ষ পরে।
* * *
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে,—

কত কথা, পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে,
একদিন শতবর্ষ আগে।

আজি হতে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্ত-গান তোমার বসন্ত-দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমর গুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্মরে,
আজি হতে শত বর্ষ পরে।

('১৩০০ সাল')

"চিত্রা"র আর একটি কবিতার উল্লেখ বাকি আছে, সেটি হইতেছে 'এবার ফিরাও মোরে'। একটু অভিনিবেশ-সহকারে রবীন্দ্র-কাব্য-জীবন আলোচনা করিলে কবি-চিত্তের একটা বিশেষ ধর্ম সহজেই ধরা পড়ে, এবং এ-ধর্ম তাঁহার কাব্যে যতটুকু সত্য তাঁহার জীবনেও ততখানি সত্য। একথা সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ বহুদিন একই স্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে পারেন না, মাঝে মাঝে বাহিরের কর্মনেশা, ভ্রমণের নেশা, নূতন দৃশ্য নূতন আবেষ্টন নূতন স্থানের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসে, এবং নিজের নিভৃত নিকুঞ্জ নিবাস হইতে তিনি ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়েন। বাহিরের জীবনের দিক হইতে ইহা সকলেরই চোখে পড়ে সহজেই। অন্তরের দিক হইতেও একথা সত্য। কবি নিজের কল্পলোক, অন্তর্লোকের মধ্যে বাস করিতেই ভালবাসেন, কিন্তু মাঝে মাঝে বাহিরের বিচিত্র ঝড়-ঝঞ্ঝা দুঃখ-বেদনা-ক্রন্দন-সংগ্রাম তাঁহাকে এমন গভীরভাবে স্পর্শ করে যে, তাঁহার স্পর্শ-কাতর চিত্ত কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, তখন তিনি স্বতন্ত্র অন্তর্লোক বস্তুবিমুখ কল্পলোক ছাড়িয়া বাস্তব-সংসারের দৈনন্দিন আবর্তের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহেন। কবির কাব্যেও তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। শুধু শিল্পময়, কাব্যময়, আত্মগত কল্পনাময় জীবন যে মাঝে মাঝে তাঁহার ভাল লাগে না, একথা বার বার তিনি কোন কোন পত্রে ও প্রবন্ধে, এমন কি পূর্বজীবনের কবিতায়ও একাধিকবার বলিয়াছেন। এই ধরনের একটি ভাবমুহূর্ত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় ধরা পড়িয়াছে। সংসারে যত ব্যথিত, উৎপীড়িত, আশাহীন, ভাষাহীন মানুষ আছে তাহাদের ক্রন্দন কবিচিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে, কবি ইহাদের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন,—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর।

কিন্তু এ ভাব-মুহূর্ত পরক্ষণেই কাটিয়া যায়, কবি আবার তাঁহার স্বতন্ত্র অন্তর্মুখী ভাব কল্পনার রাজ্যেই আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন; অন্তঃপুরচারিণী কাব্যলক্ষ্মীর সম্মুখেই নিজের

অন্তর-প্রদীপখানি তুলিয়া ধরেন। এই ধরনের অস্বস্তি বোধ তাঁহার কবিজীবনে একাধিকবার দেখা গিয়াছে। যাহা হউক, এই কবিতাটির ভাবপ্রেরণা সম্বন্ধে আমি অন্যত্র ইঙ্গিত করিযাছি; এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

"চিত্রা", "সোনার তরী" অপেক্ষা আরও গাঢ়, সংহত ও গভীরতর অনুভূতির কাব্য। দুইটি কাব্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনস্বীকার্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে 'নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা' "সোনার তরী"তে আমরা দেখিয়াছি তাহা "চিত্রা"য় আরও গভীর, আরও গাঢ় হইয়াছে। যে উচ্ছ্বসিত জীবনানন্দ, যে স্পন্দমান ইন্দ্রিয়-চেতনা, যে সহজ সুখ-দুঃখের বিচিত্র আন্দোলনের অনুভূতি "সোনার তরী"র বৈশিষ্ট্য, "চিত্রা"য় সেই প্রায় ইন্দ্রিয়-স্পর্শক্ষম আনন্দ, চেতনা ও আন্দোলন মনন-ক্রিয়ার স্পর্শে কেমন যেন দৃঢ় ও সংহত হইয়া উঠিয়াছে। সহজ তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ জীবনানন্দ অপ্রত্যক্ষ জীবন-জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। "সোনার তরী"র সঙ্গে গোত্রের যোগ পরবর্তী "ক্ষণিকা"র এবং আরও পরবর্তী "পূরবী" ও "মহুয়া"র, "চিত্রা"র সঙ্গে "কল্পনা" ও "খেয়া"র। তবু, "সোনার তরী" ও "চিত্রা" পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। "চিত্রা"য় জীবন-জিজ্ঞাসার চিন্তা "সোনার তরী"র অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট রং ও রেখাকে একটি কঠিন, গাঢ়, স্পর্শসহ রূপ দিয়াছে। "সোনার তরী" "চিত্রা"র ভূমিকা।

সহজ, তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ জীবনানন্দের অনুভূতি যে মননক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইতেছে, তাহার কারণ মানব-জীবনের সঙ্গে গভীরতর যোগ, চিত্তে তাহার বিচিত্র বর্ধমান অভিজ্ঞতার সঞ্চার। তাহারই ফলে স্বতন্ত্র আত্মগত কল্পনা "চিত্রা"র অনেক কবিতায় ব্যবহারিক জীবনের বিচিত্র কর্মের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য খুঁজিতেছে। একদিকে কবি-কল্পনার নিভৃত স্বতন্ত্র অন্তলোক যাহার সঙ্গে তিনি বহুদিন পরিচিত, আর একদিকে সদাবহমান কর্মময় মানব জীবনস্রোত যাহার সঙ্গে ক্রমশ পরিচয়লাভ ঘটিতেছে। এ দুইই সত্য এবং দুইএর মধ্যে বিরোধ কোথাও নাই। বিশ্বজীবনের অভিজ্ঞতা বিচিত্র, আরও বিচিত্র তাহার রূপ, কিন্তু কবির অন্তর্লোকে যে বিরাজ করে সে 'একা একাকী অন্তর ব্যাপিনী'। এই কবি-কল্পনা যুক্তিসহ কি না সে-প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু ইহাই "চিত্রা"র কাব্যরূপের মূলে। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় এই দুই দিককার বিরোধকে সামঞ্জস্যের এক মিলনসূত্রে গাঁথা হইয়াছে। এ বিষয়ে কবির নিজের মন্তব্য শোনা যাইতে পারে—

"চিত্রা"র প্রথম কবিতাটির সূচনায় বলা হয়েছে—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

তার পর আছে—

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

আজ ব্যাখ্যা করে যে-কথা বলবার চেষ্টা করেছি সেই কথাটাই এই কবিতার মধ্যে ফুটতে চেয়েছিল। বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারায় প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কর্ম-জীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। [কিন্তু সেই কবিতারই পরিণতিতে

সেই বিচিত্রের আহ্বান অন্তরের একের আহ্বানে রূপান্তরিত, এবং সেই হিসাবে এই দুই আপাতবিরোধী সত্তার সামঞ্জস্য একই আবেগসত্তায় কি ভাবে রূপান্তরিত হয় তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই কবিতাটি। গ্রন্থকার] 'আবেদন' কবিতায় ঠিক তার উল্‌টো কথা। কবি বলেছে, 'কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জড়তায় কর্মীরা কর্ম করছে সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।' জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এই দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য। 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য,' 'দুই বিঘা জমি' এইগুলির কাব্যকাকলি নীড়ের বাসার, 'স্বর্গ হইতে বিদায়' এখানে সুর নেমেছে উর্ধ্বলোক থেকে মর্ত্যের পথে; "প্রেমের অভিষেক"এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম, তাতে কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, লোকেন্দ্রনাথ পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম [কবিতার দিক দিয়া তাহার ফল ভালই হইয়াছে। গ্রন্থকার]; 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় বাঙালী-ঘরের ঘরকন্নার যে আভাস আছে তার প্রতিও লোকে কটাক্ষ বর্ষণ করেছিল, ভাগ্যক্রমে তাতেবিচলিত হইনি, হয়তো দুচারটে লাইন বাদ পড়েছে।"

(রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, "চিত্রার" সূচনা, ৵-৶ পৃঃ)

"চিত্রা"-রচনার অব্যবহিত পূর্বে কবি 'নদী' নামক একটি সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; এবং তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হইয়াছিল। 'নদী' পর্বতোৎসারিতা, জনপদবাহিনী, সমুদ্রগামিনী নদীর জীবনেতিহাস; পদ্মাই সেই কবি-কল্পনার উৎস। যে নিরবচ্ছিন্ন চলমানতা নদীর ধর্ম, সেই চলমানতাই এই কবিতাটিরও প্রাণ, কিন্তু গতি মন্থর, কতকটা একতালা একটানাও বটে। সুদীর্ঘ অবকাশেও উচ্ছ্বসিত আবেগ কোথাও নাই, তবে বর্ণনায় চিত্রময়তার আভাস সর্বত্র। নদীই রবীন্দ্র-কবি-প্রাণের প্রতীক; নদীর চলমানতার মধ্যেই যেন কবি আপন অন্তর্নিহিত কবিধর্মের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন! অস্বীকার করিবার উপায় নাই, পদ্মার প্রভাবেই কবি-প্রাণের এই স্বাভাবিক ধর্ম প্রথম স্ফূর্ত হইল। পদ্মার বিরাট জলস্রোতের মধ্যে কবি একদিন জীবনের যে গতিধর্ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই জীবনের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জনস্রোতেও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই নিরবচ্ছিন্ন গতির স্রোতের মধ্যে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়া ঢেউয়ের ভাঙা-গড়ায়, জোয়ার-ভাঁটার বিচিত্র রূপে নানা রং, নানা রেখার প্রতিফলন তিনি নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছেন, দেখার আনন্দ কখনও আবেগে কখনও মননাভাসে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রকাশই তো রবীন্দ্র-কাব্য।

"বিদায় অভিশাপ" নাট্যাকারে গ্রথিত হইলেও "চিত্রাঙ্গদা"র মত ইহাও গীতিকাব্য, তবে নাটকীয় লক্ষণ একেবারে অনুপস্থিত নয়, বিশেষভাবে ইহার পরিণতিতে নাটকীয় ভঙ্গি সুস্পষ্ট। তবু, ইহাকে গীতিকবিতা-হিসাবে দেখিলেই ইহার প্রতি সুবিচার করা হয় বলিয়া আমার ধারণা। এই খণ্ডকাব্যটিতে কবির নিজস্ব প্রত্যয়-ভাবনা কিছু নাই। কচ দেবযানী ও তাহার আশ্রম পরিবেশের প্রতি অনুরক্ত; দেবযানীর প্রতি বুঝিবা তাহার অনুরাগাকর্ষণও আছে।

আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখী। বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব।

কিন্তু যাহা আছে তাহা তাহার কর্তব্যাকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল নয়। সেই কর্তব্য ও জীবনের গভীরতর উদ্দেশ্যের বশ্যতাই কচ-চরিত্রের দীপ্তি ও গৌরব। এই সহজ ও সরল অথচ সুদৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়বান চরিত্রের আশ্রয়েই দেবযানীর সহজ মানবিক শঙ্কা-লজ্জা-রাগ-ভয়-

কামনা-বাসনা-কম্পিত প্রেমহৃদয়ের বিকাশ। সাধারণ মানবিক প্রেম-বাসনার দীপ্তিই দেবযানীর দীপ্তি, এবং তাহা কিছু অশ্রদ্ধেয়ও নয়। দেবযানীর অভিশাপ ও কচের বর দুইই সত্য, দুইই জীবনধর্মগত; কচের চারিত্রশক্তির ও দেবযানীর প্রেম-হৃদয়ের রাগাশ্লিষ্ট অভিশাপ জীবনরস-রসিকের কাছে দুইই একই মূল্য বহন করে, এবং দুইএর বিকাশ ও পরিণতি অপূর্ব কাব্যময়। একটু শুধু আপত্তি; যে-কৌশল অবলম্বন করিয়া দেবযানী কচের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে, তাহার মনের সন্ধান লইতে চলিয়াছে, অর্থাৎ বনভূমি, বটতল, আশ্রম-হোমধেনু, স্রোতস্বিনী, বেণুমতী প্রভৃতি আবেষ্টনের আলম্বে দেবযানীর যে-প্রয়াস তাহা যেন একটু সুলভ বলিয়া মনে হয়, কতকটা কালিদাসের শকুন্তলার কলা-কৌশলের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

'বিদায়-অভিশাপ' পড়িতে বসিয়া কবির প্রকাশ-ভঙ্গির একটা নূতনত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "প্রভাত-সংগীত" হইতেই, বিশেষ ভাবে "মানসী-সোনার তরী-চিত্রা"য় যে কল্পনার মুক্তপক্ষ গতি, দুর্বার উচ্ছ্বাস, বেগবহুল বর্ণবহুল দুর্নিবার স্রোতাবেগ লক্ষ্য করা যায়, তাহা যেন এই খণ্ডকাব্যটিতে অনেকটা সংযত ও সংহত রূপ ধারণ করিয়াছে। বস্তুত 'বসুন্ধরা', 'মানসসুন্দরী,' 'সমুদ্রের প্রতি,' এমন কি 'প্রেমের অভিষেক,' 'বিজয়িনী' 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ততর কবিতায়ও মনে হয়, কবি যেন কি এক দুর্বার স্রোতে উচ্ছ্বসিত বেগে ভাসিয়া চলিয়াছেন, থামিবার বা পাঠকদেরও থামাইবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; মনে হয়, তিনি নিজে লিখিতেছেন না বা বলিতেছেন না, তাঁহাকে আর কেহ লেখাইয়া বলাইয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। এমন উচ্ছ্বসিত আবেগ, এ যেন পূর্ণিমার জোয়ারের স্রোত! আশ্চর্য, "বিদায় অভিশাপে" এ-আবেগ অনেকাংশে সংযত, স্রোত বহুলাংশে সংহত। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, নাটকীয় বন্ধনের প্রয়োজনেই বোধ হয় এই সংযত রূপের প্রযোজন হইয়াছে; কিন্তু একটু পরেই মনে হয়, কচ-চরিত্রের সংযমও হয়ত ইহার অন্যতম কারণ, অর্থাৎ বিষয়বস্তু দ্বারা এই রূপ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত।

"চৈতালি" প্রথম প্রকাশিত হয় মোহিতবাবু-সম্পাদিত "কাব্যগ্রন্থাবলী"র মধ্যে। ইহার নাম সম্বন্ধে কবি "কাব্যগ্রন্থাবলী"র ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "চৈতালি শীর্ষক কবিতাগুলি লেখকের সব শেষের লেখা। তাহার অধিকাংশই চৈত্র মাসে লিখিত বলিয়া বৎসরের শেষ উৎপন্ন শস্যের নামে তাহার নামকরণ করিলাম।" হয়ত কবি একথা মনে করিয়া থাকিতে পারেন যে, এই কবিতাগুলি তাঁহার কবি জীবনের শেষ ফসল; এই ধরনের ধারণা উত্তর-জীবনে বার বার কবির মনে জাগিয়াছে। তবে সত্য সত্যই "চৈতালি" একটি সুদীর্ঘ জীবন-পর্যায়ের শেষ ফসল বলিলে অন্যায় কিছুই বলা হয় না।

"চিত্রা"তেই আমরা দেখিয়াছি জীবনের একটি পর্যায় পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্য-সুধায় জীবন একেবারে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে; বুঝি বা উপছাইয়া পড়িয়া যাইবে, এমন মনে হইতেছে। "চৈতালি"র প্রথম কবিতাতেই কবি তাই বলিতেছেন, আমার জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জ বনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরিয়াছে, পূর্ণ পরিপক্ব ফলে সমস্ত জীবন ফলবান হইয়া উঠিয়াছে, এখনই বুঝি তাহা ফাটিয়া পড়িয়া যাইবে এমনই মনে হইতেছে, অথচ তাহা ফাটিয়া পড়িতেছে না। তুমি তোমার শুক্তিরক্ত নখর-দ্বারা এই বৃন্তগুলি ছিন্ন কর, দশন-দংশনে পূর্ণ ফলগুলি টুটাইয়া দাও।

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতলে,
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

* * *

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেল বৃন্তগুলি,—
সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস আঙুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহো তুলি তুলি,
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক্‌ পূর্ণ ফলগুলি। ('উৎসর্গ')

যে মুহূর্তে মনের মধ্যে এই অনুভূতি জাগিল, মুহূর্তে মনে হইল একটি জীবন তাহার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত হইতেই সেই জীবন হইতে মুক্তি পাইবার, সেই জীবন অতিক্রম করিবার একটা ইচ্ছা মনের গহনে মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল। "চৈতালি"তেই তাহার প্রথম আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আভাস মাত্রই, তাহা এখনও রূপ-পরিগ্রহ করে নাই, এবং "কল্পনা"র আগে সে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি না, যদিও "চৈতালি" এবং "কল্পনা"তেও পাশে পাশেই এমন কবিতা আছে যাহার মধ্যে আমরা "সোনার তরী-চিত্রা"র জীবনের নিসর্গানুভূতিরই পরম প্রকাশ দেখিতে পাই। ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়; এক জীবন হইতে অন্য জীবনে কবিচিত্তের যাত্রাপথ এত সহজ ও সরল নয়। প্রথমত, যে-জীবন হইতে মুক্তি কবি কামনা করিতেছেন তাহা রূপ পরিগ্রহ করিতে সময় লয়, এবং দ্বিতীয়ত, রূপ পরিগ্রহ করা হইলেও অনাগত জীবনের মূর্তি সহসা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। জীবনান্তর যে হইবে "চৈতালি"তে তাহার আভাস কিছু কিছু আমরা পাই, কিন্তু তাহা কতকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল "কল্পনা"য়। তবুও "নৈবেদ্য" এবং "খেয়া"র আগে অনাগত জীবনের মূর্তি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল না। "চৈতালি"র পর হইতে "নৈবেদ্য"র পূর্ব পর্যন্ত যে কবিজীবন, সে-জীবনকে আমরা এই হেতু একটা জীবনসন্ধি-যুগ বলিতে পারি।

"চৈতালি"তে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে চতুর্দশপদী কবিতাগুলি, কতকটা আলগা ভাবে সনেটও ইহাদের বলা যাইতে পারে। "কড়ি ও কোমলে"ই চতুর্দশপদী রূপের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং পরে "নৈবেদ্যে" ইহার সুনির্দিষ্ট রূপ ধরা পড়ে। এই ছোট ছোট কবিতাগুলি যাঁহারা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, "সোনার তরী-চিত্রা"র জগৎ হইতে কবি ক্রমশ দূরে সরিয়া আসিতেছেন, মনের ভাবনা, কল্পনা ও অনুভূতি ধীরে ধীরে ভিন্ন রূপ লইতেছে। "চৈতালি"র প্রথম কবিতাতেই দেখিতেছি যে-সুরটি ধ্বনিত হইতেছে তাহা পূর্ণতার সুর, তৃপ্তির সুর। এই পূর্ণতা, এই তৃপ্তি আসিয়াছে একটি অখণ্ড নিসর্গানুভূতি হইতে, মানুষ, প্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্য, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, কোনও বস্তুই বিচ্ছিন্ন নয়, একে অন্যের সঙ্গে নিবিড় প্রেমে আবদ্ধ,

কোথাও কোনও ছেদ নাই—এই অনুভূতি হইতে। "চৈতালি"র ছোট ছোট কবিতাগুলিতেও এই পুর্ণতার সুরটি ধরা পড়ে। মানুষ ও প্রকৃতি দুইএ মিলিয়া কবিতাগুলিকে অপরূপ মাধুর্য দান করিয়াছে। শুধু নিসর্গ নয়, মানবতার মহিমাও এই কবিতাগুলিতে সুস্পষ্ট; "চিত্রা"র 'স্বর্গ হইতে বিদায়', "সোনার তরী"র 'বৈষ্ণব কবিতা' প্রভৃতি কবিতায় মানব-মহিমা যে ভাবে পুজা পাইয়াছে, "চৈতালি"তে দেখিতেছি সেই মানব-মহিমাকে কবি উপলব্ধি করিতেছেন আরও তুচ্ছতর বস্তু ও ঘটনার মধ্যে, এবং পরে "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে এই উপলব্ধি আরও সত্য আরও স্পষ্ট হইতেছে। কবি মনে করেন, এই মানব-মহিমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হইয়াছিল প্রাচীন ভারতের সাধনা ও ঐতিহ্যের মধ্যে; ভারতীয় প্রতিভার প্রধান বিশেষত্বই এই মানব-মহিমা। এই পরিপুর্ণ-মানব মহিমার আদর্শের সঙ্গে যখন তিনি আমাদের বর্তমান বাঙালী জীবনের তুলনা করেন, তখন আমাদের জীবনের পঙ্গুতা, খর্বতা ও দৈন্য তাঁহাকে পীড়িত করে; আমরা যখন বিশ্বের সমগ্রতার কথা ভুলিয়া জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া 'দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে ক্ষয়' করি, তখন কবিচিত্ত ক্ষুব্ধ হয়, পরিপুর্ণ মানব-মহিমার খর্বতায় চিত্ত পীড়িত হয়। সে-বেদনার আভাস "চৈতালি"র অনেক কবিতায় সুস্পষ্ট।

এই মাত্র "চৈতালি"র কবি-মানসের যে পরিচয় উল্লেখ করিলাম, তাহার পুর্ণতর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় "নৈবেদ্য" গ্রন্থে। এইজন্য একাধিক টীকাকার "চৈতালি"কে "নৈবেদ্য" কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ বর্ণনা সত্য। যে মানব-মহিমা, যে মাটির প্রতি আকর্ষণ, প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি যে মুগ্ধ সশ্রদ্ধ দৃষ্টি "চৈতালি"র কবিতাগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহারই পরিপুর্ণ প্রকাশ আমরা লাভ করি "নৈবেদ্য" গ্রন্থে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, একটা জীবন-পর্যায় শেষ হইতে না হইতেই আর একটা জীবনের অরুণাভাস ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে। তাহার আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ "চৈতালি"র কবিতাগুলির মধ্যে সহজেই ধরা পড়ে; এই সুগভীর শান্তি, স্নিগ্ধ দীপ্তি, এবং সমাহিত চৈতন্য "কল্পনা" গ্রন্থে আরও সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্র-কাব্যের মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, কবিমানসের ইতিহাসে "চৈতালি" একটু আকস্মিক, আঙ্গিক ও ভাব-প্রসঙ্গ উভয়তই। "সোনার তরী-চিত্রা"র ভাবযুক্তিগত ধারাবাহিকতা "চৈতালি"তে অনুপস্থিত; "চৈতালি" কাব্যেতিহাসের ক্রমিক পরিণতির বাহিরে না হইলেও কতকটা একপাশে। "সোনার তরী"র প্রত্যক্ষ জীবনানন্দ, "চিত্রা"র জীবনজিজ্ঞাসাগত মনন-সমৃদ্ধি, এবং দুইএরই ভাবগভীর চিত্রসৌন্দর্য, "চৈতালি"র মৃদু, ক্ষীণ, স্বল্পপরিসর এবং কতকটা চিন্তালেশহীন অর্ধ-উদাসীন দৃষ্টি এই দুই-এর মধ্যে জীবনেতিহাসের বিবর্তন খুঁজিতে গেলে ভুল করা হইবে। এই হিসাবে "চৈতালি" একটু 'আকস্মিক' ও 'অপ্রত্যাশিত'। কবি নিজেও "চৈতালি"র এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন। পঞ্চম খণ্ড "রচনাবলী"তে "চৈতালি"র সূচনায় তিনি বলিতেছেন, "চৈতালি···এক টুকরো কাব্য, যা অপ্রত্যাশিত। স্রোত চলছিল যে রূপ নিয়ে অল্প কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালের জন্য তার মধ্যে আকস্মিকের আবির্ভাব হল।" "সোনার তরী-চিত্রা"র সঙ্গে যেমন "চৈতালি" ক্রমবিবর্তনের অচ্ছেদ্যসূত্রে গাঁথা নয়, তেমনই নয় পরবর্তী "কল্পনা-ক্ষণিকা-কাহিনী"র সঙ্গে। "সোনার তরী-চিত্রা"র বর্ণ ও বর্ণনা-প্রাচুর্য, ভাবোচ্ছ্বাসের উন্মাদনা "চৈতালি"তে অনুপস্থিত।

"চৈতালি"র বিশিষ্ট অংশ তাহার চতুর্দশপদীগুলি। বলাই বাহুল্য ইহারা কতকটা শিথিল, আঙ্গিকের দিক হইতে অত্যন্ত সরল, সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধতা ইহাদের নাই। ইহাদের সুরও অত্যন্ত মৃদু, ক্ষীণ, ইহাদের রং একরঙা, রেখা লঘু। এই চতুর্দশপদীগুলিকে যদি একরঙা লঘু রেখাচিত্র বলা যায় তাহা হইলে খুব অন্যায় বলা হয় না। বস্তুত "চৈতালি" ত বিরাট পদ্মার কাব্য নয়, "চৈতালি" ক্ষীণকায়া মন্থরগামিনী গ্রাম্য শাখা-নদীর কাব্য; তাহার দুই তীরে সরল মৃদু, ক্ষীণ একরঙা গ্রাম্য-জীবন; নৌকার ছাতে বা জানালায় বসিয়া সেই জীবন কবি দুই চোখ ভরিয়া দেখিয়াছেন, সরল রেখায় বিরল বর্ণে তাহারই নিরলংকার ছবি তিনি ছোট ছোট কবিতায় গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। গীতিকবিতার যে প্রাণধর্মে "চৈতালি"-গ্রন্থের উন্মেষ, যে উত্তাপ ও উন্মাদনা 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জ বনে' ইত্যাদি কবিতায় সুস্পষ্ট, "চৈতালি"র বিশিষ্ট কবিতাগুলিতে তাহা নাই। মানুষের সহজ সরল গ্রাম্য জীবনযাত্রার টুক্‌রা টুক্‌রা ছবির মধ্যে সে উত্তাপ ও উন্মাদনার স্থানই বা কোথায়? বরং এই সব ছবির মধ্যে যাহা আছে তাহা কিছু বর্ণনা, কিছু গল্প, কিছু বা তত্ত্ব বা নীতিকথা। এই সব গল্প ও বর্ণনা এমন কি তত্ত্বকথাগুলি পর্যন্ত এত নিরলংকার ও বিরলসৌষ্ঠব, এবং আমাদের অতি-পরিচিত বাংলার নদী, নদীর দুই তীর, কাশবন, ধানক্ষেত, নদীর চর, এক কথায় সমতটীয় গাঙ্গেয় বাংলা-দেশের প্রেক্ষাপটে এমন একটি মৃদু সৌরভের, অর্ধউদাসীন স্মৃতি-চিত্রের বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, যাহার ফলে আঙ্গিকের তরল শৈথিল্য সত্ত্বেও "চৈতালি" কাব্যরসিকের পরম সমাদরের যোগ্য। "রচনাবলী"তে (৫ম খণ্ড) "চৈতালি"র সূচনায় কবির মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

"পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালি স্তূপ, অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসল কাটা শস্যক্ষেত ধু ধু করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকাল এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম; মন দিয়ে বই পড়বার মতন অবস্থা নয়। বোটের জানালা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষ বোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে এটাই যথেষ্ট তখন তার উপর রং লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। "চৈতালি"র ভাষা এত সহজ হয়েছে এই জন্যই।"

এই যে দেখা এ একান্তই চোখ দিয়া দেখা, মন প্রায় অর্ধউদাসীন অর্ধনিদ্রিত।

পাঁচ

কথা (১৩০৪—১৩০৬*)
কাহিনী (১৩০৪—১৩০৬)
কথা ও কাহিনী (১৩১৫ প্র)
কল্পনা (১৩০৪—১৩০৮)
কণিকা (১৩০৬)
ক্ষণিকা (১৩০৭)

"এই গ্রন্থে যে সকল বৌদ্ধ কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরেজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরেজি

* "কথা" ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শিখ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে। * * *" গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন, প্রথম সং, "কথা।"

"মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত, বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত কাব্য গ্রন্থে (১৩১০) কথার কবিতাগুলি দুই অংশে প্রকাশিত হয়, 'কাহিনী ও কথা'। কথার প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত 'দেবতার গ্রাস' ও 'বিসর্জন' এবং সোনার তরীর 'গানভঙ্গ' চিত্রার 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি', মানসীর 'নিষ্ফল উপহার,' ও কোনো গ্রন্থে অপ্রকাশিত 'দীন দান' (ভারতী, ১৩০৭) কাহিনী অংশের অন্তর্গত হয়। কথার অবশিষ্ট কবিতাগুলি, ও চিত্রার 'ব্রাহ্মণ' এবং মানসীর 'গুরুগোবিন্দ' কবিতা কথা অংশে মুদ্রিত হয়। পরে দুই অংশের কবিতা লইয়া ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে, স্বতন্ত্রভাবে 'কথা ও কাহিনী' নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। তদবধি এই গ্রন্থ এইভাবেই পরিচিত ও প্রচলিত।" রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, ৫২৭ পৃঃ।

"প্রথম প্রকাশিত 'কাহিনী' গ্রন্থে নাট্যকাব্য ও কয়েকটি কবিতা ছিল; মাঝে সে গ্রন্থ প্রচলিত ছিল না। 'কথা'ও বর্তমানে প্রচলিত আছে। তবে 'কথা ও কাহিনী' নামে যে-গ্রন্থ বর্তমানে সুপরিচিত—তাহার 'কাহিনী' অংশ নূতন সংগৃহীত পুস্তক। মোহিতচন্দ্র সেন ১৩১০ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ ও সম্পাদন করেন, তখন পুরাতন বইগুলির অনেক ভাঙাচোরা হয়। সেই সময় 'কাহিনী'র নাট্যগুলিকে পৃথক করিয়া 'নাট্যকাব্য' বলিয়া গ্রন্থ প্রণীত হয়; আর কতকগুলি কাহিনী 'সোনার তরী' 'চিত্রা' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া 'কাহিনী' নামে একটি খণ্ড প্রস্তুত করেন। পরে ১৯১০ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস 'কথা ও কাহিনী' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী" ১ম খণ্ড, ৬৪২—৪৩ পৃঃ)

"কথা" গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া "ক্ষণিকা" পর্যন্ত যে কবি-জীবন তাহাকে একটা জীবনসন্ধিযুগ বলা যাইতে পারে, একথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার সত্যতা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ আরও প্রকাশ পাইবে। "সোনার তরী-চিত্রা"র প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময় জীবন ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইবে, তাহা শুধু কবির কাব্য-চেতনার অংশ মাত্র হইয়া থাকিবে; এখন হইতে জীবন নবতর সাধনার পথে ক্রমশ অগ্রসর হইবে, জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা ধীরে ধীরে জাগিবে। "কথা ও কাহিনী" গ্রন্থ হইতেই ইহার সূত্রপাত, কিন্তু পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় "কল্পনা"-গ্রন্থে। সৌন্দর্য-তন্ময় ছিল যে-চিত্ত, নিসর্গ-সাধনায় নিমগ্ন ছিল যে-চিত্ত সেই চিত্ত ক্রমশ একটা মহাজীবনকে উপলব্ধি করিবার জন্য কি ভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, একটা শান্তসমাহিত সাধনা কি করিয়া ধীরে ধীরে কবিচিত্তকে সবলে টানিতেছে তাহার ইতিহাস বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

"কাহিনী", "কথা", "কণিকা" রচনার সঙ্গে সঙ্গেই "কল্পনা"র জগৎ পাশাপাশি চলিতেছিল, কাজেই গ্রন্থ-প্রকাশের ক্রম পর পর হইলেও সব কয়টি গ্রন্থই মোটামুটি ভাবে একই মানস-জগতের সৃষ্টি। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে একই মনের প্রকাশ বিচিত্রভাবে এই সময়ের রচনাগুলিতে ধরা পড়িয়াছে, অথচ রূপের দিক হইতে "কাহিনী"র সঙ্গে "কণিকা"র অথবা, "কথা"র সঙ্গে "কল্পনা"র কত প্রভেদ।

"কাহিনী"তে কয়েকটি নাট্যকবিতা আছে; 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' এবং 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' সব কয়টি রচনাই একান্তভাবে গীতধর্মী; কিন্তু ইহাদের নাটকীয় গুণও অনস্বীকার্য। নাটক ও নাটিকা অধ্যায়ে ইহাদের সম্বন্ধে বিশদতর আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সাহিত্যের দিক হইতে ইহাদের কবিতা হিসাবেও আলোচনা করা চলে। এক 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ছাড়া আর চারিটি নাট্য-কবিতার উপাদান আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে আহৃত, এবং সব কয়টিতেই কবি প্রচলিত লোকধর্ম, সমাজধর্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে মানবের চিরন্তন সত্য নিত্যধর্মের জয়ঘোষণা করিয়াছেন।

"কথা"-গ্রন্থের উপাদানও আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে আহৃত; এবং আমাদের অতীত ইতিহাসের অসংখ্য ছোট ছোট আপাত তুচ্ছ ঘটনা ও কাহিনীর মধ্যে যে ত্যাগ,

ক্ষমা, বীরধর্ম এবং মানব-মহত্ত্বের অন্যান্য যে সব গুণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই এই সুন্দর গাথা ও কবিতাগুলির প্রাণরস জোগাইয়াছে। মানব-মহত্ত্বের, মানবের চিরন্তন সত্য নিত্যধর্মের যে মহান রূপ আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে থাকিয়া থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার উপলব্ধিতে ধরা দিয়াছে, এবং "কাহিনী" ও "কথা"-গ্রন্থে তাহাই রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য কিশোর বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল। বৈষ্ণব পদকর্তাদের জগৎ, কালিদাসের জগৎ তাঁহার কাছে অত্যন্ত পরিচিত ছিল, এবং তাহা হইতে প্রেম ও সৌন্দর্যসুধারস তিনি কম আহরণ করেন নাই। তাঁহাদের জগৎকে তিনি নিজের চিত্তের মধ্যে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কল্পনায় রঞ্জিত করিয়াছেন, এবং তাহারা তাঁহার কাব্য চেতনার অংশ হইয়া গিয়াছে। "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" হইতে আরম্ভ করিয়া "চিত্রা" পর্যন্ত কত অসংখ্য কবিতায় যে এ কথার প্রমাণ আছে, তাহা পাঠককে দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিলেই দেখা দেখা যাইবে, যে প্রাচীন ভারতীয় জগৎ ও জীবনের পরিচয় এই সব কাব্যে আমরা পাই, সে-জগৎ ও জীবন, এবং "চৈতালি" হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-জীবনে রচিত কাব্যে যে অতীত ভারতীয় জীবন ও জগতের পরিচয় পাওয়া যায়, এই দুই জগৎ ও জীবন এক নয়। পূর্বজীবনের রচিত কাব্যে ভারতীয় সাধনার যে খণ্ড অংশ তাঁহার কবিচিত্তে প্রাণরস সঞ্চার করিয়াছে, অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহা প্রেম ও সৌন্দর্য-সাধনা, নিসর্গ-সাধনার অংশটুকু মাত্র। কিন্তু উত্তর-কবিজীবনে দেখিতেছি ভারতীয় সাধনার অন্য আর একটি গভীর দিক কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। "চৈতালি" হইতেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছে, এই গ্রন্থের অধিকাংশ চতুর্দশপদী কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে। তিনি যে ক্রমশ ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনাদর্শের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন, আমাদের খণ্ড বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র জীবন যে কবিকে পীড়িত করিতেছে, মানবের চিরন্তন মহিমা ও মহত্ত্ব যে শত আবরণ ভেদ করিয়াও তাঁহার মন ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছে এবং কল্পনাকে সবল করিতেছে, মানুষের এই তুচ্ছ সংসারের মধ্যেই যে দেবতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, "কুমারসম্ভবে"র অসমাপ্ত গানেই যে তাঁহার ভাল লাগিতেছে, এ সমস্ত হইতেই বোঝা যায় তাঁহার কবিচিত্ত কোন্ দিকে মোড় ফিরিতেছে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শুধু প্রেম, সৌন্দর্য, এমন কি নিসর্গ-সাধনাও কবিকে আর তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না, তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না, ভারতীয় ঐতিহ্যের সৌন্দর্য ও নিসর্গ সাধনার মূল্য তাঁহার কাছে ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসও অন্য দিক দিয়া, গভীরতর দিক দিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। পূর্বজীবনের 'মেঘদূতে'র সঙ্গে "চৈতালি"র 'কালিদাসের প্রতি', 'কুমারসম্ভব গান', 'মানসলোক', 'কাব্য' এই চারিটি কবিতা তুলনা করিলেই একথার সত্যতা ধরা পড়িবে। বেশ বুঝা যাইতেছে, জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার, তাহার মর্মমূলে প্রবেশ করিবার, মানস-সৌন্দর্য শুধু নয়, মানব-মহত্ত্বকে গভীরভাবে জানিবার একটা চেষ্টা কবিচিত্তে জাগিয়াছে। এই তপস্যা রূপ ধরিল "কাহিনী" ও "কথা" গ্রন্থে ভারতীয় ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া, এবং সেই ঐতিহ্যেরও সেই দিক যে-দিকে মানব-মহত্ত্ব বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই মানব-মহত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্র-কবিচিত্ত সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপন করিল। এই কথাটি উপলব্ধি করিলে "কথা ও কাহিনী"র মূল্য নির্ধারণ সহজ হইবে। অবশ্য খণ্ড খণ্ড প্রত্যেকটি

কবিতার একটা স্বাধীন মূল্য আছে, একথা বলাই বাহুল্য ; কিন্তু সমগ্রভাবে, রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের দিক হইতে "কথা" ও "কাহিনী" গ্রন্থের উপরোক্ত এই বিশেষ মূল্য আছে, একথা স্বীকার না করিলে রবীন্দ্র কাব্যজীবনের প্রবাহ বোধ-গোচর হইবে না।

"কথা" ও "কাহিনী"-গ্রন্থের এই ঐতিহ্য-অবগাহন সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

"একদিন এল যখন আর-একটা ধারা বন্যার মতো মনের মধ্যে নামলো। কিছুদিন ধরে দিল তাকে প্লাবিত করে। ইংরেজি অলংকার শাস্ত্রে এই শ্রেণীর ধারাকে বলে ন্যারেটিভ। অর্থাৎ কাহিনী। এর আনন্দ-বেগ যেন থামতে চাইল না। * * * মনের সেই অবস্থায় কখনো কখনো কাহিনী বড়ো ধারায় উৎসাহিত হয়ে নাট্যরূপ নিল।

এসব লেখার ভালোমন্দ বিচার করা অনাবশ্যক, চিন্তার বিষয় এর মনস্তত্ত্ব। * * * ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথার কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। * * *

ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে, নিরাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখায়। সেইজন্যে মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্তনা এমন বিষয়বস্তুকে স্বভাবত বেছে নেয় যার ভিত্তি বাস্তবে। এই সন্ধানে এক সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে। এই সময়ে এই বহির্দৃষ্টির প্রেরণা কাব্যে ও নাট্যে ভিড় করে এসেছিল ইতিহাসের সঞ্চয় নিয়ে। এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।" (রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, "কথা" ও "কাহিনী" গ্রন্থের সূচনা)।

কবির ব্যাখ্যা যাহাই হউক, এই ঐতিহ্য-অবগাহনের একটু ইঙ্গিত বাংলা দেশের সমসাময়িক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন। "কথা" ও "কাহিনী" গ্রন্থের চিত্রমালার পশ্চাতে সেই সমাজ-মানস ক্রিয়াশীল। বঙ্গাব্দ দ্বাদশ শতকের শেষপাদ হইতে, বিশেষভাবে ত্রয়োদশ শতকের সূচনা হইতেই বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের দেশের ঐতিহ্যবোধ প্রবল হইতেছিল। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র হইতেই তাহার সূচনা। শুনিতে হঠাৎ খট্‌কা লাগিতে পারে কিন্তু একথা সত্য যে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষাও রমেশচন্দ্রে এই বোধ প্রবল ছিল। বঙ্কিম-মানস প্রধানত রোম্যান্স-নির্ভর, রমেশচন্দ্র অধিকতর ইতিহাসানুগামী। কিন্তু সে যাহাই হউক, বহুদিন পর্যন্ত এই ঐতিহ্যসন্ধান উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, পুরাণপ্রসঙ্গের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। বঙ্কিম-রমেশই বোধ হয় সর্বপ্রথম নিকটতর বাস্তবতর ঐতিহ্যের আহ্বান স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং এই স্বীকৃতির মধ্যেই শিক্ষিত বাঙালীর স্বাদেশিকতার সূচনা। তবু তাঁহাদের স্বীকৃতি প্রথমত ও প্রধানত আদর্শমূলীয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে স্বাদেশিকতার বোধও বিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে, এবং ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহাকে অতিক্রম করিয়া এই বোধ প্রবল হইতে থাকে। এই সময়ই দেশের প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের বিশদ আলোচনার সূচনাও দেখা যায়, এবং সে ইতিহাস অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ ও বাস্তবমূলীয়। এই সমস্তই পরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনের ভাবভূমিকা। বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ঐতিহ্যবোধগত ভাবভূমির উপরই তো স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা। যে-ঐতিহ্যবোধ ও সন্ধানের কথা বলিলাম, ঠাকুরবাড়ি তাহার একটি কেন্দ্র, এবং "জীবন-স্মৃতি"র রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রসঙ্গ এই সম্পর্কে একান্তভাবে স্মরণীয়। সূক্ষ্ম ও বোধপ্রবণ রবীন্দ্রচিত্তে ইহার এবং নবজাগ্রত দেশবোধের ইঙ্গিত ব্যর্থ যায় নাই। সজ্ঞানে তীক্ষ্ণ বোধ ও বুদ্ধির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ইহাকে স্বীকার করিলেন, স্বীকার যে করিলেন তাহার প্রমাণ তদানীন্তন রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস গ্রন্থ-সংগ্রহ, এবং অত্যন্ত যত্নে ভারত-ইতিহাস পাঠ। কি সুকঠোর অধ্যবসায়ে তিনি তদানীন্তন ঐতিহাসিক গবেষণাগুলি

পাঠ করিতেন এবং ছাত্রের মতন করিয়া টীকা-টিপ্পনী উদ্ধার করিতেন তাহার কিছু কিছু সাক্ষ্য ত এখনও আমরা দেখিতে পাই। এই ভাবে ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্যের সন্ধান তিনি লাভ করিলেন তাহাই ত তাঁহার স্বাদেশিকতার মূলে, এবং অনেক সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং ঐতিহাসিক নিবন্ধে (এ জাতীয় অধিকাংশ নিবন্ধ ১৩০০-১৩১৫এর লেখা) তিনি যে সমস্ত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মূলে। নিবন্ধগুলিতে যাহা বিচারবুদ্ধিতে বিশ্লেষিত হইয়াছে, ব্যাখ্যাত হইয়াছে, "কথা" ও "কাহিনী"র আখ্যানগুলিতে তাহাই শিল্পরূপে ও রসে উৎসারিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে স্বদেশীযুগে কর্মে ও চিন্তায়, বক্তৃতা ও রচনায় যে ভাবে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহার সমস্ত কিছুর মানসমূল এই সময়কার ঐতিহ্যচর্চা, এবং এই সময়ই তাঁহার দেশ তাঁহার নিকট সর্বপ্রথম সত্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হইল। তিনি যে ভাবে দেখিলেন তাহাই যে দেশের যথার্থ বস্তুরূপ একথা মনে করা কঠিন, অথবা তাহা একতম রূপও হয়ত নয়। ইতিহাসের গভীরতর চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সে রূপ ত আমাদের দৃষ্টির সম্মুখেই বদলাইয়া গিয়াছে। অন্য রূপও যে আছে এ-প্রসঙ্গে আমরা সচেতন হইয়াছি। তবু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, রবীন্দ্রচিত্তে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাস যে-দৃষ্টিতে যে-রূপে ধরা দিয়াছিল সেই দৃষ্টি ও রূপই বহুদিন পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, সেই দৃষ্টি ও রূপই আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের মানসভূমি। একথা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিবার-স্থান এই গ্রন্থ নয়। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, এই দৃষ্টিরূপ ইতিহাসের সমগ্র জ্ঞান হইতে উদ্ভূত নয়, বস্তুমূলীয় হওয়া সত্ত্বেও বস্তুকে সমগ্ররূপে দেখা হয় নাই, পৌর্বাপর্যের ঐতিহাসিক যুক্তি এই দৃষ্টিরূপের অন্তর্গত নয়। উত্তর-জীবনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহা বার বার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে ও নিবন্ধে।

কিন্তু, তাহা বলিয়া "কথা" বা "কাহিনী"র আখ্যানগুলি রসসমৃদ্ধ নয়, একথা কিছুতেই বলা চলিবে না। ইতিহাসের খণ্ডিত দৃষ্টি লইয়া বিশিষ্ট আখ্যানের বা পরিবেশের কাব্যরূপের মধ্যে রসসঞ্চার চলে না, একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা সাহিত্যের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে মিথ্যা ধারণা পোষণ করেন। রসসঞ্চার বা রূপায়ন বিষয়বস্তুগত ঐতিহাসিক গুণাগুণের অপেক্ষা রাখে না, তাহা শুধু রচয়িতার মানস প্রকৃতিকে উদ্ঘাটিত করে, তাহার চেয়ে বেশি কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে-প্রকৃতি যে কি তাহা তো আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

"কথা"-গ্রন্থের আখ্যানগুলি সমস্তই ঐতিহাসিক; "কাহিনী"র কবিতগুলি কাল্পনিক, কিন্তু কাল্পনিক হইলেও তাহা ঐতিহ্যগত, অর্থাৎ ভারতীয় চিত্তধর্মের যে প্রকাশ "কথা"র আখ্যানগুলিতে, "কাহিনী" অংশের আখ্যানগুলিও সেই একই চিত্তধর্মী। কিন্তু "কাহিনী" নাট্যকবিতার আখ্যানগুলির উৎস একটু পৃথক। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ও 'সতী' ছাড়া আর তিনটি নাট্য-কবিতারই উৎস ভারতীয় পুরাণ কথা, 'সতী'র উৎস মারাঠি গাথা যাহা প্রায় ইতিহাসেরই অন্তর্গত। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' কাল্পনিক। কিন্তু পুরাণ-কথা যে তিনটি নাট্যকবিতার উৎস, সে তিনটি একান্তভাবে পুরাণানুগামী একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে। "কাহিনী"র অন্তর্গত 'পতিতা' কবিতাটিও পুরাণানুগামী নয়। বস্তুত ইহাদের প্রত্যেকটি চরিত্রই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, প্রত্যেকটি কাহিনীই নূতন পথনির্দেশে এবং নূতন ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। পৌরাণিক অথবা ভারত-কথার মূল হইতে তাহারা স্বতন্ত্র শুধু নয়, তাহারা অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি পীড়িত ও সংক্ষুব্ধ; সমস্যা ও সংগ্রামে, প্রেরণা ও আদর্শে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও আবেগগভীর।

'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', বিশেষভাবে 'সতী' ও 'নরকবাসে'র নাটকীয় গুণও সুস্পষ্ট; সে কথা আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এগুলি ত নাটকাকারেই লিখিত। কিন্তু "কথা" ও "কাহিনী"র ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক আখ্যানগুলি নাটকাকারে লিখিত নয়; তবু কতকগুলি আখ্যানের কাব্যরূপের মধ্যে নাটকীয় আভাস লক্ষ্য করিবার মতন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় 'দেবতার গ্রাস' বা 'বন্দী বীরে'র মত কবিতা। এই জাতীয় আরও দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয়। এই আখ্যানগুলির চিত্রপ্রবর্তনার মধ্যে একটা নাটকীয় পরিকল্পনা ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় না এবং ইহাদের ট্র্যাজিক্ পরিণতির মধ্যে কবি একটা নাটকীয় সম্ভাবনাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। "কথা" ও "কাহিনী"র অনেক আখ্যানমূলক কবিতাতেই এই নাটকীয় রসের সঞ্চার কাব্যরসিকের সমাদরের যোগ্য।

"কণিকা"র অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা 'লিরিক' জাতীয়। ইহাদের প্রেরণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোথাও তত্ত্বমূলক, কোথাও উপদেশমূলক, কোথাও ব্যঙ্গ-হাস্যমূলক। কতকগুলি দুই অথবা চার লাইনের ছড়া আছে যাহা কতকটা 'বচন' জাতীয়, যেমন—

দেহটা যেমনি করে ঘোরাও যেখানে
বাম হাত বামে থাকে ডান হাত ডানে।

অথবা,

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

যথার্থ কাব্যরসের সার্থক প্রকাশ এ-সব কবিতায় প্রায় অনুপস্থিত, তবে এমন কবিতাও আছে—

ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হতে শূন্যময়
মুহূর্তে নিখিল তবে হয়ে যেত লয়।
তুমি পরিপূর্ণ রূপ—তব বক্ষে কোলে
জগৎ শিশুর মতো নিত্যকাল দোলে।

এই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা পরবর্তী কালে কবিকে অনেক লিখিতে হইয়াছে, নানা উপলক্ষে নানা জনকে অনুগৃহীত করিবার জন্য। তাহার অনেকগুলি "লেখন" ও "স্ফুলিঙ্গ" গ্রন্থে একত্রে প্রকাশিতও হইয়াছে, এই দুই গ্রন্থের রচনাগুলি অনেক বেশি ভাবগভীর ও রসসমৃদ্ধ; তাহাদের সঙ্গে "কণিকা"র টুকরাগুলির তুলনাই হয় না।

"কল্পনা" কাব্য রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃষ্টি। নিছক অনাবিল কল্পনার সৌন্দর্য-মহিমা ও অপার বিস্তারের দিক হইতে ইহার কবিতাগুলি "চিত্রা"র কবিতা অপেক্ষা কম সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু "কল্পনা"র কবিতাগুলি উপভোগ্যতর হইয়াছে অন্য কারণে। "কথা" ও "কাহিনী"-গ্রন্থেই আমরা দেখিতেছি, মহাজীবনের আহ্বান কবির কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মানব-মহত্ত্বের গভীর আবেদন তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে, শান্ত সমাহিত তপস্যার জীবনের প্রতি তাঁহার কবিচিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে, একটা নিগূঢ় গভীর চেতনা তাঁহার সমগ্র কবি-মানসকে রূপান্তরিত করিবার উপক্রম করিতেছে। "কল্পনা"-গ্রন্থে "সোনার তরী-চিত্রা"র সৌন্দর্য-তন্ময়তার সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে নবলব্ধ এই নিগূঢ় গভীর চেতনা, এবং দুইএ মিলিয়ে কবির কাব্য চেতনাকে যে নূতন রূপ দান করিল তাহাই "কল্পনা"র কবিতাগুলিকে অপরূপ ঐশ্বর্যে ভরিয়া দিয়াছে।

গানগুলি বাদ দিলে "কল্পনা"য় কবি-চিত্তের দুইটি ধারা সহজেই ধরা পড়ে। একদিকে "সোনার-তরী চিত্রা"র প্রেম ও নিসর্গ-সাধনার প্রকাশ স্মৃতি ও ঐতিহ্য সম্পদে, শব্দ ও ধ্বনিগাম্ভীর্যে, ছন্দে ও লালিত্যে, ভাবগরিমায় এবং সৌন্দর্যমহিমায় অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে,—'বর্ষামঙ্গল', 'স্বপ্ন', 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পরে', 'পসারিণী', 'শরৎ' প্রভৃতি কবিতা তাহার প্রমাণ। আর একদিকে, যে নিগূঢ় গভীর সমাহিত চৈতন্যের কথা আগে উল্লেখ করিয়াছি, সেই চৈতন্য আপনাকে প্রকাশ করিতেছে 'দুঃসময়', 'ভ্রষ্টলগ্ন', 'বিদায়', 'অশেষ', 'বর্ষশেষ', 'অসময়', 'বৈশাখ', 'রাত্রি' প্রভৃতি কবিতায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে নিসর্গ-সাধনার প্রকাশ জড়াইয়া নাই একথা বলা যায় না। আসল কথা, কোনও কাব্যকে, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-কাব্যকে কোনও বিশেষ চিহ্নে, কোনও বিশেষ নামে চিহ্নিত অথবা নামাঙ্কিত করা যায় না। নানা বিভিন্ন ধারা, আপাতবিরোধী ভাব ও অনুভূতি একই কবিতায় হয়ত একটা সমগ্ররূপ ধরিয়া প্রকাশ পায়, বিশেষভাবে কবিজীবনের যুগসন্ধিকালে যে সব কাব্যের রচনা কবির সেই সব কবিতায়। তবু আলোচনা ও বিশ্লেষণ যখন আমরা করিতে বসি তখন নিজেদের বোধের সুবিধার জন্য প্রবলতর ভাব ও অনুভূতি অনুসারেই কাব্য-পর্যায়ের নামকরণ আমরা করিয়া থাকি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা ভুলিলে চলিবে না, কবির কাব্যে যে-মনের প্রকাশ আমরা দেখি সে-মনের মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া থাকে বিচিত্র ভাব ও অনুভূতির ধারা, শতেক যুগের গীতি, রসের সরু মোটা সহজ জটিল উপলব্ধি। তবু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য, সকল বিচিত্রতা, সকল জটিলতা অতিক্রম করিয়া এক এক সময় এক একটা সুর, এক একটা অনুভূতি প্রবলতর হইয়া প্রকাশের মধ্যে ধরা দেয়। "কল্পনা"য় ভাব ও উপলব্ধির এই জটিলতা ও বৈচিত্র্য খুব স্পষ্ট, এবং খুব স্বাভাবিকও; কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি "কল্পনা" কবি-জীবনের একটি যুগসন্ধিক্ষণের সুগভীর প্রকাশ। সেই হেতু "কল্পনা"র কতকগুলি কবিতায় ভাব ও রসের প্রকাশ একভাবে ধরা দিয়াছে, কতকগুলি কবিতায় অন্যভাবে।

নিসর্গ মহিমার অপরূপ সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায়।

> ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
> জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
> ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
> শ্যামগম্ভীর সরসা।
> গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
> উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
> নিখিল চিত্ত হরষা
> ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা। ('বর্ষামঙ্গল')

ইহার ধ্বনি ও ছন্দে, পদ-বিন্যাসে, শব্দ-চয়নে ও চিত্র-গরিমায় মত্ত নববর্ষার যে সুগভীর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় ইহার শব্দার্থের মধ্যে পাওয়া যায় না, যে মোহ-মাধুর্য ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে অতীত ভারতের বর্ষা-বিজড়িত স্মৃতি-ঐতিহ্য হইতে, তাহার উপাদান জোগাইয়াছে শতেক যুগের কবি; ঘনবর্ষার ধারায় যে গীত ধ্বনিত হয় তাহা ত এই কবিদেরই গীত—

> শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
> ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে
> শতেক যুগের গীতিকা। ('বর্ষামঙ্গল')

এই যে প্রাচীন যুগের স্মৃতি-ঐতিহ্য ইহা রবীন্দ্র-কবি-মানসের একটি বিশেষ অংশ, একটি বিশেষ সম্পদ। "মানসী-সোনার তরী-চিত্রা"র অনেক কবিতাতেই এই স্মৃতি-ঐতিহ্য মোহ-মাধুর্য বিস্তার করিয়াছে। "কল্পনা"য়ও তাহার পরিচয় কম নয়; 'বর্ষামঙ্গল', 'চৌরপঞ্চাশিখা,' 'স্বপ্ন,' 'মদনভস্মের পূর্বে', 'ভ্রষ্টলগ্ন' প্রভৃতি কবিতার মাধুর্য এই স্মৃতি-ঐতিহ্য হইতেই আহরিত হইয়াছে।

'স্বপ্ন' কবিতাটিকে একটি কোমল মধুর স্নিগ্ধ প্রেমের কবিতা বলা যাইতে পারে, এবং এক হিসাবে 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতাটিকেও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য আছে; দেহ-আত্মা-লীলার যে প্রেম অত্যন্ত নিবিড় ইন্দ্রিয়-মিলনের মধ্যে প্রকাশ পায় সেই একান্ত মর্মান্তিক প্রেমের পরিচয় রবীন্দ্র-কাব্যে নাই, একথা আমি এই আলোচনাতেই অন্যত্র বলিয়াছি। দেহ-আত্মা-মিলনের মধ্যে যে সৌন্দর্য-মাধুর্য সেইটুকু পান করিয়াই রবীন্দ্রনাথ পরিতৃপ্ত, তাহার বেশি তিনি চাহেন না, এবং এই সৌন্দর্য-মাধুর্য আস্বাদনের পরমুহূর্তেই তাঁহার প্রেম নিসর্গ-মাধুর্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে, একটা শান্ত সংযমের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়বন্ধ টুটিবার উপক্রম করিয়াও টুটিয়া যায় না, ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা বিশ্বসৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অসংখ্য কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে, "কল্পনা"-গ্রন্থে 'স্বপ্ন' কবিতায়ও আছে। প্রিয়ার দেহ-সৌন্দর্য অঁতি কোমল অঙ্গুলি দিয়া কবি আঁকিলেন, পরিবেশ সম্পূর্ণ হইল, উদ্বেলিত হৃদয় একে অন্যের সম্মুখীন হইল—

> দুজনে ভাবিনু কত দ্বার তরু তলে
> নাহি জানি কখন কী ছলে
> সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
> আমার দক্ষিণ করে,—কুলায়প্রত্যাশী
> সন্ধ্যার পাখির মতো; মুখখানি তার
> নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
> নমিয়া পড়িল ধীরে,—ব্যাকুল উদাস
> নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।

কিন্তু তার পরেই—ভিন্ন তালে, ভিন্ন লয়ে

> রজনীর অন্ধকার
> উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
> দীপ দ্বারপাশে
> কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
> শিপ্রানদীতীরে
> আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে। ('স্বপ্ন')

একদিকে এই প্রেম ও সৌন্দর্যের মধ্যে কবিচিত্ত থাকিয়া থাকিয়া সুধা অ[illegible] করিতেছে—এ যে বহু দিনের বহু বৎসরের সাধনাভ্যাস, ইহাকে ছাড়িতে চাহিলেই তন্মুহূর্তেই ছাড়া যায় না, তাহার বেদনা হইতে মুক্তিও পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া অন্যদিকে যে নিগূঢ় গভীর চৈতন্য চিত্তকে ক্রমশ অধিকার করিতেছে তাহা এখনও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই; এই অস্পষ্টতার অনিশ্চয়তারও একটা বেদনা আছে। এই দুই বেদনার দ্বন্দ্ব-ক্রন্দন "কল্পনা"র অনেক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। এই জীবন-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া কবিতাগুলি নূতন ভাব-রূপ পাইয়াছে, ছন্দ-রূপও অপূর্ব শক্তি এবং গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।

'দুঃসময়', 'অসময়', 'অশেষ', 'বিদায়', 'বৈশাখ', 'রাত্রি', 'বর্ষশেষ' প্রভৃতি কবিতায়

এই দ্বন্দ্ব-বেদনা স্বপ্রকাশ। একটি নিগূঢ় চেতনা চিত্তকে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে, কবি তাহা জানেন; কবি জানেন 'মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত, কুন্দ কুসুম রঞ্জিত' প্রেম ও সৌন্দর্য-সাধনার জীবন এখন দূরে সরিয়া যাইতেছে। এখন অসময়, বড় দুঃসময়, এখন 'অজগর গরজে সাগর ফুলিছে, ফেন হিল্লোল কল কল্লোলে 'দুলিছে', এখন 'মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে, দিক-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা', 'এখন সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে', এখন 'সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,' এতদিন 'বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি, এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে'। কিন্তু বন্ধ্যা সন্ধ্যার অস্পষ্ট ম্লানিমা বেশি দিন কবিচিত্তকে বুঝি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিল না, কোন্ অপরিচিত জগতের, কোন্ নিগূঢ় শক্তির অমোঘ আহ্বান বুঝি শুনা যাইতেছে—সে-আহ্বান কবিকে শান্তি ও সুপ্তির মধ্যে থাকিতে দিবে না, ক্লান্ত দেহমনকে বিশ্রাম দিবে না। কবি বুঝি কোনও ভাবমুহূর্তে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের কাজ তিনি শেষ করিয়াছেন, বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিয়াছে. দিবাবসানের শ্রান্ত ক্লান্ত দেহমন রাত্রির কোলে বিছাইয়া দিয়া বিশ্রাম লাভ করিবেন, কিন্তু এ যে কত মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন তাঁহার নিষ্ঠুর কঠোর জীবন-দেবতা। তাহার আহ্বান বিদ্যুতের মত কবির কানে আসিয়া বাজিল। জীবনের শেষ কি আছে, এক জীবন-পর্যায়ের শেষকে আর এক নূতন মহাজীবন ডাকিতেছে,—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচলখসা
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোল 'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।
ওপারের কালো কূলে কালি ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমির তলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।
নয়ন-পল্লব 'পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে
থেমে যায় গান;
ক্লান্তি টানে অঙ্গে মম প্রিয়ার মিনতি সম
এখনো আহ্বান!

* * *

রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক পথ-চাওয়া দুটি চোখ
যত্নে গাঁথা মালা।

* * *

রাত্রি মোর, শান্তি মোর রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্ব্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান।

* * *

হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী।

কাঁপিবে না ক্লান্ত কর ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘ রাত্রি র'ব জাগি,
দীপ নিভিবে না।
কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান। ('অশেষ')

নূতন মহাজীবনের আহ্বানকে কবি স্বীকার করিলেন যে মুহূর্তে, তাহার পরমুহূর্তেই পুরাতন জীবন হইতে 'বিদায়' লইতে হইল। এতকালের খেলা ও বাসনা ছাড়িয়া তিনি চাহিলেন শান্তি, হাসি-অশ্রু পরিত্যাগ করিয়া চাহিলেন 'উদার বৈরাগ্যময় বিশাল বিশ্রাম', প্রেম সৌন্দর্য-গীত-মুখরিত জগৎ ছাড়িয়া 'পরম নির্বাক নিস্তব্ধ' জগতের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিতে চাহিলেন। মহাজীবন যে কোন দিকে ইঙ্গিত করিতেছে, কোথায় কোন নিগূঢ় সুগভীর রহস্যের জগতে কবিচিত্তকে লইয়া যাইতেছে তাহা ত এই সব কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট; অধিকতর স্পষ্ট 'বর্ষশেষ', 'বৈশাখ', 'রাত্রি' প্রভৃতি কবিতায়। যে সুগভীর অনুভূতি এই সব কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার কাছে পূর্ববর্তী প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময়তার জীবন যেন লজ্জায় সংকুচিত হইয়া যায়।

'বর্ষশেষ' কবিতাটি '১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত'। ঝড়ের বর্ণনা হিসাবে এবং চিত্র-মহিমায় কবিতাটি অপরূপ; ঝড়ের পূর্বাভাস, তাহার বিক্ষোভ, তাহার ক্রন্দন, তাহার উন্মত্ততা, তাহার উল্লাস এবং সর্বশেষে শেষ গুচ্ছে তাহার শান্ত বিরতি সুরে সুরে তালে লয়ে এমন সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে যে শুধু ব্যাখ্যা করিয়া অর্থ করিয়া ইহার কাব্য মহিমা উদ্ঘাটিত করা অসম্ভব বলিলেই চলে। যে দ্বিধা, যে সংকোচ, যে বিদায়-বেদনা 'অশেষ' কবিতায় এখনও অবশিষ্ট ছিল তাহা যেন এই দুর্দান্ত ঝড়ে একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল তাহার ঠিকানাও পাওয়া গেল না। যে মহাজীবন, নিগূঢ় সুগভীর রহস্যময় জীবন কবিকে আহ্বান করিল, 'বর্ষশেষ', কবিতায় তাহাকে তিনি প্রকাশ করিলেন,—

হে নূতন, এস তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে,
ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোর স্তূপে।

* * *

তোমার ইঙ্গিতে যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,—
তোমার সংগীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ু গর্জে আসে,—
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণবেগে
বিদ্ধ করি হানে,
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।

* *

হে দুর্দম, হে নিশ্চিন্ত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।
তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান।
সদ্যোজাত মহাবীর, কি এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্র-চ্যুত তপনের
জলদর্চি-রেখা;
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা। ('বর্ষশেষ')

এই যে বর্ষশেষের ঝড় এ ত কবির নিজের জীবনেরই ঝড়। জীবনের এক অধ্যায়ের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা ধুইয়া মুছিয়া গিয়া আর এক নব অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইতে চলিয়াছে। এই কবিতাটির ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

"১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটি প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি * * * এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল এমনি ভাবে, চির নবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থামল। বললুম—অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই যে এতদিন কাটালুম, এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হল না। যে আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায়, তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আসতে হবে।" * * * ("শান্তিনিকেতন পত্রিকা", ১৩৩২, বৈশাখ)।

এই অবস্থা সম্বন্ধে কবি অন্যত্র লিখিতেছেন,

"এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল, ততই পূর্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্ব-প্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্র-বেশে কে দেখা দিল। এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কি-রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।" ("আমার ধর্ম", "প্রবাসী", পৌষ, ১৩২৪)।

রুদ্রের আহ্বান যে জীবনে আসিয়াছে, মহাজীবনের গভীর সুগম্ভীর রূপ যে কবি-চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছে, 'বৈশাখ' কবিতায়ও তাহার প্রমাণ আছে—রুদ্র, ভৈরব, বৈরাগী জীবনের রূপ। কিন্তু "কল্পনা"-গ্রন্থে কল্পনার সবল ও মহিমান্বিত প্রকাশ দেখা যায় 'রাত্রি' কবিতাটিতে। কবি অবগুণ্ঠিতা শর্বরীর ধ্যানমৌন সভায় সভাকবি হইতে চাহিতেছেন, রাত্রির যে ধ্যানমূর্তি তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই ধ্যান-গাম্ভীর্যের জগতে তিনি উত্তীর্ণ হইতে চাহিতেছেন।

মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।
তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্‌যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে
আমারে তুলিয়া লও সেই তার ধ্বজচক্রহীন
নীরব ঘর্ঘর মহারথে।

* * * *

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণা-কাতর,
চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ
তোমার নিখিল-লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।
জগতের সেই সব যামিনীর জাগরূকদল
সঙ্গিহীন তব সভাসদ
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে
গণিতেছে গোপন সম্পদ;
কেহ কারে নাহি জানে, আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধচ্ছবি;
হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি। ('রাত্রি')

"কল্পনা"র শেষ কবিতা ১৩০৬ সালের শেষাশেষি রচিত হয়, এবং "নৈবেদ্য"-গ্রন্থের প্রথম কবিতা রচিত হয় ১৩০৭ সালের শেষাশেষি। "কল্পনা"র জীবন হইতে "নৈবেদ্য"র জীবনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক পরিণতি আছে। যে ধ্যানমৌন গভীর সুগম্ভীর জীবনের আকুতি "কল্পনা"য় লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার পরিণতি "নৈবেদ্য" হইতেই সূত্রপাত। কিন্তু এই স্বাভাবিক বিবর্তনের মাঝখানে একটি অপরূপ কাব্য-গ্রন্থ কয়েকমাসের ফাঁকের মধ্যে একটি স্থায়ী আসন দখল করিয়া বসিয়া আছে; সেটি "ক্ষণিকা"। "ক্ষণিকা" নামটি সার্থক। এক জীবন হইতে অন্য জীবনে রূপান্তরের মাঝখানে কয়েক মাসের জন্য ক্ষণিকার মতই "ক্ষণিকা"র উদয় ও অস্ত। "ক্ষণিকা" বিস্ময়কর কাব্য, আরও বিস্ময়কর মনে হয়, কি করিয়া এই আপাতচটুল কৌতুক-বিলাসপূর্ণ কাব্যটি এমন গভীর গম্ভীর আবর্তন-বিবর্তনের মাঝখানে আসিয়া নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল, এই ভাবিয়া। কবিও বুঝিতেছেন, প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময়, রসমাধুর্যময় গতজীবনের কাছে বিদায় লইতেই হইবে, কিন্তু বুঝিলেও বিচ্ছেদের বেদনা হইতে ত' সহজেই মুক্তি পাওয়া যায় না, এবং সে-বেদনা সহজে সান্ত্বনা লাভ করিতেও চাহে না। "ক্ষণিকা"য় কবি ভাবিতেছেন, অতি তুচ্ছ কথায়বার্তায় হাসিয়া খেলিয়া এই বেদনা-ভারকে লঘু করা যায় কিনা। ক্ষণিক দিনের আলোকে ক্ষণিকের গান গাহিয়াই কবি তৃপ্ত হইতে চাহিয়াছেন, নিজের কথাটা, নিজের ব্যথাটা ঠাট্টা করিয়া হালকা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন, যে তপঃক্লিষ্ট জীবনের মহিমা তাঁহাকে আহ্বান

করিতেছে সেই জীবনকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া পরিহাসচ্ছলে যেন বলিতেছেন, 'আমি হব না তাপস, হব না, হব না, যেমনি বলুন যিনি, আমি হব না তাপস, নিশ্চয় যদি না মেলে তপস্বিনী'। কিন্তু, এই সব আপাতচটুলতা ও পরিহাসের তলে তলে গতজীবনের প্রিয়া-বিরহের কি যে অসহ্য গভীর বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া মরিতেছে, তাহাকে কবি কিছুতেই আর গোপন করিতে পারেন নাই।

এই ধরনের অভিজ্ঞতা ত সাধারণ মানুষের জীবনেও বার বার ঘটে। যে মানুষ প্রেম ও সৌন্দর্য-তন্ময় জীবনের সহজ ভাব ও রসের মাধুর্যের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতে থাকেন, তাঁহারই জীবনে যখন একদিন কঠোর গম্ভীর মহাজীবনের, মহান আদর্শের, মহান ত্যাগেব আহ্বান আসিয়া সমস্ত অন্তরকে মূল ধরিয়া টান দেয়, তখন হঠাৎ ক্ষণিকের মত এই কথা মনে হয়, কোথায় কোন্ অনিশ্চয়তার মধ্যে, সুকঠিন নির্মম জীবনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পডিব, কাজ কি এই সুকঠোর তপস্যায়, তাহার চেয়ে এই ত বেশ আছি সহজ সৌন্দর্য মাধুর্যের মধ্যে, এই তৃপ্তির মধ্যে। কিন্তু এইখানেই কথা শেষ হইয়া যায় না। মুখে এই কথা বলিলেও মনের মধ্যে অতীত জীবন হইতে বিচ্ছেদের বেদনা বাজিতে থাকে, এবং ভবিষ্যৎ জীবন অনুক্ষণ ডাকিতে থাকে। এই দুই দিক হইতে টানেব মুখে পড়িয়া স্পর্শ-কাতর চিত্ত অত্যন্ত পীড়িত বোধ করে, এই পীড়ার আভাস "ক্ষণিকা"র প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় বিদ্যমান। সাধারণ মানুষের জীবনে অতীত জীবনের পিছন টানই হয়ত সত্য হয়, অথবা ক্ষণিকের চটুলতা ও কৌতুক-বিলাস চিরন্তন হইয়া যায়, কিন্তু কবির জীবনে সত্য হইল, প্রবল হইল, ভবিষ্যতের অমোঘ কঠোর সুগম্ভীর আহ্বান।

"ক্ষণিকা"য় ক্ষণিক কালের জন্য কবি সহজ সাধনার পথে নামিয়াছেন। কৌতুক ও মর্মানুভূত প্রত্যয় হাত ধরিয়া পাশাপাশি চলিয়াছে "ক্ষণিকা"র কবিতাগুলিতে। এই ধরনের পাশাপাশি চলা কতক পরিমাণে দেখা যায় "কণিকা"-গ্রন্থে, এবং প্রায় সমসাময়িক "চিরকুমার সভা" প্রহসনে। হালকা ভাব ও ছন্দের সঙ্গে গভীর তত্ত্বের সমাবেশ "ক্ষণিকা"র প্রায় সব কবিতাতেই। কিন্তু এই ভাবজগৎ সম্পূর্ণতা পাইল "ক্ষণিকা" গ্রন্থে। হসন্ত শব্দের নির্বাধ ব্যবহারে ছন্দ পাইল এক অপূর্ব লঘুরূপ যাহা বাংলা কবিতায় ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই, লঘু কথা লঘু ছন্দ-লয়ে অত্যন্ত সহজ ভাবে বলা, বাংলা গীতিকাব্য যেন এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ পাইল তীক্ষ্ণ শাণিত বিদ্যুতোজ্জ্বল প্রকাশ-ভঙ্গিমায়। ব্যথা, বিচার, সন্ধান, সমস্যা, চিন্তা—সব কিছুকে যেন কবি দূরে ঠেলিয়া দিয়া ক্ষণিক দিনের আলোকে, অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গানের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিলেন। কিন্তু বলার চটুল ভঙ্গিমার ফাঁকে ফাঁকে যখন কবির অন্তরের মর্মস্থলে আমাদের দৃষ্টি পড়ে তখন বুঝিতে পারা যায় কোন্ গভীর বেদনার উৎস হইতে কবির চটুল কৌতুক কথাগুলি উৎসারিত হইতেছে। কবি বলিতেছেন,

> শুধু অকারণ পুলকে
> ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
> ক্ষণিক দিনের আলোকে!
> যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
> পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
> নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
> ফুটে আর টুটে পলকে,
> তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ
> ক্ষণিক দিনের আলোকে! ('উদ্বোধন')

অথবা,

হাল ছেড়ে আজ ব'সে আছি আমি
ছুটিনে কাহারো পিছুতে,
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই কিছুতে। ('উদাসীন')

অথবা,

শপথ ক'রে ছেড়ে দিলাম আজই
যা আছে মোর বুদ্ধি বিবেচনা,
যত ফেলবো ঝেড়ে ঝুড়ে
ছেড়ে ছুড়ে তত্ত্ব আলোচনা।
* * *
ভদ্রলোকের তক্‌মা তাবিজ ছিঁড়ে
উড়িয়ে দেবো মদোন্মত্ত হাওয়া।
শপথ করে বিপথ-ব্রত নেবো—
মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া। ('মাতাল')

অথবা,

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে। ('বোঝাপড়া')

অথবা,

চাইনেরে মন চাইনে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নেরে মন তাই নে। ('অচেনা')

কিন্তু আর একটু গভীরতর কথা শুনা যাইতেছে,—

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
* * *
ঠাট্টা ক'রে ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই।
হাল্‌কা তুমি কর পাছে
হাল্‌কা করি তাই
আপন ব্যথাটাই। ('ভীরুতা')

অথবা,

বাহিরে থাকে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।

গ্রন্থের মাঝামাঝি ও শেষের দিকে চটুল বিলাস ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া যেন মনে হইতেছে। 'কল্যাণী', 'সমাপ্তি', 'পরামর্শ', 'অন্তরতম', 'আবির্ভাব', প্রভৃতি কবিতায় একটা শান্ত সৌন্দর্য, সমাহিত চৈতন্য সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়িয়াছে। 'পরামর্শ কবিতার

অনেকবার ত হাল ভেঙেছে
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে
ওরে দুঃসাহসী !
সিন্ধুপানে গেছিস্ ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন রশারশি।
এখন কি আর আছে সে বল ?
বুকের তলা তোর
ভরে উঠছে জলে।
অশ্রু সেঁচে চলবি কত
আপন ভারে তোর
তলিয়ে যাবি তলে। ('পরামর্শ')

কবি নিজেকে নিজে বুঝাইতেছেন, এখন তরী না হয় ঘাটেই বাঁধা থাকুক, কাজ কি দুঃসাহসে ভর করিয়া নূতনপথে যাত্রা ? কিন্তু মিথ্যা নিজেকে এই প্রবোধ দেওয়া।

হায়রে মিছে প্রবোধ দেওয়া
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
* * *
ঘাটে সে কি রইবে বাঁধা
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকা-ডুবি। ('পরামর্শ')

সংশয় তাহা হইলে ঘুচিয়া গেল। তরী তো ভাসিল। অন্তরতম জীবন-দেবতার আহ্বানই অমোঘ সত্য হইল। অচঞ্চল গভীর জীবনই দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল; কিছুতেই আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না, নৈবেদ্য নিবেদনের জন্য কবি প্রস্তুত হইলেন।

আমি যে তোমায় জানি, সে ত কেউ জানে না
তুমি মোর পানে চাও, সে ত কেউ মানে না।
* * *
তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে-কথা বলিনে কাহারে ;
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।
স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি নীরবে ;
চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে। ('অন্তরতম')

'সমাপ্তি' কবিতায় কবি বলিতেছেন,

কখন সে পথ আপনি ফুরাল
সন্ধ্যা হ'ল যে কবে
পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন
চলিয়া গিয়াছে সবে।

একদিন কবি প্রেম ও সৌন্দর্যের দৃষ্টি দিয়া বিশ্বজীবনকে দেখিয়াছিলেন, সেই 'বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী'র লেখা কি ললাটে অঙ্কিত আছে? যতদিন তিনি পথে পথেই ছিলেন, অনেকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে, কিন্তু

সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।

এইবার 'তুমি আর আমি একা'র জীবন আরম্ভ হইল। প্রেম-সৌন্দর্য মাধুর্যমাখা যৌবন বিদায় লইল—হয়ত সে জীবন আবার ফিরিয়া আসিবে, হয়ত আসিবে না। কবি কি সে কথা নিশ্চয় করিয়া জানিতেন?

ছয়

নৈবেদ্য (১৩০৪ ও ১৩০৭)
স্মরণ (১৩০৯)
শিশু (১৩১০)
উৎসর্গ (১৩০৮ ও ১৩১০)
খেয়া (১৩১২-১৩)

"নৈবেদ্য" গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি কবিতা ১৩০৭ বঙ্গাব্দে লেখা হয়, এবং পরে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে নবপর্যায় "বঙ্গদর্শনে" সেগুলি একত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ কবিতা ১৩০৭ সালে রচিত, এবং এই কবিতাগুলিতেই "নৈবেদ্য"র মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, ১৩০৪ সালে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে দুই তিনটি ছাড়া আর সবগুলিরই উপাদান জোগাইয়াছে কবির দেশাত্মবোধ। "চৈতালি"র (১৩০৩) চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতেই আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন ভারতের সাধনা ও ঐতিহ্যের মধ্যেই কবি মানব-মহিমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন; দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁহার স্পর্শ-কাতর কবিচিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল। "চৈতালি"র অব্যবহিত পরবর্তী কালেই রচিত "কথা" ও "কাহিনী"-গ্রন্থেও দেখা যায়, আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে মানব-মহত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ধরা দিয়াছে, কবি তাহাদের মধ্যে বিহার করিতেছেন, এবং সেই সব আপাততুচ্ছ ঘটনা কবির অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। "নৈবেদ্য"র প্রথম পর্বের কবিতাগুলি ঠিক এই সময়েই রচিত, কাজেই এই কবিতাগুলিতে কতকটা সেই সুরই ধ্বনিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। তবে "নৈবেদ্য"র এই চতুর্দশপদী কবিতাগুলি ভাব-গভীরতায় আরও পূর্ণতর, দৃঢ় এবং স্পষ্ট, কারণ জীবনের আদর্শই যে ক্রমশ দৃঢ়, স্পষ্ট এবং পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

এই পর্বের কবিতাগুলির কয়েকটি খুব উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর সূর্যাস্ত-সন্ধ্যায় দক্ষিণ-আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ উপলক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর নিষ্ঠুর উন্মত্ততা কবি এবং কবির দেশবাসীর মনে পীড়া ও উত্তেজনার সঞ্চার করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ কখনও পরজাতি-নিপীড়নের অস্ত্র এই সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষমার চক্ষে দেখেন নাই; যেখানে যখন মানবাত্মা পীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়াছে কবি বজ্রনির্ঘোষে তখন তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। "নৈবেদ্য" গ্রন্থে পর পর তিনটি কবিতায় এই প্রতিবাদ সুস্পষ্ট কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে.

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলিছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে।
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে (৬৪ নং, "নৈবেদ্য")

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ রেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিমে সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা। (৬৬ নং, "নৈবেদ্য")

"নৈবেদ্য"র সব কবিতাই প্রার্থনা। স্বদেশ এবং স্বদেশ-মহিমা সম্বন্ধে প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে কয়েকটি কবিতায়, সব কয়টিই একটা মহান অধ্যাত্ম-আদর্শে বাঁধা, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে বহুকণ্ঠগীত বহুজনবন্দিত এই কবিতাটিতে,—

চিত্ত যথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী,
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নিবারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালি রাশি
বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্মচিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত। (৭২নং, "নৈবেদ্য")

কোনও রাষ্ট্রীয় অথবা অর্থনৈতিক স্বর্গের প্রার্থনা কবি কোথাও করেন নাই, তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন উন্নত মানব-মহিমার স্বর্গ, সেই স্বর্গ যে-স্বর্গে মানবের চিত্ত ভয়শূন্য, মানুষের শির অনবনত, জ্ঞান যেখানে মুক্ত। আর একটি কবিতায় তিনি প্রার্থনা করিতেছেন,—

এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্বতুচ্ছ ভয়,—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর। (৪৮ নং, "নৈবেদ্য")

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সাধনা তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনা হইতে পৃথক নয়। আমার মনে হয়, মহাজীবনের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে কবির মনের ভিতর ক্রমশ রূপ গ্রহণ করিতেছিল সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রথম স্বদেশ-সাধনার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ

করিয়াছিল। কিন্তু যখন সেই খণ্ড সাধনার ক্ষেত্র তাঁহাকে আর শান্তি ও তৃপ্তিদান করিতে পারিল না তখন তিনি এমন একটা জগতে আসিয়া নবজন্ম লাভ করিলেন, দ্বিজত্ব পাইলেন, যে জগতের প্রান্তসীমায় পৌছিবার পুর্বেই পার্থিব জনের নিকট হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ ঘটিল। সেই জগতে যাত্রা-মুহূর্তে "নৈবেদ্য"র দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত।

এই দ্বিতীয় পর্বের কবিতাগুলির মধ্যে একটা স্পষ্টতর পূর্ণতর অধ্যাত্ম-জীবনের আকৃতি স্বপ্রকাশ, যে গভীর ধর্মবোধ, ভাগবত সাধনার প্রেরণা এই কবিতা-গুলিতে দেখা যায় তাহা উপনিষদ দ্বারা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধন জীবন-দ্বারা অনুপ্রেরিত। এই "নৈবেদ্য" গ্রন্থ যে 'পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে' উৎসর্গীকৃত তাহার সার্থকতাও ঐখানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনা মানুষ ও সংসার নিরপেক্ষ সাধনা নহে, দেবেন্দ্রনাথেরও তাহা ছিল না। সেই "কড়ি ও কোমল" হইতে আরম্ভ করিয়া "চৈতালি" ও পরবর্তী কাব্যে যখন মহাজীবন তাঁহাকে ডাক দিয়াছে তখনও মানুষের জয়গানই তিনি গাহিয়াছেন। যে কবি প্রথম যৌবনে বলিয়াছিলেন,—

> মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই—

পরিণত বয়সে অধ্যাত্ম-জীবনের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই কবির পক্ষেই বলা সম্ভব হইল,

> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।
>
> *   *   *
>
> ইন্দ্রিয়ের দ্বার
> রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
> যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
> তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
> মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
> প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া। (৩০ নং, "নৈবেদ্য")

কতকগুলি প্রার্থনায় উপনিষদের ভাব ও তত্ত্ব কবির ভাষায় নূতন রূপ পাইয়াছে,—

> একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
> কে তুমি মহান প্রাণ, কি আনন্দবলে
> উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, "শোনো বিশ্বজন,
> শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
> দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাহারে,
> মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
> জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
> মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারে, অন্যপথ নাহি।"
>
> *   *   *
>
> রে মৃত ভারত
> শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ। (৬০নং, "নৈবেদ্য")

আমাদের ভারতীয় অধ্যাত্ম-আদর্শ বার বার বলিয়াছে, শাস্ত্রজ্ঞানের মধ্যে পুঁথির পাতার মধ্যে, আচারের মরুবালিরাশির মধ্যে, ধর্মসংস্কারের মধ্যে ভাগবত-সাধন নাই, ভাগবত-উপলব্ধি নাই। কবিও এই কথা নানা কবিতায় নানা ভাবে বলিয়াছেন। তাঁহার

আদর্শ মানব-মহিমা, মহাজীবন, পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধ, ভাগবতোপলব্ধি। এই পরিপূর্ণ সমগ্রতার আদর্শকে লাভ করিবার জন্যই প্রতিদিন সকল অবস্থার ভিতরে জীবন-স্বামীর সম্মুখে আসিয়া তিনি দাঁড়াইতে চাহিতেছেন,

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে,
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে। (১নং, "নৈবেদ্য")

"নৈবেদ্য"-গ্রন্থের প্রথম দিকের সবগুলিই প্রার্থনা-সংগীত। বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, কবির চিত্ত শান্ত অচপল সমাহিত দৃষ্টি লাভ করিয়াছে, লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, নহিলে এমন পূর্ণ প্রার্থনা ধ্বনিত হইতে পারিত না—

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ। (১৬নং, "নৈবেদ্য")

এই প্রার্থনা-সংগীতগুলির মধ্যে আত্মসমর্পিত ভক্তের বিচিত্র আকূতি নানা সুরে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রভুর চরণে জীবন সমর্পণ যে করে, প্রভু যে তাহার হাতেই তুলিয়া দেন তাঁহার পতাকাটি বহন করিবার ভার। সমর্পিত জীবনের দায়িত্বভার যে কত বেশি কবি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন, এবং সেইজন্য এই আকুল প্রার্থনা তাঁহার মনে জাগে—

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি
আমি তাই চাই ভরিয়া পরান
দুঃখেরি সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুঃখ হবে মোর মাথার মানিক
সাথে যদি দাও ভকতি। (২০নং, "নৈবেদ্য")

কিন্তু প্রার্থনার এই ভক্তি সমস্ত ভাবমুহূর্ত অধিকার করিয়া নাই; ক্রমশ যেন এই ভারবোধ, দায়িত্ববোধ সহজ হইয়া আসিতেছে—একটা সহজ আনন্দ, পরিপূর্ণ আসঙ্গবোধ ক্রমশ যেন চিত্তকে অধিকার করিতেছে, এবং ভাগবতোপলব্ধিও সহজ ও সরল হইয়া আসিতেছে। বিশ্বজীবনের যে অনন্ত কল্লোল এতদিন কবিচিত্তে প্রেরণা জাগাইয়াছে, সেই অনন্ত কল্লোল, অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল সব কিছুই যে দেবতার আসনের চতুর্দিকে, এই উপলব্ধি কবি-চিত্তে জাগিয়াছে (২৩নং)। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার, মন ও কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া কবি বিশ্বজীবনকে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই না অন্তর্যামী দেবতা তাঁহার চিত্তের মধ্যে আসিয়া আসন বিছাইতে পারিয়াছেন (৩২ ও ৩৩ নং); গত জীবনের একটি দিন, একটি বেলাও কবির ব্যর্থ হয় নাই,—

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে সকল ক্ষণ
আপনি তাদের তুমি করেছে গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব। (২৪নং, "নৈবেদ্য")

সমস্ত বিশ্বজীবনের 'যুগ যুগান্তের বিরাট স্পন্দন' কবির নাড়ীতে নাড়ীতে নৃত্য করিতেছে,

অনন্ত প্রাণ, আত্মার অপরূপ জ্যোতি ও মহিমা তিনি ক্রমশ উপলব্ধি করিতেছেন (২৬ নং), এবং মাঝে মাঝে নিজেই চমকিয়া উঠিতেছেন এই অপরূপ লীলায়,—

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।
এ কী জ্যোতি, এ কি ব্যোম-দীপ্তদীপ-জ্বালা,
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা?
এ কী শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্বতে কঠিন, তরুপল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ
তোমারি মিলন শয্যা, হে মোর রাজন,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি একী অপরূপ। (২৭নং, "নৈবেদ্য")

উপলব্ধি যে ক্রমশ সহজ ও সরল হইয়া আসিতেছে, কবি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেছেন,

তোমার ভুবন মাঝে ফিরি মুগ্ধসম
হে বিশ্বমোহন নাথ। (৩১নং, "নৈবেদ্য")

কবিচিত্তও সর্বদা যেন অন্তর্যামী দেবতার দিকেই উন্মুখ হইয়া আছে, এবং থাকিয়া থাকিয়া শত কর্মকোলাহল হাস্য-পরিহাসের মধ্যেও মাঝে মাঝে যোগমগ্ন ধ্যানরত হইয়া পড়িতেছে—

কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে
অর্ধরাত্রি কেটে গেল বন্ধুজন সনে,
আনন্দের নিদ্রাহারা শ্রান্তি বহে লয়ে
ফিরি আসিলাম যবে নিভৃত আলয়ে
দাঁড়াইনু আঁধার অঙ্গনে। শীতবায়
বুলায় স্নেহের হস্ত তপ্ত ক্লান্ত গায়
মুহূর্তে চঞ্চল রক্তে শান্তি আনি দিয়া।
মুহূর্তেই মৌন হ'ল স্তব্ধ হ'ল হিয়া
নির্বাণ-প্রদীপ রিক্ত নাট্যশালা সম।
চাহিয়া দেখিনু ঊর্ধ্বপানে; চিত্ত মম
মুহূর্তেই পার হয়ে অসীম রজনী
দাঁড়াল নক্ষত্রলোকে। হেরিনু তখনি—
খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে। (৩৫নং, "নৈবেদ্য")

কিন্তু কবির এই যে সমাহিতচিত্ততা ইহার মধ্যে ভাবাবেশের স্থান কোথাও নাই, জ্ঞানহারা ভাবোন্মাদ মত্ততায় যে ভক্তির প্রকাশ সেই ভক্তি এই যোগী কবি চাহেন না (৪৫নং)। কৈশোরে একদিন বিহ্বল হর্ষে ভাবরস তিনি পান করিয়াছেন, পুষ্পগন্ধে মাখা নানাবর্ণ মধু

তাঁহার চিত্তে আনন্দরস জোগাইয়াছে। সেই বিহ্বলতা সেই ভাবাবেশ আজ কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার কোনও দুঃখ নাই ; আজ তিনি সত্যের কঠিন নির্মম মূর্তিই দেখিতে চান (৪৬নং), ভাবের ললিত ক্রোড় ছাড়িয়া আঘাত সংঘাত মাঝে আসিয়া দাঁড়াইতে চান (৪৭নং), বীর্যবান জ্যোতিষ্মান পূর্ণ মনুষ্যত্বই তাঁহার কাম্য, এবং তাহাই ভগবৎ নির্দেশ। সেইজন্যই তাঁহার প্রার্থনা—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়,—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণ ভার,
এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি।
* * *
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। (৪৮নং, "নৈবেদ্য")

অথবা,

হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হতে গেলে
যে ঊর্ধ্বে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে
লহ ডাকি সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে— (৫১নং, "নৈবেদ্য")

অথবা,

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জনা। ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্মধামে। (৬১নং, "নৈবেদ্য")

অথবা,

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে ; যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। * * *
অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে। (৭০নং, "নৈবেদ্য")

অথবা,

দুর্দিন ঘনায়ে এল ঘন অন্ধকারে,
হে প্রাণেশ। দিগ বিদিক বৃষ্টিবারি ধারে
ভেসে যায়, কুটিল কটাক্ষে হেসে যায়
নিষ্ঠুর বিদ্যুৎশিখা,—উতরোল বায়
তুলিল উতলা করি অরণ্য কানন।
* * * দুঃখের বেষ্টনে
দুর্দিন রচিল আজি নিবিড় নির্জন,
হোক আজি তোমা সাথে একান্ত মিলন। (৮৫নং, "নৈবেদ্য")

অথবা,

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর। বীর্য দেহ সুখের সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহ দুখে,
যাহে দুঃখ আপনাকে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহ
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহ ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীনজ্ঞান,—বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহ, চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।
বীর্য দেহ তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির। (৯৯ নং "নৈবেদ্য")

ইহাই জাগ্রত বলিষ্ঠ সত্য-সন্ধানী জীবনের প্রার্থনা। ভক্তিতে সমস্ত দেহ-মন আনত হইয়া পড়িয়াছে অন্তর্যামীর চরণে, কিন্তু এ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মনিরপেক্ষ নয়, এ ভক্তি ভাবোন্মাদ মত্ততা নয়, রসাবেশ নয়, এ ভক্তির অন্তরে রহিয়াছে বীর্য ও জ্যোতি। এই যে একটি বলিষ্ঠ জাগ্রত, অমত্ত গম্ভীর সত্য-সন্ধানী আত্মার সৃষ্টি আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম "নৈবেদ্য"র কবিতাগুলিতে। এইখানেই এই কাব্যটির সার্থকতা। মনুষ্যত্বের একটি পরিপুর্ণ আদর্শ এই কবিতাগুলির মধ্যে অপুর্ব বলিষ্ঠ ভাষা ও ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিল। কবির এক নূতন্ পরিচয় আমরা পাইলাম। "কথা" ও "কাহিনী" গ্রন্থে বা অন্যান্য কবিতায় পরিপুর্ণ মনুষ্যত্বের যে-আদর্শ যে-সাধনা তিনি ইতস্তত সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সে-আদর্শকে সে-সাধনাকে তিনি যে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিলেন তাহার প্রমাণ "নৈবেদ্য"র এই পর্যায়ের কবিতাগুলি। রবীন্দ্র-কাব্যে যাঁহারা বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার প্রভাব দেখিতে পান তাঁহারা যদি "নৈবেদ্য"-গ্রন্থের ভক্তি-সাধনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতামত সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে ভক্তি বীর্যে পরিপুর্ণ, মানব মহত্বের আদর্শে জ্যোতিষ্মান, জ্ঞানের আলোয় ভাস্বর, কর্মের প্রেরণায় বলিষ্ঠ, আমাদের ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে সেই ভক্তিবাদের বন্দনা করা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথও সেই মার্গের সাধনা করিয়াছেন, পরবর্তী বৈষ্ণব মার্গের সাধনা নয়, অন্তত "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে তাহার পরিচয় নাই। যে-জীবন তিনি কামনা করিতেছেন তাহা এই সময়কার একটি কবিতায় অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার এই সময়কার প্রার্থনা,—

যে জীবন ছিল তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দৃপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব ('নববর্ষের গান,' "বঙ্গদর্শন," জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯)

১৩০৯, ৭ অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যু হয়; কবির তখন বয়স একচল্লিশ। কবির

স্পর্শ-কাতর চিত্তে স্ত্রীর মৃত্যু নিশ্চয়ই খুব গভীর হইয়া বাজিয়াছিল, কিন্তু সুবিস্তৃত রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক "স্মরণ"-গ্রন্থের কবিতাগুলি ছাড়া আর কোথাও স্ত্রী-সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। একান্ত নিবিড় ব্যক্তিগত বিরহজনিত দুঃখ এই কবিতাগুলি ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, জীবনেও আর কোথাও কোন প্রকাশ নাই। রবীন্দ্র-প্রকৃতি যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন যে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। স্নেহশোক, যে-দুঃখ একান্ত ব্যক্তিগত, একান্ত অন্তরগত তাহা চিরকাল তাঁহার অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেই তিনি অভ্যস্ত; যেখানে যতটুকু ব্যক্তিগত শোক দুঃখ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ততটুকুর প্রকাশই কবির রচিত সাহিত্যে ও জীবনের বাহিরের অভিব্যক্তিতে ধরা পড়ে, তাহার বেশি নয়, এবং সেখানে ব্যক্তিগত শোক দুঃখ সহজে ধরা পড়িতে চায় না, এবং ধরা পড়িলেও তাহার গভীরতা পরিমাপ করা যায় না।*

"স্মরণ"-গ্রন্থের কবিতাগুলি অত্যন্ত শান্ত, সংযত ও সংক্ষিপ্ত; শোকের উচ্ছ্বাস কোথাও নাই, প্রেমের ও শোকের উদ্‌ভ্রান্ততার পরিচয় কোথাও নাই। তাহার কারণ বুঝিতে পারা একটুও কঠিন নয়, যদি একথা মনে রাখা যায় যে কবি ইতিমধ্যে "নৈবেদ্য"র সাধনার মধ্যে বহুদিন কাটাইয়া আসিয়াছেন, একটা শান্ত সংযম তাঁহার সমগ্র জীবনকে অধিকার করিয়াছে। সমস্ত কবিতাগুলি মিলিয়া যেন একটি পূর্ণ অশ্রুবিন্দু নয়নকোণে টলমল করিতেছে; শোকের দুঃসহ আবেগেও বদন প্রশান্ত, অমত্ত, গম্ভীর।

মৃত্যু যে আসিতেছে তাহার আভাস যেন কবি পূর্বাহ্নেই পাইয়াছিলেন; "নৈবেদ্য" গ্রন্থে

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি সে বহন
পার হয়ে এল পারে। (১৮নং "নৈবেদ্য")

অথবা,

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।
সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে। (৯০ নং, "নৈবেদ্য")

অথবা,

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও
ওগো একি প্রণয়েরি ধরন। ("বঙ্গদর্শন," ১৩০৯, ভাদ্র, ২৫৫ পৃঃ)

---

* "রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহার একমাত্র প্রকাশ কবিতায় (তাঁহার সুবিস্তৃত সাহিত্যে স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নাই, কোনো গ্রন্থ তাঁহাকে উৎসর্গ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিয়োগে যে কাতরতা অনুভব করিলেন, তাহা জীবনের আর কোথাও প্রকাশ করেন নাই—একবার মাত্র কেবল কাব্যের মধ্যে তাঁহার অনুভবগুলিকে অমর করিলেন। তিনি কখনো নিজের দুঃখ শোক কাহারও কাছে প্রকাশ করেন না; অতি বেদনার সময়ে তাঁহাকে কর্মে রত দেখিয়াছি। তাঁহার বেদনাকে তিনি অন্যের কাছে বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিয়া বেদনার গুরুত্বকে হ্রাস করিতে চাহেন না।"

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী," ১ম খণ্ড, ৩৯৪-৯৫ পৃঃ)

এই সব কবিতা পড়িলে এই কথাই মনে হয়, মৃত্যুর পূর্বাভাস তিনি পাইয়াছিলেন, এবং ধীরে ধীরে তাহার জন্য প্রস্তুতও হইতেছিলেন। তারপর যখন মৃত্যু-জনিত বিচ্ছেদ পূর্ণ হইয়া গেল, তখন প্রিয়তম জন মরণের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিলেন,—

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে! ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে। * * *
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া। (১১নং "স্মরণ")

জীবন ও মরণ একই সঙ্গে প্রেম-বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেল, মৃত্যুর মাধুরী জীবনের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া গেল,—

তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চির-বিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে গিয়াছ মোর হিয়া,
এঁকে গেছো সব ভাবনায় সূর্যাস্তের বরন-চাতুরী।
জীবনের দিকচক্র-সীমা
লভিয়াছে অপূর্ব মহিমা,
অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী। (১৩নং, "স্মরণ")

রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর মৃত্যুকালে তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা মীরার বয়স দশ ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের বয়স আট। এই মাতৃহীন শিশু সন্তান দুটি এখন একান্ত ভাবেই পিতার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল; পিতার কাছে পিতা এবং মাতা দুজনেরই স্নেহলাভ করিতে আরম্ভ করিল। শোকাশ্রু-ধৌত জীবনে ইহারাই তখন পরম সান্ত্বনা, ইহাদের অবলম্বন করিয়াই তখনকার দিনগুলি কাটিতেছে। বিচ্ছেদের পর পরম শান্তির মধ্যে মধুর বাৎসল্য-রস ইহাদের ঘিরিয়া অপরূপ রূপ লাভ করিল। এই সময় পুত্র শমীন্দ্রনাথ অন্তিম রোগশয্যায়। তাহার আনন্দ-বিধানের জন্য সন্তান-বৎসল পিতা রোগশয্যায় শিশুপুত্রকে কবিতা রচনা করিয়া শুনাইতেন। এইরূপ পরিবেশের মধ্যেই "শিশু"-গ্রন্থের সৃষ্টি। কিন্তু কেবল মধুর বাৎসল্যরসই "শিশু"র শেষ কথা নয়, ইহার সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে এক অপূর্ব রহস্যরস। শিশুকে তিনি দেখিতেছেন বিশ্বজীবনের একটি খণ্ড অংশ রূপে, ভাগবত-দীপ্তির একটি পরম প্রকাশ দেখিতেছেন তিনি শিশুর মধ্যে। "শিশু"র কবিতা শিশুর মুখের ক- নয়, শিশুমনের কথাও নয়, শিশুকে আশ্রয় করিয়া বাৎসল্যরস যাহার মধ্যে মূর্তি লইয়াছে তাহার মুখের কথা, মনের কথা; শিশুর যাহা সহজ খেয়াল মাত্র সেইখানে জাগিয়াছে কবির মনে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, তাহার মূলে তিনি দেখিয়াছেন পরম রহস্য; কোনও কোনও কবিতায় ব্যথার আভাসও সুস্পষ্ট। এই জন্যই শিশুচিত্তের পরিচয় হিসাবে নয়, নিছক কাব্য হিসাবে "শিশু" বাংলা সাহিত্যের চির সম্পদ, অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। মধুর বাৎসল্য-রসের পরিচয় বৈষ্ণব সাহিত্যে অপ্রতুল নয়, কিন্তু সে-রসের সঙ্গে কোনও রহস্যের পরিণয় হয় নাই; কোনও জিজ্ঞাসার আভাস সেখানে নাই, কিংবা এমন কাব্যরূপের পরিচয়ও তাহাতে নাই।

"উৎসর্গ" প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে, কিন্তু ইহার অধিকাংশ কবিতাই রচিত হইয়াছিল ১৩০৮ ও ১৩১০ সালে, যখন মোহিতবাবু "কাব্যগ্রন্থ" সম্পাদনে নিয়োজিত ছিলেন। কবিতাগুলির মধ্যে কোনও ভাবপ্রসঙ্গের যোগাযোগ বিশেষ নাই, থাকিবার কথাও নয়। তাহার কারণ, "উৎসর্গে"র অধিকাংশ কবিতা রচিত হইয়াছিল মোহিতবাবু সম্পাদিত "কাব্যগ্রন্থে"র এক একটি গুচ্ছের এক একটি ভূমিকা রূপে। সমস্ত গ্রন্থটির একটা সমগ্রতা না থাকিলেও ইহার মধ্যে এমনি কয়েকটি কবিতা আছে, যাহা শুধু কাব্য হিসাবে মূল্যবান নয়, রবীন্দ্র-কবিজীবনের মর্মবাণীও তাহাদের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।* কবিমানসের ইতিহাসের দিক হইতে দেখিতে গেলে বলিতে হয়, ইহাদের ভাবপ্রসঙ্গের যোগ "কল্পনা"র কবিতাগুলির সঙ্গে, এবং এই গ্রন্থের কবিতাগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে তাহা মোটামুটি উৎসর্গের কবিতাগুলি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

"খেয়া"-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। কবিতাগুলি লেখা আরম্ভ হইয়াছিল ১৩১২ সালের আষাঢ় মাস হইতেই। ১৩১০ সালেই "শিশু" ও "উৎসর্গ"-গ্রন্থের কবিতাগুলি লেখা সব শেষ হইয়া যায়; মাঝখানে বৎসরাধিক কাল কবিজীবন অপেক্ষাকৃত স্তব্ধ। এই স্তব্ধতা বহির্জগতে এক কাল-বৈশাখীর পূর্বাভাস, অন্তর-জগতে এক নূতন জীবন-যাত্রা সূচনার পূর্ব-মুহূর্ত। কবি যে লিখিয়াছেন,

> বাহির হইতে দেখোনা এমন করে
> আমায় দেখোনা বাহিরে।
> আমায় পাবেনা আমার দুখে ও সুখে,
> আমার বেদনা খুঁজোনা আমার বুকে,
> আমায় দেখিতে পাবেনা আমার মুখে
> কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।
>
> *　　　*　　　*
>
> কবিরে পাবেনা তাহার জীবনচরিতে। (২১নং, 'উৎসর্গ')

---

*"মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের যে "কাব্যগ্রন্থ" সম্পাদন করেন তাহাতে কবির কবিতাগুলি ভাবানুযায়ী গুচ্ছবদ্ধ করিয়া সাজানো হইয়াছিল, এবং এক একটি নামকরণ করা হইয়াছিল।

"রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি কবিতাগুচ্ছের একটি করিয়া ভূমিকা কবিতায় লিখিয়া দেন, সেই কবিতাটি গ্রন্থমধ্যস্থিত কবিতাগুলির অর্থ ব্যক্ত করিয়াছে। যেমন 'যাত্রা' শ্রেণীর কবিতার প্রারম্ভে আছে—

> কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
> বাহির হ'নু তিমির রাতে
> তরণীখানি বাহিয়া।

'হৃদয়ারণ্য' নামে কবিতাগুলি অধিকাংশই "সন্ধ্যা সংগীতে"র—ইহার ভূমিকায় আছে 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে'। * * 'হৃদয়ারণ্য' হইতে বাহির হইয়া যেখানে কবি আসিলেন—সেখানকার কবিতাগুলির নাম 'নিষ্ক্রমণ'; হৃদয়ারণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কবি 'বিশ্বের' মধ্যে আসিলেন। ইহার ভূমিকায় আছে 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'। এইরূপে প্রত্যেকটি শ্রেণীর মুখবন্ধ স্বরূপ একটি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলি 'উৎসর্গ' নামে ১৩২১ সালে প্রকাশিত হয়; কিন্তু ইহার অধিকাংশ কবিতাই রচিত হইয়াছিল ১৩০৮ ও ১৩১০ সালে। ১৩০৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে যেগুলি রচিত হয়, সেগুলি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "স্মরণ" নামে প্রথম সন্নিবেশিত হয়।

"শিশু" গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নূতন। আলমোড়া বাসকালে ইহার অনেকগুলি রচিত; রবীন্দ্রনাথ সেখান হইতে লিখিয়া মোহিতবাবুকে কবিতাগুলি পাঠাইতেন। মোহিতবাবু এই "শিশু" কবিতা ও "সোনারতরী" প্রভৃতি হইতে শিশুর উপযুক্ত কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া "শিশু" কাব্যখণ্ড প্রণয়ন করেন। ১৩১০ সালের আশ্বিন মাসে "শিশু" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।"

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র জীবনী," ১ম খণ্ড, ৪০৩ পৃঃ)

এ কথা "খেয়া"র কবিজীবন সম্বন্ধে যতখানি সত্য, রবীন্দ্র-কবিজীবনের আর কোনও পর্ব সম্বন্ধেই তত সত্য নয়; "খেয়া"-গ্রন্থ রচনার সময়ে কবির বাহিরের জীবন সম্বন্ধে যত তথ্যই জানা হউক না কেন, কোন তথ্য অথবা তত্ত্বের মধ্যেই "খেয়া"র মর্ম কথাটি ধরা পড়িবে না, "খেয়া"র কবিকে তদানীন্তন জীবনচরিতের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। অথচ সে জীবনচরিতটুকু না জানিলে কবির জীবন যে আবার কত রহস্যময়, কত গভীর, কত বিপরীতমুখী তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকের শেষাশেষি বাংলা দেশে একটা নবজীবনের সাড়া জাগিতেছিল। বাঙালী জীবনে শতাব্দী ধরিয়া যে গ্লানি ও অপমান, যে দুঃসহ বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল তাহা একদিন বঙ্গচ্ছেদের নির্মম আদেশকে উপলক্ষ করিয়া দেশের উপর ভাঙিয়া পড়িল; এক মুহূর্তে দেশের মূর্তি বদলাইয়া গেল। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, সর্ববিষয়ে যেন দেশ সচেতন হইয়া উঠিল, একটা প্রবল ভাবোন্মাদনায় দেশ মাতিয়া উঠিল, এবং সে উন্মাদনা ভাষা পাইল রবীন্দ্রনাথের গানে, বক্তৃতায়। বাংলা দেশের সেই কয়েক বৎসরের (১৩১০-১৩১২) ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই একথা বলিবেন, রবীন্দ্রনাথই ছিলেন সেই স্বদেশী-যজ্ঞের প্রধান উদ্গাতা। যে-সমস্ত গানকে আশ্রয় করিয়া বাঙালীর মর্মবাণী সেদিন ভাষা পাইয়াছিল, সে-সব গান প্রায় সমস্তই রবীন্দ্রনাথের রচনা, এবং এই সময়কার রচনা। 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,' 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না', 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে', 'বিধির বিধান কাটবে তুমি', ইত্যাদি সমস্ত গানই ১৩১১-১৩১২ বঙ্গাব্দের রচনা। কিন্তু, শুধু গান লিখিয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই। এই দুই তিন বৎসর সমানে চলিয়াছে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা, এবং তাহাদের বিষয় আমাদের শিক্ষা, আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম, আমাদের রাষ্ট্র-জীবন, আমাদের জীবনাদর্শ। এই সময়ই শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয় ক্রমশ গড়িয়া উঠিতেছে; 'স্বদেশী সমাজে'র পরিকল্পনাও এই সময়ে। অর্থাৎ, আমাদের দেশাত্মবোধ, স্বাজাত্যবোধ জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি একেবারে তাহার মর্মমূলে প্রবেশ করিবার, ভারতীয় ইতিহাস ও সাধনার ধারা ও অর্থটিকে বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকেও তাহা বুঝাইলেন। 'স্বদেশী সমাজ', 'ছাত্রগণের প্রতি সম্ভাষণ', 'সফলতার সদুপায়', 'অত্যুক্তি', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ঘুষাঘুষি', 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত', 'নববর্ষ', 'ব্রাহ্মণ', 'চীনাম্যানের চিঠি', 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি', 'রাজকুটুম্ব', 'দেশীয় রাজ্য,' 'বিজয়া সম্মিলন', বিলাসের ফাঁস', 'রাজভক্তি', 'রাজনিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন', 'শিক্ষা সমস্যা', 'আবরণ', 'জাতীয় শিক্ষা', 'ততঃ কিম্', 'পথ ও পাথেয়', প্রভৃতি সুবিখ্যাত প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও আলোচনাগুলিও এই সময়েরই (১৩০৯ ১৩১৪) রচনা। কিন্তু গান, বক্তৃতা প্রবন্ধ ও আলোচনাতেই তাঁহার স্বদেশ-কর্মৈষণা শেষ হয় নাই। সভায় সভাপতিত্ব অথবা প্রধান বক্তার কাজ, রাজপথে গণযাত্রায় পুরোধা হইয়া যোগদান, রাখিবন্ধন দিবসের নায়কত্ব সব কিছুর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথকে। সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সমস্যা এবং ঘটনাও তাঁহার কবিচিত্তকে যে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় "বঙ্গদর্শন" ও "ভাণ্ডারে"র সাময়িক প্রসঙ্গের বিচিত্র মন্তব্যগুলির মধ্যে। বস্তুত, বাহিরের কর্মপ্রবাহের মধ্যে পূর্ব-জীবনে অথবা উত্তর-জীবনে রবীন্দ্রনাথ আর কখনও নিজেকে এমনভাবে জড়িত করেন নাই।

বাহিরের জীবনে যখন এইরূপ উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা, বিচিত্র কর্মপ্রবাহ চলিতেছে ঠিক তখন ঘরের জীবন মৃত্যু আসিয়া একে একে তাঁহার একান্ত আপনার জনদের ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে গেলেন স্ত্রী, ১৩১০ সালে গেল প্রিয়তমা কন্যা রেণুকা, ১৩১০ সালে গেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩১৪ সালে গেল কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথ। অথচ এই যে একের পর এক মর্মান্তিক বিচ্ছেদ বাহিরের জীবনে ইহার কোনও পরিচয় নাই, বাহিরের কর্মপ্রবাহ যথারীতি চলিতেছে। কিন্তু অন্তর-জীবনেও কি ইহার পরিচয় নাই? সেখানে কি এই সব মর্মান্তিক বিচ্ছেদ কোথাও তাহাদের পদচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই—ইহার পরিচয় কি অন্তর-জীবনে নাই? কাব্যে অথবা কর্মে অথবা তাঁহার এই সময়কার বিচিত্র সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই সব মর্মান্তিক দুঃখের পরিচয় কোথাও নাই, একথা সত্য, কিন্তু অন্তর-জীবনে যে একটা আমূল আবর্তন চলিতেছে তাহার আভাস "খেয়া"-গ্রন্থে এবং পরবর্তী কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে সুস্পষ্ট। "নৈবেদ্য"-নিবেদন ত আগেই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাঁহার চরণে এই নৈবেদ্য নিবেদিত হইয়াছে তাঁহাকে আরও নিবিড় করিয়া পাইবার আকুল আগ্রহ ক্রমশ সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিতেছে। সেই তিনি এখনও রহস্যের আবরণে আবৃত, এখনও তাঁহার উপলব্ধি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, রহস্যের ভিতর দিয়াই, অস্পষ্টতার ভিতর দিয়াই এখনও তাঁহার আনাগোনা চলিতেছে, দেবতা আসিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে, এখনও আসিয়া পড়েন নাই। একের পর এক মৃত্যু হয়ত সেই আগমনকে নিকটতর করিতেছে। মৃত্যুও রহস্যময়, আর দেবতার আনাগোনাও রহস্যময়, দুইই বোধ ও বুদ্ধিগোচর হয় কেবল রূপকের মধ্য দিয়া। সেই জন্যই "খেয়া"র অধিকাংশ কবিতাই রূপকের ভিতর দিয়া এক অনির্বচনীয় রহস্যের অভিব্যক্তি। "খেয়া"র কবিতা সেই জন্যই সর্বত্র ততটা অর্থগ্রাহ্য নয় যতটা বোধগ্রাহ্য, অনুভূতিগ্রাহ্য। রূপক এবং রহস্যের বাক্যার্থ কতটুকু, মর্মার্থই তাহার সবখানি, এবং সেই মর্মার্থ ধরা পরে শুধু ভাব-ব্যঞ্জনার মধ্যে।

"নৈবেদ্য" গ্রন্থের গান ও কবিতাগুলিতে বিশেষভাবে দুইটি ভাব-তরঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি কবিতায় আমরা দেখিয়াছি, কবি মানব-মহত্ত্বের এবং পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বাদর্শের বন্দনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার মাতৃভূমিকে সেই স্বর্গে উন্নীত করিতে চাহিতেছেন যে-স্বর্গে চিত্ত ভয়শূন্য, উচ্চ যেখানে শির, জ্ঞান যেখানে মুক্ত, যেখানে মানব-জীবন শতধা খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্রীকৃত নয়। তাঁহার এই আদর্শ কর্মরূপ লাভ করিল বাংলার স্বদেশী যজ্ঞকে উপলক্ষ করিয়া, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা সেইজন্য শুধু patriotism নয়, সংকীর্ণ nationalism'ও নয়। তাঁহার সমসাময়িক গানে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, আলোচনায় স্বাদেশিকতার যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের, চিরন্তন মানব-মহিমার রূপ ও আদর্শ।

কিন্তু "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে আর একটি ধারাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার। কতকগুলি কবিতায় অন্তর-জীবনে ভাগবতোপলব্ধির একটা আকুলতা অত্যন্ত স্পষ্ট। ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাগবত-সাধনাও যে কবিচিত্তকে একান্তভাবে নিজের গভীরতার মধ্যে টানিয়া লইতেছে, "নৈবেদ্যে"র অধিকাংশ কবিতায় তাহা গভীরভাবে ধরা পড়িয়াছে। অন্তর-জীবনের এই ফল্গুধারার পরিচয় স্বদেশী-যজ্ঞের বিচিত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে কোথাও ধরা পড়ে না, পড়িবার সুযোগও নাই। কিন্তু কর্মপ্রবাহের বিচিত্র উত্তেজনার মরুভূমির মধ্যে এই ধারা হারাইয়া গিয়াছিল, একথা মনে করিবারও কোন কারণ নাই।

বাহিরের জীবনে তিনি অসংখ্য মানুষের মধ্যে একজন মাত্র, সেখানে বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে সকলের সঙ্গে তিনি সমসুখদুঃখভাগী, তাহাদের সকলের সঙ্গে নিজকে তিনি জড়াইয়াছেন। কিন্তু আন্তর-জীবনে তিনি একা, সেখানে তাঁহার সঙ্গী কেহ নাই, থাকার প্রয়োজনও নাই—সেখানে একা একা প্রতিদিন তিনি অন্তরদেবতার সম্মুখীন হইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বোঝাপড়া চলিতেছে। বাহিরের জীবনে যখন তিনি বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল, কর্মনিরত, ঠিক সেই সময় অন্তর-জীবনে তিনি শান্ত, স্থির, অচঞ্চল, মধুর। "খেয়া"য় সেই অন্তরজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, ঠিক যেমন বহির্জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার এই সময়ের প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, আলোচনায়। যে আত্মগত অনুভূতির প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে, তাহাই একান্ত হইয়া যথার্থ কাব্যরূপ লইয়া প্রকাশ পাইল "খেয়া"য়। "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে প্রার্থনা আছে, উপদেশ আছে, ব্যাখ্যান আছে; কিন্তু "খেয়া"য় আছে যথার্থ কবিতা; রূপে রূপকে রসে রহস্যে গীতিমাধুর্যে "খেয়া" অপূর্ব কাব্য। আধ্যাত্মিক আকুতি "নৈবেদ্য"-গ্রন্থেও আছে, কিন্তু রূপক, রহস্য ও গীতমাধুর্য এই আকুতিকে "খেয়া"য় যে কাব্যমূল্য, দান করিয়াছে, তাহার তুলনা "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে নাই, "গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যে"ও নাই। নিসর্গ চৈতন্য, আধ্যাত্মিক আকুতি ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির এই মিলন, ইহাও আরম্ভ হইল এই "খেয়া"-গ্রন্থ হইতে।

"খেয়া"র প্রায় প্রত্যেক কবিতাই একটু বিষাদ-হতাশে ভারাক্রান্ত। এ-বিষাদ ব্যর্থতাজনিত নয়, হতাশা বঞ্চনাজনিত নয়। কবি ভাবিতেছেন, এই যে কর্মজীবনের চঞ্চলতা, এই যে বিক্ষোভ, এই উন্মাদনা, এই আবর্ত, জীবনের লক্ষ্য ত ইহার মধ্যে নাই, তৃপ্তিও নাই; জীবন ত আজিও ফুলে-ফসলে ভরিয়া উঠিল না, অথচ এদিকে দিনের আলো ত ফুরাইয়া আসিল। এই প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যময় জীবন, এই কর্মময় জীবনের তট হইতে খেয়া পার হইয়া অধ্যাত্মজীবনের তটে না পৌঁছিলে ত জীবনে তৃপ্তি নাই, জীবনের লক্ষ্যকে ত পাওয়া যাইবে না। ঘাটের কিনারায় আসিয়া বসিয়াছেন, অথচ ওপারে লইয়া যাইবার খেয়া ত এখনও এ জীবনের তটে আসিয়া ভিড়িতেছে না; "খেয়া"র কবিতায় যে বিষাদ ও হতাশ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহা এই অনুভবের জন্যই। প্রথম কবিতায়ই কবি বলিতেছেন,—

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।
ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফলল না,
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরাল সাঁঝের আলো জ্বলল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়।
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়। ('শেষ খেয়া')

'শুভক্ষণ' কবিতায়

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বল কী মতে?

* * *

রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বল কী মতে?

অথবা, 'আগমন' কবিতায়

ওরে দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্য তলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।

অথবা,

ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি
কখন যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে।
আমি চরণশবদ পাইনি শুনিতে
ছিলেম কিসের খেয়ানে
তাহা কে জানে।

* * *

রুদ্ধদুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার,
এবার তোমার আশাপথ চাহি
বসে রব খোলা দুয়ারে,—
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।
হে মোর পরানবঁধু হে
কখন যে তুমি দিয়ে চলে যাও
পরানে পরশমধু হে ('মুক্তিপাশ')

অথবা,

হেব হের মোর অকুল অশ্রু—
সলিলমাঝে
আজি এ অমল কমলকান্তি
কেমন রাজে।

* * *

আজি একা ব'সে ভাবিতেছি মনে
ইহারে দেখি,
দুঃখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।

ইহারি লাগিয়া হৃদ্ বিদারণ,
এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
ছুটেছিল ঝড় ইহারি বেদন
বক্ষে লেখি।
দুঃখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী। ('প্রভাতে')

প্রভৃতি কবিতায় পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে, খেয়া পার হইবার জন্য কবিচিত্ত উন্মুক্ত প্রতীক্ষায় দিন গুনিতেছে। প্রায় সমস্ত কবিতাই এই প্রতীক্ষার সুরে গাঁথা। 'গোধূলি-লগ্ন' 'নিরুদ্যম', 'জাগরণ', 'মিলন', 'পথের শেষ', 'দিনশেষ', 'সমাপ্তি', 'প্রতীক্ষা,' 'অনুমান', 'খেয়া' প্রভৃতি কবিতায় এই প্রতীক্ষার আভাস সুস্পষ্ট, কবিচিত্ত অধ্যাত্মজীবনকে গ্রহণ করিবার জন্য পরিপুর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। বাহিরের কর্ম-কোলাহল, বিচিত্র উন্মাদনা ও উত্তেজনা তাঁহার কাছে বোঝা বলিয়া মনে হইতেছে, নিজেকে নিজে আপন-গড়া কর্মশালায় বন্দী বলিয়া মনে করিতেছেন,—

ভেবেছিলেম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,
আমি রব একলা স্বাধীন
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনীদিন
লোহার শিকলখানা—
কত আগুন কত আঘাত
নাইকো তার ঠিকানা।
গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারি এই ডোর। ('বন্দী')

অথবা

যেথানে যা কিছু পেয়েছি, কেবলি
সকলি করেছি জমা,—
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব,
কেহ নাহি করে ক্ষমা।
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু,
নামাও।
ভাবের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে
এ যাত্রা মোর থামাও। ('ভার')

'বিদায়' কবিতায় কবি স্পষ্টই বলিতেছেন,

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মালা লও না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিও না ভাই।

* * *

তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।
রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা-গড়া
মতের লাগি দেশবিদেশে লড়া,
আলবালে জল সেচন করা
উচ্চশাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে।
পারিনে আর চলতে সবার পাছে। ('বিদায়')

'পথের শেষ' কবিতায়ও কবি বলিতেছেন, একদিন পথের নেশায় তাঁহাকে পাইয়াছিল, পথ তাঁহাকে ডাক দিয়াছিল, 'নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ' তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল ; কিন্তু

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা। ('পথের শেষ')

কবি এখন অনন্যচিত্ত, তাঁহার অন্তর আঁখির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে, 'সব-পেয়েছি'র দেশের কল্পনা, যে-দেশে

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি
নাইকো ঘাটে গোল
ওরে কবি এইখানে তোর
কুটিরখানি তোল্।
ধুয়ে ফেল্‌রে পথের ধুলো,
নামিয়ে দে রে বোঝা
বেঁধে নে তোর সেতারখানা
রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে বোস্‌রে হেথায়
সারাদিনের শেষে,
তারায়-ভরা আকাশতলে
সব-পেয়েছির দেশে। ('সব পেয়েছির দেশ')

সাত

গীতাঞ্জলি (১৩১৩-১৩১৭)
গীতিমাল্য (১৩১৫-১৬ ; ১৩১৮-২১)
গীতালি (১৩২২)

"খেয়া"তে কবির এক নবজন্মলাভের সূচনা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু শুধু ভাবের জগতেই কবি নবজন্মলাভ করিলেন এমন নয়, রূপের জগতেও কবির নবজন্মলাভ ঘটিল।

ছন্দের সচল অথচ সংযত গতিবেগ, শান্ত গভীর গাম্ভীর্য অন্তর্হিত হইয়া ভাব এখন গানের সুরে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। গানের সুর যেখানে ভাবের বাহন, সেখানে কথার লীলার স্থান অত্যন্ত কম, দুই একটি কথা শুদ্ধ মনের পরিপূর্ণতা হইতে অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িয়া কানের কাছে কেবলই অস্পষ্ট গুঞ্জনে মুখর হইয়া উঠে; মুখ ফুটিয়া সকল কথা বলিবার অবসর থাকে না, প্রয়োজনও হয় না। সুর সেখানে সকল কথা মন হইতে টানিয়া বাহির করে, সকল অকথিত বাণী সকল মূক কথাকে ভাষা দান করে; ছন্দলীলার স্থান সেখানে নাই। "খেয়া" হইতে, বিশেষ করিয়া "খেয়া"র পর হইতেই এই সুরের জগতের সৃষ্টি হইল, এবং সুদীর্ঘ বৎসরের পর বৎসর কবি সুরের সেই অনির্বচনীয় রাজ্যে নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া দিলেন। কবির এই পরিবর্তন বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া পারে না। যে-কবিকে আমরা শুনিয়াছি গভীর জ্ঞানলব্ধ কথা গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনিতে শুনাইতে, যাঁহাকে দেখিয়াছি উর্বশীর সৌন্দর্য নয়ন ও মন ভরিয়া উপভোগ করিতে, বসুন্ধরার সুবিস্তৃত বক্ষে আপনাকে বিস্তারিত করিতে, বিজয়িনীর দৃপ্ত বিজয়-মহিমা প্রাণ-ভরিয়া আঁখি-ভরিয়া দেখিতে, কালবৈশাখীর ঝড়ের উন্মাত্ততায় নাচিতে, সেই বিচিত্র বলিষ্ঠ সৌন্দর্যপিপাসু কবিচিত্তের আজ এ কি হইল! কি বিরাট এক অন্তহীন গভীর প্রেম ও আবেগ কবি-চিত্তকে আকর্ষণ করিল, যাহার ফলে সমস্ত দেহমন বালিকা-বধূর মতন কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, সমস্ত বল অন্তর্হিত হইয়া গেল, নিজেকে একান্ত দীন কাঙাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কোথায় গেল বুদ্ধির যত দীপ্তি, ভাষার যত শক্তি ও উচ্ছ্বাস, কল্পনার সবল উদ্দীপনা! সমস্ত অলংকার এক মুহূর্তে খসিয়া পড়িল, সমস্ত বাহুল্য অন্তর্হিত হইয়া গেল, সমস্ত বুদ্ধি ও জ্ঞান লজ্জায় মুখ লুকাইল; কবি যেন হৃদয়কে একেবারে অনাবৃত করিয়া দেবতার সম্মুখে অঞ্জলি করিয়া তুলিয়া ধরিলেন—যে কয়টি কথা সুরের রূপ ধরিয়া চিত্ত বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল তাহা একান্তই সহজ, সরল, অনাবৃত, বিরলসৌষ্ঠব।

"সোনার তরী-চিত্রা-কল্পনা-ক্ষণিকা"র কবি, মানব ও প্রকৃতির কবি, প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি, বিচিত্র রসানুভূতির কবি যে "খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"তে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব অধ্যাত্মজীবনে দ্বিজত্ব লাভ করিলেন, তাহা কিছুই অস্বাভাবিক বা আশ্চর্যজনক ব্যাপার নহে। সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেম-আনন্দ সকল রসের সায়রে যিনি এতদিন ডুবিয়া ছিলেন তিনি যে প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্য-স্বরূপকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবেন, সকল রসের মূলে পৌঁছিতে চাহিবেন, ইহা ত খুবই স্বাভাবিক। এই প্রচেষ্টা "খেয়া" হইতেই শুরু হইয়াছিল, "গীতাঞ্জলি"তে তাহা একটা স্পষ্ট রূপ ধারণ করিল, পরিপূর্ণ সার্থকতা পাইল "গীতিমাল্যে"। কয়েকটি ঋতু-উৎসবের গান, কিছু নিসর্গ-প্রকৃতির গান এবং আরও কয়েকটি গান ও কবিতা ছাড়িয়া দিলে "গীতাঞ্জলি"র প্রত্যেকটি গানে ও তাহাদের সুরে রস-স্বরূপকে পাইবার জন্য অন্তরের কি আকুলতা, সর্বত্র তাহার অস্তিত্বকে অনুভব করিবার জন্য কি তীব্র আবেগ, নিজের সকল অহংকার চূর্ণ করিয়া জীবন-কুসুমটি দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিবার জন্য কি প্রাণপাত নিবেদন! কিন্তু "গীতাঞ্জলি"তে এই অধ্যাত্মসাধনায় কবিচিত্তের সহজ আনন্দ, সরল উপলব্ধি, অপরূপ লীলার কোনও আভাস আমরা পাই না; পাই সাধনার বেদনা ও তাহার বিভিন্ন স্তর, পাই সংগ্রামের আভাস, পাই ব্যর্থতার ও বিরহের অস্পষ্ট ক্রন্দন। অথচ যতদিন পর্যন্ত জীবনে এই সাধনার আনন্দ সহজ হইয়া না উঠিল, উপলব্ধি সরল না হইল, দেবতার বিচিত্র ও অপরূপ লীলা সমস্ত চিত্তকে রাঙাইয়া রসে ভরিয়া না দিল, সমগ্র জীবনের হাসিখেলার সঙ্গে ভাগবত উপলব্ধির আনন্দ জড়াইয়া মিশিয়া না রহিল ততদিন

লীলা ও সৌন্দর্যানুভূতির কবি রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সে তৃপ্তি ও শক্তি, সে শান্তি ও আরাম, সে মুক্তি ও আনন্দ লাভ হইল "গীতিমাল্যে"। "গীতাঞ্জলি" ও "গীতিমাল্য" নাম দুইটিতেও আমার এই কথার প্রমাণ ও সার্থকতা আছে। কাব্য ও সৌন্দর্যের দিক হইতে, সহজ, স্বচ্ছ আনন্দোপলব্ধির দিক হইতে, অধ্যাত্মজীবনের সার্থক প্রকাশের দিক হইতে "গীতিমাল্য" এবং "গীতালি" যে "গীতাঞ্জলি" হইতে শ্রেষ্ঠতর একথা বলিতে আমার কোনও দ্বিধাবোধ নাই।

"গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি" সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। এই গ্রন্থ কয়টির প্রায় সব কবিতাই গান, কথার মূল্য কিছু নাই একথা বলি না, কিন্তু যেহেতু কথার যাহা কিছু ব্যঞ্জনা তাহা সুরের মধ্যে, সেই হেতু কথা সব অদৃশ্য বন্ধনে জড়াইয়া আছে সুরের সঙ্গে। কথা ও সুর মিলিয়া সৃষ্টি করিয়াছে এই গ্রন্থ কয়টির কাব্য-জগৎ; শুধু কথার মধ্যে ইহাদের সৌন্দর্য ধরা পড়ে না, শুধু সুরের মধ্যেও নয়, এবং সেই হিসাবেই ইহারা বিচার্য।

"খেয়া"-গ্রন্থে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি উন্মুখ চিত্তের অধীর প্রতীক্ষা। "গীতাঞ্জলি"তে দেখিতেছি এই উন্মুখ অধীর প্রতীক্ষা বিরহেব ক্রন্দনে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। বিরহের বেদনা, দেবতাকে একান্ত না পাওয়ার দুঃখ "গীতাঞ্জলি"র গানগুলির উপর সুগভীর ছায়াপাত করিয়াছে। নানা অবস্থায় নানা পরিবেশের মধ্যে কবি নানাভাবে দেবতার সান্নিধ্যলাভ করিতে চাহিয়াছেন, নানাভাবে কবি তাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কোথাও যেন পাওয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, সত্যকার সম্পূর্ণ উপলব্ধি যেন এখনও হয় নাই; সেইজন্যই একটা ব্যথা ও বেদনার সুর "গীতাঞ্জলি"র অনেক গানেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দুঃখ-আঘাত-বিপদের ভিতর দিয়া যে-সাধনা সে-সাধনাকে কবি স্বীকার করিয়াছেন; এবং সে-সাধনার ভিতর দিয়া, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া দেবতার স্পর্শ তিনি চাহিয়াছেন। দুঃখ-আঘাত-বেদনা যে দেবতারই স্পর্শ এই উপলব্ধি তাঁহার চিত্তে জাগিয়াছে। আবার নিজের অহংকারকে চূর্ণ করিবার যে-সাধনা সে-সাধনাকেও কবি স্বীকার করিয়াছেন এবং নিজের সকল অহংকারকে চোখের জলে ডুবাইয়া দিবার সাধনা অভ্যাস করিয়াছেন। আবার কর্মযোগের যে-সাধনা তাহাও কবি স্বীকার না করিয়া পারেন নাই, এ কথা তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে ধরা দিয়াছে যে, আমাদের দেশে ভগবান তাঁহার সুউচ্চ স্বর্ণসিংহাসন ছাড়িয়া নামিয়া আসিয়াছেন 'সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে', নামিয়া আসিয়াছেন সেইখানে যেখানে

> * * * মাটি ভেঙে
> করছে চাষা চাষ,
> পাথর ভেঙে কাটছে যেথা পথ
> খাটছে বারো মাস। ("গীতাঞ্জলি")

সেইখানে ভগবানকে তিনি স্পর্শ করিতে চাহিয়াছেন। "গীতাঞ্জলি"র গানগুলিতে তাই বেশির ভাগ কবির এই সাধনার ইঙ্গিতই পাওয়া যায়; পরিপূর্ণ উপলব্ধির আনন্দের বার্তা যেন স্বল্পই; সাধনার পরিপূর্ণ ফল যে সহজ আনন্দরস তাহা "গীতাঞ্জলি"তে নাই বলিলেই চলে। সেইজন্যই "গীতাঞ্জলি"র অধিকাংশ গান ও কবিতা রসসমৃদ্ধ হইতে পারে নাই; বিশেষ ভাবে একথা সত্য, অধ্যাত্ম-সাধনার ইঙ্গিত যে গানগুলিতে আছে, সেই গানগুলি-সম্বন্ধে। "গীতাঞ্জলি"র অধিকাংশ গানে তাই রসের কথা অপেক্ষা সাধনার কথা বড়, আনন্দ অপেক্ষা বেদনার কথা অধিক।

"কাব্য হিসাবে এই সাধনার ইঙ্গিত সম্বলিত কবিতাগুলি নিকৃষ্ট। * * বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি কবির অধ্যাত্ম-সাধনার বার্তার ভাগই বেশি; পরিপূর্ণ উপলব্ধির বাণী কম। * * * বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র যে-সকল গানে কবির অধ্যাত্ম-সাধনার আভাস ইঙ্গিত আছে সেগুলি পরে পরে সাজাইলে কবির সাধনার একটা সুস্পষ্ট চেহারা ধরিতে পারা যায়। মোটামুটি সাধনার তিনটি ধারা আমি ধরিতে পারিয়াছি। * * *

'গীতাঞ্জলি'র এই সাধনার কবিতাগুলি কবিতা হিসাবে নিকৃষ্ট সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহাই আশ্চর্য যে কবির সমস্ত স্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে এই কাব্যের মধ্যে ধরা দিয়াছে। এ যেন কবির প্রতি-দিনের ডায়ারি—শুধু প্রভেদ এই যে মানুষ ডায়ারি লিখিবার কালে প্রায়ই আপনার সম্বন্ধে কিছু না কিছু সচেতন না হইয়া যায় না। এই কাব্যে কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম অভিজ্ঞতাগুলি পরে পরে বাহির হইয়া আসিয়াছে। * * * শিল্পীর মত কেবল শিল্পের শ্রেষ্ঠ ফল দান করিয়া কবি বিদায় লন নাই, তিনি এই কাব্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করিয়া দান করিয়াছেন। এইখানেই 'গীতাঞ্জলি'র বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই পশ্চিমে এই শ্রেণীর অন্যান্য সকল কাব্যের অপেক্ষা 'গীতাঞ্জলি'র সমাদর এত অধিক হইয়াছে। এই কাব্যে মানুষের জীবনের মধ্যে কবির সাধনা গিয়া আঘাত করিয়াছে। * * *

(অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য পরিক্রমা," ২য় সং, ১৩৮—১৪১ পৃঃ)

সকলেই জানেন ইংরেজি "গীতাঞ্জলি" উপলক্ষ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন, এবং এই গ্রন্থ-সম্বন্ধেই সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ প্রশংসামুখর হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজি "গীতাঞ্জলি" বাংলা "গীতাঞ্জলি"র সব গানের অনুবাদ নয়; "নৈবেদ্য" ও "খেয়া"-গ্রন্থের অনেক কবিতা, "গীতাঞ্জলি"র অনেক গান, "গীতিমাল্যে"রও ১৫।১৬টি গানের অনুবাদ ইংরেজি "গীতাঞ্জলি"তে স্থান পাইয়াছে; তবে "গীতাঞ্জলি"র গানের অনুবাদই সব চেয়ে বেশি। কিন্তু সে যাহাই হউক, "গীতাঞ্জলি"র মধ্যে পাশ্চাত্য জগৎ এমন কি মায়ামন্ত্রের সন্ধান, কি সোনার কাঠির স্পর্শ পাইল যাহার ফলে সমস্ত পিপাসু আত্মা এক মুহূর্তে একেবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়িল! ইহার হেতু কি সে-সম্বন্ধে অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং আমি মনে করি তাঁহার অনুমান ও বিচার মোটামুটি সত্য।* কাজেই এ-সম্বন্ধে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আমরা, যাহারা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা ও উপলব্ধির পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছি, অতীন্দ্রিয় জগৎ ও অধ্যাত্মচেতনার রাজ্য যাহাদের কাছে অপরিচিত নয়, তাহাদের কাছে "গীতাঞ্জলি"র অধ্যাত্ম-সাধনা ও উপলব্ধির মর্মবাণী এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। অতীন্দ্রিয় লোকের রূপ ও রহস্য, অধ্যাত্ম-সাধনার বেদনা, বিরহানন্দ ইত্যাদি বিচিত্র গূঢ় অনুভূতি আমাদের মধ্যযুগের কবি-সাধক অথবা সাধক-কবিদিগের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাণীর ভিতর, বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলীর ভিতর, আউল-বাউলদের মধুর গানের ভিতর হইতে অহরহই আমাদের মন ও প্রাণকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে আদি ও মধ্যযুগে অনেক কবিই ছিলেন সাধক, অনেক সাধকই ছিলেন কবি; কাজেই আমাদের দেশের ধর্ম-সাধনা রূপ ও রস-সাধনাকে জীবন হইতে নির্বাসন দেয় নাই; ভারতীয় ধর্ম সাধনা এই হেতুই কোনও দিনই একান্ত শুষ্ক নীরস হইয়া উঠে নাই। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আদি যুগে, ব্রাহ্মধর্মে, একসময়ে আত্যন্তিক নীতিবোধ ও পাপবোধের ফলে ভারতীয় ধর্ম-সাধনা শুষ্ক নীরস জীবন-নিরপেক্ষ এক মরুপথকেই জীবন-পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সে-পথ চিরন্তন পথ বলিয়া আমাদের দেশ কখনও গ্রহণ করে নাই। মধ্যযুগের ধর্ম-সাধনা একেবারেই সে-পথকে অস্বীকার করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি হইলেন মূলত কবি, তাঁহার অধ্যাত্ম-

* অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য-পরিক্রমা," ১২১—১৩৭ পৃঃ।

সাধনা এবং উপলব্ধি রূপ ও রস-সাধনাকে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে নাই, বরং তাহাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার জগৎ, অতীন্দ্রিয় লোকের বিচিত্র রস ও রহস্যের জগৎ পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টিতে এক নূতন গ্রহলোক আবিষ্কার বলিয়া মনে হইলেও আমাদের ভারতীয় মানসের দৃষ্টিতে এমন কিছু নূতন নয়; সে জগৎ আমাদের কাছে নূতন জগৎ নয়, শুধু নূতন করিয়া নূতন ভাষায় নূতন ভঙ্গিমায় আমাদের কাছে তাহা উপস্থিত করা হইয়াছে মাত্র। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"ব কবি-সাধক রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে নানক-কবীর-দাদূ-রজ্জব-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-একনাথ-মীরাবাঈ প্রভৃতি সাধক কবিদেরই সমগোত্রীয়। বিশ্বজীবনের সকল রূপের মধ্যেই অপরূপের লীলা এই সাধক-কবিদের অধ্যাত্মদৃষ্টির সম্মুখে ধরা দিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথও জীবনের ও নিসর্গের সকল রূপের মধ্যে এক নিত্য অপরূপের লীলাই দেখিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার অধ্যাত্ম-মানসের আশ্রয় হইতেছে প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ, মানব-জীবনের বিচিত্র লীলা। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র প্রায় প্রত্যেক গানে ও কবিতায় তাহার প্রমাণ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কথা উঠিয়াছে, "গীতাঞ্জলি"র অধ্যাত্ম-সাধনা ও উপলব্ধির মর্মবাণী এমন কিছু বিস্ময়কর নাই বা হইল, কিন্তু তাই বলিয়া "গীতাঞ্জলি"র গান ও কবিতাগুলি রসসমৃদ্ধ নয়, কিংবা কবিত্বের দিক হইতে তাহাদের মূল্য কম, একথা কি করিয়া বলা চলিতে পারে? আগেই বলা প্রয়োজন, এই যে রসসমৃদ্ধির অল্পতার কথা বা কবিত্বের অপূর্ণতার কথা বলিতেছি তাহা শুধু "গীতাঞ্জলি"র অধ্যাত্ম-সাধনার ইঙ্গিত-সম্বলিত গানগুলি-সম্বন্ধে, এবং আমার ধারণা, এই গানগুলিতেই "গীতাঞ্জলি"র ভাববৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। আমাদের দেশের মধ্যযুগীয় কবি-সাধকদের হিন্দী, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষার রচিত গান, দোহা, ভজন; মধ্য, উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় রাগ-রাগিণী চিত্রশালা; এবং বাংলা বাউল, বৈষ্ণবদের পদ, গীত ইত্যাদির সঙ্গে যাঁহাদের বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে ভারতীয় অধ্যাত্ম-মানসে রূপে ও রসে কতকটা ঠিক এই জাতীয় ভাব-পরিবেশ সুপরিচিত, এবং তাহাদেব কবিত্বরসও একেবারে তুচ্ছ করিবার মতন নয়। "গীতাঞ্জলি"র গানগুলির অনেক চিত্র-পরিবেশ, অনেক উপমা, অনেক আকুতি ও বেদনাব সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি পরিচয় মধ্যযুগীয় এই সব গান, ভজন, দোহা, পদ, গীত প্রভৃতিতে এবং রাজস্থানী পদ্ধতির চিত্রশালায়। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে', 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই', 'কত অজানারে জানাইলে তুমি', 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে', 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে', 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চল্‌বে না', 'প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে', 'তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী', 'আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রবো', 'রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ রতন আশা করি', 'নিভৃত প্রাণের দেবতা', 'সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি', 'তব সিংহাসনের আসন হ'তে', 'তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্‌নি তার পায়ের ধ্বনি', 'তারা তোমার নামের বাটের মাঝে মাসুল লয় যে ধরি', 'একদা আমি বাহির হলেম তোমার অভিসারে' প্রভৃতি সুবিখ্যাত গানের ভাব ও রূপ-পরিবেশ ভারতীয় সংস্কৃতিবিচ্যুত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানসে নূতন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের জনসাধারণের চিত্তে ইহাদের ভাব ও রূপ-জগৎ একটি অখণ্ডরূপে আজও বিধৃত, তাহারা এই জগতের সঙ্গে পরিচিত, যদিও

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও আঙ্গিকের সঙ্গে পুরোপুরি নয়। তাহাদের কাছে এই জগতের রূপ ও রস-অভিজ্ঞতা বিশেষ কিছু নূতনত্ব বহন করে না। অথচ অভিজ্ঞতার নূতনত্ব বা স্বাতন্ত্র্য এবং প্রকাশের অভিনবত্বের মধ্যে রসের অঙ্কুর অনেকাংশে নিহিত। এই স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব "গীতাঞ্জলি"র সাধনার ইঙ্গিত-সম্বলিত গানগুলিতে প্রায় অনুপস্থিত। তবে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম-সাধনার ইঙ্গিত যেখানে নিসর্গ সাধনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত সেখানে গানগুলি নূতন অর্থ-নির্দেশ, নূতন ব্যঞ্জনা-লাভ করিয়াছে; সে গানগুলির কবিত্বরস কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। যেমন, 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে' সুবিখ্যাত গানটির আরম্ভ যদিও অতি সুপরিচিত চিত্র-পরিবেশে, এবং ভাবপরিবেশ যদিও পুরাতন ঐতিহ্য-অভিজ্ঞতা হইতে আহৃত, তবু সূচনার পরই নিসর্গ অভিজ্ঞতার ও চিত্র-পরিবেশের একটি মোড় দেখা দিয়াছে প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় পর্যায়ে—

প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি,
বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি,
নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।
কূজনহীন কাননভূমি
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিকহীন পথের পরে।

অথবা, 'মেঘের পর মেঘ জমেছে' গানটিতে

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায
দুরন্ত বাতাসে।

এই ধরনের দৃষ্টান্ত আরও আহরণ করা কিছুই কঠিন নয়।

এই যে 'দুরন্ত বাতাসে পরান কাঁদিয়া বেড়ান'—অধ্যাত্মাকূতির সঙ্গে সূক্ষ্ম নিসর্গানুভূতির এই ধরনের শুভ্র পরিণয়, এই ধরনের মিলনের মধ্যে একটি নূতন অভিজ্ঞতার পরিচয় কতকগুলি গানে পাওয়া যায়। সর্বত্র এই সংযোগের মধ্যে বা ভাব-পরিবেশের মধ্যে খুব নূতনত্ব নাই; কোন কোনও ক্ষেত্রে তাহা ঐতিহ্য-স্বীকৃত; তবু বহুক্ষেত্রে যে আছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। যে-সব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার এই স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বের প্রকাশ আছে, সেই সব গানই নূতন রসরূপ লাভ করিয়াছে; তবে, অধ্যাত্ম-সাধনার ইঙ্গিত-সম্বলিত গানগুলিতে এই পরিচয় কম। যেটুকু আছে তাহাও এমন কিছু নয় যাহার সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্যে ইতিপূর্বেই আমাদের পরিচয় লাভ ঘটে নাই।

তবে, "গীতাঞ্জলি"তে এমন কতকগুলি গান আছে, যেখানে নিসর্গানুভূতির প্রকাশই প্রবল, অধ্যাত্মানুভূতি তাহাদের মধ্যে একটু মৃদু সৌরভ মাত্র সঞ্চার করিয়াছে, তাহার বেশি কিছু নয়। এই ধরনের গানগুলির চিত্র-গরিমাই শুধু উপভোগ্য নয়, ভাব গরিমায়ও ইহারা সরস, এবং যেহেতু অধ্যাত্মানুভূতির ইঙ্গিত এসব ক্ষেত্রে নিসর্গানুভূতির পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন, সেই হেতু ইহাদের রসব্যঞ্জনাও গভীর। "গীতাঞ্জলি"র যাহা কিছু রস-সমৃদ্ধি তাহা এই জাতীয় গানগুলির। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা', 'তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ দুখের অশ্রুধার',

'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালি মালা', 'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া', 'আজি শ্রাবন ঘন গহন মোহে', 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'আমার নয়ন ভুলানো এলে', 'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, গেলোরে দিন বয়ে', 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', 'আর নাইরে বেলা নামলো ছায়া ধরণীতে', 'আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে', 'এসো হে এসো, সজল ঘন বাদল বরিষণে', 'শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে', 'গায়ে আমার পুলক লাগে', 'আজি গন্ধ বিধুর সমীরণে', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে', 'আজি বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে' ইত্যাদি কোনও কোনও গানে অধ্যাত্মানুভূতির বেশ একটু নূতন ব্যঞ্জনা, নূতন অভিজ্ঞতার রস ধরা পড়িয়াছে ; কিন্তু "গীতাঞ্জলি"র ১৫৭টি গানের অনুপাতে ইহাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অধিকাংশ গানেই ত সাধনার বেদনা অথবা আনন্দ অত্যন্ত সুপরিচিত অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত ; গভীরতর ব্যঞ্জনা বা সূক্ষ্মতর অনুভূতি প্রায় অনুপস্থিত। এই কারণেই "গীতাঞ্জলি"র গানগুলিকে যখন সমগ্রভাবে দেখি তখন তাহাদের রসসমগ্রতা মনকে আবেশাভিভূত করে না ; কল্পনা ও মননকে যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি দেয় না। তাহাদের যাহা কিছু মাধুর্য তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুরের মাধুর্য এবং সেই সুর-পরিবেশ আমাদের চিত্তের মধ্যে অনুক্ষণ সঞ্চিত ও সঞ্চারিত।

যাহাই হউক, "গীতিমাল্য" ও "গীতালি"তে কিন্তু কবি এই সুপরিচিত অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট প্রকাশের ধারাটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন, অধ্যাত্মাভিজ্ঞতাও ইতিমধ্যে গভীরতর হইয়াছে। যে-অনুভূতি তাঁহার কবি-প্রকৃতির, সূক্ষ্মতর কল্পমানসের আত্মীয় সেই নিসর্গানুভূতিই ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়াছে ; অধ্যাত্মানুভূতির যাহা কিছু প্রকাশ তাহাও আশ্রয় করিয়াছে এই নিসর্গানুভূতিকে এবং তাহারই ভিতর দিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে। এই ধরনের ব্যঞ্জনাময় সূক্ষ্ম আভাসসমৃদ্ধ অধ্যাত্মানুভূতির পরিচয় বহুলাংশে নূতন। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের এই ধরনের গান, দোহা, পদ, ভজন প্রভৃতিতে এক ধরনের নিসর্গ পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা ছিল, কিন্তু তাহা একান্ত রীতিগত, কতকটা যেন বাঁধা গৎ ; সেই শ্রাবণের ধারা বর্ষণ, সেই কদম ও তমালবন, সেই মাঘের কুয়াশা ও শীত, বসন্তের দক্ষিণ বাতাস ও বিচিত্র রং ইত্যাদি বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন প্রকাশের সাহায্যে কেবল যেন একটি একটি চিত্র-পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা, তাহার চেয়ে বেশি কিছু নয়। অধ্যাত্মানুভূতির সঙ্গে সেই চিত্র-পরিবেশের কোনও সূক্ষ্ম অনুভূতির গভীর ভাব-সংযোগ কিছু ছিল না। "গীতাঞ্জলি"র কতকগুলি গানে এই ধরনের সংযোগের ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি, এবং সেই গানগুলিরই যাহা কিছু রসসমৃদ্ধি। "গীতিমাল্য" এবং "গীতালি"তে এই ধরনের সংযোগ গভীরতর হইয়াছে, এবং অধ্যাত্মানুভূতিও সহজতর হইয়াছে ; সেইজন্যই এই দুই গ্রন্থের রসসমৃদ্ধিও "গীতাঞ্জলি" অপেক্ষা অনেক গভীর, স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ। "গীতিমাল্য" ও "গীতালি"কে যে "গীতাঞ্জলি" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়াছি তাহা এই কারণেই। গভীর নিসর্গচেতনার সঞ্চারই রবীন্দ্র-অধ্যাত্মানুভূতির বৈশিষ্ট্য এবং এই ধরনের গানগুলির রস প্রেরণার মূলে ; যে গানগুলিতে তাহা নাই তাহাদের রসপ্রেরণাও দুর্বল।

"গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি" রচনার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ ধর্মসংগীত অনেক রচনা করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মসমাজে এবং ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও খুব পরিচিত, বহুল পরিমাণে গীত ও ব্যাখ্যাত। 'অন্ধজনে দেহ আলো', 'শুনেছে তোমার নাম', 'জানি হে যবে প্রভাত হবে' ইত্যাদি গান কবির যৌবনের রচনা, যখন অধ্যাত্মচেতনা

কবিচিত্তকে স্পর্শও করে নাই। এই ধরনের ধর্মসংগীত রচনা "মানসী"র যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল;

"কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্বেকার ধর্মসংগীতগুলি প্রচলিত ব্রহ্মোপাসনার ভাব অবলম্বন করিয়াই রচিত। তখন কবির স্বকীয় কোন অধ্যাত্ম অনুভূতি জাগে নাই—তিনি আপনার অভিজ্ঞতাকে আপন বাণীরূপে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন নাই। সুতরাং তখনকার গানগুলি প্রচলিত উপাসনার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আধুনিক গানগুলি যে তাঁহার কাব্যজীবনের চরম পরিণতি স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা তো প্রথাগত নহে, আত্মগত—দশের জিনিস নহে, একেলার।"

—অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য পরিক্রমা", ১১০—১১১ পৃঃ।

পূর্বেকার ধর্মসংগীতগুলি ধর্মপ্রবণ চিত্তে ধর্মবোধের সঞ্চার কতটুকু করে বা করে না, আমাদের বিচার্য তাহা নহে; কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, সে-সংগীতগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজের অধ্যাত্ম-চৈতন্যের কথা নয়, প্রচলিত ধর্মধারণার কথা। কিন্তু "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র গানগুলি কবির স্বীয় অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার কথা, মর্মছেঁড়া বাণী, জাগ্রত অধ্যাত্ম-চৈতন্যের গোপন গুঞ্জন।

ইতিপূর্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগীয় সাধক-কবি কবীর-নানক-রজ্জব-দাদূ-মীরাবাঈ-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস প্রভৃতির সমগোত্রীয়। ভক্তিরসাশ্রিত গান ইঁহারা অনেক রচনা করিয়াছেন, নিজেরা গাহিয়াছেন, ভক্তশিষ্যেরা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, গাহিয়া ধর্মসাধনায় শক্তি লাভ করিয়াছেন; এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়া সে-সব গানের কিছু কিছু পদ আমাদের চিত্ত-তটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু সে সব অধ্যাত্ম-রসাশ্রিত গান ও রবীন্দ্রনাথ-রচিত গানগুলি কি একই রস ও রূপাশ্রিত, তাহারা কি একই মূল্য বহন করে? বোধ হয় নয়; কারণ যে-সব সাধক-কবিদের কথা বলিলাম, তাঁহারা সকলেই জীবনে শুধু ঐ ভক্তিসাধনা, অধ্যাত্ম-সাধনাই করিয়াছেন, ভক্তিরস অধ্যাত্মরসই জীবনের একমাত্র রস বলিয়া জানিয়াছেন; অন্য কোন রস বা সাধনা তাঁহাদের জীবনকে স্পর্শ করে নাই, করিলেও তাহা কাব্যের মধ্যে উৎসারিত হয় নাই। কিন্তু জীবনের বিচিত্র রস ও সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটিয়াছে, তিনি নিসর্গের কবি, নরনারীর দেহ-আত্মার প্রেমলীলার কবি, জীবনের বিচিত্র রস ও রহস্যের কবি। তিনি "সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-কল্পনা-ক্ষণিকা"র কবি; তিনি তো শুধু "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র কবি নহেন।

"যিনি প্রকৃতির কবি, মানবপ্রেমের কবি, যিনি সকল বিচিত্র রস ও নিগূঢ় জীবনের গান গাহিয়াছেন, তিনিই যে এখন রসানাং রসতমঃ, সকল রসের রসতম ভগবৎপ্রেমের গান গাহিতেছেন—ইহাতে ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের ভক্তিসংগীতের সঙ্গে এই নূতন ভক্তিসংগীতের প্রভেদ ঘটিয়াছে। এমন ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটিয়াছে কিনা জানি না। কারণ ধর্ম চিরকালই জীবনের অন্যান্য বৈচিত্র্য হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া সযত্নে সন্তর্পণে আপনাকে এক কোণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। * * * জীবনের সকল রস, সকল অভিজ্ঞতার এমন আশ্চর্য প্রকাশ জগতের অল্পকবির মধ্যেই দেখা গিয়াছে। পরিপূর্ণ জীবনের গান যিনি গাহিয়াছেন, তিনি যখন অধ্যাত্ম উপলব্ধির গান গাহেন, তখন এসরাজের মূল তারের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশাপাশি যে তারগুলি থাকে তাহারা যেমন একই অনুরণনে ঝংকৃত হইতে থাকে এবং মূল তারের সংগীতকে গভীরতর করিয়া দেয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম উপলব্ধির সুরের সঙ্গে জীবনের অন্যান্য রসোপলব্ধির সুর মিলিত হইয়া এক অপূর্ব অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি করে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে যে সকল বিলাতি সমালোচক খৃষ্টান ভক্ত কবিদের সঙ্গে বা হিব্রু প্রফেটদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তাঁহাদের তুলনা যেমন সত্য হয় নাই, সেইরূপ যাঁহারা এতদ্দেশীয় ভক্ত কবিদের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করেন, তাঁহাদেরও তুলনা ঠিক বলিয়া মনে করি না। বরং আধুনিক কালের যে-সকল কবি জীবনের সকল বিচিত্রতার রসানুভূতিকে অধ্যাত্ম-রসবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে চান—সেই সকল কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তুলনীয় হইতে পারেন।"—(অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য-পরিক্রমা," ১৫৩—১৫৪ পৃঃ)

অনেকেই "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র কবি রবীন্দ্রনাথকে বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক উপরোক্ত কারণেই এই তুলনা খুব সত্য ও সার্থক নয়, ঠিক যেমন সত্য ও সার্থক নয় উপনিষদের ঋষি কবিদের সঙ্গে তাঁহার তুলনা। অথচ উপনিষদের অধ্যাত্মযোগ কিংবা বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব তাঁহার কবিমানসকে নূতন ঐশ্বর্য দান করিয়াছে, একথাও অস্বীকার করা চলে না। "গীতাঞ্জলি"র অনেক গানে বিরহের সুগভীর ব্যথা ও বেদনা, "গীতমাল্যে"র কোন কোন গানে মিলন ও বিরহের আনন্দ খুব স্পষ্ট; বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভাবজগৎ কল্পনা-জগৎ "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র অনেক গানেই ছায়া পাত করিয়াছে। তবু একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, মূর্তিসাপেক্ষ যে-প্রেম বৈষ্ণব পদাবলীতে মান, বিরহ, মিলন, অভিসার প্রভৃতি বিচিত্র রসকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে, ঠিক সেই প্রেমই রবীন্দ্র-কবি-মানসের উপজীব্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেম রহস্যময়, তাঁহার দেবতাও রহস্যময়, নব নব বিচিত্র তাঁহার রূপ, গভীর বিচিত্র রহস্যের মধ্যে কোথায় কখন যে তাঁহার প্রকাশ ক্ষণে ক্ষণে ধরা দেয় তাহা কবি নিজেও ভাল করিয়া জানেন না। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই রহস্যের আভাস পাওয়া যায় না; তাহাদের বিচিত্র প্রেমলীলা যেন অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট; তাহাদের সব কথাই যেন আমাদের জানা, বুদ্ধির ও কল্পনার গোচর; কোন্ পথ যে কোন্ বাঁকে মোড় ফিরিবে, সবই যেন আমরা জানি। বৈষ্ণব পদকর্তাদের সহজ ভক্তির সুরও রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতে ধরা পড়ে নাই। তাহার কারণও আছে। বৈষ্ণব পদকর্তারা একটি প্রচলিত ধর্মমত ও বিশ্বাসকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা সহজ ভক্তি-সাধনাকেও তাহার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং সহজেই তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন প্রচলিত ধর্মমত ও বিশ্বাসকে স্বীকার করিয়া যাত্রা শুরু করেন নাই, সেইজন্য বৈষ্ণবের সহজ ভক্তিও তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব হইতেই সঞ্চারিত হয় নাই; সহজ হইবার সাধনা তিনি করিয়াছেন, কিন্তু নিজেই আবার দারুণ অস্বস্তিতে বলিয়াছেন,

> জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
> দুটো তারে,
> জীবন বীণা ঠিক সুরে তাই
> বাজে না রে। ("গীতাঞ্জলি," ১২৮নং)

এই যে সরু-মোটা দুইটি তারে জীবন-বীণা জড়াইয়া যাওয়া, ইহাও ত এক অধ্যাত্মলীলা। এই লীলার প্রকাশ বৈষ্ণব পদাবলীতে নাই। সেইজন্য "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"তে যে বিরহের দুঃখ-বেদনা, মিলনের যে আনন্দ, ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে নিবিড় সঙ্গোপন আলাপন তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ-মিলন প্রভৃতি বিচিত্র রসের একটি গভীর সাদৃশ্য থাকিলেও, এ কথা স্বীকার করিতে হয়, এই দুই অধ্যাত্ম সাধনার ধর্ম এক নয়। রবীন্দ্র-অধ্যাত্মরসের বৈচিত্র্যও বৈষ্ণব অধ্যাত্ম-সাধনায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদতত্ত্বের আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু উপনিষদের অধ্যাত্মযোগতত্ত্বও "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র অধ্যাত্মরসকে অনুপ্রাণিত করে নাই; উপনিষদের অধ্যাত্মযোগ গভীর জ্ঞানসাপেক্ষ ধ্যানসাপেক্ষ—জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

"উপনিষদের সাধনা এই অন্তর্মুখীন ধ্যানপরায়ণ সাধনা—অধ্যাত্মযোগের সাধনা। উপনিষদের ব্রহ্ম—দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং। তিনি লীলারসময় বিশ্বরূপ ভগবান নহেন। * * উপনিষদের যোগতত্ত্বে বেদান্তশাস্ত্র তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে কাব্যকথা সমুৎসারিত হয় না।"—(অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য-পরিক্রমা," ২য় সং, ১৪০—৪১ পৃঃ)

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, "গীতাঞ্জলি"র গানগুলিতে সাধনার বেদনা, ব্যর্থতা ও বিরহের ক্রন্দনের সংবাদই বেশি পাওয়া যায়; অথচ অধ্যাত্ম-সাধনার পরিণত ফলটির সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধনার বৈচিত্র্যকে আমাদের দেশ স্বীকার করিয়াছে বটে, এবং বিভিন্ন পন্থা লইয়া কলহ-কোলাহলও কম করে নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনা সর্বদাই লক্ষ্য রাখিয়াছে পরিণত ফলটির দিকে, এবং তাহার মাপকাঠিতেই সাধন-পন্থার মূল্য নির্ধারণ করিয়াছে। যে-জীবনে ভাগবতোপলব্ধি আসিয়াছে, সেই জীবনের রস ও আনন্দ-হিল্লোলই আমাদের দেশের অধ্যাত্মচিত্তে আনন্দসঞ্চার করিয়াছে এবং অধ্যাত্মজীবনে জনসাধারণকে আকর্ষণ করিয়াছে; এই রস ও আনন্দ-হিল্লোলই মুখ্য, সাধন-পন্থা গৌণ, সে-পন্থার ব্যথা এবং বেদনাও গৌণ। এই হিসাবে ভারতীয় চিত্তে "গীতাঞ্জলি" খুব বৃহৎ মূল্য বহন করে না। এই কথাটাই শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার চক্রবর্তী খুব সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন,—

"* * * আমাদের দেশের লোক সাধনার বিচিত্রতাকে * * বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, একটা বিষয়ে এদেশের লোকের বোধ সুপরিণত হইয়াছে। অধ্যাত্ম-সাধনার ফলটিতে ঠিক পাক ধরিল কিনা, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝি। কথায় আমাদের চিড়া ভিজাইতে পারে না। আমাদের দেশের লোক শ্রুতি-ধারনের মত করিয়া যে-সকল ভক্তদের বাণী ও সংগীত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা শ্রবণ মাত্র আমরা এবিষয়ে জাতির প্রতিভা বুঝিতে পারিব। * * *

"আমরা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনবৃক্ষের পরিণামের দিকে চাহিয়া আছি; একটা 'গীতাঞ্জলি'কেই আমরা সেই জীবন-মহাবৃক্ষের পরিণত ফল বলিতে যাইব কেন? 'গীতাঞ্জলি'কে পশ্চিম বেশি বুঝিয়াছে, একথা তাহারা গর্ব করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেও আমরা তাহা সত্য নয় জানি। * * * আমরা যে কবিকে তাঁহার সমগ্র কাব্যজীবনের ভিতর হইতে দেখিতেছি—তাঁহার জীবনের পশ্চাতে যে বহুযুগের অধ্যাত্মরসধারা তাঁহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে তাহাকে দেখিতেছি,—কিছুই আমাদের কাছে ঝাপসা নহে। আমরা জানি তাঁহার প্রাণের মূল জীবনের সুখদুঃখময় সকল বিচিত্র রসের মধ্যে কতদূরে গভীরতম তত্ত্বতে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছে এবং সমস্ত বিশ্বের আলোকে সমীরণে নানা আঘাতে বিকাশ লাভ করিয়া দিকে দিকে সেই বিচিত্র জীবনের রসপুষ্ট কাব্যের শাখা-প্রশাখা কি আশ্চর্য পত্রপুষ্পে শোভিত হইয়া আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। ক্রমে যখন শাখাগ্রভাগে পরিণত জীবনের ফল ধরিল তখন তাহার কাঁচা রং আমরা দেখিয়াছি—তখনও তাহা রসে মধুর হয় নাই, জীবনের ভোগের বৃন্তে তাহার জোড় দৃঢ়বদ্ধ। ক্রমে ভিতরে ভিতরে রসে যখন সে পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন ভিতরের সেই পূর্ণতা তাহার বাহিরে আত্মদান-রূপে অত্যন্ত অনায়াসে যখন প্রকাশ পাইল, তাহার ভোগের বৃন্ত শিথিল হইল—তখন তাহার সেই বিশ্বের কাছে নিবেদিত অঞ্জলিকে আমরা যে চিনি নাই, একথা স্বীকার করি না। কিন্তু সেই অঞ্জলিকেই সম্পূর্ণ বলিতে যাইব কেন? সে তো রসের ভারে একেবারে অবনত হয় নাই—তাহার রসের কথার চেয়ে সাধনার কথা বেদনার কথা যে অধিক। এই নবপ্রকাশিত "গীতিমাল্যে"র গানগুলি রসে টুসটুসে ফলের মত—স্পর্শ মাত্রেই যেন ফাটিয়া পড়িবে। ইহার মধ্যে সাধনার বিশেষ কোন বার্তা নাই—সেইজন্য বেদনার মেঘ-মলিনিমা নাই।"—(অজিতকুমার চক্রবর্তী, "কাব্য-পরিক্রমা," ২য় সং ১৪২—৪৩ পৃঃ)

আগেই বলা হইয়াছে, "গীতাঞ্জলি"তে শুধু সাধনার কথা, বেদনার কথা, শুধু ভাগবত বিরহের ক্রন্দনই বড় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম চৌদ্দটি গান ১৩১৩ হইতে ১৩১৫-র মধ্যে রচিত, বাকি সবগুলিই আষাঢ় ১৩১৬ হইতে শ্রাবণ ১৩১৭-র মধ্যে লেখা। গীতাঞ্জলি"র মূল সুর শেষোক্ত পর্যায়ের গানগুলির মধ্যেই ধরা পড়ে। ভাগবত বিরহের আভাস আমরা "খেয়া"-গ্রন্থেই লক্ষ্য করিয়াছি, সেখানেই আমরা দেখিয়াছি কবির

অপরিসীম ব্যাকুলতা, অধীর প্রতীক্ষা। "গীতাঞ্জলি"তে সেই ব্যাকুলতা, সেই প্রতীক্ষা কান্নায় যেন ফাটিয়া পড়িল,

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো। ("গীতাঞ্জলি", ১৭ নং)

ভাগবত অনুভূতি-লাভ এখনও ঘটে নাই, সেই তাঁহাকে পাওয়া এখনও হয় নাই, অথচ পাইবার জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুখ; অধীর বিরহী চিত্ত দুয়ার খুলিয়া সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে তাঁহার মৃদু পদধ্বনি শুনা যাইতেছে, মাঝে মাঝে তাঁহার মধুর সৌরভ গায়ে আসিয়া লাগিতেছে, অথচ তিনি আসিতেছেন না, মনোমন্দিরে আসিয়া বসিতেছেন না—ইহার বেদনা কবিকে পীড়িত করিতেছে। নানা পরিবেশের মধ্যে, নানা অবস্থায় এই বেদনার ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছে,—মেঘাচ্ছন্ন দিবসে

তুমি যদি না দেখা দাও
করো আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখো
একা দ্বারের পাশে। ("গীতাঞ্জলি", ১৬নং)

অথবা, শ্রাবণঘনঘটায়

হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে। ("গীতাঞ্জলি", ১৮নং)

অথবা,

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরান-সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরান-সখা বন্ধু হে আমার। ("গীতাঞ্জলি" ২০নং)

অথবা,

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না
এবার হৃদয়মাঝে লুকিয়ে বোসো, কেউ জানবে না,
কেউ বলবে না। ("গীতাঞ্জলি," ২৩নং)

অথবা,

শুধু আসন পাতা হলো আমার
সারাটি দিন ধ'রে,
ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা, তারে
ডাকবো কেমন ক'রে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে
হয়নি আমার পাওয়া। ("গীতাঞ্জলি," ৩৯নং)

অথবা,

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই
বেদনার উপহারে। ("গীতাঞ্জলি," ৭২নং)

অথবা,

তোমার সাথে নিত্য বিরোধ
আর সহে না,—
দিনে দিনে উঠছে জমে
কতই দেনা। ("গীতাঞ্জলি," ১৫০নং)

কোনও কোনও গানে নিজের অসম্পূর্ণতার বেদনা, সাধনার ত্রুটির আভাসও আছে। নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়া দিবার প্রার্থনাও আছে। তাঁহাকে পাওয়া হয় নাই, কিন্তু তাঁহারই পথ চাহিয়া আছেন, এই 'পথ চাওয়াতেই আনন্দ', এই পথ পানে চাহিয়া থাকিতেও ভাল লাগিতেছে,—

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে ;
দেখা নাই পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে। ("গীতাঞ্জলি," ২৮নং)

ধনে জনে কবি জড়াইয়া আছেন, তবু মন সব ছাড়িয়া সব কিছুর মধ্যে একান্তভাবে তাঁহাকেই চাহিতেছে। কবি প্রতি মুহূর্তেই ভাবিতেছেন, তাঁহার আসার সময় হইয়াছে, এখন মলিনবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে—

এখন তো কাজ সাঙ্গ হলো
দিনের অবসানে
হলোরে তাঁর আসার সময়
আশা এলো প্রাণে।
স্নান করে আয় এখন তবে
প্রেমের বসন পরতে হবে,
সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে
গাঁথতে হবে হার।
ওরে আয় সময় নেই যে আর। ("গীতাঞ্জলি," ৪১নং)

অথবা,

তোরা শুনিস্‌নি কি শুনিস্‌নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত
আপন মনে খ্যাপার মতো
সকল সুরে বেজেছে তার
আগমনী—
সে যে আসে, আসে, আসে। ("গীতাঞ্জলি", ৬২নং)

কিন্তু, সাধনার আনন্দের আভাসও যে কোথাও নাই, একথা সত্য নয়। মাঝে মাঝে দেবতার স্পর্শ তিনি পাইতেছেন, চিত্ত তখন বিপুল আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে, বিরহও তখন মধুর বলিয়া মনে হইতেছে—

গায়ে আমার পুলক লাগে
চোখে ঘনায় ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা রাখির ডোর।
* * *
আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়ন-জলে
বিরহ আজ মধুর হয়ে
করেছে প্রাণ ভোর। ("গীতাঞ্জলি," ৪২নং)

অথবা,

জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হলো ধন্য হলো মানব-জীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন। ("গীতাঞ্জলি," ৪৪নং)

অথবা,

আলোয় আলোকময় ক'রে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে দিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবি ভালো। ("গীতাঞ্জলি," ৪৫নং)

তবে এমন সার্থক আনন্দক্ষণের প্রকাশ "গীতাঞ্জলি"তে খুব বেশি নাই ; এই যে মাঝে মাঝে নিজের ঘরের দুয়ারে দেবতার পদধ্বনি তিনি শুনিয়াছেন, ঘুমের ভিতর, প্রভাত স্বপ্নের মধ্যে দেবতার স্পর্শ তাঁহার গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে অথচ মুখোমুখি দেখা হইল না, তাহার আনন্দ এবং বেদনা দুইই দুঃসহ।

সে যে পাশে এসে বসেছিলো
তবু জাগিনি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিলো
হতভাগিনী।
* * *
কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়ে কাছে না পায়,
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগেনি। ("গীতাঞ্জলি," ৬১নং)

অথবা,

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ-বরন পারিজাত লয়ে হাতে।
নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে,
বারেক থামিয়া মোর বাতায়নপানে।
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।
* * *
কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি,
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে—
দেখা বুঝি আর হলোনা তোমার সাথে
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে। ("গীতাঞ্জলি", ৬৭নং)

"নৈবেদ্য"-গ্রন্থে আমরা দেখিয়াছি, একটি মুক্ত সবল প্রাণের প্রার্থনা ; "গীতাঞ্জলি"তে সে প্রাণ ভক্তিতে আনত হইয়াছে, একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে একথা সত্য ; কিন্তু এই ভক্তি দুর্বল প্রাণের করুণ আত্মনিবেদন মাত্র নয়, হীনবল দাসচিত্তের অশ্রুজলের নৈবেদ্য নয়। কবি বলিতেছেন,

আমার এ প্রেম নয় ত ভীরু
নয় ত হীনবল,
শুধু কি এ ব্যাকুল হয়ে
ফেলবে অশ্রুজল।
* * *
নাচো যখন ভীষণ সাজে
তীব্র তালের আঘাত বাজে,
পালায় ত্রাসে পালায় লাজে
সন্দেহ-বিহ্বল।

সেই প্রচণ্ড মনোহরে
প্রেম যেন মোর বরণ করে,
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার
দিক সে রসাতল ।। ("গীতাঞ্জলি," ৮৯নং)

কবির প্রার্থনা

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান ।
সেই সুরেতে জাগবো আমি
দাও মোরে সেই কান ।
* * *
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে ।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান ।। ("গীতাঞ্জলি," ৭৪নং)

অথবা,

আমোঘ যে ডাক সেই ডাক দাও
আর দেরি কেন মিছে ।
যা আছে বাঁধন বক্ষ জড়ায়ে
ছিঁড়ে প'ড়ে যাক পিছে ।
গরজি গরজি শঙ্খ তোমার
বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার,
গর্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া
জাগুক তীব্র চেতনা ।। ("গীতাঞ্জলি," ৭৭নং)

অথবা,

লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ করো না ।
জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ,
গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ
পূর্ণতা বিস্তারো ।। ("গীতাঞ্জলি," ৯০নং)

এই সবল সতেজ নিবেদন হইতেই হয়ত এই অনুভূতি কবিচিত্তে জাগিয়াছে যে, আমাদের এই প্রতিদিনের ধূলামাটির সংসারে সকলের মাঝখানেই তাঁহার আসন। এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছু নূতনও নয়। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি ত তাঁহার নয়,

সংসারের ধূলামাটি ছাড়িয়া ত তিনি সাধনার ধন লাভ করিতে চাহেন না! "গীতাঞ্জলি"তে তাঁহার নিবেদন,

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো॥ ("গীতাঞ্জলি," ৯৪নং)

অথবা,

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে
সব-হারাদের মাঝে। ("গীতাঞ্জলি," ১০৭নং)

অথবা,

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥ ("গীতাঞ্জলি," ১০৮নং)

অথবা,

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস্ ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষী চাষ,—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে।
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার 'পরে। ("গীতাঞ্জলি," ১১৯নং)

কিন্তু বিরহের বেদনাবোধ, অথবা ভাগবত অস্তিত্বের অনুভূতিই ত সাধনার সবটুকু কথা নয়, শেষ কথা ত নয়ই। বোধ ও বুদ্ধির মধ্যে ভাগবত প্রতিষ্ঠা হয়ত হইয়াছে, কিন্তু

জীবন জুড়িয়া যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত না হইল, উচ্ছ্বসিত আনন্দে দেহচিত্তমন যতক্ষণ পর্যন্ত নৃত্যময় হইয়া না উঠিল, সমগ্রজীবনের হাসিখেলার সঙ্গে তিনি নিত্যসঙ্গী হইয়া না রহিলেন, প্রিয় হইতে প্রিয়তম হইয়া বক্ষলগ্ন হইয়া না রহিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি কোথায়, কোথায় তৃপ্তি, কোথায় আরাম, কোথায় আনন্দ? এই শান্তি, এই তৃপ্তি, এই আনন্দ, এই আরাম "গীতাঞ্জলি"তে নাই। "গীতাঞ্জলি" অসমাপ্ত সুরের, অসমাপ্ত সাধনার কাব্য। এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন, কবিজীবনের এক একটি পর্যায় স্তরে স্তরে বিচিত্র ভাবরসের ভিতর দিয়া প্রত্যেক স্তরের বিচিত্র সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত করিয়া অবশেষে তাহার সহজ স্বাভাবিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, এবং সমাপ্তির সীমায় পৌঁছিয়া পরমুহূর্তেই আবার সেই সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন প্রবাহের সূচনা করিয়াছে। নিত্য নূতন করিয়া নূতন সৃষ্টির মধ্যে বিহারই রবীন্দ্র-কবিজীবনের ধর্ম, কিন্তু কোনও নূতন সৃষ্টিই ততক্ষণ তাঁহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয় নাই যতক্ষণ না পূর্বতন সৃষ্টির সমগ্র রস তিনি নিঃশেষে পান করিয়াছেন, যতক্ষণ না তিনি তাহার সমস্ত সম্ভাবনা পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "কল্পনা-নৈবেদ্য-খেয়া" হইতে যে নবজীবনপ্রবাহের সূচনা হইয়াছিল, "গীতাঞ্জলি"র সুরের মধ্যে তাহার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষে আত্মপ্রকাশ করে নাই, সে জীবন এখনও পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই, একটা বিশেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে মাত্র।

এই আত্মপ্রকাশ, এই পূর্ণ পরিণতি লাভ ঘটিল "গীতিমাল্য" ও "গীতালি"তে। এই দুইটি গ্রন্থের অধিকাংশ গানগুলির মুক্ত গতি, কোমল সৌন্দর্য, উদ্বেলিত আনন্দ, স্বচ্ছ সহজ আবেগ এবং সুনিবিড় ঐক্যানুভূতি যে কোনও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। "গীতাঞ্জলি"তে যে ভক্ত কবি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় দেবতাকে চাহিয়াও ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, "গীতিমাল্য"-গ্রন্থে সেই ভক্ত কবি দেবতাকে বন্ধু মানিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিলেন। কবে যে একদিন

ফুটলো কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে। (১৭নং)

কবে যে একদিন কোন্ শুভমুহূর্তে দেবতা আসিয়া তাঁহার অন্তরে আসন বিছাইয়া গিয়াছেন, তাহা কি কবি নিজেই জানেন? কিন্তু সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগিয়া সব যে সোনা হইয়া গেল, দুঃখ, বেদনা, দহনজ্বালা সব যে এক মুহূর্তে জুড়াইয়া গেল, আনন্দে খুশিতে সমস্ত দেহচিত্তমন যে নাচিয়া উঠিল,—

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা। (১৫নং)

অথবা,

সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধাসরসে। (২২নং)

অথবা

মনে হলো আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে
মনে হলো সকল দেহ
পূর্ণ হলো গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুটলো পূজার ফুলের মত,
জীবননদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে। (৩৫নং)

অথবা

প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে
দুঃখকে আজ কঠিন ব'লে
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে। (৩৬ন)

অথবা,

তোমারি নাম বলবো নানা ছলে
বলবো একা ব'সে, আপন
মনের ছায়াতলে
* * *
বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাক্‌বো তোমার নাম
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পুরবে মনস্কাম। (৩২নং)

অথবা,

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা-গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে—
সেই সুরে মোরে বাজাও। (৩৯নং)

অথবা,

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
ফুল্লশ্যামল ধরা।।
* * *
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরান আমার বধুর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা।। (৫২নং)

কিন্তু আর দৃষ্টান্ত উল্লেখের কি-ই বা প্রয়োজন আছে? "গীতিমাল্য"-গ্রন্থের প্রায় সকল গান ও কবিতায়ই এই তৃপ্তির, এই আনন্দের সুর সহজেই ধরা পড়ে। সহসা এই তৃপ্তি, এই আনন্দ আসিল কোথা হইতে?

১৩১৬ বঙ্গাব্দের শেষাশেষি কবি য়ুরোপ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইল, কবি চলিয়া গেলেন শিলাইদহ। সেখানে অসুস্থতার মধ্যে কতকগুলি গান ও কবিতা রচনা করিলেন (৪নং-২১নং); বাহিরের কাজকর্ম চঞ্চলতা সমস্তই তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—

কোলাহল ত বারণ হলো
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে। (৮নং)

গানে গানে প্রাণের আলাপ যখন শুরু হইল তখন ধীরে ধীরে যে ছিল অজানা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাকে অত্যন্ত নিকটে পাইলেন,—

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে।

* * *

জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে। (৯নং)

মনে হইল,

অপূর্ব তার চোখের চাওয়া,
অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া,
অপূর্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে॥ (১১নং)

ধীরে ধীরে কবি তাঁহাকে পাইলেন; উপলব্ধির শান্তি ও তৃপ্তি লাভ ত ঘটিল, কিন্তু এই তৃপ্তি, এই শান্তির মধ্যেও কবি অতৃপ্তির চিরগতি প্রার্থনা করিলেন, বেদনার আঘাত প্রার্থনা করিলেন,

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো—আরো দাও প্রাণ।

* * *

আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ। (২৮নং)

"গীতিমাল্য" গ্রন্থের শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যে এই বেদনাময় চৈতন্যের প্রার্থনা থাকিয়া থাকিয়া উঁকি মারিতেছে।

২৮নং হইতে ৪১নং পর্যন্ত গানগুলি ইংলণ্ড যাইবার পথে, ইংলণ্ডে, এবং ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পথে রচিত। বাকি গানগুলি প্রায়ই শান্তিনিকেতন অথবা

রামগড়ে রচিত সর্বশেষটি কলিকাতায়। "গীতিমাল্য"-গ্রন্থের গানগুলি সম্বন্ধে অজিতবাবু বলিতেছেন,

"কবির সৌন্দর্যসাধনা যেমন কড়ি ও কোমল ও চিত্রাঙ্গদার ভোগপ্রদীপ্ত বর্ণ-উজ্জলতায় প্রথম সূচনা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সোনার তরী-চিত্রার 'মানস-সুন্দরী', 'উর্বশী' প্রভৃতি কবিতার বর্ণ-প্রাচুর্যে ও বিলাসে বিচিত্র হইয়া অবশেষে ক্ষণিকার বর্ণ-বিরল ভোগবিরহিত সুগভীর স্বচ্ছতায় পরিণত লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া ক্রমশ কবির অধ্যাত্ম-সাধনা এই গীতিমাল্যে বিচিত্রিতা হইতে ঐক্যে, বেদনা হইতে মাধুর্যে, বোধ-প্রাখর্য হইতে সরল উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে।" ("কাব্য পরিক্রমা", ১৬৫ পৃঃ)

সত্যই "গীতিমাল্যে"র গানগুলির মধ্যে কোনও তত্ত্বকথা নাই, কোনও সাধনার কথা নাই; ইহারা স্বচ্ছ, ভারমুক্ত, সহজ, আনন্দময়।

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখ থুয়ে। (৪৪নং)

অথবা,

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে। (৪৯নং)

অথবা,

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে
তোমারই সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে।
* * *
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে ভুখের 'পরে। (৬৮নং)

অথবা,

তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচলখানি ধুলায় পেতে
আঙিনাতে মেলো গো। (৯৮নং)

এই সব গানে তত্ত্বকথা, সাধনার কথা কোথায়? উপলব্ধি এত গভীর, এত পরিপূর্ণ, এত সরল যে ইহার মধ্যে বসিয়াই স্থির সার্থক তৃপ্তিতে ও শান্তিতে বলিতে পারা যায়—

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছো
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছো
তোমায় করি গো নমস্কার।
* * *
এই কর্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই গন্ধ-গহন সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার। (১১১নং)

"গীতালি"র সব কয়টি গানই (১০৮) ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে ৩রা কার্তিকের মধ্যে রচিত। এই গ্রন্থের সব গানেই একটা শান্তি ও সার্থকতার-সুর ধ্বনিত; দেবতার

সঙ্গে বিচিত্র লীলা, বিচিত্র গভীর রহস্য নিসর্গ-সৌন্দর্যদ্বারা মণ্ডিত। সাধনার বেদনা দুঃখের কথা কবি আজ একেবারে ভুলিতে চাহিতেছেন ;

যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা ;
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা। (১৭নং)

প্রেম এত নিবিড় যে কবি আর যেন সহ্য করিতে পারেন না,—

আমি যে আর সইতে পারিনে
সুর বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে। (১১নং)

অথবা,

বক্ষ আমার এমন করে
বিদীর্ণ যে করো
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতরো ? (৩২নং)

রহস্য-লীলার আভাসও আছে অনেক গানে—

পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিন্‌ল না সে মরণকে
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
ধরে তোমার চরণকে। (৭৩নং)

অথবা,

কোন্ সাহসে একেবারে
শিকল খুলে দিলি দ্বারে,
জোড় হাতে তুই ডাকিস্ কারে
প্রলয় যে তোর ঘরে ঢোকে। (১০নং)

কবির 'হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে' তাঁহার প্রিয়তম নিদ্রিত, তাঁহাকে তিনি প্রেমের আকর্ষণে আহ্বান করিতেছেন জাগিবার জন্য। কিন্তু সে আহ্বানে কোন শঙ্কা নাই, কোনও বেদনা নাই সেই সুরে ; পরিপূর্ণ প্রেম ও বিশ্বাসে নিবিড় সেই আহ্বান।

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন 'পরে—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

* * *

মিলাবো নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাবো এ-হাত তব দক্ষিণ হাতে
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে জাগো, জাগো জাগো। (৫০নং)

প্রেম যেখানে এত নিবিড় সেইখানেই পরম বিশ্বাসে, সবল গর্বে বলা চলে,

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
*　　*　　*
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্র সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক্ লয়।
তোমারি হউক জয়। (১০১নং)

অথবা,

আজ ত আমি ভয় করিনে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধু পারে
তবু তুমি সেইত আমার তুমি,
আবার তোমায় চিনব নূতন করে। (৯৭নং)

ভাগবত উপলব্ধি ত এইবার পরিপূর্ণতা লাভ করিল, সাধনা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল; এইবার সকৃতজ্ঞ অঞ্জলি নিবেদনের পালা,—

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপ মুখে,
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে।
হে মোর অতিথি যত তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষণে;
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চ'লে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম। (১০৮নং)

জীবন ত এইখানে পৌছিয়া একটা পরিপূর্ণতা লাভ করিল; কৈশোরের চঞ্চলতা, যৌবন উন্মেষের অনিশ্চিত বিরহ উন্মাদনা, যৌবন-মধ্যাহ্নের তীব্র প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি এবং ভোগ ও বিলাস-প্রাচুর্য, যৌবন-সায়াহ্নের ভোগ-বিরতি, তারপর পরিণত জীবনের অধ্যাত্ম-আকূতি, অধ্যাত্ম-সাধনা এবং সর্বশেষে ভাগবত উপলব্ধি—এই ত সাধারণ মানুষের জীবনপর্যায়। কবি ত ইহাদের প্রত্যেকটিই পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশেষ করিয়া পাইলেন, জীবনের সমস্ত সুধা আহরণ করিলেন। পথের শেষ তো পাইলেন, আর কি বাকি রহিল?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি পথের শেষ চাহিয়াছিলেন? তিনি ত চিরচঞ্চল, চির-পথিক; এই পথের শেষ কি তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারিল? "গীতিমাল্যে"র শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যেও যে তিনি অতৃপ্তির চিরগতি প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি যে চাহিয়াছেন, 'আরও আরও আরও আলো, আরও আরও আরও প্রাণ' তাঁহার যাত্রা যে অশেষের সন্ধানে, অসীমের পানে; এই সীমা কি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে? কবি-কণ্ঠের গান "গীতিমাল্যে" বলিতেছে, 'পথ আমারে পথ দেখাবে, এই জেনেছি সার', কবি যে বলিতেছেন, 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না'। "গীতালি"তে চিরপথিকের কাছে সম্মুখ পথের আহ্বান যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল, পথ ত এইখানেই ফুরাইয়া যায় নাই, সীমা যেন অসীমের দিকে ডাকিতেছে,—

আমি পথিক, পথ আমারি সাথী।

*   *   *

যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি। (৮৩নং)

অথবা,

পথে পথেই বাসা বাঁধি,
মনে ভাবি পথ ফুরালো।

*   *   *

কখন দেখি আঁধার ছুটে
স্বপ্ন আবার যায় যে টুটে,
পূর্বদিকের তোরণ খুলে
নাম ডেকে যায় প্রভাত আলো। (৯৪নং)

অথবা,

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া! (৯৫নং)

অথবা,

জীবন-রথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহ নমস্কার। (৯৮নং)

আরও তিনি জানিয়াছেন, অথবা পুরাতন জানাকেই নূতন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন,—

পথের ধুলার বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।

*   *   *

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি। (৯৯নং)

এই উপলব্ধি যখন জাগিল তখন পুরাতন ধূলিময় স্বর্গভূমি, সুখদুঃখময় ধরণীর প্রতি

বহু পুরাতন প্রেম নূতন করিয়া জাগিল, পুরাতন পথ নূতন হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, সীমারেখা অস্পষ্ট হইয়া অসীমের দিকে ছড়াইয়া গেল। অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার পরিণতির সুউচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া চিরপরিচিত ধরণীর দিকে তাকাইয়া এই গান কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

আবার যদি ইচ্ছা করো
আবার আসি ফিরে
দুঃখ-সুখের ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধুলার পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে
ভাসি নয়ন নীরে।
কাঁটার পথে আঁধার রাতে
আবার যাত্রা করি :
আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিংবা
আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে। (৮৬ নং)

জীবনদেবতা তাহাই ইচ্ছা করিলেন।

আট

বলাকা (১৩২১—২৩)
পলাতকা (১৩২৫)
শিশু ভোলানাথ (১৩২৮)

"গীতিমাল্য" গাঁথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন কাব্যসৃষ্টির সূত্রপাত হইল, সেটি "বলাকা"। ১৩২১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের মধ্যে "গীতিমাল্য" গাঁথা সমাপ্ত হইল; "গীতালি"র সবগুলি গান ও কবিতা আষাঢ় হইতে কার্তিক মাসের মধ্যে রচিত। এই কয়মাস কেবল অফুরন্ত গানের ফোয়ারা, সঙ্গে সঙ্গে "বলাকা"র আরম্ভ। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র কবি রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া যে হঠাৎ "বলাকা"য় নবজন্মলাভ করিলেন, তাহা বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

মানুষ সারাজীবন সুখ দুঃখ, মিলন বিরহ, আশা ও নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া যখন কিছুর মধ্যেই চরমশান্তি লাভ করিতে পারে না, তখন সে ভগবানকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করে, এবং তাঁহার সহিত মিলনের আনন্দ ছাড়া আর কোনও কিছুরই অপেক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা রাখে না। ইহাই সাধারণ মানুষের কথা, কবি-জীবনেও প্রায় তাহাই ঘটিয়া থাকে। দেশের কবিদের কথা ছাড়িয়া দিয়াও বিদেশের কবি, যাঁহারা মানব জীবনের বিচিত্র পর্যায়ের সূক্ষ্ম রস ও অনুভূতির মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছেন এমন কবিদের মধ্যে—যথা ব্রাউনিং, ফ্রান্সিস্, টম্পসন্, ওয়াল্ট্ হুইটম্যান—দেখা গিয়াছে তাঁহারা নানা বৈচিত্র্যময় রসানুভূতিকে সর্বশেষ

অধ্যায়ে অধ্যাত্ম রসানুভূতিতে ডুবাইয়া দিবার মানবচিত্তের যে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তাহারই সুস্পষ্ট আভাস প্রদান করিয়াছেন। আমরাও হয়ত ভাবিয়াছিলাম, "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র বিচিত্র রসবোধে আত্মনিমজ্জন করিয়া দিয়া অনন্যশরণ ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনই বুঝি রবীন্দ্র-কবিচিত্তের শেষ আশ্রয় হইল। তাহা হইলে মানব-মনের যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহাই হইত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাহা হইল না। কেন হইল না, তাহার আভাস পূর্বেই দিয়াছি, এবং রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের কাছে সে কারণ অবিদিত নয়। রবীন্দ্রনাথ চিরচঞ্চল, তাঁহার চিরপথিক কবিচিত্ত কোনও নির্দিষ্ট ভাবক্ষেত্র হইতে অধিকদিন রস আহরণ করিয়া নিজেকে সতেজ রাখিতে পারে না, কেবল অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে নূতন নূতন রসাস্বাদ করিবার আকুল প্রেরণা তাঁহাকে পাগল করিয়া তোলে। অধ্যাত্ম রসবোধ ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির একটা স্বচ্ছ, সহজ আনন্দ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই স্থির শান্ত গতিবিহীন আনন্দক্ষেত্র তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। "গীতিমাল্যে"র শেষের দিকে এবং "গীতালি"তে আধ্যাত্মিক রসানুভূতিকেও ছাড়াইয়া মাঝে মাঝে স্বপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে মানবপ্রীতি ও নিসর্গ সৌন্দর্য-প্রেরণা, "গীতালি"র শেষের দিকে ত আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি, পথের আহ্বান আবার তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সময়েই অন্য দিকে "বলাকা"য় নূতন করিয়া ফিরিয়া-পাওয়া নিসর্গ-সৌন্দর্য বোধ এবং পুরাতন ধরণীর প্রতি মমত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকে যৌবনের উৎসবে ধীরে ধীরে পুনরাহ্বান করিবার চেষ্টাও দেখা দিয়াছে। আমার মনে হয় তাহার একটা কারণ ছিল, অবান্তর হইলেও সে কথা এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি।

একথা বোধ হয় কবির অজ্ঞাত ছিল না যে, আমাদের এই জড়তার দেশে কিংবা পশ্চিমের কর্মচঞ্চলতার দেশে সর্বত্রই জীবনের শেষ অবস্থায় যে পরমব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিবার মানবচিত্তের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তাহার মধ্যে খানিকটা দুর্বলতা, অসহায়তা এবং নির্ভরতার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এবং যৌবনের তেজোময় স্বাধীনতা ও অকারণে উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগকে অস্বীকার করিবার একটা চেষ্টা আছে। ভাল হউক, মন্দ হউক, আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ইহার সবখানি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই, এবং বোধ হয় সেইজন্যই "গীতিমাল্য" ও "গীতালি"র অনেক গানেই তিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাবকে বিসর্জন দিয়া নিজের স্বাধীন সত্তাকে ভগবানের সঙ্গে একাসনে স্থান দিবার আভাস দান করিয়াছেন। দেবতার নিকট হইতে যে তিনি আঘাত ও বেদনা প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং দেবতার রুদ্র রূপও যে তাঁহার কাছে সমান প্রিয়, তাহার মধ্যেও বোধ হয় এই মনোভাবের পরিচয় আছে। আমার বিশ্বাস, মনের এই ভাবপন্থাই পরে "বলাকা"য় তাঁহাকে যৌবনের জয়গানে এবং গতিবেগের প্রশস্তিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই সময় য়ুরোপের ক্ষমতা-মদমত্ত যৌবন যে প্রাণের তাণ্ডব-নৃত্যে মাতিয়াছিল তাহার প্রতি কবির আন্তরিক অশ্রদ্ধা থাকিলেও যৌবনের সেই অদ্ভুত চাঞ্চল্য ও সংঘাত যে কবি-চিত্তকে একটুও দোলা দেয় নাই এবং "বলাকা"য় তাহার ছায়াপাত হয় নাই, একথাই বা কে বলিবে? যেমন করিয়াই হউক, "বলাকা"র রবীন্দ্রনাথ "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র রবীন্দ্রনাথ হইতে পৃথক —শুধু ভাবৈশ্বর্যে পৃথক নহেন, কলাকৌশলেও পৃথক। "বলাকা"র ছন্দ যেন যৌবনের ছন্দ, দৃপ্তবেগে কলনৃত্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, যেন ভাদ্রের ভরা জোয়ারের বিরাট নদী। আর যৌবন যে ফিরিয়া আসিল তাহা ত কবি নিজেই স্বীকার করিলেন,—

বহু দিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।" (১৩ নং)

কিন্তু একটা কথা এইখানেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন। মানুষের গভীরতর জীবনের, অধ্যাত্ম-জীবনের অন্তর ও বাহিরের অনেক অমর-তত্ত্ব, সৃষ্টিনিহিত অনেক সুগভীর রহস্য ইতিমধ্যে কবিচিত্তের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া কবি ক্রমশ স্বদেশ ও স্বসমাজের গণ্ডির ভিতর হইতে বিশ্বজীবনের বিচিত্র কর্ম ও চিন্তার রাজ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বৃহত্তর জীবনের নাড়ীস্পন্দনের সঙ্গে তাঁহার যোগ ক্রমশ নিকটতর ও গভীরতর হইতেছিল এবং তাহার ফলে বিচিত্র গভীর চিন্তাও তাঁহার মনকে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। "বলাকা"র প্রায় সকল কবিতাতেই প্রেম, যৌবন, সৌন্দর্য অথবা জীবনগতিবেগের জয়গানের অদ্ভুত প্রকাশ-ভঙ্গির আড়ালে সেই সকল তত্ত্ব ও সত্য, চিন্তা ও কল্পনা অতি নিপুণভাবে আপন অস্তিত্ব জানাইতেছে। মাঝে মাঝে তত্ত্বপ্রচারের চেষ্টাও আছে, একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে কি? লক্ষণীয় বিষয় তাই "বলাকা"র কবিতাগুলি খুব উঁচু দরের একটা intellectual appeal যাহা মানুষের চিন্তার প্রসব-স্থানটিকে নাড়া না দিয়া পারে না।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের মধ্যেই প্রায় "বলাকা"র সব রচনা শেষ হইয়া গেল। "পলাতকা"র সবগুলি কবিতা ১৩২৫ বঙ্গাব্দে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যদি আজও "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র জীবনে বাস করিতেন তাহা হইলে তাঁহার হাত হইতে এ সময় "পলাতকা" সৃষ্টি সম্ভব হইত না। সকল হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ তিনি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ত দেবতার চরণেই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন; অধ্যাত্মানুভূতির মধ্যেই ত সকল অনুভূতি বিলীন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু "পলাতকা"য় দেখিতেছি মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, অতি তুচ্ছ ঘরকন্নার ইতিহাস আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া দোলা দিতে আরম্ভ করিল; সেগুলিকে তিনি সকল সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহের যিনি কাণ্ডারী তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাই দেখিতে পাইতেছি, শৈল'র শিশুহাতের কয়টি আঁচড় কবির বুকেও চিরদিনের জন্য দাগা দিয়া গেল; আর, রেল-ইস্টিশনের কুলিমেয়ে রুকমিনীকে ফাঁকি দিয়া বঞ্চিত করিবার দুঃখ কি শুধু বিনুর স্বামীর বুকেই চিরস্থায়ী হইয়া রহিল, কবির চিত্তও কি সেইজন্য ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল না? মনে হয় "পলাতকা"র কবিতাগুলিতে শুধু নানা ভাবে, নানা ছলে, গল্প-কথায় মানবচিত্তের নানা খুঁটিনাটির ভিতর, সংসারের বিচিত্র মাধুর্যরসপূর্ণ জীবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার চেষ্টাই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা না হইলে এর পরই "শিশু ভোলানাথ"-গ্রন্থে শিশুজীবনের আনন্দলোকের রহস্য-উদ্ঘাটনের মধ্যে কবি নিজে যে আনন্দলাভ করিলেন, এবং সেই জীবনের মধ্যে যে আনন্দ-উৎসের সন্ধান সকলকে জানাইলেন তাহা সম্ভব হইত কি?

কিন্তু আমার বক্তব্য ইহা নয় যে, অধ্যাত্ম-জীবনে অতৃপ্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত অন্যদিকে গতি ফিরাইয়াছিল। আমি শুধু বলিতে চাই, জীবনের বিচিত্র রসানুভূতিকে কবি যে স্বাভাবিক গতিতে অধ্যাত্ম-রসবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সর্বজনানুমোদিত সর্বশেষ আশ্রয় তাঁহার কবিচিত্তকে অধিক দিন অমৃতরস জোগাইতে

পারিল না। তাই, তিনি যে জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন তাহাতে এই দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের বিচিত্র রসানুভূতিই বড় হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাতে গভীরতর জীবনের রসবোধ অতি বিপুলভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিল, এবং সকল রসের মধ্যেই অতি দূরের ইন্দ্রিয়াতীত জগতের একটি ক্ষীণ অথচ গভীর গম্ভীর ধ্বনি অনুরণিত হইতে লাগিল।

১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে "সবুজপত্র" মাসিক সাহিত্য-পত্রিকার সূচনা রবীন্দ্র-জীবনে এক নূতন জোয়ার আনিল। "বঙ্গদর্শন" ও "সাধনা"র যুগে যেমন করিয়া কবিজীবনে বান ডাকিয়াছিল, কাব্যে, গল্পে প্রবন্ধে, বক্তৃতায় জীবনের প্রতিমুহূর্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল, "সবুজপত্র" উপলক্ষ করিয়া আবার তেমনই কাব্যে গল্পে প্রবন্ধে ভরা বর্ষার জোয়ার প্লাবন দেখা দিল। একদিকে "বলাকা"র কবিতা রচনা, যেখানে যখন আছেন তখনই এক একটি করিয়া কবিতা রচনা এবং "সবুজ-পত্রে" তাহার প্রকাশ, অন্যদিকে প্রবন্ধ, গল্প, গান, উপন্যাস রচনা, ধর্মসমাজ সাহিত্যালোচনায় বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ।* হালদার গোষ্ঠী,' 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'ভাইফোঁটা', 'শেষের রাত্রি,' প্রভৃতি সুবিখ্যাত গল্প এই সময়কার রচনা, "চতুরঙ্গ" উপন্যাসও এই সময়ের রচনা এবং কিছুদিন পরেই (বৈশাখ, ১৩২২) "ঘরে বাইরে" উপন্যাসের সূচনা। "ফাল্গুনী" নাটকের সৃষ্টিও এই সময়ে। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা,' 'বাস্তব,' 'লোকহিত,' 'আমার জগৎ,' 'মা মা হিংসী,' কর্মযজ্ঞ,' 'পল্লীর উন্নতি,' 'শিক্ষার বাহন,' 'ছাত্র শাসনতন্ত্র,' প্রভৃতি সুপরিচিত প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাও এই সময়কার রচনা। তাহা ছাড়া অনুবাদ, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা, নানা আলোচনা, বিতর্ক, নাট্যাভিনয়, অধ্যাপনা ইত্যাদি ত চলিতেছেই।

১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে "সবুজপত্র" বাহির হইল, ভূমিকায় সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখিলেন—

'আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখিরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্রমণ্ডিত নব শাখার উপর অবতীর্ণ হন, তাহলে আমরা বাঙালী জাতির সবচেয়ে বড় অভাব তা কতকটা দূর করতে পারব। আমরা যে আমাদের সে-অভাব সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনি তার প্রমাণ এই যে আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য ব'লে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা ব'লে, আলস্যকে ঔদাস্য ব'লে, শ্মশান-বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ ব'লে, উপবাসকে উৎসব ব'লে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় ব'লে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে। বাঙালীর মন যাতে বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে।"

ভাষা প্রমথবাবুর সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাব যেন রবীন্দ্রনাথেরই, এ ধরনের কথা ত আমরা কবির মুখে বার বার শুনিয়াছি। যাহাই হউক "সবুজপত্রে"র যাত্রা শুরু হইল "বলাকা"র প্রথম কবিতা "সবুজের অভিযান" ললাটে আঁকিয়া। সুদীর্ঘ ভাগবত সাধনা ও তপশ্চর্যার শান্ত সমাহিত শক্তি ও আনন্দে দেহচিত্তমন যখন পরিপূর্ণ তখন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইল যৌবনের আহ্বান, যে যৌবন অবুঝ, জীবন্ত, অশান্ত, যে যৌবন প্রচণ্ড, প্রমুক্ত, যে-যৌবন অমর। কবিতা হিসাবে এই কবিতাটি অথবা প্রায় দুই বৎসর পরে লেখা 'যৌবনরে, তুই কি র'বি সুখের খাঁচাতে (৪৫) ইহার কোনটিই খুব উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু যে ভাব-ইঙ্গিত এই

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র জীবনী," ২য় খণ্ড, ৫৬—৬২ পৃঃ।

কবিতা দুইটির মধ্যে মুক্তিলাভ করিয়াছে, রবীন্দ্র-কবিজীবন এবং কাব্য-প্রবাহের দিক হইতে তাহার একটা বিশেষ মূল্য আছে।

সকল রবীন্দ্র-পাঠকই জানেন, কবি চিরকাল প্রেম, যৌবন ও সৌন্দর্যের পূজারী, কিন্তু পূর্বজীবনে যে-যৌবনের পূজা তিনি করিয়াছেন সে-যৌবন প্রধানত এবং প্রথমত বাসনানুরাগী ; সে-যৌবনের পরিচয় আমরা পাই "কড়ি ও কোমল" হইতে আরম্ভ করিয়া "চিত্রা" পর্যন্ত। সে-যৌবন-বসন্ত আসিয়াছিল তাহার সঙ্গে লইয়া

* * * কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণ তলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে,
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে। (২৫ নং)

তাহার মধ্যে ছিল সুতীব্র মোহ, ছিল রক্তিম বিহ্বলতা। তাহার পর এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে। "নৈবেদ্য-খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র সুদীর্ঘ সাধনার স্তর তিনি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এবং এই সাধনায় তিনি লাভ করিয়াছেন শক্তি, লাভ করিয়াছেন রুদ্রের প্রসাদ। তাই, সেই যৌবন-বসন্ত,

সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে ;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে। (২৫ নং)

"গীতিমাল্য" অথবা "গীতালি"তে যে তৃপ্তি ও শান্তি তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও কবি হয়ত দেখিয়াছিলেন, অনুভব করিয়াছিলেন, একটা স্তব্ধ শান্তি বিলাস, তৃপ্তির মোহ, যাহা হয়ত তাঁহার মনে হইয়াছিল জড়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়তারই আর একটা দিক। সেই জন্যই সেই শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যে "গীতিমাল্য-গীতালি"তে তিনি বার বার প্রার্থনা করিয়াছিলেন দুঃখের আঘাত, রুদ্রের লাঞ্ছনা ; তিনি চাহিয়াছিলেন অতৃপ্তির চিরগতি, নব নব বেদনাময় চৈতন্য। এখন যেন তাহাই চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিল।

চিত্তের এই ভাব-পরিবর্তনের একটা কারণ বাহিরের দিকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই সামাজিক প্রগতি সম্বন্ধে স্বাধীন উদারনীতি পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। ধর্মসম্বন্ধেও তিনি অনেকটা স্বাধীন-মতাবলম্বী ; কোনও প্রচলিত ধর্মমতই তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার চিন্তানুযায়ী যখন তিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, অকুণ্ঠ ও নির্ভীক চিত্তে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন ; অনেক সময় তাঁহার মতামত প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করিয়াছে। স্বদেশ ও স্বসমাজ সম্বন্ধেও একথা সত্য। তাঁহার স্বকীয় ধর্মসাধনায়ও তিনি কোন প্রচলিত ধর্মমত অথবা সাধনপদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই। বরং "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"তে বার বার বলিয়াছেন, 'ওদের কথা আমি বুঝি না এবং সে সব কথা শুনলেই আমার চোখের সম্মুখে সব অন্ধকার হ'য়ে যায় ; কিন্তু আমি তোমার কথা খুব সহজেই বুঝি'। এক কথায় তিনি সর্বদাই নিজের অন্তরের আলোকে পথ দেখিয়া চলিয়াছেন। এই ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আমাদের চিরাচরিত সামাজিক বোধ ও বুদ্ধি সহজে সহ্য করিতে রাজি নয়, এবং রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় কথা যখনই যাহা

বলিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হইয়াছে। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে মানুষের মনে একটা প্রবল দেশাত্মবোধ ও অভিমান জাগিয়াছিল। এই বোধ ও অভিমান ক্রমশ রূপ লইল একটা উৎকট রক্ষণশীল মনোভাবের মধ্যে, এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের অভাব হইল না। দেশ, সমাজ ও ধর্মের যাহা কিছু ভাল বা মন্দ সমস্তই নির্বিচারে সমর্থন করিবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি আমাদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে দেখা গেল, এবং আমাদের গণ্য ও মান্য লোকদের অনেকেই এই মনোভাবের আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা নির্বিচারে প্রমাণ ও প্রচার করিলেন আমাদের জাতিগত জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলিয়া, আলস্যকে ঔদাস্য বলিয়া, দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলিয়া, আত্মপ্রবঞ্চনাকে আত্মপ্রসাদ বলিয়া। রবীন্দ্রনাথ হয়ত অনুমান করিলেন, তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনায় নবলব্ধ শান্তি ও তৃপ্তির আরাম ও আনন্দের মধ্যে বোধ হয় এই ধরনের রক্ষণশীল মনোভাবের সমর্থন আছে। যাহাই হউক, যে কারণেই হউক, রবীন্দ্রচিত্ত এই ধরনের মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রচণ্ড, প্রগল্ভ, অশান্ত, অমর যৌবনের জয়গান করিল এবং গতিবেগের প্রশস্তি উচ্চারণ করিল। বৃদ্ধের অথবা অলসের জড়ত্ব নয়, যৌবনের অশান্তিই সত্য ; শান্তি ও তৃপ্তির স্থিতি নয়, গতিবেগের আনন্দই সত্য। তাহারই কাব্যময় প্রকাশ "বলাকা"। প্রবন্ধে ও বক্তৃতায়, গল্পে ও উপন্যাসেও এই নূতন মর্মবাণীই ব্যক্ত হইল। 'সবুজের অভিযান' কবিতায় যাহা বলিলেন, তাহাই বিস্তৃত করিয়া বলিলেন 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে,—

> "সমাজে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ বাঁধিবোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে। * * * আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া গিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলি বাধা। * * * দেশের নবযৌবনকে সমাজপতিরা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঞ্জাল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হউক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্য সাধন হইতে থাক।" (সবুজপত্র, বৈশাখ, ১৩২১, ২০—২১ পৃঃ)।

যে-যৌবন রুদ্রের প্রসাদ সেই-যৌবন দেশবাসীর চিত্তকে অধিকার করুক, ইহাই হইল কবির প্রার্থনা। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের নববর্ষের প্রার্থনাও তাহাই,—

> পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
> ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
> তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
> রুদ্রের ভৈরব গান।
>
> * * *
>
> ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
> চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
> সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
> নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
> মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
> দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
> এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,
> এই তোর রুদ্রের প্রসাদ। (৪৫ নং)

'সবুজের অভিযান' কবিতায় অথবা 'যৌবন' কবিতায় যে-সুর আমরা শুনিয়াছি সেই সুর 'আহ্বান' এবং 'শঙ্খ' কবিতায়ও সহজেই ধরা পড়ে।

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে।
রৈল যারা পিছন টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।
* * *
রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।

মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি খেপে,
ওরা আছে দুয়ার বেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে। (৩নং)

অথবা,

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে
কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল ম'রে
এ কী রে দুর্দৈব!
* * *
যৌবনের পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ।
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি'
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ। (৪নং)

কিন্তু রুদ্রের প্রসাদ যৌবনের জয়গানই "বলাকা"র শেষ কথা নয়, মূল কথাও নয়; শুধু এইটুকু হইলে "বলাকা" তাহার যথার্থ কাব্যমূল্য কিছুতেই দাবি করিতে পারিত না। কারণ, যৌবন-সত্য যে-বাণীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার মধ্যে ভাব-কল্পনার সৌন্দর্য অপেক্ষা প্রচারের শক্তিই স্বপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে বেশি, বোধ ও বুদ্ধির ঐশ্বর্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বাক্যের প্রাথর্য।

"বলাকা" গতিরাগের কাব্য। সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এক অফুরন্ত গতিবেগ, এই গতিবেগই অচল পাষাণের মধ্যে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা স্থাণু, জড়, নিশ্চল তাহার মধ্যে প্রাণরসের সঞ্চার করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তোলে, যাহার বলে তরুশ্রেণী পাখা মেলিয়া শূন্যে উড়িয়া যাইতে চায়, পর্বত বৈশাখের মেঘের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে চায়, পটে লিখা ছবি জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসে; এই তৃণ এই ধূলি এরা অস্থির, সচল বলিয়াই এরা সত্য হইয়া উঠে। গতি, eternal flux, ইহাই সত্য; স্থিতি মিথ্যা, মায়া মাত্র! যাহাকে আমরা স্থাণু, জড় অথবা স্থিতিশীল বলিয়া মনে করি, তাহা আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম; জগতের মধ্যেই জড় বিধৃত, জগৎ হইতে জড় পৃথক নয়, এবং আমরা যাহাকে পরিবর্তন বলিয়া ব্যাখ্যা করি, তাহা জড় হইতে জড়ে পরিণতি নয়, নিরন্তর গতিচক্রাবর্তের এক একটি মুহূর্ত মাত্র। তত্ত্ব হিসাবে এই তত্ত্ব কিছু নূতন নয়; হিন্দু ও বৌদ্ধ চিন্তা-জগতে, আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তারাজ্যে এ তত্ত্ব অজ্ঞাত ছিল না। ফরাসী মনীষী আঁরি বের্গস

তাঁহার চারিটি সুবিখ্যাত গ্রন্থে এই তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; আমাদের হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকেরাও করিয়াছেন।

কিন্তু তত্ত্ব কাব্য নয়, এবং তত্ত্ব হিসাবে "বলাকা" বিচার্যও নয়। এই theory of perpetual change বুঝিবার জন্য কেহ "বলাকা" কাব্য পড়িবে না। সে কথা অবান্তর। চিন্তাশীল দার্শনিক যিনি তিনি যুক্তিপরম্পরার ভিতর দিয়া যখন কোনও তত্ত্ব অথবা সত্যকে লাভ করেন, সেই মুহূর্তেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায় ; পরে হয়ত তিনি তাঁহার চিন্তা ও যুক্তিগুলিকে সাজাইয়া অপরের বোধ ও বুদ্ধির গোচর করিতে চেষ্টা করেন। তিনি চিন্তাসূত্রগুলি উপভোগ করেন না, সেগুলি তাঁহার কাছে উপায় মাত্র, এবং সেই উপায় অবলম্বন করিয়া যখন সত্যে আসিয়া উপনীত হন, তখন নিজেকে সার্থকজ্ঞান করেন। কিন্তু যে কবি বহুদিন আগেই ইন্দ্রিয়ানুভূতির আনন্দস্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহার বোধ ও বুদ্ধি ক্ষুরের ধারের মত শাণিত এবং চিন্তার আনন্দস্তরে যাঁহার চিত্ত জাগ্রত তিনি শুধু চিন্তার তন্তুজাল উপভোগ করেন তাহাই নয়, চিন্তা-উদ্ভূত সত্যটিকেও রূপায়িত করিয়া রসবস্তুতে পরিণত করিয়া তাহাকে নিবিড়ভাবে উপভোগ করেন। এই রূপরসাশ্রিত সত্যই কাব্য হইয়া দেখা দেয়।

কোন্ চিন্তাস্তরপর্যায়ের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকে লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা কঠিন, এবং কাব্য-প্রবাহের পরিচয়ের জন্য তাহা অবান্তরও ; হিন্দু-বৌদ্ধ দর্শন অথবা বেঁর্গস-তত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার কতটুকু মিল আছে বা নাই, তাহার আলোচনাও নিরর্থক। তবে, কি করিয়া এবং কেন এই তত্ত্ব রবীন্দ্র-কবিচিত্তকে অধিকার করিল, তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-জীবন ও কাব্য-প্রবাহের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, এই উভয়ই perpetual change'র উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হেরাক্লিটাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও বলিতে পারেন, I cannot bathe in the same river twice. বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবাহের ইতিহাস নিরন্তর এক ভাব ও অনুভূতির পর্যায় হইতে আর এক ভাব ও অনুভূতির পর্যায়ে যাত্রার ইতিহাস। অতৃপ্তির চিরগতিই তাঁহার চিরকাম্য, নব নব চৈতন্যে উদ্বোধিত চিত্তই তিনি প্রার্থনা করেন। চিরযৌবনই তাঁহার পূজা লাভ করিয়াছে জীবনের সকল অবস্থায় ; এবং যৌবনের ধর্মই গতিচঞ্চল প্রাণবেগ। এই কারণেই কি গতিতত্ত্ব কবির সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল ?

যাহাই হউক, এই গতিতত্ত্ব কবিচিত্তকে অধিকার করিল এবং ক্রমশ কবিকে মুগ্ধ করিয়া অন্তরে এক নূতন অনাস্বাদিতপূর্ব রহস্যানুভূতি জাগাইয়া তুলিল। কবিচিত্তে যখন কোনও তত্ত্ব অথবা সত্য অনুভূতির স্তরে আসিয়া পৌঁছায় তখন তাহা কোনও নির্দিষ্ট রূপের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তত্ত্ব কবির মায়া কাঠির স্পর্শে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপবস্তু হইয়া উঠে। "বলাকা"য় এই গতিতত্ত্বই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, কখনও আপাতদৃষ্ট জড় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া (যেমন, 'ছবি' অথবা 'তাজমহল' কবিতায়), কখনও চঞ্চল গতিময় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া (যেমন, 'চঞ্চলা' অথবা 'বলাকা' কবিতায়)।

'ছবি' (৬ নং) কবিতা হইতেই "বলাকা"র মূল সুরটির সূত্রপাত। একটি ছবির রূপবস্তুকে আশ্রয় করিয়া কবি গতিতত্ত্বের চিন্তাতন্তুটিকে উপভোগ করিয়াছেন। এই গতিতত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনও সন্দেহ নাই ; সত্যে তিনি আগেই পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু এই সত্যকে তিনি যে চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া লাভ করিয়াছেন, সেই চিন্তাধারাটিকে রূপাভিব্যক্তি দান করিয়াছেন এই কবিতায়।

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়;
ওই যারা দিনরাত্রি।
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?
* * *
এই ধুলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে;
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে;
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়—
এই ধুলি এও সত্য হায়;—
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি,—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।

কিন্তু এই যে পটে লিখা ছবিকে জড় বলিয়া স্থিতিশীল বলিয়া মনে করা, ইহা ত মিথ্যা, মায়া মাত্র; সৃষ্টির প্রত্যেক অণুপরমাণু পর্যন্ত গতিচ্ছন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, এই গতি আছে বলিয়াই ত জগৎ। কবি নিজেই তাই উত্তর দিতেছেন,

কী প্রলাপ কহে কবি।
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে।
মরি মরি সে-আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গ বেগ;
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিতে তার সোনার লিখন।
* * *
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে।
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল
ভুলিনে কি তারা।

তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাস বায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

* * *

নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

যে শব্দ-চয়ন নৈপুণ্য, ভাব-গাম্ভীর্য, ছন্দ-সজ্জা এবং কল্পনার প্রসার এই কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায়, "বলাকা"র প্রায় সব কবিতাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় কবিতাগুলির সচেতন শক্তিসম্পদ ; এই শক্তি কতকটা আসিয়াছে ইহাদের নূতন ছন্দ গরিমা হইতে, কতকটা চিন্তার গভীরতা ও ভাবের গাম্ভীর্য আশ্রয় করিয়া, এবং কিছুটা সংস্কৃত শব্দ-সম্পদের সুনির্বাচিত প্রয়োগের ফলে।

'ছবি'র পরেই অতি সুপরিচিত 'শা-জাহান' কবিতায়ও কবি নিজের বিপরীতমুখীন চিন্তাধারা উপভোগ করিয়াছেন, অনবদ্য ভাষায় ও ছন্দে, এবং সবল কল্পনায় সেই চিন্তা-ধারাকে রূপদান করিয়াছেন। কিন্তু যে যুক্তি-শৃঙ্খলা, ভাব-পারম্পর্য, চিন্তার যে স্বচ্ছ অবারিত গতি, যে অনুভূতির দীপ্তি "বলাকা"র কবিতাগুলির সম্পদ, তাহা এই 'শা-জাহান' কবিতাটিতে দেখা যায় না—চিন্তাসূত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটা জট পাকাইয়া গিয়াছে, এই কথাই কেবল মনে হয়। কবি বলিতেছেন, দিল্লীশ্বর শাজাহান স্ত্রীবিয়োগের অন্তর-বেদনা চিরন্তন করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তাজমহল রচনা করিয়াছেন, সর্বশোকাপহারী যে কাল মানুষের সকল শোক ভুলাইয়া দেয়, তাজমহলের সৌন্দর্যে ভুলাইয়া সেই কালের হৃদয় তিনি হরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাজমহল সম্রাটের হৃদয়ের ছবি, নব-মেঘদূত। সেই সৌন্দর্য-দূত

যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

কিন্তু দিল্লীশ্বর আজ নাই, তাঁহার অতুল বৈভব, তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যও আজ নাই!

তবুও তোমার দূত অমলিন
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্যভাঙাগড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!"

কিন্তু তাহার পরই কবি বলিতেছেন, এই যে "ভুলি নাই" একথা মিথ্যা। স্মৃতির পিঞ্জর-দুয়ার খুলিয়া অতীতের চিরঅস্ত-অন্ধকার বাহির হইয়া যায়। সমাধি-মন্দির স্মরণের আবরণে মরণকে যত্নে ঢাকিয়া রাখে মাত্র।

জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।

এ-জীবন কাহার জীবন? সম্রাট-মহিষীর জীবনের কথা কবি বলিতেছেন না, বলিতেছেন সম্রাটের জীবনের কথা। সম্রাট-মহিষীর মৃত্যু-স্মৃতিকে সম্রাট স্মরণের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু, তাঁহার নিজের জীবন-উৎসবের শেষে এই ধরাকে মৃৎপাত্রের মতন দুই পায়ে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার জীবনের রথ তাঁহার কীর্তিকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রি আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।

জীবন সম্বন্ধে এই তত্ত্ব সম্রাট-মহিষী সম্বন্ধেও সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও 'ভুলি নাই, ভুলি নাই' একথা হয়ত মিথ্যা হইয়া যায় না। মানুষমাত্রেই স্মরণের আবরণে মরণকে যত্নে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর স্মৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। সম্রাটও তাহাই চাহিয়াছিলেন, তিনি জীবনকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন নাই, পারেনও নাই; তাঁহার নিজের জীবনকেও কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রিয়জনের জীবন ও মৃত্যুর স্মৃতিকে মানুষ বাঁচাইয়া রাখিয়া বলিতে চায় "ভুলি নাই, ভুলি নাই", একথা যেমন সত্য, জীবনকে মানুষ ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, একথাও তেমনই সত্য—এই দুইএ ত সত্যকার কোনও বিরোধ নাই।

তাজমহলকে উপলক্ষ করিয়া আর একটি কবিতা "বলাকা"য় আছে (৯নং)। কবিতাটি সুন্দর, মধুর, এবং "বলাকা"র মূল সুর যে গতিতত্ত্ব সেই সুরে এই কবিতাটি বাঁধা নয়। সম্রাট তাঁহার প্রিয়তমার প্রেমের স্মৃতি এই সমাধি-মন্দিরের মধ্যে অমর করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাজমহলের সৌন্দর্যে সেই প্রেমের স্মৃতি মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাজমহলের বস্তুপুঞ্জের মধ্যে অথবা সম্রাটের মধ্যেই সেই স্মৃতি আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, সম্রাট ও সম্রাট-মহিষীকে অতিক্রম করিয়া তাহা আজ ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে সর্বমানবের আনন্দ-বেদনার মধ্যে। রবীন্দ্র-কবিচিত্তের ইহা অতি পুরাতন অনুভূতি।

সম্রাট-মহিষী,
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হয়েছে মহীয়সী।

সে-স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।
অঙ্গ ধরি সে-অনঙ্গস্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।
রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে
গৌরবমুকুট তব, পরাইল সকলের শিরে
যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে,—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

কিন্তু গতিতত্ত্ব সর্বোচ্চ সুসম্বদ্ধ কাব্যাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে "চঞ্চলা" ও "বলাকা" কবিতা দুইটিতে।

বিরাট নদীর অদৃশ্য নিঃশব্দ জল অবিচ্ছন্ন অবিরল ছুটিয়া চলিয়াছে; কবির কল্পনা-দৃষ্টির সম্মুখে তাহার যতটুকু দেখা যাইতেছে তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই। ভৌগোলিক তথ্যের কোন মূল্য নাই এই দৃষ্টির সম্মুখে। এই অবিরত চলার কায়াহীন বেগে সমস্ত বিরাট শূন্য স্পন্দিত শিহরিত হইয়া উঠে। ভৈরবী বৈরাগিনী সেই রুদ্ররূপ, তাহার প্রেম সর্বনাশা, সে তাই ঘরছাড়া। উন্মত্ত তাহার অভিসার, কিছুই সে সঞ্চয় করে না, শোক ভয় কিছুই তাহার নাই, পথের আনন্দবেগে অবাধে সে পাথেয় ক্ষয় করিয়া চলে; প্রতি মুহূর্তে সে নূতন, পবিত্র, তাহার চরণস্পর্শে মৃত্যুও প্রাণ হইয়া উঠে। তাহার রূপ নটীর, চঞ্চল অপ্সরীর। তাহার নৃত্য-মন্দাকিনী প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবনকে নূতন ও পবিত্র করিয়া তুলিতেছে। নদী সম্বন্ধে চিন্তা ও কল্পনা যখন অনুভূতির এই স্তরে আসিয়া পৌঁছিল তখন কবির ব্যক্তিগত জীবনও এক মুহূর্তে গভীর ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল, অনুভূতি তখন উপায় ও উপলক্ষকে ছাড়াইয়া কবির চিত্তমূল ধরিয়া টান দিল। নদীর অবিচ্ছিন্ন অবিরাম রুদ্রগতি নিজের চিত্তে সংক্রামিত হইল, কবি বলিয়া উঠিলেন,—

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা। (৮নং)

নদীস্রোতকে উপলক্ষ করিয়া কবির মনে পড়িতেছে নিজের জীবন স্রোতের কথা। তিনিও ত প্রতিদিন চলিয়া আসিয়াছেন রূপ হইতে রূপে, প্রাণ হইতে প্রাণে, যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহাই ক্ষয় করিয়া আসিয়াছেন দান হইতে দানে, গান হইতে গানে। তারপর একদিন তিনি অরূপের নিস্তব্ধ গহনে, একের নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিজেকে নিমগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আবার পুরাতন

সেই স্রোত হয়েছে মুখর
তরণী কাঁপিছে থরথর।

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী,
নিক্ তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে,—অকুল আলোতে। (৮নং)

'চঞ্চলা'য় দেখিলাম নদীর চলমান রুদ্ররূপ দেখিয়া কবির চিত্তস্রোতও চঞ্চল এবং মুখর হইয়া উঠিল। 'বলাকা' কবিতায় (৩৬ নং) দেখিতেছি, হংসবলাকার উন্মুক্ত ডানার নিরুদ্দেশ যাত্রাধ্বনি শুনিয়া একমুহূর্তে কবির চিত্তে বিশ্বজীবনের অনন্ত অলক্ষিত ব্যাকুল অবারিত অনির্দেশ যাত্রাব কল্পনা জাগিয়া উঠিল। এই অনুভূতির এমন অপূর্ব অপরূপ কাব্যাভিব্যক্তি অতুলনীয়; এবং সর্বাপেক্ষা এই একটি কবিতাই "বলাকা"-গ্রন্থকে তাহাব মহার্ঘ কাব্যমূল্য দান করিয়াছে। এমন সুন্দর পবিবেশ, সবল কল্পনা, মননের এমন স্বচ্ছ অবারিত গতি, এমন ভাব-ব্যঞ্জনা, এমন নিখুঁত অপরূপ শব্দ-সজ্জা ও গাম্ভীর্য, সর্বোপরি এমন কাব্যময় প্রকাশ "বলাকা"র আর কোনও কবিতাতে দেখা যায় না।

শ্রীনগরে ঝিলম নদীর উপর নৌকায় কবি তখন বাস করিতেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, অন্ধকার কাল জলের উপর তারায় খচিত আকাশের ছায়া পডিয়া মনে হইতেছে যেন তারাফুল ভাসিতেছে। নিস্তব্ধ দুই তীরে পর্বতশ্রেণী, তাহারই পাদমূলে সারি সারি দেওদার বন। মনে হইল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে কথা কহিতে চাহিতেছে, স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছে না, শুধু অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। এমন সময় এমনই পরিবেশের মধ্যে এক ঝাঁক হংসবলাকা স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করিয়া অন্ধকারের বক্ষবিদীর্ণ করিয়া মাথার উপর দিয়া মুহূর্তের মধ্যে দূর হইতে দূরান্তরে শূন্যতা হইতে শূন্যতায় উড়িয়া চলিয়া গেল। দেওদার বন, তিমিরমগ্ন গিরিশ্রেণী শিহরিয়া উঠিল। শিহরিয়া উঠিল কবির অন্তর, শিহরিয়া উঠিল কবির চিন্তা ও কল্পনা; হংসবলাকার শব্দায়মান উন্মুক্তপক্ষ স্পর্শ করিল কবিচিত্তের গভীরতম স্তর, এক মুহূর্তে কবির অনুভূতি সচকিতে জাগিয়া উঠিল,

মনে হলো, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগে।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি,
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,—
"হেথা নয়, হেথা নয় আর কোন্‌খানে।"

কবি তখন শূন্যে জলে স্থলে সর্বত্র উদ্দাম চঞ্চল পাখার শব্দই কেবল শুনিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে, মাটির তৃণ মাটির আকাশে ডানা ঝাপটাইতেছে, পাহাড়, বন সমস্তই উন্মুক্ত ডানায় ছুটিয়া চলিয়াছে, নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে অন্ধকার চমকিয়া উঠিতেছে। আরও

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনেরাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের এ-পানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

এ পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, কবি সৃষ্টির গতি-সত্যকে রূপাশ্রিত করিয়া রসমণ্ডিত করিয়া অত্যন্ত নিবিড় ভাবে গভীর ভাবে উপভোগ করিলেন, অনুভূতির মধ্যে উপলব্ধি করিলেন, এবং তাহাকে অপূর্ব কাব্যাভিব্যক্তি দান করিলেন। কিন্তু একদিন এই গতি-সত্য নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে স্পর্শ করিল; 'ঝংকার-মুখরা, এই ভুবনমেখলা, অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা' কবিকে উতলা করিয়া তুলিল; শুধু তাহাই নয়, তাঁহার কল্পনা-দৃষ্টির সম্মুখে এক গভীরতর সমস্যারও সৃষ্টি করিল। জীবনরথচক্রের গতিই যদি একমাত্র সত্য হয়, তাহা হইলে ত একদিন জীবন মৃত্যুতে আসিয়া তাহার চরম বিরতি লাভ করিবে, জীবনের গতি-আবর্ত সেইখানে আসিয়া সমাপ্ত হইবে। এই প্রত্যক্ষ মৃত্যু-ভাবনা তখন কবি-চিত্তকে অধিকার করিল; সৃষ্টির অনন্ত গতিশীলতার মধ্যে ত নিজের চলিয়া যাওয়ার ইঙ্গিতটুকুও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। কিন্তু, এই চিন্তার প্রথম স্তরে কোনও বেদনাবোধ নাই, বরং পথযাত্রার আনন্দই যেন কবি উপভোগ করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে,—

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যতকিছু বস্তুভার।

* * *

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ যে আপনি ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়
পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া উঠে প্রতিক্ষণ।
ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।

কেন মিছে
আমারে ডাকিস্ পিছে।
আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রবো না ঘরে কোণে থেমে।
আমি চির-যৌবনেরে পরাইব মালা

*　　*　　*

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি। (১৮ নং)

কিন্তু ক্রমশ যেন মৃত্যুর এই চিন্তা চিত্তের কোণে একটু বেদনার সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিল, যে কবি এই জগৎ ও জীবনকে এমন নিবিড় করিয়া ভালবাসিয়াছেন, মৃত্যু-ভাবনা তাঁহাকে ব্যথিত করিবে নাই কি। কবি যেন এই মৃত্যু-বিরহের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজিবার চেষ্টা করিতেছেন। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোথাও কোনো মিল আছে, তাহাই কবি অনুভব করিতে চাহিতেছেন, —

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে,

*　　*　　*

এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।
তবুও মরিতে হবে, এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ-বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে ফুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে,
মোর কানে কানে
রজনী কবে না তার রহস্য বারতা,
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি মোর শেষ কথা। (১৯নং)

এই ভাবনার সঙ্গে বেদনা জড়িত আছেই, কিন্তু সান্ত্বনাও কি নাই? কবি বলিতেছেন আছে।

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল,
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।

সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো। (১৯নং)

য়ুরোপে তখন প্রবল সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মরণের তাণ্ডব নৃত্য তখন দিকে দিকে। দূর হইতে সেই গর্জন কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। এই যে মরণে মরণে আলিঙ্গন ইহার মধ্যেও জীবন-সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। জীবনের হাটে পুরানো সঞ্চয় নিয়া বেচা কেনা আর কত কাল চলিবে? দিনে দিনে সত্যের পুঁজি ফুরাইতেছে, বঞ্চনা বাড়িয়া উঠিতেছে; মরণ সমুদ্র পার হইয়া, মৃত্যুস্নানে শুচি হইয়া জীবনকে এখন নূতন করিয়া পাইতে হইবে—

কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি,
"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"

ঘরে ঘরে বিচ্ছেদের হাহাকার, মাতৃকণ্ঠের ক্রন্দন, প্রেয়সীর আর্তনাদ; কিন্তু সমস্ত তুচ্ছ করিয়া মানুষ নূতন উষার স্বর্ণদ্বার অতিক্রম করিবার আশায় নবজীবনের অভিসারে মরণ-মহোৎসবে ছুটিয়া চলিয়াছে দলে দলে, 'কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার, শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন, চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন।' দেশে দেশে দিকে দিকে মানুষের যত পাপ যত অন্যায়, 'লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ, জাতি-অভিমান, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান' আজ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, মৃত্যুযজ্ঞে আজ তাহা বিসর্জন দিতে হইবে। এই যে অভ্রভেদী বিরাট মৃত্যুর রূপ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—

বলো অকম্পিত বুকে,—
"তোরে নাহি করি ভয়,
এ-সংসারে প্রতিদিন তোরে আমি করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ-বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্!
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।" (৩৭নং)

ইহাই কবির সান্ত্বনা, মৃত্যুযজ্ঞের ইহাই সার্থকতা। সৃষ্টির গতিকে একদিন মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেই হয়, কিন্তু সেইখানেই সব শেষ হইয়া যায় না, সৃষ্টি ও জীবন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া নূতন গতির, নূতন মুক্তির সন্ধান লাভ করে।

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো।
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কী ধরার ধুলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।

বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবেনা দেখা দেবতার অমর মহিমা ? (৩৭নং)

এই আশ্বাস ও বিশ্বাসেই কবি মৃত্যুকে স্বীকার করিলেন ; সৃষ্টির গতি-সত্যই একমাত্র সত্য নয়, এই গতিবেগ হইতে মুক্তিও গতির অন্যতম সত্য। সৃষ্টি শুধু গতি-সর্বস্ব হইতে পারে না ; তাহা হইলে তাহার সার্থকতা কোথায় ? সেই সার্থকতা গতি হইতে মুক্তিতে। সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এই দুইটি সত্য।

এতক্ষণ যে কবিতাগুলির আলোচনা করা গেল, তাহা ছাড়াও "বলাকা"য় অনেকগুলি কবিতা আছে যেখানে কোনও তত্ত্ব অথবা সত্য কবির কল্পনা অথবা মননের বিষয়বস্তু নয়, যেখানে কোনও সুগভীর সৃষ্টি-রহস্য কবিকে আলোড়িত করিতেছে না। এই কবিতাগুলি রবীন্দ্র-সুলভ নিসর্গ সৌন্দর্যে মণ্ডিত, সহজ অনুভূতি ও উপলব্ধিতে সার্থক এবং অন্তর-রহস্যে সুনিবিড়। ১০নং (হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে, নিজ হাতে), ১১নং (হে মোর সুন্দর), ১২নং (তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে), ১৪নং (কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে), ১৫নং (মোর গান এরা সব শৈবালের দল), ১৭নং (হে ভুবন, আমি যতক্ষণ তোমাকে না বেসেছিনু ভাল), ২০নং (আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি) ২২নং (যখন আমার হাত ধরে আদর করে); ২৪নং (স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা, ভাই), ২৫নং (যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল), ২৭নং (আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা), ২৮নং (পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান), ২৯নং (যে দিন তুমি আপনি ছিলে একা), ৩০নং (এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো), ৩২নং (আজ এই দিনের শেষে), ৩৩নং (জানি আমার পায়ের শব্দ), ৩৮নং (সর্ব দেহের ব্যাকুলতা), ৪০নং (এই ক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে), ৪১নং (যে কথা বলিতে চাই), ৪২নং (তোমারে কি বারবার) প্রভৃতি কবিতা সমস্তই এই পর্যায়ের। "গীতিমাল্য" ও "গীতালি"র অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শান্তি ও তৃপ্তির সুরের সঙ্গে এই পর্যায়ের অনেকগুলি কবিতার একটা নিবিড় আত্মীয়তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভাগবতোপলব্ধি এই সব কবিতায় আরও উচ্চ গ্রামে আসিয়া পৌছিয়াছে। দেবতা প্রিয়তম এবং বন্ধুর আসন অধিকার করিয়াছেন বহুদিনই ; দেবতাকে লাভ করিয়া কবি কৃতার্থ এবং পরিপূর্ণ হইয়াছেন, শুধু এ কথাই সত্য নয়, কবিকে লাভ করিয়াও দেবতা কৃতার্থ এবং পরিপূর্ণ হইয়াছেন, এমন কি এই যে ভুবন যতক্ষণ কবি ইহাকে ভাল না বাসিয়াছেন, ততক্ষণ তাহার আলো খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার সকল ধনের সন্ধান পায় নাই, ততক্ষণ নিখিল গগন হাতে দীপ লইয়া শূন্য পানে শুধু পথ চাহিয়াছিল ; আজ তাহাকে কবি ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই সে সার্থক হইয়াছে (১৭নং)। যতক্ষণ দেবতা একা ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার নিজকেই নিজে দেখা সম্পূর্ণ হয় নাই,—

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে ত হয়নি তোমার দেখা
* * *

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।

* * *

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাইত তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

* * *

আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে ত এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল। (২৯নং)

অথবা,

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রি দিনে শুনতে তুমি পাও,
খুশি হয়ে পথের পানে চাও।

* * *

আমি যতই চলি তোমার কাছে
পথটি চিনে চিনে
তোমার সাগর অধিক করে নাচে
দিনের পরে দিনে। (৩৩নং)

কতকগুলি কবিতা কেবল মিলনের পূর্ণ তৃপ্তি ও শান্তিতে আনন্দ-বিভোর, নিসর্গ-সৌন্দর্যে স্বচ্ছ ও নির্মল (১০, ২৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪২ ইত্যাদি) এবং ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিতে রহস্যময়। নিজের অধ্যাত্ম-উপলব্ধিজনিত আত্মবিশ্বাস এবং মুক্তির আনন্দও কতকগুলি কবিতায় সুপরিস্ফুট। যতদিন দেবতা তাঁহার একান্ত সাথে সাথে ছিলেন, তখন মনে মনে ভয় ছিল, ভাবনা ছিল, কখন তাঁহাকে হারাই, কখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিরাগভাজন হই; আজ আর সে ভয় নাই।

যখন আমায় হাতে ধরে
আদর করে
ডাকলে তুমি আপন পাশে,
রাত্রি দিবস ছিলাম ত্রাসে
পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই,
চলতে গিয়ে নিজের পথে
যদি আপন ইচ্ছা মতে
কোনোদিকে এক পা বাড়াই,
পাছে বিরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা একটু মাড়াই!

মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
উঠলো বাজি
অনাদরের কঠিন ঘায়ে,
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।

ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই যে আমার হলো ছুটি,
ভাঙলো আমার মনের খুঁটি,
খস্‌লো বেড়ি হাতে পায়ে ;
এই যে এবার
দেবার নেবার
পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।
* * *
আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি
দেখি বদনখানি। (২২নং)

দেবতার নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াই যেন কবি দেবতাকে বেশি করিয়া পাইলেন, আত্ম-প্রত্যয়ও দৃঢ় হইল ; এতদিন কবি শুধু নিবেদন করিয়াছেন, আজ ভগবানের পালা কবির কাছে চাহিবার।

তুমি তো গড়েছো শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
* * *
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও। (২৮নং)

মুক্তির আনন্দ কবির আজ সর্ব অঙ্গে মনে, আত্ম-প্রত্যয়ের উপর সেই আনন্দ প্রতিষ্ঠিত ; আজ তাই কবি আবার অজানার পথে যাত্রী হইয়াছেন—'আমি যে অজানার যাত্রী, সেই আমার আনন্দ * * * অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই ত মুক্তি',—

ভাবিস বসে যেদিন গেছে সেদিন কী আর ফিরবে।
সেই কূলে কী এই তরী আর ভিড়বে।
ফিরবেনা রে, ফিরবেনা আর, ফিরবেনা,
সেই কূলে আর ভিড়বেনা।
* * *
কোন রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ। (৩০নং)

কবির কল্পনায় ও অনুভূতিতে

বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে।
প্রাণের ঢেউ সে এমনি করেই নাচে
এমনি ভালোবেসে।
* * *

সে-গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।

* * *

জোয়ার ভাঁটার নিত্য চলাচলে
তার এই আনাগোনা
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশোনা।
তারে নিয়ে হলো না ঘর-বাঁধা,
পথে-পথেই নিত্য তারে সাধা,
এম্‌নি করেই আসাযাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল-বোনা। (৪৩নং)

"বলাকা"য় একটি কবিতা আছে, 'স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা, ভাই?' আমরা আগে দেখিয়াছি, কবি আর একটি কবিতায় বলিয়াছেন, ভগবান গড়িয়াছেন মাটির ধরণী, আর কবিকে দিয়াছেন স্বর্গ গড়িবার ভার। এই কবিতাটিতে (২৪নং) দেখিতেছি কবির কল্পনা ও অনুভূতিতে সেই স্বর্গের কোনও ঠিকঠিকানা নাই, তাহার আরম্ভ নাই শেষও নাই, দেশও নাই দিশাও নাই, দিবসও নাই রাত্রিও নাই। কবি সেই শূন্য স্বর্গে, ফাঁকির ফাঁকা ফানুসে বহুদিন বিহার করিয়াছেন, আর নয়। আজ তিনি বলিতেছেন,—

কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির 'পরে ধুলামাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।
আমার জন্ম-মৃত্যুরি তরঙ্গে
নিত্যনবীন রঙের ছটায় খেলায় সে-যে রঙ্গে।

* * *

স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে।

"পলাতকা"য় আমরা সেই মাটি-মায়ের স্বর্গের ঠিকানা পাইলাম।

"পলাতকা"র কবিতাগুলি ১৩২৪-২৫র চৈত্র-বৈশাখের মধ্যে লেখা। "বলাকা"য় কবি অসমছন্দে কবিতায় এক নূতন আঙ্গিক সৃষ্টি করিয়াছিলেন—শক্তি ও বীর্যে, শব্দ-সজ্জা নৈপুণ্যে, ধ্বনি-গাম্ভীর্যে সেই ছন্দ বাংলা কাব্যে এক নূতন ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই ভঙ্গ, অসমছন্দই "পলাতকা"য় আর এক নূতন রূপে দেখা দিল—সর্বপ্রকার অলংকার বর্জিত, একান্ত সহজ ঘরোয়া শব্দ ও বাক্যভঙ্গিতে সরল ও অনাড়ম্বর অথচ কোথাও অভদ্র নয়, বরং স্বচ্ছ, মুক্ত, সহজ ও স্বাধীন। কবিতাগুলি অনেকটা গল্পের ধরনে বলা, স্বচ্ছ সহজ ভাষায়, তাহাদের কবিত্ব ধরা পড়ে চকিতে বিদ্যুৎ ঝলকের মত এখানে ওখানে কোন উপমায়,

হঠাৎ কোনও চিত্রাভাসে অথবা রহস্যগর্ভ কোনও বাক্যে। তাহা ছাড়া কাব্যাভাস বোধ হয় ছড়াইয়া আছে গল্পগুলির টানা-পোড়েনের মধ্যে, গল্পগুলিই যেন কাব্যময়। কবির অতীন্দ্রিয় জীবনের সুগভীর অনুভূতি এই গল্পগুলির মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে; তাহার সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে কবির সুনিবিড় নিসর্গপ্রীতি। প্রথম কবিতাটিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কবির বাগানে খেলা করে একটি পোষা হরিণ ও একটি কুকুরছানা; একদিন,—

ফাগুন মাসে জাগল পাগল দখিন হাওয়া,
শিউরে উঠে আকাশ যেন কোন প্রেমিকের রঙিন-চিঠি-পাওয়া।
শালের বনে ফুলের মাতন হলো শুরু,
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে লাগল কাঁপন দুরুদুরু।
হরিণ যে কার উদাস-করা বাণী
হঠাৎ কখন শুনতে পেলে আমরা তা কি জানি।
তাই যে কালো চোখের কোণে
চাউনি তাহার উতল হলো অকারণে,
তাই সে থেকে থেকে
হঠাৎ আপন ছায়া দেখে
চমকে দাঁড়ায় বেঁকে।

তারপর একদিন বিকাল বেলায় ঝিকিমিকি আলোর খেলায় আমলকী বন যখন অধীর, আমের বোলের গন্ধে তপ্ত হাওয়া যখন ব্যথিত, তখন হরিণ মাঠের পর মাঠ পার হইয়া নিরুদ্দেশের আশায় ছুটিয়া গেল—'সম্মুখে তার জীবনমরণ একাকার, অজানিতের ভয় কিছু নেই আর।'

কেন যে তা, তা সে-ই কী জানে। গেছে সে যার ডাকে
কোনোকালে দেখে নাই যে তাকে।
আকাশ হতে আলোক হতে, নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হতে
দিশাহারা দখিন হাওয়ার স্রোতে
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এলো!

* * *

জন্ম হতে আছে যেন মর্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
আছে যেন চল চপল চোখের কোণে জেগে।
কোনো কালে চেনে নাই সে যারে
সেই তো তাহার চেনাশোনার খেলাধুলা ঘোচায় একেবারে।
আঁধার তারে ডাক দিয়েছে কেঁদে,
আলোক তারে রাখলনা আর বেঁধে।

সেই পুরাতন দু'চার ছত্রে অপূর্ব নিসর্গ-পরিবেশ সৃষ্টির নৈপুণ্য, এবং ইন্দ্রিয়াতীত জীবনের রহস্যময় অনুভূতি, দুইই সহজেই এই কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায়! "পলাতকা"র অন্যান্য কবিতায়ও তাহার আভাস আছে; কিন্তু রহস্যানুভূতির খানিক স্পষ্ট পরিচয় আছে, 'মালা', 'কালো মেয়ে', এবং আরও স্পষ্ট 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতাটিতে।

আরও আছে এই কবিতাগুলিতে—দুঃখের প্রতি, বেদনার প্রতি কবি হৃদয়ের অপূর্ব দরদ, সুকোমল সহানুভূতি। কবি নিজের জীবনে দুঃখ ও বেদনার উপর জয়ী

হইয়াছেন, তাহার উর্ধ্বে উঠিয়াছেন—তবু, আমাদের প্রতিদিনের সমাজ ও সংসারে যত দুঃখ ও বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহার প্রতি তিনি তাকাইতেছেন অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতির দৃষ্টি লইয়া, যত দুঃখী ব্যথিত হৃদয় সকলকে তিনি গ্রহণ করিতেছেন নিজের হৃদয়ের ভিতর। শৈলর দুঃখ, বিনুর বঞ্চনার বেদনা, অপূর্বর মাসীর লাঞ্ছনা ও মহত্ত্ব, মঞ্জুলির মায়ের স্মৃতির অপমান, বঞ্চিত পিতৃহৃদয়ে ভোলার স্নেহ-আবদারের স্পর্শ, মনুর ছেঁড়া চিঠির টুক্‌রায় জলে-ওঠা পুরাতন স্মৃতি, পাগল মহেশের আত্মভোলা বৃহৎ প্রাণ, সব কিছু কবি-হৃদয়ের সুকোমল সহৃদয়তার স্পর্শে রসে ও রহস্যে সুনিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। স্বল্প কথায় অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি, দুই চার লাইনে মানব-মনের অন্তর্লোকের রহস্য উদ্ঘাটন, হঠাৎ এখানে ওখানে ছড়ানো স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, দুঃখ ও বেদনার সুকোমল করস্পর্শ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যানুভূতির অস্পষ্ট আলোক এই কবিতাগুলিকে অপরূপ মাধুর্য ও সুনিবিড় আত্মীয়তা-বোধের ঐশ্বর্য দান করিয়াছে। একটি কবিতাও বর্ণনা-বাহুল্য দ্বারা পীড়িত ও ভারাক্রান্ত নয়—এত স্বল্প কথায়, এমন অনাড়ম্বরে, এমন স্বচ্ছ সহজ ভাবে যে মানব-মনের সঙ্গে মানব-মনের আত্মীয়তা স্থাপন করা যায়, "পলাতকা"র কবিতাগুলি না পড়িলে সহজে তাহা জানা যায় না। "পলাতকা"র অধিকাংশ কবিতাই শুধু মানব-মনের পরিচয়জ্ঞাপক, আমাদের এই ধরার ধূলা-মাটির স্বর্গে মানব-চিত্ত কত আপাত-তুচ্ছ সুখ ও দুঃখে, ব্যথা ও বেদনায়, প্রেম ও গঞ্জনায়, প্রীতি ও অবহেলায় নীরবে দৃষ্টির বাহিরে কি ভাবে আন্দোলিত আলোড়িত হয় তাহাই নিপুণ তুলির স্পর্শে ফুটাইয়া তোলা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু দু'একটি কবিতা আছে যেখানে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অন্যান্য অবিচারের প্রতি কঠোর ইঙ্গিত সহজেই ধরা পড়ে, যেমন 'মুক্তি' ও 'নিষ্কৃতি' কবিতায়। 'দশের ইচ্ছা বোঝাই করা' আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে নারীত্বের অবহেলা সহজে আমাদের মন ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। নারীত্বের পূর্ণ সম্ভাবনার খবর আমাদের বাঁধা-ধরা এই ঘরকন্নার ঠাসবুনান জীবনযাত্রার পথে প্রবেশ করিবার কোনও পথই নাই।

সুখের দুঃখের কথা
একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা!
এই জীবনটা ভালো কিংবা মন্দ, কিংবা যা-হোক একটা-কিছু
সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগু-পিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।

কিন্তু আজ বাইশ বৎসর বিবাহিত-জীবন যাপনের পর দীর্ঘ অসুখের ছল করিয়া মৃত্যু যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তখন এই মেয়েটির হেলা-ফেলার জীবনে প্রথম বসন্ত দেখা দিল, নারীত্বের পূর্ণ সম্ভাবনার আভাস যেন জাগিল।

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দ আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুরে বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হোত সন্ধ্যাতারা ওঠা
মিথ্যা হোত কাননে ফুল-ফোটা।

* * *

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক।
মরণ-বাসর ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক্
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু.
হেলা আমায় করবেনা সে কভু!
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্ণিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী!
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

আমাদের সমাজে বালবিধবা কন্যা ঘরে রাখিয়া প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ পিতার দ্বিতীয়বার বিবাহ খুব অসাধারণ নয়। ইহার মধ্যে সমাজ জীবনের যে দুঃখ ও গ্লানি, নারীত্বের যে-অবমাননা, যে নিদারুণ ট্রাজেডি আত্মগোপন করিয়া আছে, সচরাচর তাহা আমাদের চোখে পড়ে না। 'নিষ্কৃতি' কবিতায় কবি সেই গ্লানি ও অবমাননা, দুঃখ ও বেদনা সবিস্তারে সুনিপুণ ভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন, এবং উদ্ঘাটন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বর্তমান সমাজের যুবক-যুবতীর হাতে সেই আঘাতের প্রত্যাঘাত কোথায় তাহারও যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন। পিতা যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া

বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি প'ড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে ক'রে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চ'লে
সেইখানেতেই ঘর পাতবে বলে।
আগুন হয়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

তখন এই ভাবিয়া মন খুশি হয় যে, মঞ্জুলিকা দিনের পর দিন যে আঘাত পাইয়াছে, অবশেষে সে-আঘাত সে ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে। হয়ত ইহাই একমাত্র পথ, হয়ত

ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু তাহাতে কবিতাটির কাব্য-মূল্য কতটুকু বাড়িয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন।

যাহাই হউক, "পলাতকা"র নানা গল্পে নানা ভাবে কবি এই কথাই স্বীকার করিলেন, এই ধূলামাটির ধরা-স্বর্গবাসী যত জীব ইহারাই কবির পরমাত্মীয়, ইহারাই ত তাহাদের 'আপন হিয়ার পরশ দিয়ে' সকাল সন্ধ্যায় কবির গানের দীপে আলো জ্বালাইয়াছে, কবি-জীবনের যাহা কিছু সাদা কালো তাহা ত ইহাদেরই আলোছায়ার লীলা,—

নানান প্রাণের প্রীতির মিলন নিবিড় হয়ে স্বজনবন্ধু জনে
পরমায়ুর পাত্রখানি জীবনসুধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে।

আজ জীবন-সায়াহ্নে প্রেম-পূর্ণ অন্তরে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে কবি স্বীকার করিলেন,—

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের সূর্য-ডোবার বেলায়
তাদের হাতে তুলে দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—
ব'লে নে ভাই, এই যে দেখা, এই যে ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই তো ভালো ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাণের আশায়।

(শেষ গান, "পলাতকা")

১৩২৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের ভিতর "পলাতকা"র প্রায় সব কবিতা রচনা শেষ হইয়া গেল। তারপর বহুদিন কবির সঙ্গে কাব্য-লক্ষ্মীর কোনও দেখাশুনা নাই। ১৩২৮ সালে পূজার ছুটির ভিতর দেখিতেছি কবি ধীরে ধীরে একটি করিয়া "শিশু ভোলানাথে"র কবিতাগুলি লিখিতেছেন, এবং সেগুলি শেষ হইতে না হইতেই ১৩১৯এ "লিপিকা"র কাব্য-কথিকাগুলি রচনার সূত্রপাত হইতেছে, এবং "প্রবাসী", "ভারতী", "শান্তিনিকেতন পত্রিকা", "সবুজপত্র", "বঙ্গবাণী", 'শঙ্খ" প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

"শিশু ভোলানাথ"-গ্রন্থে কবি যেন আবার নূতন করিয়া শিশুজীবন উপভোগ করিলেন, কখনও কেবল খেলাচ্ছলে, কখনও শৈশব-লীলাকে রহস্যজালে মণ্ডিত করিয়া। আগে "শিশু"-গ্রন্থ সম্বন্ধে যে-কথা বলা হইয়াছে, "শিশু ভোলানাথ" সম্বন্ধেও সে-কথা প্রযোজ্য; তবে "শিশু ভোলানাথে"র কল্পনা-রহস্য আরও গভীর। কবি যেন দূরে দাঁড়াইয়া সুগভীর দরদ দিয়া অনিমেষ আঁখি লইয়া শিশু-জীবনের অন্তর্লোকের রহস্যের মধ্যে দৃষ্টি নিমজ্জিত করিতেছেন, তাহাকে উপভোগ করিতেছেন।

"লিপিকা" গদ্যে লিখিত হইলেও তাহাকে অপূর্ব কাব্য বলা যাইতে পারে। সাহিত্য-সৃষ্টিতে ফর্মের নেশা কবিকে চিরকালের নূতন উৎসাহ জোগাইয়াছে; "লিপিকা"তেও দেখিতেছি কবিতার এক নূতন গদ্যরূপ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কিছুদিন এই নূতন রূপেই সাহিত্য-সৃষ্টি চলিল। ২।৩টি কথিকা পরিষ্কার মুক্তছন্দের কবিতা, গদ্যের আকারে লেখা মাত্র। বেশির ভাগ অবশ্য রূপক-মূলক গদ্যকবিতা, কোনও বিশেষ ভাব-গ্রন্থিকে মুক্ত করিবার চেষ্টা। সূক্ষ্ম ভাবধারা ও বীক্ষণ-নৈপুণ্যে রচনাগুলি

সমৃদ্ধ, যদিও সর্বত্র ইহা সুনিবিড় নয়। বাক্য ও পদ-নির্বাচন অনির্বচনীয়, এবং লয় ও তাল নির্দোষ। সুরসমৃদ্ধ গীতি-কবিতার নূতন রূপ হিসাবে "লিপিকা" বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি সন্দেহ নাই, এবং বোধ হয় অননুকরণীয়।

কিন্তু রবীন্দ্র-কবি-জীবনের ভাব-প্রবাহের দিক হইতে "শিশু ভোলানাথ"ও "লিপিকা"র মূল্য অন্যত্র খুঁজিতে হয়। এই দুইটি গ্রন্থেই কবিজীবনকে দেখি একটু নূতন রূপে। যে রবীন্দ্রনাথ একদিন রূপারূপ সৌন্দর্যের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যাইতেই অভ্যস্ত ছিলেন, যিনি ছিলেন চির-অতৃপ্ত, নব নব অনুভূতি যাঁহার প্রাণে নিত্য নব নব রসের সঞ্চার করিত, তিনি যেন আজ দরদী সহৃদয় দর্শক মাত্র, সমস্ত সৌন্দর্য উৎস হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে রাখিয়া তিনি যেন শান্তি ও তৃপ্তিতে জগৎ ও জীবনের দিকে তাকাইয়া আছেন, অনুভূতির আনন্দ অপেক্ষা বুদ্ধি ও চিন্তার দীপ্তি যেন তাঁহাকে প্রসন্নতায় ভরিয়া তুলিয়াছে। যাহা ছিল এক সময় সুগভীর দুঃখ ও বেদনার হেতু, তাহা যেন চিত্তে আনিয়াছে অপার শান্তি। দুঃখ ও বেদনার আভাস আমরা পরবর্তী কাব্য "পুরবী"তেও দেখিব, কিন্তু সে দুঃখে কোনও গ্লানি নাই। পুরাতন সুখ ও দুঃখের স্মৃতি মনের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করিতেছে—"লিপিকা" ও "পুরবী"-গ্রন্থে তাহাব পরিচয় পাওয়া যায়—কিন্তু সে-বেদনা অপার শান্তি দ্বারা, মাধুর্য দ্বারা মণ্ডিত। এই শান্তি, এই মাধুর্য "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"র দান।

নয়

পুরবী (১৩৩২)
মহুয়া (১৩৩৬)
বনবাণী (১৩৩৪-১৩৩৮)

১৩৩১ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের গোড়াতে পেরু গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করেন (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪)। চাবমাস পবে মাঘ মাসের গোড়ায় দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া কবি ইতালি হইয়া ৫ই ফাল্গুন দেশে ফিরিয়া আসেন। "পুববী"র অধিকাংশ কবিতা এই ক'টি মাসের মধ্যে রচিত ("পুরবী", ৬৩-২২৪ পৃঃ; ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ হইতে ২৪শে জানুয়ারী ১৯২৫)। "পুরবী"-গ্রন্থের প্রথম কবিতাটির সাক্ষাৎ "পলাতকা"-গ্রন্থেই আমরা পাইয়াছি। দ্বিতীয় কবিতা 'বিজয়ী' ১৩২৩ চৈত্রমাসে, তৃতীয় কবিতা 'মাটির ডাক' ১৩২৮ ফাল্গুনে, চতুর্থ কবিতা 'পচিশে বৈশাখ' ১৩২৯'র জন্মদিনে, এবং পঞ্চম কবিতা 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' ১৩২৯ আষাঢ়ে কবি-কনিষ্ঠের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। 'শিলংয়ের চিঠি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বকুল বনের পাখি' পর্যন্ত সবগুলি কবিতাই ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ হইতে আবম্ভ করিয়া ফাল্গুনের ভিতর লেখা। কবি এই কাব্য-পর্বের (অর্থাৎ প্রথম হইতে 'বকুল বনের পাখি' পর্যন্ত) নামকরণ করিয়াছেন 'পুরবী'। দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ য়ুরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে রচিত কবিতাগুলির (১৩৩১) নাম দিয়াছেন 'পথিক'; এবং কতকগুলি পুরাতন কবিতা যাহা এতদিন কোনও গ্রন্থে গ্রথিত হয় নাই, সেগুলিকে গাঁথিয়াছেন 'সঞ্চিতা' নামে। 'সঞ্চিতা' পর্বের কবিতাগুলি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত, কারণ "পুরবী"-গ্রন্থের ভাব-প্রবাহের সঙ্গে তাহাদের কোনও যোগ

নাই। মূল সুর অথবা ভাব-প্রবাহের দিক হইতে "পুরবী" পর্যায়ের কবিতাগুলির সঙ্গে 'পথিক' পর্যায়ের কবিতাগুলি বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই; কাজেই এই দুই পর্যায়ের কবিতাগুলি এক সঙ্গেই আলোচনা করা যাইতে পারে।

"পুরবী"-গ্রন্থ 'বিজয়ার করকমলে' উৎসর্গীকৃত। দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ কালে কবির স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, আর্জেন্টাইনের ডাক্তাররা পেরু যাইতে বারণ করিলেন। শেষ পর্যন্ত পেরু আর যাওয়া হইয়া উঠিল না। আর্জেন্টাইনের নগরবাসীরা শহর হইতে ২০ মাইল দূরে San Isidore নামে একটি সুন্দর বাগান-বাড়িতে কবির বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এখানে Signore Victoria de Estrada নাম্নী একটি অতি বিদুষী বিদগ্ধা মহিলার সঙ্গে কবির পরিচয় হয়, এবং তিনি ক্রমশ কবির প্রতি শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে আকৃষ্ট হন। San Isidoreর বাগান-বাড়িতে এই মহিয়সী মহিলার সঙ্গ ও সেবাই ছিল কবির আনন্দ। এই মহিলাই কবির 'বিজয়া'। ইহাকে উপলক্ষ করিয়াই কবি "পুরবী"র 'অতিথি' কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন,—

> প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করে দিলে, নারী,
> মাধুর্যসুধায়; কত সহজে করিলে আপনারি
> দূরদেশী পথিকেরে।*

'"পুরবী"র রবীন্দ্রনাথ ষষ্ঠীতমবৎসরোত্তীর্ণ কবি। জীবন-সায়াহ্নের গোধূলি আলোকে এই দিনগুলি আলোকিত। কবির ভাব ও কল্পনায় 'সূর্য আলোর অন্তরালের দেশের' স্পর্শ আসিয়া লাগিয়াছে, বিদায়ের 'বিষণ্ণ মূর্ছনা' শোনা যাইতেছে। "পুরবী"তে একদিকে দেখিতেছি, কবি এই 'বিষণ্ণ মূর্ছনা'কে ছিন্নশৃঙ্খল বন্দীযৌবনের ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে ডুবাইয়া দিয়াছেন, স্থবিরের শাসন নাশন চূর্ণ করিয়া বিদ্রোহী নবীন বীরের সিংহাসন রচনা করিয়াছেন, তাহাকেই সম্ভাষণ জানাইয়াছেন। আর একদিকে দেখিতেছি, এই সুন্দরী ধরণীর বক্ষলগ্ন জীবনের দিনগুলি ফুরাইয়া আসিতেছে, কবি তাহা অত্যন্ত বেদনার সহিত অনুভব করিতেছেন,—বেলা চলিয়া যাইতেছে, দিন সারা হইয়া আসিতেছে, পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণা বাজিতেছে, এই ধরণীর প্রাণের খেলায়, তাহার আনন্দোৎসবে কবি আর বেশি দিন যোগ দিতে পারিবেন না, এই ভাবনা কবি-হৃদয়কে অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া তুলিতেছে। "পুরবী"র অধিকাংশ কবিতা ব্যথার রঙে রঙিন। অথচ দুঃখের আবেগ নাই, বেদনার চঞ্চলতা নাই—স্তব্ধ শান্ত করুণায় মণ্ডিত পুরবীর সুরটি! বার্ধক্যের শান্ত-সমাহিত সাধনা ও তপস্যার স্তব্ধ মাধুর্য কবিচিত্তের এই ফিরিয়া-পাওয়া-যৌবনের তীব্র শক্তি এবং "পুরবী"র ব্যথাভরা করুণ সুরটির উপর এক অপরূপ রসের তুলি বুলাইয়া দিয়াছে।' বহুদিন যে-যৌবন তাহার সমস্ত আনন্দ ও সৌন্দর্য লইয়া অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই অতীত এক দুস্তর কালসমুদ্র পার হইয়া আসিয়া এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় কবিচিত্তে অভিনব মায়াতন্ত্র রচনা করিয়াছে। "পুরবী"তে দেখিতে পাই, শৃঙ্খলহীন যৌবনের দিনগুলিকে জীবনের মধ্যে ফিরিয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যখন কবিচিত্তে এই কথা জাগিল,—জীবনের সন্ধ্যা আসিয়াছে, ধরণীর প্রাণের খেলা ত এইবার ফুরাইবে, অথচ জানালার ফাঁকে ফাঁকে কাজের কক্ষকোণে অতীত জীবনের নানা

---

* Signore Victoria de Estrada সম্বন্ধে জার্মান মনীষী Count Hermann Keyserlingএর স্মৃতিলিপি কয়েক বৎসর আগে Visva-Bharati Quarterly নামক ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠক দেখিয়া লইতে পারেন।

বিচিত্র রসমাধুর্যময় দিনগুলি আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, তখন যেন মুহূর্তে অন্তর বেদনায় ভরিয়া গেল, সমস্ত চিত্ত ক্রন্দনমুখী হইয়া উঠিল।

কিন্তু, যে-রসমাধুর্যময় অতীত জীবনের জন্য এই সায়াহ্নবেলায় সমস্ত অন্তর কাঁদিয়া উঠিল, সে-দিনগুলি জন্মলাভ করিয়াছিল কোথায়? যে-সখী সকালবেলায়, বটের তলায়, শিশির ভেজা ঘাসের উপর বসিয়া কবিহৃদয় সুরের মাধুর্যে ভরিয়া দিয়াছিল সে-সখী জীবনের কোন্ শুভ-মুহূর্তে আসিয়া ধরা দিয়াছিল?

পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এক অপূর্ব সম্পদ। এই অপূর্ব সম্পদটি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে নানা ভাবে নানা রূপে ও রসে, সুরে ছন্দে লীলায়িত করিয়াছে, তাঁহাকে হাসি কান্না সুখ দুঃখ, তৃপ্তি অতৃপ্তি, বিরহ মিলনের বিচিত্র দোলায় দোলাইয়াছে। এই প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের প্রথম পরিচয় আমরা লাভ করি "ছবি ও গানে"। তারপর "কড়ি ও কোমল" হইতে আরম্ভ করিয়া "মানসী"তে, "চিত্রাঙ্গদা"য় ইহার ব্যগ্র বিকাশ এবং তাহার পর "সোনার তরী" "চিত্রা" ও "চৈতালি"তে সেই ব্যগ্রতা ও চঞ্চলতার সম্পূর্ণ সার্থকতা পাঠককে প্রেম ও সৌন্দর্যের এক মাধুর্যময় জগতে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। রবীন্দ্র-কবি-জীবনের এই অধ্যায়টি বাস্তবিকই মাধুর্যরসে কানায় কানায় ভরপুর, এবং আমার মনে হয়, নিছক কাব্য ও শিল্প হিসাবে এমন অপরূপ সৃষ্টি আগেকার জীবনে ত কোথাও নাইই, পরবর্তী কালেও অনেক দিন পর্যন্ত সেই সৃষ্টির বিকাশ কোথাও দেখিতে পাই না। আমার বিশ্বাস, সেই প্রেম ও সৌন্দর্যময় জীবনকে এক সুমহান সাধনা ও তপশ্চর্যার আড়ালে বন্দী রাখিয়া কবি বহুকাল পরে তপস্যার মহিমা ও চিন্তার দীপ্তিদ্বারা শক্তিযুক্ত ও জয়যুক্ত করিয়া "পূরবী"-গ্রন্থে তাহার শৃঙ্খল উন্মোচন করিলেন।

কিন্তু, "নৈবেদ্য-খেয়া" হইতে যে কবি-জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল তাহার মূলে এই প্রেম-সৌন্দর্যমাধুর্যময় জীবনের কাছে কবিকে বিদায় লইতে হইয়াছিল।

"সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি"র প্রেম ও বিচিত্র রসানুভূতির কবি রবীন্দ্রনাথ "খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"-র অধ্যাত্ম-লোকের একতম ও গূঢ়তম রসানুভূতির মধ্যেই নিজকে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অধ্যাত্ম-জীবনের শান্ত স্থির বিরামপূর্ণ আনন্দরস তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। কবি নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাত্মময়, শান্ত, পরিতৃপ্ত জীবন হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অথচ সেই জীবন দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া যৌবন ও সৌন্দর্যের জীবনে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন, এবং "বলাকা"য় আমরা তাহার প্রথম আভাস লাভ করিলাম। "পূরবী"তে যাহা শক্তিতে, সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে দেখা দিবে, "বলাকা"য় তাহার সূচনা দেখা গেল।

[১৩২৩ সালের বৈশাখের প্রথম খরদাহে নববর্ষে রুদ্ররূপকে আহ্বান করিয়া কবি "বলাকা" হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর হইতেই কবি-জীবনে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল। না জানি কেন মনে হইতে লাগিল—জীবন হইতে একটা জিনিস হারাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহাকে ফিরিয়া না পাইলে কিছুই আর ভাল লাগিতেছে না। চারিদিকে যাহারা নিবিড় বন্ধনে জড়াইয়া আছে, এই পৃথিবীর যে সকল বস্তু এই জীবনকে ঘিরিয়া আছে, তাহাদের লইয়া প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুভূতি একসময়ে কবির পক্ষে যত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, তাহা যেন দুর্লভ দুরধিগম্য হইয়া উঠিয়াছে;

অথচ, এদিকে জীবনের দিনগুলি ফুরাইয়া আসিল! শেষে কি এই দুঃখ থাকিয়া যাইবে, যাহারা আপন হিয়ার পরশ দিয়া কবির হৃদয়ে

" * * * সাঁঝ সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
* * * এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা * * *

সেই যে কবির 'আপন মানুষগুলি' তাহাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভ তাহাদের প্রাণের সাড়া হইতে এই জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় বঞ্চিত থাকিতে হইবে? না; চাই না গূঢ় তত্ত্বের পাকে পাকে আপনাকে জড়াইতে, চাই না জীবনের রহস্য বুঝিতে, অধ্যাত্ম-জীবনের নিগূঢ় ও দুর্লভ আনন্দের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে; ইহার চেয়ে জীবনের শেষ কয়টা 'দিনের আলো থাকিতে থাকিতে' এই হৃদয়ের সুহৃত্তম যাহারা তাহাদের হাতে হাত দিয়া গাহিয়া লই, বলিয়া লই,

এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্না-হাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গ মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।

ইহাই "পলাতকা"র শেষ এবং "পূরবী"র প্রথম কবিতা। বাস্তবিকই ত যে ধরার ধূলা মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর মধ্যে এই জীবন্ গানে গন্ধে রসে প্রেমে আনন্দে সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিল তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন কতদিন বাঁচে? নীড়-ছাড়া বিহঙ্গ ত আপন মনের আনন্দে মুক্ত বাতাসে উদার আকাশে শুধু ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে অসীম আলোক বিচ্ছুরিত জ্যোতির মধ্যে কোথায় যে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু সন্ধ্যার রঙিন আলোয়-আলোয় যখন সকল জগৎ রঙিন হইয়া উঠে তখন সেই সুদূর আকাশের প্রান্ত হইতে নীড়ের পাখি নীড়ের পানেই উন্মুখ হইয়া ফিরিয়া আসে; অনন্ত অসীমের নেশা তাহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। এই ভাবিয়াই কি কবি 'কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে' আবার ফিরিয়া আসিলেন? যেমন করিয়াই হউক, যৌবনের সেই লুপ্ত দিনগুলিকে ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তাঁহার প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। সেই আকাঙ্ক্ষার প্রথম স্ফুরণ ত "বলাকা"তেই দেখা গিয়াছে, এবং "বলাকা"র সুর "পূরবী"তে তাহার শেষ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে 'বিজয়ী' কবিতাটিতে। এই কবিতাটির ভাব ও ছন্দ যেন "বলাকা"র সুরেই গাঁথা। তাহার কারণও আছে; "পূরবী"র প্রথম কবিতা দুটি ১৩২৪ সালে লেখা এবং তখনও কবি "বলাকা"র জীবন-সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অন্য কোন গ্রন্থে এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই তাহা "পূরবী"তে স্থান লাভ করিয়াছে, নহিলে "পূরবী"র ভাব-ধারার সঙ্গে 'বিজয়ী' কবিতাটির কোন ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

"শিশু ভোলানাথে"র পর হইতে অর্থাৎ ১৩২৬ এবং ১৩২৭, এই পরিপূর্ণ দুটি বৎসর এবং ১৩২৮ সালেরও দীর্ঘ কতকগুলি মাস বঙ্গবাণীর মুখর কবিটি শুব্ধ নীরব হইয়া রহিলেন।

মানুষের জীবনের চিন্তাধারা যখন্ এক রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য রাজ্যে গমনোদ্যোগ করে, তখন এ দিকে বিচ্ছেদের দুর্ভাবনা, অন্যদিকে সম্মুখে ভবিষ্যতের

অস্পষ্ট প্রেরণা এই দুইএ মিলিয়া যে সংশয় ও সংঘাতের সৃষ্টি হয় তাহাতে কবিচিত্তের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত নীরব হইয়া পড়া কিছুই আশ্চর্য নয়। "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে"র নিবিড় অধ্যাত্ম-জগৎ হইতে জীবন ক্রমেই দূরে সরিয়া আসিতেছিল এবং অতীতের সর্বব্যাপী প্রেম ও সৌন্দর্যের এক নূতন রূপ ক্রমেই দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হইতেছিল। এই পরিবর্তনের মুখে "বলাকা"য় কবি যাহা লাভ করিয়াছিলেন তাহা যতটা যৌবনের শক্তি এবং জীবন ও সৌন্দর্যের নিগূঢ় জ্ঞান ততটা সহজ উপলব্ধি নয়। কিন্তু জীবনের গতি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া মোড় ফিরিয়াছিল "বলাকা"য় তাহার সন্ধান মিলিল না; অতৃপ্তি রহিয়াই গেল। এই অতৃপ্তি ও সংশয় আরও বাড়িয়া উঠিল মহাযুদ্ধের অবসানে রণক্লান্ত পশ্চিমের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং কবিহৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া। এই ক্ষমতামত্ত ঐশ্বর্য গর্বিত পশ্চিম, যন্ত্রসভ্যতার কেন্দ্রভূমি পশ্চিম, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিতকলার লীলাভূমি পশ্চিম—এরা ত মানুষের প্রাণকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া পৃথিবীর বুকে ধন ও রক্ত ছড়াইয়া যৌবনের তাণ্ডবলীলায় মাতিয়াছিল, শক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখাইয়াছিল, কিন্তু এরা মঙ্গলকে, কল্যাণকে লাভ করিতে পারিল কি? জীবনের নিগূঢ় রহস্যও ত এদের কম জানা ছিল না, বিশ্বের কল্যাণকামী মহাত্মাদের শান্তি ও প্রীতির বাণীও ত এরা কম শোনে নাই, কিন্তু কিছুই ত এদের রক্ষা করিতে পারিল না। কবি অবশ্য দেশে ফিরিয়া আসিয়া সর্বাগ্রে একথা স্বীকার করিলেন যে প্রাণের লীলার অদ্ভুত বিকাশে কর্ম ও চিন্তার জগতে শক্তির স্ফুরণে 'পশ্চিম জয়ী হইয়াছে' কিন্তু ব্যক্তি-জীবনে কবিচিত্তের মধ্যে তাঁহাকে এ কথাও স্বীকার করিতে হইল, প্রাণের গতি-চাঞ্চল্যে কিংবা শুধু শক্তির স্ফুরণে কল্যাণ নাই, আনন্দ নাই, জীবনের নিগূঢ় তত্ত্বোপলব্ধির মধ্যেও নাই, প্রেম ও শান্তির রহস্য-প্রচারেব মধ্যেও নাই। আছে, এই যে জীবনের আশেপাশে চারিদিকে ধূলা মাটি ফল ফুল তৃণ নিজেদের বিলাইয়া দিয়াছে, হাসি-কান্নায় ভরা এই যে মানব-সংসার চিরকাল ধরিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে, ইহাদেরই মধ্যে। ব্যক্তিজীবনের শান্তি ও কল্যাণকে লাভ করিতে হইলে এই সংসারের বিচিত্র লীলার মধ্যে, তাহার ঋতু উৎসবের মধ্যে, তাহার সুখ ও দুঃখের মধ্যে, যাহাদের জন্য 'স্বর্গ হইতে বিদায়' লইয়া কবিচিত্ত এই ধরার স্নেহে পুষ্ট সকল প্রাণীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহাদেরই মধ্যে খুঁজিতে হইবে। মনের মধ্যে এই কথাটি যেখানে জাগিল সেইখানেই "পূরবী"র সৃষ্টি।

"সোনার তরী"র 'দরিদ্র', কিংবা 'স্বর্গ হইতে বিদায়', "চিত্রা-চৈতালি-ক্ষণিকা"র অনেক কবিতাতে দেখা যায় এই ধরিত্রীর প্রতি কবির প্রাণের কি একটা অচ্ছেদ্য ভালবাসার টান, তাহার সঙ্গে প্রেম কি নিবিড়! এই জীবনের এবং পৃথিবীর সকল বস্তুই যে কবির প্রাণে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে; যাহা কিছু দেখিতেছেন,

> কিছু তুচ্ছ নয়
> সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।

গ্রীষ্মের খরতাপ, বর্ষার মেঘ, শরতের রৌদ্র, সবুজ মাঠ, হরিৎ ক্ষেত্র, সকলের সঙ্গে কি সুগভীর আত্মীয়তা, প্রকৃতির সঙ্গে কি নিবিড় যোগ! কিন্তু, বলিয়াছি, এই জীবন হইতে তিনি বিদায় লইয়াছিলেন। তারপর কত সুদীর্ঘ কাল কাটিয়া গিয়াছে। ঐ মাধুর্য-সৌন্দর্যময় জীবন-বৈচিত্র্য হইতে বিদায়ের পর জীবনের উপর দিয়া কত ভাব-প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদিন পর আবার সেই অতীত জীবনের কথা মনে পড়িল কেন? কেন মনে পড়িল

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠত খেপে
ফাগুন বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগতো পুলক কী মন্তরে
কচিপাতায় প্রথম কলকথায়,
সেদিন মনে হতো কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে। ('মাটির ডাক')

কেন মনে হয়, আশ্বিনের ফসল ক্ষেতে, কিংবা ‘নীল আকাশের কূলে কূলে সাগর ঢেউয়ের তালে তালে’ সবুজের নিমন্ত্রণে কবির প্রাণের দাবি আছে। দাবি যে এক সময় ছিল, একথাও সত্য, কিন্তু কবি নিজেকেই নিজে দোষী করিতেছেন,—

কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিলি চাবি?

যে মাটি-জননীর কোলে তাহার জন্ম, সেই কোল হইতে কে তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়াছিল? আজ কে যেন কবিকে বলিতেছে,—

বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে। ('মাটির ডাক')

কবিও এতদিন ‘নানা মতে নানান ঘাটে’ নানান পথে হারানো কোল খুঁজিয়া খুঁজিয়া কেবলি ঘুরিয়াছেন। এতদিন পরে আবার তাহার সন্ধান মিলিল।

আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ। ('মাটির ডাক')

উপরে “পূরবী”র যে কবিতাটি উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই অনুরূপ ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে ‘লীলা-সঙ্গিনী’তেও। জীবনের যে প্রিয়তমা লীলা-সঙ্গিনী কবিকে একা ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ আবার তাহার পুরাতন বন্ধুকে মনে পড়িয়াছে। সেই দ্বারের পুরাতন পরিচিত পথে আসিয়া সে কিঙ্কিণী বাজাইল, সে শব্দে কবি দুয়ার-বাহিরে আসিয়া যেমনই চাহিলেন অমনি তাহাকে চিনিয়া লইতে পারিলেন। এই লীলা-সঙ্গিনী অতীতের সেই মধুর দিনগুলিতে কতদিন কত লীলার ছলে আসিয়া কবিকে বারবার দেখা দিয়া গিয়াছে, তাহার কঙ্কন-ঝংকারে কবির বন্ধ দুয়ার কতদিন খুলিয়া গিয়াছে, বাতাসে বাতাসে তাহার ইশারা ভাসিয়া আসিয়াছে, ‘কখনও আমের নবমুকুলের বেশে’, কখনও ‘নবমেঘভারে’, কত বিচিত্র রূপে চকিত চাহনিতে কবিকে সে বার বার ভুলাইয়াছে। এতদিন পরে আজ সকল কথাই কবির মনে পড়িয়া গেল। শুধু কি তাই, কত প্রশ্ন যে বুকের মধ্যে উতলা হইয়া উঠিল, -

এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল?
বকুল-গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল?

'শেষ অর্ঘ্য' সুন্দর একটি সনেট ; সেখানেও ঐ একই কথা। যে কবিকে প্রত্যূষে 'মাহেন্দ্রক্ষণে প্রথম নিশান্তের বাণী' শুনাইয়াছিল, যে তাঁহাকে এই 'নিখিলের আনন্দ মেলায়' ডাকিয়া আনিয়াছিল, যে

*   *   *   দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলি-পাতে তন্দ্রাযবনিকা
সহাস্তে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা—

সে কবির জীবন হইতে কোথায় খসিয়া পড়িল, কোথায় আত্মগোপন করিল ? অথচ আজ তাহাকে না পাইলে ত আর কিছুতেই চলিতেছে না , জীবন-সন্ধ্যায় একবার তাহাব দর্শন, একবার তাহার আলিঙ্গন চাই। তাই সব কিছু তুচ্ছ করিয়া প্রিয়তমের সন্ধান

এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

যাহাদের সঙ্গে কবিব অতীত জীবন জড়াইয়া ছিল, তাহাদের কতজন আজ সন্ধ্যা বেলায় 'কাজেব কক্ষকোণে' আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, হাতছানি দিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। চোখের সমুখ দিয়া 'বকুল বনেব পাখি' উড়িয়া যাইতেছে , কবি তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন, তুমি ত এক সময়ে আমার মনোজগতের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে, আজ যে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া আসিয়াছি, তাব বেদনা কি তোমার বুকে বাজে নাই ? আমি যে তোমায় ভালবাসিতাম। আষাঢ়ের জলভরা মেঘের খবর কি তুমি বলিতে পার, সে কি আমার আশায় উন্মুখ হইয়া থাকে না ? নদীর কলতানে আমার অভাবের বেদনা কি বেসুরে বাজে না ? আমি হারাইয়া গিয়াছি বলিয়া আঁখিজলে কাহারও বুক কি ভাসিয়া যায় নাই ?

শোনো শোনো, ওগো বকুল বনের পাখি,
সেদিন চিনেছ, আজিও চিনিবে না কি ?
পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার,
খেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হবো পার
শেষের পেয়ালা ভরে দাও, হে আমার
সুরার সুরের সাকী। ('বকুল বনের পাখি')

একদিকে এই বেদনাময় আকুলতা আর একদিকে বিশ্বাসের দীপ্তি—'আমি ত এই বিশ্বের উচ্ছ্বসিত আনন্দেব পরিপূর্ণ অনুভূতির জীবনকেই আবার ফিরিয়া পাইলাম', নহিলে এই জীবন-সন্ধ্যার 'পঁচিশে বৈশাখ'

পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা

সাজাইয়া আনিবে কেন ?

এর পরে আমি যে কবিতাটির উল্লেখ করিতে চাই, কবি তাহার নামকরণ করিয়াছেন, 'তপোভঙ্গ'। এই অপূর্ব কবিতাটিকে ছন্দে এবং ধ্বনিতে, শব্দসজ্জায় এবং বর্ণনাভঙ্গিতে, ভাবের সূক্ষ্ম প্রকাশ এবং অনুভূতিতে 'উর্বশী'র সহিত একাসনে স্থান দিতে আমার একটুও দ্বিধা নাই। 'উর্বশী'তে কি শক্তিতে অথচ কি সংযত কৌশলে শব্দ দ্বারা ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, অপূর্ব কল্পনায় ভাবকে রূপদান করিয়া কবি সৌন্দর্যের তীব্র অথচ শান্ত ও নির্মল অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন! 'তপোভঙ্গে'ও প্রকাশ-ভঙ্গি একই, কিন্তু অনুভূতি হইতেছে তারুণ্যের সদানন্দ প্রাণশক্তির। কি করিয়া কবি এই অপূর্ব বর্ণনাচাতুর্য ও প্রকাশ-ভঙ্গিমা এতদিন পরে পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। "তপোভঙ্গে" কবি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, আমার মনে হয়, তাহা এই,—

কালের অধীশ্বর মহেশ্বরের হিসাবের খাতায় ত মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিনের কথাই লিখা থাকে। তিনি কি কবির 'যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল দিনগুলির' কথা ভুলিয়া গিয়াছেন? সে দিনগুলি কি অযত্নে ভাসিয়া গিয়াছে, না 'স্বেচ্ছাচারী হওয়ার খেলায় নির্মম হেলায়' বিস্মৃতির ঘাটে ডুবিয়া গেল? একদিন সেই যৌবনের দিনগুলি প্রাণশক্তিতে কী পরিপূর্ণ ছিল—তাহারা ভোলানাথের রুদ্ররূপকে সৌন্দর্যে সাজাইয়া দিয়াছিল, ডম্বরু-শিঙ্গা কাড়িয়া লইয়া হাতে মন্দিরা বাঁশরি তুলিয়া দিয়াছিল; তাঁহার তপস্যাকে 'গীতরিক্ত হিম মরুদেশে' নির্বাসিত করিয়া সন্ন্যাসের অবসান করিয়া দিয়া বিশ্বের ক্ষুধার জ্যোতির্ময় সুধাপাত্রটি তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল। মহেশ্বরের এই নব সৌন্দর্যরূপই কবি-হৃদয়কে প্রেমে ও গানে, রসে ও সৌন্দর্যে ভরিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কবির যৌবনের দিনগুলির সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথের এই নবরূপকে কে সংহরণ করিয়া লইয়াছিল। নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যে অগীত সংগীতে অশ্রুর সঞ্চয়ে পরিপূর্ণ জ্যোতির্ময় সুধাপাত্রটি কি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল? কবির যৌবনের লুপ্ত দিনগুলি কি নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিঃশ্বাসে আকুলিয়া উঠিল? না, সে দিনগুলি লুপ্ত হইয়া যায় নাই; মহেশ্বরের প্রেম ও সৌন্দর্যের চিরন্তন রূপও নিঃশেষিত হয় নাই—

> নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছো তাদের সংহরিয়া
> নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
> রাখো সংগোপনে।

যৌবনের সেই অকারণ আনন্দ-উল্লাস, সৌন্দর্যের সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগ 'তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে' শান্ত হইয়া আছে মাত্র। কিন্তু এ তপস্যা কি চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকিবে? যৌবন কি চিরকাল বন্দী হইয়া থাকিবে; এর কি অবসান হইবে না? হইবেই—

> চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আবার উন্মত্ত অবসান
> দুরন্ত উল্লাসে।
> বন্দী যৌবনের দিন
> আবার শৃঙ্খলহীন
> বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

কবি এই তপস্যাকে স্থায়ী হইতে দিবেন না; তিনি যে তপোভঙ্গদূত, স্বর্গের চক্রান্ত। ভোলানাথের ছলনা তিনি জানেন, সেই শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী তপস্যার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সুন্দরের সাধক কবির হাতেই ত পরাজয় কামনা করিতেছে। সেইজন্যই

বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চ'লে
মৃত্তিকার কোলে।

মহেশ্বরের তপস্যা তখন ভাঙ্গিয়া যায়; তার চিতাভস্ম, বিভূতি সমস্তই খসিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়, পরিবর্তে দেখা দেয় পুষ্পমাল্য। বহুদিন বিচ্ছেদের পরে কবির প্রসাদে আবার উমার সঙ্গে তার মিলন—সেই মিলনের বিচিত্র ছবি কবির বীণায় আবার সুর জাগায়; আর

কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে;
সে হাস্তে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পরানে।

শুধু অপরূপ কাব্যসৃষ্টির দিক হইতে না দেখিয়া এই কবিতাটিকে যদি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের উপর প্রতিফলিত করিয়া এই কথা বলি যে 'তপোভঙ্গ' কবিতায় কবি নিজের তপস্যাও ভঙ্গ করিয়াছেন, তবে খুব ভুল করিব কি? আমার মনে হয় কবিগুরু মহেশ্বরের তপোভঙ্গের আড়ালে নিজের এই "নিত্য নূতনের লীলা চিত্ত ভরিয়া" দেখিবার আকুলতার অস্পষ্ট আবরণটি ছিন্ন করিয়া একেবারে আপন মর্মবাণীটি ব্যক্ত করিলেন।

কবিচিত্তের এই পরিবর্তনকে শুধু তাঁহার ভাবপ্রবাহের মধ্যেই খুঁজিলে চলিবে না। ভাব ও কথা যে-রূপ ধরিয়া, যে ছন্দে ও ধ্বনিতে আত্মপ্রকাশ করিল, তাহার মধ্যেও তাহা লক্ষ্য করা যায়। 'তপোভঙ্গ' কবিতা সম্পর্কে আমি তাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। শুধু এই কবিতাটিতেই নয়, "পূরবী"র অনেক কবিতাতেই সে-আভাস অতি সুপরিস্ফুট। 'সাবিত্রী', 'আহ্বান', 'সমুদ্র', 'যাত্রী' প্রভৃতি কবিতা কিছুতেই 'বর্ষশেষ', 'সমুদ্রের প্রতি,' 'রাত্রি,' 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া না দিয়া পারে না। বাস্তবিক "পূরবী" পড়িলে মনে হয় নিজের পুরাতন ছন্দের জগতেও কবি আবার ফিরিয়া আসিলেন। "বলাকা"তে অবশ্য একটা নূতন ছন্দ প্রথম সৃষ্টিলাভ করিল, তাহার মধ্যে একটা বিপুল শক্তি, উদ্দাম গতিবেগ, যাহা আছে যাহা পাইয়াছি তাহা লইয়া একটা গভীর অতৃপ্তি, সেই বন্ধন ও অতৃপ্তির হাত হইতে মুক্তি কামনার আবেগ ও উচ্ছ্বাস সমস্তই প্রকাশ পাইয়াছে, শুধু ছন্দে নয়—ভাবেও। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিসের যেন একটা অভাবও তাহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। "বলাকা"র ছন্দ গতিতে ও শক্তিতে মন ও কল্পনাকে বর্ষার পার্বত্য নদীর মত উদ্দাম বেগে ঠেলিয়া লইয়া যায়; কিন্তু শরতের ভরা নদীর যেমন শান্ত, সংযত, গম্ভীর অথচ দ্রুতগতির তরলায়িত লীলা আছে এবং তাহার চলার মধ্যে যে-মাধুর্য আছে সেই লীলা ও মাধুর্য তাহাতে নাই। ছন্দের এই লীলা ও মাধুর্যের জগৎ "বলাকা"র দানে সমৃদ্ধ হইয়া "পূরবী"র কবিতাগুলিতে পুনরাবিষ্কার লাভ করিল, ইহাই আমার বিশ্বাস।

আমি এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি সেই কথাটি নানাস্থানে কবি-হৃদয় হইতে বিচিত্ররূপে আপনি ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দে সৌন্দর্যে এক সময় যে জীবন পরিপ্লুত হইয়াছিল, জীবনের সেই আনন্দ ও সৌন্দর্য কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল—আজ তাহা জীবন-সন্ধ্যায় অতি ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আবার আসিয়া গোপনে কবির ভাবের ও রূপের রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বড় দ্রুত ক্ষণিকার মত সেদিনের সেই ত্রস্ত আঁখি-যুগল সুনিবিড় তিমিরের তলে ডুবিয়া গিয়াছিল—দু'জনের জীবনের চরম অভিপ্রায় সেদিন পূর্ণ হয় নাই; আজ তাই

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিলো আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চ'লে গেলো আমার ক্ষণিকা।
* * * *
* * * *
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করিছে অধিকার।
দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি। ('ক্ষণিকা')

'খেলা', 'কৃতজ্ঞ' প্রভৃতি কবিতায়ও এই কথা। 'কৃতজ্ঞ' একটি অতি সুন্দর মধুর প্রেমের কবিতা; স্মৃতিবেদনাময় স্নিগ্ধ প্রেমের একটি শান্ত মধুর দীপ্তি সমস্ত কবিতাটিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অতীত জীবনের ছোট-খাট স্মৃতিগুলি কবিকে কি রকম বেদনা দিতেছে এই একটি কবিতা পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কোন্ অতীত দিনে কবেকার সেই প্রিয়া কবিকে তার শেষ চুম্বন দিয়া গিয়াছে। কবি এতদিনের বিচ্ছেদে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আজ যখন আবার তাহাকে মনে পড়িয়াছে তখন বড় আকুল হৃদয়ে এই বিস্মৃতির জন্য তিনি ক্ষমা চাহিতেছেন। সেই শেষ চুম্বনের পরে কত মাধবী-মঞ্জরি থরে থরে শুকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, কত কপোতকূজনমুখরিত মধ্যাহ্ন, কত 'সন্ধ্যা সোনার বিস্মৃতি আঁকিয়া দিয়া', কত 'রাত্রি অস্পষ্ট রেখার জালে আপন লিখন আচ্ছন্ন করিয়া' প্রতি মুহূর্তে 'বিস্মৃতির জাল বুনিয়া' দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কবি যদি তাঁহার প্রিয়াকে ভুলিয়া গিয়াই থাকেন, আজ তাহার জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। তবু একদিন এই প্রিয়া কবিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল বলিয়াই গানের ফসলে কবি-জীবন ভরিয়া উঠিয়াছিল—'আজও তার শেষ নাই'; তাহার স্পর্শ আজ আর নাই কিন্তু কি যে 'পরশমণি' কবির অন্তরে সে রাখিয়া গিয়াছে যাহার কল্যাণে

বিশ্বের অমৃত ছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে,—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। * * *

আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছো তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে যাওয়া তোমার সিঁদুরে।
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্য ঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

এই কবিতাটির করুণ মাধুর্যের তুলনা "পুরবী"র আর একটিতেও আছে বলিয়া মনে হয় না।

আগেই বলিয়াছি, "পুরবী"র 'পথিক' অংশে যে-কবিতাগুলি গ্রথিত হইয়াছে তাহা ১৩৩১ সালে য়ুরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময় লেখা; কিন্তু এই কথাটি জানা না থাকিলে কিংবা কবিতার নিচে "আণ্ডেস্ জাহাজ" অথবা "বুয়েনোস্ এয়ারিস্" লেখাটি না দেখিলে কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই, এই সহজ সুন্দর মাধুর্যময় কবিতাগুলি জাহাজের

নির্জন কক্ষে কিংবা পশ্চিমের জনসংঘাতের উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে বসিয়া লেখা, না বাংলা দেশের খাল, বিল, নদী, বট, শাল, পলাশ,- জুঁই, বেল, করবীর চিরপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে প্রসূত। 'কিশোর প্রেম', 'অন্তর্হিতা', 'শেষ বসন্ত' প্রভৃতি যে-কোনও কবিতা পড়িলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। স্থান ও কালের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত কি করিয়া সর্বদাই চিরপরিচিত গৃহের সুমধুর আবেষ্টনের মধ্যে বিহার করিয়া ও একই সঙ্গে সমস্ত বিশ্বানুভূতির সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া চলে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময় উৎপাদন না করিয়া পারে না। 'চাপাড মালাল' কিংবা 'বুয়েনোস্ এয়ারিসে'ও অতি তুচ্ছ আকন্দ এবং জুঁই যে কবিচিত্তের স্মরণ ও ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছে ইহা বিস্ময়কর সত্যই।

অতীতের সৌন্দর্যরসভরা দিনগুলিকে যখনই ফিরিয়া পাইবার ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগিয়াছে তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে শেষের সুরটিও অতি করুণ ঝংকারে হৃদয়তন্ত্রীকে পীড়ন করিয়াছে। এই পীড়া, এই বেদনা সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটিতে।

প্রিয়তমা লীলাসঙ্গিনী এই জীবন-সন্ধ্যায় আবার আসিয়া চিত্ত-দুয়ারে হানা দিয়াছে; কিন্তু এতদিন পরে বেলা-শেষে সে যে আসিল তাহাকে আমি বরণ করিয়া ঘরে লইতে পারিব কি? পারিলেও আর কতদিন?

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এলো দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বসি
গানহারা উদাসীন।

* * *

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ অন্ধকারে?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে?

আবার, 'বৈতরণী' কবিতায়, কতবার মরণ-সমুদ্রের খেয়ার তরণী

এসেছিল এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।
নিয়ে গেল কালহীন তোমার কালোতে
কত মোর উৎসবের বাতি,
আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথি,
দিবসেরে রিক্ত করি, তিক্ত করি আমার রাত্রিরে।
সেই হতে চিত্ত মোর নিয়েছে আশ্রয় তব তীরে।

কবির হৃদয়ের একদিকে এই সুতীব্র বেদনাবোধ এবং অন্য দিকে ব্যথাজীর্ণ হৃদয় লইয়া শেষ দিনটির জন্য নীরব প্রতীক্ষা, ইহা পাঠকের চিত্তকেও পীড়িত না করিয়া পারে কি? বাংলার যে-কবি অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাংলার, ভারতের ও সমগ্র পৃথিবীর পিপাসু

চিত্তকে গানে গন্ধে সৌন্দর্যে মাধুর্যে রসে সৌরভে নন্দিত করিয়াছেন, যিনি অজ্ঞাত মানব এবং অনাগত কালের জন্যও সুধাপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি আজ 'পুরবীর ছন্দে শেষ রাগিণীর বীণা' বাজাইতেছেন, ইহার ভাবনা মাত্রই কবির অনুরক্ত পাঠকের মন ব্যথায় ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। তবু, মনে হয়, জরার পীত উত্তরীয়ের অন্তরালে, বয়সের হিসাবে জীবন-সন্ধ্যার পশ্চাতে যে চির-নূতন চির-অতৃপ্ত প্রাণের পরিচয় আমরা এতকাল তাঁহার জীবনে ও কাব্যে দেখিয়াছি, বারবার যে নব অরুণোদয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই চির-নূতন প্রাণ, নব অরুণোদয় আবার আমরা কবির জীবনে প্রত্যক্ষ করিব, কবির জীবন-দেবতার নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর আহ্বান-বাণী আবার কবির প্রাণে নূতন জীবনের সঞ্চার করিবে।

"পুরবী"র পরবর্তী কাব্য-প্রবাহই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

সাক্ষ্য যে দিতেছে তাহা প্রায় চার বৎসর পরে প্রকাশিত "মহুয়া" গ্রন্থেই প্রমাণিত হইয়া গেল।

কিন্তু "মহুয়া" আলোচনার আগে স্বল্প-পরিচিত একটি গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন —সেটি "লেখন"। "লেখন" রচনা শেষ হয় ২৬ কার্তিক ১৩৩৩ সালে, কবির নিজের হাতের লেখা বুডাপেস্টে ছাপা। একে বিদেশে, তার উপর আবার স্বল্প সংখ্যাই ছাপা হইয়াছিল, কাজেই বহুজনের হাতে তাহা পৌছায় নাই। ছোট ছোট, চার-ছয়-আট লাইনের কবিতা; বাংলার সঙ্গে সঙ্গে কবিতাগুলির ইংরাজি অনুবাদও কবির নিজের হাতের লেখাতেই ছাপা হইয়াছে। এই স্বল্পায়তন 'কবিতিকা' (কবির দেওয়া নাম) গুলির জন্ম, রূপ-বৈশিষ্ট্য এবং বিষয়-বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়া কবি নিজে বলিতেছেন,

"যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলুম, প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হতো। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাথায় অনেক লিখতে হয়েছে। * * দু'চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তা'র যে একটি বাহুল্য-বর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড় লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড় বড় কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলেই তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি করতে আমাদের বাধে। * * * জাপানে ছোট কাব্যের অমর্যাদা নেই। ছোটর মধ্যে বড়কে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের * * * সৌন্দর্যবস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। * * * এই রকম ছোট ছোট লেখায় আমার কলম যখন রস পেতে লাগল, তখন আমি অনুরোধ নিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা তা লিখেছি, এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মনে ঠাণ্ডা করবার জন্য বিনয় করে বলেছি—

আমার লিখন ফুটে পথ-ধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ। যে-জিনিসটা বহরে বড় নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখিনে—যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হলেও লজ্জার কারণ থাকতো না। * * * ছোট লেখাকে যাঁরা সাহিত্য হিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর-হিসাবে হয়তো সেগুলোকে গ্রহণ করতেও পারেন। * * * ইংরেজি বাংলা এই ছুটকো লেখাগুলি লিপিবদ্ধ করতে বসলুম। * * *" ("প্রবাসী" কার্তিক, ১৩৩৫, ৩৮-৪০ পৃঃ)।

"কণিকা"-আলোচনার প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই বলিয়াছি "লেখনে"র কবিতাগুলি

"কণিকা" জাতীয়; সেখানে একথাও বলিয়াছি, "কণিকা"র কবিতাগুলি তত্ত্বমূলক, উপদেশমূলক এবং সেই হেতু কাব্য হিসাবে "কণিকা" "লেখন" অপেক্ষা বহুলাংশে নিকৃষ্ট। বৃহৎ প্রসারিত এবং সুগভীর ভাব ও অনুভূতিকে ক্ষুদ্র সংযত পরিসরের মধ্যে সমগ্রতায় ভরিয়া বাঁধিয়া তুলিতে অনুভূতির যে গাঢ় দৃঢ়তা এবং চিত্তের যে সংযম প্রয়োজন "লেখনে"র কবিতাগুলিতে তাহা স্বপ্রকাশ। কবিতাগুলি সরল ও নিরাভরণ, এবং তাহাদের পূর্ণ অখণ্ডতা তাহাদের অন্তরের মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছতায় বিরাজমান।

নিজের হাতের লেখায় এবং বুডাপেস্টেই ছাপা আর একটি গ্রন্থ "লেখনে"র সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হইয়াছিল, অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যায়। একান্ত বন্ধু ও অন্তরঙ্গ মহল ছাড়া এই বইটি আর কাহারও হাতে বোধ হয় নাই। ইহার নাম "বৈকালী", কিন্তু যেহেতু ইহার প্রায় সব কবিতাই অন্যান্য গ্রন্থে, বিশেষভাবে "মহুয়া"য় ছাপা হইয়াছে, সেই হেতু "বৈকালী" সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা অবান্তর।

"মহুয়া"র কবিপরিচয় দিতে গিয়া প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় লিখিলেন, বইখানির

"অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। সেই সময়ে কথা হয়-যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিবাহ উপলক্ষে উপহার দেওয়া যায় এরূপ একখানি বই বাহির করা হইবে, এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া গেল। এই সব কবিতাই এখন 'মহুয়া' নামে বাহির হইতেছে। ইহার কিছু পূর্বে, ১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসে, 'শেষের কবিতা' নামে উপন্যাসের জন্য কয়েকটি কবিতা লেখা হয়। ভাবের মিল হিসাবে সেই কবিতাগুলিও এই সঙ্গে ছাপা হইল। * * * বইয়ের আরম্ভে বসন্তের আগমনী সম্বন্ধে ৫টি কবিতা আর বইয়ের শেষে বসন্তের বিদায় সম্বন্ধে ৪টি কবিতা ১৩৩৩-১৩৩৪ সালের লেখা। ঐ সময়ের আর একটি মাত্র কবিতা 'সাগরিকা' এই বইতে স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু কাব্যের দিক হইতে অতি অবান্তর একটি ফরমাশ উপলক্ষ করিয়া যে নূতন ঝোঁকের কবিতা উৎসারিত হইল তাহাকে আর বাহিরের প্রয়োজনের তাড়নায় রচিত কাব্য কিছুতেই বলা চলিবে না। কবিচিত্তে নূতন বসন্তের আবির্ভাব "পূরবী"তেই ধরা পড়িয়াছিল; "মহুয়া" আসিল সেই বসন্তেরই অনুচর হইয়া। মহুয়ার রসের মধ্যে যে-উন্মাদনা প্রচ্ছন্ন থাকে, সেই উন্মাদন-গন্ধে "মহুয়া" গ্রন্থের কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। বিবাহ উপলক্ষে উপহারের প্রয়োজনের তাড়না ইহাদের মূলে কোথাও যে ছিল তাহা জানিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন পাঠকের নাই, এবং তাহা একেবারে অস্বীকার করিলেও রসোপভোগে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিবে না।

"মহুয়া"র কবিতাগুলির ভাব-প্রসঙ্গের পরিচয় কবি নিজেই রাখিয়া গিয়াছেন; সে-পরিচয় আর কোনও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

"* * * ফরমাশ ব্যাপারটা মোটর গাড়ির ষ্টার্টার-এর মতো। চালনাটা শুরু করে দেয় কিন্তু পরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎশক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। * * * নতুন লেখার ঝোঁক যখন চিত্তের মধ্যে এসে পড়ে তখন তারা পূর্ব দলের পুরানো পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে চায় না, নতুন বাসা না বাঁধতে পারলে তাদের মানায়না, কুলোয়না। ক্ষণিকার বাসা আর বলাকার বাসা এক নয়।

"আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গিতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধন কলা মুখ্য। আর একটিতে আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।

"মহুয়ার" মায়া নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্যে সৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রচনা করে—নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি করে অন্তরে বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে—সেখানে ভাবে ভঙ্গিতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য; তার কোন অংশে ছন্দে ভাষার ভঙ্গিতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোন অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।

"এই দুয়ের মধ্যে নূতনের বাসন্তিক স্পর্শ নিশ্চয় আছে—নইলে লিখতে আমার উৎসাহ থাকতো না। * * * কত অল্প সময়ের মধ্যে এগুলি সমাধা করেছি। তার কারণ প্রবর্তনার বেগ মনে সতেজ ছিল। * * * বারোমাসে পৃথিবীর ছয় ঋতু বাঁধা, তাদের পুনরাবর্তন ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার আমার মন থেকে যে-ঋতু যায়, সে আর এক অপরিচিত ঋতুর জন্যে জায়গা করে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না, এ হতেই পারেনা, কিন্তু সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলের মতো। মনের যে ঋতুতে মহুয়া লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, দরমাশের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক। * * * মনের মধ্যে রচনার একটা বিশেষ ঋতুর সমাগম হয়েছে—তাকে পুরবী ঋতু বা বলাকার ঋতু বললে চলবে না।

"পূরবী ও মহুয়ার মাঝখানে আর-এক দল কবিতা আছে,—সেগুলি অন্য জাতের; তাদের মধ্যে নটরাজ ও ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যাভিনয়ের উপলক্ষ নিয়ে এগুলি রচিত হয়েছিল কিন্তু এরাও স্বভাবতই উপলক্ষকে অতিক্রম করেছে। আর কোনো খানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখিনি—তারই সঙ্গে মানব-ভাষায় উত্তর প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলছে। * * * এই বইয়ের প্রথমে ও সব শেষে যে গুটি কয়েক কবিতা আছে যেগুলি মহুয়া পর্যায়ের নয়। সেগুলি ঋতু উৎসব পর্যায়ের। দোলপূর্ণিমায় আবৃত্তির জন্যেই এদের রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা বলে নকিবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।" (মহুয়া গ্রন্থের 'পাঠ পরিচয়ে' উদ্ধৃত কবির পত্র)।

"মহুয়া"-সম্বন্ধে ইহার বাহিরে বলিবার কিছু নাই। দৃষ্টান্তের সাহায্যে কবির বক্তব্য আরও উদ্‌ঘাটিত করা চলে মাত্র। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থের প্রধান ও প্রথম বৈশিষ্ট্য ইহার প্রেম ও প্রণয়ের কবিতাগুলি। 'নাম্নী' পর্যায়ের কবিতাগুলিও 'প্রণয়ের প্রসাধন-কলা'রই অন্তর্গত। প্রণয়ের প্রসাধন-পারিপাট্যে নারীর বিচিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করাই এই পর্যায়ের কবিতাগুলির লক্ষ্য। কিন্তু যে-কবিতাগুলিতে প্রণয়ের প্রসাধনকলাই মুখ্য বলিয়া কবি বলিয়াছেন, সেগুলিতেও 'প্রণয়ের সাধনবেগ' একেবারে অনুপস্থিত একথা বলা চলে না, প্রণয়োপলব্ধির নিবিড়তা প্রসাধন-পারিপাট্যের পশ্চাতে প্রকাশমান। যেমন 'সন্ধান' কবিতায়

আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকানো, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে?
দুয়ারে এঁকেছি রক্তরেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে,
বাঁশি কী আশার ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে?

অথবা, 'শুভযোগ' কবিতায়

যে-বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এলো চঞ্চল দক্ষিণে;
পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি;
শিমুল পাগল হয়ে মাতে,
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে,
পাত্র করি পূরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্ত-ফেন সুরা।
উচ্ছ্বসিত সে-এক নিমেষে
যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে ॥

ইহাদের মধ্যে প্রসাধন-কলার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু প্রণয়ের সাধন বেগ এবং উপলব্ধির নিবিড়তা নাই এ কথাও বলা চলে না।

প্রণয়ের সাধনবেগ ও উপলব্ধির নিবিড়তা যে-কবিতাগুলির মুখ্য ধর্ম, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, সে-কবিতায়ও যৌবনে যেমন পরিণত বয়সেও তেমনই, পলাশ-পারুল-শিমুল-কাঞ্চনের যৌবন বাসন্তিক উন্মাদনা, বর্ণবহ্নির প্রাচুর্য ও রক্তফেন সুরার উচ্ছ্বসিত স্ফূর্তি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রণয়-কল্পনা বরাবরই নরনারীর দেহভাবনা বা মিথুনাকর্ষণ বিচ্যুত, কামনা-বাসনা অতিক্রান্ত। কবির একান্ত চিত্তসংযম, দেহাতিক্রান্ত মনন-কল্পনা এবং কতকটা বস্তুবিরহিত প্রেম-বাসনা নরনারীর দেহগত প্রণয়-ভাবনাকেও মানবিক কামনার বহির্দেশে স্থাপন করিয়াছে। "মহুয়া"র কোনও কোনও কবিতায় এই মানবিক কামনার আভাস বর্তমান, দেহভাবনার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন, আভাসে ব্যঞ্জনায় যৌনাবেদন উপস্থিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবির শুদ্ধ, সংযত, আচারনিষ্ঠ ভাব-কল্পনা কোথাও তাহাকে দেহকামনার লীলার মধ্যে পদক্ষেপ করিতে দেয় নাই।

এই প্রণয় কবিতাগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। নরনারীর প্রণয়-লীলায় নারীর যে মূর্তি কবির ভাবকল্পনায় রূপ লইয়াছে সে-নারী অবশ, নর-নির্ভরা, কামনা-কোমলা, প্রেমাবলুণ্ঠিতা নারী নয়; তার প্রণয়ে হীন ভিক্ষাবৃত্তি অথবা দীনাত্মার কাতর আকুলতার স্থান কোথাও নাই। এই প্রণয়-লীলা বলিষ্ঠ সংগ্রাম-তৎপর, সত্য ও সাহস-প্রতিষ্ঠ। 'উজ্জীবন' নামে গ্রন্থারম্ভেই যে কবিতাটি তাহার পুরাণ-কাহিনীতে কবি যে নূতন অর্থের ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার অবলম্বনে প্রণয়-লীলার এই বলিষ্ঠ ভাবকল্পনা সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।

পুষ্পধনু মনসিজ একদা সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর ক্রোধপঞ্চশরে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত সৃষ্টি-প্রেরণার মূলে হইতেছেন মনসিজ; তাঁহার বিনাশের অর্থ সৃষ্টিরই বিনাশ। কাজেই কবি সেই অতনু মনসিজকে আহ্বান করিতেছেন ভস্ম-অপমান ছাড়িয়া উজ্জীবিত হইতে; কিন্তু মনসিজের পুরাতন পৌরাণিক রূপে কবি তাঁহার উজ্জীবন কামনা করেন না। তিনি কামনা করেন, যাহা স্থূল, যাহা মূঢ়, যাহা রূঢ় তাহা ভস্মের মধ্যেই পড়িয়া থাকুক, যাহা অমৃত, যাহা অবিস্মরণীয় তাহাই উজ্জীবিত হউক।

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি,
অমৃত সে মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ,
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।

মিলনেরে করুক প্রখর
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।
* * * *
দুঃখে সুখে বেদনার বন্ধুর যে-পথ,
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ
তিমির তোরণে রজনীর
মন্দ্রিবে সে রথচক্র নির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো, পুষ্পধনু
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু

তারপর এই ধুয়া চলিয়াছে প্রায় প্রত্যেকটি প্রণয় কবিতায়—

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে।
* * *
উড়াবো ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথমাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে। ('নির্ভয়'

যাবোনা বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী,
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লবো একদিন
* * *
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,—
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার। ('সবলা')

সেবা কক্ষে করিনা আহ্বান ;—
শুনাও তাহারি জয়গান
যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত। ('প্রতীক্ষা')

কিন্তু আর দৃষ্টান্ত উল্লেখের প্রয়োজন আছে কি ? প্রণয়-লীলার নানা পরিবেশ নানা অবস্থা নানা অনুভূতির ভিতর কবি এই কথাটাই "মহুয়া"র অধিকাংশ কবিতায় নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু প্রেম-কল্পনার অন্য পরিচয়ও "মহুয়া"র কয়েকটি কবিতায় আছে, যেমন 'বিদায়' বা 'পথের বাঁধন' শীর্ষক কবিতায় এবং আরও কয়েকটি কবিতায়। এই কবিতাগুলির কয়েকটি বিশেষভাবে "শেষের কবিতা" কাব্যোপন্যাসের জন্য লেখা হইয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে "মহুয়া"র অধিকাংশ কবিতার ভাব-প্রসঙ্গের আত্মীয়তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয়, অনুভূতির তীব্রতায় ও মাধুর্যে, প্রণয়-লীলার সহজ রূপে ও রহস্যে এবং বিষয়গত বক্তব্যের আপেক্ষিক অনুপস্থিতিতে এই কবিতাগুলি একটু অন্য গোত্রের, এবং অধিকতর রসদীপ্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে, কবির সুবিখ্যাত দুটি গানের আদি ভাবরূপ "মহুয়া"র দুটি কবিতায় পাওয়া যায়। 'বরণডালা' কবিতার 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার অঙ্গমাঝে' এবং 'উদ্ঘাত' কবিতায় 'অজানা জীবন বাহিনু, রহিনু আপন মনে,' পরে যথাক্রমে 'আমায় ক্ষম হে ক্ষম, নমো হে নমঃ' এবং 'জানি তোমার অজানা নাহিগো, কী আছে আমার মনে' শীর্ষক দুটি সুবিখ্যাত গানে রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

"মহুয়া"র ঠিক দুই বৎসর পর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে "বনবাণী" প্রকাশিত হয়। "বনবাণী" এই নিসর্গবিশ্ব এবং উদ্ভিদপ্রাণীর প্রশস্তি-কাব্য। এই কাব্যে কবির চিরপুরাতন অথচ চিবনবীন ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ গভীর নিসর্গবোধ এবং বিশ্বমৈত্রী ও করুণা নানারূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার বস্তু ও ভাবপ্রসঙ্গ চারিটি ভাগে বিন্যস্ত। প্রথমভাগে আরণ্যক পশুপক্ষী ও তরুলতার প্রশস্তি; এই ভাগের সবই কবিতা। দ্বিতীয় ভাগ 'নটরাজ ঋতুরশঙ্গালা'য় মুক্তি, যৌবন ও চিরনবীনতার বন্দনা। এক একটি ঋতু বিশ্বের এক এক নূতন রূপ, ঋতুগুলি নৃত্যপীঠ; এই নৃত্যপীঠ চিরনূতন; পুরাতনকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া উড়াইয়া দেওয়াই তাঁহার ধর্ম। "নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হ'য়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হ'তে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকাশের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে সব বন্ধন মুক্ত হয়। কবির অতি পুরাতন এই বাণী, যে-বাণী আমরা বারবার শুনিয়াছি "বলাকায়", "শারদোৎসবে", "ফাল্গুনী"তে, অসংখ্য কবিতায়, গানে, নিবন্ধে বক্তৃতায়; তবু সেই পুরাতন বাণীকেই কবি বার-বার নূতন রূপে ও রসে, নূতন রহস্যে আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করেন। "নটরাজ" পালা গান; সুতরাং ইহার অধিকাংশই গান; কয়েকটি রস-সমৃদ্ধ কবিতাও আছে। তৃতীয়ভাগে 'বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব'; এক্ষেত্রেও বস্তুপ্রসঙ্গ এক। একদিকে বৃক্ষপ্রশস্তি, আর একদিকে ঋতু বন্দনা। চতুর্থ ভাগ 'নবীন' গীতিনাট্যে বসন্তবন্দনা, যাহার অর্থ চিরনূতন ও চিরযৌবনেরই বন্দনা। এই দুই বিভাগেও অধিকাংশই গান, কয়েকটি কবিতাও আছে।

"বনবাণী" গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন,

"আমার ঘরের আশে পাশে যে-সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষা,—তার কোন স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে। * * * আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবিতিষ্ঠত্যেবঃ। শুনেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? * * * সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে? * * *

উদ্ধৃত মন্তব্য হইতেই বুঝা যাইবে কবির দৃষ্টিতে নিসর্গ-ভাবনা কিছুতেই জড় প্রকৃতির ভাবনা মাত্র নয়। বস্তুত কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রকবিমানস প্রকৃতিকে দেখিতে শিখিয়াছিল মানবিক চেতনার দৃষ্টি দিয়া, মানবীয় অনুভূতির ব্যঞ্জনা নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া। এ বিষয়ে কবি বিহারীলাল, ইংরেজ রোমান্টিক কবিগোষ্ঠী এবং সংস্কৃত কবিকুল তাঁহাকে যে-দৃষ্টি দান করিয়া গিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে কখনও তাহা বিস্মৃত

হন নাই। বস্তুত নিসর্গের এই পরিচয় ক্রমশ গভীরতর হইয়াছে, এবং সর্বশেষে এক গভীর আধ্যাত্মিক সত্তার সমন্বয়ের মধ্যে কবি নিসর্গ-বিশ্বের এক নূতন অর্থগভীর পরিচয় লাভ করিয়াছেন। "বনবাণী"র নিসর্গ-বন্দনার কবিতাগুলিতে সেই পরিচয় সুস্পষ্ট। কিশোর কাব্য-প্রচেষ্টার নিসর্গ-বর্ণনা, "সোনার তরী"র নিসর্গ-সম্ভোগ, "চিত্রা"র নিসর্গ-জিজ্ঞাসা ক্রমশ "বলাকা-পুরবী"র গভীর অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়া নূতন অর্থনির্দেশে সমৃদ্ধ হইয়া "বনবাণী"তে ঔপনিষদিক সমন্বয় লাভ করিয়াছে; তাহার ভিতর জীবেতিহাসের আদিমতম ভাষার, প্রাণের প্রথমতম পরিচয়ের, যুগ যুগান্তরের সুপ্রাচীন ইতিহাসের যে-বিস্ময়, যে রহস্য, সেই বিস্ময় ও রহস্য "বনবাণী"র কয়েকটি সার্থক কবিতায় বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। দুর্লভ মুহূর্তেই কেবল মানুষ বৃক্ষ-বন-অরণ্যের লতা-ফুল-ফলের বাণী শুনিতে পায়; এবং ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ মনন-কল্পনাতেই শুধু সেই বাণী রূপ লইতে পারে। "বনবাণী"র শুধু হ্রস্ব ও দীর্ঘ কবিতাগুলিতেই যে সেই রূপ বাঁধা পড়িয়াছে এমন নয়, অনেকগুলি সার্থক গানেও।

"বনবাণী"র কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে একটা কথা বারবার মনে জাগে; রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যত্রও এ-প্রশ্ন মনকে অধিকার করে, তবু "বনবাণী" যেন এ-প্রশ্নটিকে একেবারে ঠেলিয়া সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। রবীন্দ্রনাথের কল্প-দেবতা কি শিব? আমাদের পুরাণ ঐতিহ্যে ধূর্জটি, নটরাজ, মহাকাল, ভৈরব প্রভৃতি বিচিত্র নামে যিনি পরিচিত এবং যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের ভারতীয় মানসে নাট্য ও নৃত্য, ঋতু ও কাল, জীবন ও মৃত্যু, ইহকাল ও পরকাল, সৃষ্টি ও প্রলয় প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচিত্র প্রত্যয়-ভাবনা আবর্তিত, গঠিত ও সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই নটরাজ শিবই কি কবির কল্পদেবতা? যে শিব রুদ্র, যিনি ভয়াল, যিনি আমাদের জীবনকে নিত্য নূতন বিপদের বিস্ময়ময় অগ্নি-পরীক্ষায় আহ্বান করেন, যিনি সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী, যিনি দক্ষবিতাড়িত শ্মশানচারী অনার্য তাপস, যিনি একদিকে সতীর প্রেমে উন্মত্ত, অন্যদিকে হিমালয় দুহিতা উমা যাঁহার প্রেমের কাঙাল, যিনি আবার কল্যাণ ও মঙ্গলের, গভীর গম্ভীর রস ও সৌন্দর্যের, রূপ ও রহস্যের আধার সেই বেদ-ভারত-পুরাণকীর্তিত ভোলা মহেশ্বরের সমন্বিত ঐতিহ্য-কল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনন-কল্পনাকে কী গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের আর কোনও দেব-দেবী কল্পনাই এমন গভীর ভাবে এমন সর্বতোভদ্র সমগ্রতায় রবীন্দ্র-চিত্তকে স্পর্শ করে নাই। বাংলার মাটিতে বাংলার আকাশ-বাতাসের মধ্যে বর্ধিত রবীন্দ্রচিত্তে রাধাকৃষ্ণের ঐতিহ্যকল্পনা মূল প্রসারিত করিতে পারিল না, লক্ষ্মী বা সরস্বতী বিশেষ আমল পাইলেন না, বিষ্ণু ব্রহ্মা অবজ্ঞাতই রহিলেন, এ-তথ্যের বিস্ময় সংস্কৃতির ইতিহাসে অবজ্ঞা করিবার মতন নয়। একথা অবশ্য সত্য যে, নটরাজ শিব-মহেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় ঐতিহ্যকল্পনার যে-সমৃদ্ধি,আর কোন দেবদেবী সম্বন্ধেই সে-সমৃদ্ধির কথা বলা যায় না; ভারতীয় মানস আর কোনও দেব-দেবী অবলম্বন করিয়া কল্পনার এতটা প্রসারতা বা গভীরতা লাভ করে নাই। নরতত্ত্ব এবং জাতিতত্ত্বের মধ্যে ইহার কারণ অনেকাংশে নিহিত সন্দেহ নাই, কিন্তু এ-প্রসঙ্গে সে-ইতিহাস আলোচনা অবান্তর। জ্ঞাতব্য তথ্য এইটুকু যে, রবীন্দ্রচিত্তে এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য-কল্পনার প্রসার সুস্পষ্ট, এবং এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রাচীন যুগের কবিদের এবং মধ্যযুগের বাংলা লোক-কাব্যের লেখকদের মনন-কল্পনার আত্মীয়তা অনস্বীকার্য। তবে রবীন্দ্রনাথের মনন-কল্পনা আরও গভীর, ব্যাপক ও সমৃদ্ধ।

পূর্বোক্ত উক্তি বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না; ইহার প্রমাণ রবীন্দ্রকাব্যে ইতস্তত

বিক্ষিপ্ত। এ তথ্য কিছুতেই মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয় যে, যেখানেই নিসর্গের রুদ্র ভয়ংকর রূপের বা রুক্ষ বৈরাগী নিঃস্ব ধূসর তপস্যার রূপের কল্পনা, যেখানেই কালের আবর্তন বিবর্তন লীলার কল্পনা, ঋতু পরিবর্তনের কল্পনা, যৌবনের রুদ্র বিপ্লবী রূপের কল্পনা, প্রেমের ও সৌন্দর্যের গভীর গম্ভীর লীলারহস্যের কল্পনা, সেইখানেই রবীন্দ্রমানস আশ্রয় করিয়াছে শিবের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে। প্রেমসাধনার মধ্যে যে তপস্যার রূপ এবং যে-রূপের প্রতি রবীন্দ্রমানসের অনুরাগ সুস্পষ্ট, তাহাও ত রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করিয়াছেন—যেমন করিয়াছিলেন কালিদাস—ভারত-পুরাণধৃত মহেশ্বরের ঐতিহ্য হইতে। হিমালয়ের এবং তাহারই পটভূমিকায় শিব ও উমার যে গভীর গম্ভীর কল্পনারূপ রবীন্দ্রকাব্যে থাকিয়া থাকিয়া আভাসে ইঙ্গিতে উপমায় ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহারও মূলে ঐ শিবায়ন। আর, ঋতুরঙ্গশালার যাহা কিছু উৎসব, নৃত্যেগীতে নাট্যভঙ্গিমায় মহাকালের যে ছন্দরূপ, তাহা ত একান্তই দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজ শিবের কল্পনা ঐতিহ্যগত; চিত্তাকাশই (চিদম্বরম্) ত মহাকালের নৃত্যলীলার যথার্থ পাদপীঠ, এবং এই কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই ত রবীন্দ্র-মনন-কল্পনাও প্রসারিত হইয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু শিব-ঐতিহ্য আত্মসাৎ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি তাহাকে নিজস্ব মনন-কল্পনায় সমৃদ্ধও করিয়াছেন। "পূরবী"র 'তপোভঙ্গ' কবিতায় অথবা ঋতুরঙ্গশালার গানে ও কবিতায়, "বনবাণী"র এক একটি কবিতায় যে শিব-ঐতিহ্য একটি অখণ্ড সমন্বিত রূপে ধরা পড়িয়াছে তাহার অনেকখানি বেদ-ভারত-পুরাণবহির্ভূত। অনেকক্ষেত্রেই কবি প্রাচীন ঐতিহ্যকে প্রসারিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নূতন অর্থনির্দেশ করিয়াছেন, নূতনতর ব্যঞ্জনায় তাহাকে আরও গভীরতা ও ব্যাপকতা দান করিয়াছেন। এক কথায় বলা চলে, আজিকার দিনে আমরা যে শিব-নটরাজ ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়াছি তাহাতে রবীন্দ্রনাথের দান তুচ্ছ করিবার মতন নয়।

দশ

রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন প্রায় মধ্যগগন স্পর্শ করিয়াছে তখন বাংলাদেশে নূতন স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধের প্রথম অরুণোদয়; আর যখন সেই প্রতিভা-সূর্য অস্তমিত হইল তখন সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া ধন ও রাজ্যলোভে বিভ্রান্ত, প্রভুত্বমদে মত্ত নরমাংসলুব্ধ শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ির উন্মত্ত নৃত্য চলিয়াছে। কাল সমুদ্রের এই দুই বিন্দুর মাঝখানে বিচিত্র ভাব ও আদর্শে বিক্ষুব্ধ, বিচিত্র চিন্তা, স্বপ্ন ও কল্পনায় লীলাচঞ্চলিত বাংলাদেশের একটি সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল অধ্যায় বিধৃত হইয়া আছে। যে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার সৃষ্টির মধ্যে এই সুদীর্ঘ অধ্যায়টি সমগ্ররূপে একটি অখণ্ডতায় ধরা পড়িয়াছে সে-প্রতিভার অধিকারী একক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। বস্তুত, বাংলাদেশের গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস রবীন্দ্র-কবিমানসের প্রকাশ ও পরিণতির ইতিহাস; রবীন্দ্রনাথ ত একক একজন নহেন, একটি ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান বলিলেও তাঁহাকে কম করিয়া বলা হয়। তিনি একাই একটি যুগ, এবং এই যুগটির ধর্ম ও প্রকৃতি, রূপ ও রহস্য সমস্তই রবীন্দ্র-মানস-প্রকাশের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে একটি অখণ্ড সমগ্রতায়। এই অর্ধ শতাব্দীর একপ্রান্তে গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত, সংকীর্ণ স্বল্পপরিসর গ্রাম্যজীবনমুখর, গীতি ও কল্পনাসমৃদ্ধ বাংলার বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র; ইহার অন্তপ্রান্তে কোলাহল মুখর, গর্বোদ্ধত, আত্মশক্তিতে দৃঢ় ও সচেতন, সংগ্রাম বিক্ষুব্ধ সুবিস্তৃত

সাম্প্রতিক পৃথিবী। অগণিত ভাব ও চিন্তাবৈচিত্র্যে বিপর্যস্ত এই দুস্তর কালসমুদ্রের খণ্ড খণ্ড রূপ ও অংশকে একটি অখণ্ড সমগ্ররূপে এমন করিয়া সৃষ্টির মালায় গাঁথিয়া তোলার সৌভাগ্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশি নাই।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য-পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল কলিকাতায়, যে-কলিকাতা তখন বিদেশী ধনিক-রাষ্ট্রের প্রভুত্বের আওতায় কেবল বর্তমান রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার প্রতিভার যৌবনোন্মেষ ঘটিল বাংলার সমতলক্ষেত্রে ক্ষীয়মাণ পল্লীসমাজের ছায়ায়, এবং কতকাংশে নগর-নির্ভর, নূতন ও অগ্রসর মধ্যবিত্ত-সমাজের উজ্জ্বল কিরণপাতে। তারপর, পঞ্চাশোর্ধ্বে তিনি পদক্ষেপ করিলেন বৃহত্তর পৃথিবীর আঙ্গিনায় যেখানে ইতিমধ্যেই উনবিংশ শতকের শেষপাদ এবং বিংশ শতকের প্রথম যুগের বিচিত্র ও গভীর সমাজ-মানসের চঞ্চল জীবন-নাট্যের অভিনয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের এই ইতিহাসের মধ্যে বাংলাদেশের সমাজ-মানসের ইতিহাসের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। এই সুদীর্ঘ ব্যক্তি-ইতিহাসের, আর বাংলার নগর-নির্ভর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর পৃথিবীর প্রবহমাণ জীবনধারার যোগ এবং বাঙালীর সমগ্র জীবনে পরদেশী ধনিকরাষ্ট্র-বাহিত বৃহত্তর পৃথিবীর জীবনধারার অসংখ্য শাখা-প্রশাখার বিস্তার—এ-দু'এর মর্মবাণী ও ঐতিহাসিক ইঙ্গিত একই। এই উভয়ই রবীন্দ্র-মানসপ্রকাশের ভিতর একটি অখণ্ড ঐক্যে রূপায়ন লাভ করিয়াছে, এবং এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে একটি দেশ ও কালের মানস-প্রতীক, পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসে তাহার তুলনা খুব বেশি নাই। গত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলাদেশে ছোটবড় এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, এমন কোন ভাব, কল্পনা বা চিন্তার রশ্মিপাত হয় নাই, যাহা রবীন্দ্রচিত্তকে কোন না কোন ভাবে স্পর্শ করে নাই; বস্তুত আমাদের মানসজীবনের সকল দিক ও সকল স্তর তাঁহার প্রতিভার মায়াস্পর্শে ত্বরান্বিত ও রূপান্বিত হইয়াছে, তিনিই আমাদের গভীরতর সমাজ-মানসকে প্রকাশ করিয়াছেন। পদ্মা-ভাগীরথীর পলিমাটি হইতেই তিনিই গড়িয়া তুলিয়াছেন যাহাকে বলি আমরা বর্তমান বাংলাদেশ। বিগত পঞ্চাশ ষাট বৎসরে বাঙালীর সজাগ চিত্তে স্বদেশ ও পৃথিবীর যত তরঙ্গাঘাত লাগিয়াছে রবীন্দ্রনাথের সুবিস্তৃত সাহিত্যে, রবীন্দ্র-মহাভারতে সে আঘাত কোন না কোন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটি স্তর কখনও পরবর্তী স্তরে বিবর্তিত হইয়াছে, কখনও পরবর্তী স্তর বা স্তরগুলির ভিতর দিয়া দূরতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; কখনও অতীত ও বর্তমান একই স্তরে একীভূত হইয়া ভবিষ্যতের সমন্বয়িত রূপের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছে, এবং সকল স্তর একত্র গ্রথিত হইয়া একটি অখণ্ড চলমান রূপ রচনা করিয়াছে। বস্তুত রবীন্দ্র-কবিজীবন গতির চাঞ্চল্যে প্রাণবান, তিনি চিরপথিক, অবারণ তাঁহার বিরামহীন গতি; সে-গতি মৃত্যুতে শুধু আসিয়া থামিল। থামিলই বা বলি কেন, রবীন্দ্রনাথ ত বারবার বলিয়াছেন, সৃষ্টির এই গতি মৃত্যুতেও আসিয়া থামে না, মৃত্যুস্নানে শুচি হইয়া জীবন নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের ঋষিকবি ও কবিঋষিরাও ত এই কথাই না বলিয়াছেন! কিন্তু সে যাহাই হউক, রবীন্দ্র-কবিমানসের এই সচেতন গতিধর্ম, সহজ প্রাণবান প্রাগ্রসরতার ধর্ম, এ-ধর্ম সহজে রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় না; বিশেষ করিয়া তাঁহার কাব্য যখন আমরা খণ্ড খণ্ড রূপে পাঠ করি; খণ্ডিত দৃষ্টি ও অনুভূতির রূপে ও রসে যখন ডুবিয়া যাই তখন সেই অখণ্ড সমগ্র রূপ এবং তাহার সচেতন প্রাণবান গতিধর্ম আমাদের দৃষ্টি ও মন এড়াইয়া যায়।

রবীন্দ্র-মানস-প্রকাশের কোন পর্বেই এই সচেতন প্রাণবান গতিধর্ম অনুপস্থিত নয়;

তিনি ত চিরকালই কালের রথের রথী। এই প্রাণবান গতিধর্ম কৈশোরের "প্রভাত-সংগীতে"ও যেমন স্বপ্রকাশ, ঠিক তেমনই স্বপ্রকাশ পরিণত বয়সের "বলাকা" ও "পূরবী"তে, এমন কি মধুর ও কোমল "মহুয়া"তেও। এই গতিধর্মের রূপ সর্বত্র এক নয়, একথা সত্য, তবে সর্বত্রই ইহার রূপ প্রকাশ পাইয়াছে জীবনের এমন একটা গভীর তরঙ্গাঘাত হইতে যাহা উপরকার লীলাচাঞ্চল্যকে অনেক সময় আবৃত করিয়া রাখে শিল্পের ও সৌন্দর্যেরই প্রয়োজনে। জীবনের এই প্রাণবান গতিধর্ম, গভীরতম স্তরের লীলাচাঞ্চল্যকে কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কখনও ভাবমুগ্ধ বিস্ময়ের স্বপ্নবিহ্বলতায়, কখনও আদর্শলোকের ঊর্ধ্বমুখী কল্পনায়, কিন্তু তাঁহার একান্ত গীতধর্মী কবিতা কিংবা সাংকেতিক নাট্যেও তাঁহার বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টি অথবা আদর্শবাদী কল্পনা তাঁহাকে কখনও মাটির ধরণী এবং ধরণীর মাটি দিয়া গড়া মানুষের বস্তুমূল হইতে একেবারে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করে নাই। 'জন্ম-রোম্যান্টিক' রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্সের প্রকৃতি সত্যই একটু ভিন্ন ধরনের। বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে এক ধরনের চেতনা তাঁহার বহুদিনই ছিল, কিন্তু এই বস্তু-প্রকৃতির চেতনায় সচেতন ঐতিহাসিক বোধের স্পর্শ পাইতে এবং ঐতিহাসিক চেতনা দ্বারা তাহাকে সমৃদ্ধ করিতে কবিকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল পরিণত বয়স পর্যন্ত। বস্তুত তাঁহার পরিচয় আমরা পাইলাম কবিগুরুর সত্তর বৎসরের পর, শেষের দশ বৎসরের রচনায়। স্বাধীন ও অনেকাংশে সংস্কারমুক্ত অথচ বোধ ও বুদ্ধির গভীর অনুশাসন দ্বারা শাসিত মন রবীন্দ্রনাথের অনেকদিনই ছিল, কিন্তু যে মুক্ত বিশুদ্ধ মানুষ পরিস্রুত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সৃষ্টিরহস্য, মানব-প্রগতির রহস্য দেখিতে পায় সে-দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ অর্জন করিয়াছিলেন জীবনের শেষ দশটি বৎসরে। কবিজীবনের শেষ দশটি বৎসর একটি নূতন অধ্যায়,—নূতন, কিন্তু পুরাতন প্রবহমান জীবনধারার প্রাক্তন অধ্যায়গুলি হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত নয়, তাহাদের সঙ্গে ভিতরকার ঐক্যসূত্রে গাঁথা, একটু অন্য ভাবে বলিতে গেলে বলা যায়, নূতন অধ্যায়টি পুরাতন অধ্যায়গুলিরই পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপ, কার্যকারণ সম্বন্ধে গাঁথা জীবনপ্রবাহের পূর্ণ ঐতিহাসিক রূপ।

কয়েকটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০'এ রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়া ঘুরিয়া আসিলেন, এমন সময়ে যখন সমস্ত পৃথিবী নিদারুণ অর্থ দৈন্যে পীড়িত; ভারতবর্ষও এই পীড়া হইতে বাদ পড়ে নাই। ১৯৩১'এ প্রকাশিত হইল "রাশিয়ার চিঠি" যাহাতে কবিগুরুর মনের ও মননের গতি স্বপ্রকাশ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই বৎসরেই আমরা দেখিলাম ভারতবর্ষে দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থ পরিণতি, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ জুড়িয়া সাম্রাজ্যবাদের নিষ্করুণ অত্যাচার ও অবিচারের সূত্রপাত, ব্যক্তিস্বাধীনতা বিলোপের প্রচেষ্টা। সাম্প্রতিক সোভিয়েট রাশিয়ার পটভূমিতে দেশের এই নিঃস্ব ও নিঃসহায় অবস্থা যেন আরও বেশি প্রকট হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া, ইহার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্গতি ত ছিলই। এই দারুণ দুর্গতির মধ্যেও দেশের আনাচ কানাচ হইতে এক নূতন বাণীর, নূতন যুগাদর্শের, মানবতার এক নূতন আদর্শের ক্ষীণ ও অস্পষ্ট আহ্বান মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছিল। এমন সময়ে ১৯৩৬ ও আর একবার ১৯৩৭'র লক্ষ্ণৌ ও ফয়জাবাদের সভাপতিমঞ্চ হইতে জবাহরলাল নেহ্‌রু সেই ক্ষীণ অস্ফুট আহ্বানকে স্পষ্ট বাণীরূপ দান করিয়া তাহার কর্মরূপের মধ্যে সমস্ত দেশকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু দু'দিন যাইতে না যাইতেই সরকারী ও বেসরকারী নিষ্পেষণ যন্ত্র রাজপথে নামিয়া গেল, এবং সকল প্রকার প্রগতিবাদী দল ও আন্দোলনগুলির কণ্ঠ ও হস্তরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত এই দল ও আন্দোলনগুলি অযথা চীৎকার ও বাগ্‌বিস্তারে নিজেদের শক্তিও ক্রমশ হারাইয়া

ফেলিতে আরম্ভ করিল। বিদেশে, ১৯৩৬'এ ফ্যাসিস্ট ইতালি অতর্কিতে দুর্বল হাবসীদের গ্রাস করিল, এবং দর্পোদ্ধত জাপান মুক্তিসংগ্রামরত চীনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র য়ুরোপ জুড়িয়া আর্থিক ও রাষ্ট্রিক মুক্তির নীতি ও আদর্শ একেবারে নিম্নতম স্তরে নামিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে শক্তির নিষ্ঠুর দন্তপংক্তি মানবতার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। কবির একতম ভালবাসার পাত্র প্রিয়তম মানুষের পায়ের শৃঙ্খল আরও কঠিন হইয়া বাঁধা পড়িল; যে-মানবতার বেদী ছিল কবির পুজা-নৈবেদ্যের একতম বেদী সেই বেদী হইল সর্বত্র ধূলিবিলুণ্ঠিত। এবং সর্বশেষে, ১৯৩৯'এ মানুষ এবং মানবতার ভবিষ্যৎ নিক্ষিপ্ত হইল ধ্বংস ও মৃত্যুর ঘূর্ণীচক্রে।

পৃথিবীর এই দৃশ্যপট যখন মনের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল সেই সময়ই অন্যদিকে কবির মনের মধ্যে ছায়াপাত করিতেছে মৃত্যুর অস্পষ্ট অগ্রসরমান মূর্তি; জীবন মোহানার পার হইতে মৃত্যুদূতের ক্ষীণ পদধ্বনি কানে আসিয়া বাজিতেছে। ১৯৩১'এ তিনি সত্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, দেশ জুড়িয়া রাজকীয় সমারোহে তাঁহার জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ১৯৩৭'এ কবি হঠাৎ নিদারুণ রোগে আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু কঠিন সংগ্রামের পর বাঁচিয়া উঠিলেন এবং সুপক্ক পরিণত জীবনের শক্তি ও দীপ্তি খানিকটা ফিরিয়া পাইলেন। ১৯৪০'এ মৃত্যুর সঙ্গে নিদারুণ সংগ্রাম আবার আরম্ভ হইল, সুদীর্ঘ কয়েক মাস শুধু আত্মার অপরাজেয় শক্তিতে তাহার সঙ্গে যুঝিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানিয়া জয়ী হইয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। কিন্তু এই দশ বৎসর ক্রমশই তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন, মৃত্যু শুধু তাঁহার জীবনেই আসিতেছে না, মৃত্যু তাহার সমস্ত মারণ-যন্ত্র ও দলবল লইয়া অগ্রসর হইতেছে এই ধ্বংসোন্মুখ মানবধর্মবিরোধী সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থার অন্তিম শয্যার দিকেও। অথচ এই সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থাকেই একদিন তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন, স্বীকার একদিন করিয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে, ইহার ভিতর হইতেই একদিন চিরন্তন মানবধর্ম হইবে জয়ী, মানুষ তাহার মুক্তি অর্জন করিবে।

এই ছিল মানুষ ও পৃথিবীর প্রবাহ যাহার তরঙ্গ আসিয়া প্রতি মুহূর্তে আঘাত করিতেছিল কবির চিত্ততটে; ইহার প্রত্যভিঘাত কি ভাবে কবির মন ও কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, কি ভাবে ইহাদের প্রকাশকে বাণীরূপ দান করিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে কবির দশ বৎসরের রচনায়। স্পর্শালু কবিচিত্তের মণিকোঠায় বিশ্ব-জীবনের বিচিত্র তরঙ্গাঘাত কত সূক্ষ্ম-লীলায় কত বিচিত্র রূপান্তর গ্রহণ করে তার বহুল পরিচয় এই রচনাগুলিতে পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এই রূপান্তরের ধর্ম ও প্রকৃতি যদিও একান্ত ভাবে অদ্বৈতাচারী, এবং প্রকাশ একান্ত ব্যক্তিগত, তাহা হইলেও ইহার ভিতর গত দশ বৎসরের সমাজ-মানসের সমগ্রতার পরিচয়ও সমান প্রত্যক্ষ।

প্রত্যভিঘাতের রূপগুলিও সহজ ও সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের ও পৃথিবীর তিনপুরুষের ইতিহাস তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি সবই দেখিয়াছেন, সবই জানিয়াছেন, দেখিয়াছেন ও জানিয়াছেন কবির দৃষ্টি ও মন দিয়া যে-দৃষ্টি ও মনের কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়, কিছুই অধরা নয়। যত কিছু মহৎ আদর্শ ছিল তাঁহার প্রিয়, পরিপূর্ণ মানবতার যে-আদর্শ তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন সমগ্র জীবনের সাধনা দিয়া, পরিণত বয়সে জীবনের সায়াহ্নে তিনি দেখিলেন সব ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়া মাটির ধূলায় লুটাইতে। বিগত দিনের স্মৃতি শুধু নিদারুণ লজ্জা ও অপমানের স্মৃতি। নিজের দেশেও যে দৃশ্য চিত্তপটে ভাসিয়া উঠিল তাহাতেও গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্য ছাড়া অন্তরে আর কোন অনুভূতি উদ্রিক্ত হইবার কথা নয়। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ কি দুঃখে অভিভূত হইলেন, নৈরাশ্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলেন? মানুষের প্রতিবিশ্বাস ও ভালবাসা কি তাঁহার চলিয়া গেল? মানবের অপরাজেয় বীর্যে বিশ্বাস, তাঁহার ঐতিহাসিক পরিণতিতে অপরিমেয় বিশ্বাস কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল? না, তাহা হইল না, একেবারেই হইল না। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই দুঃখবাদী ছিলেন না, অবিশ্বাস তাঁহার কোনদিনই ছিল না। সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ নিঃশেষে আহরণ করিয়া নিরাসক্ত মন লইয়া, শান্ত পরিণত মানস লইয়া স্বচ্ছ গভীর দৃষ্টি লইয়া মৃত্যুর তোরণে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন; এই স্বচ্ছ পরিণত দৃষ্টি সর্ব আবরণ-মুক্ত মানুষকে তাঁহার চিত্তের নিকটতর করিয়াছে, জীবনের বিচিত্র ও গভীর অভিজ্ঞতা জীবনেরই গভীরতর অর্থ ও মহিমা তাঁহাকে জানাইয়াছে। মৃত্যু তাঁহার জীবনে ঘনাইয়া আসিতেছিল, শেষ খেয়ার জন্য তিনি বহুদিনই প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তিনি পাড়ি দিবার জন্য উন্মুখ ছিলেন না, যে-পৃথিবীকে তিনি ভালবাসিতেন, যে-মানুষের মধ্যে তিনি অন্তরের শান্তির উৎসকে জানিয়াছিলেন তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার এতটুকু ঔৎসুক্যও তাঁহার ছিল না। সেই জন্যই মানুষে গভীর বিশ্বাস কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই, তাঁহার দেশের ও পৃথিবীর লোকদের উপর বিশ্বাস কখনও তিনি হারান নাই। ধ্বংস ও মৃত্যু শাশ্বত মানুষের পরিণতি হইতে পারে না; যে-মানুষ কর্ম ও সংগ্রামে রত, 'যে-মানুষ মাটির কাছাকাছি,' যে-মানুষ তাহার পরিবেশের সঙ্গে একাত্মায় যুক্ত, সেই সাধারণ মানুষের ধ্বংস নাই। আর যে-মানবতার আদর্শ সমাজ-ইচ্ছার প্রতিরূপ, যে-মানবতা বস্তুকে অনুরূপ ইচ্ছায় রূপান্তরিত করে সেই আদর্শের মৃত্যু নাই। রবীন্দ্রনাথ সেই শাশ্বত সাধারণ মানুষের সঙ্গে, সেই বৃহৎ মানবতার আদর্শের সঙ্গে চিত্তের ও কল্পনার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তাহারা তাঁহার কাছে বিনিময়ে মন ও হৃদয় উন্মুক্ত করিয়াছিল যাহার ফলে কবিগুরুর চিত্তে মানুষ ও মানবতার ঐতিহাসিক বোধ জন্মিয়াছিল। কবি যে তাঁহার পরিণত বয়সে বারেবারে মানুষের সাধারণ জীবনের মধ্যে, প্রাত্যহিক জীবনের সহজ সমতল ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার আবর্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন, যে সাধারণ মানুষ খেলা করে, ভালবাসে, খাটে ও গান গায়, প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে হাসে ও কাঁদে, তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহা কিছু অকারণে নয়। ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা, রাজ্য ভাঙ্গাগড়া, বড় বড় বীর ও সম্রাটদের, বড় বড় নেতাদের মধ্যে যে তাঁহার কল্পনা এই যুগে প্রসারিত হয় নাই, হইয়াছে অত্যন্ত সাধারণ জীবনের মধ্যে, ইহার ইঙ্গিতও নিরর্থক নয়। বস্তুত সাধারণ মানুষের অফুরন্ত শক্তি ও যৌবনেই তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস; সাধারণ মানুষই যৌবন ও প্রগতির একমাত্র উৎস বলিয়া জানিয়াছেন। পৃথিবীর শক্তি ও যৌবন ত এই সাধারণ মানুষের মধ্যেই বিধৃত হইয়া আছে, যে মানুষ মাটি ভাঙিয়া চাষ করে, যে-মানুষ বার মাস খাটে, যে-মানুষ চির-পথিক, যে-মানুষ আপন শক্তি ও বীর্যে বাঁচে অথবা মরে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন হয় অবিশ্বাসী ও রক্ষণশীল; রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হইয়াছে ঠিক বিপরীত। গভীরতর অর্থে মানুষ ও পৃথিবীকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই এই অবাঞ্ছিত পরিণতি হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন। পৃথিবীর যে-সভ্যতা ও সংস্কৃতির তরঙ্গ-পর্যায়ের মধ্যে তিনি দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন, সে-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বংস যে আগাইয়া আসিতেছে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং তাহার সম্পূর্ণ অর্থও ভাল করিয়াই জানিতেন। এই জ্ঞান যে-কোন মানুষের বিশ্বাসের ও ভালবাসার ভিত্তিভূমিকে টলাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু

রবীন্দ্র-মানস পরিণত বয়সে এমন এক ঐতিহাসিক বোধের অধিকারী হইয়াছে যাহার বলে কবি জানিয়াছেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন একটা বিশেষ পর্যায়ের ধ্বংস শাশ্বত মানবাত্মার যাত্রাপথে একটি ছেদ মাত্র, নূতন সভ্যতার নবজন্মের একটি বেদনাপর্ব মাত্র। ধ্বংস ও মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়মেই আসে স্বাভাবিক কারণেই, মানুষই তাহাকে ডাকিয়া আনে; আবার নূতন স্বপ্নাদর্শ, নূতন সভ্যতা সৃষ্টির অধিকার এবং শক্তিও শুধু মানুষেরই আছে। এই যদি হয় ধ্বংস ও সৃষ্টির, মৃত্যু ও জীবনের মর্মবাণী, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ মানুষে বিশ্বাস, মানবতার আদর্শে বিশ্বাস হারাইবেন কেন, কেন দুঃখবাদী হইবেন, কেন হইবেন সংশয়বাদী? অথবা প্রগতি-বিরোধী মনই বা কেন হইবে তাঁহার? নির্ভীক, নিরাসক্ত, ভারমুক্ত, সর্বসংস্কারমুক্ত রবীন্দ্রনাথ সর্ববন্ধনমুক্ত মানবাত্মার বেদীতেই চিরকাল অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিয়াছেন; মানুষকে পরিপূর্ণভাবে না জানার, না বুঝার জন্যই ত যত সংস্কার ও বন্ধনের সৃষ্টি! সেই মানুষকে একান্ত করিয়া জানা ও বুঝা, ইহাই ত কবির সাধনা। এই সাধনা পূর্ণতা পাইল কবির পরিণত বয়সে যখন তাঁহার সত্যকার ঐতিহাসিক বোধ জন্মাইল, যাহার বলে তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন নানা চেষ্টা ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া, নানা বিচিত্র ভাবাদর্শের বৈপরীত্যের ভিতর দিয়া চিরন্তন মানুষের শেষহীন সীমাহীন অগ্রযাত্রা, নিরবচ্ছিন্ন। জীবনের শেষ দশ বৎসর রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ যেন নূতন করিয়া বিচিত্র সুখদুঃখময় মানব-সংসারের সঙ্গে আপনাকে জড়াইতেছিলেন, প্রতিদিনের মানবসংসার যেন তাঁহার গভীরতর সত্তার মধ্যে নূতন মোহজাল বিস্তার করিতেছিল। একথা নিঃসন্দেহ যে বিশ্ববিধাতার নিগূঢ় অস্তিত্ব তিনি গভীরতর ভাবে ও রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাহার পরিচয় গত দশ বৎসরের রচনায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সমান সত্য যে মানুষের নিগূঢ় অস্তিত্ব এবং তাহার ঐতিহাসিক অর্থও গভীরতর ভাবে তাঁহার মনকে অধিকার করিতেছিল এবং বিশ্ববিধাতার সিংহাসনের পাশেই চিরন্তন মানুষের আসনও প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল; যতই তিনি মৃত্যুর নিকটতর হইতেছিলেন, জীবনরসের পিপাসা যেন তাঁহার ততই বাড়িতেছিল, মানুষকে যেন তিনি আরও ততই বেশি ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, জীবনের সুধাভাণ্ড হইতে ততই আরও বেশি রস আহরণ করিতেছিলেন। তিনি যে তাঁহার দেবতাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যাহারা এই পৃথিবীর বায়ুকে বিষাক্ত করিতেছে, যাহারা দেবতার আলো বারবার নিভাইয়া দিতেছে, যাহারা মানুষকে অপমানে অত্যাচারে জর্জরিত করিতেছে, দেবতা কি তাহাদের ক্ষমা করিয়াছেন, তাহাদের ভালবাসিয়াছেন—এ প্রশ্ন নিরর্থক নয় কিংবা কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিচ্যুত নয়। মনের এই যে সমগ্র ভঙ্গি, অনুভূতির এই যে সমগ্র দৃষ্টি, এই ভঙ্গি ও দৃষ্টিই রবীন্দ্র-মানসের শেষ অধ্যায়ের ভূমিকা।

আমি আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি, মনের এই দৃষ্টিভঙ্গির, এই ঐতিহাসিক বোধের প্রথম সূচনা যেন ১৯৩০ খ্রীস্ট বৎসর হইতে, সোভিয়েট রাষ্ট্র ভ্রমণের প্রত্যভিঘাত হইতে। "রাশিয়ার চিঠি"তেই তাহার প্রথম প্রমাণ, কিন্তু তখনও এই নবলব্ধ বোধ ও দৃষ্টি বুদ্ধি ও চিন্তার স্তরে, অর্থাৎ সেই স্তরে যখন প্রথম প্রত্যভিঘাত মনকে নাড়া দিয়াছে মাত্র। ভাবানুভূতির প্রথম প্রকাশ একটু দেখা গেল "পরিশেষে" (১৯৩২), কিন্তু "প্রান্তিকে"র (১৯৩৭) আগে এই নূতন বোধ ও দৃষ্টি ভাবসত্তার অঙ্গীভূত হইয়া যায় নাই। যাহাই হউক, এই গভীরতর ঐতিহাসিক বোধ যে-সব কবিতায় স্বপ্রকাশ তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে শেষ-অধ্যায়ের রচনাগুলির বিশিষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বল্পায়তনের মধ্যে সাধারণ

ভাবে দু'একটি কথা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই দু'একটি কথা সাধারণ ধর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে হইলেও জীবন ও বস্তুধর্মের গভীরতর বোধ ও জ্ঞানের পরিচয়ও ইহাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ; এই বোধ ও জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সুযোগ সুদীর্ঘ কবিজীবনে ইতিপূর্বে আর হয় নাই, এবং ইহার সঙ্গে ঐতিহাসিক-বোধের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট ও গভীর।

প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে শেষ অধ্যায়ের রচনাগুলিতে মৃত্যুভাবনার, মৃত্যুকল্পনার পৌনঃপুনিক উপস্থিতি। একথা ত সর্বজনবিদিত যে, মৃত্যুভাবনা লইয়া কবি কিশোর বয়স হইতেই এত লীলায় মাতিয়াছেন যে মৃত্যুভীতি বলিয়া কিছু আর তাঁহার ছিল না। কিন্তু যতদিন না মৃত্যু তাঁহার জীবনের নিকটতর হইল, যতদিন না তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইলেন ততদিন মৃত্যু তাহার সকল রহস্য ও মহিমা, সকল দীপ্তি ও গরিমা কবির সম্মুখে প্রসারিত করে নাই। মৃত্যুর এই ক্রমাগ্রসরমান পদধ্বনি কবির মনন ও কল্পনার কারখানায় এমন সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটাইল যাহার ফলে কবি শুধু যে মৃত্যুর রহস্যই আরও গভীর করিয়া উপলব্ধি করিলেন তাই নয়, জীবনের রহস্য এবং মহিমাও তাঁহার কাছে গভীরতর উদ্ঘাটিত হইল। বারবার অসংখ্য কবিতায় নানা ছলে নানা উপলক্ষে কবি এই মৃত্যুভাবনার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন ; তারপর ১৯৩৭'র নিদারুণ অসুস্থতা প্রথম তাঁহাকে মৃত্যুস্নানের সুযোগ দিল। ডুব দিয়া যখন তীরে আসিয়া উঠিলেন তখন তিনি শুচিস্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, দীপ্তিময়। বস্তুত ভাবকল্পনার বলে মৃত্যুসমুদ্রে এই যে নিরন্তর অবগাহন ইহা যেন কবির পক্ষে হইয়া দাঁড়াইল নিজের আত্মাকে শুচি-স্বচ্ছ করিয়া লইবার একটা উপায়। "প্রান্তিকে"র সুন্দর গভীর গম্ভীর কবিতাগুলি তাহার প্রমাণ। তারপর ১৯৪০'র যে মারাত্মক পীড়া, সেই পীড়াই সর্বশেষে 'দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতির' ধ্যানে তাঁহার দৃষ্টি ও মনকে তন্ময় করিয়া দিল। 'দেহ দুঃখ হোমানলে' পুড়িয়া খাঁটি সোনা হইয়া যখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন তখন তিনি পূর্ণতর মানুষ—দৃঢ়তর, সবলতর, আরও নিরাসক্ত, আরও ভারমুক্ত, আরও স্বচ্ছ, গভীর ; অথচ সহজ মোহমুক্ত তখন তাঁহার দৃষ্টি। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কবিতাগুলি হইতে এখানে উদ্ধার করা যাইতে পারে ; "রোগ শয্যায়", "আরোগ্য", "জন্মদিনে" ও "শেষ লেখা" গ্রন্থ চারিটিতে তাহা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তিনি মৃত্যুর কোমল শীতল ক্রোড়ে শেষ শয্যা বিছাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, কিন্তু চলিয়া যাইবার ঔৎসুক্য যে তাঁহার মোটেই ছিল না, একথা আগেই বলিয়াছি। যত কিছু কাজ ছিল সব ত শেষ হইয়াছে, ছোটবড় সব কর্তব্যই ত শেষ করা হইয়াছে, মানুষ ও বিশ্বজীবন যাহা কিছু তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিয়াছে তাহার সমস্তই ত নিঃশেষে আহরণ করা, পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার প্রত্যভিঘাতে ভাবকল্পনায় যত অনুভূতি ধরা দিয়াছে সমস্তই রসে ও সৌন্দর্যে ব্যক্ত করাও হইয়া গিয়াছে,—তিনি এবার যাইবার জন্য প্রস্তুত ; কিন্তু জীবন যে ইতিমধ্যে নূতনতর অর্থে ও স্বপ্নে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে, নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। এ-জীবনকে যে পরিপূর্ণ করিয়া এখনও জানা হয় নাই, ভোগ করা হয় নাই, সীমাহীন জীবন-সমুদ্রের সকল রস ত এখনও আহরণ করা হয় নাই। সেই জন্যই এ-জীবন হইতে বিদায় লইবার ইচ্ছা তাঁহার নাই, সেই জন্যই বারবার তিনি এই মানবসংসারের বহুমুখী জীবনযাত্রার মধ্যেই ফিরিয়া ফিরিয়া আসেন ; এই মানুষই যে জীবনের চিরন্তন উৎস! এই ভাবানুভূতির যত কবিতা সব আছে শেষ অধ্যায়ে। বিশেষ ভাবে ১৯৪০'র সুদীর্ঘ রোগশয্যায় ও তারপর মৃত্যু পর্যন্ত রচনাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই একটি গভীর গম্ভীর সুর ধরা পড়ে অতি সহজেই ; এই কবিতাগুলিতে জীবন ও মৃত্যুর, ধ্বংস ও সৃষ্টির

নূতনতর স্বপ্ন ও অর্থ অনুভূতিশীল পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এই প্রকৃতির কবিতাগুলি পড়িলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া বলিতে হয়, স্বচ্ছ ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময় মানবাত্মার একি অপরূপ প্রকাশ! এত সহজ স্বচ্ছ, এত উজ্জল ও সুস্পষ্ট বলিয়াই না প্রকাশের ভঙ্গিও এত সহজ ও সরল, স্পষ্ট ও বাহুল্যবিহীন। মানুষ যখন সত্যকে পায়, অলংকার তখন বাহুল্য মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। বলিবার ভঙ্গি অপেক্ষা বক্তব্য বস্তু এই সব কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং এই বলার মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নাই; সবল নিরাসক্ত মনের অপরাজিত বীর্যের গভীর স্বচ্ছ দীপ্তি এই কবিতাগুলিকে একটি অপরূপ শক্তি ও দৃঢ় সংহত রূপ দান করিয়াছে। ক্ষীয়মাণ আয়ুর দুর্বলতার এতটুকু চিহ্ন এই কবিতাগুলির কোথাও নাই, না বলার ভঙ্গিতে, না তাহাদের ছন্দে, না বক্তব্যের শিথিলতায়। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই যেন সুগভীর প্রেম ও বিশ্বাসের দীপ্তিতে জলজল্ করিতেছে।

এই স্বচ্ছ সবল গভীর ভাবানুভূতি কবিকে সুগভীর প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়াছে। এই গভীর প্রজ্ঞাদৃষ্টি একদিকে যেমন তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে বিশ্ব-বিধাতার কোলে, তেমনই তাহাকে বারবার টানিয়া আনিয়াছে মানুষের বুকে, মানবের প্রবহমান জীবনধারা যাহাকে আমরা বলি ইতিহাস তাহার মর্ম কবিচিত্তের নিকটতর করিয়াছে। সৃষ্টির অন্তহীনতায় সবল প্রাণের গভীর বিশ্বাস, মানুষের সেবায় ও ভালবাসায় তৃপ্তি ও বিশ্বাস, মানবচিত্তের সাধনায় যে-সত্য নিহত তাহাতে বিশ্বাস, জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি ও শান্তিতে বিশ্বাস—এই গভীর পরিব্যাপ্ত বিশ্বাসই শেষ অধ্যায়ের কবিতাগুলিকে তাহাদের কাব্যমূল্য দান করিয়াছে, এবং এই স্থির অকুণ্ঠিত নিঃশঙ্ক বিশ্বাসই রোগাক্রান্ত কয়েকটি বৎসরের কবি-মানসের পরিচয়। বিশেষ করিয়া ১৯৪০'র পরে লেখা "আরোগ্য", "জন্মদিনে" ও "শেষ লেখা" এই তিনটি গ্রন্থে এই পরিব্যাপ্ত বিশ্বাস কী উদাস প্রীতি ও ভালবাসায় নূতনতর মাধুর্যে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার পরিচয় আছে। যে-কবি পরিপূর্ণ শক্তি, ধৈর্য, বীর্য ও বিশ্বাসে মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইল উদাস প্রীতি ও ভালবাসায় বলা "এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।" অর্ধ-উদাসীন কল্পনায়, স্বচ্ছ সহজ হৃদয়মুকুরে কবি যে-সব অপরূপ ছবিগুলি একটি একটি করিয়া দেখিয়া গিয়াছেন, কথার মালায় টুক্‌রা টুক্‌রা সে-সব ছবি গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। নিরালা অবকাশের মধ্যে কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিয়াছে; অতীতের সকরুণ স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে, ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা স্বপ্নময় হইয়া দেখা দিতেছে। জীবনের শেষপ্রান্তে বসিয়া পশ্চাতের দিকে তাকাইয়া সেই ছবি দেখিতে ভাল লাগিতেছে। কত যে শান্ত, রঙ্গিন ব্যাপ্ত মুহূর্ত এই কবিতাগুলিতে ধরা পড়িয়াছে, কত যে গভীর ব্যঞ্জনা ছড়াইয়া আছে, তাহার হিসাব নাই। কি অপরূপ ছবিই না আঁকিয়াছেন, এবং সবগুলি ছবিই একটা শান্তসৌন্দর্যে মণ্ডিত। বিক্ষোভ নয়, আলোড়ন নয়, পরমা শান্তি ও স্বচ্ছ শান্ত মমতাময় বিনয়নম্র দৃষ্টিভঙ্গিই শেষতম অধ্যায়ের কবিতাগুলিকে রূপে রসে ভরিয়া দিয়াছে; পৃথিবীর রূপ ও রস কৃতজ্ঞতায় যেন মনকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। সুগভীর ভাবানুভবতায় ছবিগুলি যেন আরও সুন্দর, আরও দীপ্ত, আরও গম্ভীর। কিন্তু সব কবিতাই শুধু শান্ত-ছবির মালা মাত্রই নয়, সত্যের অমৃতরূপেও কবিতাগুলি উদ্ভাসিত, জীবনরহস্যের গভীর ইঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ, গভীর ধ্যানে তন্ময়, গভীর গম্ভীর আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত এবং পৃথিবীর ও

মানুষের প্রতি সুগভীর প্রীতি ও ভালবাসায় উজ্জ্বল। নিখিল বিশ্বের মর্মস্থলে যে-গভীর রহস্য আবর্তিত হইতেছে তাহার অর্থানুভূতিতে কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। সৃষ্টিলীলা, জন্মমৃত্যুর বিচিত্র রহস্য, পুরাতন আবর্জনার ধ্বংস ও নূতন সৃষ্টির আহ্বান, মৃত্যুর অতীত আত্মার চিরন্তন মহিমা ইত্যাদি সমস্তই কখনও গভীর গম্ভীর সুরে, কখনও গল্পচ্ছলে, কখনও লঘুলাস্যে কবিতাগুলিতে রূপ গ্রহণ করিয়াছে; বক্তব্য সর্বত্রই সুস্পষ্ট, আবছা অস্পষ্টতার লেশমাত্র কোথাও নাই।

আমি আগেই বলিয়াছি, কবি শেষ-খেয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, কিন্তু উন্মুখ ছিলেন না; নিরাসক্ত মন লইয়া তিনি জীবনকে যেন এখন আরও গভীর করিয়া আঁকড়াইয়া রহিলেন। বারবার সেইজন্য নানা কবিতায়, নানা গল্পচ্ছলে তিনি জীবনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়াছেন; জীবন যেখানে উচ্চৈঃস্বরে বৃহৎ আয়োজন ও আড়ম্বরের মধ্যে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে সেখানে নয়, বরং আপাত-তুচ্ছ ক্ষুদ্র অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য ভাবলীলায় জীবন যেখানে আবর্তিত সেইখানে, জীবন যেখানে ছায়ার আড়ালে গোপন সেইখানে। একান্ত সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক তুচ্ছ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অসংখ্য ছবি বারবার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে—যাহারা ভিড় করিয়া আসিতেছে তাহারা মাঠের চাষী, কলের কুলি, দরিদ্র গৃহস্থ নরনারী, সাধারণ মেয়ে, কলেজের ছেলে, আপিসের কেরানী, রাখাল বালক, সাঁওতাল কুমারী, মংপুর পাহাড়িয়া মেয়ে, বাড়ির পুরানো চাকর, রিক্সওয়ালা এবং এমনই ধরনের অসংখ্য নরনারী যাহারা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ফলে দৈন্যে পীড়িত, সংস্কারে সংকুচিত, মনুষ্যত্বের এবং মানবতার সুবৃহৎ অধিকারে বঞ্চিত। ইহাদের জীবনের মধ্যে ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতা কবি পূর্ববর্তী কবিজীবনেও ভোগ করিয়াছেন, যেমন, "পলাতকা"য়, "লিপিকা"য় আরও পূর্ববর্তী অনেক কাব্যে। এই সমস্তই বস্তু-চেতনার পরিচয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশেষভাবে "নবজাতক" গ্রন্থ হইতে এই বস্তু-চেতনার সঙ্গে ঐতিহাসিক বোধের শুভ পরিণয় লক্ষণীয়। এই সব ঘটনার প্রতিচ্ছবি কখনও আসিয়াছে অতীত স্মৃতি হইতে, কখনও আসিয়াছে চোখের সম্মুখের চলমান ছায়াছবি হইতে; কিন্তু কবি যেখানে দূর-স্মৃতিতে আবিষ্ট সেইখানেই কবিতাগুলি একটি স্নিগ্ধ অপরূপ মাধুর্যে সমৃদ্ধ হইয়াছে। যাহাই হউক, উভয় ক্ষেত্রেই কবি যে জীবনের এক নূতন আস্বাদন লাভ করিয়াছেন, দৃঢ়তর সবলতর বিশ্বাসের অধিকারী হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। বস্তু ও জীবনের প্রত্যক্ষবোধ ও অনুভূতির আনন্দে জীবন যেন তাঁহার ভরপুর।

এই প্রত্যক্ষবোধ ও অনুভূতি হইতেই ঐতিহাসিক বোধের জন্ম, এক কথায় বস্তু-ধর্মবোধের জন্ম। বস্তুত প্রত্যক্ষবোধ ও অনুভূতিই যখন মননের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই ঐতিহাসিক বোধের সূচনা দেখা দেয়। আমি বলিয়াছি, এই সূচনা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় "পরিশেষ"-গ্রন্থে (১৯৩২), এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায়, বিশেষ করিয়া 'আগন্তুক' জাতীয় কবিতায় এই বোধের পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। একবার যখন এই বোধ জাগিল তখন 'প্রশ্নে'র মতন কবিতা তো অনিবার্য হইয়া উঠিল। বস্তুর প্রত্যক্ষবোধ যখন জন্মাইল তখন বস্তু সম্বন্ধে তাহার মর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিবে, ইহা একান্তই স্বাভাবিক, বস্তুত "পরিশেষ"-গ্রন্থের 'প্রশ্ন' কবিতা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শের একেবারে মূল ধরিয়া টান দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বোধের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ খুলিয়া দিল। কিন্তু এখনও এই নবলব্ধ বোধ একেবারে বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের গভীর

ভাবানুভূতির অঙ্গীভূত হইয়া যায় নাই। "পরিশেষে"র অল্প পরেই কবি 'পথের রশি' নাম দিয়া ছোট একটি নাটিকা রচনা করেন; এই নাটিকাটিতে নবলব্ধ বোধ সংকেতের আড়ালে একেবারে ফাটিয়া পড়িল; বস্তুত এই নাটিকাটিকে বলা যায় বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের দায়, শক্তি ও অধিকারের প্রথম ঘোষণাপত্র। কিন্তু এখনও ঐতিহাসিক বোধ কেবল নিজেকে সজোরে ব্যক্ত করিতেছে, হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া গভীরতর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে নাই। তাহার উপায় হইতেছে জীবনকে আরও ভাল করিয়া জানা, বস্তুর ঐতিহাসিক রূপে জীবনকে জানা। সেই জানার চেষ্টা "পুনশ্চ" গ্রন্থে স্বপ্রকাশ; তবু এই গ্রন্থে দুটি কবিতা আছে যাহাতে এই ঐতিহাসিক বোধ তাহার নিপুণ অস্তিত্ব জানাইতেছে। একটি 'মানবপুত্র' যাহাতে 'প্রশ্ন' কবিতার সুরটি আবার গভীর সুরে ধ্বনিত; কিন্তু খুব উঁচু স্তরের, গম্ভীর সুন্দর কবিতা 'শিশুতীর্থ'। শেষোক্ত কবিতাটিতে মানুষের নবজন্মতীর্থে শাশ্বত যাত্রার একটি কম্পন-শিহরিত ইতিহাস সবল কল্পনায় অপরূপ মূর্তি লাভ করিয়াছে। কবিতার ধুয়াটি গভীর অর্থব্যঞ্জক; "জয় হোক্ মানুষের, জয় হোক্ নবজাতকের, জয় হোক্ চিরজীবিতের"। "বিচিত্রিতা" (১৯৩৩) ও "শেষ সপ্তকে"র (১৯৩৫) ভিতর দিয়া জীবনের পাঠ আগাইয়া চলিয়াছে; "শেষ সপ্তকে"র ৪৩নং কবিতাটি ঐতিহাসিক বোধের দিক হইতে খুব সার্থক, এই কবিতাটিতে কবি জন্মদিন উপলক্ষ করিয়া নিজের জীবনের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় নিজে গ্রহণ করিলেন, পরকেও দিলেন। ২০, ২১ ও ৩৯নং কবিতা তিনটিও এই দিক হইতে খুব সার্থক। "পত্রপুটে" (১৯৩৬) এই নবলব্ধ বোধ একটা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিল এবং কয়েকটি কবিতাতেই প্রকাশের তাড়নায় ব্যাকুল এই বোধ উদ্বেলিত তরঙ্গে ভাঙিয়া পড়িল, বিশেষ করিয়া ২০, ২১ ও ৩৯নং কবিতা তিনটিতে। "শ্যামলী"তে এই বিবর্তনই চলিয়াছে: 'চিরযাত্রী', 'মিলভঙ্গ', 'অমৃত', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কবিতায় তাহা সুস্পষ্ট।

কবি এখন ভাবানুভূতির এমন একটা স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যখন একবার স্থির হইয়া এই ঐতিহাসিক বোধের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা এ-পর্যন্ত সঞ্চিত হইয়াছে তাহার সবটা জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকষে যাচাই করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখার একটা ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগিল, এবং সে-ইচ্ছা রূপান্তরিত হইল "কালান্তরে"র সমাজ ও রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে (১৯৩৭)। ইহার অব্যবহিত পরেই আসিল ১৯৩৭'র নিদারুণ অসুস্থতা, এবং মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা ঘটিবার ফলেই গত কয়েক বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরিশ্রুত পরিশুদ্ধ হইয়া একেবারে কবি-চেতনার অঙ্গীভূত হইয়া গেল। "প্রান্তিকে"র ব্যঞ্জনাময় ক্ষুদ্র ভূমিকাটিতে তিনি বলিলেন:

> অস্তসিন্ধুকূলে এসে রবি
> পূরব দিগন্তপানে
> পাঠাইল অন্তিম পূরবী।

এই গ্রন্থের আঠারোটি কবিতার প্রথম ষোলটিতে জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে গভীর সুর আবেগময় ভাষায় ধ্বনিত, কিন্তু শেষের দুটি কবিতা পড়িলেই পরিষ্কার বুঝা যায় বিশ্বজীবনের সমস্ত কিছুকে ভেদ করিয়া, সমস্ত কিছুকে আবৃত করিয়া একটা গভীরতর জীবনদর্শন, জীবন ও মৃত্যুর, ধ্বংস ও সৃষ্টির ব্যাপকতর একটা রহস্য কবির অনুভূতিকে কবির চেতনাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এবং এই দর্শন ও রহস্য গভীর ঐতিহাসিক বোধ হইতে জাত। ১৭নং কবিতায় কবি পরিষ্কার বলিয়াছেন, যেদিন তিনি মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন হইতে

চেতনার মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন সেই দিনই তাঁহার মনে হইল পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতার জলন্ত কটাহে প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য অসহায় মানুষ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহার উত্তপ্ত বিষ-নিশ্বাসে পৃথিবী জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। পরবর্তী ১৮নং কবিতাটিতে সুর একেবারে সপ্তমে চড়ান, অথচ সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক পৃথিবীর ঐতিহাসিক বোধের কি অপরূপ কাব্যময় প্রকাশ—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

একটু ভিন্ন ও চাপা সুরে এই ধুয়াটিই ধরা যায় "সেঁজুতি"তে (১৯৩৮)। জীবনের গভীর অভিনিবিষ্ট পাঠ চলিয়াছে "সেঁজুতি"তেও; এমন কি একটু তরল সুরে গল্পকথায় গাঁথা পরবর্তী কাব্য "আকাশ প্রদীপে"ও (১৯৩৯)। ১৯৪০'র গোড়ায় প্রকাশিত হইল "নবজাতক"; নামটি গভীর অর্থের দ্যোতনায় সার্থক। একটা ঋতু পরিবর্তনের নূতন সুরের সুস্পষ্ট পরিচয় হিসাবেই যে "নবজাতকে"র জন্ম তাহা কবি নিজেই স্বীকার করিলেন গ্রন্থটির ভূমিকায়, এবং এই ঋতু পরিবর্তন বা নূতন সুর আর কিছুই নয়, ঐতিহাসিক চেতনায় কবি-মানসের নবজন্ম, তাহারই জাতকর্মের উৎসবগীতি। কিন্তু শুধু ভূমিকাতেই নয়, এর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় এমন একটি দৃষ্টি ও মননভঙ্গির পরিচয় আছে যাহার আভাস "পরিশেষ" হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু "নবজাতকে" আসিয়া তাহা পরিপূর্ণ কাব্যময় রূপ ধারণ করিল, এবং এখন আর শুধু দু'চারিটি কবিতায় নয়, অসংখ্য কবিতায় তাহা ফুটিয়া উঠিল। তেমনই লক্ষ্য করিতে হয় বস্তু ও জীবনকে তার ঐতিহাসিক স্বরূপে দেখিবার জন্য চিত্তের একটা সহজ প্রবণতা। "নবজাতক" গ্রন্থের 'প্রায়শ্চিত্ত', 'হিন্দুস্থান,' 'রাজপুতানা', 'ভূমিকম্প', 'পক্ষী-মানব', 'আহ্বান','এপারে-ওপারে', 'রোম্যান্টিক', 'রাত্রি', 'রূপ-বিরূপ' প্রভৃতি কবিতা এদিক হইতে খুবই উল্লেখযোগ্য। "সানাই"র (১৯৪০) কবিতাগুলি একটু হালকা ধরনের; কয়েকটি রচনা সত্যই সুন্দর কিন্তু খুব অভিনব হয়ত নয়।

যে ঐতিহাসিক বোধের কথা এতক্ষণ বলিয়াছি তাহা "রোগশয্যায়" (১৯৪০) "আরোগ্য", "জন্মদিনে" (১৯৪১) এবং "শেষ লেখা" (১৯৪২), এই গ্রন্থ চারিটিতে যেন আরও গভীর আরও অন্তরতর স্তরে তার মূল প্রসারিত করিয়াছে, কবি যেন আরও স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, বস্তু ও জীবনের প্রত্যক্ষ বোধের আনন্দ যেন আরও গভীর, আরও নিবিড় হইয়াছে। ১৯৪০'র মারাত্মক ব্যাধি যেন কবিকে আরও দিল শক্তি ও বীর্যের দীপ্তি, আরও গভীর প্রীতি, শান্তি ও ভালবাসা, নূতন চেতনায় আরও গভীর বিশ্বাস। যে-সব কবিতায় জীবন ও মৃত্যু রহস্যের সুর ধ্বনিত, যেখানে তিনি মধুময় দ্যুলোক, মধুময় পৃথিবীর কথা বলিয়াছেন, শুধু যে সেই সব কবিতাতেই এই ধর্ম ও প্রকৃতি স্বপ্রকাশ তাহা নয়, যেখানে তিনি চিরন্তন শাশ্বত জড়জগৎ এবং তাহার ঐতিহাসিক পরিণতির কথা বলিয়াছেন, সেখানেও তাহা সমান দীপ্তিময়। এই দিক হইতে বিশেষ করিয়া সার্থক ও অর্থব্যঞ্জক হইতেছে "আরোগ্য" গ্রন্থের ১, ৩, ৪, ৭, ১০ এবং ১৮ নং কবিতা, এবং "জন্মদিনে" গ্রন্থের ৫, ১০, ১২ ১৭, ১৮ এবং ২১ নং কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যরচনাগুলির, এমনকি গল্প-কবিতাগুলিরও এমন একটা দৃঢ় সংহত রূপ আছে, এমন সংযত আবেগ আছে যাহা কবির অপেক্ষাকৃত পুরাতন লেখাগুলিতেও দেখা যায় না। যে প্রবল বাণীস্রোত ও আবেগোচ্ছ্বাস পাঠককে স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া যায়, সে প্রবল স্রোত ও উচ্ছ্বাস এই পর্বের কবিতাগুলিতে একেবারে অনুপস্থিত। যেটুকু বক্তব্য সেটুকু শুধু বলা হইয়াছে সকল প্রকার রূপক অলংকার বর্জন করিয়া, বাহুল্য কল্পনার মায়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া, প্রকাশ-ভঙ্গি অপেক্ষা বক্তব্য বস্তুকেই যেন মুখ্যতর করিয়া। তাহার ফলে কবিতাগুলি খুব দৃঢ়, সংযত ও সংহত রূপ লাভ করিয়াছে। অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক রূপকে ও বর্ণনায় একটি কবিতাও আচ্ছন্ন নয়, বক্তব্যের মধ্যেও অস্পষ্ট কুয়াশা কোথাও নাই। মিলহীন ছন্দ, কিন্তু নিয়মিত তালে লয়ে বাঁধা, এবং ছন্দের গাঁথুনির মধ্যেও একটা সংযত দৃঢ়তা, ধ্বনির আবেগহীন গভীরতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আঙ্গিকের এই সব গুণ বা ধর্মকে আমি একান্তভাবে ভাবানুভূতি ও মননপ্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ বলিয়াই মনে করি, এবং তাহার সঙ্গে আঙ্গিকের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়। বস্তুত ভাবানুভূতি ও মনন প্রকৃতিকে বাদ দিয়া আঙ্গিকের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে তাহার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু তাহাকে সার্থক অস্তিত্ব বলা যায় না বলিয়াই আমার ধারণা। যাহা হউক, একথা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয় যে "পরিশেষ" হইতে আরম্ভ করিয়া কবি যতই অগ্রসর হইয়াছেন, এই পর্যায়ের ভাবানুভূতি ও মননক্রিয়া যতই গভীর ও নিবিড় হইয়াছে ততই তার ধর্ম ও প্রকৃতি অনুযায়ী আঙ্গিকের পূর্বোক্ত ধর্মও ক্রমশ দৃঢ়, সংহত, সংযত ও গভীর হইয়াছে।

বস্তুচেতনা রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল। কাব্যে তা' খুব সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িবার কথা নয়, কারণ তাহা পরিস্রুত ও পরিশুদ্ধ হইয়া বোধ ও অনুভূতির যে-স্তরে কবিকল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে সে-স্তর বস্তু-চেতনার স্তর হইতে অনেক দূরে। কিন্তু গল্পে ও উপন্যাসে এবং নাটকেও তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক স্পষ্টতর হইয়া ধরা ছোঁওয়া দেয়; গল্প-উপন্যাস-নাটকের সাহিত্য-প্রকৃতিই তাহার সহায়ক। কিন্তু "শেষের কবিতা", "যোগাযোগ" পর্যন্ত দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টি ও মননভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন যাহাতে বস্তু-চেতনার ও সমাজ-মানসের অকুণ্ঠিত শিল্পময় প্রকাশ ব্যাহত হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া কঠিন নয়। কিন্তু জীবন যতই পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, যতই তিনি নিরাসক্ত, ভারমুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন ততই ক্রমশ তাঁহার বস্তু ও সমাজ-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে ঐতিহাসিক বোধ, এবং তাহার ফলে ক্রমশ তাঁহার মন হইতে সমস্ত সংস্কার খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে—মানুষ সংস্কারে জড়িত থাকে মানুষ মানুষকে পরিপূর্ণ করিয়া জানে না বলিয়া—বস্তু ও ঘটনার ঐতিহাসিক অর্থ ততই তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, ততই তিনি স্বচ্ছ ও নির্ভীক দৃষ্টি লইয়া বস্তু ও ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছেন। এই যে নূতন দৃষ্টি ও মননভঙ্গি, গল্পে উপন্যাসে এর প্রথম পরিচয় মেলে "দুই বোন" (১৯৩৩) এবং "মালঞ্চ" (১৯৩৪) গ্রন্থে; "চার অধ্যায়" (১৯৩৪) এইদিক হইতে একটু শিথিল, কিন্তু মনন-কল্পনার বৈপ্লবিক রূপান্তর দেখা গেল আবার "তিন সঙ্গী" গ্রন্থে (১৯৪০)! বস্তুত "তিন সঙ্গী"র আধুনিকতার ধর্মকে লজ্জা দিতে পারেন বাংলা দেশে এমন আধুনিক আজও কেহ জন্মান নাই। মোহমুক্ত মানুষের যে-দাবি, সর্ববন্ধনমুক্ত, সর্বসংস্কারমুক্ত শুদ্ধ স্বচ্ছ মানবতার যে-দাবি, পরিণত স্থিতপ্রজ্ঞ জীবনের শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র সেই দাবি, সেই

আদর্শকেই স্বীকার করিয়াছেন, আর কোনও আদর্শকেই নয়। সেই সর্ববন্ধন সর্বসংস্কার মুক্ত মানুষ ও মানবতার বেদীমূলেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দশ বৎসরের বহু অভিজ্ঞতা বহু বেদনালব্ধ অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিয়াছেন, এবং সর্বশেষে "সভ্যতার সংকটে" একটি গভীর গম্ভীর বজ্রমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই অর্ঘ্যটি নিবেদন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

কবিজীবনের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে এই মূল কথাটি স্মরণে রাখিয়া এইবার সংক্ষেপে সাধারণ ভাবে শেষ দশ বৎসরের কবিতাগ্রন্থগুলির আলোচনা করা যাইতে পারে।

এগার

পরিশেষ (১৩৩৯)
বিচিত্রিতা (১৩৪০)
বীথিকা (১৩৪২)

রবীন্দ্র-কবিজীবনের শেষ-অধ্যায় নানাদিক হইতে বিস্ময়কর। সকলের চেয়ে বিস্ময়কর রচনার প্রাচুর্য, প্রকাশের নূতনত্ব এবং সতেজ ও সাবলীল ভাবস্ফূর্তি। মনে রাখা প্রয়োজন কবি ইতিমধ্যে সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসী মহাসমারোহে তাঁহার সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে। তখন কি তাঁহারা জানিতেন কবিমানসের আরও এক সমৃদ্ধ অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইতে বাকি আছে? কবি নিজেই কি তাহা জানিতেন? পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের সাধনায় তিনি চরমতম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন অনেক সুদুর্গম পথে; সেই মত ও পথ ধরিয়া স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ বিহার করিয়া গেলেও তাঁহার পূর্বলব্ধ কবিখ্যাতি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না। কিন্তু সহজ স্বচ্ছন্দ পথে পদচারণা না করিয়া সত্তরোত্তীর্ণ কবি বাছিয়া লইলেন দুর্গম সংশয়াকুল পথে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার, নূতন পরীক্ষার, দুঃসাধ্য বরণের দুঃসাহসিক অভিযান। বৃদ্ধ কবির চিত্তের এই সরস নবীনতা, যৌবনসুলভ প্রাণপ্রাচুর্য পাঠকের বিস্ময়, সাহিত্যের বিস্ময়। জীবনের শেষ দশ বৎসরে তিনি যত কবিতা ও গান, যত কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আর কোনও দশ বৎসরেই কাব্য-রচনার এত প্রাচুর্য দেখা যায় নাই। এই দশ বৎসরে শুধু কাব্যগ্রন্থই রচনা করিয়াছেন বিংশাধিক। উৎকর্ষ অপকর্ষের কথা না তুলিয়াও বলা চলে সত্তরোত্তীর্ণ কবির এই রচনাপ্রাচুর্য সাহিত্যের ইতিহাসে বোধ হয় অভূতপূর্ব। আর এই রচনা ত শুধু প্রাচুর্যের দিক দিয়াই বিস্ময়কর নয়; আরও বিস্ময় লাগে এই দেখিয়া যে, এই প্রাচুর্যের মধ্যেও বার্ধক্যের বলিরেখার সুস্পষ্ট চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। ইহাদের দীপ্তি অক্ষুণ্ণ, অম্লান, ইহাদের বৈচিত্র্য অশেষ, অফুরন্ত। সত্যই মনে হয় একাশি বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু অকালমৃত্যু; হয়ত শেষ-অধ্যায়েরই পর্বমোচন আরও বাকি ছিল। তাঁহার কাব্যে ভাবের স্ফূর্তি, দৃষ্টির প্রসারিত বৈচিত্র্য, রস ও কল্পনার ঐশ্বর্য "শেষ লেখা" পর্যন্তও অম্লান দীপ্তিতে বিরাজমান। প্রাণধারার সঙ্গে সঙ্গে শেষ দুই বৎসরের বাণীর ধারা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল সত্য, কিন্তু সে-ধারা তখনও তাহার অর্থ বা ব্যঞ্জনার, ভাব ও ইঙ্গিতের গভীরতা হারায় নাই। কবি-মানসের এই চির নূতনত্ব, দুঃসাধ্য দুঃসাহসিক পরীক্ষার আনন্দ, নব নব উন্মেষের তৃপ্তিহীন কামনা, নিত্য নূতন প্রভাতে জীবনকে নূতন করিয়া দেখা কাব্য ও কবিজীবনের ইতিহাসেও এত দুর্লভ এত বিরল যে, রবীন্দ্র-কবিমানস

শুধু এই কারণেই পাঠকের আনন্দিত বিস্ময়ের উদ্রেক না করিয়া পারে না। ইহাই ত রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার অন্যতম সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান।

অথচ এক এক জীবন পর্যায়ের শেষে বারবার তিনি মনে করিয়াছেন এই পৃথিবীতে তাঁহার জীবনের দিনগুলি ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাঁহার যাহা দিবার, যাহা বলিবার তাহা তিনি নিঃশেষে দিয়াছেন, বলিয়াছেন ; যে-গান তিনি গাহিতেছেন তাহাই তাঁহার শেষ গান। সে-গানের নাম কখনও "খেয়া", কখনও "পুরবী"। অথচ 'বিচিত্রা'র এমনই লীলা, তিনি শেষের মধ্যেও অশেষকে ধারণ করেন এবং কবিকে দিয়া বারবার নূতন পথে 'পূজার অর্ঘ্য বিরচন' করাইয়া লন, কবি তাহা জানিতেও পারেন না। তিনি ত বারবার মনে করেন,

> রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন
> হয়ে আসে সমাপন। ('জন্মদিন')
>
> যাত্রা হয়ে আসে সারা,—আয়ুর পশ্চিমপথশেষে
> ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে। ('বর্ষশেষ')

এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে 'বিচিত্রা'কে প্রশ্ন করেন

> তবুও কেন এনেছ ডালি দিনের অবসানে
> নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি নিঃস্ব করা দান ('বিচিত্রা')

এই নিঃস্বকরা দানে নিঃশেষ করিয়া ভরা ডালি'র নাম "পরিশেষ"।

"পরিশেষ" প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে ; কবিতাগুলি মোটামুটি তাহার আগের দুই বৎসরের মধ্যে লেখা। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী', 'সিয়াম' (ইহার যথার্থ উচ্চারণ, 'শ্যাম' উচ্চারণ আত্মাভিমানী সংস্কৃত-করণ), 'বোরোবুদুর' প্রভৃতি দ্বীপময় ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে লিখিত কয়েকটি কবিতা আছে। তাহা ছাড়া মূল গ্রন্থে নানা উপলক্ষে লেখা কয়েকটি কবিতাও আছে—বিবাহ, নামকরণ, সাময়িক ঘটনা প্রভৃতি উপলক্ষে রচনা। 'বক্সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি,' 'প্রশ্ন' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার সৃষ্টি সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় অথবা বৃহত্তর অর্থে সামাজিক ঘটনার প্রত্যভিঘাতে। কতকগুলি কথিকা এবং গাথা জাতীয় কবিতাও আছে, তাহাদের কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ গদ্যে রচিত। এই আঙ্গিকের সূচনা "লিপিকা" গ্রন্থ হইতেই, কিন্তু "পরিশেষ" হইতেই এই আঙ্গিকের বিস্তৃত পরীক্ষা ও ব্যাপকতর প্রয়োগ আরম্ভ হইল। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ের আলোচনার বাহিরে, তবে এই আঙ্গিক-রূপের সঙ্গে কবি-মানসের যোগ সম্বন্ধে এই নিবন্ধেরই অন্যত্র আমার বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ সন্ধান করিতেই হইবে। যাহাই হউক, পূর্বোক্ত কবিতাগুলির মধ্যে "পরিশেষ"-গ্রন্থের সমগ্র মূল সুরটির সন্ধান মিলিবে না, সংখ্যায়ও ইহারা অনধিক। সে-সুরটি কান পাতিয়া শুনিতে হইলে অধিক সংখ্যক অন্য কবিতাগুলির দ্বারস্থ হইতে হইবে।

"পরিশেষ" আত্মবিশ্লেষণের, আত্মপরিচয়ের কাব্য। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত এই আত্মবিশ্লেষণ চলিয়াছে থাকিয়া থাকিয়া। সত্তর বৎসরের সমগ্র রূপখানি নিজের আঁখির একাগ্র দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া আর একবার তিনি জানিয়াছেন যে তিনি কবি, জীবনের রূপরসগন্ধস্বাদ ও আনন্দনয়ন ভরিয়া দেখা ও দেখার আনন্দ বেদনা গান ও কবিতার ছন্দে বাঁধিয়া যাওয়াই তাঁহার আজন্ম সাধনা।

আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিশ্বাস
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে।

* * *

নিখিলের অনুভূতি
সংগীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম। ('প্রণাম')

'বিচিত্রা' কবিতায় তিনি আত্মজীবনধারার প্রকৃতির পরিচয় লইয়াছেন; আজীবন যে-সাধনা তিনি করিয়াছেন, যে দৃষ্টিতে জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন তাহারই সুষ্ঠু, অনবদ্য ভাবে ও রূপে গাঁথা আত্মপরিচয়ের ইতিহাস, তাঁহার বিচিত্রা সঙ্গিনী বা জীবনদেবতা কী অভাবিত লীলায় তাঁহাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভিতর দিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, কতভাবের দোলায় তাঁহাকে দোলাইয়াছেন, আন্তর জীবনের সেই গভীর মর্মানুভূতির ইতিহাস তিনি সাজাইয়াছেন একটির পর একটি কবিতায়। 'বিচিত্রা', 'জন্মদিন', 'পান্থ', 'আমি', 'তুমি', 'আছি', 'বালক', 'বর্ষশেষ', 'আহ্বান', 'দীপিকা', 'অগ্রদূত', 'দিনাবসান', 'ধাবমান', 'বিস্ময়', 'নিরাবৃত', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'যাত্রী', 'মিলন', 'আগন্তুক', 'সাক্ষী', 'সান্ত্বনা' প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায় আত্মবিশ্লেষণ, আত্মপরিচয় চলিয়াছে নব নবরূপে। কবি হয়ত ভাবিয়াছেন, 'আয়ুর পশ্চিম পথশেষে, ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে', এইবার হিসাবের খাতা খুলিয়া নিজের সমগ্র পরিচয়টা জানিয়া লই, ইষ্টদেবতার সঙ্গে, নিজের জীবনের দ্বৈতানুভূতির সঙ্গে, নিজের মনের সঙ্গে বুঝাপড়াটা চুকাইয়া লই, সত্তর বৎসরের জীবনের গভীর সমগ্রতার যাহা কিছু সারাবশেষ তাহা এই জীবনসন্ধ্যায় বিশ্ব ও বিশ্ব-দেবতার চরণে নিবেদন করিয়া লই। এই বুঝাপড়া ও পরিচয় চলিয়াছে কবিতার পর কবিতায়। রসিক ও কৌতূহলী পাঠক নিজেই তাহা আস্বাদন করিয়া লইতে পারেন।

এই বুঝাপড়া পরিচয়ের মধ্য দিয়া কবিজীবনের একটি অতি পুরাতন রহস্য আবার নূতন করিয়া উদ্ঘাটিত হইল। বিশ্বজীবনের প্রতি গভীর প্রীতি ও ভালবাসা আবার নূতন শক্তি ও উদ্দীপনা লাভ করিল, বিশ্বসত্তার স্পর্শ আবার নূতন করিয়া দেহেচিত্তেমনে লাগিল, অন্তরের কবিপুরুষ আবার যেন নব বসন্তে সঞ্জীবিত হইল।

বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হোক মোর,
ছিন্ন করে দাও কর্মডোর।
আমি আজ ফিরিব কুড়ায়ে
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণ যে-কুসুম এনেছে উড়ায়ে
সহজে ধুলায়,
পাখির কুলায়
দিনে দিনে ভরি উঠে যে-সহজ গানে,
আলোকের ছোঁওয়া লেগে সবুজের তম্বুরার তানে।
এই বিশ্বসত্তার পরশ
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ

তুমি লব অন্তরে অন্তরে,
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়। ('জন্মদিন')

বিশ্বসত্তার গভীর পরিচয়, গভীরতর স্পর্শের এই আবেগময় প্রকাশ "পরিশেষে"র অনেক কবিতায়; সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজীবনের প্রতি গভীর প্রীতি ও ভালবাসার। কবি ত এবারও বারবার বলিতেছেন, তাঁহার আয়ুসূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলিয়া পড়িতেছে, শেষবারের মতন তিনি প্রাণ ভরিয়া এই ধরণীর নিঃশ্বাস টানিয়া লইতেছেন; কিন্তু প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে তিনি আবার নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলেন, যেখানে প্রাণমন্ত্রের সাধনা, যেখানে যৌবন প্রাচুর্য, যেখানে সৌন্দর্য, যেখানে জীবনের নবীন বসন্ত সেইখানেই, জীবন-সায়াহ্নেও মন ও চিত্ত সেইখানেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে—চিরসঙ্গিনীর সঙ্গে তাঁহার জীবনের বিচ্ছেদ এখনও ত ঘটে নাই। এখনও নূতন জীবন, নূতন সম্ভাবনা নূতন করিয়া হাতছানি দিয়া তাঁহাকে ডাকে—"পরিশেষে"র অনেকগুলি কবিতায় এই ডাক শুনা যায়। বৃথাই তিনি পরিশেষ কল্পনা করিয়াছিলেন; তাঁহার কবিপুরুষের চরম পরিণাম, পশ্চিম দিগন্তে রবি-প্রদক্ষিণের শেষ তো কোথাও নাই! সেই অতি পুরাতন কথা—তিনি ত চিরযাত্রী, চিরপথিক, তাঁহার ত কোথাও শেষ নাই, পরিশেষ নাই, সমাপ্তির বিচ্ছেদ রেখা নাই।

হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম;
তীর্থ তব পদে পদে;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে,
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে প্রলয়ের পলকে পলকে। ('পান্থ')

এই চির পথিকের মৃত্যু কোথায়, বিচ্ছেদ কোথায়? আর থাকিলেই মৃত্যু তাহাপেক্ষা বড় হইবে কেন? মৃত্যুভয় চিরপথিককে পীড়িত করিবে কেন?

যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড় বলে নিয়েছিনু গনি।
তোমার আঘাত-সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে। ('মৃত্যুঞ্জয়')

কাজেই "পুনশ্চ" জীবনের যাত্রা শুরু হইল। বিশ্বসত্তার স্পর্শ যাঁহার জীবনে এখনও গভীর, এখনও যিনি মাটির কাছাকাছি থাকিয়া এই ধরণীর সঙ্গে প্রীতিতে ও

ভালবাসায় বাঁধা পড়িয়া আছেন, যিনি চিরপথিক, এখনও নূতন জীবন, নূতন সম্ভাবনা রুদ্রের আহ্বানে যাঁহাকে ডাকে, যৌবন ও সৌন্দর্য-প্রাচুর্য যাঁহার চিত্তকে এখনও উদ্বেল করিয়া তোলে, সত্তর বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়াই ত তাহার জীবনের চরম পরিণাম, পরিপূর্ণ শেষ দেখা দিতে পারে না! কাজেই "পরিশেষ" রচনা শেষ হইলেও "পুনশ্চ" বলিয়া জীবন আবার আরম্ভ করিতে হয়। কবি-মানসের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই দুটি গ্রন্থের নামাকরণ এত সার্থক ও অর্থব্যঞ্জক যে মানস-ইতিহাসটুকু না জানিলে, না নাম দু'টির না কবিতাগুলির রহস্য ধরা পড়ে।

"পরিশেষে"র কয়েকটি কবিতার পশ্চাতে সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বঙ্গাব্দ ১৩৩৮'এ ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে গুরুতর আবর্তন চলিতেছে, রাষ্ট্রীয় অবিচারের উপর সাম্প্রদায়িক কোলাহল নরহত্যায় রূপান্তরিত হইয়াছে; কবির মন অত্যন্ত বিচলিত। তাহার উপর প্রাকৃতিক বিপ্লব—বন্যা, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ। এই বৎসরেরই মাঝামাঝি (১৬ আশ্বিন) হিজলি জেলে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে জেল কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সামান্য কারণে গুলি করিয়া হত্যা করেন এবং নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জরিত করেন। ইহার প্রতিবাদে কলিকাতায় মনুমেণ্টের নিচে যে বিরাট জনসভা আহূত হয় তাহার সভাপতিমঞ্চ হইতে কবি বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারণ করিলেন, "ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতন নীরব করে দিয়েছে।" এই ঘটনার সরকারী রিপোর্ট যথারীতি প্রকাশিত হইবার পর ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র "স্টেট্‌স্‌ম্যান" খ্রীষ্টানোচিত আদর্শের কথা তুলিয়া নর-ঘাতকদের ক্ষমা করিতে বলেন। তাহার উত্তরে কবি বলিলেন, "হিজলি-কারার যে-রক্ষীরা সেখানকার দুজন রাজবন্দীকে খুন করেছে তাদের প্রতি কোনো একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র খ্রীষ্টোপদিষ্ট মানব-প্রেমের পুনঃপুনঃ ঘোষণা করেছেন। অপরাধকারীদের প্রতি দরদের কারণ এই যে, লেখকের মতে নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের 'পরে এত বেশি অসহ্য চাপ লাগে যে, বিচারবুদ্ধিসংগত স্থৈর্য তাদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এই সব অত্যন্ত চড়া নাড়ীওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মান ভোগ করে থাকে, এদের বাসা আরামের, আহার বিহার স্বাস্থ্যকর!—এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেই সব হতভাগ্যদের যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্ট কালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়ন করছে। * * *" এই সমস্ত ঘটনাই পাঠক সাধারণের স্মৃতির সীমানার মধ্যে। তবু, উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইহার কয়েকমাস পরই লণ্ডনে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ভাঙিয়া গেল, দেশের মাটিতে পা দিতে না দিতেই গান্ধীজি ১৯শে পৌষ কারারুদ্ধ হইলেন। একে দেশে নানা অশান্তির ব্যাপারে কবির মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ভারাক্রান্ত, তাহার উপর গান্ধীজির বন্ধন তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিল। দেখিতে দেখিতে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় আবর্ত ঘনাইয়া উঠিল, এবং সমস্ত দেশের যৌবন সেই আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িল। গান্ধীজির বন্ধনের কয়েকদিনের মধ্যেই কবি লিখিলেন 'প্রশ্ন' কবিতা। এই বন্ধন পীড়িত দেশে গান্ধীজির ক্ষমা ও অহিংসার আদর্শ মুক্তি আনিবে কবির মনের একদিকে এই ভরসা, এই বৃহৎ মানবস্বাধীনতার আদর্শের প্রতিই তাঁহার অন্তরের অনুরাগ, অথচ আর একদিকে তিনি দেখিতেছেন আমাদের শাসক ও শোষকবর্গের নির্মম নিষ্করুণ অত্যাচার অবিচার। মনের মধ্যে 'প্রশ্ন' ঘনাইয়া উঠাও একান্তই স্বাভাবিক, এমন কি, যে-রবীন্দ্রনাথ ভাগবত

ইচ্ছার কল্যাণ-নির্দেশে বিশ্বাসী, মঙ্গলময় মানব-পরিণামে বিশ্বাসী তাঁহার পক্ষেও স্বাভাবিক।

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমাদের যুগে গান্ধীজি ত সেই দূত, কিন্তু সেই দূতের মহনীয় আদর্শ সত্ত্বেও

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটা, এই ত ভারতীয় জীবনের দুঃসহ ট্র্যাজেডি! এই ট্র্যাজেডি নিত্য অভিনীত হইতে দেখিয়াছেন কবি চোখের সম্মুখে—হিজলির গভীর মর্মবেদনা কবি তখনও ত ভোলেন নাই। এই কারণেই

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো!

কী দুঃসহ বেদনায় এ সন্দেহ জাগিয়াছে, সমসাময়িক ঘটনার দিকে তাকাইলে তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত; সেই যৌবনান্দোলনের প্রেক্ষাপটে 'অবাধ' কবিতাটির মতন রচনার অর্থও সুস্পষ্ট, এবং একই অনুভূতির জারিত নির্যাস তাহার সৌরভ ছড়াইয়াছে আরও কয়েকটি কবিতায় যেখানে রূপরসগন্ধময় জীবন ও যৌবনবন্দনা বিভিন্ন ভাব ও বস্তুর আধারে দেদীপ্যমান।

রূপ ও রীতির দিক হইতে এবং কতকটা ভাবানুষঙ্গের দিক হইতেও "পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী" কিছুটা একগোত্রের; এই কারণে এবং আলোচনার সুবিধার জন্য এই চারিটি গ্রন্থের আলোচনা পরে করা অন্যায় হইবে না। তাহার আগে ঐতিহাসিক ক্রমের একটু ব্যতিক্রম করা হইলেও "বিচিত্রিতা" সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে।

"বিচিত্রিতা" প্রকাশিত হয় ১৩৪০'র শ্রাবণ মাসে। এই গ্রন্থে ৩১টি নানা বিচিত্র বর্ণের ও রেখার ছবি। ছবিগুলি রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ কর, গৌরী দেবী, সুনয়নী দেবী, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রতিমা দেবী, মনীষী দে প্রভৃতি বিখ্যাত বাঙালী চিত্রকরদের আঁকা। বলা বাহুল্য,

গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র ও নন্দলালের ছবিগুলি এই অভিনব কাব্যগ্রন্থটিকে উজ্জ্বলতা দান করিয়াছে। ছবিগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই রচনাগুলির সৃষ্টি, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই রচনাগুলি উপলক্ষ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে; ছবির সূত্র মাত্র ধরিয়া কবি নিজের মনন-কল্পনাকে প্রসারিত করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্বেও, সার্থক রবীন্দ্র-প্রতিভাদীপ্ত রচনা এই গ্রন্থটিতে খুব বেশি নাই, এবং মনন-কল্পনার নূতনত্বও প্রায় অনুপস্থিত। 'কুমার', 'শ্যামলা', 'ছায়াসঙ্গিনী', 'ভীরু', 'কালোঘোড়া' প্রভৃতি কয়েকটি সার্থক কবিতার সঙ্গে "মহুয়া-পরিশেষে"র ভাবাত্মীয়তা লক্ষণীয়; ছোটছোট দু'একটি রচনা, যেমন 'কন্যা-বিদায়' এবং 'বিদায়' চিত্রনিরপেক্ষ হইয়াও সার্থক। একথা উল্লেখযোগ্য যে, অধিকাংশ সার্থক রচনা গগনেন্দ্রনাথের ছবি উপলক্ষ্য করিয়া; নিঃসন্দেহে গগনেন্দ্রনাথের সাদায়-কালোয় রূপরহস্যময় ছবিগুলি কবির কল্পনাকে শক্তি ও মুক্তি দিয়াছে সকলের চেয়ে বেশি। বস্তুত, এই কবিতাগুলিতে অলক্ষ্যে গগনেন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার প্রতি যে-সম্মান দান করা হইয়াছে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের শিল্পী ও শিল্পরসিক সমাজ এই প্রতিভাবান শিল্পীকে সেই সম্মান দান করেন নাই। আমি নিজে সখেদে মনে করি, গগনেন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা এখনও অজ্ঞাত এবং অনাদৃত।

"বীথিকা" প্রকাশিত হয় ১৩৪২'র ভাদ্র মাসে। কবির অন্যতম এই সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থটিতে উনসত্তরটি কবিতা আছে, এবং তাহাদের প্রতেকটিই সমিল কবিতা। একান্ত আত্মলীন ভাব-গভীরতায়, ব্যক্তি-জীবনের ছায়ায় ভাবনায়, বিশ্বসত্তার সুগভীর স্পর্শানুভূতিতে এবং মনন-কল্পনার স্বকীয়তা ও দ্বিধাহীন বিশ্বস্ততায় প্রায় প্রত্যেকটি কবিতা সমুজ্জ্বল ও সার্থক। জীবনের শেষতম পর্বের অনেক কল্পভাবনার আভাস "বীথিকা"র কবিতাগুলিতে সহজেই ধরা পড়ে। সত্তরোত্তীর্ণ কবির "বীথিকা" তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ একথা বলিতে দ্বিধা করার কোনও কারণ নাই। পাঠক সমাজে এই গ্রন্থটি কেন যে এখনও যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে নাই, জানি না।

"বীথিকা"র কবিমানস অতি গভীরে প্রসারিত, গভীর গম্ভীর জীবন-জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত। কবিতার বিষয়বস্তু যাহাই হউক, প্রায় সর্বত্রই অতীত ও বর্তমান, নিসর্গ ও বিশ্বজীবন বা এককথায় বিশ্বসত্তা, প্রেম ও অনুরাগ, জীবন ও মৃত্যু, ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া ও স্বপ্ন, মনন ও কল্পনা, সব কিছু জড়াইয়া সব কিছু বিদীর্ণ করিয়া এই আত্মলীন জীবনজিজ্ঞাসা একটি পরিব্যাপ্ত সুগভীর বিশ্বাস, একটি শান্ত নিঃস্তব্ধ অনুভব, এবং জীবনের পুরাতন মূলগত দর্শন ও আদর্শগুলির নূতন মূল্য আবিষ্কারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বিচিত্র ছন্দে ও বর্ণে, বিচিত্র ভাব ও বস্তু পরিবেশের মধ্যে। এই ভাব ও বস্তু পরিবেশ একান্তই রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত, সন্দেহ নাই, এবং এই দৃষ্টি একেবারে সৃষ্টির ও প্রলয়ের মূল পর্যন্ত প্রসারিত। ইহার দুই প্রান্তে দুই মহাশূন্য এবং তাহাদের মাঝখানে নানা ঐতিহ্যময়, নানা কোলাহলময়, রূপ-রহস্যময় প্রাণ-মহিমার সীমাহীন বিস্তৃতি। ইহার কিছুই কবির দর্শন ও মনন হইতে বাদ পড়ে নাই। গভীর চিত্র ও কল্পনা-সমৃদ্ধিতেও কবিতাগুলি প্রাণবান। এখানে ওখানে দু'চারিটি কবিতার পরিচয় লইলেই উক্তিগুলির সার্থকতা ধরা পড়িবে।

প্রথম কবিতাটিতে মহা অতীতের সঙ্গে কবির মিতালি; সেই মহা অতীত 'রূপহীন দেশে দিবালোকে তারালোক জ্বালিয়া' ধ্যানে বসিয়া আছে, সেখানে

> রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
> গোধুলি ধূসর আবরণে,
> অতীতের শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।

এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়
এ যে চিত্তময় ;

* * *

আলোড়িত এই শূন্য যুগে যুগে উঠিয়াছে জ্বলি,
ভরিয়াছে জ্যোতির অঞ্জলি।
বসে আছি নির্নিমেষ চোখে
অতীতের সেই ধ্যানলোকে,—
নিঃশব্দ তিমির তটে জীবনের বিস্মৃত রাত্রির।

* * *

কল কোলাহলশান্ত জনশূন্য তোমার প্রাঙ্গণে,
যেখানে মিটেছে দ্বন্দ্ব মন্দ ও ভালোয়,
তারার আলোয়
সেখানে তোমার পাশে আমার আসন পাতা,—
কর্মহীন আমি সেথা বন্ধহীন সৃষ্টির বিধাতা। ('অতীতের ছায়া')

একদা যৌবনের দুই দুরু দুরু বক্ষের প্রেমযাত্রা আজ এই জীবন-সায়াহ্নে সুদূর গগনের দিকে শান্ত হইয়া চাহিয়া আছে,

অকথিত কোন্ কথা
কী বারতা
কাঁপাইছে বক্ষের পঞ্জরে।
বিশ্বের বৃহৎ বাণী লেখা আছে যে মায়া অক্ষরে,
তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে
ওদের মিলন লিপি, চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে। ('দুজন')

কবি আজ কামনা করিতেছেন, রাত্রিরূপিনীর প্রেমে

চিত্তে মোর যাক থেমে
অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ,
দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহ।

* * *

অপ্রমত্ত মিলনের মন্ত্র সুগম্ভীর
মন্ত্রিত করুক আজি রজনীর তিমিরমন্দির। ('রাত্রিরূপিণী')

এমন যে কৈশোরের প্রিয়া তাহাব সম্বন্ধেও কবির উক্তি

হে কৈশোরের প্রিয়া,
এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে
কোন্ পার হতে এনে দিলে মোর পারে
অনাদি যুগের চিরমানবীর হিয়া।
দেশের কালের অতীত যে মহাদূর
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর,—
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে। ('কৈশোরিকা')

একদিকে এই মহামৌন শূন্যতা যে-শূন্যতা গভীর চিত্তময় রূপময় কবিচিত্তে তাহারই কামনা। আর একদিকে প্রলয়ের অন্ধকার, তাহাও শূন্য, কিন্তু এই শূন্যতা কবিচিত্ত কামনা করে না। এই শূন্য অন্ধকার, দূরত্ব ও ব্যবধান রচনা করে, চেতনাকে আবিল করে।

সে যে সৃষ্টি করে নিত্য ভয়।
ছায়া দিয়ে রচি তুলে আঁকা বাঁকা দীর্ঘ উপছায়া,
জানারে অজানা করে, ঘেরে তারে অর্থহীন মায়া।
পথ লুপ্ত ক'রে দিয়ে যে পথের করে সে নির্দেশ
নাই তার শেষ।
সে-পথ ভুলায়ে লয় দিনে দিনে দূর হতে দূরে
ধ্রুবতারাহীন অন্ধপুরে।

* * *

দানব বিলুপ্তি আনে, আঁধারের পঙ্কিল বুদ্বুদে
নিখিলের সৃষ্টি দেয় মুছে;
কণ্ঠ দেয় রুদ্ধ করি, বাণী হতে ছিন্ন করে সুর,
ভাষা হতে অর্থ করে দূর;
উদয়দিগন্তমুখে চাপা দেয় ঘন কালো আঁধি,
প্রেমেরে সে ফেলে বাঁধি
সংশয়ের ডোরে;
ভক্তিপাত্র শূন্য করি শ্রদ্ধার অমৃত লয় হ'রে।
মূক অন্ধ মৃত্তিকার স্তর,
জগদ্দল শিলা দিয়ে রচে সেথা মুক্তির কবর। ('প্রলয়')

রূপকামী মুক্তিকামী দীপ্তিকামী কবি এই প্রলয়ের শূন্য অন্ধকারের কারাগার কামনা করিবেন কি করিয়া? একদিকে অস্তিত্বময় গভীর মহামৌন বিশ্বসত্তার শূন্যময় কল্পনা, আর একদিকে রুদ্ধসৃষ্টি অন্ধকারের বন্ধ্যা শূন্যতা, এ দু'য়ের কোথাও কোন মিল নাই; কাজেই কবিচিত্ত প্রাণপ্রাচুর্য ও জীবন-চাঞ্চল্যের বিচিত্র রূপের মধ্যেও কামনা করেন শান্ত স্তব্ধ মৌন গভীরতা, কামনা করেন অন্তরের নিভৃত কুলায়, কামনা করেন তপস্যার গভীর নীরবতা।

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন

* * *

সেই মহাবাণীময় গহন মৌনতলে
নির্বাক জলে স্থলে
শুনি আদি ওংকার
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।

ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে
কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে
তার মাঝে নিই স্থান,
চেয়ে-থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান। ('আদিতম')

বেশ বুঝা যায় চিত্তের আকূতি প্রসারিত হইয়াছে জীবনের সুগভীর রহস্যময়তার দিকে; এবং এই গভীর রহস্যময়তা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। "বীথিকা"য় প্রেমের কবিতা আছে, সেগুলি প্রায়ই পুরাতন স্মৃতিবহ; কয়েকটি আখ্যানবাহী লীলাচপল কবিতাও আছে। তাহা ছাড়া, আত্মলীন নিসর্গানুভূতি, এবং ব্যক্তিজীবনের পরিচয়বাহী বিভিন্ন বিষয়াশ্রয়ী বিচিত্র

অনুভূতির কয়েকটি কবিতাও আছে। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দৃষ্টি প্রসারিত জীবনের শান্ত গভীর রহস্যময়তার অভিমুখে। ক্ষণিক ভাবনা, ক্ষণিক মায়ার ছন্দরূপের মধ্যেও এই স্তব্ধ সুদূর সুবিস্তৃত রহস্যময়তার আভাস।

মাঝখানে দু'একটি কবিতায় (যেমন, 'বিরোধ') এবং শেষের দিকে কয়েকটি কবিতায় একটি নূতন সুর শোনা যায়। সে সুর ভাঙনের, বিদ্রোহের, নূতন সৃষ্টির, বন্ধন হইতে কলুষ হইতে মুক্তির সুর, সংগ্রামের সুর।

ভাঙনের আক্রমণ
সৃষ্টিকর্তা মানুষেরে আহ্বান করিছে অনুক্ষণ।

* * *

উৎপীড়িত সেই জাগরণে
তন্দ্রাহীন যে-মহিমা যাত্রা করে রাত্রির আঁধারে
নমস্কার জানাই তাঁহারে।
নানা নামে আসিছে সে নানা অস্ত্র হাতে
কণ্টকিত অসম্মান অবাধে দলিয়া পদপাতে—
মরণেরে হানি
প্রলয়ের পান্থ সেই, রক্তে মোর তাহারে আহ্বানি। ('বিরোধ')

একই সুর শোনা যায় 'কলুষিত' কবিতায়—

মন মোর কেঁদে আজ ওঠে জাগি
প্রলয় মৃত্যুর লাগি।
রুদ্র, জটাবন্ধ হতে করো মুক্ত বিরাট প্লাবন,
নীচতার ক্লেদপঙ্কে করো বন্যা ভীষণ, পাবন।
তাণ্ডব নৃত্যের ভরে
দুর্বলের যে-গ্লানিরে চূর্ণ করো যুগে যুগান্তরে
কাপুরুষ নির্জীবের সে নির্লজ্জ অপমানগুলি
বিলুপ্ত করিয়া দিক উৎক্ষিপ্ত তোমার পদধূলি।

অথবা, 'অভ্যুদয়' কবিতায়

আকাশে ধ্বনিছে, বারংবার—
"মুখ তোলো,
আবরণ খোলো,
হে বিজয়ী, হে নির্ভীক,
হে মহাপথিক,
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে
মুক্তির সংকেতচিহ্ন
যাক লিখে লিখে।"

এই সংগ্রামের সুর আরও দু'একটি কবিতার নূতন ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

একেবারে শেষ দুটি কবিতায় মৃত্যুর পদচিহ্ন আঁকা। শুধু ক্ষণিক মৃত্যুভাবনার বিলাস নয়, এ যেন মৃত্যু দর্শন ঘটিয়াছে নিজের জীবনে, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয় হইয়াছে—যে-পরিচয় তাহার সমগ্র নিবিড়তা লইয়া ধরা পড়িয়াছে, কবির শেষতম কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে, "রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিন-শেষলেখা"য়। এ-অনুভূতি এই প্রথম এবং একান্তই অভূতপূর্ব। অতীতের সমস্ত গ্লানি ও আবর্জনা, ক্লান্তি ও বেদনা, প্রীতি ও সুখস্মৃতি, সব কিছুর আলিঙ্গন শিথিল করিয়া

এই দেহ যেতেছে সরিয়া
মোর কাছ হতে।
সেই রিক্ত অবকাশ যে-আলোতে
পূর্ণ হয়ে আসে
অনাসক্ত আনন্দ-উল্লাসে
নির্মল পরশ তার
খুলি দিল গত রজনীর দ্বার।
নব জীবনের রেখা
আলোরূপে প্রথম দিতেছে দেখা;
*   *   *
ভাসিতেছে সত্তার প্রবাহে
সৃষ্টির আদিম তারাসম
এ চৈতন্য মম।
*   *   *
পিছনের ডাক
আসিতেছে শীর্ণ হয়ে; সম্মুখের নিস্তব্ধ নির্বাক
ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ময়
অশোক অভয়,
স্বাক্ষর লিখিল তাহে সূর্য অস্তগামী।
যে মন্ত্র উদাত্ত সুরে উঠে শূন্যে সেই মন্ত্র—'আমি'। ('শেষ')

সর্বশেষ কবিতায় কবি বলিতেছেন, দেহে মনে যখন সুপ্তি ভর করে, চৈতন্যলোকে যখন কল্পান্তর দেখা দেয় তখন জাগ্রত জগৎ মিথ্যার কোঠায় চলিয়া যায়; নিদ্রার শূন্যতা ভরিয়া তখন যে স্বপ্নের সৃষ্টি হয় তাহাকেও তখন সত্য বলিয়া মনে হয়। সে-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যখন চিত্ত নূতন এক পৃথিবীতে জাগিয়া উঠে তখন সেই জাগ্রত জগৎই সত্য বলিয়া মনে হয়, স্বপ্নে দেখা নিশ্চিতরূপ তখন অনিশ্চিতের কোঠায় চলিয়া যায়।

তাই ভাবি মনে,
যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্বপনে,
মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে
আজিকার এ জগৎ অকস্মাৎ যায় টুটে,
সবকিছু অন্য-এক অর্থে দেখি,—
চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি তারে জানিবে কি।
সহসা কি উদিবে স্মরণে
ইহাই জাগ্রত সত্য অন্তকালে ছিল তার মনে। ('জাগরণ')

ইহা যেন শুধু প্রশ্ন মাত্র নয়, যেন ইহা প্রত্যক্ষ কল্প-অভিজ্ঞতার বাণীময় রূপ!

বার

পুনশ্চ (১৩৩৯)
শেষসপ্তক (১৩৪২)
পত্রপুট (১৩৪৩)
শ্যামলী (১৩৪৩)

"পুনশ্চ" প্রকাশিত হয় ১৩৩৯'র আশ্বিনে, "শেষসপ্তক" ১৩৪২'র বৈশাখে, "পত্রপুট"

ঠিক একবৎসর পরে, এবং "শ্যামলী" ১৩৪৩'র ভাদ্রে। 'গদ্য'-কবিতা বলিতে যে-ধরনের কাব্যরচনার দিকে আমরা ইঙ্গিত করি, তাহাদের যথার্থ ও সার্থক প্রকাশ এই গ্রন্থ চারিটিতেই দেখা যায়। বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যে কাব্য-রচনার এই বিশিষ্ট রীতির স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ, এবং ইহার সূচনা দেখা গিয়াছিল "লিপিকা"তেই। কিন্তু "লিপিকা"রও আগে "বলাকা"তেই কবি এক ধরনের ছন্দ-স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; গদ্য ও পদ্যের মধ্যে একটা সার্থক সমন্বয় সেই মুক্তক ছন্দের নিয়মিত বৃত্তপ্রবাহ ও অন্তঃমিলের মধ্যেই ধরা পড়িয়াছিল। সুঅভ্যাসগত ছন্দের যত্নবিন্যস্ত অতিপিনদ্ধ নিয়মানুগত্যের মধ্যে, অন্তঃমিলের এবং বৃত্তপ্রবাহের উত্থান পতনের সংগীতাবেশের মধ্যে গদ্যের যুক্তিশৃঙ্খলা, চিন্তাধারার ছন্দানুগামী সরল অথচ শক্তিমান একটা প্রবাহ সঞ্চারের সার্থক চেষ্টা ধরা পড়িল "বলাকা-পলাতকা-মহুয়া"য়; বস্তুত "বলাকা"র ভাবপ্রসঙ্গের এবং সেই হেতু মনন-কল্পনার মৌলিকতাই এই নূতন রীতি প্রবর্তনের হেতু। "বলাকা"র ছন্দ ঐ কাব্যেরই আত্মার নিগূঢ় অপরিহার্য অঙ্গাভরণ, ভাব ও ছন্দ দুইই এক মর্মগত ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। কিন্তু "পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী"তে তিনি যে নূতন ছন্দরীতির প্রবর্তন করিলেন তাহা অন্তঃমিল ও বৃত্তপ্রবাহধৃত মুক্তক ছন্দ নয়, অথচ সেই সার্থক পরীক্ষারই যুক্তি শৃঙ্খলাময় চরম পরিণতি, একথা বলিলে বোধ হয় খুব অন্যায় বলা হয় না।

এই নূতন ছন্দ-রীতির আঙ্গিক-কৌশল আমার আলোচনার বাইরে; ইহার ব্যাকরণ-রীতিবিশ্লেষণ ছান্দসিকের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ছন্দ ত শুধু কাব্যের বাহ্যসৌষ্ঠব বা অলংকার মাত্র নয়, তাহা যে কাব্যের সহজাত রূপমূর্তি এবং সেই হেতু কবির মনন-কল্পনার সঙ্গে তাহার যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। "বলাকা"য় যে সার্থক পরীক্ষা তিনি করিয়াছিলেন, বৃত্তপ্রবাহ এবং অন্তঃমিল উপস্থিত থাকার দরুন সেক্ষেত্রেও তাঁহার কবিতা একান্তভাবে সংগীতের আবেশ হইতে মুক্তিলাভ করে নাই, সে-প্রয়াসও হয়ত তিনি করেন নাই। কিন্তু, এবার তিনি প্রয়োজন অনুভব করিলেন, সংগীতের আবেশ হইতে কবিতার পরিপুর্ণ মুক্তির, গদ্যের দৃঢ় কাঠিন্য এবং চিন্তাধারার প্রবাহানুগামী সরল প্রবহমান গতির মধ্যে কাব্যের ধ্বনি ও রস সঞ্চারের, এবং বস্তু বা বিষয়-গৌরবের উপরই আপন বক্তব্যের একান্ত প্রতিষ্ঠার। কবিতা সংগীত ও সুরের আবেশ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের বক্তব্য বিষয়ের উপর স্থির ও সবল নির্ভরতায় দাঁড়াইতে পারিবে না কেন, ইহাই যেন কবির অন্তরের প্রশ্ন। অন্তঃমিল ও বৃত্তপ্রবাহের সংগীতময়তা নয়, কেবল ভাব-প্রবাহের উত্থান পতনের প্রবহমানতার উপর, ধ্বনিপ্রবাহের স্রোতাবেগের উপরই এই নূতন গদ্যছন্দের নির্ভর। এই নূতন ছন্দ বাহিরের ছন্দরূপের উপর নির্ভর করে না, করে অন্তরের ভাবচ্ছন্দের উপর, এবং এই ছন্দের ব্যবহার একান্ত ভাবেই নির্ভর করে গদ্যের স্বাধীন অনিয়মিত প্রবাহের অবাধ আধিপত্যের উপর।

এই নূতন রীতির প্রবর্তন যে কিছু আকস্মিক খেয়াল বশে নয় তাহা "বলাকা-লিপিকা"র রীতি-পরীক্ষাতেই সপ্রমাণ। কিন্তু রীতি-বিকাশের ইতিহাসের দিক ছাড়িয়া দিলেও একটু অনুসন্ধানেই ধরা পড়ে, ইহার পশ্চাতে কবির মনন-কল্পনার ঋতু পরিবর্তনের হেতুটাই প্রবলতর। বস্তুত, ঋতু পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়াই রীতি-পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্ব "পুনশ্চ" হইতেই দৃষ্টিগোচর, তাহার মধ্যেই ঋতু পরিবর্তনের প্রথম প্রমাণ, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ দৃষ্টিভঙ্গির নূতনত্ব। এই নবাবিষ্কৃত দৃষ্টিভঙ্গিই নূতন রীতি-প্রবর্তনের হেতু। এই নূতন রীতির গতিপ্রকৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে

কবি বারবার নানাভাবে নানা যুক্তি ও উপমার সাহায্যে নিজের মনন ও আদর্শ, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে প্রয়াস-পাইয়াছেন; তাহার ভিতর এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যাও প্রচ্ছন্ন। "পুনশ্চ"-গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন।

"গদ্যকাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, গদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হ'তে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। * * *"

"পুনশ্চ"র প্রথম কবিতা 'কোপাই' নদীর ভাষার মধ্যে কবি তাঁহার নূতন রীতির প্রতীক আবিষ্কার করিয়াছেন—

ওর [কোপাই'র] ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা,—
তাকে সাধু ভাষা বলে না।
জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।

* * *

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাক্ষী করে নিলে,
সেই ছন্দের আপস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে;
পার হয়ে যাবে গরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে,
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা,
আর মাসিক তিনটাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

এই গ্রন্থেরই দ্বিতীয় কাবতায় একই বিষয়ের ভিন্ন অভিব্যক্তি; নিজেব নূতন উদ্ভাবিত রীতির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এইবার কবি বলিলেন,

গদ্য এলো অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এলো
ঠেলাঠেলি করে।
ছেঁড়া কাঁথা আর শাল দোশালা
এলো জড়িয়ে মিশিয়ে,
সুরে বেসুরে ঝনঝন্ ঝংকার লাগিয়ে দিলো।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়লো গদ্যবাণীর মহাদেশ।
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিঃশ্বাস,
কখনো ঝরালে জলপ্রপাত।

* * *

একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানা রকম গতি অবগতি।

বাহিরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয়না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।

গর্জন ও গান, তাণ্ডব ও তরল, অগ্নিনিঃশ্বাস ও জলপ্রপাত, শ্যামলে কঠোরে মেশানো এই নূতন কাব্যরূপ, একথা যে কত সত্য তাহা ধরা পড়ে বিশেষভাবে "শেষসপ্তক" ও "পত্রপুটে"র সার্থক ও গভীর ভাব-ব্যঞ্জক দীর্ঘ কবিতাগুলিতে। কিন্তু সে যাহাই হউক,. এই উদ্ধৃত কবিতা দুটির ভিতর কবির দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব সুস্পষ্ট। তাঁহার ছন্দরূপই যে শুধু জনগণের সাধারণ জীবন-যাত্রার সাধারণ গৃহস্থপাড়ার ভাষার তাহা নয়, তাঁহার মনন-কল্পনাও আশ্রয় করিতে চলিয়াছে বৃহত্তর জন-মানসকে, নূতন কালের নূতন সমাজ-চেতনাকে, কেবল সাধু ও গুরু মুষ্টিমেয় সমষ্টি-মানসের বুদ্ধি ও চেতনাকে নয়। দৃষ্টিভঙ্গির এই অভিনবত্ব তাহার সুস্পষ্ট উক্তি লাভ করিয়াছে "পুনশ্চ"র তৃতীয় কবিতা 'নূতন কাল'-এ

কাল আপন পায়ের চিহ্ন যায় মুছে মুছে
স্মৃতির বোঝা আমরাই বা জমাই কেন,
একদিনের দায় টানি কেন আর একদিনের 'পরে,
দেনাপাওনা চুকিয়ে দিয়ে হাতে হাতে
ছুটি নিয়ে যাই না কেন চলে সামনের দিকে চেয়ে।

*   *   *

তাই ফিরে আসতে হলো আর একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালবাসার দোহাই মেনে।
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে,
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারি কথা মনে করে।
যেন সময় হলে একদিন বলতে পারো
মিটলো তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগলো তোমাদেরও মনে।
দশজনের খ্যাতির দিকে হাত বাড়াবার দিন নেই আমার।
কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে প্রাণের টানে।
সেই বিশ্বাসকে কিছু পাথেয় দিয়ে যাব
এই ইচ্ছা।

এই একই কথা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে "শেষসপ্তকে"র তিনটি কবিতায়। বিশ নম্বরে কবি খোলা আকাশের তলে রাঙামাটির পথের ধারে সভা করিয়া বসিয়াছেন। এতকাল যত কাব্যরচনা করিয়াছেন সেই রচনা পুঁথিখানা খুলিয়া পড়িতে গিয়াই মনে বড় সংকোচ হইল, এই সব রচনা বড় কোমল, বড় স্পর্শকাতর, ইহাদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু ও কুণ্ঠিত। ইহারা অন্তঃপুরিকা, ইহাদের অবগুণ্ঠনের উপর সোনার সূতায় ফুলকাটা পাড়। মাটিতে চলিতে ইহাদের পা' সরে না, ইহারা বহুসম্মানে বন্দিনী, নৈপুণ্যের বন্ধনে ইহারা বাঁধা; এই পথের ধারের সভায় ইহাদের উপস্থিত করা চলে না। এখানে আসিতে পারে তাহারাই যাহাদের সংসার বন্ধন খসিয়াছে, অসংকোচ অক্লান্ত যাহাদের গতি, গায়ের বসন যাহাদের ধূলিধূসর, কাহারও মন জোগাইয়া চলিবার দায় যাহাদের নাই; অজ্ঞাত শৈলগুহায়,

জনহীন মাঠে, পথহীন অরণ্যে যাহাদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি জাগায়; তাহাদেরই জন্য কবির নূতন রচনার উদ্যম। কাজেই কবিতা পাঠ আর হইল না, কবি এই বলিয়া বিদায় লইলেন, "যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে, নিয়ে আসবো কঠিন চিত্ত উদাসীনের গান।" চব্বিশ নম্বর কবিতায় কবি এই নূতন রীতির রচনা সম্বন্ধে বলিলেন, ইহারা ছুটি পাওয়া নটী, ইহাদের উচ্চহাসি অসংযত খেলা ধূলা যেমন তেমন, ইহারা খেয়ালি ঝরনার ধারা, কোথাও মোটা, কোথাও সরু, কোথাও গুহায় লুকায়িত, কোথাও মোটা পাথরে ঠেকানো; তাহাদের মুঠার মধ্যে ধরা যায় না, তাহাদের পরিচয় অসাজানো আটপৌরে। পঁচিশ নম্বরেও প্রায় একই কথা। কবির বিগত যুগের রচনাগুলি আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা, সে-বাগান যেন রাজআদরে অলংকৃত মোগল বাদশাহ্‌র জেনানা। অথচ সেই বাগানের প্রাচীরের বাইরেই যে আগাছা ফুল তাহাদের উপরে অবারিত নীল আকাশ বিস্তীর্ণ। সমুন্নত তাহাদের স্বাধীনতা, স্বকীয় মুক্তিতেই তাহাদের সৌন্দর্যের মর্যাদা। তাহারা ব্রাত্য, সহজ, আচারমুক্ত; বাইরে শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি নাই, অথচ মজ্জার মধ্যে সংযম। ইহাদের ডালপালা বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে যথেচ্ছ ছড়ান।

ঋতু ও রীতি পরিবর্তন সম্বন্ধে কবির যাহা বক্তব্য তাহা সবিস্তারেই উল্লেখ করিলাম। স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে, কবি মনে করিতেছেন, এতদিন তিনি যাহাদের গান গাহিয়াছেন তাহারা বৃহত্তর জনসাধারণের পর্যায়ভুক্ত নয়, যে-রীতি ও ভাষায় গান ও কবিতা রচনা করিয়াছেন সে রীতি এবং ভাষাও জনগণের মুখের ভাষা ও কথার রীতি নয়। অথচ নূতন কাল ত তাহাদেরই। সুতরাং, আজ যদি কাহারও বুকের কথা কবিতায় গাঁথিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে তাহাদের কথাই বলিতে হইবে তাহাদেরই মুখের ভাষায় ও কথার রীতিতে। কাজেই এ-যুগের কবিতা হইবে সমস্ত কারুকৌশল বর্জিত, নিরলংকার, বিরল সৌষ্ঠব, অযত্ন গঠিত, সহজ, সবল, আচারমুক্ত।

"পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী" এই চারিটি গ্রন্থে রীতির পরিবর্তন যে ঘটিয়াছে, এবং ঋতু পরিবর্তনও যে এই গ্রন্থ ও পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে সুস্পষ্ট সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

কবির মনন-কল্পনায় তাহার পরিচয় অনস্বীকার্য। কিন্তু যে ইচ্ছা ও আদর্শের প্রেরণার বশে এই রীতি পরিবর্তন, সেই ইচ্ছা ও আদর্শ চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে কি? অর্থাৎ বৃহত্তর জনমানসের বুকের কথা তাহাদের মুখের ভাষা ও কথার রীতিতে রূপলাভ করিয়াছে কি?

সহসা এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া কঠিন। কবি-মনের এই ইচ্ছা ও আদর্শের আন্তরিকতায় এতটুকু অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তবু যেন মনে হয়, তাঁহার ইচ্ছা ও আদর্শ এই নূতন কাব্যরীতির মধ্যে যথাযথ প্রতিফলিত হয় নাই, হওয়ার বাধাও ছিল অনেক। প্রথমত, যে-ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি কবি এই চারিটি-গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন সেই ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি বহু অভ্যাসে, বহু সাধনায় আয়ত্ত এবং মনন-কল্পনার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, বহু আয়াস সত্ত্বেও তাহা বিদগ্ধজনেরই ভাষা, সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর সাহিত্যিক বোধ ও বুদ্ধিরই অধিগম্য সেই ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি—রবীন্দ্রনাথে তাহার অন্যথাই বা কি করিয়া হইবে? অনেক ক্ষেত্রে ভাব ও অনুভূতির সার্বিকতা অনস্বীকার্য, কিন্তু সেই ভাবানুভূতি যে-ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গিতে রূপায়িত তাহা বহু জনের মূঢ় মূক কণ্ঠের ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি নয়, তাহা একটা বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বহুদিনের সাধনার অপেক্ষা রাখে। দ্বিতীয়ত,

কবির মনন-কল্পনায় যে যুক্তি ও উপমা, যে চিত্র পরিবেশ, যে স্বপ্ন ও ছায়া, যে গাঢ় ভাব তন্ময় দৃষ্টি অথবা গভীর চিন্তাশীলতা রূপ লইয়াছে তাহা জনমানসের বিচরণক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে, সে মানস-ঐতিহ্যে এই ধরনের চিত্র, যুক্তি, উপমা, দৃষ্টি ও চিন্তা আজও স্থান লাভ করে নাই, করিলেও চিত্তের গভীরে তাহাদের মূল প্রসারিত হয় নাই। তৃতীয়ত, বিষয় নির্বাচনে নূতনত্ব সত্ত্বেও তাহাতে এমন কিছু নাই যাহার মধ্যে জনমানসের গভীর পরিচয় সুগভীর অভিজ্ঞতায় বর্ণিত হইয়াছে, অথবা যে-বিষয়বস্তু 'তেঁতুল' অথবা 'শালিখ' সত্ত্বেও রবীন্দ্রকাব্যে এমন কিছু জনগণমন-পরিচায়ক যাহার সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমাদের পরিচয় হয় নাই। সেইজন্যই মনে হয়, যে-আদর্শের প্রেরণার বশে কবি এই নূতন রীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সে-আদর্শ এই রীতির মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করে নাই। করে যে নাই, কবি হয়ত তাহা অনুভব করিয়াছিলেন, কারণ "শ্যামলী"র পর কবি আর এই নূতন রীতিতে কাব্য রচনা করেন নাই; তাঁহার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে অন্তঃমিল ও বৃত্তপ্রবাহধৃত প্রবহমান অসম ছন্দেরই প্রাধান্য। "প্রান্তিক" ও শেষতম চারিটি গ্রন্থে—"রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে-শেষলেখা"য় অন্তঃমিল বহুক্ষেত্রে অনুপস্থিত, কিন্তু বৃত্ত-প্রবাহের নিয়মিত তাল সুস্পষ্ট। যাহা হউক, এই নূতন রীতির মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা ও আদর্শ যে সার্থকতা লাভ করে নাই, এমন কি কোনও কাব্যরীতির মধ্যেই যে তিনি বৃহত্তর জনমানসের বুকের কথা তাহাদের মুখের ভাষা ও কথার রীতিতে রূপায়িত করিতে পারেন নাই, এ বেদনা তাঁহার মনে ছিল; মৃত্যুর কয়েক মাস আগেই তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই রূপায়ন সেই ভাবী কবির কবিকর্ম যিনি জন্মলাভ করিবেন সেই বৃহৎ জনগণের রক্ত অস্থি ও মজ্জা মন্থন করিয়া; সেই অজ্ঞাত কবিকে তিনি পূর্বাহ্ণেই অভিনন্দন জানাইয়া গিয়াছেন—

*   আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

*   *   *

এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার
প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।   ("জন্মদিনে", ১০নং)

কিন্তু কবির অন্তরের ইচ্ছা ও আদর্শ চরিতার্থতা লাভ করে নাই বলিয়াই, এই নূতন রীতির কাব্যমূল্য রসমূল্য কিছু কমিয়া যায় না। কাব্যরীতির ক্ষেত্রে এই 'গদ্য'-কবিতার একটা বিশেষ মূল্য আছে, "পুনশ্চ" ও "পত্রপুটে"র অধিকাংশ কবিতাই তাহার প্রমাণ। "পুনশ্চ"র 'শিশুতীর্থ,' 'প্রথম পূজা', "পত্রপুটে"র 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী' (৩নং), 'বসেছি অপরাহ্ণে পারের খেয়া ঘাটে' (১২নং), 'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত' (১৫নং),

প্রভৃতি কবিতা যে আর কোনও রীতিতে লেখা চলিত, একথার কল্পনা আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া, এই গ্রন্থচারিটির অনেকগুলি কবিতায় কল্পনার বিশ্বব্যাপী প্রসার, ভাবানুভূতির সুগভীর মহিমা এমন একটা উচ্চ স্তর স্পর্শ করিয়াছে, এমন একটা গভীর ঐক্য ও দৃঢ় সংহতি লাভ করিয়াছে যে, মনে হয় ইহাদের মানসিক ও বাহ্যিক গড়ন একান্ত ভাবে এই রীতিরই অপেক্ষা রাখে। গদ্যের দৃঢ় কাঠিন্য, উত্থান পতনের অনিয়মিত ধ্বনিতরঙ্গ, শব্দ ও পদের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট অর্থের ইঙ্গিত ছাড়া এমন কাব্যরস কিছুতেই সম্ভব হইত না। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এই যে, কবি এই দৃঢ় সুকঠিন রীতির মধ্যেও কেবল উচ্চস্তরের মনন-কল্পনার সাহায্যে ছন্দোবদ্ধ কবিতার আবেগ-কম্পিত বিপুল গতিবেগ, ধ্বনিতরঙ্গের অনিবার্য স্রোত আহরণ করিয়া গদ্য-কবিতারও একটি অন্তর্নিহিত গাঢ় অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়াছেন। আরও বিস্ময়কর, যে-সব কবিতা বিশ্বপ্রসারী কল্পনা এবং প্রগাঢ় মনন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, ব্যক্তিজীবনের দৃষ্টি-সমগ্রতার স্পর্শ যে-সব কবিতায় লাগিয়াছে, সেই সব কবিতার সহজ অথচ দীপ্তময় ওজঃশক্তি, বীর্যবান প্রবাহ, উপল কঠিন গতিবেগ। "পত্রপুটে" এই ধরনের দৃষ্টান্ত অতি সহজেই মিলিবে; উপরে আমি ঐ গ্রন্থ হইতে যে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতেই আমার এই উক্তি সমর্থিত হইবে। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলিয়াছেন, তরলে শ্যামলে কোমলে কঠিনে মিলিয়া গদ্যকাব্যে একটা সংযত সুসমঞ্জস রীতি আপনি গড়িয়া উঠে যাহার ভিতর অতিমাধুর্য, অতি-লালিত্যের কোনও অবকাশ থাকে না। এ কথা যে কত সত্য তাহা ধরা পড়ে আখ্যানমূলক বা প্রেমমূলক গদ্য কবিতাগুলিতে। "পুনশ্চ-শেষসপ্তক-শ্যামলী"তে এই ধরনের অনেকগুলি কবিতা আছে। একথা সত্য যে এই কবিতাগুলি আমাদের চিত্তে যে রস সঞ্চার করে তাহা খুব গাঢ় বা আবেশময় নয়; ইহারা ভাব বা সুরের অযথা অনুভূতির একটা গভীর মোহের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া আমাদের চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় না। কিন্তু এই অভিযোগ একান্তই অবান্তর, কারণ কবি তাহা কামনাও করেন নাই। এই কবিতাগুলিতে অনেকক্ষেত্রেই অবান্তর ঘটনার বিস্তৃতি আছে, তুচ্ছ বিচ্ছিন্ন অকিঞ্চিৎকর চিন্তা ও কল্পনার বিবৃতি আছে, অতি পল্লবিত ভাষণেরও অভাব নাই, কিন্তু বাস্তব জীবনে দৈনন্দিন সংসারের প্রেম কাহিনী বা অনুরূপ আখ্যানের সঙ্গে এ সমস্ত অনিবার্য ভাবে জড়িত মিশ্রিত, এবং কবির সাময়িক অনুভূতিতে এই সমস্তই একটি ঐক্যের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। বাস্তব জগতের সমস্ত বিক্ষেপে সমস্ত অবান্তর ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়া মিশাইয়াই তিনি ইহাদের রস উপভোগ করিয়াছেন, এবং পাঠকচিত্তেও তরলে শ্যামলে কঠিনে কোমলে মিলাইয়াই সেই আখ্যানের বাস্তবানুভূতি সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গদ্য কবিতার এই অতি-মাধুর্য, অতি-লালিত্য বিরহিত রীতি ছাড়া তাহা সম্ভব হইত কি? হৃদয়বৃত্তির লীলাগত কবিতায় মাধুর্য ও লালিত্য সঞ্চার ত আমাদের স্বভাবগত, সুঅভ্যাসগত; রবীন্দ্রনাথ পূর্বজীবনে বার বার তাহা করিয়াছেন উচ্ছ্বসিত উদ্দীপনায় পরম মোহাবেশে, চিরাচরিত ছন্দোবন্ধনের সংগীতময়তায়। কিন্তু এই বিষয়গত অন্যতর শিথিল বাস্তববিক্ষেপ-জড়িত অনুভূতিও ত আছে, এবং তাহার যথাযথ প্রকাশের অন্যতম কাব্যরীতির সার্থকতাও স্বীকার করিতেই হয়।

রূপ ও রহস্যময় রসদৃষ্টি, অপরূপ কাব্যময় বাক্ ও বর্ণনাভঙ্গি, গাঢ় ও গূঢ় নিসর্গ ও জীবন-সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্র-কবিমানসের অক্ষয় ও চিরন্তন ঐশ্বর্য। তাঁহার রচনা যে-রীতিই আশ্রয় করুক না কেন,—গদ্য হউক, কবিতা হউক, গদ্যকাব্য হউক—সকল রীতিতেই এই

রসদৃষ্টি, বাক্ ও বর্ণনাভঙ্গি এবং নিগূঢ় সৌন্দর্যবোধ উপস্থিত। বিষয়-বৈচিত্র্য ও দুরবগাহ কল্পনার সর্বেতোভদ্র প্রসারতাও তাঁহার সকলপ্রকার রচনার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য কবির গদ্য কবিতাগুলিতেও সমান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। গদ্য কাব্য চারিটি বিশ্লেষণ করিলেই তাহা ধরা পড়িবে।

প্রথমেই চোখে পড়ে কতকগুলি আখ্যানমূলক কবিতা; লঘু সুরে অর্ধজাগ্রত কল্পনায় স্তিমিত চেতনায় গল্পবলার ভঙ্গিতে আখ্যান রচনা। "পুনশ্চ"তে 'অপরাধী', 'ছেলেটা' 'সহযাত্রী', 'শেষচিঠি', 'বালক', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'প্রথম পুজা', "শেষ সপ্তকে"র তিন চারিটি কবিতা (যেমন, ৩২নং ও ৩৩নং) এবং "শ্যামলী"তে 'কণি', 'দুর্বোধ', 'অমৃত', 'বঞ্চিত' প্রভৃতি এই জাতীয়। কতকগুলি কবিতায় চিত্তের একটা ক্ষণিক আবেগ, একটা হঠাৎ খুশি বা হঠাৎ খেয়াল, একটা বিশেষ ভাব-ঝলকিত বা অনুভূতি-স্পৃষ্ট লঘু শিথিল মুহূর্তকে রূপে রহস্যে ধরিবার চেষ্টা আছে। এই ধরনের কবিতায় আবেগ স্বভাবতই স্তিমিত, ভাবানুভূতির গতি কতকটা আকস্মিক ও অনিয়ন্ত্রিত, দৃষ্টি কতকটা অলস, মন্থর ও উদাসীন। গভীর উদ্দীপনা বা প্রগাঢ় প্রেরণা কিছু ইহাদের মধ্যে নাই। "পুনশ্চ"তে অনেকগুলি কবিতা—'পুকুর ধারে', 'স্মৃতি', 'বাসা', 'সুন্দর', 'দেখা', 'ফাঁক', 'একজন লোক', 'ছুটি', 'গানের বাসা' ও 'পয়লা আশ্বিন'; "শেষসপ্তকে"র ২৯ ও ৩০নং; "শ্যামলী"র 'হারানো মন' ও বিদায়-বরণ' প্রভৃতি কবিতা এই জাতীয়। এই কবিতাগুলিতে, বিশেষ ভাবে "শ্যামলী"র কবিতা ক'টিতে ভাবগত কল্পনার ঐক্য বাক্ ও বর্ণনাভঙির সঙ্গে অপূর্ব সৌহার্দ্যের সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে।

উপরোক্ত আখ্যান ও ক্ষণিক আবেগবাহী কবিতাগুলিতে কোথাও কোথাও প্রেমের স্পর্শ সুস্পষ্ট, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আখ্যান-বিবৃতিই সেখানে কবির উদ্দেশ্য, প্রেমের চিরন্তন রহস্য উদ্‌ঘাটন নয়। তবে আলোচ্য গ্রন্থ চারিটিতে যথার্থ প্রেমের কবিতার কিছু অপ্রাচুর্য নাই। "শ্যামলী"র 'দ্বৈত', 'মিলভাঙা', 'শেষ পহরে,' 'সম্ভাষণ', 'বাঁশিওয়ালা', "শেষসপ্তকে"র ১, ২, ৩, ১৪, ৩২নং ও আরও দু'একটি কবিতাকে নিছক প্রেমের কবিতা বলিলে কিছু অন্যায় বলা হয় না। কিন্তু এই কবিতাগুলিতে তীব্র হৃদয়াবেগের প্রাধান্য নাই, কল্পনার উদ্দীপনা, কিংবা পঞ্চম রাগের ঝংকারও নাই; দেহচিত্তের উদগ্র কামনার দীপ্তি ত রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় বরাবরই অনুপস্থিত। কয়েকটি কবিতায় প্রেমাশ্লিষ্ট চিরন্তন সমস্যার অভিঘাত সুস্পষ্ট। তবু মোটামুটি ভাবে এই কবিতাগুলিতে সহজ, মৃদু ও শান্ত প্রেমের আকস্মিক অথচ অবিনশ্বর পরিচয়ই বিচিত্র রেখায়, চিরন্তন রহস্যের স্তিমিত উজ্জ্বলতায় দীপ্তিলাভ করিয়াছে। উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত আবেগ সর্বত্রই যেন সহজ আয়াসে সংযত। "শ্যামলী"র 'দ্বৈত' এবং "শেষসপ্তকে"র ৩১নং কবিতা দুইটি ভাবসৌন্দর্যে, অনুভূতির সূক্ষ্মতায়, কল্পনার সহজ রহস্য-ব্যঞ্জনায় এবং প্রেমের গভীর পরিচয়ে সত্যই অনবদ্য। দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই প্রত্যেকটি উক্তিই পরিস্ফুট করিয়া তোলা যায়, কিন্তু রসিক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিজেই তাহা করিয়া লইতে পারেন, আমি শুধু ইঙ্গিত রাখিয়া যাইতেছি মাত্র।

গদ্য কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তিগত জীবন ও বিশ্বনিসর্গগত গভীর মননশীল মন্তব্য ও পরিচয়ে ঐশ্বর্যবান। এ কবিতাগুলি ব্যাখ্যা ও বর্ণনার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে বেগবান, গভীর দৃষ্টিতে, বক্তব্যের স্পষ্টতায় এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল কাব্যময় বাক্‌ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ। "পুনশ্চ"-গ্রন্থের 'পত্র', 'বিচ্ছেদ', 'শেষদান', 'খোয়াই', "শেষসপ্তকে"র ৪, ৬, ৮, ১৫, ১৬, ১৭,

২৩, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৮, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও সর্বশেষ ৪৬নং এবং "শ্যামলী"র 'তেঁতুলের ফুল', 'অকাল ঘুম', 'প্রাণের রস', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কবিতা এই জাতীয়। "শেষসপ্তকে"র অনেকগুলি কবিতাই কবির ব্যক্তিজীবনের নিবিড় ও নিগূঢ় পরিচয়ের আলোকে উদ্ভাসিত, বিশেষত শেষদিকের কবিতাগুলি। বস্তুত রবীন্দ্র-জীবনের ও রবীন্দ্র-মানসের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লইতে হইলে তাঁহার শেষ অধ্যায়ের কাব্যগুলির পাঠ একান্ত প্রয়োজন, বিশেষভাবে "শেষসপ্তক" ও "পত্রপুট" হইতে আরম্ভ করিয়া "শেষলেখা" পর্যন্ত। জীবনের শেষ পইঠায় দাঁড়াইয়া কবি বারবার নিজের সমগ্র জীবন ও মনের পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, বারবার নানাভাবে নানারূপে নানাদিক হইতে তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণ সর্বত্রই স্বচ্ছ সুগভীর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত এবং ঐতিহাসিক পরম্পরায় বিকশিত। জন্মদিনকে কেন্দ্র করিয়া যে কবিতাগুলি তাহাদের মধ্যে এই বিশ্লেষণ ও পরিচয় ত আছেই, "শেষসপ্তকে" তাহা পাওয়া যাইবে ৪৩নং কবিতায়; কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যান্য কবিতায়ও নানা উপলক্ষে সেই পরিচয় পাওয়া যায়। "শেষসপ্তকে"রই সর্বশেষের তিনটি কবিতা "পত্রপুটে"র ৩নং ও ১২নং কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যদিও শেষোক্ত কবিতা দু'টির দৃষ্টি আরও গভীর, কল্পনা আরও প্রসারিত এবং ভাবগাম্ভীর্য আরও দুরবগাহ। কোনও কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া কবিজীবনের অন্তরঙ্গ এই কবিতাগুলির ইতিহাসের এবং ভাব ও মননগভীর সৌন্দর্যের, ইহাদের অবিচ্ছিন্ন শক্তিমান প্রবাহের কোনও পরিচয় দেওয়া যায় না। "শেষসপ্তকে"র ৪৩নং কবিতায় কবি নিজের বিভিন্ন বয়সের—'ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের'—সুষ্ঠু, সংক্ষিপ্ত ও সার্থক একটি পরিচয় নিজের ও পাঠকের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বাল্য, কৈশোর, তরুণ যৌবন ও যৌবন-মধ্যাহ্নের দীপ্ত পরিচয়ের পর প্রৌঢ়প্রহরের কবি বলিলেন,

> এই দুর্গমে, এই বিরোধসংক্ষোভের মধ্যে
> পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
> তোমরা এসেছ আমার কাছে।
> জেনেছ কি—
> আমার প্রকাশে
> অনেক আছে অসমাপ্ত
> অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন
> অনেক উপেক্ষিত।
>
> *　　*　　*
>
> ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সংমিশ্রণের মধ্য থেকে
> যে আমার মূর্তি
> তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,
> তোমাদের ক্ষমায়
> আজ প্রতিফলিত—
> আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,
> তাকেই আমরা পঁচিশে বৈশাখের
> শেষ বেলাকার পরিচয় ব'লে
> নিলেম স্বীকার ক'রে,
> আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
> আমার আশীর্বাদ।

যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল ব'লে
করব না অহংকার।

তারপরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা-সূত্রে-গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

'অনেক অসমাপ্ত, অনেক ছিন্নবিচ্ছিন্ন, অনেক উপেক্ষিতে'র যে বেদনা তাহা জীবনসায়াহ্নে বারবারই কবিকে ব্যথিত করিয়াছে। "পত্রপুটে"র বারো নম্বর কবিতায় অপরাহ্নে 'পারের খেয়াঘাটের শেষধাপের কাছটাতে' বসিয়াও মনে হইয়াছে—

জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে
নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে।
গান যে-মানুষ গায়, দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে;
যে-মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলেনি তার।

* * *

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
সে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

* * *

বাজালো ভেরী,
তবু জাগলোনা রণদুর্মদ
এই নিরাপদ নিশ্চেষ্ট জীবনে;
ব্যূহ ভেদ ক'রে
স্থান নিইনি যুধ্যমান দেবলোকের সংগ্রাম-সহকারিতায়
কেবল স্বপ্নে শুনেছি ডমরুর গুরুগুরু,
কেবল সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন
মিলেছে হৃৎস্পন্দনে বাহিরের পথ থেকে।
যুগে যুগে যে-মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়,
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে,
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

বিশ্বনিসর্গের সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্তের গভীর যোগ বহুপুরাতন। প্রকৃতির বহমান স্রোতের মধ্যে একান্ত ভাবে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া একসঙ্গে আত্মসম্ভোগ ও নিসর্গসম্ভোগ

কবি বহুকাল করিয়াছেন ; এই সম্ভোগের ভিতর দিয়াই তরুণ ও মধ্যাহ্ন-যৌবন স্বাদ গন্ধ ও বর্ণের সমারোহ আহরণ করিয়াছে। আজ প্রৌঢ় অপরাহ্ণে বা বার্ধক্য-সায়াহ্নে কবি শুধু নিসর্গের মধ্যে আত্মসম্ভোগ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাহার মধ্যেই তিনি আত্ম-মুক্তির উপায়ও খুঁজিয়া পাইয়াছেন। আয়ুর অপরাহ্ণ আমাদের মানসাকাশকে অস্পষ্ট ও আবিল করিয়া দেয়, মনন ও কল্পনাকে স্থবির করিয়া তোলে ; এই আবিলতা ও অলস স্থবিরতা হইতে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র বাহিরের বিশ্বনিসর্গ, এই নিসর্গই পারে আমাদিগকে "শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতা"র মধ্যে ডাকিয়া আনিতে। প্রকৃতির মধ্যেই প্রাণেরও অস্তিত্বের সহজ সনাতন প্রবাহ সদা বহমান ; সেহ প্রবাহের সঙ্গে মানুষ যখন নিজের প্রাণ-প্রবাহ মিশাইয়া দেয় তখনই কেবল মানুষ পারে নিজেকে উপলব্ধি করিতে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে কবিও বারবার সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। এই নিসর্গ-প্রবাহের মধ্যে তিনি নিজের প্রাণ-প্রবাহ বারবার মিশাইয়া দিয়া তাহাতেই বারবার অবগাহন করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে এক পরমা শান্তি এবং ভাগবত দৃষ্টিলাভ তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে। এই নিসর্গ অবগাহন সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ "শেষসপ্তকে", "পত্রপুট" ও "শ্যামলী"র কয়েকটি কবিতায়। বিস্ময়ের বিষয় এই, প্রত্যেকটি কবিতাতেই আকণ্ঠ নিসর্গ অবগাহনের শেষে মনন-কল্পনার পরিণতি সর্বত্রই এক অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে। দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহার স্বরূপটি ধরা পড়িবে। "শেষসপ্তকে"র ৪নং কবিতায়—

চারিদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা।
চঞ্চল বসন্তের অবসানে
আজ আমি অলস মনে
আকণ্ঠ ডুব দেয় এই ধারার গভীরে ;
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদু তালের ছন্দে।
এর আলোছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যুসাগর সংগমে।

৮ নং কবিতায়

এই নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃতি চলতি প্রাণের হিল্লোল ;
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই ত পাচ্ছি
সদ্য মুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ।

• • •

সেইঅন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্তের রূপকার, যিনি নামের অতীত
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

২৩ নম্বরে

আমার নগ্নচিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে
যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর
তার সেই জীর্ণ উত্তরীয় গেল খসে
দেখা দিল সেই অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে
দেখা দিল সেই অনির্বচনীয়তায়।
* * *
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি করেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার ভেতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

২৬ নম্বরে

তাই ওগো বনস্পতি
তোমার সম্মুখে এসে বসি সাকলে বিকালে,
শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বাণী
* * *
তোমার নব কিশলয়ের মর্ম এসে মেশে
বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দ মন্ত্র—
"ভালোবাসি।"
* * *
এই বাণীই দিনে দিনে রচনা করেছে
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা
আমার বিরহ গগনে
অস্তসাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে
আজ দিনান্তের অন্ধকারে।
এ জন্মের যত ভাবনা যত বেদনা
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একটি তারার মতো
জীবনের শেষ বাণীতে হোক উদ্ভাসিত—
"ভালোবাসি।"

৪৪নং কবিতাটি স্নিগ্ধ নিসর্গ-সৌন্দর্যে এবং কবির জীবন-সায়াহ্নের শ্যামল কামনায় সুন্দর ও মেদুর। কবিতাটি কবির মাটির ঘর 'শ্যামলী' উপলক্ষ করিয়া লেখা। কবি স্থির করিয়াছেন, তাঁহার শেষবেলাকার ঘরখানি গড়িবেন মাটি দিয়া, তাহার নাম রাখিবেন 'শ্যামলী', যে হেতু বাংলা দেশের মাটির রং শ্যামল, রূপ স্নিগ্ধ, যেহেতু যে বাংলা দেশের মেয়েকে তিনি

ভালবাসিয়াছেন তাহার চোখে আছে 'এই মাটির শ্যামল অঞ্জন, কচি ধানের চিকন আভা', যেহেতু চিরদিন মাটি তাঁহাকে ডাকিয়াছে পদ্মার পারে, ধানের ক্ষেতে, সরষে তিসির ক্ষেতে, পুকুর পাড়ে। সেই শ্যামল মাটি,

আজ আমি তোমার ডাকে
ধরা দিয়েছি শেষ বেলায়।
এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,
যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে
নবদূর্বাশ্যামলের
করুণ পদস্পর্শে
চরম মুক্তির জাগরণের প্রতীক্ষায়,
নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে।

এই মাটিব ধরণীর প্রতি জীবনের শেষ অধ্যায়ে যে ভালবাসা পুনরুদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এই ধূলিধূসর ধরণীর মানুষের প্রতি যে ভালবাসায় এই পৃথিবীকে ছাড়িয়া যাইতে মন বেদনায় বারবার কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তাহার আভাস এই কবিতাটিতে সুস্পষ্ট। এই মাটির ঘর শ্যামলীব উপরই আর একটি কবিতা আছে—"শ্যামলী"-গ্রন্থের শেষ কবিতা। এ-কবিতাটিও সুন্দর ও কোমল, এবং মাটির ক্ষণভঙ্গুরতায় জীবনের আসা যাওয়ার প্রতিচ্ছবিতে সমুজ্জ্বল। এই নিসর্গ-অবগাহন ও তাহার ভিতর দিয়া অধ্যাত্মোপলব্ধির পরিচয় "শ্যামলী"ব আরও দুইটি কবিতায় আছে; এই কবিতা দুইটি 'অকাল ঘুম' ও 'প্রাণের রস', কিন্তু তাহা আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই। "পত্রপুটে"র ৪, ৭, ৮, ১০নং প্রভৃতি কবিতাও এই পর্যায়ের, কিন্তু "পত্রপুটে"র কবিতাগুলি আরও গভীর মননশীলতায় সমৃদ্ধ, উদার ধ্বনিগাম্ভীর্যে প্রসারিত, এবং সৃষ্টির অন্তর্নিহিত রহস্য-ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। একটি বুনো চারাগাছ, পাতার রং তার হলদে সবুজ, ফুলগুলি যেন 'আলো পান করবার পেয়ালা, বেগুনি রঙের', দেখিতে দেখিতে ফুলগুলি খসিয়া পড়িয়া গেল, 'যে শব্দটুকু হলো, বাতাসে কানে এলোনা'।

ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটো পাতার কোণে
বিশ্ব-লিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।
তবু তারই সঙ্গে উদ্ঘাটিত হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস,
দৃষ্টি চলে না এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায়।
শতাব্দীর যে নিরন্তর স্রোত বয়ে চলেছে
বিলম্বিত তালের তরঙ্গের মতো,
যে ধারায় উঠলো নামলো কত শৈলশ্রেণী,
সাগরে মরুতে কত হোলো বেশ পরিবর্তন,
সেই নিরবধি কালেরই দীর্ঘ প্রবাহে এগিয়ে এসেছে
এই ছোটো ফুলটির আদিম সংকল্প
সৃষ্টির ঘাতপ্রতিঘাতে।
লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে
সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয়নি দেখা।
এ দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে।
যে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে।

নিসর্গ-স্নান উপলক্ষ ছাড়াও গভীর গম্ভীর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা, সৃষ্টি ও মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে সুগভীর চিন্তা ও জিজ্ঞাসা, মানবসত্তা এবং জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা অনেকগুলি গদ্যকবিতার বিষয়বস্তু। এই পর্যায়ের সব কবিতায়ই কবিকল্পনা বিশ্বপ্রসারী এবং চিন্তা অত্যন্ত গভীরে প্রসারিত। যে গভীর মননসম্পন্ন অধ্যাত্মদৃষ্টি কবিজীবনের শেষ দুই বৎসরের প্রধান সম্পদ তাহার গড়ন এই গদ্য কবিতাগুলির মননকল্পনার কারখানায়। কবিত্ব হিসাবে সব কবিতাগুলিই সার্থক একথা বলা কঠিন, তবু কবিমানসের বিকাশের দিক হইতে ইহাদের মূল্য অনস্বীকার্য। "পুনশ্চ"-গ্রন্থের 'কীটের সংসার' 'মৃত্যু', 'শিশুতীর্থ', "শেষসপ্তকে"র অনেকগুলি কবিতা, বিশেষভাবে ৫, ৯, ১২, ২২, ৩৫, ৩৬, ৩৯ ৪০নং কবিতা, "পত্রপুটে"র প্রায় সবগুলি কবিতা, "শ্যামলী"র 'আমি' প্রভৃতি কবিতা এই পর্যায়ের। কবি-কল্পনা কত গভীর, কত ঊর্ধ্বমুখী, কত বিশ্বপ্রসারী হইতে পারে, এপিক কল্পনাকে কি করিয়া গীতি কবিতার খণ্ডিত ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে ধারণ করা যায় তাহার চরমতম পরিচয় মিলিবে 'শিশুতীর্থ' কবিতায়। ইহার মনন-কল্পনা এত বিরাট, ইহার গতি এত দ্রুত প্রবহমান, ইহার বিস্মিত উপলব্ধি এত দুরবগাহ, মানবসত্তার চিরন্তন অভিযানের অনুভূতি ইহার মধ্যে এত গূঢ় ও নিবিড় যে, খণ্ড বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ইহার রসসমগ্রতা ক্ষুণ্ণ করিতে এতটুকু ইচ্ছা হয় না। "শেষসপ্তকে"র অনেক কবিতাতেই এই গভীর গম্ভীর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা অপূর্ব কল্পনাভূতিতে রূপান্তর লাভ করিয়াছে। ২২নং কবিতাটির ভাবানুভূতি পাঠকের কল্পনা ও রস-কৌতূহলকে উদ্রিক্ত না করিয়া পারে না।

শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে,
ঐ একটা অনেক কালের বুড়ো,
আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে।
আজ আমি ওকে জানাচ্ছি—
পৃথক হবো আমরা।

* * *

ওর জরা দিয়ে আচ্ছন্ন করে আমাকে
যে-আমি জরাহীন।
মুহূর্তে মুহূর্তে ও জিতে নিয়েছে আমার মমতা,
তাই ওকে যখন মরণে ধরে
ভয় লাগে আমার
যে-আমি মৃত্যুহীন।

* * *

আমি দেখবো ওকে জানালায় বসে
ঐ দূর পথের পথিককে

* * *

উপরের তলায় ব'সে দেখবো ওকে
নানা খেয়ালের আবেশে,
আশানৈরাশ্যের ওঠাপড়ার সুখদুঃখের আলো-আঁধারে।
দেখবো যেমন করে পুতুলনাচ দেখে;
হাসবো মনে মনে।
মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি উৎসবের আনন্দধারা আমি।

* * *

এই যে নিজের থেকে নিজের বার্ধক্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা, স্বতন্ত্র করিয়া দেখা, এই দেখার মধ্যে এক ধরনের তত্ত্বদৃষ্টি সুস্পষ্ট। ৩৫নং কবিতায় জীবনদর্শনের আর এক রহস্য :

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য—
যে-কথা দেহের অতীত।

*　　*　　*

সামনে তাকিয়ে চোখের দেখা দেখি
এ তো কেবলি দেখার জাল বোনা নয়।

*　　*　　*

দীর্ঘ পথ ভালো মন্দে বিকীর্ণ,
রাত্রিদিনের যাত্রা দুঃখ সুখের বন্ধুর পথে।
শুধু কেবল পথ চলাতেই কি এ-পথের লক্ষ্য।

*　　*　　*

মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ ;
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।
অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তাহার শেষ।
উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ ;
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই।

জীবনসত্তার অস্তিত্বের বোধ দৈনন্দিন কর্মকোলাহলের মধ্যে ধরা পড়ে এক নিমিষের অসামান্যতার স্পর্শে, এই কথাটি কবি ব্যক্ত করিয়াছেন ৩৬নং কবিতায় প্রকৃতির নিবিড় রহস্যময়তার ভিতর দিয়া।

অলস মনের শিয়রে দাঁড়িয়ে
হাসেন অন্তর্যামী,
হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি
প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে
কবির গানের সুর দিয়ে,
তখন যে-আমি ধুলিধুসর
সামান্য দিনগুলির মধ্যে মিলিয়ে ছিল
সে দেখা দেয় এক নিমেষের অসামান্য আলোকে।
সে-সব দুর্মূল্য নিমেষ
কোনো রত্ন ভাণ্ডারে থেকে যায় কিনা জানিনে ;
এইটুকু জানি—
তারা এসেছে আমার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে,
জাগিয়েছে আমার মর্মে
বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী
"আমি আছি"।

৩৯ ও ৪০নং কবিতা দু'টিতে মৃত্যু সম্বন্ধে কবির মননকল্পনা গভীর ও নিবিড় রসঘন রূপ লাভ করিয়াছে। মৃত্যুই এই জগতের প্রবহমান গতিস্রোতের নিরবচ্ছিন্নতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে, মৃত্যুমোহানার ভিতর দিয়াই জীবনের অমৃত দেখা দেয়। ক্ষণস্থায়ী দিনরাত্রি, স্বল্পকালস্থায়ী

মানব জীবন ও প্রায় সীমাহীন বিরাট কল্পযুগ এই তিন নিত্য বর্ধমান পরিধিকে অবলম্বন করিয়া মৃত্যুরহস্য এক অভিনব রসে দীপ্ত হইয়াছে ৪০নং কবিতায়।

মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।
তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,
আমার রক্তে তার আনন্দ প্রবাহ।
বলছে সে,—চলো চলো,
চলো বোঝা ফেলতে ফেলতে,
চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে
আমারি টানে, আমারি বেগে!

* * * *

আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ ক্ষেত্রে।
যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে
দিইনি তাকে কোনো গর্তে আটক থাক্‌তে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে
সে সমুদ্র আমিই।

* * * *

এই অনন্ত অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে
আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি
অন্তহীন নব নব অনাগতে।

২১নং কবিতায় মৃত্যু মহাকালের আর এক রূপ। মহাকালের প্রেক্ষাপটে দুইটি দৃশ্য, দুইই ক্ষণজীবী, দু'য়েরই প্রতি কবির আকর্ষণ। সৌরজগতে নূতন নূতন গ্রহজ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ও গহন অন্ধকারে তাহাদের বিলয় সভ্যতার উত্থান-পতনের মতই ক্ষণজীবী মহাকালের প্রেক্ষাপটে তাহাদের অস্তিত্বকাল কতটুকু? তাহাদের উত্থান-পতনের পশ্চাতে মহাকাল যে অক্ষুব্ধ শান্তিতে বিরাজমান, কবি সেই পরম শান্তির কামনা করেন। এই মহাকালেরই প্রেক্ষাপটে আবার মানব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমৃতময় আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তগুলি আরও কত বেশি ক্ষণস্থায়ী, তবু তাহারা, অমর, অক্ষয়। মানবজীবনের এই ক্ষুদ্র, স্বল্পস্থায়ী, সুখে দুঃখে সরস মুহূর্তগুলির প্রতি কবিচিত্তের আকর্ষণ নিবিড়তর। যুগের জয়স্তম্ভ ভাঙিয়া পড়ে, ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা মুহূর্তগুলি বাঁচিয়া থাকে।

আজি রাত্রে আমি সেই নক্ষত্র লোকের
নিমেষহীন আলোর নিচে
আমার লতাবিতানে বসে
নমস্কার করি মহাকালকে।
অমরতার আয়োজন
শিশুর শিথিল মুষ্টিগত
খেলার সামগ্রীর মতো
ধুলায় পড়ে বাতাসে যাক উড়ে।

আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে।
তার অপরিমেয় সত্য
অযুত নিযুত বৎসরের পরিধির মধ্যে
ধরে না ;
কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে,
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।

"শ্যামলী"র 'আমি' কবিতাতেও কবি ব্যক্তিত্ববিহীন 'অস্তিত্বের গণিততত্ত্বের' বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির অফুরন্ত রূপগন্ধময় বর্ণস্পর্শময় ঐশ্বর্যকে দাঁড় করাইয়াছেন; এই কবিতাটিও মানবসত্তার দুরবগাহ বিস্মিত উপলব্ধিতে উদ্দীপ্ত।

"শ্যামলী"র অনেকগুলি কবিতাই একটু 'লিরিক'-জাতীয়, এবং সেগুলিতে মানবজীবনের ছোট ছোট ছবি, জীবনের ছিন্নপত্র বিস্মৃতির হাওয়ায় উড়িয়া যাইতে যাইতে যেন কবির কল্পনায় বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। "পুনশ্চ" এবং "পরিশেষে"ও এই জাতীয় কবিতাই বেশি। এই আখ্যানমূলক লিরিক কবিতাগুলিতে "পলাতকা"র মতন সম্পূর্ণ কোনও আখ্যান নাই, সমগ্র একটি আখ্যানের ক্ষুদ্র একটি অংশ আছে, এবং তাহাকে ঘিরিয়াই উজ্জ্বল একটি ভাবপবিবেশ, এবং তাহার মধ্যেই যেন সমগ্র জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা উন্মোচিত হইয়াছে। "পরিশেষ-পুনশ্চ-শ্যামলী"র অনের কবিতাই পুরাতন স্মৃতিবহ. এই স্মৃতি রোমন্থনকে আশ্রয় করিয়াই কবিচত্তে নামিয়াছে একটি অকূল গভীর প্রশান্তি, স্তব্ধ গাম্ভীর্য, নিঃশব্দ গভীর দৃষ্টি, যাহার আভাস "বীথিকা"তেও সুস্পষ্ট, উত্তর জীবনের কাব্য ক'টিতে ত কথাই নাই।

"পত্রপুটে"র কবিতাগুলি একই রীতিতে লেখা হওয়া সত্ত্বেও একেবারে অন্য জাতের। লিরিক কবিতার রহস্যময়, আকস্মিক, অভাবনীয় চকিত আলোর দীপ্তি, গভীর ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য এই কবিতাগুলিতে নাই। "পত্রপুটে"র কবিতাগুলি জীবনের অনুভূতির কথা তত বলে না, যতটা বলে অসংখ্য ও বিচিত্র অনুভূতির পশ্চাতে সৃষ্টির যে গভীর নিয়তি-নিয়ম সক্রিয়, যে দুর্নিরীক্ষ্য চিরন্তন সত্যের রহস্য প্রাণবান, যে গহন গম্ভীর চিন্তা অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় বিচ্ছুরিত সেই সব নিয়তি-নিয়ম, সেই সব চিন্তা ও রহস্যের কথা। এই কবিতাগুলি যেন বিরাট গম্ভীর চিন্তারণ্যের মহাটবীগুলির প্রসারিত শাখা-প্রশাখার মর্মরধ্বনি, মানবমনের গভীর দ্বন্দ্বসমস্যার গম্ভীর কলকল্লোল। গভীর মননশীলতার পরিচয় "শেষসপ্তকে" এবং "বীথিকা"তেও আছে, কিন্তু "পুত্রপুটে" জীবন ও সৃষ্টির মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে মনন-কল্পনার ধ্যান এত গভীরে প্রসারিত, এবং তাহা প্রকাশের ধ্বনি এত গম্ভীর ও বিস্তৃত, গতি এত সবল ও বেগবান, বর্ণ এত গাঢ় ও বিচিত্র এবং ভাষা সমাসে-অনুপ্রাসে এত সংস্কৃত ও অভিজাত যে, সকলে মিলিয়া "পত্রপুটে"র গদ্য কবিতাগুলিকে এক অভিনব কাব্যরূপ দান করিয়াছে। ইহারা যেন গভীর চিন্তাশীল প্রবন্ধের সংহত কাব্যরূপ। গভীর প্রসারিত নীলকৃষ্ণ সমুদ্রের উদ্বেলিত গম্ভীর তরঙ্গধ্বনির মত ইহাদের দুর্নিবার ধ্বনিমোহ। একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি ৩ নং কবিতাটি হইতে ; "পত্রপুটে" এই ধরনের দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে আপক্বধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে;
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী
"আমি আনন্দিত"।
অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
বৈশাখে দেখেছি, বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেন পাখির মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠলো যেন কেশর ফোলা সিংহ;
তার ল্যাজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়লো উবুড় হয়ে;
হাওয়ার মুখে ছুটলো ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।

এই অন্তর্নিহিত ধ্বনিছন্দই গদ্য কবিতার রীতিতে এপিক্ রচনার ছন্দ। নিছক গদ্যে ইহার গভীর তরঙ্গ প্রবাহ, ইহার গম্ভীর ধ্বনিমোহ সৃষ্টি সম্ভব নয়, এমন কি অন্তঃমিল ও বৃত্তপ্রবাহধৃত প্রথাগত কবিতার ছন্দেও নয়। গদ্যছন্দে যে কত গভীর মনন কল্পনা রূপায়িত করা যায়, কত গম্ভীর ধ্বনি ও প্রবাহ, কত বেগ ও শক্তি, কত বর্ণসমারোহ সঞ্চার করা যায়, "পত্রপুটে"র কবিতাগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। বস্তুত "বলাকা"র পর সকলদিক হইতে এত বিশিষ্ট ও মহৎ কাব্য রবীন্দ্রনাথ আর রচনা করেন নাই।

তের

প্রান্তিক (১৩৪৪)
সেঁজুতি (১৩৪৫)
প্রহাসিনী (১৪৪৫)
আকাশ-প্রদীপ (১৩৪৬)
নবজাতক (১৩৪৭)
সানাই (১৩৪৭)

"প্রান্তিক" প্রকাশিত হয় ১৩৪৪'র পৌষ মাসে। ঐ বৎসরই ভাদ্র মাস কাটে নিদারুণ রোগে; এই রোগই কবিকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল। আশ্বিনের গোড়ায় কবির চেতনা 'লুপ্তিগুহা' হইতে মুক্তিলাভ করিল। "প্রান্তিকে"র ১৮টি অন্তঃমিলনবিহীন অথচ বৃত্তপ্রবাহধৃত কবিতা আশ্বিন হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। এই আঠারটির ভিতর ষোলটি কবিতাই মৃত্যু এবং মৃত্যু-উত্তীর্ণ জীবনকে কেন্দ্র করিয়া। শেষ দুইটি কবিতার বিষয়বস্তু অন্যতর।

"প্রান্তিক" নামটি অর্থবহ। কবির জীবনে মৃত্যুদূত একদিন চুপে চুপে আসিয়া

দেখা দিল—'বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে'; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যু-অন্ধকারকে অতিক্রম করিল আলোকের খরপ্রবাহ, জয় হইল শুভ্র চৈতন্যময় জ্যোতির। চেতন-অচেতনের প্রান্তদেশে এক মুহূর্তের জন্য বিভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও অবশেষে ঘুচিয়া গেল;

> নূতন প্রাণের সৃষ্টি হলো অবারিত
> স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ অভ্যুদয়ে। (১ নং)

মৃত্যুর প্রসাদবহ্নিতে কামনার যত আবর্জনা, জীবনের ক্ষুদ্রতুচ্ছ যত জঞ্জাল সব পুড়িয়া ঝরিয়া পড়ুক, জীবন আলোকের দানে ধন্য হউক, এ মর্ত্যের প্রান্তপথ দীপ্ত হইয়া উঠুক (২নং); শূন্য দিগন্তের ভূমিকায় নূতন জীবনচ্ছবি কবি রচনা করিবেন, ইহাই তাঁহার কামনা (৩নং)। অতীতের যাহা কিছু সহচর, যাহা কিছু বেদনার ধন, কামনার ব্যর্থতা, সব কিছু ত মৃত্যুরই পাওনা, মৃত্যুর হাতেই তাঁহাদের ফিরাইয়া দিয়া আজ কবি মেঘমুক্ত শরতের আকাশের মত ভারমুক্ত হইতে চাহিতেছেন (৫নং)। ইহাই যথার্থ মুক্তি—'সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে'—

> হে সংসার
> আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে
> বর্জন কোরোনা মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো!
> জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,
> * * *
> সর্বহর আঁধারের দস্যুবৃত্তি ঘোষণার আগে। (৬নং)
> হে জীবন, অস্তিত্বের সারথী আমার
> বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
> মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয় যাত্রায়। (৭নং)

আট নম্বর হইতে কবির ভাবনা-কল্পনা একটু মোড় ফিরিয়াছে। কবি মনে করিতেছেন, এতকাল যে সাজে সজ্জায় নিজের পরিচয় তিনি রচনা করিয়াছেন, মৃত্যুস্নানের পর আজ তাহা নিরর্থক মনে হইতেছে। আজ বাহিরের যাহা কিছু বর্ণ-প্রসাধন এক মুহূর্তে তাহা ধুইয়া মুছিয়া গেল (৮নং), ধরা পড়িল নিজের নিগূঢ় পূর্ণতা। বিশ্ববৈচিত্র্যের উপর এক কৃষ্ণ অরূপতা নামিয়া আসিতেছে, দেহ ছায়া হইয়া বিন্দু হইয়া অন্তহীন তমিস্রায় মিলাইয়া যাইতেছে—অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায় ইহাই ছিল চিত্তের অনুভূতি (৯নং)। ইহাই ত মৃত্যু, কিন্তু তাহার পশ্চাতে আছে জ্যোতি; নিজের ছায়াই সেই জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সৃষ্টির সীমান্তে সেই জ্যোতিলোকের রূপদর্শন, ইহাই কবির চরম আকাঙ্ক্ষা; এতকাল তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয় নাই।

> লব আমি চরমের কবিত্বমর্যাদা
> জীবনের রঙ্গভূমে এরি লাগি সেধেছিনু তান।
> বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,
> জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মূরতি
> তাই ফিরাইয়া দিলে। আসিবে আরেকদিন যবে
> তখন কবির বাণী পরিপক্ব ফলের মতন
> নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
> অনন্তের অর্ঘ্যডালি 'পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
> জীবনের শেষমূল্য, শেষযাত্রা শেষ নিমন্ত্রণ। (১০নং)

স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, কবিচিত্ত গভীরে নিমগ্ন হইতেছে, ঔপনিষদিক জ্যোতির ধ্যানে দৃষ্টি ক্রমশ এক মহা অনন্তের মধ্যে স্থিতকেন্দ্র হইতেছে—আত্মার চরম মহামুক্তির আস্বাদনের জন্য কবি উতলা হইতেছেন। এই পৃথিবীর কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ হইতে (১১নং), লোকমুখবচনের নিঃশ্বাস পতনের আন্দোলন হইতে (১২নং) দূরে সরিয়া যাইতে চাহিতেছেন—'নবজীবনের অরুণের আহ্বান ইঙ্গিত, নব জাগ্রতের ভালে প্রভাতের জ্যোতির তিলক' স্পর্শ করিয়াছে কবির চিত্ত (১২নং)।

তোমার সম্মুখ দিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়। (১৩নং)

এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণ তরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে। (১৪নং)

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসার যাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ সম। (১৫নং)

একদিকে মন যখন এইভাবে গভীরে নিমগ্ন, তখন অন্যদিকে সংসারের উপরের স্তরে দারুণ দুর্যোগ কবিচিত্তকে ক্ষণে ক্ষণে আলোড়িত করিতেছে। পৃথিবী জুড়িয়া মানুষের তীব্র অপমান অত্যাচার অবিচার যুদ্ধ কোলাহলের তপ্তধূমে গর্জিয়া ফুসিয়া উঠিতেছে—কবিচিত্তে তাহার বেদনা ক্ষোভে ক্রোধে রূপ লইতেছে। ২৫ ডিসেম্বর, খ্রীষ্ট জন্মদিনের অব্যবহিত পরেই একদিন কবিচিত্তের এই ধূমায়িত ক্ষোভ বহ্নির রূপ ধারণ করিল, একদিনেই লিখিলেন "প্রান্তিকে"র শেষ দুইটি কবিতা। দুইটিই উদ্ধার যোগ্য, একটি (১৮নং—'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস') আগেই উদ্ধার করিয়াছি; আর একটি এই :

যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তি গুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে; তপ্তধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ।

* * *

মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নরঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারে যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠে ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

এই যে চিত্তের একদিকে গভীর মহামৌনের প্রশান্তি, স্তব্ধ-উদার গাম্ভীর্যের ব্যাপ্তি, আর একদিকে সাম্প্রতিক বিক্ষোভের ক্ষুব্ধ আলোড়ন, উত্তর-জীবনের কাব্যে ইহাদের ইঙ্গিত ব্যর্থ যায় নাই। যে শান্ত গভীর জ্যোতির্ময় জীবনের কামনায় শেষ বৎসরগুলি প্রোজ্জ্বল, সেই ব্যাপ্ত গভীর প্রশান্তি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে সমসাময়িক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে, নবলব্ধ ঐতিহাসিক ও সামাজিক চেতনার ফলে। আত্মার গভীরতর কামনা, চিত্তের ব্যাপকতর প্রশান্তি বারবার বিদীর্ণ করিয়া মানব-ইতিহাসের বিরোধ ও বেদনা, সাধারণ মানুষের দুঃখ ও লাঞ্ছনা, দেশের ও পৃথিবীর দুর্দশা দুর্যোগ কবির মনন-কল্পনাকে অধিকার করিয়াছে। "প্রান্তিকে"র পর হইতে প্রায় প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থেই তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট।

"আকাশ-প্রদীপ" প্রকাশিত হয় ১৩৪৬'র বৈশাখে। সবগুলি কবিতাই ১৩৪৫'র কার্তিক হইতে চৈত্রমাসের মধ্যে লেখা। গ্রন্থটির উৎসর্গ-পত্র পড়িলেই বুঝা যাইবে, বক্তব্যের মধ্যে কোথাও একটা দ্বিধা আছে। মনের মধ্যে এই শঙ্কা আছে, এই কবিতাগুলির বিষয়ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি হয়ত নূতন কালের হৃদয় মন স্পর্শ না-ও করিতে পারে; হয়ত এই দ্বিধার কারণও আছে। তরুণ ও পরিণত যৌবনে, এমন কি প্রৌঢ় অপরাহ্ণেও কবিকল্পনা ছিল আপনাতে আপনি তৃপ্ত, কবিতা ছিল আত্মরতি মুখর, বাহিরের দিকে তাকাইবার সময়ও ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না; যাহাদের মধ্যে ছিল তাঁহার স্বেচ্ছা-বিহার, তাহারা সকলেই ছিল ঘরের একান্ত পরিচিতের সীমানার মধ্যে। আজ তাহারা কেহ নাই, জীবনদৃশ্য গিয়াছে বদলাইয়া; পরিচিত জগৎ, পরিচিত মানুষ, পরিচিত জীবনদৃশ্য সবই আজ আকাশের স্বপ্ন; আকাশে প্রদীপ জ্বালাইয়া সেই স্বপ্নগুলিকেই কবি ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে।

গোধূলিতে নামল আঁধার,
ফুরিয়ে গেল বেলা,
ঘরের মাঝে সাঙ্গ হোলো
চেনা মুখের মেলা।
দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা
নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো।

* * *

অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ পানে—
যেথান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে। (আকাশ প্রদীপ)

স্বভাবতই এই আকাশ-প্রদীপ জ্বালান কবিতাগুলি স্বপ্নময় ও স্মৃতিবহ—'চলেছে মন্থরতরী নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই'। এইখানেই কবির মনের দ্বিধা এবং এই দ্বিধার কৈফিয়ৎ 'সময়হারা' কবিতায়:

পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।

এই কৈফিয়তের কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই আকাশ ত কবির স্মৃতির আকাশ, যে-আকাশে জীবনের সঙ্গী-সঙ্গিনীরা তারকার রূপ ধরিয়া এখনও মিটিমিটি জ্বলিতেছে;

স্মৃতির প্রদীপ জ্বালাইয়া আজ এই জীবন-সায়াহ্নে কবি তাহাদের ক্ষণিক সঙ্গ উপভোগ করিতেছেন। এই উপভোগ-অভিজ্ঞতার সঙ্গে ত আধুনিক কালের কোনও বিরোধ নাই, ইহাদের সঙ্গে জড়িত মনন-কল্পনার সঙ্গেও নয়। ইহারাও ত জীবনের জীবন্ত পরিচয় বহন করে, এবং মানুষের জীবন্ত হৃদয়ই ত কবির কাম্য লোক ; বরং পৃথিবীকেও আড়াল করিয়া জীবন-সায়াহ্নে কবি ত মানবের প্রেম, মানবের সুখ দুঃখ এবং মানবের বিচিত্র সংসার-বিক্ষেপময় কাহিনীর মধ্যেই বেশি করিয়া বিশেষ করিয়া নিজের চিত্তের আশ্রয় খুঁজিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনাধুনিক ত কিছু নাই ; তবু সাম্প্রতিক কালে আধুনিকতার যে অহংকার, যে মিথ্যা কৃত্রিম অনৈতিহাসিক দৃষ্টি আমাদের জীবনে আজ কলরবমুখর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিবার, তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার একটা লোভ কবির অবচেতন চিত্তে সক্রিয় ছিল, এবং ক্ষণে ক্ষণে থাকিয়া থাকিয়া তাহা আত্মপ্রকাশও করিয়াছে শেষ অধ্যায়ের রচনায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কবি নিজেই জানিতেন যে তিনি 'জন্ম-রোম্যাণ্টিক্' ; জীবনের মধ্যে যখন নূতনাকাশের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে তখনও তিনি স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলেন নাই যে

আমারে বলে যে ওরা রোমাণ্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ-পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রং লাগায়েছি প্রিয়ে।

মনে রাখা প্রয়োজন এই কবিতাটি "নব-জাতক" গ্রন্থের। যাহাই হউক, কবি-মানসের এই নিগূঢ় পরিচয় যাঁহাদের জানা আছে আকাশে প্রদীপ জ্বালাইয়া স্মৃতির স্বপ্নে চিত্ত ভরিয়া তোলাতে তাঁহাদেব দ্বিধার কোনও হেতু থাকিবার কথা নয়।

আগেই বলিয়াছি, "আকাশ-প্রদীপে"র কবিতাগুলি স্মৃতিবহ ; জীবনের বহু পুরাতন দিনগুলি হইতে আহৃত স্মৃতির অনুধ্যানই এই গ্রন্থের অধিকাংশ সার্থক কবিতার বিষয়বস্তু। তাহার আভাস ত "প্রান্তিক" গ্রন্থেই পাওয়া যাইতেছে ৫ ও ৭নং কবিতায় ; এবং তাহারও আগে কিছু কিছু "পুনশ্চ-শেষসপ্তক-শ্যামলী"তে।

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন গুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে। (৫নং)

অনভিজ্ঞ কৈশোরের
কম্পমান হাত হতে স্খলিত প্রথম বরমালা
কণ্ঠে ওঠে নাই, তাই আজিও অক্লিষ্ট অমলিন
আছে তার অস্ফুট কলিকা। সমস্ত জীবন মোর
তাই দিয়ে পুষ্প-মুকুটিত। পেয়েছি যা অযাচিত
প্রেমের অমৃতরস, পাইনি যা বহু সাধনায়
দুই মিশেছিল মোর পীড়িত যৌবনে। (৭নং)

তবু, "সেজুঁতি" ও "আকাশ-প্রদীপে"ই ব্যক্তিগত জীবনের অতীত-অনুধ্যান সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, এবং পরে "জন্মদিনে" পর্যন্ত এই ধ্যান কবিচিত্ত হইতে কখনও খুব দূরে সরিয়া যায়

নাই। বস্তুত এমন অকপট সারল্যে অতীত জীবনের রহস্য এবং তাহার সঙ্গে কত অকথিত কামনা বাসনা, কত অতৃপ্ত অকৃতার্থ তৃষ্ণা, কত বিচিত্র সলজ্জ রহস্যময় স্মৃতি, কত বিচ্ছিন্ন ছবি, বড় কেহ উদ্ঘাটিত করেন না, এমন কি কবিরাও নন। অতীত-রোমন্থন জীবন-সায়াহ্নের স্বাভাবিক চিত্ত-প্রকৃতি, কিন্তু যে-রবীন্দ্রনাথ পরিণত যৌবনে "জীবনস্মৃতি" লিখিতে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন অপূর্ব কাব্য, সেই রবীন্দ্রনাথ শুভ্র বার্ধক্যে জীবনস্মৃতি লইয়া কবিতা লিখিতে বসিয়া শুধু কাব্যই রচনা করিলেন না, নিজের জীবনকেও নূতন করিয়া উদ্ঘাটন করিলেন তাঁহার অগণিত পাঠকজনের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে। অতীত স্মৃতিকথা বলিতে বসিয়া চিত্ত উদ্দীপিত হইয়াছে নানা বিচিত্র অনুভূতিতে, নানা ভাবরসে; তখন স্মৃতিকাহিনী হইয়া উঠিয়াছে কাব্য, আর যেটুকু গল্পে, ইতিবোধে কাহিনীমাত্র তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিছু "ছেলেবেলায়", কিছু "গল্পেসল্পে" আভাসে ইঙ্গিতে, কিছু বর্ণনাত্মক কবিতায়।

"আকাশ-প্রদীপে"ও সার্থক কবিতাগুলি সব এই স্মৃতি-কাহিনী লইয়া। ছেলেবেলার স্মৃতিভাণ্ডার হইতে টুক্‌রা টুক্‌রা কাহিনী তিনি কি গভীর অনুভবে, কি গভীর আনন্দে আস্বাদন করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে 'যাত্রাপথ', 'স্কুল পালানো', 'ধ্বনি', 'বধূ', 'সময়হারা', শ্যামা,' 'কাঁচাআম' প্রভৃতি কবিতায়। এই ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে ছড়া ও রূপকথার আকাশ সুবিস্তৃত, তাহাদের ধ্বনি ও সুর, তাহাদের পরিমণ্ডল জীবন-সায়াহ্নে চিত্তের মধ্যে আবার বিস্তার লাভ করিতেছে; সে-পরিচয় পাওয়া যাইবে 'বধূ', 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' প্রভৃতি কবিতায়, "ছড়ার ছবি" (১৩৪৪), "সে", (১৩৪৪) "গল্পসল্প" (১৩৪৭) ও "ছড়া" (১৩৪৮)-গ্রন্থে। 'বোধের প্রত্যূষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে' সেই শৈশব ভাবমণ্ডলে এই জাতীয় কবিতা ও গ্রন্থগুলির সৃষ্টি। কিন্তু শিশুচিত্তাশ্রয়ী গ্রন্থগুলিতে যাহাই হউক, "আকাশ-প্রদীপ" কিংবা "সেজুঁতি"র কবিতা-গুলিতে কবির পরিণত মননশীলতা এবং গভীর রহস্যময় অভিজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্ট। সেগুলি ছেলেবেলার খেয়ালখুশি কল্পনার সৃষ্টি নয়, বার্ধক্যের পরিণত মানসের সৃষ্টি। "বধূ" কবিতাটিই ধরা যাক্। কবি ছেলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে কবে বধূ-আগমন গাঁথা শুনিয়াছিলেন,

> "বউ আসে চতুর্দোলা চ'ড়ে
> আম কাঁঠালের ছায়ে
> গলায় মোতির মালা সোনার চরণচক্র পায়ে!"

সেই গানের ছন্দ বালকের প্রাণে একদিন অর্ধ-জাগ্রত কল্পনার শিহরণ জাগাইয়াছিল। তারপর সেই বালককাল মিলাইয়া গেল। যৌবনে সেই মায়াময়ী বধূর নূপুর নানাভাবে নানা বিচিত্র উপলক্ষে কবির চিত্তে নানা কল্পনার রাগিণী বাজাইয়াছে, কিন্তু কোনদিনই সে বধূর দেখা পাওয়া যায় নাই।

> অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
> রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ,
> তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,
> "তুমিই কি সেই,
> আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
> এসেছ আলোতে।"

উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ,
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, "আমি তারি দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।
নক্ষত্র লিপির পত্রে তোমার নামের কাছে
যার নাম লেখা রহিয়াছে
অনাদি অজ্ঞাত যুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোলা,
ফিরিছে সে চিরপথভোলা
জ্যোতিষ্কের আলো ছায়ে
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।

এই ধরনের মননশীল রহস্যময়তা, চিন্তাময় গভীর দর্শন "আকাশ-প্রদীপে"র 'জল', 'জানা-অজানা', 'আমগাছ', 'যাত্রা', 'নামকরণ' প্রভৃতি কবিতায়ও লক্ষণীয়।

'শ্যামা' ও 'কাঁচা আম' কবিতা দুইটি কিশোর প্রেম ও প্রথম নারী চেতনার অপরিণত মানসানুভূতির অপূর্ব কাব্য-রূপ। শ্যামা ছিল,

নব কৈশোরের মেয়ে,
ছিল তার কাছাকাছি বয়স আমার।

মুখচোরা বালকের ভীরু সলজ্জ কৌতুক কিশোরীর পদক্ষেপ অনুসরণ করিয়াই তৃপ্ত। তারপর জানাশোনা যখন বাধাহীন হইল, তখন

একদিন নিয়ে তার ডাক নাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়
পরিহাসে পরিহাসে হোলো দোঁহে কথা বিনিময়।

তাহার পর আরম্ভ হইল কিশোরীর সপ্রতিভ প্রণয়-চাঞ্চল্য, ঘনিষ্ঠতর হইল পরিচয়,

তবু ঘুচিলনা
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয়না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।
পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিম দিগন্তে হয় লীন।

ইহাই ত কিশোর প্রেমের চিরন্তন পরিচয়। গদ্যছন্দে লেখা 'কাঁচা আম' কবিতাটিতে কিশোর প্রেমের কাঁচা অনুভূতির প্রথম উন্মেষ এক অভিনব চাঞ্চল্যলীলায় বিকশিত হইয়াছে। কিশোর বয়সের এই অভিজ্ঞতাও চিরন্তন, এবং ব্যক্তিগত ছায়ার ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। কিশোর বয়সের অপরিণত প্রেমের সলিল-সমাধি লাভই একমাত্র গতি, চিত্তের প্রথম উন্মেষ ঘটাইয়া দিয়াই তাহার মুক্তি; তাহার অম্লমধুর রস আস্বাদন করা যায় শুধু স্মৃতিতে, সেইখানেই তাহার মূল্য।

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে,
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে,
খুঁজে পাইনি।

এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর।
ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।

প্রেমতত্ত্বের দিক হইতে মূল্যবান 'তর্ক' কবিতাটি। নারীসম্বন্ধগত প্রেম ও মোহকে পৃথক করিয়া দেখিতে আমরা অভ্যস্ত; বঙ্গদেশের নৈতিক ও সাহিত্য-ঐতিহ্য এই সংস্কার আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই সংস্কার একাধিক বার স্বীকার করিয়াছেন; বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রেমকল্পনা এই সংস্কার হইতে একান্ত বিচ্যুত নয়। কিন্তু পরিণত বার্ধক্যে বোধ হয় তাঁহার এই সংস্কারে সাম্প্রতিক মননক্রিয়ার আঘাত লাগিয়াছিল; "দুই বোন" হইতে আরম্ভ করিয়া "তিনসঙ্গী" পর্যন্ত বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে, "আকাশ-প্রদীপে"র একাধিক কবিতায় ('তর্ক', 'নামকরণ', ময়ূরের দৃষ্টি'), "সানাই" গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় নরনারীর দেহ-আত্মাগত প্রেমের সম্বন্ধ লইয়া বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্ববিশ্লেষণ তিনি করিয়াছেন। সার্থক রস-সৃষ্টির চেষ্টা এই সব রচনায় উপস্থিত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রাচীন সংস্কার-গ্রন্থিও যেন কবি ধীরে ধীরে উন্মোচন করিয়াছেন। প্রেম ও মোহের সম্বন্ধ লইয়া 'তর্ক' কবিতাটিতে কবি বোধ হয় সর্বপ্রথম প্রেম আর মোহের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করিলেন।

যদি প্রেম হয় অমৃত কলস,
মোর তবে রসনার রস।
সে সুধার পূর্ণ স্বাদ থেকে
মোহহীন রমণীরে প্রবঞ্চিত বলো করেছে কে।
আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্যভরা কায়া,
তাহার তো বারো আনা আমারি অন্তরবাসী মায়া।
প্রেম আর মোহে
একেবারে বিরুদ্ধ কি দোঁহে।
আকাশের আলো
বিপরীতে ভাগ করা সে কি সাদা কালো।

"সেজুঁতি" প্রকাশিত হয় ১৩৪৫'র ভাদ্রমাসে। তেইশটি কবিতা সর্বশুদ্ধ এবং তাহাদের অধিকাংশই নিজের জীবনসন্ধ্যাকে কেন্দ্র করিয়া, অদূরাগত মৃত্যুভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া। "সেজুঁতি" সার্থকনামা; সত্যিই ইহার অধিকাংশ কবিতা সাঁঝের বাতি। সন্ধ্যা বাতি জ্বালাইয়া জীবনদিবার হিসাব নিকাশ, মৃত্যুরাত্রির প্রতীক্ষা। কতকগুলি কবিতা ত একান্তভাবে ব্যক্তিগত জীবনকেই আশ্রয় করিয়াছে, আত্মভাবনাই তাহাদের অবলম্বন, যেমন 'জন্মদিন' ('আজ মম জন্মদিন'), 'পত্রোত্তর', 'যাবার মুখে', 'অমর্ত্য', 'জন্মদিন' (দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে), 'নিঃশেষ', 'প্রতীক্ষা', 'পরিচয়'। এই সব কবিতায় ত কবি স্পষ্টতই সাঁঝের বাতি জ্বালাইয়া বিগত জীবনের এবং অগ্রসরমান মৃত্যুর পরিচয় লইতেছেন। তাহা ছাড়া 'সন্ধ্যা', 'ভাগীরথী', 'তীর্থযাত্রিণী', 'নতুন কাল', 'পালের নৌকা' প্রভৃতি কবিতায়ও এই দুই ভাব-কল্পনাধৃত ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া পড়িয়াছে।

যিনি ১৩৪৪'র নিদারুণ মৃত্যুপরীক্ষার হাত হইতে কবিকে ত্রাণ করিয়াছিলেন গ্রন্থটি সেই "ডাক্তার নীলরতন সরকার বন্ধুবরেষু" উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-পত্রেই কবি বলিলেন, মৃত্যুর অন্ধকার গহ্বর হইতে ফিরিয়া নিজের সঙ্গে নিজের নূতন করিয়া পরিচয় হইল, 'অরূপলোকের দ্বার' 'অচিহ্নিতের পার' যেন দৃষ্টির সীমানায় ধরা দিল,

আলো আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা,
রিমিঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা।

সে-ভাষার চরম অর্থ আজও কবি জানেন নাই, উত্তর জীবনে সে অর্থ ক্রমশ উদ্ঘাটিত হইবে।

ভাবানুভূতির স্বচ্ছ গভীরতায়, পরিচ্ছন্ন জীবন-ব্যাখ্যায়, দৃষ্টি ও বিশ্বাসের আন্তরিকতায় এবং ছন্দ ও ধ্বনির প্রচ্ছন্ন গরিমায় 'জন্মদিন' কবিতাটি এ-গ্রন্থের গৌরব।

নবসূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।

* * *

হে বসুধা
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে—যে-তৃষ্ণা যে-ক্ষুধা
তোমার সংসার-রথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছে রাত্রদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানাদিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল কমে
ছুটির গোধূলি বেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য পানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ,
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু জানি
তোমার অবজ্ঞা মোরে না ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ, তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু করো, যদি মোরে করো অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন করো নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধো বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদীতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ণ র'বে সগৌরবে, তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব।

* * *

সে মানুষ, হে ধরণী,
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে, নিয়ো তুমি গনি
যা-কিছু দিয়েছ তারে। * *
তবু জেনো অবজ্ঞা করিনি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোতে
লীন হোত জড় যবনিকা, পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে
রূপে রসে সেই ক্ষণে যে গূঢ় রহস্য দিনে দিনে

হোত নিঃশ্বসিত, আজি মর্ত্যের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি।

* * *

তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে
শেষ-প্রহরের ঘণ্টা ; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পুরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক-টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে, দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূছিয়া তোমার পদতলে।
আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এপারের ভালবাসা, বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে, রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

জন্মদিনের উপর আর একটি কবিতা আছে, এ'টি একটু হাল্কা অথচ মধুর সুরে রচনা ; বিগত জীবনের স্মৃতিদীপেই তাহার জ্যোতি। বিশ্বনিসর্গের চিরন্তন বাণী তিনি কি করিয়া আহরণ করিয়াছেন তাহারই ইতিহাসারতি, মাটির কাছে তাঁহার ঋণ স্বীকার। 'পত্রোত্তরে'ও কবি দেখিয়াছেন আত্মহারা নিখিলের, অন্তবিহীন প্রাণের উৎসব যাত্রা ; সেই ধারারই বেগ লাগিয়াছে কবির মনে, সারাজীবন সেই বেগেই ত তিনি পথ চলিয়াছেন। আজ

এ-ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি,
যার অলক্ষ্যে সূর্য তারার সাথী

এই সব ভাবনা-কল্পনা—এই মাটির 'পরে অনুরাগ বিশ্বনিসর্গের সুর ও সৌন্দর্যধারায় নিরন্তন অবগাহন এবং তাহার ভিতরই নিজের পরিচয়-সার্থকতা, সকল কিছুর সীমানা ছাড়াইয়া অসীমের অক্লান্ত ইশারা, অজানা সমুদ্রপথে মহৎ অজানার অভিসার গান—এই সব ভাবনা কল্পনাই নানাভাবে নানা ছন্দে ও চিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে "সেঁজুতি"র কবিতাগুলিতে। সাঁঝের বাতির স্নিগ্ধ ও কোমল, নম্র ও শীতল মাধুর্য সব কবিতাগুলিতেই ছড়ান; প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই মৌন স্মৃতির স্নিগ্ধ প্রদীপ। এই স্নিগ্ধ নম্র সুরটির একটু পরিচয় লওয়া যাইতে পারে। 'পরিচয়' কবিতায়, কবির তরীখানা বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে নদীতে এক ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছিল, লোকেরা যখন তাহার পরিচয় শুনিতে চাহিল তিনি বলিতে পারেন নাই। তারপর একদিন

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান
একা বসে গাহিলাম যৌবনের-বেদনার গান।
সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণতরুণী
তুলিল অশোক,
মোর হাতে দিয়ে তা'রা কহিল, এ আমাদেরি লোক।
আর কিছু নয়
সে মোর প্রথম পরিচয়।

তারপর জোয়ারের বেলা, তরঙ্গের খেলা শেষ হইয়া গেল; ভাঁটার গভীর টানে নৌকা ভাসিয়া চলিল সমুদ্রের দিকে। দূর হইতে নূতন কালের নূতন যাত্রী যত তরুণ-তরুণী ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, ঐ যে তরণী বাহিয়া চলিয়াছে সন্ধ্যার তারার দিকে, ও কে?

সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার—
—মোর নাম এই ব'লে খ্যাত হোক্,—
আমি তোমাদেরি লোক।—
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।

"প্রহাসিনী" একেবারে অন্য জাতের অন্য সুরের কবিতা; হাস্যে পরিহাসে, প্রলাপে কৌতুকে, ব্যঙ্গ কটাক্ষে কবিতাগুলি যেন ধূমকেতুর পুচ্ছ ঝাঁটার এক একটি শলাকা।

আমার জীবন কক্ষে জানিনা কি হেতু
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু,
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি,
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।

যে গভীর গাম্ভীর্য নিজের চিত্তের মধ্যে বাসা বাঁধিতেছিল, নূতন কালের সঙ্গে নিজের প্রাণের সুর মিলাইতে গিয়া মননের মধ্যে যে-সব প্রশ্ন, যে-সব সমস্যা জট পাকাইয়া উঠিতেছিল, নিজের চোখের সম্মুখে এবং মনের মধ্যে নূতন কাল যে রূপ লইতেছিল, যে নূতন জীবন ও মৃত্যু-চেতনা চিত্তকে গভীরে টানিয়া লইতেছিল, "প্রহাসিনী" যেন সে সব-কিছুর ঝুঁটি ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া ক্ষণিক কৌতুকের ছেলেখেলায় মাতিয়া ওঠা।

দুই হাতে মুঠা মুঠা কৌতুকের কণা
ছড়ায় হরির লুঠ, নাহি যায় গনা।

"প্রহাসিনী"র প্রকাশ কাল ১৩৪৫'র পৌষমাস। কবিতাগুলির বিষয়ভাবনা বিচিত্র। কবির ঠাট্টা কখনও আধুনিক নারী ও তাহাদের চালচলন লইয়া, কখনও ভোজন ও ভোজনের বিপত্তি লইয়া, কখনও নিজেকে লইয়া, কখনও আধুনিক কবিতার ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে লইয়া। কিন্তু যত কৌতুকই করুন না কেন কবি, সকল কৌতুকের পশ্চাতে থাকিয়া থাকিয়া কবির মনের গভীর কথাও ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়াছে; সকল পরিহাস-রসিকতার পশ্চাতে একটু ম্লান হাসি, একটু দুঃখের রেশ আবিষ্কার করা কঠিন নয়।

এই হাস্য পরিহাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের তীব্রতা সত্ত্বেও 'মাল্যতত্ত্ব' একটি রসসমৃদ্ধ কবিতা। এই ব্যঙ্গবাণের লক্ষ্য আধুনিক কবিতার ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি। জগামালির গাঁথা কুন্দমালা কবির গলায়, এই জগামালির মালার উপরই আজ কবিকল্পনার বিভূতি, ইহাই খাঁটি এবং ইহাকে লইয়াই আজকের দিনের কবিতা—

"শুক্ল একাদশীর রাতে
কলিকাতার ছাতে
জ্যোৎস্না যেন পারিজাতের পাপড়ি দিয়ে ছোঁওয়া,
গলায় আমার কুন্দমালা গোলাপ জলে ধোওয়া",—

এইটুকু যেই লিখেছি সেই হঠাৎ মনে পোলো
এটা নেহাৎ অসাময়িক হোলো।
হাল ফ্যাশানের বাণীর সঙ্গে নতুন হোলো রফা
একাদশীর চন্দ্র দেবেন কর্মেতে ইস্তফা।

* * *

তা ছাড়া ঐ পারিজাতের ন্যাকামিও ত্যাজ্য,
মধুর করে বানিয়ে বলা নয় কিছুতেই ন্যায্য।
বদল করে হোলো শেষে নিম্নরকম ভাষা :—
আকাশ সেদিন ধুলোয় ধোঁয়ায় নিরেট করে ঠাসা,
রাতটা যেন কুলিমাগি কয়লাখনি থেকে
এল কালো রঙের উপর কালীর প্রলেপ মেখে।
তার পরেকার বর্ণনা এই,—তামাক সাজার ধন্দে
জগায় থ্যাবড়া আঙুলগুলো দোক্তাপাতার গন্ধে
দিনরাত্রি ল্যাপা।
তাই সে জগা খ্যাপা।
যে মালাটাই গাঁথে তাতে ছাপিয়ে ফুলের বাস
তামাকেরই গন্ধের হয় উৎকট প্রকাশ।

* * *

[তা ছাড়া] মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, সরস্বতীর গলে
আর কি ওটা চলে।
রিয়ালিস্টিক প্রসাধন যা নব্যশাস্ত্রে পড়ি—
সেটা গলায় দড়ি।

এই ধরনের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ হাস্য পরিহাস তিনি করিয়াছেন আধুনিকা প্রিয়াদের সঙ্গেও। এবং "সানাই" গ্রন্থের 'অত্যুক্তি' কবিতায়, "প্রহাসিনী"র দু'একটি কবিতায় তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট। কবির রোম্যান্টিক্ অত্যুক্তির প্রসাধন ও প্রণয়গুঞ্জন সম্বন্ধে একালের আধুনিক প্রিয়ার আপত্তি; কবি তাহার উত্তরে বলেন,

তব অঙ্গে অত্যুক্তি কি করো না বহন
সন্ধ্যায় যখন
দেখা দিতে আসো।
তখন যে হাসি হাসো
সে তো নহে মিতব্যয়ী প্রত্যহের মতো,
অতিরিক্ত মধু কিছু তার মধ্যে থাকে তো সংহত।

* * *

কিন্তু ওই আসমানি শাড়িখানি
ও কি নহে অত্যুক্তির বাণী।
তোমার দেহের সঙ্গে নীল গগনের
ব্যঞ্জনা মিলায়ে দেয়, সে যে কোন্ অসীম মনের
আপন ইঙ্গিত
সে যে অঙ্গের সংগীত। ('অত্যুক্তি')

কিন্তু এ অত্যুক্তি ত আধুনিকার মধ্যে নয়, তাহা কবির চোখের রোম্যান্টিক্ দৃষ্টিতে। যে-আধুনিকার কাছে কবি ঋণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন "প্রহাসিনী"র 'আধুনিকা'য় সে আধুনিক রোম্যান্টিক্ কবি-চিত্তের চিরন্তনী আধুনিকা। সেই চিরন্তনী আধুনিকার স্বরূপটি দেখা যাইবে "সানাই"-র 'অনসূয়া' কবিতায় :

নায়িকা আসিল নেমে আকাশ-প্রদীপে আলো পেয়ে।
সেই মেয়ে
নহে বিংশ শতকিয়া
ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গ-হাসি-বিহসিত প্রিয়া।
সে নয় ইকনমিক্স-পরীক্ষাবাহিনী।
আতপ্ত বসন্তে আজি নিঃশ্বসিত যাহার কাহিনী।
অনসূয়া নাম তার, প্রাকৃত ভাষায়
কারে সে বিস্মৃত যুগে কাঁদায় হাসায়,
অশ্রুত হাসির ধ্বনি মিলায় সে কলকোলাহলে
শিপ্রাতটতলে
পিনদ্ধ বল্কল-বন্ধে যৌবনের বন্দী দূত দোঁহে
জাগে অঙ্গে উদ্ধত বিদ্রোহে।
অযতনে এলায়িত রুক্ষ কেশপাশ
বনপথে মেলে চলে মৃদুমন্দ গন্ধের আভাস।" ('অনসূয়া')

এই চিরন্তনী আধুনিকা ও অধুনা-জাত বিংশশতকিয়া আধুনিকাব মধ্যে ব্যবধান ত আছেই, এবং এই ব্যবধান দুই দৃষ্টিভঙ্গিব ব্যবধান। তাহা লইয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

অতএব মন, তোর কল্‌সি ও দড়ি আন,
অতলে যাবিস ডুব Mid Victorian।
কোনো ফল ফলিবে না আঁখিজল-সিচনে।
শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে।
গদগদ সুর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
শেষ বেলা কেটে যাক ঠাট্টায় ঠাট্টায়। ("আধুনিকা', "প্রহাসিনী")

কাজেই 'বিংশশতকিয়া আধুনিকা'দের সঙ্গে জীবনের শেষ বেলায় কবি ঠাট্টা পরিহাসই করিয়া গিয়াছেন। চিত্তেব গভীরে তাহারা স্থান লাভ করিতে পারে নাই, সেখানে 'মালবিকা'দের একচ্ছত্র রাজত্ব।

"নবজাতক"-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৪৭'র বৈশাখে। গ্রন্থের সূচনায় কবিকে বলিতে শুনিতেছি,

"আমাব কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। * * * কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হোতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাহিরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রশস্ততা ধরা পড়ে। * * * হয়তো * * * এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুব ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা। * * *"

কবি-জীবনের শেষ অধ্যায়ে এই ঋতু পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল "পুনশ্চ-শেষসপ্তক" হইতেই, একথা আমি আগেই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। "নবজাতক" নাম দিয়া যে নূতন ঋতুকে বা নূতন আপনাকে কবি চিহ্নিত করিলেন, সেই ঋতুব বা নূতন মানুষের লক্ষণ হইল এক নূতন সমাজ-চেতনা, বৃহত্তর জন-মানস সম্বন্ধে চেতনা, ইতিহাস-চেতনা এবং এই চেতনার সাহায্যে কাব্যে বস্তুর বাস্তব অনুভূতির সঞ্চার। এই সব লক্ষণের সূচনা "পুনশ্চ" হইতেই ধীরে ধীরে দেখা যাইতেছিল, এবং পদ্যরীতির প্রবর্তনার মধ্যেই তাহা কতকটা ধরা

পড়িয়াছিল। অন্তরের মধ্যে তাহাদের বিবর্তনও চলিতেছিল ধীরে ধীরে; ইতিপূর্বেই সে-পরিচয় নানা কবিতায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কবিচিত্তে এই বাস্তব-বোধের প্রকৃতি একটু নূতন রকমের। বাস্তব বলিতে আমরা যাহা বুঝি রবীন্দ্র-কবিচিত্তে বাস্তব সেই সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ অর্থ বহন করে না। সে-বাস্তব কবির নিজের সৃষ্টি; তাহাদের 'অনেকটা মায়া অনেকটা ছায়া',

আমারে শুধাও যবে এবে কভু বলে বাস্তবিক ?
আমি বলি কখনো না, আমি রোম্যাণ্টিক।
যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি, সে নহে কথায় তাহা জানি
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা
সেথায় রমণী দস্যুভীতা,
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম,
সেথায় নির্মম কর্ম,
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মাভৈঃ'
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে-হাতে। ('রোম্যাণ্টিক')

সত্যই, যেখানে দুঃখ ও বেদনা, যেখানে অত্যাচার-অবিচার, যেখানে মানবতার অপমান, যেখানে হিংসা ও পরপীড়ন সেখানে কবি কবিহিসাবে বাস্তবের আহ্বান স্বীকার করিতে এতটুকু দ্বিধা করেন নাই, এবং সেখানে বস্তুর যথার্থ স্বরূপও তিনি নিজস্ব রোমাণ্টিক কল্পনায় আচ্ছন্ন করেন নাই, বরং যথার্থ সমাজ ও ইতিহাসগত চেতনায় তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "নবজাতক"-গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু অনুভূতি যেখানে একান্ত ব্যক্তিগত, বস্তু যেখানে একান্তভাবে ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই বাস্তব, ব্যক্তিগত হৃদয় ও কল্পনাবৃত্তির লীলার মধ্যেই যেখানে বস্তুর স্বরূপ একান্ত ভাবে দৃষ্টি ও ভাবগোচর হয়, সেখানে কবি রোম্যাণ্টিক হইতে এতটুকু দ্বিধা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মনন ও কল্পনার প্রকৃতিই এইরূপ। "নবজাতকে" তাহারও প্রমাণ মিলিবে।

প্রথমেই চোখে পড়ে "নবজাতকে"র কবিতাগুলির নিরলংকার বিরলসৌষ্ঠব স্বল্পভাষিতা। এই স্বল্পভাষিতার সূত্রপাত "পরিশেষ" গ্রন্থ হইতেই, কিন্তু তাহার পরেও কবি মাঝে মাঝে বাণীবন্যার উচ্ছ্বসিত স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, প্রমাণ "পত্রপুট"। কিন্তু "নবজাতক" হইতেই সৃষ্টিলাভ করিল সেই নিরংলকার স্বল্পভাষিতা যাহা ক্রমশ সমস্ত রূপকালংকার, বাহুল্য কল্পনার মায়াজাল একে একে মুক্ত করিয়া শুধু বক্তব্য বিষয়ের উপরই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, স্বচ্ছ সুস্পষ্ট অর্থই তাহার ভিত্তি।

দৃষ্টিভঙ্গির যে নূতনত্বের জন্য "নবজাতক" নাম সার্থক, তাহা প্রথমেই ধরা পড়িবে বিষয়বস্তুর মধ্যে। এমন সব বিষয়ের আশ্রয়ে কবি নিজের মনন-কল্পনাকে বিস্তৃত করিয়াছেন যে-বিষয়গুলিই একান্ত ভাবে বর্তমান যুগের—রেলগাড়ি, এরোপ্লেন, রেডিও। শুধু তাহাই নয়, যে সব উপমা কবির কল্পনায় ভিড় করিয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি

একান্তভাবে আধুনিক যুগের, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি আমাদের অতি পরিচিত দৈনন্দিন জীবনেরও ;

এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি,
কামরায় গাড়িভরা ঘুম
রজনী নিঝুম। ('রাতের গাড়ি')

রাত্রির অন্ধকারে দ্রুত ধাবমান রেলগাড়ির উপমাকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্তিগত প্রাণের অন্ধযাত্রার কল্পনা প্রসারিত হইয়াছে। অন্যত্র, সংসারের 'চলাফেরার ধারা'র চলতি ছবি দেখার কল্পনা বিস্তৃত হইয়াছে ইস্টেশনে রেলগাড়ির আসা-যাওয়াকে আশ্রয় করিয়া :

সকাল বিকাল ইষ্টেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি।
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে,
ভাঁটির ট্রেনে কেউ বা চড়ে
কেউ বা উজান ট্রেনে। ('ইষ্টেশন')

রেলগাড়ির যাত্রা শুরুর ধ্বনি ও ছন্দ রূপটিও ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর ধরা পড়িয়াছে এই কবিতাটিতে। এরোপ্লেনের উপর ত কবিতাই আছে, কিন্তু তাহার প্রতি কবির চিত্ত প্রসন্ন নয় ; বিজ্ঞানের এই নবাবিষ্কারের মধ্যে কবি শুধু শক্তির অভিমানই দেখিয়াছেন, অশান্ত স্পর্ধাই দেখিয়াছেন,

ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।

অথচ এই বিভীষিকা যে বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থারই সৃষ্টি, সেকথা কবির মনে পড়ে নাই। তিনি কামনা করিতেছেন, এই এরোপ্লেন যে কলুষিত ইতিহাসের প্রতীক সে-ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া যাক্, এই আর্ত ধারয় 'শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি' আবার সার্থক হউক। যদিও এ-দৃষ্টি ঠিক আধুনিক নবজাতকের দৃষ্টি নয়, তবু একথা সত্য যে, বর্তমান সভ্যতার পাপের ও ধ্বংসের যে রক্তলিপ্ত রূপ তাহার উপর কবির ক্রুদ্ধ অভিশাপ বারেবারে অগ্নিনিঃশ্বাসে উচ্চারিত হইয়াছে। (বর্তমান সভ্যতার মূলে যে ঘুণ ধরিয়াছে, এই ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যে মানবতাকে প্রতিমুহূর্তে লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত করিতেছে, এ সম্বন্ধে চেতনা কবিচিত্তে আগেই জাগিয়াছিল, "প্রান্তিকে"ই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—"নবজাতকে" এই ঐতিহাসিক সচেতনতা আরও গভীর হইয়াছে। কবি এই সভ্যতার ধ্বংসই কামনা করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিশ্বাস করেন যে সেই ধ্বংসের ভিতর হইতেই 'নূতন আলোক নূতন জীবন' সৃষ্টিলাভ করিবে।) বর্তমানের ধ্বংস কামনা ও নূতন সৃষ্টিতে বিশ্বাস কবিতার পর কবিতায় বারবার ধ্বনিত হইয়াছে। এই সভ্যতার প্রকৃতি এবং অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব সম্বন্ধেও তিনি সচেতন।

ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

* * *

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানা ছেঁড়া তারি দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরাব অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুল বীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি।
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।
* * *
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে। ('প্রায়শ্চিত্ত')

এই সভ্যতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে 'বুদ্ধভক্তি' এবং 'আহ্বান' কবিতায়ও, এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাস 'আহ্বান', 'নবজাতক' এবং কতকটা 'জয়ধ্বনি' কবিতায় স্বপ্রকাশ। 'নবজাতক' কবিতায়

নবীন আগন্তুক,
নবযুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
* * *
তরুণ বীরের তূণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির 'পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রামের তরে।
রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলন-তীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে।
* * *
মানবের শিশু বার বার আনে
চির আশ্বাসবাণী
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝিবা দিতেছে আনি।

এই বিশ্বাসই, ভবিষ্যতের এই মুক্তির আলোতে প্রাণের চরিতার্থতায় বিশ্বাসই শেষ অধ্যায়ের কবিচিত্তকে বিক্ষোভ সংগ্রামের মধ্যেও জাগ্রত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক-চেতনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়, হিন্দুস্থান' ও 'রাজপুতানা' কবিতা দু'টিতে। কবিতা হিসাবে অধিকতর সমৃদ্ধ 'হিন্দুস্থান' কবিতাটি, কিন্তু 'রাজপুতানা'র ইতিহাস-চেতনা

সমৃদ্ধতর। রাজপুতানার বর্তমান রূপ ইতিহাসের নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গরূপ; নিরর্থক, অনৈতিহাসিক, অসার্থক রূপ।

তাই ভাবি হে রাজপুতানা
কেন তুমি মানিলেনা যথাকালে প্রলয়ের মানা,
লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক ;
জনতার চোখ
দীপ্তিহীন
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন।
শংকরের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে।

কতগুলি কবিতা ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্লেষণ ও হিসাব-নিকাশের ভাবানুভূতিতে দীপ্ত। 'শেষদৃষ্টি', 'ভাগ্যরাজ্য', 'এপারে-ওপারে', 'জবাবদিহি', জন্মদিন', 'রোম্যাণ্টিক', 'অবর্জিত', 'শেষ' 'হিসাব', শেষবেলা', 'রূপ-বিরূপ' এবং 'শেষ কথা' এই পর্যায়ের। কবির অতি পরিচিত অনুভূতিগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ এই কবিতাগুলিতে মিলিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখিতেছি, কবির নিজের জীবনের অপূর্ণতা বারবার তাহাকে পীড়িত করিতেছে। পুর্বেও "শেষসপ্তকে" ও "পত্রপুটে" তাহা ব্যক্ত হইয়াছে; "নবজাতকে"ও দেখিতেছি একাধিক কবিতায় অসম্পূর্ণতার বেদনায় কবিচিত্ত উৎপীড়িত। কবি নিজেই সেই অসম্পূর্ণতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন। কবি নিজে জানেন, তিনি 'রোম্যাণ্টিক', তাঁহার চিত্তধর্মের প্রকৃতিই এইরূপ যে, সে জীবনের তথ্য ফেলিয়া রাখিয়া নিঃসঙ্গ মনে জীবনের তত্ত্ব খুঁজিয়া বেড়ায়।

ভাবি এই কথা—
ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলেছি দিনেরাতে।

* * *

তারি ধাক্কা পেয়ে মন
ক্ষণেক্ষণ
ব্যগ্র হয়ে উঠে জাগি
সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি।
আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

('এপারে-ওপারে')

অথচ তাহার বেদনাও ত এড়াইতে পারেন না। শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত বার্ধক্য পর্যন্ত অনেক অজ্ঞাত রহস্য অনেক দুর্বোধ্য বাণী

কাব্যের ভাণ্ডারে আনি
স্মৃতিলেখা ছন্দে রাখিয়াছি ঢাকি,
আজ দেখি অনেক রয়েছে বাকি।
সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ যা নিষ্ঠুর উৎকট যা করেনি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে
তার সংগীতের তালে

ছন্দোভঙ্গ হলো তাই
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই। ('রূপ-বিরূপ')

কবি আজ তাই প্রার্থনা করিতেছেন, বাণীর সম্মোহবন্ধ ছিন্ন হউক,

তাই আজ বেদমন্ত্রে হে বজ্রী, তোমার করি স্তব,
তব মন্ত্ররব
করুক ঐশ্বর্যদান,
রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষগান,
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার,
বাণী-বিলাসীর কানে ব্যক্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার। ('রূপ-বিরূপ')

অন্য কতকগুলি কবিতায় কালের অতীত যে-রহস্যলোক, অগ্রসরমান মৃত্যুর যে-কল্পনা অথবা রূপের যে অলক্ষ্য স্পর্শ বহুকাল কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে, তাহার দীপ্তি সুস্পষ্ট। এ-ধরনের ভাবানুভূতি ও মনন-কল্পনার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত বলিয়া সে-কবিতাগুলির আর উল্লেখ করিতেছি না। এই ভাবানুভূতি ও মনন-কল্পনা কোথাও কোথাও ব্যক্তি-জীবনের প্রেক্ষাপটে, স্মৃতির ম্লান সৌরভে আরও ঘননিবিড, জীবনের অসম্পূর্ণতার বেদনায় আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

"সানাই" সার্থকতর কাব্য। গীতিকাব্য হিসাবে যে শুধু "নবজাতক" অপেক্ষাই "সানাই" মধুরতর, তাহা নয়, এই পর্বের সমস্ত কাব্যের মধ্যে বোধ হয় "সানাই"ই শ্রেষ্ঠ— শ্রেষ্ঠ সুরে ও গীতিময়তায়, ভাবমাধুর্যে ও কল্পমায়ায়, পুরাতন মধুর প্রেমের নূতন আস্বাদনে, নিসর্গের ক্লান্ত মধুর রূপের সুকুমার সম্ভোগে। "পূরবী"র সেই স্মৃতিময় সুকোমল প্রেমের কিছু সুর কিছু আবেশ বহুদিন পর "সানাই"র অধিকাংশ কবিতায় যেন নূতন করিয়া ধরা পড়িল, অধিকাংশ কবিতাই সেই সুদূরবর্তিনী লীলাসঙ্গিনীর স্মৃতির আবেশে আবিষ্ট; কৈশোর-যৌবনের প্রেম ও সম্ভোগ স্মৃতির নিঃশ্বাসে সুরভিত হইয়া এই কবিতাগুলিতে একটি মৃদু ও সুকুমার তন্দ্রাজড়িত মায়ামোহের সৃষ্টি করিয়াছে। বহুদিন পর যেন এই ধরনের ভাবমণ্ডলের মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম। এ যেন পুরাতন রং আবার নূতন করিয়া লাগিল জীবনে,

এ ধূসর জীবনের গোধূলি
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি
মুছে আসা সেই ম্লান ছবিতে
রং দেয় গুঞ্জন গীতি।

* * *

এই ছবি ভৈরবী আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে।
বুকের লালিম-রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি। ('নতুন রঙ')

এই নূতন রঙের পরিচয় স্বপ্নের অতিথি সেই সব ছবি "সানাই"র অসংখ্য কবিতায়।

বেলা হয়ে গেল তোমার জানালা 'পরে
রৌদ্র পড়েছে বেঁকে।
এলোমেলো হাওয়া আমলকি ডালে ডালে
দোলা দেয় থেকে থেকে।

* * *

যারা আসে যায় তাদের ছায়ায়
প্রবাসের ব্যথা কাঁপে,
আমার চক্ষু তন্দ্রাঅলস
মধ্যদিনের তাপে।
ঘাসের উপরে একা বসে থাকি
দেখি চেয়ে দূর থেকে
শীতের বেলার রৌদ্র তোমার
জানালায় পড়ে বেঁকে ॥ ('জানালায়')

অথবা,

জ্বেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ
বিজন ঘরের কোণে।
নামিল শ্রাবণ, কালো ছায়া তার
ঘনাইল বনে বনে।

* * *

দুয়ার বাহির হতে আজি ক্ষণে ক্ষণে
তব কবরীর করবী মালার বারতা আসুক মনে।
বাতায়ন হতে উৎসুক দুই আঁখি
তব মঞ্জীর-ধ্বনি পথ বেয়ে
তোমারে কি যায় ডাকি।
কম্পিত এই মোর বক্ষের ব্যথা
অলকে তোমার আনে কি চঞ্চলতা
বকুল বনের মুখরিত সমীরণে ॥ ('আহ্বান')

বহুদিন পর যেন রবীন্দ্র-কাব্যে এই ধরনের সুর শুনিলাম। কোথাও কোথাও এই সুরের সঙ্গে মিশিয়াছে স্মৃতির রেশ, কোথাও কোথাও জীবনের দিনগুলি যে শেষ হইয়া আসিতেছে তাহারই বেদনা, তাহারই ব্যথিত ঔদাসীন্য। আবার কোথাও কোথাও জীবনের সার্থকতা অসার্থকতার আনন্দবেদনার অঞ্জলি। যাহাই হউক "সানাই"র প্রায় সব কবিতাতেই স্বল্পস্তিমিত ভাষণের মধ্য দিয়া উদাস করুণ পূরবীর সুরটি ধরা পড়ে। ঐখানেই ইহাদের মাধুর্য। আখ্যানমূলক দু'তিনটি সার্থক কবিতাও আছে; সেগুলিও কতকটা এই সুরে বাঁধা। "প্রান্তিকে"র প্রত্যক্ষ মৃত্যু-ভাবনা দূরে চলিয়া গিয়াছে, সৃষ্টি ও জীবন, মৃত্যু ও নিয়তির গভীর রহস্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন কবি অনুভব করিতেছেন না, ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণেও মন ও কল্পনা প্রসারিত হইতেছে না, সমাজ এবং ইতিহাসের চেতনাও বোধ-বুদ্ধিকে পীড়িত করিতেছে না, বাহিরের সংস্পর্শে মননজাত অভিজ্ঞতা আবর্তিত হইতেছে না, চিত্ত এখন অতীতের মধুর স্মৃতিতে সঞ্চরমান, একটি ব্যথিত ঔদাসীন্যে ভরপুর। "পরিশেষে" যে মনন-কল্পনার জীবন আরম্ভ হইয়াছিল বহু আবর্তন পরিবর্তনের পর সে-জীবন যেন আবার নিজস্ব ভাবকেন্দ্রে স্থিতিলাভ করিতেছে।

কিন্তু একান্ত ভাবে স্থিতিলাভ করা আর কি সম্ভব? সেই প্রাচীন দিনের পুরাতন ভাবকল্পনা কি আর উদাস করুণ একটি সুরে গাঁথিয়া তোলা সম্ভব? কবির মনন-কল্পনায় যে নূতন দিনের স্পর্শ লাগিয়াছে, নূতন চেতনায় যে কবিচিত্ত ইতিমধ্যেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহার সুর ও তাল যে অন্য জগতের। সেই সুর ও তাল পুরাতন সুর ও তালকে যে মাঝে মাঝে বেসুর বেতাল করিয়া দেয়, জীবনবীণাও একসুরে একতালে বাজিবার উপায় আর নাই! সানাইর সুরে যে ডমরুর ধ্বনি বাজিয়া প্রেম ও অতীত-স্মৃতির মাধুর্যকে হঠাৎ বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়! সূর্যাস্তের পথ হইতে বৈকালের রৌদ্র নামিয়া গিয়াছে, বাতাস ঝিমাইয়া পড়িয়াছে; বাংলার সুদূর গ্রামের জনশূন্য মাঠে বিচালি বোঝাই গরুর গাড়ি মন্থর গতিতে চলিয়াছে, পিছনে দড়ি বাঁধা বাছুর। পুকুরের ধারে বনমালি পণ্ডিতের ছেলে সারাদিন ছিপ ফেলিয়া বসিয়া। শুক্‌নো নদীর চর হইতে বুনো এক ঝাঁক হাঁস মাথার উপর দিয়া কাজলা বিলের দিকে চলিয়া গেল গুগলির সন্ধানে। ছুটিতে দুই বন্ধু গ্রামে আসিয়াছে; কাটা আকের ক্ষেতের পাশ দিয়া, বৃষ্টি ধোওয়া ভিজা ঘাসের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দুই বন্ধু প্রেমের গল্পে মশগুল।

> নব বিবাহিত একজনা,
> শেষ হোতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা।
> আশে পাশে ভাঁটি ফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
> বাঁকা চোরা গলির জঙ্গলে,
> মৃদুগন্ধে দেয় আনি
> চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।
> জারুলের শাখায় অদূরে
> কোকিল ভাঙিচে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে
>
> টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
> ফিন্‌ল্যাণ্ড চূর্ণ হোলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে॥ ('অপঘাত')

এই রবীন্দ্রনাথ নূতন রবীন্দ্রনাথ, শেষ অধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ। এই চেতনা নূতন কালের চেতনা। আমাদের ভাব-কল্পনার স্বপ্ন, ছায়া, মায়া, প্রেমের ও স্মৃতির স্বপ্ন আগে ভাঙ্গিত না, এখন বারে বারে ভাঙ্গিয়া টুটিয়া যায়। আগে আমরা আত্মরত আত্মলীন কল্পনায় ডুবিয়া থাকিতাম, বোমার বর্ষণ বজ্রের গর্জন আমাদের দুর্ভেদ্য কল্পনার প্রাচীর ভাঙ্গিতে পারিত না, এখন পারে। ভাল মন্দ'র কথা নয়, যাহা হয় তাহারই উল্লেখ করিতেছি। বস্তু-পৃথিবীর চেতনা আমাদের আত্মরত কল্পনাকে শিথিল করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথেরও করিয়াছে; নহিলে সোভিয়েট বোমার বর্ষণে ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভস্মভূতি বাংলা দেশের একপ্রান্তে চৈত্রের ছড়ান নেশাকে এক নিমেষে চূর্ণ করিয়া দিত না।

কিন্তু "সানাই"-গ্রন্থে এই ধরনের ভাবানুভূতি, এই নূতন চেতনার পরিচয় অত্যন্ত কম; সে পরিচয় আছে পূর্বালোচিত গ্রন্থগুলিতে—"নবজাতকে", "পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুটে", "পরিশেষে"। তবু, এই চেতনাকে বাহিরে রাখিয়া, ইহাকে পাশ কাটাইয়া পূর্বপরিচিত রবীন্দ্রনাথকে, রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভাবকল্পনার প্রকৃতিটিকে যে "সানাই"-গ্রন্থে নূতন করিয়া দেখিলাম, পুরাতন সুরটি শুনিলাম, এবং শেষ বারের জন্য দেখিলাম ও শুনিলাম, পাঠকের এ মহাভাগ্য। জীবন যে ছন্দভাঙ্গা অসংগতিতে পূর্ণ, সুর ও তালের মধ্যে যে অহরহ বেসুর বেতাল বাজিয়া ধ্বনিয়া উঠে, নিকটের, অর্থাৎ চোখের সম্মুখের স্পর্শমান দৃশ্যমান বস্তুজীবনের দুঃখদ্বন্দ্ব ও অপূর্ণতা যে দূরের নিরবধি প্রবহমান কালের সমগ্রতার ঐক্য ও সংগতিকে আড়াল

করিয়া রাখে, একথা কবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানিয়াছেন ; নূতন কাল যে এই রূপ ও বিরূপকে চেতনার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে তাহাও কবি জানেন, বরং দৃশ্যমান স্পর্শমান বস্তু-পৃথিবীকেই প্রাধান্য দিয়াছে, তাহাও জানেন। কিন্তু কবির সমগ্র জীবনের সাধনা ত সুরের, ছন্দের, তালের, ঐক্যের ও সংগতির, পূর্ণতার ও সমগ্রতার। ইহাই রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনার প্রকৃতি এবং "সানাই"-গ্রন্থে আর একবার তিনি সেই প্রকৃতিটি উদ্ঘাটিত করিলেন। 'সানাই' কবিতাটিই দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যাইতে পারে।

সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে,
বুঝিবার সময় কি আছে।
অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর মাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত্যলোকের কোন বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি

*　　*　　*

তারি স্পর্শ লেগে
সাহানার রাগিণীতে বৈরাগিণী ওঠে যেন জেগে,
চলে যায় পথহারা অর্থহারা দিগন্তের পানে।

*　　*　　*

এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল
যার সুর যার তাল
রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে ওঠে।
কালের অঞ্জলিপুটে।
প্রথম যুগের সেই ধ্বনি
শিরায় শিরায় উঠে রণরণি,
মনে ভাবি এই সুর প্রত্যহের অবরোধ পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ-আরম্ভের অজানা পর্যায়।
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব, নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।

চৌদ্দ

রোগশয্যায় (১৩৪৭)
আরোগ্য (১৩৪৭)
জন্মদিনে (১৩৪৮)
শেষলেখা (১৩৪৮)

"প্রান্তিকে" একবার কবি মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বাণীরূপ দান করিয়াছেন। সেই মৃত্যুস্নান কবিকে এক নূতন জীবনে জন্মদান করিয়াছিল; নানা অভিজ্ঞতায় জীবন আবার আপনার নূতন সহজ রূপ লাভ করিতেছিল, তিনি যে বার বার নবজাতক, এই কথাই তাঁহার বিচিত্র রচনার মধ্যে ব্যক্ত হইতেছিল। নানা বিচিত্র সাধনায় বার্ধক্যের দিনগুলি কাটিতেছিল, এবং নূতন কাল ও নূতন জীবনকে কবি ক্রমশ পুরাতন জীবনের ভাবকল্পনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় করিয়া এক সমগ্রতায় গাঁথিয়া তুলিতেছিলেন। এমন সময় এক বিশ্রামের অবকাশ কবি কাটাইতেছিলেন হিমালয়ের কোলে। মনের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড়; তাহাদেরই সঙ্গে চলিতেছিল গল্প সল্প; একদিন গল্প বলা শেষ হইল;

তারপরে বরাবরকার অভ্যাস মতো শোবার ঘরের কেদারায় গিয়ে বসলুম। বাদলার হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি হবে হবে করছে। সুধাকান্ত [কবির পার্শ্বসঙ্গী] দেখতে এলেন দরজা জানালা ঠিকমতো বন্ধ আছে কিনা। এসে দেখলেন আমি কেদারায় বসে আছি। ডাকলেন, কোনো উত্তর নেই। স্পর্শ করে বললেন ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, চলুন বিছানায়। কোনো সাড়া নেই। তারপর চৌষোট্টি ঘণ্টা কাটলো অচেতনে। ("গল্পসল্প", ৬৭-৬৮ পৃঃ)

সেই অবস্থায় কবিকে নামাইয়া আনা হইল কলিকাতায়; কয়েকটি দিন কাটিল জীবনমরণের সন্ধিস্থলে, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হইল পরিচয়, তারপর চেতনা যখন ফিরিয়া আসিল কবি তখন নূতন মানুষ। আর একবার নবজন্মলাভ তাঁহার ঘটিল; 'দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতির' ধ্যানে তখন তাঁহার দৃষ্টি হইল তন্ময়। তাহার পর করাঙ্গুলের গণনায় যে ক'টি মাস কবি প্রাণাধিক প্রিয় এই মাটির পৃথিবীতে বাঁচিয়া ছিলেন, সে ক'টি মাস মৃত্যুর সঙ্গে যুঝিয়া, মৃত্যুর দ্রুত অগ্রসরমান পদধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া, দেহদুঃখ-হোমানলে পুড়িয়া পুড়িয়াই কাটিয়াছে। মৃত্যুর অস্পষ্ট ছায়া যত নিকটে আসিয়াছে দেহগত দুঃখ-তপস্যা জীবনকে তত বেশি জ্যোতিষ্মান তত বেশি দীপ্তিমান করিয়াছে, ততই কবি প্রাণকে বেশি করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন এবং প্রাণশিল্পী কবি তপস্যার আনন্দকে মানবের অপরাজেয় শক্তি ও মহিমাকে জাগ্রত জীবনকে বেশি করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই শুভ্র পরিণত বার্দ্ধক্যের মৃত্যুধৃত জীবনের স্বচ্ছ শুভ্র জ্যোতির মধ্যে শেষ কয়েকটি মাসে কবি যে-চারিটি কাব্য রচনা করিয়াছেন, সমস্ত মানবসংসার সেই কাব্যের আশ্রয়, এখানে সকলেরই জায়গা আছে, কাহারও জন্য কোনও বিধিনিষেধ নাই। বৃহৎ মানব ও প্রকৃতির সংসার, বৃহৎ সেই সংসারে চলিয়াছে প্রাণের বিচিত্র লীলা। অতীত ও বর্তমান, কৃষক ও কারখানার শ্রমিক, যুদ্ধের গর্জন ও তপস্যার শান্তি, মানবিক কোলাহল ও অপার্থিব শুদ্ধতা, বৃদ্ধ বনস্পতি ও তুচ্ছ ভুট্টার ক্ষেত, মৃত্যু ও জীবন, অচেতন অত্যাচার ও যন্ত্রণার শক্তি, ভজিয়ার যাঁতা ঘুরান এবং অশ্বত্থ তলায় খেয়াঘাটে লোক পারাপার, গুড়ের কলসি ও পাটের বস্তা কিছুই এ সংসার হইতে বাদ পড়ে নাই। এই বিচিত্র চলমান প্রাণলীলার মধ্যে বাঁচিয়া আছি, কবির কাছে আজ এই কথাটির মূল্যই সবচেয়ে বেশি। "রোগশয্যায়", "আরোগ্য", "জন্মদিনে" সর্বত্র এই অস্তিত্বের মাধুর্যই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সূক্ষ্মতম ধ্বনিতে ধরা

পড়িল। কতবার যে বলিলেন, এই প্রাণ-লীলার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিয়াই আমি ধন্য আমি আনন্দিত ; এবং এই কথা এক এক সময় মিশিয়া গিয়াছে উপনিষদের ঋষি কবির শ্লোকের সঙ্গে। সত্তার আনন্দময় আকুতি একেবারে যেন দ্রষ্টা ঋষিদের আনন্দস্তর স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু কবির আনন্দ দেখার আনন্দ, তাঁহার বাণীও দেখারই বাণী। এই দেখাই কবির ধ্যান। এবং সেই ধ্যানের দৃষ্টিই সমগ্র সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবনদৃশ্যের উপর প্রসারিত হইয়া আছে। এই ধ্যানের দৃষ্টি শুভ্র স্বচ্ছ ; সেই শুভ্র স্বচ্ছ দৃষ্টির তলে জাগিয়া আছে মানব-সংসার, মাটির ঘর আর সেই মাটির মানুষ। সেই ঘর আর সেই মানুষের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কবির তৃপ্তির শেষ নাই, বিস্ময়ের অবধি নাই, আনন্দ ও বেদনার সীমা নাই। বিরল অলংকারে, স্বল্পতম ভাষণে দেখার একটি সর্বব্যাপী আকাশ যেন এই চারিটি কাব্যের ভিতরে বাহিরে বিস্তৃত হইয়া আছে। শেষ অধ্যায়ের শেষতম এই কাব্যমণ্ডলটি যেন একেবারেই বাক্য ও চিন্তার অতীত, যেন একেবারে অবাঙ মানসগোচর, গোচর শুধু দৃষ্টির।

"রোগশয্যায়" প্রকাশিত হয় ১৩৪৭'র পৌষ মাসে। ৩০ অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত জোড়াসাঁকোর বাড়ির রোগশয্যায় ১১টি কবিতা রচিত হইল, কোনওটি প্রাতে, কোনওটি দুপুরে, কোনওটি রাত দু'টোয়। বাকি সবগুলিই ১৯ নভেম্বর হইতে ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে শান্তিনিকেতনে "উদয়ন"-গৃহের রোগশয্যাবেষ্টনের মধ্যে রচিত। "আরোগ্য" প্রকাশিত হয় ১৩৪৭'র ফাল্গুনে। ইহার সব কবিতাই ১৯৪১'র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা। বই দুটি প্রকৃতপক্ষে একই বই'র দু'টি খণ্ড, প্রায় একই ভাবকল্পনার সৃষ্টি, এবং সেই হেতু এক সঙ্গেই আলোচ্য।

এই দু'টি গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় বিশেষভাবে "রোগশয্যায়"-গ্রন্থে একটি অতি গভীর গম্ভীর সুর ধ্বনিত ; জীবন ও মৃত্যুর, ধ্বংস ও সৃষ্টির একটি গভীরতর দর্শন যেন কবির দৃষ্টিকে একটি সহজ ও স্বচ্ছতা দিয়াছে, একটি দৃঢ় বিশ্বাসে রূপান্তরিত করিয়াছে, এবং সে-বিশ্বাস ও গভীরতর দর্শন অনেকগুলি কবিতার বক্তব্যের মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বলিবার ভঙ্গি অপেক্ষাও বক্তব্য বস্তু এই সব কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং এই বলার মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নাই। সবল নিরাসক্ত মনের অপরাজিত বীর্যের গভীর স্বচ্ছ দীপ্তি এই কবিতাগুলিকে একটি অপরূপ শক্তি ও দৃঢ় সংহত রূপ দান করিয়াছে। "জন্মদিনে" এবং "শেষলেখায়"ও এই বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। বাক্য ও বর্ণ-বিরল এই কবিতাগুলিতে বক্তব্য স্পষ্ট, দৃষ্টি প্রখর ও গভীর, ভঙ্গি দৃঢ় ও সংহত এবং আবেগ সংযত।

রোগশয্যার দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে মানুষের চিত্ত স্বভাবতই হয় দুর্বল, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত শক্তি ও শান্তিতে স্বভাবতই মানুষ তখন বিশ্বাস হারায় এবং একান্ত ভাবেই নিজেকে, নিজের দেহ এবং দেহাশ্রিত রোগকে লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়ে। আশ্চর্য এই, এই দুর্বলতার এতটুকু চিহ্ন এই কবিতাগুলির কোথাও নাই, না বলিবার ভঙ্গিতে, না মনন-কল্পনায় না বক্তব্যের শিথিলতায়। নিজের রোগযন্ত্রণার মধ্যে নিজেই তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, মানুষের ক্ষুদ্র দেহের যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি কি দুঃসীম! দেহ-দুঃখ-হোমানলে যে-অর্ঘ্যের আহুতি মানুষ রচনা করে তাহার তুলনা কোথাও নাই,

এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
এমন উপেক্ষা মরণেরে
হেন জয়যাত্রা:—

ইহার তুলনা কোথাও নাই। দেহ-যন্ত্রণা যত বড়ই হোক, সংসারে তাহাও প্রাণেরই আনুষঙ্গিক। নির্ভীক সহিষ্ণুতার পরীক্ষাও সকলকেই দিতে হয়, তাহার সমস্ত ভার বহন করিতে হয় সমস্ত চেতনা দিয়া।

এই মহাবিশ্বতলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে।

এই যন্ত্রণার বর্ণ ও গন্ধ অনেকগুলি কবিতায় ছড়ান অন্যান্য বর্ণ ও গন্ধের সঙ্গে মিশাইয়া জড়াইয়া। ব্যক্তিগত জীবনের রোগ ও আরোগ্য লইয়াই এই কবিতাগুলি, ইহাদের মধ্যে রোগ-সংক্রান্ত দুঃখ-যন্ত্রণার কথা আছে, কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত ইতিহাস গোপন ও প্রচ্ছন্ন, ব্যক্তিগত দুঃখ যন্ত্রণার প্রেক্ষাপটে ধরা পড়িয়াছে সেই 'পীড়নের যন্ত্রশালা' যাহাকে মর্ত্যবাসী মানব বারে বারে অতিক্রম করিয়া যায়,

বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে—

তাহাদের এই যাত্রাই সত্তার অপরাজেয় অস্তিত্ব ঘোষণা করে। প্রাণশিল্পী কবি এই মহান যাত্রার দৃশ্যই দেখিয়াছেন এবং তাহার আনন্দ ও বিশ্বাসে ব্যক্তিগত দুঃখ-যন্ত্রণাকে প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন। তাই, দীর্ঘ যন্ত্রণার অন্ধকার রাত্রি যখন পার হইলেন তখন অন্ধকারকেই অস্বীকার করিয়া বলিলেন,

প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখ-বিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণদেহ দুর্গের শিখরে,

তখন তাহার কণ্ঠে দেশকালহীন মানুষের দুঃখবিজয়ী প্রাণের জয়গানই শুনিলাম। অস্তিত্বের এই যে যাত্রা প্রাণের মধ্যে ইহার স্বীকৃতিই মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার পথ, এই প্রাণ জন্মমৃত্যুর অতীত, অদর্শনের দুঃখ, বিদায়ের বেদনা সেই প্রাণকে মোহগ্রস্ত করে না।

চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী
এই শুধু জানি।
চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কা'কে,
পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণপরে সেও নাহি থাকে।

*　　*　　*

চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা,
খোলা আর ঢাকা,
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্বপ্রবাহে
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।

*　　*　　*

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান।

যাহাই হউক, উল্লিখিত দেহদুঃখের মধ্যে, শারীরিক কষ্টের মধ্যেও কবির লেখনীর বিরাম নাই। তিনি মনে করেন তাঁহার বাণী ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, রচনা ক্লিষ্ট হইয়া আসিতেছে,

অসুস্থ শরীরখানা
কোন্ অবরুদ্ধ ভাষা
বাণীর ক্ষীণতা করিছে বহন,
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কায়া।

অন্যত্র,

অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি
অনাদি আকাশে।

অন্যত্র, "রোগশয্যায়"-গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে,

অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা।

কিন্তু তবু লিখিতে হয়, তবু শিথিল না হইবার প্রাণপণ প্রয়াস, কারণ এক মুহূর্তের তালভঙ্গে ইন্দ্রের সভায় উর্বশীর ক্ষমা নাই। মানুষও ক্ষমা করিবে না কবির ক্ষুদ্রতম ত্রুটি।

তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে;
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ-তালে।

তবে, লোকের খ্যাতির প্রতি কোনও মোহও কবির আর নাই, তাঁহার নিরাসক্ত মন আজ পার্থিব খ্যাতিতে মুগ্ধ আর নয়।

খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর
মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়;
নির্মম ভবিষ্য জানি অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে
কীর্তির সঞ্চয়ে
আজি তার হয় হোক প্রথম সূচনা।

ব্যক্তিগত দেহদুঃখের প্রসঙ্গ কবিকে নিকটতর করিয়াছে বৃহত্তর জনগণের বিচিত্র দুঃখ ও বেদনার। তাহাদের এই দুঃখ বেদনা নিজের অন্তরের মধ্যে গ্রহণ ও বহন করা আজ সহজ হইল; অসহায় নিঃসম্বলের দৈহিক ও সাংসারিক দুঃখ কষ্ট নিজের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার উর্ধ্বে মাথা তুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল,

অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,।
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার
শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত।

এই দুঃখের দায়িত্বকে কবি স্বীকার করিলেন। মানুষের উপর মানুষের অন্যায় সম্বন্ধে চেতনা সর্বমানবের চেতনায় বিস্তারিত হইতেছে; 'সুতীব্র অক্ষমা' যুগে যুগে মানুষের চিত্তে সঞ্চিত হইতেছে, একদিন প্রলয়ের দূত দেখা দিবে,

দারুণ তাড়ন এ যে পূর্ণেরি আদেশে
কি অপূর্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে—

সৃষ্টির এই অন্তহীনতায় সবল প্রাণের সুগভীর বিশ্বাস, মানুষের সেবায় ও ভালবাসায় তৃপ্তি ও বিশ্বাস, মানবচিত্তে সাধনায় যে সত্য নিহিত তাহাতে বিশ্বাস, জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি ও শান্তিতে বিশ্বাস—এই গভীর পরিব্যাপ্ত বিশ্বাসই এই দুই গ্রন্থের কবিতাগুলিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থির অকুণ্ঠিত নিঃশঙ্ক বিশ্বাসই কবির শেষ ক'টি মাসের কবি-মানসের পরিচয়। "রোগশয্যায়"-গ্রন্থের দুটি ছোট কবিতা হইতেই এই পরিচয় পাঠকের বোধ ও বুদ্ধির গোচর করা যাইতে পারে ; জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি রূপ কবির ধ্যান-তন্ময় দৃষ্টিতে কি ভাবে ধরা দিয়াছে তাহাও প্রসঙ্গত বুঝা যাইবে।

ধূসর গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা,
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ,
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তরের পানে।

অন্যত্র,

তোমাদের দেখিনা যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়
পৃথিবী পায়ের নীচে চুপি চুপি করিছে মন্ত্রণা
সরে যাবে ব'লে।
আঁকড়ি ধরিতে চাহি উৎকণ্ঠার শূন্য আকাশেরে
দুই বাহু তুলি।
চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে
দেখি তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।

উৎকণ্ঠায় পীড়িত বিক্ষুব্ধ চিত্তের পাশেই এই নতশিরে পশম বুনার ছবি ও তাহার ব্যঞ্জনাটি কি সুন্দর, কত অর্থবহ।

যে-কবি পরিপূর্ণ শক্তি, ধৈর্য, বীর্য ও বিশ্বাসে মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া সৃষ্টি, জীবন ও মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন তাঁহার পক্ষেই প্রীতি ও ভালবাসায় বলা সম্ভব হইল,

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

এই মহামন্ত্র ত বৈদিক ঋষিরাও না উচ্চারণ করিয়াছিলেন—মধুবৎ পার্থিবং রজঃ! সদ্য-রোগমুক্ত দেহে শীতের স্নিগ্ধ স্পর্শ লাগিতেছে, পৃথিবীর বিচিত্র মায়া ও মাধুর্য শান্ত নির্জন রোগীর ঘরে খোলা দুয়ার ও জানালা দিয়া বিচিত্র ছায়াছবি সৃষ্টি করিতেছে ; অর্ধ-উদাসীন কল্পনায় স্বচ্ছ সহজ হৃদয়-মুকুরে কবি সেই সব অপরূপ ছবিগুলি একটি একটি করিয়া দেখিয়া যাইতেছেন, স্মৃতির সরোবরে সঙ্গে সঙ্গে মৃদু দোলা লাগিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কবি কথার মালায় টুকরা টুকরা স্মৃতি-ছবি গাঁথিয়া তুলিতেছেন। নিরালা অবকাশের মধ্যে মানুষ ও

পৃথিবীর ঋণ স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছে, অতীতের সকরুণ স্মৃতি তাহার স্মিত মৃদু হাসি ও দীর্ঘশ্বাস শীতের মধুর হাওয়ায় ভাসাইয়া আনিতেছে, ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা ও দৃশ্য স্বপ্নময় হইয়া দেখা দিতেছে, মনের পটে আঁকা অসংখ্য ছবি আবার নূতন করিয়া চিত্তে ভাসিয়া উঠিতেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে বসিয়া পিছনের দিকে তাকাইয়া সেই সব ছবি নূতন করিয়া দেখিতে ভাল লাগিতেছে। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় একটি একটি করিয়া ছবি যখন মনের মধ্যে জমাট হইয়া উঠিতেছে তখন তাহা স্বল্প দুই চারিটি কথায়, স্নিগ্ধ মাধুর্য ও আত্মীয়তায়, বিরল রেখা ও বর্ণে তাহা গাঁথিয়া তুলিতেছেন। কত যে শান্ত, রঙিন, ব্যাপ্ত মুহূর্ত এই কবিতাগুলিতে ধরা পড়িয়াছে, কত যে গভীর ব্যঞ্জনা ছড়াইয়া আছে, তাহার হিসাব নাই। কি অপরূপ ছবিই না আঁকিয়াছেন এবং সবগুলি ছবিই একটি শান্ত সৌন্দর্যে মণ্ডিত ; বিক্ষোভ নয়, আলোড়ন নয়, শান্তি, পরমা শান্তি, স্বচ্ছ সহজ শান্ত গতিভঙ্গিই এই কবিতাগুলিকে গন্ধে রসে ভরিয়া দিয়াছে। মানুষ ও মাটি, আকাশ ও পৃথিবীর গন্ধ, বর্ণ ও রূপ যেন মনকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। সুগভীর ভাবানুভবতায় ছবিগুলি যেন আরও সুন্দর, আরও গভীর দীপ্তি লাভ করিয়াছে ; এই মধুর ভাবুকতাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার।

> নির্জন রোগীর ঘর।
> খোলা দ্বার দিয়ে
> বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।
> শীতের মধ্যাহ্ন তাপে তন্দ্রাতুর বেলা
> চলেছে মন্থরগতি
> শৈবালে দুর্বলস্রোত নদীর মতন।
> মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস
> শস্যহীন মাঠে।
>
> মনে পড়ে কতদিন
> ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা
> কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
> ছায়াতে আলোতে
> আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া
> ফেনায় ফেনায়।
>
> * * *
>
> পুকুরের ধারে ধারে সর্ষেক্ষেতে পূর্ণ হয়ে যায়
> ধরণীর প্রতিদান রৌদ্রের দানের,
> সূর্যের মন্দিরতলে পুষ্পের নৈবেদ্য থাকে পাতা।

এমনই গভীর ভাবুকতায় গন্ধ ও রূপের আকাশ যিনি গড়িয়া তুলিতে পারেন কথার মালায়, তাঁহাকেও আক্ষেপ করিয়া বলিতে হয়—

> ভাষা নাই ভাষা নাই ;
> চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
> মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।

'জীবন যাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর' সেই সব একদিন 'উপেক্ষিত ছবি' আজ 'চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে' জাগিয়া উঠিতেছে। কি অপরূপ ব্যঞ্জনাময় সেই সব ছবি!

সেই বহুদিন আগে
দু'পহর রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্য তীরে তীরে,
কচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা।

*   *   *

ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তন্বী নৌকা তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ;
দুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরণ
চাঁদের মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নির্বাক হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।

*   *   *

হেথা হোথা চরে গরু শস্যশেষ বাজরার ক্ষেতে ;
তরমুজের লতা হতে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণ বালক।
কোথাও বা একা পল্লীনারী
শাকের সন্ধানে ফেরে ঝুড়ি নিয়ে কাঁখে।
কভু বহুদূরে চলে নদীর রেখার পাশে পাশে
নতপৃষ্ঠ ক্লিষ্টগতি গুণটানা মাল্লা এক সারি।

*   *   *

ইঁদারায় টানা জল
নালা বেয়ে সারাদিন কুলু কুলু চলে
ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ।
ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম
পিতল-কাঁকন-পরা হাতে।

জীবনের এই সব ছবি, প্রাণের এই সব বিচিত্র লীলা ও রহস্য যাহা নয়ন ভরিয়া চিত্ত ডুবাইয়া কবি এতকাল দেখিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন আজ তাহাদেরই কথা মনে করিয়া চিত্ত গভীর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছে। প্রত্যেকটি কবিতায় এই গভীর কৃতজ্ঞতার সুর সুস্পষ্ট। কোনও কিছুর জন্যই জীবনে আর কোনও ক্ষোভ নাই ; বৃহৎ শান্তি, অপরিমেয় শক্তি ও সৌন্দর্যের কোলে যেন বসিয়া আছেন এই ধ্যানরত শুভ্র বৃদ্ধ কবি। শুধু এই সব তুচ্ছ ক্ষুদ্র উপেক্ষিত ছবিই ত নয়, প্রবহমান ইতিহাসের বিরাট দৃশ্যমালাও একে একে প্রসারিত হইতেছে চোখের ও চিত্তের সম্মুখে ; অতীত ইতিহাস ও সাম্প্রতিক দৃশ্যাবলীর গভীর চেতনায় কবি তাহাদের মধ্যে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি পাঠ করিতেছেন। পাঠান মোগল সকলের জয়স্তম্ভ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আজ তার কোনও চিহ্ন নাই। তাহার পর আসিয়াছে ইংরাজের পণ্যবাহী সৈন্য—'লৌহ বাঁধা পথে, অনল-নিঃশ্বাসী রথে' (ইতিহাস-চেতনার কি ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ এই দুটি লাইনে)—তাহাদের চিহ্নও একদিন থাকিবে না ; কিন্তু কল কল রবে নানা পথে নানা দলে দলে যে বিপুল জনতা যুগ যুগান্তর হইতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনের দিনযাত্রা মুখর করিয়া তুলিতেছে, যাহারা ইতিহাসে প্রাণধারা সঞ্চারিত করিতেছে প্রতিদিনের তুচ্ছ কাজে, তাহারা কাজ করিয়াই যাইবে, জীবনের নিত্য প্রয়োজনের দাবি মিটাইয়াই যাইবে। সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে, কিন্তু সেই সাধারণ মানুষ ও বিপুল জনতার কর্মচক্র,

অবিশ্রান্ত ঘূর্ণমান এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের রথচক্র, মানব যাত্রার চিরন্তন প্রবাহ। কবির দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। শক্তির অহংকার, প্রতাপের দম্ভ, শাসনের রক্তচক্ষু একদিন নত হয়, তাহার চিহ্নও থাকে না, কিন্তু থাকে ফুল, থাকে প্রেম, থাকে গান, থাকে সূর্যের আলো, থাকে শরতের প্রভাত, হেমন্তের গোধূলি, যে-কথা বলিয়া বলিয়া কবি কখনও শেষ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ কবি সে-কথা বলিতেছেন না, আজ বলিতেছেন, থাকে শুধু বিপুল জনতা ; তাহারাই জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি মন্ত্রিত করিয়া তোলে।

> মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে
> দেখি সেথা কলকলরবে
> বিপুল জনতা চলে
> নানা পথে নানা দলে দলে
> যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
> জীবনে মরণে।
> ওরা চিরকাল
> টানে দাঁড়, ধ'রে থাকে হাল ;
> ওরা মাঠে মাঠে
> বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
> ওরা কাজ করে
> নগরে প্রান্তরে।
> রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
> জয়স্তম্ভ মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে,
> রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্তআঁখি
> শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
> ওরা কাজ করে
> দেশে দেশান্তরে,
> অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে,
> পঞ্জাবে বম্বাই গুজরাটে
> গুরু গুরু গর্জন গুণ গুণ স্বর
> দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
> দুঃখ সুখ দিবস রজনী
> মন্ত্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
> শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ন শেষ 'পরে
> ওরা কাজ করে।

কি গভীর আবেগ ও ঐতিহ্য-চেতনায় সমৃদ্ধ এই অপূর্ব কৃষক-শ্রমিক প্রশস্তিটি!

কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের শেষ অধ্যায়ে সমসাময়িক মানুষ কাব্যের প্রসঙ্গ হিসাবে কবির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইতিহাসগত চরিত্র হিসাবে এবং নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত মানুষের পরিচয় আমরা রবীন্দ্রকাব্যে বারবার পাইয়াছি ইতিপূর্বেই। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে সমসাময়িক মানুষের, বিশেষ ভাবে সাধারণ মানুষের যে-পরিচয় সে-পরিচয় পরিণত বয়সে আমরা সর্বপ্রথম কতকটা পাইলাম "পলাতকা"র এবং "লিপিকা"র দু'একটি কথিকায়। কিন্তু সে-পরিচয় তখনও সমসাময়িক চেতনায় গভীর নয়, এবং মানুষ হিসাবে সমসাময়িক বস্তুঘনিষ্ঠ মানুষের সম্পূর্ণ মূল্য তখনও কবির চেতনায় ধরা পড়ে নাই। তাহার প্রথম

সূত্রপাত দেখা গেল "পুনশ্চ"-গ্রন্থ হইতে; 'গদ্য'-কবিতার আঙ্গিক প্রবর্তনের মধ্যেই সে-আদর্শ ও উদ্দেশ্য যে নিহিত ছিল, তাহা ত আগেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ঐ সময় হইতেই সমসাময়িক মানুষ ও তাহার দৈনন্দিন জীবন তাহাদের নিরাভরণ বাস্তবরূপে কবির চেতনার মধ্যে ধরা পড়িল। তাঁহার কবিতায় ভিড় করিয়া আসিতে আরম্ভ করিল ছেঁড়া ছাতা মাথায় গ্রামের পাঠশালার বৃদ্ধ গুরুমশায়, দুরন্ত বালক, পূজার বলির পাঁঠা, গ্রাম ও শহরের সাধারণ মেয়ে, কলেজে পড়া মেয়ের ব্যর্থ প্রেমের গল্প, কাঁকনপরা হাতে ভজিয়ার যাঁতায় গমভাঙা, বস্তির উলঙ্গ নোংরা ছবি, কুকুর, চড়ুইপাখি, শাকের চুপড়ি কাঁখে গরিব মেয়ে, সাঁওতাল বালক, অস্পৃশ্য মেয়ে, কবির জাত খোয়ানো প্রিয়া, উড়ে বেহারা, খোট্টা দারোয়ান, ইস্কুল কলেজের ছাত্র, এবং আরও কত কি। সমসাময়িক জীবনের শোভাযাত্রা যেন চলিয়াছে এই শেষ অধ্যায়ের কাব্যগুলিতে।

"আরোগ্য"র শেষ কয়েকটি কবিতা "রোগশয্যায়"-গ্রন্থের কবিতাগুলির সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। এগুলি ঠিক উদ্ধৃত কবিতাগুলির মতন শান্ত ছবির মালা নয়; সত্যের অমৃতরূপে এই কবিতাগুলি উদ্ভাসিত, জীবন-রহস্যের গভীর ইঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ, গভীর ধ্যানে তন্ময়, গভীর গম্ভীর আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত।

আরোগ্যের প্রথম কবিতাটিতে কবি যেখানে বৈদিক ঋষির মন্ত্রে আপন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, সেইখানে বলিয়াছেন,

> শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
> ব'লে যাব তোমার ধূলির
> তিলক পরেছি ভালে,
>
> *　　*　　*
>
> সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
> এই জেনে এ-ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

এবং ইহার পরের কবিতাটিতে,

> পাখিদের অকারণ গান
> সাধুবাদ দিতে থাকে জীবনলক্ষ্মীরে!
> সব কিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
> অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
> মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি
> সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

এই মাটির মানুষের প্রীতির দান, আত্মীয়তা ও ভালবাসার অভিষেক চিহ্ন হইতেছে মাটির তিলক, সেই তিলক কপালে পরিয়াছেন কবি। এই ত চরম ও পরম পুরস্কার—তাহার আনন্দময় কৃতজ্ঞতাময় হৃদয়াবেগ বাক্‌ভঙ্গির মধ্যে অন্তর্লীন, দুটি একটি মাত্র কথার মধ্যে ব্যক্ত। মর্ত্য মানুষের প্রীতির স্পর্শই ত অমৃতত্বের অর্থ বহন করে, ধরণীর ধূলিকে মধুময় করে।

এই মাটির ধরণী ও মাটির মানুষ, ইহাদের ঘিরিয়াই জীবনের ক্ষীয়মাণ বাকি ক'টি দিন কাটিয়াছে। শেষের দিন যত ঘনাইয়া আসিতেছে তত তিনি ইহাদের নিবিড় করিয়া আঁকড়িয়া ধরিতেছেন, অর্ধ-উদাসীন ভালবাসায়। ইহাদের প্রতি প্রীতিময় অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতায় অন্তরের একদিক পরিপূর্ণ; তার একদিকে এক মহান জ্যোতির্ময় আদিত্যবর্ণ পুরুষে বিশ্বাস

এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বিচিত্র প্রত্যয়ভাবনার রহস্য। এই দু'য়েরই পরিচয় মিলিবে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "জন্মদিনে" এবং "শেষলেখা"য়।

"জন্মদিনে" প্রকাশিত হয় ১৩৪৮'র ১লা বৈশাখ, এবং "শেষলেখা" মৃত্যুর পর ১৩৪৮'র ভাদ্রে। জন্মদিনের কবিতাগুলি বেশির ভাগ ১৯৪১'র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে, দু'একটি ১৯৩৯এ এবং কয়েকটি ১৯৪০'র সেপ্টেম্বরের পর লেখা। "শেষ লেখা"র 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি শান্তিনিকেতনে "ডাকঘর" অভিনয়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। 'ঐ মহামানব আসে' গানটি আশ্রমে ১৩৪৮'র নববর্ষ উৎসবের জন্য লিখিত, এবং ইহাই কবির রচিত শেষ সংগীত। 'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে' এবং 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করে' এই দুইটি কবিতা কবি মুখে রচনা করিয়াছিলেন, লেখনীধারণের ক্ষমতা তখন আর ছিল না, কিন্তু প্রথমটি পরে সংশোধন করিবার সুযোগ তাহার ঘটিয়াছিল, তাহাও মুখে মুখেই, দ্বিতীয়টি মৃত্যুর তিনদিন আগে রচিত বলিয়া সে সুযোগ কবি পান নাই।

জন্ম-মৃত্যুর মিলন-মোহনায় দাঁড়াইয়া কবি যে-কাব্য রচনা করিলেন, তাহার নাম দিলেন "জন্মদিনে", অথচ, ইহার প্রত্যেকটি কবিতার আকাশ মৃত্যুর গম্ভীর সুন্দর প্রসন্ন মেঘে ছাওয়া, তাহাদের স্তবকে স্তবকে মৃত্যুর স্থির পদধ্বনি। মৃত্যুর সেই মহা-আবির্ভাব তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন।

> সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ত্যনিকেতন,
> আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
> ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
> কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ
> সে রহস্যসূত্রে এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
> চ'লে যাব কয় বর্ষ পরে।

তখন কি কবি জানিতেন, কয় বর্ষ নয়, কয়েকটি মাস পরই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে! নিজের জীবনের অবসানের কল্পনাটি কি সুন্দর! মৃত্যুর বিকৃতি মৃত্যুমুহূর্তেও তাঁহাকে স্পর্শ না করুক, অসুন্দর সেই মুহূর্তেও জীবনকে আঘাত না করুক।

> জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
> দেখি যেন সে মিলনে
> পূর্বাচল অস্তাচলে
> অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি বিনিময়
> সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত অবসান।

কিন্তু জীবন যাহাকে বঞ্চনা করে নাই এবং জীবনকেও যিনি বঞ্চনা করেন নাই,

> আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
> আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।

এই ছিল যাঁহার আজীবন সাধনা তিনি ত আজ মৃত্যুকে শূন্য হাতে বরণ করিতে পারেন না। যাঁহারা এতকাল তাঁহাকে নিত্য নূতন সাজে সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছেন তাঁহাদের তিনি স্মরণ করিয়াছেন, বলিয়াছেন,

> আমি কিছু দিতে চাই, তা না হলে জীবনে জীবনে
> মিল হবে কী করিয়া, আসি না নিশ্চিত পদক্ষেপে,

ভয় হয় রিক্ত পাত্র বুঝি, বুঝি তার রসস্বাদ
হারায়েছে পূর্বপরিচয়, বুঝি আদানে প্রদানে
রবেনা সম্মান, তাই আশঙ্কার এ দূরত্ব হতে
এ নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা মাঝে তোমাদের ডেকে বলি,—
যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা,
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়ত শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভশঙ্খধ্বনি ॥

ভাব গম্ভীর নিখিল বিশ্বের মর্মস্থলে যে গভীর রহস্য নিরন্তর অবস্থিত হইতেছে তাহারই অর্থানুভূতিতে "জন্মদিনে"র অধিকাংশ কবিতা সমৃদ্ধ। কোনও জন্মদিনে "দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে, অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম", কোনও জন্মদিনে মনে হইল, "সম্পূর্ণ যে-আমি রয়েছে গোপনে অগোচর শুধু করি অনুভব চারদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে", কখনও মনে হইতেছে, পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে রহস্য যবনিকা তুলিবার কাজে কবির ডাক ছিল, সেই কাজে মনে হইয়াছে "সাবিত্রী পৃথিবী, এই আত্মার এ মর্ত্যনিকেতন, কি গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্য প্রদক্ষিণ"। সৃষ্টিলীলা, জন্মমৃত্যুর বিচিত্র রহস্য, পুরাতন আবর্জনার ধ্বংস ও নূতন সৃষ্টির আহ্বান, মৃত্যুর অতীত আত্মার চিরন্তন মহিমা ইত্যাদিই কখনও গভীর গম্ভীর সুরে, কখনও লঘু লাস্যে কবিতাগুলিতে রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কোথাও কোথাও বক্তব্য অনুভূতির সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছে, এবং কাব্যময় প্রকাশে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি কবিতায় কবি মানসের কাব্যময় প্রকাশ বক্তব্যকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। 'সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে', 'পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান', 'বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায়', 'নদীর পালিত এই জীবন আমার', 'তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মানুষ', প্রভৃতি কবিতা শুধুই যে ভাব ও রসগভীর তাহাই নয়, পূর্বোক্ত রহস্যে ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ।

কিন্তু এই সৃষ্টিলীলা, জন্মমৃত্যুর এই রহস্য, ইহার গভীরে যখন চিত্ত মগ্ন তখনও সমসাময়িক মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্য, পৃথিবীজোড়া অত্যাচার অবিচার, রক্তোন্মত্ত ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে কবি সচেতন।

মহা ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,

* * *

একপাখা শীর্ণ যে পাখির
ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে না স্থির,—
সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন
আসিবে বিধির কাছে হিসাব চুকিয়ে-দেওয়া দিন।

সেই হিসাব-চুকাইয়া-দিবার-দিন আসে প্রলয়ের রূপ ধরিয়া, এবং সেই প্রলয়-পয়োধির মধ্য হইতেই জন্মলাভ করে নূতন সৃষ্টি, নূতন পৃথিবী।

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজ সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

কামানের ঘোষণার মধ্যে নবসৃষ্টির আহ্বানের কল্পনা সাম্প্রতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

মানব-তপস্বীর যে ইঙ্গিত পূর্বোক্ত কবিতাটিতে সে-ইঙ্গিত স্পষ্টতর হইয়াছে শেষ অধ্যায়ের অনেকগুলি কবিতায়। কবি বিশ্বাস করেন, নবযুগের নূতন সৃষ্টিকে আবাহন করিয়া আনিবেন এই সব মানব তপস্বীরা, মহামানবেরা। একদিকে এই অনির্বাণ মানব-মহিমা, আর একদিকে জড়প্রকৃতি এই দু'য়ের উপরই কবির শেষ নির্ভর। এই মানব মহিমার বন্দনা গাহিতে গিয়া কবি বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিয়াছেন, বলিয়াছেন,

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হযে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে॥ ("শেষলেখা")

এই মহামানব কোনও ব্যক্তি বিশেষ নয়, মানব-মহিমারই দেশকালধৃত একটি বিশিষ্টরূপ। মৃত্যুকে, মৃত্যুভয়কে যাঁহারা জয় করিয়াছেন তাহাদের মধ্যেই সেই মানব-মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। পৃথিবীর মানুষকে ডাক দিয়া তিনি বলিয়াছেন, সেইসব মৃত্যুঞ্জয় মহাপ্রাণদের পরিচয় লইতে।

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়

* * *

তাদেরে সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়॥

এই সব মৃত্যুঞ্জয় মহাপ্রাণদের উদ্দেশ্যেই কবি তাঁহার শেষ প্রণাম রাখিয়া গিয়াছেন।

বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে।

* * *

মন বলে, আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো ॥

১৭ নম্বর কবিতায়ও তাঁহাদের কথাই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আজি এই প্রভাত আলোকে, তাঁহাদের করি নমস্কার।"

জীবনের অসম্পূর্ণতার যে-বেদনার কথা আগে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি "জন্মদিনে"র একটি কবিতায় সেই বেদনা এক অপূর্ব অনুভূতির সুগভীর আন্তরিকতায়, মধুর প্রীতিময় সরলতায়, সহজ বিনয়ে ও সততায়, এবং অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এই বিশিষ্টভাবানুভূতিটির পরিচয় ইহার চেয়ে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় বুঝি আর কিছুতেই হইতে পারিত না। কাব্য হিসাবে যে কবিতাটি সমৃদ্ধ শুধু তাহাই নয়, কবি-মানসের একটি বিশেষ অনুভূতির বলিষ্ঠ পরিচয় হিসাবেও কবিতাটি স্মরণীয়। অন্যত্রও এই কবিতাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছি; এখানেও আরও বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি কত নদী গিরি সিন্ধু মরু
কত না অজানা জীব কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।

* * *

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহু তব ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।

* * *

সবচেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

* * *

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

* *

এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

* * *

মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাদের বাণী যেন শুনি।

* * *

আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

এমনই রসোত্তীর্ণ আর একটি কবিতা

* *

করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।

* * *

তবু জানি অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
বাক্যে তার বাক্যের অতীত।
সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, "শেষলেখা" কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত। ইহার বিজ্ঞপ্তিতে কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

"এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই।

"শেষলেখা"র অধিকাংশ কবিতা গত সাত আট মাসের মধ্যে রচিত। ইহার মধ্যে কয়েকটি তাঁহার স্বহস্তলিখিত, অনেকগুলি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত, নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা সেগুলি লিখিয়া লইতেন, পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অনুমতি দিতেন।"

রোগশয্যা-বিলগ্ন অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুঞ্জয় কবি। মৃত্যু তাঁহার জীবনে যে

পূর্ণতা আনিয়াছে কবি তাহা ইতিমধ্যেই জানিয়াছেন, জীবনকে যেমন মৃত্যুকেও তিনি তেমনই পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিয়াছেন। মৃত্যুর অভিজ্ঞতাই জীবনকে সম্পূর্ণতা দান করিল। এই হিসাবে তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন, এই মৃত্যু অভিজ্ঞতা পূর্ণ প্রাণের পরিচয় এই গ্রন্থেও সুস্পষ্ট। মৃত্যুর চেয়েও তাঁহার কবিপুরুষ বড়, একথা তিনি আগেই জানিয়াছিলেন। আজ তিনি 'বিচিত্র ছলনা জালে আকীর্ণ সৃষ্টির পথ', 'দুঃখের আঁধার রাত্রি', 'আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা' সব কিছু উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া রক্তের অক্ষরে আঁকা আপনার রূপ দেখিয়া লইয়াছেন, অন্তরে 'মহা অজানার নির্ভয় পরিচয়' লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পরম আমিকে জানিয়া শান্তির অক্ষয় লাভ করিয়াছেন। মুক্ত স্বচ্ছ দিব্য জ্যোতির্ময় আজ তাঁহার অন্তরের কবিপুরুষের রূপ, বিরলভাষ বিরলালংকার স্বচ্ছ ঋজু বাণীমূর্তিতে সেই জ্যোতির্দীপ্ত পুরুষের প্রকাশ। এই পুরুষের অলংকারের কোন প্রয়োজন? কাজেই তাহা নাই, উপমা নাই, বর্ণনা নাই, ঝংকার নাই, সজ্জা বিন্যাস কিছুই নাই। শুধু দু'একটি কথা, যে কথা ক'টি না বলিলে নয়—স্পষ্ট, সরল, সংহত, কঠিন কয়েকটি কথা, যেন মন্ত্র, যেন চরমতম অভিজ্ঞতার পরমতম বাণী। কাব্য জিজ্ঞাসার কোনও নিকষেই এই বাণীরূপের বিচার করা চলে না। উপনিষদের ঋষি কবি যখন বলেন,

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

তখন আমরা কেউ তাহার কাব্যবিচার করিতে পারি না। আমরা তখন শুধু সেই ঋষি কবিদের প্রাণের অনুভবের গন্ধটুকু, দীপ্তিটুকু অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া। "শেষলেখা"র কবিতাগুলি সম্বন্ধে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় আত্মার ইহাই বোধ হয় যথার্থ বাণীদেহ, বাসনা, কামনা, বিচিত্র রূপের ইহাই বোধ হয় রূপাতীত অপরূপ প্রকাশ। প্রত্যয়োপলব্ধ চরম বাণীরূপ, সত্য মানবের শেষ বাণীরূপ। পূর্ণ জ্ঞান ও দর্শনের, চরম বৈরাগ্য ও আনন্দের, পরম শান্তি ও বিশ্বাসের এমন রসঘন সরল, কঠিন স্বচ্ছ আত্মিক বাণীরূপ বর্তমান কালে আর কোথায়ও বা আমরা দেখিয়াছি!

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি,
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর॥

অথবা,

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ-জগৎ
স্বপ্ন নয়।

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ-জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।

আমরা যাহাকে 'কবিতা' বলিয়া জানি ইহাই কি সেই কবিতা, না দ্রষ্টা ঋষির বিস্মিত মন্ত্র। ইহার বক্তব্য এত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ, ইহার অঙ্গরচনা কি কোনও আঙ্গিক-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে?

দু'টি প্রত্যয়কে কবি পাইয়াছেন সমস্ত জীবনের দুঃখের তপস্যায়। একটি,

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
কোন্ অলক্ষিত পথ দিয়ে,
সন্ধান মেলে না তার।

* * *

স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেক ধারা,
সে-জীবন বাণী দিল দিবসরাত্রিরে,
রচিল অরণ্যফুলে অদৃশ্যের পূজা-আয়োজন,

* * *

প্রিয়ারে বেসেছি ভালো
বেসেছি ফুলের মঞ্জরীকে,

* * *

দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে।

এ সত্যও কবি জানিয়াছেন যে, এ-জগৎ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মিথ্যা নয়, মৃত্যু-রাহুর ক্ষমতা নাই জীবনের স্বর্গীয় অমৃতকে গ্রাস করিবার। এই সত্যটিকে স্থির-নিশ্চয় করিয়া দেখিয়াছেন, জানিয়াছেন বলিয়াই এখনও পার্থিব গানের দান তিনি হাত পাতিয়া গ্রহণ করেন, প্রিয়হীন ঘরে শূন্য চৌকির করুণ কাতর ভাষা অন্তর শূন্যতার বেদনায় ভরিয়া তোলে, বিদেশী প্রিয়ার, রচিত আসন—'অতীতের পালানো স্বপন'—অস্ফুট গুঞ্জনের নীড় রচনা করে, বৃষ্টিধৌত শ্রাবণের নির্মল আকাশ আজও সার্থক বলিয়া মনে হয়, এবং বন্ধুজনের হাতের স্পর্শ, সত্যের অন্তিম প্রীতিরস জীবনের চরম প্রসাদ বলিয়া মনে করেন।

আর একটি সত্য যাহা তিনি পাইয়াছেন, সেটি

মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে
এ-বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি।

এবং তাহারই আনুষঙ্গিক

দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে॥

যতবার এই ভয়ের সুযোগকে কবি বিশ্বাস করিয়াছেন, ততবারই জীবনে তাঁহার অনর্থ পরাজয় ঘটিয়াছে; এই সব ভয় আর বিভীষিকা ইহারাই অন্ধকারে বিকীর্ণ মৃত্যুর নিপুণ শিল্পকার্য। সৃষ্টির পথ বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ, জীবনে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ নিপুণ হস্তে বিছানো; যে অনায়াসে এই ছলনা সহ্য করিতে পারে, মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ এড়াইতে পারে, সেই শুধু পায় অক্ষয় শান্তির অধিকার, পায় সত্যকে 'আপন আলোক ধৌত অন্তরে অন্তরে।'

একদিন, এবং কিছুদিন আগেই কবি নিজের আজীবন বাণী-সাধনাকে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস করিয়াছেন; আজ বলিতেছেন,

বাণীর মূরতি গড়ি
একমনে
নির্জন প্রাঙ্গণে
পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার
যায় ছড়াছড়ি
অসমাপ্ত মূক
শূন্যে চেয়ে থাকে
নিরুৎসুক।

*   *

বিস্মৃত স্বর্গের কোন্
উর্বশীর ছবি
ধরণীর চিত্তপটে
বাঁধিতে চাহিয়াছিল
কবি
তোমারে বাহন রূপে
ডেকেছিল
চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল
কখন সে অন্যমনে গেছে ভুলি
আদিম আত্মীয় তব ধুলি,
অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্-বিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।
এই ভালো,
বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে
আজ পঙ্গু আবর্জনা
নিয়ত গঞ্জনা

কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
বাধা দিতে জানে,
পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে ॥

অবিরাম অপ্রতিহত বাণী-বন্যায়, সমৃদ্ধ বাণী বিন্যাসে যাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কাটিয়াছে আজ এ কি ঔদাসীন্য, এ কি পরম বৈরাগ্য সেই সুদীর্ঘ জীবনের সাধনাকেই দিতে চাহিল ধরণীর ধূসর ধূলায় মিশাইয়া, তুলিয়া দিতে চাহিল বাণীহীন রথে। যে বাণীর মূর্তি তিনি গড়িয়াছেন চিরকাল ধরিয়া, সেই মূর্তি আজ নিরুৎসুক দৃষ্টিতে শূন্যের দিকে তাকাইয়া। এ কি পরিণাম! অথচ, অস্বীকার করিবার উপায় নাই, রবীন্দ্র কবি পুরুষের ইহাই সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি। এই গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধেই একথা বলিয়াছিলাম, রবীন্দ্র কবিপুরুষের মর্মবাণী বৈরাগ্যের বাণী, তাহার সুর বিবাগী চিত্তের সুর। এই বিবাগী, বৈরাগী চিত্তই শেষ পর্যন্ত নিজের আজীবন সাধনাকেও কোনও পার্থিব কোনও মোহ বন্ধনে বাঁধিল না, দিল ধরণীর গৈরিক ধূলায় অসীম বৈরাগ্যের দিক্‌বিহীন পথে উড়াইয়া, বলিল, বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানের ধূলিতে মিশিয়া যাওয়া, ইহাই পরম পরিণতি। ইহাই না ভারতীয় চিত্তের সংস্কার, dust unto dust!

অথচ, মধুময় এই পৃথিবী, মধুময় এই পৃথিবীর ধূলির গড়া মানুষ। ইহাদের সকলকে আশীর্বাদ না করিয়া, ইহাদের সকলের আশীর্বাদ না লইলে কি আজ শান্তির অক্ষয় অধিকার পাওয়া যাইবে মৃত্যুর সঙ্গে মহামিলন কি সার্থক হইবে। তাই, আজ

আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের পরম প্রসাদ
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
শূন্য ঝুলি আজিকে আমার,—
দিয়েছি উজাড় করি
যাহা কিছু আছিল দিবার,
প্রতিদানে যদি কিছু পাই
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

নাটক ও নাটিকা

এক

বাংলা সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠকেরা সকলেই একথা জানেন যে, আমাদের সাহিত্যে সার্থক নাটক-রচনা বহুদিন হয় নাই। দীনবন্ধু-মাইকেল-গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল, ইঁহারা সকলেই নাটক রচনা করিয়াছেন, নাট্যমঞ্চে সেই সব নাটক বহুবার অভিনীত হইয়া বহুজনের চিত্ত নন্দিতও করিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে বস্তুধর্ম, বস্তুজীবনের যে অমোঘ প্রবাহ ঘটনাকে এবং ঘটনাগত চরিত্রগুলিকে রূপ হইতে রূপান্তরে ঠেলিয়া লইয়া যায় দুর্নিবার পরিণতির দিকে, যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষ নাটকের প্রাণ বাংলা নাটকে তাহার পরিচয় খুব বেশি নাই। দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী"-জাতীয় রচনায় তাহার কিছু পরিচয় আছে, এবং যতটুকু আছে ততটুকুই নাটক রচনা হিসাবে সার্থক। কিন্তু নাটকত্ব ছাড়াও, অর্থাৎ দৃশ্য-কাব্যের যে যে লক্ষণ আমরা নাটকের উপর সাধারণত আরোপ করিয়া থাকি তাহা ছাড়াও নাট্য-রচনার অন্য সাহিত্য-মূল্য আছে, একথা আজিকার দিনে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরেজী সাহিত্যে সেক্সপীরীয় নাটকের ধারা নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়া আজিকার নাটকে আসিয়া পৌঁছান সত্ত্বেও সেখানে আধুনিক নাটকের রূপ ও ভঙ্গিমা বদলাইয়া গিয়াছে; য়ুরোপের অন্যান্য সাহিত্যেও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা তাহাকে নাটকই বলি। গ্রীক্ ট্র্যাজেডি অথবা এলিজাবেথীয় নাটকের লক্ষণ আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকে নাই, অতি আধুনিক এলিয়টীয় নাটকে ছাড়া, কিন্তু তাহাতে তাহার যে বিশিষ্ট সাহিত্যমূল্য তাহার কিছু আসিয়া যায় না, নাটক বলিতেও আপত্তি হইবার কিছু নাই। নাটকের সংজ্ঞাই সবদেশে সর্বকালে এক ছিল না, আজও নাই।

আমাদের দেশে দৃশ্যকাব্যের যে-লক্ষণ আমরা নাটকের উপর আরোপ করি তাহা আমরা বর্তমানকালে শিখিয়াছি সংস্কৃত নাটকের রূপ, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বেশি ইংরেজী এলিজাবেথীয় এবং পরবর্তী নাট্য-সাহিত্যের রূপ ও ভঙ্গিমা হইতে। কিন্তু সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের ধারার সঙ্গে বহুকাল আগেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। গ্রাম্য টপ্পা অথবা তরজায়, কবিগানে অথবা যাত্রাগানে এক ধরনের নাটকীয় রসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে বর্তমান বাংলা নাটকের যোগ কিছু নাই বলিলেই চলে। দীনবন্ধু-গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে দৃশ্যকাব্য-লক্ষণকে আমরা নাট্যলক্ষণ বলি তাহা প্রধানত ইংরেজী নাটক হইতেই আহৃত, ঠিক যেমন বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চ য়ুরোপীয় আদর্শের অনুকরণেই রচিত। একথা স্বীকার করার মধ্যে কোনও লজ্জা নাই।

কিন্তু, কি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, কি এলিজাবেথীয় ইংরেজী নাটক, বস্তুধর্মই ইহাদের প্রাণ, ঘটনার অমোঘ অনিবার্য প্রবাহই ইহাদিগকে ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথের যে-জাতীয় রচনাগুলিকে আমরা গীতিনাট্য, কাব্য-নাট্য অথবা নাটক ইত্যাদি বলি তাহাদের মধ্যে এই বস্তুধর্ম নাই, ঘটনার অমোঘ অনিবার্য প্রবাহ তাহাদের রূপ ও ভঙ্গিমা নিয়ন্ত্রিত করে না দৃশ্যকাব্যের লক্ষণ দ্বারা রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনাগুলি বিচার্য নহে, যেমন এলিজাবেথীয়

নাট্য-লক্ষণ দ্বারা আধুনিক য়ুরোপীয় নাটকও বিচার্য নয়। আসল কথা হইতেছে, সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনেই নাটকের প্রাচীন লক্ষণ, প্রাচীন সংজ্ঞা বদলাইয়া গিয়াছে, প্রাচীন রূপ এবং ভঙ্গিমাও বিবর্তিত হইয়া অন্য রূপ ও ভঙ্গিমা ধারণ করিয়াছে। নাট্যমঞ্চও সেই নূতন আদর্শের রূপ দিতেছে। এই দিক হইতেই রবীন্দ্রনাটক বিচার্য। তাহা ছাড়া সাহিত্য-মূল্যের দিক হইতেও ইহাদের একটা বিশেষ স্থান আছে। কিন্তু যেহেতু আমার উদ্দেশ্য রবীন্দ্র-মানসের পরিচয়, যে-মানস তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে সেই মানসের বিবর্তন আবর্তনের ইতিহাস, সেই হেতু নাট্য-লক্ষণের বিচার আমার কাছে মুখ্য নয়, সাহিত্য-বিচার এবং সেই সাহিত্যের মধ্যে রবীন্দ্র-মানস কতখানি কি উপায়ে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে তাহার আলোচনাই প্রধান।

রবীন্দ্র-নাট্যের বিভিন্ন পর্ব একটির পর একটি কালানুক্রমিক সাজাইয়া লওয়া চলে। প্রথম পর্বের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার একটা বিবর্তনের ধারাও লক্ষ্য করা যায়। এই বিবর্তন ধারার সঙ্গে রবীন্দ্র-মানসের অন্যান্য প্রকাশের সম্বন্ধ খুব নিবিড়; সেই জন্য রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্য পাঠের অথবা আলোচনার-সময় সমসাময়িক রবীন্দ্র-সাহিত্যের কাব্য, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতি রচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে রবীন্দ্র-মানস বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

রবীন্দ্র-মানস একান্তভাবে গীতধর্মী। এই গীতধর্মী মানস যে কাব্যেই শুধু আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা নয়, ছোট্ট গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, সর্বত্রই ইহার প্রকাশ দেখা যায়, নাটকেও তাহাই। একথা এই গ্রন্থেই বারবার বলিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস, একথা স্বীকার করিয়া না লইলে রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের পরিপূর্ণ সাহিত্যরস উপলব্ধি ও উপভোগ করা যায় না।

দুই

বাল্মীকি-প্রতিভা (১২৮৭)*
কাল-মৃগয়া (১২৮৯ ?)†
প্রকৃতির প্রতিশোধ (১২৯১)
মায়ার খেলা (১২৯৫)

"বাল্মীকি-প্রতিভা" রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতি-নাট্য। ১৩০৩ সালে কবির কাব্যগ্রন্থের যে-সংস্করণ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, 'গ্রন্থাবলীর অসম্পূর্ণতা দোষ নিবারণের জন্য' এই গীতি-নাট্যখানিকে উহার মধ্যে 'স্থান দেওয়া' হইয়াছিল। এসম্বন্ধে কবির মনে একটা সংকোচ ছিল, কারণ তিনি তখনই মনে করিতেন, "এই গীতি-নাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুরে লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য।" বহু বৎসর পরে লেখা

* "বাল্মীকি-প্রতিভাকে আমরা যে রূপে বর্তমানে পাই, প্রথমে তাহা সেরূপ ছিল না। বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া (কবি) এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য পরে লিখিয়াছিলেন। তাহার নাম কাল-মৃগয়া—দশরথ কর্তৃক অন্ধ-মুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। পরে এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কাল-মৃগয়া গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

† "নাট্যাভিনয় উপলক্ষে ইহা (বাল্মীকি-প্রতিভা) ছাপা হইয়াছিল * * *। তখন ইহাতে কাল-মৃগয়ার গান ছিল না। পরে কাল-মৃগয়া আর ছাপানো হয় নাই।...কাল-মৃগয়া অভিনীত হইয়াছিল বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয়ের প্রায় দুই বৎসর পরে, ১২৮৯, ৯ই পৌষ।"—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী", ১ম খণ্ড, ১০৫ পৃঃ।

'জীবন-স্মৃতি"তেও এই সংকোচের উল্লেখ আছে। গানের সংগ্রহ-পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণে "বাল্মীকি-প্রতিভা" বারবার প্রকাশিত হইয়াছে; বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ও সরস্বতীর ভূমিকায় প্রতিভা দেবীর ‡ প্রথম অভিনয়ের বহু পরেও আজ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে এবং বাংলাদেশের অনেক পরিবারে ও প্রতিষ্ঠানে বহুবার এই গীতিনাট্যখানি অভিনীত হইয়াছে। ইহার বন্ধনবিহীন ছন্দের মধ্যে, ইহার গানগুলির টোড়ি, সিন্ধু, রামপ্রসাদী রাগিণী ও সুর বুনানির মধ্যে এমন একটা সহজ সবল উচ্ছ্বাস আছে যাহা মানুষের মনকে আনন্দে উল্লসিত না করিয়া পারে না। আর, সত্য বলিতে কি, কবির প্রথম যৌবনে গীতি-নাট্যগুলির মধ্যে এই গানের আনন্দই বিশেষভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। হইবার কারণও আছে। কবির তখন 'অল্প বয়স' (১৮-২০),

"গান গাহিতে···কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না, তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরল বিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শতকর-বর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রং ছড়াইয়া দিতেছে।"

সংগীতের এই প্রাচুর্যের মধ্যে, "বাল্মীকি প্রতিভা", "কাল মৃগয়া" "প্রকৃতির প্রতিশোধ", এবং "মায়ার খেলা"র সৃষ্টি। প্রথম য়ুরোপ প্রবাসকালে কবি আইরিশ মেলডীজের সুরের প্রতি খুব অনুরক্ত হইয়াছিলেন। বিলাতে তাহার অনেকগুলি গান তিনি শুনিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিখিবার ইচ্ছা আর থাকে নাই। ইহার ফলে তাহার সুর-সাধনার একটু পরিবর্তন না হইয়া পারে নাই। প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই

"এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দেশী, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকী মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে, উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো হইয়াছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতি-নাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। * * * বস্তুত 'বাল্মীকি-প্রতিভা' পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে। উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা— অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোন স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। * * * ইহা সুরে নাটিকা, অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই * * *। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে, তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমান সংগত রীতিমত সংগীত নহে।" ('জীবন স্মৃতি", ১১৫-৫৩ পৃঃ)

"বাল্মীকি-প্রতিভা" যে কি বস্তু তাহা কবির ভাষাতেই ব্যক্ত করিলাম। এই গীতি নাট্যটির বিষয়বস্তু অথবা ভাব-প্রকাশের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই, ইহার যাহা কিছু রস মাধুর্য তাহা ইহার গানগুলির মধ্যে। বিষয়বস্তুর ভিতর কোনও সত্য অথবা তত্ত্ব আবিষ্কারের উদগ্র চেষ্টাও কোথাও নাই; না থাকিয়া ভালই হইয়াছে, কারণ তাহাতে নাট্যকে গানের সুরের আশ্রয় করাইয়া যে শিল্পরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাহার অভিব্যক্তি সহজ হইতে পারিয়াছে। নাট্যই ইহার মুখ্যবস্তু, তাহা সুরকে আশ্রয় করিয়াছে মাত্র। যেমন, 'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অলকায়, এ বনে এস না এস না এ দীনজন কুটীরে—' বাল্মীকির ভূমিকায় একটি গানের এই কথাগুলির রসাভিব্যক্তি পাঠের সময় তত বেশী পড়েই না, টোড়ি রাগিণীতে বসিয়া বসিয়া গান করিলেও ততটা পড়ে না, যতটা পড়ে তাহার অভিনয় চোখের সম্মুখে দেখিলে।

এই যে নাট্যকে সুরের আশ্রয় করাইয়া ভাবকল্পনার অভিব্যক্তি, সংগীতের এই নূতন

‡ "প্রতিভা দেবী হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। বাল্মীকি-প্রতিভা এই নামের মধ্যে এই ইতিহাসটুকু আছে। পরে প্রতিভা দেবীর সহিত আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহ হয় (১৮৮৬, আগষ্ট)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়" 'রবীন্দ্র-জীবনী", ১ম খণ্ড, ১০৫ পৃঃ।

পরীক্ষা কবিকে কিছুদিন খুব একটা আনন্দ দিয়াছিল; "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সার্থকতায় হয়ত তিনি খুব উৎসাহিতও হইয়াছিলেন। "প্রভাত-সংগীতে"র কবিতাগুলি যখন লেখা হইতেছে, এবং একটি করিয়া "ভারতী"তে বাহির হইতেছে, তখন কবি ঠিক "বাল্মীকি-প্রতিভা"রই ঢঙে আর একটি একটি গীতি-নাট্য রচনা করেন, তাহার নাম "কাল-মৃগয়া"। দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ এই গীতি-নাট্যের বিষয়বস্তু। "পরে এই গীতি-নাট্যের অনেকটা অংশ "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া "কাল-মৃগয়া" গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।'' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী" ১ম খণ্ড, ১০৫, ১৩৭ পৃঃ)।

"বাল্মীকি-প্রতিভা" ও "কাল-মৃগয়া"র কিছুকাল পরে, কবি "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামক একটি নাটিকা রচনা করেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যপ্রয়াস যাহা গানের ছাঁচে ঢালা নয়, গীতি-মাধুর্যই যাহার মুখ্যবস্তু নয়। ইহার বিষয়বস্তুর মধ্যে একটু স্বকীয়ত্ব, একটু নূতনত্ব আছে। "বাল্মীকি-প্রতিভা" এবং "কাল-মৃগয়া"র বিষয়বস্তু তিনি পাইয়াছিলেন যথাক্রমে দস্যু রত্নাকরের এবং দশরথ কর্তৃক অন্ধ-মুনির পুত্রবধের রামায়ণী কথার মধ্যে; কিন্তু, "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র গল্পভাগ কবির নিজস্ব সৃষ্টি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায়, এবং কোথাও কোথাও গদ্যে সমস্ত গল্পটি বিবৃত হইয়াছে; মাঝে মাঝে কয়েকটি গান আছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা খুব বেশি নয় বলিয়া এবং নাট্যবস্তুর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ খুব কম বলিয়া অভিনয়ের ভাষা কোথাও সুরকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই নাটিকাটির নায়ক একজন সন্ন্যাসী। তিনি সংসারের সমস্ত স্নেহবন্ধন, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের মায়া ছিন্ন করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর জয়ী হইতে চাহিয়া অন্ধকার নির্জন গুহায় সাধন-রত হইয়াছিলেন। একদিন সন্ন্যাসী নগরের রাজপথে চলিতে চলিতে 'ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা' বলিয়া পরিচিত, পিতৃমাতৃহীন স্বজন পরিত্যক্ত সর্বজনঘৃণিত অসহায় একটি বালিকাকে পথের পাশে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া বালিকাকে তাহার ভাঙা কুটীরে পৌঁছাইয়া দেন। সেইদিন হইতে বালিকা তাহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে, এবং সেই মোহবন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসীর হৃদয়েও স্নেহের অঙ্কুর জাগাইয়া তোলে। সন্ন্যাসী তাহা বুঝিতে পারেন এবং সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার চিত্তে সন্ন্যাস ও সংসারের আদর্শের তুমুল সংগ্রাম বাধে। বালিকাকে তাঁহার গুহাদ্বারে লইয়া গিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে নানা তত্ত্বকথা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বালিকা ওসব কিছুই বুঝিত না, শুনিতেও চাহিত না, শুধু একান্ত নির্ভরে ও ভালবাসায় তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিত। এই ভাবে শুধু তাহার ভালবাসা দিয়া ক্ষুদ্র বালিকা সন্ন্যাসীকে সংসারের স্নেহবন্ধনের মধ্যে ফিরাইয়া আনিল, তিনি আর কিছুতেই সংসার হইতে, প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন তাঁহাকে বলিতে হইল,

> আজ হতে আমি আর নহিরে সন্ন্যাসী!
> পাষাণ সঙ্কল্প ভার দিয়ে বিসর্জন
> আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার!
> হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
> আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
> একা আমি সাঁতারিয়া পারিবনা যেতে!
> কোটী কোটী যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া,
> আমিও চলিতে চাই উহাদের সাথে

যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে !

তাঁহার চোখে পৃথিবীর রং তখন বদলাইয়া গেল, 'জগতের মুখে হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, চন্দ্রসূর্য ঘিরিয়া আনন্দ তরঙ্গ নাচিতে লাগিল, লতায় পাতায় আনন্দ হিল্লোল কাঁপিতে লাগিল, পাখির গলায় আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল, কুসুমে কুসুমে আনন্দ ফুটিয়া পড়িতে লাগিল'।

দুইটি আপাতবিরোধী আদর্শের এই যে সংগ্রাম, এবং বহু সংগ্রামের পর এই সুমধুর পরাজয়, এই সংগ্রাম ও পরাজয়ই "বাল্মীকি-প্রতিভা" অথবা পরবর্তী "মায়ার খেলা" অপেক্ষা "প্রকৃতির প্রতিশোধ"কে একটি পূর্ণতর নাট্যরূপ দান করিয়াছে ; এই দ্বন্দ্বই সমস্ত নাটিকাটির মধ্যে একটি সচল গতি সঞ্চার করিয়া সমস্ত কথা ও ভঙ্গিমাগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্যই "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র মধ্যেই সর্বপ্রথম আমরা একটা বিশিষ্ট নাটকীয় রসের আস্বাদন লাভ করি। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী চরিতকার টম্‌সন্ সাহেব যে এই নাটিকাটিকে কবির 'first important drama' বলিয়াছেন, একথা অত্যন্ত সত্য।

একটু অভিনিবেশ সহকারে এই বিষয়-বস্তুটির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, এই নাটিকাটির মধ্যে শিল্পাভিব্যক্তির যে আনন্দ শুধু তাহাই ফুটিয়া উঠে নাই, জীবনের একটি পূর্ণতর সত্যের দিকেও ইঙ্গিত ইহার মধ্যে আছে। এই সত্য কবির তৎকালীন জীবনে যে-ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া এই নাট্য-কাব্যটি জন্মলাভ করিয়াছে। সেইজন্যই "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সঙ্গে ইহার প্রভেদ অনেকখানি। এই প্রভেদের কারণও আছে। "প্রকৃতির প্রতিশোধ" লিখিবার কিছুদিন আগেই কবির প্রথম যৌবনের ভাবধারার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসিয়াছিল ; সে-পরিবর্তনের পরিচয় ইতিপূর্বেই "প্রভাত-সংগীতে" পাওয়া গিয়াছিল। "সন্ধ্যা-সংগীতে" একটা দুঃখের, এবং নৈরাশ্যের, একটা অনির্দিষ্ট অন্ধকারের যে ভাব ছিল, তাহা কাটিয়া গিয়া কবির হৃদয় "প্রভাত-সংগীতে" বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের আনন্দকে বরণ করিয়া লইল। 'আজি এ প্রভাতে রবির কর', 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি' প্রভৃতি কবিতায় তাহার প্রকাশ অতি সুপরিস্ফুট। "জীবন-স্মৃতি"তে কবির নিজের লেখা হইতেই আরও ভাল করিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালবেলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। * * * আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। * * * আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত ; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া চলিয়াছে। * * * রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আরেক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম। * * * বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা পালন করিতেছে, একটা গরু আর একটা গরুর পাশে

দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে একটা অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল।"

প্রকৃতির লীলার মধ্যে, সংসারের স্নেহ প্রীতি ভালবাসার মধ্যে কবি এমনই করিয়াই একটা আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্যে জীবনের সার্থকতার সন্ধানও লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই সংসারের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে বিদ্রোহ করিয়া সন্ন্যাসীকে তিনি থাকিতে দিলেন না, প্রকৃতি সেই বিদ্রোহের প্রতিশোধ লইল, সন্ন্যাসীকে সংসারের মধ্যে, আপনার স্নেহ ভালবাসার মধ্যে ফিরাইয়া আনিল এবং তাহার মধ্যে যে 'অন্তহীন অপরিমেয়তা', সেই দিকে ইঙ্গিত করিয়া গেল। শিল্প বিকাশের দিক হইতে হয়ত ততটা নয়, কিন্তু কবি-জীবনের ভাবরহস্যের বিকাশের দিকে হইতে এই জন্যই "প্রকৃতির প্রতিশোধ"কে "বাল্মীকি-প্রতিভা" হইতে বড় বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্যে ভাবের যে গভীরতা আছে, জীবনবিকাশের সত্যকে যেমন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা আছে, বহুদিন পর্যন্ত তাহার প্রকাশ নাটকে আর দেখা যায় নাই।

"জীবনস্মৃতি"তে কবি নিজেই "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র ভিতরকার রহস্যটিকে তাঁহার অনবদ্য ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সন্ন্যাসী যখন সংসারের সংকীর্ণতার গণ্ডির মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন,

"ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই। * * * বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষ বোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কি করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাস দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর মধ্যে একদিকে যতসব পথের লোক যতসব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে, আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোনমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মধ্যে তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।" ("জীবন-স্মৃতি", পৃঃ ১৮৬—৮৭)

"প্রকৃতির প্রতিশোধে"র পরে "কড়ি ও কোমল", তাহার পরেই "মায়ার খেলা"র সৃষ্টি। "বাল্মীকি-প্রতিভা" ও 'মায়ার খেলা" দুইটিই গীতিনাট্য, কিন্তু শেষেরটি অনেকটা "ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা * * * যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের উপরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম, তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।" ("জীবন-স্মৃতি", পৃঃ ১৫৩-৫৪)। অল্প কথায় এই গীতিনাট্য দু'টির রূপ-বিশ্লেষণ ইহার চেয়ে সুস্পষ্ট আর কি হইতে পারে? "মায়ার খেলা"র বিষয়বস্তু কিছু নাই বলিলেও চলে; কয়েকটি তরুণ প্রাণ শুধু আপনার সুখের মোহে প্রেমের মায়ায় ভালবাসার ছলনার মধ্যে পড়িয়া নিজেরা কি করিয়া ভুল করিয়া মরিয়াছে, তাহাই অফুরন্ত গানের সুরের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার সমস্ত সত্যটি মায়াকুমারীদের সর্বশেষ গানটির করুণ বিভাস রাগিণীর মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে:

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলেনা
শুধু সুখ চলে যায় !
এমনি মায়ার ছলনা।
এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায় !
তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ !
তাই মান অভিমান
তাই এত হায় হায়।

এই মায়াকুমারীরাই শুনাইয়াছেন,

দুঃখের মিলন টুটিবার নয়
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়
নয়ন সলিলে যে হাসি ফুটে গো,
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়।

এত যে গানের লীলা, সিন্ধু দেশ সাহানা খাম্বাজ বেহাগ কানাড়া পুরবী সোহিনী ভূপালী ভৈরবীতে এত যে সুরের এত যে সৌন্দর্যের উৎসব, তাহার মধ্যেও কবি প্রেমের, সৌন্দর্যের, ভোগানুভূতির অন্তরের রহস্যটিকে ভুলিয়া যান নাই ; এত যে 'ভুবনমোহিনী মায়া' সমস্ত 'কায়াকে বেষ্টন করিয়া ধরিতে চায়', তাহাদের মধ্যেও কবি বিস্মৃত হন নাই যে, দুঃখের তপস্যার ভিতর দিয়া জীবনের প্রেমতৃষ্ণাকে, সৌন্দর্যানুভূতিকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে না পারিলে, নয়ন সলিলে ডুবিয়া হাসির কমলকে ফুটাইতে না পারিলে মায়ার বন্ধনই চিরস্থায়ী হইয়া থাকে, চিরজীবন ক্রন্দনই সার হয়, প্রাণই দগ্ধ হয় ; প্রেমকে পাওয়া যায় না, জীবনের সার্থকতার স্বপ্ন সুদূরে মিলাইয়া যায়। ইহার পরই লেখা "মানসী" কাব্যটির ভিতরে এই মায়ার খেলা হইতে মুক্ত হইবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে ; 'নিষ্ফল কামনা', 'আঁখির অপরাধ' প্রভৃতি কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে। আমরা এইখানেই তাহার প্রথম আভাস লাভ করিলাম। ভাবরহস্যের দিক হইতে দেখিতে গেলে বুঝা যাইবে কবি "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র রহস্য হইতে "মায়ার খেলায়" এক ধাপ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। পূর্বোক্তটিতে দেখিয়াছি সংসারমুক্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে "সন্ধ্যা-সংগীতে"র রবীন্দ্রনাথ সংসারের স্নেহ প্রীতি প্রেম ভালবাসার সীমার বন্ধনের মধ্যে ধরা দিলেন, এই ক্ষুদ্রতর সীমার মধ্যে সৌন্দর্যভোগের মধ্যে জীবনের আমন্ত্রণ জানাইলেন। কিন্তু "মায়ার খেলা"র মধ্যে এই রহস্যই ব্যক্ত হইল যে, এই প্রেমকে শুধু আপনার সুখের জন্য চাহিলে প্রেমের স্পর্শ ত পাওয়া যাইবেই না, সুখও দূরে পলাইবে, শুধু ভোগের নিমিত্ত ভালবাসার দুয়ারে অতিথি হইলে 'সে তোমাকে ছলনা করিবেই, সংসারের মধ্যে 'অন্তহীন অপরিমেয়তার' সন্ধান তুমি কিছুতেই পাইবে না, আর তাহাই যদি তুমি না পাইলে, তাহা হইলে তোমার জীবনের সার্থকতা রহিল কোথায় ? মায়ার খেলাই যদি তোমার সার হইল, তাহার মধ্যেই যদি বাঁধা পড়িয়া রহিলে তবে তোমার প্রেমের 'মলিন মালা কে লইবে', 'নীরব নিরাশা' কে সহিবে' ?

রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, সত্য হউক মিথ্যা হউক, তাঁহার সমসাময়িক কাব্যেও সুপ্রকাশ, এবং তাহার বিস্তৃত উল্লেখ আগেই করিয়াছি ; এখানে তাহার পুনরুল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি রবীন্দ্রনাথের বাল্যাবস্থায় নবজাগ্রত বাঙালী উচ্চমধ্যবিত্ত-মানসের লীলাক্ষেত্র ছিল। কাব্যালোচনায় গানে নাটকাভিনয়ে ঠাকুরবাড়ির সান্ধ্যমজলিস

মুখরিত ; সেই মজলিসে রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠতম। তাঁহার স্ফুটনোন্মুখ কবি-প্রতিভা এবং সংগীত-নৈপুণ্য সেই মজলিসে স্বীকৃত। গীত ও গীতিকাব্যের রসে তখন কিশোর-মন আচ্ছন্ন ; তাহার ফাঁকে ফাঁকে নিজের বাড়ির বিচিত্র নাটকাভিনয় ধীরে ধীরে তাঁহার মনে নাটকীয় রস সঞ্চার করিতে আরম্ভ করে। এই উভয়ের মিলন-মোহানায় "বাল্মীকি-প্রতিভা"র সূচনা। তখন দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথের সামন্ত-পরিবারের প্রাচীর ধীরে ধীরে ভাঙিতেছে ; ঠাকুরবাড়িতে যাঁহারা জমায়েৎ হইতেন, তাঁহারা নূতন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তাহাদের মানস ব্যক্তিকেন্দ্রিক ; ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নানান বিচিত্র সম্বন্ধের লীলা ও আলোড়নই তাহাদের ঔৎসুক্যের বিষয় ; এবং সেই সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদের মানস ও ভাবকল্পনা মুক্তি পায়। সমাজও রাষ্ট্র-শাসনমুক্ত যে মানবত্ব সেই মানবত্বের পাঠ তাহারা লইয়াছেন তদানীন্তন বাংলা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির ধারা হইতে, এবং এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবত্বই তাহাদের কামনার বস্তু। স্বভাব ও সংস্কারের, অভ্যাস ও অহংকারের, সর্বপ্রকার শাসন ও বন্ধনের দাসত্ব হইতে মুক্ত যে মানুষ সেই মানুষের জয়গানই বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের একমাত্র ধর্ম, যাহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল প্রথম পাদে রামমোহন এবং পরবর্তী যুগে তত্ত্ববোধিনী সভাকে কেন্দ্র করিয়া, এবং যাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ বাংলাদেশে দেখা গেল বিংশ শতকের প্রথম পাদে। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষের জয়গানই রবীন্দ্র-সাহিত্যেরও ধর্ম এবং এই ধর্ম রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে ভাবে ও রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, এমন আর কোনও ভারতীয় সাহিত্যেই এই যুগে আর দেখা যায় নাই। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে তবু অতি সংক্ষেপে এইখানে তাহার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, ইহা না জানিলে রবীন্দ্রনাথের আদি নাট্য-প্রয়াসগুলির অন্তরের ধর্মটি সহজে বুঝা যাইবে না।

আগেই বলিয়াছি, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের লীলা-বৈচিত্র্যই ছিল কিশোর রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয়, পরম বিস্ময়ের বস্তু ; কবি-মানসের মধ্যে তখন কেবল প্রথম এই অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হইতেছে। "বাল্মীকি-প্রতিভা" ও পর পর কয়েকটি নাট্য-প্রয়াস ঠিক এই সময়কার সৃষ্টি। দয়া, করুণা, প্রেম, স্নেহ, মৈত্রী, এই গুণই মানবতার স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত। এই স্বভাবজ মানবধর্ম নানা অভ্যাসের কঠোরতায়, নানা সংস্কারের শাসনে, নানা বিধি-বিধানের, নানা ঐতিহ্যের বাঁধনে মানুষ ভুলিয়া যায়, তাহাকে অস্বীকার করে। এই ভাবেই স্বাভাবিক মানবত্ব লাঞ্ছিত হয়। দস্যু রত্নাকরের কাছেও একদিন তাহাই হইয়াছিল, সংসার-বন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসীর কাছেও তাহাই হইয়াছিল। ইহাদের একজনও নিজেদের স্বাভাবিক মানবধর্ম সম্বন্ধে সজাগ ছিল না। দস্যু রত্নাকর তাহাকে ভুলিয়াছিল অভ্যাসের কঠোরতায়, সন্ন্যাসী তাহাকে ভুলিয়াছিল সন্ন্যাস-সংস্কারের শাসনে, প্রমদা ভুলিয়াছিল তাহার নিজের অহংকারে। বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবেশকে আশ্রয় করিয়া একদিন প্রত্যেকেরই জীবনে এক একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিল ; এই দ্বন্দ্বটুকুই নাটক, এবং যেটিতে এই দ্বন্দ্ব যতটা সুস্পষ্ট রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই নাটকটি ততটুকুই সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি হইতে পারিয়াছে। এই হিসাবে এই চারিটির ভিতর "প্রকৃতির প্রতিশোধ"ই সার্থকতম। যাহা হউক, এই দ্বন্দ্বের ভিতর হইতেই আবিষ্কৃত হইল স্বাভাবিক মানবত্ব, এবং শেষপর্যন্ত চিরকালের ভিতরকার সর্ব-আবরণমুক্ত মানুষটিই হইল জয়ী।

তিন

রাজা ও রানী (১২৯৬)
বিসর্জন (১২৯৬)
মালিনী (১৩০৩)

"রাজা ও রানী"-রচনা হইতে রবীন্দ্রনাট্যের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হইল। এই পর্বে বিশেষ করিয়া তিনটি নাট্য-প্রচেষ্টাকে স্থান দিতে হয়। "রাজা ও রানী", "বিসর্জন" ও "মালিনী"। প্রথম দুইটি একেবারে পর-পর লেখা, তৃতীয়টি প্রায় ছয় বৎসর পর। ভাবকল্পনার ধারা ও বিষয়বস্তু, উভয় দিক হইতেই এই তিনটি কাব্যনাট্যকে এক পর্যায়ভুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যখন একদিকে "মানসী"র হৃদয়াবেগ ও প্রচ্ছন্ন অনিশ্চিত বেদনাবোধে কবিচিত্ত ভারাক্রান্ত তখনই "রাজা ও রানী" এবং "বিসর্জন" এই নাটক দু'টির সৃষ্টি। "মালিনী" প্রায় "চৈতালি"র সমসাময়িক, এবং ইতিমধ্যে রবীন্দ্র-কবিমানস "চিত্রাঙ্গদা-সোনার তরী-বিদায় অভিশাপ-চিত্রা"র সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। "মায়ার খেলা"র কয়েকমাস পরই রচিত হয় "রাজা ও রানী"। "মায়ার খেলা"র কল্পনা ক্ষীণ, হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস প্রবল, এবং প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধে ভাবকল্পনা ভারাক্রান্ত। "রাজা ও রানী" নাটকেও হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রবল এবং বিষয়বস্তু ও সাহিত্যরূপ ভিন্ন প্রকারের হওয়া সত্ত্বেও ইহার মধ্যে গীতিকাব্যের আবেগই নাটকীয় দ্বন্দ্ব অথবা পরিণতি অপেক্ষা স্পষ্টতর। তাহার ফলে নাটক হিসাবে "রাজা ও রানী" দুর্বল হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে, অথচ বিষয়বস্তুর মধ্যে নাট্য-সম্ভাবনা নাই একথা কিছুতেই বলা চলে না। তবু নাটক হিসাবে "রাজা ও রানী" যত দুর্বলই হউক ইহার গল্পের মধ্যে বস্তু আছে যাহা কবির পূর্ববর্তী নাট্য-প্রয়াসগুলির মধ্যে দেখা যায় না ;ইহার গল্প-বিন্যাসের মধ্যে সুদৃঢ় গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে এবং মানবসম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতর আভাস আছে। ভাবকল্পনার প্রসারের পরিচয়ও পাওয়া যায় গল্প ও চরিত্রের পরিকল্পনার ভিতর ; কিন্তু এই ভাব-কল্পনা এখনও স্বপ্নমোহে আচ্ছন্ন, বাস্তবের অমোঘ ও অনাবিল স্পর্শ এখনও তাহাকে আলোকোদ্ভাসিত করে নাই। সে-স্পর্শ লাগিয়াছে "বিসর্জন" নাটকে, যদিও এই নাটকটি "রাজা ও রানী"র কিছুদিন পরই লেখা। ভাব-কল্পনার প্রসারে ও গভীরতায়, নাটকীয় আঙ্গিকের দৃঢ় স্থাপত্য-মহিমায়, জটিল মানব-সম্বন্ধের সুনিপুণ বিশ্লেষণে, হৃদয়াবেগের সংযমে ও স্বচ্ছন্দতায়, এবং অনুভূত সত্যের প্রতি নিষ্ঠায় "বিসর্জন" এত সমৃদ্ধতর যে মনে হয়, এই দুই নাটকের মধ্যে একটা যেন সুদীর্ঘ অথচ অজ্ঞাত অভিজ্ঞতার ইতিহাস কোথাও আত্মগোপন করিয়া আছে।

এই পর্ব হইতে আমি ইচ্ছা করিয়াই "চিত্রাঙ্গদা" ও "বিদায়-অভিশাপ"কে বাদ দিতে চাহিতেছি ; তাহার কারণ, ইহাদের ভাববস্তু একটা নাট্যরূপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিলেও মূলত ইহারা নাট্য নহে। নাট্যের যে বিশেষ ভঙ্গি, যে দ্বন্দ্ব ও পরিণতি যথার্থ নাটকীয় তাহা ইহাদের মধ্যে নাই। বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকার ভিতর দিয়া সমগ্র বস্তুটি তীক্ষ্ণতর ও পূর্ণতর হইয়া ইহাদের মধ্যে অভিব্যক্তি পাইবার অবসর পাইয়াছে বটে, কিন্তু বিষয়বস্তুটির মধ্যে এমন কোন দ্বন্দ্ব, অথবা সমস্যা নাই যাহার জন্য একটা নাট্যরূপেরই প্রয়োজন হইতে পারে ; এবং বলিতে কি, এই দু'টি সাহিত্য-বস্তুর যে রস, তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে নাটকের অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা-সংস্থানের অথবা তাহাদের পরিণতির মধ্যে ততটা নয়, যতটা তাহাদের বক্তব্যের অর্থ ও ব্যঞ্জনার মধ্যে। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ইহাদের মধ্যে

নাটকীয়ত্ব ততটা নাই, যতটা আছে শুধু কথনের ভিতর দিয়া মনের ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তোলা। ইহাদের ঘটনার সজ্জা ও বিন্যাসের জন্য কবিকে প্রথম হইতেই কিছু অবহিত হইতে হয় নাই, যাহা নাট্যে ও উপন্যাসে একান্তই প্রয়োজন। আমার এই বিশ্লেষণ সত্য না-ও হইতে পারে, কিন্তু "চিত্রাঙ্গদা" ও "বিদায় অভিশাপে"র রূপ ও রসাভিব্যক্তি যে কাব্যের, নাট্যের নহে, এ সম্বন্ধে কাহারও বোধ হয় দ্বিমত নাই।

আগেকার পর্বে যে চারিটি নাট্য-প্রচেষ্টার আলোচনা করিয়াছি, দেখিয়াছি তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি প্রত্যয়, একটি অনুভূত সত্যকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে; সমস্ত কথা ও ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়া সেই সত্যটাই একটা শিল্পরূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। টম্‌সন্ সাহেব সত্যই বলিয়াছেন এবং সকলেই একথা স্বীকার করিবেন যে 'his dramatic work is the vehicle of ideas, rather than expression of action.' এই যে নাটককে একটা ভাবের বাহন করিয়া তোলা, রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার সূচনা হইতেই এই বিশেষত্বটুকু আমরা লক্ষ্য করি, এবং ক্রমে যত অগ্রসর হই, "রাজা ও রানী", "বিসর্জন", "মালিনী"র ভিতর দিয়া যতই রূপক-নাট্যের রাজ্যের সীমার মধ্যে আসিয়া পৌঁছাই, ততই এই বিশেষত্বটুকু স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি মনে করি কোন একটা নির্দিষ্ট সত্য বা প্রত্যয়কে প্রকাশ করিবার জন্যই কোন একটি বিশেষ নাটকের সৃষ্টি তিনি করিয়াছেন তাহা হইলে হয়ত ভুল করিব। বরং, সর্বত্রই আমরা দেখি, নাটকের পারিপার্শ্বিক শিল্পাবেষ্টনের ভিতর হইতে কবির বিশিষ্ট ভাবটি, সত্যটি আপনি আপনার অজ্ঞাতসারে ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে; দেখি, কোথাও কোনও প্রত্যয় তত্ত্বের রূপ ধারণ করিয়া নাটকীয় সংস্থান, রীতি ও ভঙ্গিমাকে অথবা তাহার রসাভিব্যক্তিকে সহজে ব্যাহত করিতে পারে নাই; কোথাও সেই সত্য বা প্রত্যয় কোন 'মেসেজ' হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব শিল্পপ্রতিভা ও সৌন্দর্যবুদ্ধিই তাঁহাকে এই অত্যন্ত সম্ভাবনীয় পরিণাম হইতে দূরে রাখিয়াছে। প্রত্যয় বা অনুভূত সত্যকে কোথাও সজ্ঞানে লক্ষ্যের মধ্যে রাখা হয় নাই, সর্বত্রই ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-স্ফুরণের ভিতর হইতে বিশিষ্ট প্রত্যয়টি নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজ হইতেই যেন উদ্যত, এই কথাটাই মনে হয়।

যাহা হউক, "রাজা ও রানী", "বিসর্জন" অথবা "মালিনী" কি করিয়া কোন্ ভাবের বাহন যে হইয়া উঠিল তাহা সত্যই দেখিবার বস্তু। সঙ্গে সঙ্গে উহাদের নাটকীয় সংস্থান ও অন্যান্য কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িবে।

"রাজা ও রানী"র নাট্যবস্তুটি গড়িয়া উঠিয়াছে একটি অতি তুচ্ছ ঐতিহাসিক ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া। সে ঐতিহাসিক ঘটনাও আবার এতখানি কল্পনার খাদে মেশান, একেবারে উল্‌টাইয়া এ কথাও বলা চলে যে, একটা কল্পিত আখ্যান বস্তুকে একটা ঐতিহাসিক আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া তাহাকে ইতিহাসের রূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। বিক্রমদেব জলন্ধরের রাজা; কাশ্মীরের রাজা চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং যুবরাজ কুমারসেনের ভগিনী সুমিত্রা তাঁহার মহিষী। মহিষীর 'কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী' বিক্রমদেবের রাজ্য জুড়িয়া বসিয়া 'রাজার প্রতাপ খণ্ড খণ্ড করিয়া' ভাগ করিয়া লইয়াছে, বিদেশীর অত্যাচারে রাজ্যের যত প্রজা সব 'জর্জর কাতর'। প্রতিকার করিবার কেহ নাই; রাজা বিক্রমদেব দুর্বলচিত্ত,

কর্তব্যবিমুখ ; নিজে রাজ্য ছাড়িয়া রানীর রাজত্বে তিনি আশ্রয় লইয়াছেন ; কর্তব্য ও দায়িত্ব-বিরহিত প্রেম মেঘের মত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত চিত্তকে বিকল করিয়াছে. রাজ্যের প্রতি সকল কর্তব্য ভুলিয়া তিনি ভালবাসার নামে একটা মোহ-মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু মহিষীর কর্তব্যে জাগ্রত-চিত্ত সুমিত্রা রাজার এই আত্ম-বিস্মৃতিতে লজ্জায় ম্রিয়মাণ,

শোন প্রিয়তম,
আমরা সকলি তুমি, তুমি মহারাজ,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশি নই ; আমারে দিয়োনা লাজ,
আমারে বেসোনা ভাল রাজশ্রীর চেয়ে !

সুমিত্রা চাহেন না রাজার একান্ত বিস্মৃত আত্ম-সমর্পিত প্রেম ; লতার মত দুর্বল ললিত হৃদয়ের দৃষ্টি-বিহীন প্রেম নারীর ভালবাসাকে শুধু অবমানিত করে, সে প্রেম নারী কামনা করে না। সুমিত্রা তাই রাজাকে বলেন,

তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন
আপনি অটল রবে আপনার পরে
স্বতন্ত্র উন্নত ; * * *
তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময়, কিছু
উদাসীন ; কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত,
সহস্র পাখির গৃহ, পান্থের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী লতার আশ্রয়।

কিন্তু রাজার কর্তব্যবুদ্ধিকে তিনি বৃথাই উদ্রিক্ত করিতে চেষ্টা করেন। বিদীর্ণ-হৃদয় মন্ত্রী নতশিরে শূন্য সিংহাসনের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদেন, আর রানী সুমিত্রা অভাগা প্রজার করুণ ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া বারবার রাজাকে উৎপীড়ক অমাত্যবর্গের নির্বাসনের জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজকর্তব্য পালনে তৎপর করিয়া তুলিতে পারেন না। অগত্যা মহিষী সুমিত্রা নিজেই পতি-সত্য পালনের জন্য পুরুষের ছদ্মবেশ ধরিয়া দেবপূজার ছলে রাজধানী ছাড়িয়া অনুচর মাত্র সঙ্গে লইয়া কাশ্মীরে আসিয়া উপস্থিত হন। এদিকে রাজা বিক্রমদেব যখন দেখিলেন, রাজ্যের যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার, যত শৃঙ্খল সব কিছু দিয়া, তাহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম উজাড় করিয়া দিয়াও ক্ষুদ্র একটি নারীর হৃদয়কে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, আপন কর্তব্যের আহ্বানে মোহাচ্ছন্ন প্রেমকে সবলে ঠেলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল, তখনই তাহার সমস্ত স্বপ্ন টুটিয়া গেল, নিজেকে তিনি ফিরিয়া পাইলেন। তখনই তিনি বলিতে পারিলেন,

অন্তর্যামী দেব,
তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালবাসা ; পুণ্য গেলো, স্বর্গ গেলো
রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেলো !
তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর ;
রাজধর্ম ফিরে দাও ; পুরুষ হৃদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গ মাঝে !

কোথা কর্মক্ষেত্র! কোথা জনস্রোত! কোথা
জীবন মরণ! কোথা সেই মানবের
অবিশ্রান্ত সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস! * * *

এইখানে নাটকটির প্রথম পর্যায়ের শেষ। এ-পর্যায়ে সুমিত্রা ও বিক্রমদেবকে কেন্দ্র করিয়াই প্রত্যেকের কথা ও গতির সঞ্চার। রাজপথে বিভিন্ন লোকের কথাবার্তা—দেবদত্তের সঙ্গে রাজার, মন্ত্রীর সঙ্গে মহিষীর—প্রভৃতির ভিতর দিয়া রাজ্যের অবস্থা, বিশেষ করিয়া রাজার চরিত্রের দিকটার একটি সুন্দর পরিবেশ রচিত হইয়াছে। নহিলে বিক্রমদেবের চরিত্র-বিশ্লেষণ আমাদের কাছে এতটা সহজ হইত না। এই যে প্রথম পর্যায় ইহারই মধ্যে একটি জিনিস অতি সুস্পষ্ট হইয়া পাঠকের মনে ধরা না পড়িয়া পারে না। দুইটি অঙ্কের কয়েকটি দৃশ্যের মধ্যে নাটকীয় সংস্থান খুব সচল নয়, খুব ঘনীভূতও নয়; বরং প্রথম অঙ্কে রাজপথের দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে জয়সেনের প্রাসাদের দৃশ্য নাটকীয় সংস্থানকে একটু শিথিলই করিয়া দিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে একটা সত্য অত্যন্ত সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাহা বিক্রমদেব ও মহিষীর চরিত্রের মধ্যেই ব্যক্ত। দুর্বল, দায়িত্ববিহীন, কর্তব্য-বিরহিত ভালবাসার মোহে যতদিন তিনি আচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন, ততদিন তাহার ভালবাসা কিছুতেই মহিষীর পূজা ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই, ববং রাজাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া ভালবাসার বস্তুটি একদিন অন্তঃপুর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া গেল, শুধু তখনই তাহার স্বপ্ন টুটিল, আপনাকে জানা তাহার সম্ভব হইল এবং নিজের কর্তব্যবুদ্ধিতে তিনি জাগ্রত হইলেন। এই যে আপনার পরিচয় লাভ, এর জন্য মূল্য দিতে হইল রানীকে। যিনি তাহার অন্তরের দেবতা, তাহাকে ছাড়িতে হইল, রানী হইয়া তাহাকে অনেকখানি বিপদ ও লোকনিন্দাকে বরণ করিতে হইল। কিন্তু, কেন? তাহার উত্তর, "তোমারে যে ছেড়ে যাই, সে তোমারি প্রেমে"; যাহাকে তিনি ছাড়িয়া গেলেন তাহাকেই তিনি আরও বেশি করিয়া পাইবেন বলিয়া, মোহের আচ্ছন্নতার ভিতর হইতে সত্যের ও জীবনের কর্তব্যের জ্যোতির মধ্যে তাহার প্রিয়তমকে ফিরাইয়া আনিবেন বলিয়া। "রাজা ও রানী"তে এই সত্যটাই নানান ভাবে নানান ঘটনায় সর্বত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; প্রথম পর্যায়ে যাহার শুরু, শেষ পর্যন্ত সেই সত্যটাই, সেই আইডিয়াটাই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে। এই সত্যটির সন্ধান পাইলেই সমস্ত নাটকটির অন্তরের রহস্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

তৃতীয় অঙ্কে একটি শান্ত মধুর অথচ তেজস্বী চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভ ঘটে। শংকর কাশ্মীর-কুমার কুমারসেনের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য। প্রথম দৃশ্যে যেখানে পুরুষবেশী সুমিত্রার সঙ্গে শংকরের প্রথম দেখা, সেখানে শংকরের বুকে কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রতি স্নেহের উৎসের পরিচয়ে মন সিক্ত হয়। এই বৃদ্ধ ভৃত্যটির স্নেহপ্রবণ তেজোদীপ্ত চরিত্রটি বহুবার আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় না, কিন্তু তাহার এই একটুখানি পরিচয়ই আমাদের চিত্তের সমস্ত সম্ভ্রমকে আকর্ষণ করে এবং সমস্ত নাটকটির উপর একটি অপূর্ব সরল রেখাপাত করিয়া যায়। দ্বিতীয় দৃশ্যে ত্রিচূড়-কাননে কুমারসেনের সহিত বিবাহপণবদ্ধা ত্রিচূড়-রাজকন্যা ইলার ও কুমারের আলাপনের ভিতর দিয়া কুমারের চরিত্রের পরিচয় কতকটা পাওয়া যায়। তৃতীয় দৃশ্যে ছদ্মবেশী সুমিত্রা যুবরাজ কুমারসেনের কাছে কাশ্মীরের, দুর্বিনীত দস্যুদের অত্যাচারে নিজের মর্মপীড়ার কথা জ্ঞাপন করেন, কিন্তু কুমারের অনুরোধেও রাজা চন্দ্রসেনের কাছে নিজের অনুরোধ জানাইতে অসম্মত হন।

আমি কি এসেছি
জালন্ধর রাজ্য হতে ভিখারিণী রানী
ভিক্ষা মাগিবার তরে কাশ্মীরের কাছে?

কিন্তু কুমারসেন নিজেই কাশ্মীরের এই কলঙ্কমোচন করিবার জন্য সংকল্প করেন এবং পিতৃব্যের আদেশ লইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। পঞ্চম দৃশ্যে ইলার নিকট হইতে কুমারসেনের বিদায়।

এদিকে জাগ্রতকর্তব্য রাজা বিক্রমদেব দুর্বৃত্ত কাশ্মীর দস্যুগণের অনেককেই পরাজিত করিয়া তখন তিনি উদগ্র সংগ্রামে মাতিয়া উঠিয়াছেন,

সন্ধি নহে—যুদ্ধ চাই আমি! রক্তে রক্তে
মিলনের স্রোত—অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের
ধ্বনি

শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন, তখন খবর পাইলেন 'বিপক্ষদল নিকটে আসিয়াছে *** মার্জনা প্রার্থনা তরে', এবং মহারানী সুমিত্রা ভাই কুমারসেন ও কাশ্মীরের সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া পলাতক দস্যুদের বন্দী করিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন! কিন্তু বিক্রমদেবের সমস্ত চিত্ত তখন উৎকট রণমদে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহার অপমানক্ষুব্ধ চিত্ত কিছুতেই এত সহজে শান্ত হইতে চাহিল না; মহারানীকে সাক্ষাতে অসম্মতি জানাইয়া, দূত শংকরকে অপমানিত করিয়া তিনি কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন। এইখানেই "রাজা ও রানী" নাটকের যথার্থ নাটকীয় পরিণতি। বিক্রমের বিপুল প্রেমাবেগ প্রতিহত হইয়াছে সুমিত্রার স্থির অবিচল সত্যবুদ্ধি ও প্রেমের কাছে, এবং প্রতিহত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে দুর্দম হিংসায় ও হিংস্রতায়; যে-প্রেম আঘাত করিতেছিল নিজেকে, সে-প্রেম প্রতিহত হইয়া এইবার আঘাত করিল সকলকে, তাহার মধ্যে নাই ক্ষমা, নাই বিচারবুদ্ধি। নাটকীয় সম্ভাবনা এই রূপান্তরের মধ্যে নিহিত: কিন্তু তাহার পরেই ইলা ও কুমারের যে গীতিকাব্যিক উপাখ্যান নাটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহা যে শুধু অলীয় তাহাই নয়, নাটকীয় সম্ভাবনার দিক হইতে অবান্তরও বটে।

যাহাই হউক, কুমারসেন সুমিত্রার স্নেহানুরোধে, এবং আপন হৃদয়ের ঔদার্যে বিক্রমকৃত অপমানের কোনও প্রতিশোধ না লইয়াই কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিলেন। শংকরের তীব্র ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ তাঁহাকে টলাইতে পারিল না, সুমিত্রার সঙ্গে তাঁহার যে চিরজীবনের প্রাণের সম্পর্ক, তাঁহাদের স্নেহভালবাসার মধ্যে যে 'পিতৃমাতা-বিধাতার আশীর্বাদ-ঘেরা পুণ্য স্নেহতীর্থখানি' গড়িয়া উঠিয়াছে। বিক্রমকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে গিয়া 'বাহির হইতে হিংসানলশিখা আনিয়া' তিনি সেই স্নেহতীর্থের কল্যাণভূমিকে 'অঙ্গার মলিন' করিতে চাহিলেন না।

এইখানে চতুর্থ অঙ্কের ছেদ পড়িয়াছে। এই পর্যন্ত ঘটনাস্রোতের বেগ কোথাও খুব দ্রুত নয়, অতি ধীরে ধীরে সমস্ত কাহিনীটি একটু একটু করিয়া দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের পরে সমস্ত ঘটনাটির পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা সহজে অনুমান করিয়া ওঠা যায় না। এই পরিণতির ইঙ্গিতও এ পর্যন্ত কোনও চরিত্র বা ঘটনার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। সেই জন্যই পঞ্চম অর্থাৎ সর্বশেষ অঙ্কটিতে ঘটনাস্রোতের বেগ খুব দ্রুত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে; একটি দৃশ্যের পর আর একটি দৃশ্য অত্যন্ত চঞ্চল ও শৃঙ্খলাবিহীন ঘটনাবর্তের ভিতর দিয়া দর্শকের সমগ্র দৃষ্টি ও

অনুভূতিকে অতি দ্রুত পদক্ষেপে শেষ পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে, কোথাও বিরামের অবসর দেয় নাই। এই হিসাবে "রাজা ও রানী" ঠিক পরিচিত নাট্যভঙ্গিমাকে আশ্রয় করে নাই। এই দ্রুত ঘটনা সঞ্চালনের ভিতর দিয়া যে চরিত্রগুলির পরিচয় আমরা পাই তাহারা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চোখের ও মনের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়; তাহাদের কথা ও গতির মর্ম, এককথায় তাহাদের পরিচয় আমাদের মনের মধ্যে খুব স্থায়ী ও নিবিড় হইয়া আসন দাবি করিতে পারে না; যবনিকাপাতের পর মন যখন বিশ্রামের ও ভাবিবার অবসর পায়, তখনই শুধু সেই স্থায়ী ও নিবিড় পরিচয়টুকু সম্ভব হয় এবং সমস্ত নাটকের মর্মরহস্যটি আমাদের কাছে ধরা পড়িবার সুযোগ ঘটে। পঞ্চম অঙ্কের ঘটনার সংস্থান যদি এতটা দ্রুত না হইত এবং তাহার কিছুটা গতিবেগ যদি তৃতীয় বা চতুর্থ অঙ্কে ধরিয়া রাখা যাইত, বোধ হয় নাট্যাভিব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্যটুকু ধরা পড়িত না, ঘটনা-সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যরহস্যটি হয়ত আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারিত, যদিও সেই অনুপাতে নাটকের রসমাধুর্য হয়ত অনেকটা কমিয়া যাইতে বাধ্য হইত। পঞ্চম অঙ্কের নাট্যবস্তুর পরিচয় লাভ করিলেই আমার কথাটা পরীক্ষা করা সহজ হইবে। ইহার ফলে লাভ হইয়াছে এই যে, চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত নাট্য-বিষয়ের সংস্থানের মধ্যে যে শিথিল মন্থরতা লক্ষ্য করা যায়, তাহা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং সমস্ত সংহত শক্তি যেন হঠাৎ মুক্তি পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়া আপন পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিল। এ যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতায় বেশির ভাগ পথটুকু ধীরে ধীরে দৌড়াইয়া আসিয়া তারপর শেষ লক্ষ্যটি যখন নিকটতর হইল তখনই হঠাৎ সমস্ত সংহত শক্তিকে মুক্তি দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পদচালন করিয়া লক্ষ্যটির দিকে অগ্রসর হওয়া।

কুমারসেন কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিয়া পিতৃব্য চন্দ্রসেনকে বিক্রমদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জার জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু চন্দ্রসেনের মহিষী রেবতী জালন্ধর-রাজের শত্রুতাচরণ করিতে অনিচ্ছুক, কারণ, কাশ্মীর-রাজের উত্তরাধিকারী কুমারসেন রাজ্যের রক্ষক মাত্র। মহিষীর ইচ্ছা কোনও উপায়ে কুমারসেনকে সিংহাসন-বঞ্চিত করিয়া নিজের স্বামীর জন্য কাশ্মীর-রাজ্য ও সিংহাসন লাভ। সেইজন্য তিনি চাহেন জালন্ধররাজ্যের মিত্রতা।

> যুদ্ধ সজ্জা? কেন যুদ্ধ সজ্জা? শত্রু কোথা?
> মিত্র আসিতেছে। সমাদরে ডেকে আনো
> তারে! করুক সে অধিকার কাশ্মীরের
> সিংহাসন! রাজ্যরক্ষা তরে তুমি এত
> ব্যস্ত কেন! একি তব আপনার ধন?
> আগে তারে নিতে দাও, তারপর ফিরে
> নিও বন্ধুভাবে! তখন এ পররাজ্য
> হবে আপনার।

দুর্বল চিত্ত চন্দ্রসেনকে বাধ্য হইয়াই মহিষীর ইচ্ছার দাস হইতে হয়; এবং কুমারসেন যুদ্ধসজ্জার অনুমতি লইতে আসিয়া প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। চন্দ্রসেন ও রেবতী চাহিয়াছিলেন কুমারকে বন্দী করিয়া জালন্ধররাজের হাতে অর্পণ করিতে। কিন্তু কুমারসেন সুমিত্রাকে সঙ্গে করিয়া ত্রিচূড় রাজ্যে চলিয়া আসেন এবং অমরুরাজের নিকট ইলার দর্শন ভিক্ষা করেন। কিন্তু জালন্ধররাজভীত অমরু কুমারসেনকে

আশ্রয় এবং ইলার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন। ভগ্নমনোরথ কুমারসেন সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে বিক্রমদেব কাশ্মীর আক্রমণ করিতে আসিয়া চন্দ্রসেন কর্তৃক পরমাতিথ্যে গৃহীত হন এবং বিশেষ করিয়া রেবতী বিক্রমদেবের নিকট "রাজবিদ্রোহী" কুমারের শাস্তি প্রার্থনা করেন ও চরের মুখে ত্রিচূড়-রাজ্যে তাহার গোপন আশ্রয়ের সংবাদ দান করেন। বিক্রমদেব মৃগয়ার ছলে ত্রিচূড়-রাজ্যে আগমন করিলে অমরুরাজ তাঁহার হাতে তাঁহার সর্বস্ব তুলিয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'তব যোগ্য কন্যা মোর—তারে লহ তুমি' বলিয়া ইলাকেও তাঁহার হাতে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হন। পঞ্চম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে ইলা ও বিক্রমের কথোপকথনের মধ্যে নাটকের একটি অপূর্ব ইঙ্গিত অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুমিত্রার বিস্মৃতপ্রেম বিক্রম ইলার পাণি প্রার্থনা করেন, কিন্তু ইলার চিত্ত মন ভরিয়া আছে কুমারের প্রেম-স্পর্শে, তাহার ধ্যানে চিত্ত তাহার সদাজাগ্রত।

> পিতা মোর দিয়াছেন সঁপি তব হাতে,
> আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
> দাও মোরে। কত ধন, রত্ন, রাজ্য, দেশ
> আছে তব, ফেলে রেখে যাও মোরে এই
> ভূমিতলে; তোমার অভাব কিছু নাই।

আর যদি লুণ্ঠিত রত্নের মত আমাকে লইয়া যাইবেই তাহা হইলে

> তোমরা যেমন ক'রে বনের হরিণী
> নিয়ে যাও, বুকে তার তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে
> তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া
> জীবন কাড়িয়া আগে, তারপর মোরে
> নিয়ে যাও। * * * কিন্তু, মহারাজ!
> কোথা নিয়ে যাবে? রেখে যাও তার তরে
> যে আমারে ফেলে রেখে গেছে।

কে সে? এমন একনিষ্ঠ প্রেমের অধিকারী কোন্ ভাগ্যবান? বিক্রমদেব উত্তর পাইলেন, সে হইতেছে সৌভাগ্য-বঞ্চিত আশ্রয়-বিহীন কুমারসেন। কত করিয়া তিনি চেষ্টা করিলেন ইলাকে তাহার প্রেম হইতে বিচ্যুত করিতে। কিন্তু এমন একান্ত একনিষ্ঠ সর্বহারা প্রেমের কি বিচ্যুতি আছে? যে-প্রেম আত্মবিস্মৃতি ঘটায় না তাহার কি কোনও পরাজয় আছে? প্রেমস্বর্গচ্যুত বিক্রম আপনাকে বুঝি বহুদিন পরে ফিরিয়া পাইলেন, বহুদিন পরে বুঝি সত্য প্রেমজ্যোতির একটু আভাস পাইলেন ইলার চোখে মুখে, বুঝি তাঁহার উদগ্র হিংস্র যুদ্ধোন্মত্ততা শীতল হইয়া আসিল, বুঝি 'শিশির-শীতল প্রস্ফুটিত শুভ্রপ্রেমের' একটি বিন্দু লাভ করিবার জন্য, আবার সেই পুরাতন দিনগুলিকে তাহাদের সব সুখদুঃখভার লইয়া ফিরিয়া পাইবার জন্য সমস্ত অন্তর তৃষিত হইয়া উঠিল।

> কী প্রবল প্রেম! ভালোবাসো, ভালোবাসো
> এমনি সবেগে চিরদিন। যে তোমার
> হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালোবাসো।
> প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
> ধন্য হই! দেবী চাহিনে তোমার প্রেম;
> * * * *

আমারে বিশ্বাস করো, আমি বন্ধু তব ;
চলো মোর সাথে, আমি তারে এনে দেবো
সিংহাসনে বসায়ে কুমার—তাঁর হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারি। * * *
* * * . *

যুদ্ধ নাহি
ভালো লাগে। শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ।
গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে! এ সংসারে যেথা যাও, সেথা থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টি সম, পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মতো। আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ-দেশান্তরে, স্কন্ধে বহি জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ!
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্রপ্রেম শিশির শীতল।
ধুয়ে দাও প্রেমময়ি, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর, রক্ত কলুষিত।

এদিকে অরণ্যে সুমিত্রা ও কুমারসেন খবর পাইলেন, ছদ্মবেশে রাজ্যের সংবাদ নিতে গিয়া শংকর ধরা পড়িয়াছে এবং শত্রুচরেরা তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিতেছে ; জয়সেন গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া প্রজাদের উপর নৃশংস অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। কুমারসেনের কাছে জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিল,

আর ত সহেনা।
ঘৃণা হয়, এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।

সুমিত্রার ইচ্ছা দুইজনে রাজসভায় গিয়া ইহার কিছু প্রতিকার প্রার্থনা করেন, কিন্তু বন্দীভাবে ধরা দিবার চিন্তাও কুমারসেনের অসহ্য!

পিতৃ-সিংহাসনে
বসি বিদেশের রাজা দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি, একি সহ্য হবে?

তাহার চেয়ে যে মৃত্যুও ভাল! সত্যই ত মৃত্যুও ভাল। সুমিত্রারও ইহাতে কোনও দ্বিধা নেই।

বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল!
* * *
ভক্ত যারা অনুরক্ত মোর—প্রতিদিন
সঁপিছে আপন প্রাণ নির্যাতন সহি।
তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে
জীবন করিব ভোগ—একি বেঁচে থাকা!

সুমিত্রা। এর চেয়ে মৃত্যু ভালো!

কুমার। বাঁচিলাম, শুনে!
কোনোমতে রেখেছিনু তোমারি লাগিয়া
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর
নির্দোষের প্রাণবায়ু করিয়া শোষণ!
আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
যে কথা বলিব তাহা করিবে পালন
যতই কঠিন হোক।

কিন্তু তাহার আগে একবার ইলার কথা মনে পড়িল না কি? তাহার নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার কথা মনে হইয়া সমস্ত অন্তর দুর্বলতায় কাঁপিয়া উঠিল না কি? কিন্তু, এ কি বিক্রমের মোহাচ্ছন্ন প্রেম, এ কি বিচ্ছেদে দুর্বল, না মৃত্যুতে ব্যথিত!

তারে কি জানিনে আমি?
হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু
বাঁচিতে বলিত? সে আমার ধ্রুবতারা
মহৎ মৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ।

কাশ্মীরের রাজপ্রাসাদে বিচারসভা আসীন। সংবাদ আসিয়াছে কুমারসেন স্বেচ্ছায় বন্দীভাবে ধরা দিতে আসিতেছেন। সিংহাসনে বিক্রমদেব নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন, কুমার আসিলে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া পিতৃ-সিংহাসন তাহাকে দান করিবেন। বৃদ্ধ শংকরও সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, কুমারসেন বন্দীভাবে ধরা দিতে আসিতেছেন শুনিয়া লজ্জায় ও অপমানে বৃদ্ধের অন্তর ক্ষুব্ধ, মস্তক অবনত, ভাবিতেছেন, "চিরভৃত্য তব, আজি দুর্দিনের আগে মরিল না কেন?" রুদ্ধদ্বার শিবিকা দরজায় আসিয়া থামিল, বিক্রমদেব সিংহাসন হইতে নামিয়া অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এমন সময় সুমিত্রা স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া শিবিকা হইতে নামিলেন, এবং বিস্মিত স্তব্ধ বিক্রমের হাতে সেই থালা অর্পণ করিলেন—

ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধ'রে
কাননে কান্তারে শৈলে—রাজ্য ধর্ম দয়া
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জিয়া, যার লাগি
দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
লহো, মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির। আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ।

এই বলিয়াই মহিষী সুমিত্রা ভূমিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই মুহূর্তেই ইলা ছুটিয়া আসিয়া 'কুমার' 'কুমার আমার' বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, এবং বৃদ্ধ শংকরকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার মৃত্যু পথের সঙ্গী হইলেন। চন্দ্রসেন সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া 'রাক্ষসী পাপীয়সী' রেবতীকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিলেন। আর, বিক্রমদেব সুমিত্রার মৃতদেহের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া একটিমাত্র আক্ষেপোক্তি বাহির হইয়া আসিল

দেবি, যোগ্য নহে আমি তোমার প্রেমের,
তাই ব'লে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী ক'রে? ইহজন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি

ক্ষমা তব ; তাহারো দিলেনা অবকাশ
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

পঞ্চম অঙ্কে আমি যে দ্রুত ঘটনা-সংস্থানের কথা বলিয়াছি, এখন বোধ হয় তাহা কতকটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে ; "বিসর্জনে"র ঘটনা-সংস্থান ও নাট্যরহস্যের আলোচনার সময় এই কথাটা আরও স্পষ্ট হইবে। এই ঘটনা-সংস্থানকে বুঝাইবার জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই "রাজা ও রানী"র কাহিনীটিকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি ; "রাজা ও রানী", "বিসর্জন" ও "মালিনী"র নাট্যরূপটি বুঝিবার জন্যও ইহার প্রয়োজন ছিল। পাঁচটি অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যকে আশ্রয় করিয়া কি ভাবে সমস্ত নাট্য-বিষয়টি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার আরম্ভ, বিবৃতি ও পরিণতি কেমন করিয়া মনের বিভিন্ন অনুভূতির সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহা একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। এই তিনটি নাটকই মোটামুটি ভাবে প্রাচীন পঞ্চাঙ্ক নাটকের নাট্যরূপের অনুসরণ করিয়াছে ; অবশ্য, "মালিনী" "রাজা ও রানী" এবং "বিসর্জন" অপেক্ষা অনেকটা সহজ ও সাবলীল।

কিন্তু "রাজা ও রানী"র প্রত্যয়-ভাবনাটি এইবার জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। আমি পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি, বিক্রমদেবের চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া একটি সত্য, একটি 'আইডিয়া' এই নাটকটির মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যতদিন বিক্রম সুমিত্রার প্রতি প্রেমে আত্মকর্তব্য বিস্মৃত হইয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন ততদিন তিনি সত্য প্রেমের আভাস লাভ কবিতে পারেন নাই ; তারপর, একদিন সুমিত্রাকে নিজেই যখন পথে বাহির হইয়া যাইতে হইল, তখনই তাহার স্বপ্ন টুটিল, আপনাকে জানা সম্ভব হইল, এবং নিজের কর্তব্যবুদ্ধিতে তিনি জাগ্রত হইলেন। কিন্তু এ-জাগরণও সত্য জাগরণ নয় ; কারণ, যে-রাজ্যের মধ্যে তিনি জাগিলেন সে-রাজ্য একটি ক্রুদ্ধ আহত অভিমানের রাজ্য, একটা সাময়িক উন্মত্ততার রাজ্য, নিজের উদগ্র অভিমানের মধ্যে নিজেকে উদ্দীপ্ত করিয়া রাখার রাজ্য ; যেন এক মোহের আচ্ছন্নতার ভিতর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আর এক আচ্ছন্নতার ভিতর নিজকে ডুবাইয়া দেওয়া! চতুর্থ অঙ্কে রানী সুমিত্রা নিজে আসিয়াও এই নূতন আচ্ছন্নতার ভিতর হইতে আপন স্বামীকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না, বরং অপমানিত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। এত সহজে বিক্রমের ভুল ভাঙিল না ; জীবনের রহস্য প্রেমের রহস্য এত সহজে তাঁহার কাছে ধরা দিল না ; তাহার জন্য অনেকখানি মূল্য দিতে যে এখনও বাকী! যুদ্ধের পর যুদ্ধ তিনি জয় করিতেছেন, কিন্তু যাহাকে জয় করিবার জন্য এ যুদ্ধ, তাহাকে তিনি পাইতেছেন কোথায়? জীবনের যে-সন্ধান লাভের জন্য এই উন্মত্ত অভিযান, সে-সন্ধান কোথায়? এই রহস্যটিকে উদ্ঘাটিত করিবার জন্য কবিকে অনেকখানি কৌশল অবলম্বন করিতে হইল, অনেকগুলি জীবনের বিকাশকে বিক্রমের কাছে বলি দিতে হইল, বিকৃত করিতে হইল। রেবতীকে এমন করিয়া দেখাইতে হইল, এমন 'হিংস্র', এমন 'নরকাগ্নিশিখার' মতন করিয়া ফুটাইতে হইল, যাহাতে 'এতদিন পরে' বিক্রম নিজের 'শাণিত ক্রূর বক্র' হিংসার প্রতিমূর্তিখানা দেখিতে পাইলেন 'এই রমণীর মুখে' ; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিলেন,

এ হিংসা আমার
চোর নহে, ক্রূর নহে, নহে ছদ্মবেশী।
প্রচণ্ড প্রেমের মত প্রবল এ জ্বালা
অভ্রভেদী সর্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ দুর্নিবার!

এত জ্বালা বুকে লইয়া কি মানুষ কখনও আপনার সন্ধান জানিতে পারে, প্রেমের মধুর রহস্য আস্বাদন করিতে পারে? সেই জন্য ইলাকে সুদীর্ঘ বিরহ দুঃখ সহিতে হয়, পরহস্তে সমর্পণের যে সুদুঃসহ লজ্জা তাহা বহন করিতে হয়। ইলার এই সর্বত্যাগী মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের পরিচয়ের সম্মুখে বিক্রমের আচ্ছন্নতা যেন সূর্যোদয়ে কুয়াশার মত কোথায় উবিয়া গেল, তাহার সমস্ত চৈতন্য এক মুহূর্তে যেন ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার পরও প্রেমের রহস্য, জীবনের রহস্য যে এখনও অনেক দূরে, এখনও যে তাহার জন্য অনেকখানি মূল্য দেওয়া বাকী। যে দুঃখের ও অনুতাপের কষ্টিপাথরে প্রেমের পরীক্ষা দিতে হয়, জীবনের পরিচয় লাভ করিতে হয়, সে দুঃখ লাভ হইল কি? আক্ষেপ অনুতাপের আগুনে নিজেকে পোড়ান হইল কোথায়? কুমারসেন সেই পরিচয়, সেই পরীক্ষা প্রতিদিন দিতেছেন বলিয়াই না তিনি আজ নির্বাসিত হইয়াও পুজিত এবং সমাদৃত, সকল পরাজয়ের ভিতরও সর্বজয়ী; আর তিনি জয়ী হইয়াও একান্ত পরাজিত, সকল সাফল্যের অধিকারী হইয়াও ব্যর্থতার বেদনায় ভারাক্রান্ত, ইহা অপেক্ষা নিষ্করুণ আর কি হইতে পারে? সেইটুকু বুঝাইবার জন্য আত্মদান করিতে হইল কুমারসেনকে, এবং সর্বোপরি সুমিত্রাকে। ইলার প্রেম কুমারসেনকে মহৎ মৃত্যুর দিকেই পথ দেখাইয়া দিল, তাহাকে নিজের কাছে কোন সংকীর্ণ বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিল না, তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া মুক্তি দিয়াই তবে উভয়ে উভয়কে পাওয়া সত্য হইল। আবার, "তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে", এই সত্যটাই আপনাকে ব্যক্ত করিল; একেবারে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া না দিলে যে সর্বস্বকে ফিরিয়া পাওয়া যায় না, এই কথাটিই কুমারসেন তাহার সমস্ত জীবন দিয়া বিক্রমকে বুঝাইয়া গেলেন। ইলা তাহার নিজেকে বঞ্চিত করিয়া তাহার জীবনের চাইতেও অধিক স্বামীকে হারাইয়া এই সত্যটাকেই স্বীকার করিল এবং বিক্রমকে তাহার সন্ধান দিল। আর সুমিত্রা! সে ত নিজের দুর্বিষহ দুঃখ ও অপমান মাথা পাতিয়া লইয়া আপনার প্রিয়তমকে জীবনের রহস্য, প্রেমের রহস্যের সন্ধানই দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই; শেষ পর্যন্ত সেই প্রিয়তমের প্রেমেই প্রিয়তমকে ছাড়িয়া যাইতে হইল, পরিপূর্ণ প্রেমজ্যোতির অরুণালোকের মধ্যে তাহার স্বামীকে বাঁচাইবার জন্যই তাহাকে আত্মদান করিতে হইল, তবেই বুঝি বিক্রমের ভুল ভাঙিল, জীবনের সন্ধান তিনি লাভ করিলেন! এ দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন তাহার বাকী ছিল, সুমিত্রাকে আত্মদান করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে হইল, নইলে কিছুতেই তাহা সম্ভব হইত না।

সমগ্র নাটকটিতে প্রায় সবগুলি চরিত্রই সুপরিস্ফুট, বিশেষ করিয়া বিক্রম ও সুমিত্রার, ইলা ও কুমারসেনের, এবং বৃদ্ধ ভৃত্য শংকরের। ঐতিহাসিক আবেষ্টনটিও কোথাও অস্পষ্ট হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু ইলা ও সুমিত্রার পরিচয় যতটা নিবিড় করিয়া আমরা পাই, এমন আর কাহারও নহে। একথা খুব সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের নাট্যে ও কাব্যে, গল্প ও উপন্যাসে নারী চরিত্র, নারী জীবনের রহস্য যেমন করিয়া ফুটিয়াছে, পুরুষচরিত্র তেমন করিয়া ফুটিবার অবসর পায় নাই। ইহার হেতু কি জানি না, তবে মনে হয়, আমাদের দেশে ও সমাজে নারীজীবনের যে সহজ দুর্বলতা, তাহা রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়ের দরদ ও সহানুভূতিকে অতি সহজেই আকর্ষণ করিয়াছে এবং একেবারে তাঁহাকে অন্তঃপুরের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। এই দুর্বলতাকে তিনি কোথাও কঠোর হস্তে আঘাত করেন নাই, বরং তাহার উপর নিজের কোমল হৃদয়টি বুলাইয়া দিয়া সর্বত্রই নারীজীবনের যেটুকু নীরব ত্যাগের দিক, স্নেহের দিক, মহত্ত্বের দিক, সেই দিকটাই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া সমস্ত দুর্বলতাকে আড়াল

করিয়া দিতে চাহিয়াছেন ; ইহার ফলে নারীজীবনের পরিচয় আমাদের কাছে খুব নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু কোথাও কোথাও বোধ হয় কবির প্রধান নারী চরিত্রগুলি একটু বৈচিত্র্যবিহীন হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে ; তাহাদের ভাব প্রকাশের মধ্যে সৃষ্টির বিভিন্নতা একটু কম। সর্বত্রই তাহারা একটা করুণ মাধুর্য-বিমণ্ডিত রাজ্যের মধ্যে বাস করেন এবং প্রায় সর্বদাই তাহারা তাহাদের ত্যাগের ও প্রেমের মধ্য দিয়া নিজেদের ও পরকে অভিব্যক্ত করিয়া যান। এই কথা সর্বত্র সত্য হয়ত সমভাবে নয়, কিন্তু ইলা ও সুমিত্রার জীবনে এই পরিচয়ই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুমিত্রা একটু ধীর গম্ভীর, জীবনের কর্তব্যে জাগ্রতচিত্ত রানী ; কিন্তু ইলা ও সুমিত্রা দুজনেই প্রেমে অবিচল, একনিষ্ঠ, এবং দুজনেই নিজেদের সকল ভোগ ও সহজ আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং সুমহান ত্যাগকে বরণ করিয়া নিজের এবং নিজের প্রিয়তমের জীবনকে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে সুমিত্রার ত্যাগ যতটা স্বেচ্ছায়, যতটা মহৎ মর্যাদায়, ইলার ত্যাগের মধ্যে তার আভাস ততটা নাই। সুমিত্রা ও কুমারসেন মহৎ, কিন্তু ইলা মধুর ; সে হয়ত আমাদের পূজা ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু আমাদের ভালবাসাকে টানিয়া লয়। তবু যদি শেষ পরিণতির দৃশ্যটিতে তাহার পরিচয় আমরা আর একটু বেশি করিয়া পাইতাম! কবি সে সুযোগ আমাদের দেন নাই। সে শুধু একবার একটু আকস্মিক ক্ষণিকার মত দেখা দিয়াই নিভিয়া যায়, তাহা তাহার কোনও পরিচয় নয়। নাট্য-কৌশলের দিক হইতে বোধ হয় এখানে একটু ত্রুটি আছে ; শেষ দৃশ্যে ইলাকে মঞ্চের উপর আনিয়া মূর্ছা না ঘটাইলেও কিছু ক্ষতি হইত না, বরং শোভন হইত বলিয়াই মনে হয়। পঞ্চম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে তাহার যে-পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট ছিল। শেষ দৃশ্যটিতে ইলা আমাদের চোখের আড়ালে থাকিলে আমাদের মনের অন্তরালে তাহার জন্য যে করুণ অনুভূতিটি রসসিক্ত হইয়া উঠিতে পারিত, তাহার আকস্মিক উপস্থিতি ও মূর্ছা সেই অনুভূতিটিকে একটু ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

একটা কথা অবান্তর হইলেও এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। বিদেশী কাশ্মীরী কর্মচারীদের অত্যাচারের দৃশ্যের উল্লেখ করিয়া টমসন্ সাহেব বলিয়াছেন, "It will be at once grasped that the play has a double meaning ; it has a political reference, which helps to explain its very considerable measure of popularity on the stage." "রাজা ও রানী"র সমগ্র বস্তুটি আমি বিশদ ভাবেই বিবৃত করিয়াছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই তাহার ভিতরের মর্মার্থটিকেও টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু কোথাও এই "political reference" এতটুকুও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কি? না, সমগ্র নাটকটির মধ্যে তাহার কোনও মূল্য আছে? ঘটনার আবেষ্টন ও সংস্থানের জন্যই এই 'বিদেশীর অত্যাচার' আখ্যানটুকুর আশ্রয় লইতে হইয়াছে ; চরিত্র-বিকাশের ক্ষেত্রে, নাট্য-রহস্যের ক্ষেত্রে মূল্য তাহার কতটুকু?

"রাজা ও রানী"র অল্প কিছুদিন পরেই "বিসর্জন" রচিত হইয়াছিল। "বিসর্জন" রবীন্দ্রনাথের ও শিক্ষিত বাঙালীর প্রিয় নাটক ; বহুবার নানাস্থানে সাফল্যে অভিনীত হইয়াছে এবং আজ ইহার আখ্যানভাগ সকলের কাছেই অত্যন্ত পরিচিত। "বিসর্জনে"র ঘটনাবস্তুর বিন্যাস "রাজা ও রানী" নাটকের ঘটনা-বিন্যাসেরই অনুরূপ ; "রাজা ও রানী"র মতনই ইহারও রচনা অমিত্রাক্ষর ছন্দে, শুধু পৌরগণের দৃশ্যগুলি গদ্যে। "রাজা ও রানী"র প্রথম চারিটি অঙ্কে ঘটনাস্রোতের একটা শিথিল মন্থরতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু "বিসর্জনে"

তাহার আভাসও কিছু পাই না। প্রথম হইতেই ঘটনার পর ঘটনা এমন কৌশলে সুবিন্যস্ত হইয়াছে যে, কোথাও কোন ফাঁক নাই, সর্বত্র নাটকীয়-সংস্থান অত্যন্ত ঘন ও নিবিড়; কিন্তু এ কথাটা স্বীকার করিতে হইলে খুব সংক্ষেপে বিষয়-বস্তুটির একটু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা, গুণবতী তাঁহার মহিষী। রঘুপতি রাজপুরোহিত, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের তেজস্বী ব্রাহ্মণ। এই মন্দিরেব সেবক রঘুপতির পালিত একটি রাজপুত যুবক, নাম তার জয়সিংহ। অপর্ণা একটি সরলা কোমলহৃদয়া বালিকা। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে দেবীর পুজায় পশু বলিদান বহুবৎসরের চিরাচরিত প্রথা; কেহ কোনদিন এই প্রথার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করে নাই। প্রথম প্রতিবাদ জানাইল ভিখারিণী বালিকা অপর্ণা। বালিকার স্নেহের পুত্তলি ক্ষুদ্র একটি ছাগশিশুকে 'মায়ের' কাছে বলি দিবার জন্য জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া আসা হইয়াছে: আর বালিকা চোখের জলে তাহার আহত হৃদয়ের দীপ্তি জ্বালিয়া রাজার কাছে ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। সেই করুণাকাতর কণ্ঠস্বরের প্রতিবাদ মন্দিরের সেবক জয়সিংহের ভক্তহৃদয়কে এক অপরূপ বেদনায় ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে এবং আজ সর্বপ্রথম তাহাকে বিশ্ব জননীর প্রেমে সন্দেহাকুল করিয়াছে। সেইদিন হইতে গোবিন্দমাণিক্য নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন, মন্দিরে মায়ের পুজায় জীববলি হইতে পারিবে না। পুরোহিত রঘুপতি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; ধর্মের বিনাশ আশঙ্কা করিয়া রাজ্যের মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ, যুবরাজ নক্ষত্র রায় ও প্রজাবৃন্দ আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। সংশয়াকুলচিত্ত জয়সিংহও রাজার আদেশ শুনিয়া বিচলিত হইল, কিছুতেই সে-আদেশকে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সংশয় নাই শুধু রাজার মনে, অন্তরের মধ্যে তিনি ভগবানের স্থির আদেশ লাভ করিয়াছেন, তিনি জানিয়াছেন,

> মানবের
> বুদ্ধি দীপ সম, যত আলো করে দান,
> তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া, স্বর্গ
> হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
> টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই নাই।

এদিকে ব্রাহ্মণ রঘুপতি তাঁহার ক্রোধ সকল দিকে ছড়াইতেছেন, সকলকে রাজার বিরুদ্ধে, রাজার আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছেন; পুরবাসীরা রাজাদেশ অমান্য করিয়া মন্দিরে বলি লইয়া আসিতেছে, আর রাজা নিরুপায় হইয়া সৈন্যবলের সাহায্যে সে-বলি ঠেকাইয়া রাখিতেছেন। জয়সিংহ পায়ে ধরিয়াও রাজাকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না। রঘুপতির উন্মত্ততাও ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, যুবরাজ নক্ষত্র রায়কে তিনি গোবিন্দমাণিক্যের হত্যায় প্ররোচিত করিলেন এবং জয়সিংহকেও বুঝাইলেন, 'রাজরক্ত চাই, দেবীর আদেশ!' জয়সিংহের সন্দেহ সংশয় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল; সত্যই কি মা এত নিষ্ঠুর, সত্যই কি তিনি রক্তপিপাসু! "কিন্তু রাজরক্ত! ছি ছি! ভক্তি-পিপাসিতা মাতা, তাঁরে বল রক্ত-পিপাসিনী"! তবে কি বলি বন্ধ হইবে? হউক। কিন্তু না, তাহা হইতেই পারে না, তাহা হইলে যে গুরু রঘুপতির প্রতি অবিশ্বাসী হইতে হয়, প্রাণ থাকিতে তাহা সম্ভব নয়। "রাজরক্ত চায় যদি মহামায়া, সে রক্ত আনিব আমি! ভ্রাতৃহত্যা দিব না ঘটিতে।" কিন্তু সংশয় যে তাহার কিছুতেই কাটে না, আর অপর্ণা যে তাহার সংশয় আরও বাড়াইয়া তোলে! রঘুপতি বলেন অপর্ণা হইতে দূরে থাকিতে, কিন্তু তাহাকে দূরে রাখিতে যে জয়সিংহের বুকে বেদনার তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। তবুও গুরু বড়, গুরুর কথাই সত্য।

তাই দেব গুরুদেব।
চলে যা অপর্ণা! দয়ামায়া স্নেহ প্রেম
সব মিছে। সরে যা অপর্ণা! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবে দয়াময় মৃত্যু! চলে যা অপর্ণা!

এমনই মর্মন্তুদ বেদনা বুকে লইয়াও সে অপর্ণাকে দূরে রাখিতেই চায়, কিন্তু অপর্ণা বলে, "কেন যাব?" এতটুকু অভিমান তাহার হয় না।

অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই
অভিমান।

কিন্তু জয়সিংহ পারিল না রাজ-রক্ত আনিতে, মন্দিরের মধ্যে রাজাকে হত্যা করিতে গিয়া ছুরি তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল, পারিল না! রঘুপতির ক্রোধ আবার জ্বলিয়া উঠিল! আবার জয়সিংহকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল, "আমি এনে দিব রাজ-রক্ত শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।" রঘুপতি তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারই চক্রান্তে মন্দিরের মধ্যে প্রস্তর-প্রতিমার মুখ ফিরিয়া যায় এবং সমস্ত প্রজা ভীত ও শঙ্কিত হইয়া উঠে। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য নির্বিকার, চিত্ত তাঁহার অবিচল। আবার অপর্ণা ও জয়সিংহ। জয়সিংহকে অপর্ণা টানিতেছে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের করুণায় ভালবাসায়, সমস্ত অন্ধ আচারের মরুবালিরাশির ভিতর হইতে অখণ্ড নিষ্কলুষ নিঃসংশয় প্রেমের রাজ্যের দিকে সে তাহাকে ইঙ্গিত করিতেছে, কিন্তু আর একদিকে তাহাকে টানিতেছে গুরু রঘুপতির নিষ্করুণ স্নেহ, তাহার সুকঠোর আদেশ। এই দুই সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া জয়সিংহের অন্তর প্রতি মুহূর্তে বেদনায় উৎপীড়িত হইতেছে। রাজহত্যার চক্রান্তে লিপ্ত এই অপরাধে বন্দী হইয়া এদিকে রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের বিচার সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, বিচারে 'অষ্টবর্ষ নির্বাসন' দণ্ড হইয়াছে, দুই দিন পরে নির্বাসনে যাইতে হইবে। এতদিন পর রঘুপতি আজ বিচলিত হইয়াছেন,

গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব!

* * *

অন্তরেতে সে দীপ্তি নিভেছে, যার বলে
তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্যের জ্যোতি
রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র পড়িলে খসি
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ!

কিন্তু অন্তরের হিংসা বহ্নি আজও তাঁহার নিভে নাই। 'রাজ-রক্ত চাই দেবীর'—একথা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া জয়সিংহের মুখ হইতে তৃতীয়বার এই প্রতিজ্ঞা বাহির করিয়া লইলেন—"রাজ-রক্ত চাহে দেবী; তাই তাঁরে এনে দিব।" এদিকে নক্ষত্র রায় গোপনে মোগল-সৈন্যবাহিনীর সাহায্য লইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করিতেছেন। ভাই-এর বিশ্বাসঘাতকতায় বিচলিত গোবিন্দমাণিক্য কি করিবেন বুঝিলেন না। মন্দিরের বাহিরে ঝড় উঠিয়াছে, পূজোপকরণ লইয়া রঘুপতি মন্দিরে প্রবেশোন্মুখ, ঝড়ের উন্মত্ততা তাহার নিজের মধ্যেও হিংস্র উন্মত্ততা জাগাইয়া তুলিয়াছে। এমন সময় অপর্ণা জয়সিংহের অন্বেষণে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু রঘুপতি তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া

দিলেন—"দূর হ', দূর হ' মায়াবিনী ! জয়সিংহে চাস্ তুই ! আরে সর্বনাশী মহাপাতকিনী"। অপর্ণা চলিয়া গেল। একটু পরেই জয়সিংহ দৌড়িয়া আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ-রক্ত কই" ! জয়সিংহ স্থির অকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,

আছে আছে ! ছাড় মোরে !
নিজে আমি করি নিবেদন।—রাজ-রক্ত
চাই তোর দয়াময়ী জগৎপালিনী
মাতা। নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা।—আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে !
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা। এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ত তৃষাতুরা।

এই বলিয়া নিজেই সে নিজের বুকে ছুরি আমূল বসাইয়া দিল এবং মুহূর্তেই ধরাশায়ী হইল ! কিন্তু জয়সিংহ এ কি সর্বনাশ করিয়া বসিল ! সে যে রঘুপতির 'একমাত্র প্রাণ, প্রাণাধিক জীবনমন্থন-করা ধন !' তাহাকে ছাড়িয়া রঘুপতি বাঁচিবে কি করিয়া ?

"জয়সিংহ ! বৎস মোর গুরুবৎসল !
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি ; অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব দূর হয়ে যাক,
তুই আয় !"

এমন সময় ছুটিয়া আসিয়া অপর্ণা দেখিল জয়সিংহের মৃত রুধিরাক্ত দেহ—"ফিরে দে, ফিরে দে ! ফিরে দে !" কিন্তু ফিরাইয়া দিবে কে ? প্রতিমা যে পাষাণ !!

জয়সিংহকে হারাইয়া রঘুপতির এতদিনে চৈতন্যলাভ হইয়াছে ! দেবী ত জড় পাষাণের স্তূপ ! সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব তাহার পায়ে কাঁদিয়া মরিতেছে, তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। আর 'মা বলিয়া ডাকে যত জীব—হাসে তত ঘোরতর অট্টহাস্য নির্দয় বিদ্রূপ।' মহারাণী গুণবতী মন্দিরে দেবীর চরণে পূজা লইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দেবী কোথায় ? রঘুপতি উত্তর করিল,

দেবী বল
তারে ? এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী
তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী ? মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিষ্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি
মূঢ় পাষাণের পদে ! দেবী বল তারে ?
পুণ্য রক্ত পান করে সে মহা রাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে !

দেবী নাই, দেবী নাই, দেবী কোথাও নাই সেই মন্দিরে ! অপর্ণা আসিল সেই মন্দিরে দেবীর মূর্তি ধরিয়া।

পাষাণ ভাঙিয়া গেল, জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা !
জননী অমৃতময়ী।

এই ত সংক্ষেপে নাট্য-বস্তুর বিবৃতি। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ঘটনার সংস্থান কোথাও এতটুকু শিথিল হইয়া উঠিতে পারে নাই ; একটির পর একটি, প্রত্যেকটি আখ্যান-অংশ এমনই স্থির অথচ সচল গতিতে চলিয়া গিয়াছে যে, আমাদের বোধ ও দৃষ্টি প্রতি পদেই একটি নূতন অনুভূতির আস্বাদন লাভ করিয়া চলে। সমস্ত নাটকটির উপর দিয়া একটা ক্রুদ্ধ বাতাস যেন হু হু করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। রঘুপতির জ্বালাময়ী কথাগুলি যেন তাহার এক একটা ঝাপ্‌টা, সে-বাতাসের গতি থাকিয়া থাকিয়া বাড়িয়া বাড়িয়া চলে, তাহার মুখে জয়সিংহের দ্বিধা সংশয় বার বার উড়িয়া যায়, বার বার অপর্ণা আসিয়া বিদ্যুতের মত তাহার চিত্তকে আলোকিত করে। শুধু গোবিন্দমাণিক্য ঝড়ের মুখে বিরাট মহীরুহের মত দাঁড়াইয়া থাকেন। কিন্তু গতি সংহত করিবার শক্তি তাঁহার কোথায় ? জয়সিংহ যেখানে বুক পাতিয়া দিয়া ঝড়ের বেগ থামাইল সেইখানে নাটকের গতিবেগও সংহত হইল, তাহার পর ধীরে ধীরে শান্তিও নামিয়া আসিল। এই যে সমগ্র নাটকটির ভিতর এই গতিবেগের সঞ্চার ইহার অন্য কারণও আছে, সে কারণটি নাটকীয় ভাববস্তুর সঙ্গে জড়িত। "বিসর্জন" আমাদের ধর্মের একটা অর্থবিহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ প্রথম দেখা দিয়াছে একটি বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে এবং সেই প্রতিবাদকে ভাষা দিয়াছেন গোবিন্দমাণিক্য। নাটকটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে এই সংগ্রাম সর্বত্র মুখর হইয়া আছে, জয়-পরাজয়ের মীংমাসা না হওয়া পর্যন্ত তাহার বিরাম নাই। এই সংগ্রাম আরও জীবন্ত হইয়াছে ব্রাহ্মণ রঘুপতির চরিত্রে ; তাঁহার জলন্ত বিশ্বাস যেন আগুন হইয়া তাঁহার কথার মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই দুই বিরোধী সমস্যাই নাটকের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বকে আগাগোড়া জাগাইয়া রাখিয়া উহাকে স্পন্দিত ও জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। কি মনের, কি বাহিরের, এতখানি দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের আর কোন নাট্যেই এমন জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠে নাই, এই হিসাবে "বিসর্জন" অতুলনীয়। জয়সিংহের মনের মধ্যে যে সংশয়ের নিষ্করুণ দ্বন্দ্ব, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব চরিত্র-বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, খুব কম নাট্যেই তাহার তুলনা আছে। আর, কি জয়সিংহ, কি রঘুপতি, কি গোবিন্দমাণিক্য, কি অপর্ণা, ইহাদের মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম তাহা মনের মধ্যেই শুধু লীলায়িত হয় নাই, বাহিরের কথার গতিভঙ্গি ও কর্মের মধ্যেও তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। চিত্তের ও কর্মের দ্বন্দ্বগতির এমন অপূর্ব সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের আর কোনও নাটকেই এতটা সম্ভব হয় নাই। "বিসর্জন" যে অভিনয়-সাফল্য লাভ করিয়াছে, ইহাই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ।

ভাববিকাশের দিক হইতেও "বিসর্জন" প্রতি মুহূর্তে লীলা-চঞ্চলিত। প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্রেই একটা সংশয়ের চঞ্চলতা, একটা সংগ্রামের ক্ষুব্ধতা যেন দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে। এই সংশয় ও সংগ্রাম সকলের চেয়ে প্রবল জয়সিংহের চরিত্রে! প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই এই সংশয় প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে, এবং সে-সংশয়কে জাগাইয়াছে অপর্ণা

আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারিনে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের—দয়া নাই বিশ্বজননীর।

এই যে সংশয় জাগিল এর নিবৃত্তি আর কোথাও হইল না, হইল শুধু মৃত্যুর মধ্যে। জয়সিংহের জীবনের সমস্তগুলি দিন তাহার শুধু নিষ্করুণ দ্বিধা সংশয়ের মধ্যে কাটিল, চিত্ত শতধা দীর্ণ হইল, প্রেমের মধ্যে শান্তির মধ্যে প্রতি মুহূর্তে আশ্রয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া বার বার তাহাকে গুরুর আদেশে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। অপর্ণা তাহাকে প্রতিদিন মুক্ত জীবনের প্রেম ও শান্তির মধ্যে টানিতে চাহিল, আর প্রতিদিন ভালবাসিতে চাহিয়াও নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া কাঁদিয়া মরিল। গুরুর ইচ্ছার পদতলে, তুচ্ছ আচার ও সংস্কারের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিতে হইল। এমন সংশয়-নিপীড়িত আপাত-ব্যর্থ জীবন কাহার! এমন করিয়া নিজে মৃত্যুকে বরণ করিয়া পরকে জীবনের সন্ধান দিয়া যায় কে? অথচ নিজের জীবনের সংশয় শেষ পর্যন্ত তাহার ঘুচিল না। শেষ পর্যন্ত একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যেই তাহাকে জীবন বিসর্জন করিতে হইল। মন্দিরের দেবী কি সত্য, না অন্তরের বিশ্বাস সত্য; গুরুর আদেশ বড়, না প্রেমের আহ্বান বড়; সংস্কার বড়, না হৃদয় বড়? অপর্ণা তাহাকে শিখাইয়াছে, অন্তরের বিশ্বাসই সত্য, প্রেমের আহ্বানই বড়, হৃদয়ের নির্দেশই অমোঘ; কিন্তু পিছন হইতে টানিয়াছে মন্দিরের দেবী আজন্মের সংস্কার, গুরুর আদেশ, এবং শেষ পর্যন্ত ইহাদেরই নিষ্করুণ বিধানের নিচে তাহাকে আত্মবিসর্জন করিতে হইয়াছে। এমন শূন্যতার মধ্যে এমন একটা জীবনের বিসর্জন, ইহাই সমগ্র নাটকটিকে একটি বিরাট শূন্য ব্যর্থতায় একটি নিষ্করুণ বেদনার ভারে ক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

> দেবি, আছ, আছ তুমি। দেবি, থাক তুমি।
> এ অসীম রজনীর সর্বপ্রান্তশেষে
> যদি থাক কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে
> ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বলো মোরে,
> 'বৎস আছি'।—নাই, নাই, নাই, দেবী নাই।
> নাই? দয়া করে থাকো, অয়ি মায়াময়ি
> মিথ্যা, দয়া কর্‌, দয়া কর্‌, জয়সিংহে,
> সত্য হয়ে ওঠ। আশৈশব ভক্তি মোর
> আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
> এত মিথ্যা তুই?

এই যে আক্ষেপ, এ আক্ষেপের কোনও সান্ত্বনা আছে, না ইহার বেদনার কোনও সীমা আছে? কিন্তু, সত্যই কি তাহার জীবন ব্যর্থ, সত্যই কি তাহার আত্মদান মানুষকে কোনও মহত্তর সত্যের দিকে ইঙ্গিত করিয়া যায় নাই? এত বড় বিসর্জন কি মানুষের অন্ধকার চিত্তপুরীতে একটি কক্ষও আলোকিত করে নাই!

করিয়াছে, রঘুপতিকে সে জীবনের সন্ধান দিয়া গিয়াছে; মানুষের একটা অন্ধ আচার ও সংস্কারকে চূর্ণ করিয়া তাহাকে সত্যের জ্যোতির্ময় আলোকরেখার দিকে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছে। রঘুপতি নিষ্করুণ, কিন্তু রঘুপতি ক্রূর, কুটিল নহে; তাহার বিশ্বাস ভুল হইতে পারে, কিন্তু সে নিজেকে বঞ্চনা করে নাই, সত্যই সে বিশ্বাস করে দেবী চাহেন বলি, জীবরক্ত ছাড়া তাঁহার তৃষ্ণা মিটে না। ইহাই আজন্মের সংস্কার, এই সংস্কারের জালের মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখিয়াই সে তাহার সার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যের গর্ব তার প্রদীপ্ত, তাহার অপমান, তাহার ক্ষমতার হ্রাস তিলমাত্রও সে সহিবে না; নিজের ও দেশের চিরাচরিত আচার ও সংস্কারকে কিছুতেই সে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না, যত কঠোর

হউক রাজার আদেশ। তাহার বিরুদ্ধে যে উপায়, যে চক্রান্তই তাহাকে অবলম্বন করিতে হয়, সে তাহা করিবেই, কর্তব্যবিচ্যুতি সে কিছুতেই ঘটিতে দিবে না।

আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খ'সে যায় রাজহস্ত হ'তে
মুকুট ধুলায় পড়ে লুটে।

এমন প্রচণ্ড তাহার গর্ব! এই গর্বই তাহাকে রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবার যুক্তি দেয়, এই গর্বই জয়সিংহকে বার বার বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়া রাজরক্ত আনিতে পাঠায়। এই গর্বই তাহার মানব-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ প্রীতি দয়া মায়া ভালবাসাকে উৎখাত করিয়া সমস্ত জীবনটাকে শুধু একটা ধূ ধূ করা ভয়াল তৃষ্ণার্ত মরুভূমি করিয়া তোলে। পাপ কি, পুণ্য কি সে তাহা ভালই জানে; সত্য কি, মিথ্যা কি তাহাও তাহার অজ্ঞাত নয়, কিন্তু আত্মাভিমানের কাছে সব খর্ব হইয়া যায়, সত্য মিথ্যা হইয়া যায়, মিথ্যা সত্যের মুখোশ পরিয়া উপস্থিত হয়, পাপপুণ্যের ভেদাভেদ চলিয়া যায়, শুধু জাগিয়া থাকে প্রচণ্ড প্রদীপ্ত নিষ্করুণ অহং। কিন্তু দ্বন্দ্ব কি তাহার চিত্তেও নাই? আছে, এই নিষ্করুণ হৃদয়ের এক কোণে একটু স্নেহের উৎস আছে। জয়সিংহকে সত্যই রঘুপতি ভালবাসে, তাহাকে হারাইবার চিন্তাও সে সহিতে পারে না, অপর্ণা তাহার প্রেমে জয়সিংহকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে, ইহা তাহার অসহ্য।

সত্য করে বলি বৎস তবে। তোরে আমি
ভালবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
শিশুকাল হ'তে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে।

অন্যত্র

বৎস তোল মুখ, কথা কও একবার
প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই।

ইহা রঘুপতির ছলনা নয়। সত্যই রঘুপতি জয়সিংহকে ভালবাসে। কিন্তু সে ভালবাসাও যে আত্মাভিমানেরই তৃপ্তি! কিন্তু এই যে আত্মাভিমান, এই যে প্রচণ্ড গর্ব, ইহাকে চূর্ণ করিয়া ধুলায় লুটাইতে না পারিলে যে রঘুপতির মুক্তি নাই, জীবনের রহস্য, ধর্মের রহস্য যে সে জানিল না। এ অভিমান চূর্ণ করিল তাহারই স্নেহের পুত্তলি জয়সিংহ, তাহারই নিষ্ঠুর গর্বিত অন্ধ উন্মত্ত খেয়ালের চরণে নিজেকে বিসর্জন দিয়া; আর জীবনের রহস্য, ধর্মের রহস্য জানাইল অপর্ণা, তাহার বালিকা-হৃদয়ের সহজ দ্বিধাবিহীন প্রেম ও বিশ্বাসের মধ্যে তাহাকে আশ্রয় দান করিয়া।

কিন্তু রঘুপতির চরিত্রের শেষ পরিণতি যেন একটু অকস্মাৎ ঘটিয়াছে, এবং তাহার পূর্বাপর দৃপ্ত অনম্য চরিত্রের সঙ্গতিকে যেন একটু ক্ষুণ্ন করিয়াছে। পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পর রঘুপতির পরিচয় যদি আমরা না পাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এই অসঙ্গতিটুকু আমাদের চোখে পড়িত না। যেখানে আছে, 'বৎস মোর গুরুবৎসল! ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর কিছু নাই চাই; অহংকার অভিমান দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক্। তুই আয়!' সেইখানেই যদি রঘুপতির পরিচয়ের সমাপ্তি ঘটিত তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতাম, তাহার জীবনের ক্রুদ্ধ অমাবস্যা-রাত্রির অবসান হইয়াছে, শান্ত উষার অরুণোদয়ের আর বাকী নাই; নাটকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু পঞ্চমাঙ্কের

চতুর্থ দৃশ্যে তাহার যে পরিচয় আমরা পাই তাহাতে মনে হয়, যেন সমগ্র জীবনের একান্ত পরাজয়ের মধ্যে তাহার চরিত্রের তেজোদৃপ্ত গর্বটুকু একেবারে ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে, মনে হয় যেন নিজের কাছেই নিজে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অথচ এই দুর্বলতা তাহার চরিত্রের নিজস্ব বস্তু নহে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ যথার্থ কিনা তাহা পরে একটু বিচার করিয়া দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন হইবে।

গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র এত শান্ত ও স্তব্ধ, এত স্থির ও অচঞ্চল লীলার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সহসা তাহা আমাদের অনুভূতিকে স্পন্দিত করে না—জয়সিংহ, রঘুপতি ও অপর্ণাই আমাদের সমস্ত বোধ ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। তাহার কারণও আছে। গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র মহৎ, কিন্তু বিকাশের দিক হইতে তাহা সুন্দর নহে; তাহার মধ্যে কোন দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সংশয় নাই। প্রতি মুহূর্তের অনুভবের নূতনত্বের মধ্যে যে রসের লীলা, মনের মধ্যে সংশয়ের যে দোলা, গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে তাহা নাই। ঘটনা-সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সে আপনাকে বিকশিত করিয়া চলে না; তাঁহার চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ নাই।

অপর্ণার চরিত্রের মধ্যেও যে এই সৃষ্টির আনন্দ খুব আছে তাহা নয়, সে চরিত্রের মধ্যেও খুব কিছু দ্বন্দ্বের লীলা নাই, সংশয়ের খুব দোলা নাই, কিন্তু তাহা না থাকিলেও অপর্ণার চরিত্রে রসের একটা লীলা আপন মাধুর্যে আপনি স্পন্দিত হইয়া আছে; সে-লীলা সে-রহস্য সকল অবস্থাতেই সুন্দর। অথচ তাহার জীবনের কোনও বিকাশ নাই, ধীরে ধীরে সে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে না। অপর্ণাকে প্রথম আমরা যখন দেখি, তখন সে শুধু একটি সরলা বালিকা মূর্তি ধরিয়াই আমাদের সম্মুখে দাঁড়ায়; পরে অবশ্য ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে জয়সিংহের প্রতি একটা স্নেহ ও প্রেমাকর্ষণের ভাব ফুটিয়া উঠে এবং সর্বশেষে জয়সিংহের বিসর্জন-দৃশ্যে তাহা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু অপর্ণার চরিত্রে ধীরে ধীরে এই যে পরিবর্তন, এ যেন জীবনের কোনও বিকাশ নয়, যেন তাহার সরলা বালিকামূর্তিরই আর একটা দিক মাত্র সরল দ্বিধাবিহীন একটি প্রেমানুভূতির ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেন সে যাহা ছিল শেষ পর্যন্ত তাহাই রহিয়া গেল। মনে হয় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম; তাহার দলগুলি একটি একটি করিয়া বিকশিত হয় নাই, একটি একটি করিয়া ঝরিয়া পড়ে নাই। অপর্ণা বিচলিত করে, নিজে বিচলিত হয় না, হইলেও পরক্ষণেই নিজের সংবিৎ নিজেই ফিরিয়া পায়। না পাইবেই না কেন—সে যে একটি শাশ্বত সত্য, যাহার গন্ধ মধুর, যাহার স্পর্শ কোমল, যাহার রূপ সুন্দর, যাহার কোনও জন্ম নাই, বিকৃতি নাই, মৃত্যু নাই; একটি অবিকৃত সহজ সরল সত্যের সে রহস্যমূর্তি বালিকার রূপ ধরিয়া স্নেহের ও প্রেমের শান্ত স্নিগ্ধ রাজ্যের মধ্যে জয়সিংহকে, সকল সংশয়াকুল মানুষকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া আনিতে চাহিতেছে। অপর্ণা একটি আইডিয়ার রসমূর্তি, কোনও জীবনের বিকাশ নয়, রক্তমাংসের একটি মানবকন্যার রূপ তাহার মধ্যে কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই। যদি একটি জীবনই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বিচিত্র বিকাশ কোথায়, তাহার উদয় কোথায়, অস্ত কোথায়, তাহার দুঃখের বেদনা কোথায়, সুখের অনুভূতি কোথায়, চিত্তের বিকার কোথায়, অন্তরের চঞ্চলতা কোথায়? সে যে জয়সিংহকে ভালবাসে, তাহার সংশয় ও বেদনায় বিচলিত হয়, সেখানে শুধু সে সত্যের প্রকাশকেই আরও জীবন্ত, আরও রহস্যময় করিয়া তোলে; সত্য যে কোনও জড় নিশ্চল পদার্থ নয়, সে জীবন্ত ও নিত্য স্পন্দমান এই কথাই সপ্রমাণ করে। রঘুপতি কোনও সত্যের প্রতিমূর্তি নয়, সে একটা জীবন যাহা নানান

ঘটনার ভিতর দিয়া আবর্তিত ও বিকশিত হইতেছে। জয়সিংহও কোন বিশিষ্ট সত্যকে রূপায়িত করে না, সে নিজের জীবনকেই নানান সংশয়ের ভিতর দিয়া পরিণতির দিকে লইয়া চলে। কিন্তু অপর্ণার চরিত্র ঠিক বিপরীত। সে তাহার নিজের জীবনকে বিকশিত করে না, কোন পরিণতির দিকে চালনা করে না, একটি 'আইডিয়া'কেই উদ্‌ঘাটিত করিতে সাহায্য করে, সে সত্যেরই অস্পষ্ট মূর্তি গ্রহণ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া নাটকের সত্যটি ফুটিয়া উঠে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি পঞ্চমাঙ্কে প্রথম দৃশ্যের পর রঘুপতি-চরিত্রের আর কোন পরিচয় যদি আমরা না পাইতাম তাহা হইলে হয়ত ভাল হইত। একথা বলিবার পক্ষে কি যুক্তি আছে তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে প্রথমেই মনে হয়, তাহা হইলে রঘুপতির চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা পাইত এবং আমাদের কাছে রঘুপতি আরও জীবন্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিত। জয়সিংহ যেখানে একটি নিষ্ঠুর বিধানের নিচে আত্মদান করিল, যেখানে এক মুহূর্তে স্নেহের গোপন কোণটিতে প্রচণ্ড বেদনার আঘাত লাগিয়া রঘুপতির চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, যেখানে একান্ত প্রিয় জয়সিংহকে হারাইয়া অপর্ণাও কিছুতেই নিজকে অবিচলিত রাখিতে পারিল না, সেইখানেই যদি নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিত, তাহা হইলে অভিনয় হিসাবে "বিসর্জনে"র রসমাধুর্য আরও নিবিড় হইতে পারিত। শুধু ঘটনা-বস্তুর বিকাশের দিক হইতে দেখিতে গেলেও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এর পর রঘুপতি অথবা অপর্ণা, গোবিন্দমাণিক্য অথবা গুণবতী কাহার কি হইল, ঘটনার-স্রোত কোন্ পথে চলিল, যে-সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য গোবিন্দমাণিক্য যুঝিয়াছিলেন, সে-সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল কি না, যে-সংশয়ের জন্য জয়সিংহ প্রাণ দিল সে-সংশয় ঘুচিল কি না, এসব জানিবার ঔৎসুক্য পাঠক অথবা দর্শকের থাকে না; জয়সিংহের বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাবস্তুর প্রতি তাহার মনোযোগ ও আকর্ষণ শিথিল হইয়া যায়। অপর্ণার চরিত্র যে একটা 'আইডিয়া'র রূপক হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার জন্য এই উপসংহার দৃশ্যটি কতটা দায়ী। যেখানে জয়সিংহের মৃত রুধিরাক্ত দেহ দেখিয়া প্রতিমার চরণে আছড়াইয়া পড়িয়া অপর্ণা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে!' সেইখানেই যদি অপর্ণা-চরিত্রেরও পরিচয় শেষ হইত, তাহা হইলে অপর্ণার মধ্যে আমরা স্পন্দমান মানবচিত্তের, সর্বোপরি তাহার নারী-হৃদয়ের সত্য রূপটি দেখিতে পাইতাম, এবং সেইরূপেই সে আমাদের চিত্তের রসবোধকে বেশি তৃপ্ত করিত এবং তাহার ঐ পরিচয়ই আমাদের মনের উপর চিরকালের জন্য দাগ কাটিয়া যাইত। কিন্তু শেষ দৃশ্যে সে আসিয়া যখন দাঁড়াইল তখন তাহার মধ্যে সেই মানব-হৃদয়ের বাস্তব রূপটি আর নাই, তখন সে এত শান্ত, এত স্থির যেন তাহার উপর দিয়া কোনও ঝড়ই বহিয়া যায় নাই, যেন তাহার চিত্তের কোন বিকারই কোন কালে হয় নাই, সে যাহা ছিল তাহাই যেন সে রহিয়া গেল। তাহার মুখের কথা কয়টিও খুব লক্ষ্য করিবার, বার দুই তিন সে শুধু বলিল, 'পিতা, চলে এস! পিতা, এস এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা', যেন এই কথা কয়টির ভিতর দিয়া এই মর্মটিই ব্যক্ত হইল যে, সে যে-সত্যের রহস্যমূর্তি সেই সত্যটাকেই শেষ পর্যন্ত সে জয়ী করিয়া লইল, কিছুই তাহাকে বিকৃত ও বিচলিত করিতে পারিল না, সেই সত্যের আহ্বানই রঘুপতিকে দেবীহীন মন্দির হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল! যেন বালিকা অপর্ণা কেহই নয়, যেন সত্যের রহস্যমূর্তি অপর্ণাই সব! ইহার ফলে আর একটা জিনিসও একটু বড় হইয়া উঠিয়াছে। একথা সকলেই জানেন যে, "বিসর্জনে"র মধ্যে একটা প্রত্যয় খুব নিবিড় হইয়া আছে, সমস্ত নাটকটিতে সেই প্রত্যয়টিকে

কেন্দ্র করিয়াই যত কিছু সংগ্রাম। পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি নাটকটির উপর যবনিকাপাত হইত, তাহা হইলে সংগ্রামের শেষে সেই প্রত্যয়টিই জয়ী হইল কিনা সে খবর আমরা পাইতাম না। কিন্তু শেষ দৃশ্যগুলিতে দেখিলাম, সেই প্রত্যয়টিরই সম্পূর্ণ বিজয়োৎসব। একটা নির্দিষ্ট সত্যপ্রতিষ্ঠার, একটা নির্দিষ্ট প্রত্যয়ের জয়-প্রদর্শনের এই যে প্রয়াস, ইহা "বিসর্জনে"র রসবোধ ও অনুভূতির তীব্রতাকে একটু ক্ষুণ্ণ না করিয়া পারে নাই; এবং সেই নির্দিষ্ট সত্যটাই যে কবির মনকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল তাহাও কতকটা ধরা না পড়িয়া পারে নাই।

কিন্তু, এই ধরনের বিচারের বিরুদ্ধে কিছু যুক্তিও আছে। প্রথমেই কথা হইতেছে, পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অর্থাৎ জয়সিংহের বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে রঘুপতির চরিত্রের পরিচয় শেষ হইতে পারে কি? তাহা হইলে রঘুপতি চরিত্রের চরম পরিণতিটুকু বুঝিতে পারা যায় কি? তাহার ব্রাহ্মণ্যের দৃপ্তগর্ব হঠাৎ বাধা পাইয়া যে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্ততায় নিজেকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই দৃপ্ত গর্ব মাটির ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া চরম ব্যর্থতায় আত্মপ্রকাশ না করিলে রঘুপতির সবটুকু পরিচয় যেন কিছুতেই সম্পূর্ণ হয় না, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাটকটি যে-পথে যাত্রা শুরু করিয়াছিল তাহাও একটা যুক্তিসহ পরিণতিতে আসিয়া পৌঁছায় না। রঘুপতির দৃপ্ত গর্বিত চরিত্র যে প্রচণ্ড বেদনার আঘাতে একেবারে সকল দর্প গর্ব হারাইয়া সকল অহংকার অভিমান জলাঞ্জলি দিয়া একান্ত দুর্বল অসহায়তার মধ্যে আপন সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল, এবং ধর্মের রহস্যকে জানিয়াছিল, তাহার আগেকার চরিত্রের ছায়াটুকুও যে থাকে নাই, ইহা হয়ত কিছু অস্বাভাবিক নয়। এই ধরনের জীবনে যেন এইরকম পরিণতিই দেখা গিয়া থাকে। একটা অহংকারকে আশ্রয় করিয়া যখন কাহারও সমস্ত কর্ম ও চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই অহংকারের মধ্যেই সে যখন একেবারে ডুবিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই সমস্ত রস পানীয় সংগ্রহ করে, বেদনার আঘাত লাগিয়া তাহা যখন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার আর আশ্রয় কিছু থাকে না, তাহার রস ও পানীয়ের উৎস শুকাইয়া যায়, এবং সেই অবস্থায় সে একান্ত নিঃস্ব ও অসহায় দুর্বলতার মধ্যে নিজের স্বরূপটিকে জানিতে পারে। মানুষের চিত্তধর্মের ইহাই স্বাভাবিক গতি। কিন্তু রঘুপতির চরিত্র যে জয়সিংহের বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইতে পারে না, ইহাই হয়ত তাহার একমাত্র কারণ নহে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, জয়সিংহের চরিত্রই বুঝি সকলের অপেক্ষা করুণ-রসাত্মক এবং তাঁহার বিসর্জন দৃশ্যের মধ্যেই বুঝি নাটকের সমস্ত ট্র্যাজেডিটুকু নিহিত রহিয়াছে। সেইজন্যই তাহার বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে রঘুপতি-চরিত্রের অবসান ঘটিলেই নাটকের ট্র্যাজেডিটুকু ভাল করিয়া ফুটিতে পারিত, এই ধারণা জন্মায়। জয়সিংহের আত্মদানের ট্র্যাজেডি খুব দৃশ্যময়, সেই হেতু আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে হওয়া খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে, নাটকের ট্র্যাজেডিটুকু জয়সিংহ-চরিত্রের মধ্যে ততটা নয়, যতটা রঘুপতির চরিত্রের মধ্যে; বস্তুত জয়সিংহ-চরিত্র অপেক্ষাও গভীরতর ট্র্যাজেডি নিহিত রহিয়াছে রঘুপতি-চরিত্রে এবং সেই ট্র্যাজেডির বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে জয়সিংহের আত্মদানের পরমুহূর্ত হইতে। সে-মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্তও রঘুপতির একটা ঐশ্বর্য ছিল, একটা সুবৃহৎ গর্ব ছিল, তাহা তাহার বুদ্ধির অহংকার, যুক্তির অহংকার, বিশ্বাসের অহংকার, ক্ষমতার অহংকার; এই অহংকারই তাহার সমস্ত সত্তাটাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু জয়সিংহ যে মুহূর্তে তাহার অহংকারের বেদীমূলে আত্মবিসর্জন করিল সেই মুহূর্তেই তাহার সকল অহংকার

চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত ঐশ্বর্য তাহার খসিয়া পড়িল, একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে সে 'গৃহচ্যুত হতজ্যোতি' তারকার মতন কোথায় যে গিয়া পড়িল তাহার ঠিকানা নাই। রঘুপতির এই যে একান্ত রিক্ততা, ইহাই নাটকের করুণতম ও চরমতম ট্র্যাজেডি, এই ট্র্যাজেডিটুকুর বিকাশ না হইলে রঘুপতি-চরিত্রের শেষ পরিচয় কিছুতেই আমরা পাই না।

শুধু এই রঘুপতি-চরিত্রের জন্যই পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পর সমস্ত নাটকটির উপর যবনিকাপাত আমরা কল্পনা করিতে পারিলেও সাহিত্য সৃষ্টির দিক হইতে হয়ত তাহা সার্থক হইত না। একথা ভুলিলে চলিবে না যে 'বিসর্জন" শুধু নাটক নহে, শুধু অভিনয়ই উদ্দেশ্য নহে, তাহা কাব্য নাট্য, তাহার একটা কাব্যের দিক, সাহিত্যের দিক আছে। আর, শুধু নাটকের দিক হইতে দেখিলেই জয়সিংহের বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকাপাত হইলে নাটকের কলাকৌশল একটু ক্ষুণ্ণ হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ, তাহা হইলে একটা বেদনাময় অস্থিরতার মধ্যে নাটকটির সমাপ্তি ঘটিত, নাটকীয় কলাকৌশলের দিক হইতে তাহা হয়ত খুব ভাল হইত না, রবীন্দ্রনাথও হয়ত তাহা চাহেন নাই, এবং চাহেন নাই বলিয়াই আখ্যান বস্তুটিকে একেবারে শেষ যুক্তিসহ পরিণতি পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া একটা স্থির অবিচল শান্তির মধ্যে সমস্ত নাটকটির উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন, পাঠক অথবা দর্শককে কোন অস্থির চঞ্চল বা [illegible]ভাবগ্রস্ত ভাবনার মধ্যে আন্দোলিত হইবার সুযোগ দেন নাই। [illegible] এই হিসাবে তিনি প্রাচীন গ্রীক নাটকের অথবা মধ্যযুগের শেক্সপীরীয় নাটকের পন্থারই অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য-রীতিই তাঁহাকে পথ দেখাই[illegible] বলিলে [illegible] হয় [illegible] দৃষ্টান্তস্বরূপ "শকুন্তলা"র উল্লেখই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হইবে। [illegible] বিস্মৃতি হেতু দুষ্মন্ত কর্তৃক শাপগ্রস্ত শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান, সেই দৃশ্যটিই সব চেয়ে চঞ্চল ও বেদনাময়, সেইখানে কালিদাস নাটকটির উপর যবনিকাপাত করেন নাই, সমস্ত আখ্যানটিকে আরও ঘটনা পরম্পরার ভিতর দিয়া শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং একটি পরিপূর্ণ শান্তি ও মিলনের মধ্যে উহাকে সমাপ্তি দান করিয়াছেন। তাহার ফলে 'শকুন্তলা" রস হিসাবে সমৃদ্ধি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, এবং সেইজন্য "শকুন্তলা" নাট্যজগতের মধ্যে খুব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, 'বিসর্জন" রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা' নাট্য-বিন্যাসের কথা না ভাবিয়া পারেন নাই। দুষ্মন্তের শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তাহার কিছু পরে নাটকটির উপর যবনিকাপাত আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, তাহা করিতে গেলে সমস্ত নাটকের ঘটনা বস্তু ও নাট্য-বিন্যাস একেবারে আমূল পরিবর্তন করিতে হয়। শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান দৃশ্যের এবং তাহার পর সমগ্র নাটকের পরিণতির রহস্য-চাবিটি রহিয়া গিয়াছে ঐ দুর্বাসার অভিশাপটুকুর মধ্যে। এই অভিশাপ না কাটিলে, দুষ্মন্তের বিস্মৃতির কালরাত্রি অতীত হইয়া শকুন্তলার সঙ্গে পুনর্মিলন না ঘটিলে নাটকের সমাপ্তি ত আমরা কিছুতেই কল্পনাও করিতে পারি না। "বিসর্জনে" তেমন কিছু কেন্দ্রবস্তু নাই বটে, কিন্তু তাহারও রহস্যটি রহিয়াছে ঐ রঘুপতি-চরিত্রের চরম পরিণতিটুকুর মধ্যে, সেই পরিণতিটুকু বিকশিত হইয়া না উঠিলে "বিসর্জন" নাটকের সমাপ্তি কল্পনা করা একটু কঠিন।

"বিসর্জন"কে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, দুই বৎসর পরে রচিত "মালিনী"

নাটিকাখানির একটু স্মরণ লইতে হয়। "মালিনী"র ঘটনাস্রোতের মধ্যে কোনও জটিলতা নাই কোনও আবর্ত নাই। তাহা ছাড়া "বিসর্জনে"র মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব যতটা বহুক্ষণস্থায়ী ও বহুবিস্তৃত, "মালিনী"তে তাহা ততটা নিবিড় মোটেই নহে, এবং সেই হেতু স্বল্পকালস্থায়ী ও স্বল্পবিস্তৃত। অথচ কি চরিত্র-সৃষ্টিতে, কি প্রত্যয়বস্তুতে এ দু'টি নাটকের সাদৃশ্য কত বেশি! দু'টি নাটকেই চিরাচরিত সনাতন প্রথা ও ধর্মের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া নাট্যবস্তুকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। "বিসর্জনে" দেখি পুঁথিগত আচারগত ধর্মের বিরুদ্ধে মানবধর্ম বিশ্বধর্মের প্রতীক একটি ধর্মকে দাঁড় করাইয়া দু'য়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং মানবধর্মকে শেষ পর্যন্ত জয়ী করা হইয়াছে। "মালিনী"তেও দেখি সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে মানবধর্ম বিশ্বধর্মের প্রতীক একটি ধর্মকে দাঁড় করাইয়া দু'য়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে। দুই পক্ষের সাজসজ্জা ও যুক্তি কৌশলও দুইটি নাটকের একরকম, শুধু প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গিমা ভিন্ন। শুধুই কি তাই, দুইটি নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিও যেন একটির ছাঁচে আর একটি ঢালা। "বিসর্জনে"র রঘুপতি আর "মালিনী"র ক্ষেমংকর, "বিসর্জনে"র জয়সিংহ আর "মালিনী"র সুপ্রিয় প্রায় একই, ইহাদের ভাব ও গতি, ভাষা ও প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য খুব কম।

রঘুপতির মধ্যে দেখিয়াছি সনাতন ধর্ম ও আচারের প্রতি তাহার অবিচল নিষ্ঠা, একটি প্রচণ্ড আত্মাভিমানের দীপ্তি, একটি প্রদীপ্ত প্রতিভার সুতীক্ষ্ণ যুক্তি-কৌশল যাহার সম্মুখে বার বার জয়সিংহের চিত্ত সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া মাথা নত করে। ক্ষেমংকরের মধ্যে নিষ্ঠার সে দ্যুতি নাই, প্রতিভার সে দীপ্তি নাই, যুক্তির সে তীক্ষ্ণতা নাই, একথা সত্য, কিন্তু সব কিছুরই প্রকার এক, দুইটি চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য শুধু তীব্রতার। রঘুপতির মতন ক্ষেমংকরের মুখেও যুক্তি যেন ছুরির ফলার মতন ঝলসিয়া উঠে, সুপ্রিয় তাহার প্রতিবাদ করিবার পথ ও শক্তি খুঁজিয়া পায় না। বস্তুত, কি রঘুপতি, কি ক্ষেমংকর, ইহারা যুক্তিতে কখনও কাহারও কাছে হার মানে না, হার মানে শুধু সেইখানে যেখানে মনের মধ্যে কোথাও কোনও স্নেহের অথবা কোনও সূক্ষ্মতর অনুভূতির একটুখানি লীলা আত্মগোপন করিয়া আছে। বুদ্ধির মধ্যে জীবনের চরমতম সত্যের সন্ধানকে তাহারা জানে না, জানিতে পায় একটা পরম আঘাতের ভিতর দিয়া হৃদয়ের বেদনাময় অনুভূতির মধ্যে। সেই সত্যের সন্ধানও ক্ষেমংকর শেষ পর্যন্ত পাইয়াছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু একথা সত্য যে, সুপ্রিয়কে বার বারই তাঁহার যুক্তির ও আবেদনের কাছে মাথা নোয়াইতে হইয়াছে বলিয়াই ক্ষেমংকরের চরিত্র ফুটিবারও অবসর পাইয়াছে। ক্ষেমংকরও রঘুপতির মতন নিষ্করুণ, সেও নিজেকে বঞ্চিত করে না, জয়সিংহের জন্য রঘুপতির মনে যে স্নেহের একটি নিভৃত-কুঞ্জ রচিত হইয়াছিল, সুপ্রিয়র জন্যও তেমনই ক্ষেমংকরের বুকে স্নেহের একটি নীরব উৎস সঞ্চিত হইয়াছিল, এবং এই দুই ক্ষেত্রেই এই স্নেহ ও ভালবাসা তাহাদের আত্মাভিমানেরই নামান্তর মাত্র।

কিন্তু একটি বিষয়ে রঘুপতি-চরিত্রের সঙ্গে ক্ষেমংকর চরিত্রের খুব মস্ত একটা অমিল আছে, এবং আমার মনে হয়, এই হিসাবে ক্ষেমংকরের চরিত্র-সৃষ্টিতে নাট্যকৌশলের অভিব্যক্তি বেশি। রঘুপতির চরিত্রে আমি পূর্বাপর একটু অসঙ্গতির উল্লেখ করিয়াছি, নাটকটির শেষ দৃশ্যে সমগ্র জীবনের একান্ত পরাজয়ের মধ্যে তাহার চরিত্রের তেজোদৃপ্ত গর্বটুকু একেবারে ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে, মনে হয় সে যেন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ক্ষেমংকর-চরিত্রে এ অসংগতি কোথাও নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার

রাজকন্যার নির্বাসন। রাজা এবং রাজমহিষী দুজনেই চাহেন কন্যাকে তাহার ধর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নারীধর্মে সংসারধর্মে ফিরাইয়া আনিতে—

ধর্ম কি খুঁজিতে হয়?
সূর্যের মতন ধর্ম চিরজ্যোতির্ময়
চিরকাল আছে। ধর তুমি সেই ধর্ম,
সরল সে পথ। লহ ব্রত ক্রিয়া কর্ম
ভক্তিভরে। শিবপূজা কর দিনযামী,
বর মাগি লও, বাছা, তারি মত স্বামী।
সেই পতি হবে তোর সমস্ত দেবতা,
শাস্ত্র হবে তারি বাক্য, সরল একথা।
রমণীর ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে।

রানী এইভাবে কন্যাকে বারবার সংসারধর্মে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজা যখন কন্যাকে ভর্ৎসনা করেন, তখন সেই ভর্ৎসনা হইতেই আবার প্রিয়তমা কন্যাকে আড়াল করিয়া রাখেন।

ভাব মনে
এ কন্যা তোমার কন্যা, সামান্য বালিকা,
ওগো তাহা নহে। এ যে দীপ্ত অগ্নিশিখা।
আমি কহিলাম, আজি শুনি লহ কথা—
এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা,
এসেছে তোমার ঘরে। করিয়ো না হেলা,
কোন দিন অকস্মাৎ ভেঙে দিয়ে খেলা
চলে যাবে—তখন করিবে হাহাকার—
রাজ্য ধন সব দিয়ে পাইবে না আর।

কিন্তু এদিকে প্রজার দল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে, ক্ষেমংকর প্রতিদিন সকলকে উত্তেজিত করিতেছে। নবধর্মের স্রোতের মুখে সনাতনধর্ম আর বাঁচে না, সে স্রোতকে ঠেকাও, রাজকন্যার নির্বাসন চাই। কিন্তু ক্ষেমংকরের আজন্ম বন্ধু একান্ত সুহৃৎ স্নেহের পাত্র সুপ্রিয় নির্দোষের এই নির্বাসন কিছুতেই সহ্য করিতে রাজী নহে, উত্তেজিত সংকীর্ণচিত্ত প্রজাবৃন্দের ছায়ামাত্র হইতে সে চাহে না, 'মূঢ়তার দুর্বিনয়' সে সহ্য করিতে পারে না।

যাগযজ্ঞ দিয়া ধর্ম রক্ষা উপবাস
—এই শুধু ধর্ম বলে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে? বালিকারে দিয়া নির্বাসন
সেই ধর্ম রক্ষা হবে? ভেবে দেখ মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলে করেনি প্রচার—
সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়া ধর্ম তার
সর্বজীবে প্রেম, সর্বধর্মে সেই সার—
তার বেশি যাহা আছে—প্রমাণ কি তার?

ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সুপ্রিয় বুঝিল না। তবু ভালবাসার ও শ্রদ্ধার দুর্বলতা তাহাকে বলিতে বাধ্য করিল, 'তব পদগামী চিরদিন এ অধীন। রেখে দিব আমি তব বাক্য শিরে ধরি! যুক্তি সূচি'পরে সংসার কর্তব্যভার, কভু নাহি ধরে!' এদিকে প্রজারা যখন মহোৎসাহে যাগযজ্ঞে ও পূজায় সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রীর আবাহন

করিতেছে তখন ভিক্ষুণীর বেশে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল মালিনী। তাহাকেই সকলে দেবী বলিয়া ভ্রম করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল; শুধু করিল না ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়। কিন্তু মালিনী বলিল, তোমরা আমারই নির্বাসন চাহিয়াছ, স্বেচ্ছায় সে-নির্বাসন আমি লইলাম। আজ আমি তোমাদের কাছেই আসিয়াছি, 'আমি ফিরিব না আর! জানিতাম, জানিতাম তোমাদের দ্বার মুক্ত আছে মোর তরে। * * * তবু একবার মোরে বল সত্য করে, সত্যই কি আছে কোন প্রয়োজন মোরে, চাহ কি আমায়?' প্রজারা তাহাকেই চাহিল, একদিন তাহারা এই দেবীরই নির্বাসন চাহিয়াছিল মনে করিয়া নিজেরাই ধিক্কৃত হইল এবং মালিনীকে ঘিরিয়া লইয়া সকলে তাহাকে রাজগৃহে লইয়া গেল। সুপ্রিয় নড়িল না, কিন্তু বুঝিল, যে গুরুর ধর্মে সে আশ্রয় লইয়াছে সে-ধর্ম মিথ্যা, সত্যধর্মের সন্ধান মালিনীই পাইয়াছে, সে পায় নাই।

মিথ্যা তব স্বর্গধাম,
মিথ্যা তব দেবদেবী ক্ষেমংকর! ভ্রমিলাম
বৃথা এ সংসারে এতকাল! পাই নাই
কোন তৃপ্তি কোন শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়ে। আজ আমি লভিয়াছি
ধর্ম মোর, হৃদয়ের বড় কাছাকাছি!
সবার দেবতা তব শাস্ত্রের দেবতা
আমার দেবতা নহে! * *
* * আজি তুমি কে আমার
জীবন তরণী 'পরে রাখিলে চরণ
সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ
একি গতি দিলে তারে! এতদিন পরে
এ মর্ত্য ধরণী মাঝে মানবের তরে
পেয়েছি দেবতা মোর!

কিন্তু দেবতার সন্ধান পাইয়াছে বলিয়াই এত সহজে সে ক্ষেমংকরকে ছাড়িয়া যাইবে কি করিয়া? ক্ষেমংকর বুঝাইলেন, যে-দেবতার সন্ধান সে পাইয়াছে সে মায়া মাত্র, যে-ধর্মের আভাস সে লাভ করিয়াছে তাহা ছায়া মাত্র। বুঝাইলেন, ভারতের সনাতন ধর্মের গরিমা ও ঐশ্বর্য, কল্পনার চক্ষে তাহাকে দেখাইলেন, আর্যধর্মের মহাদুর্গকে আক্রমণ করিয়াছে যত ধর্মদ্রোহী গৃহদ্রোহী, সে দুর্গকে রক্ষা করিতেই হইবে। তিনি এই দুর্গরক্ষার ভার লইয়াছেন, সুপ্রিয় কি তাঁহার পাশে দাঁড়াইবে না? বাহির হইতে সৈন্য আনিয়া রক্তস্রোত মুক্ত করিয়া এই বিদ্রোহ-বহ্নি নির্বাইতে হইবে, সেইজন্য তিনি দেশান্তরে যাইবেন। সুপ্রিয় সঙ্গে যাইতে চাহিল, কিন্তু ক্ষেমংকর সঙ্গে লইতে চাহিলেন না, চাহিলেন শুধু, 'তুমিও ভুলোনা শেষে নূতন কুহকে, ছেড়োনা আমায়! মনে রেখো সর্বক্ষণ প্রবাসী বন্ধুরে।' সুপ্রিয় বিদায় আলিঙ্গন চাহিল, কহিল,

সখে, কুহক নূতন,
আমি তো নূতন নহি, তুমি পুরাতন,
আর আমি পুরাতন। * * *
প্রথম বিচ্ছেদ আজি! ছিনু চিরদিন
এক সাথে! বক্ষে বক্ষে বিরহ বিহীন
চলেছিনু দোঁহে—আজ তুমি কোথা যাবে,
আমি কোথা রব।

সংশয়লেশবিহীন অবিচলিত ক্ষেমংকর চলিয়া গেলেন। এদিকে সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান নবধর্মের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত-চিত্ত সুপ্রিয়র সঙ্গে রাজোদ্যানে মালিনীর দেখা। আর শুধুই কি নবধর্মের জ্যোতিই তাহাকে উদ্ভাসিত করিয়াছে? যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই জ্যোতি তাহার চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সেই মালিনীও যে তাহার নিভৃত অন্তরে সোনার কাঠি স্পর্শ লাভ করিয়াছে। এই স্পর্শ তাহাকেও চঞ্চল করিয়া মালিনীর কাছে টানিয়া আনিয়াছে। মালিনীর হাতে সে তাহার সমস্ত ভার তুলিয়া দিতে আসিয়াছে, 'দীপবর্তিকার ছায়ার মত' সে তাহার সাথে চলিতে আসিয়াছে। মালিনীর মনেও কি জীবনের কোন নূতন অনুভূতির আভাস জাগিয়াছে, সুপ্রিয়র অন্তর হইতে জীবনধর্মের কোনও আবেদন কি তাহার নারীচিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে? হয়ত করিয়াছে;

হে ব্রাহ্মণ চলে যায় সকল ক্ষমতা
তুমি যবে প্রশ্ন কর, নাহি পাই কথা!
বড়ই বিস্ময় লাগে মনে! হে সুপ্রিয়
মোর কাছে জানিতে এসেছ তুমিও!

কিন্তু সুপ্রিয় ত জানিতে আসে নাই।

জানিবার কিছু নাই, নাহি চাহি জ্ঞান
সর্ব শাস্ত্র পড়িয়াছি, করিয়াছি ধ্যান
শত তর্ক শত মত। ভুলাও ভুলাও,
যত জানি সব জানা দূর করে দাও!
পথ আছে শত পথ, শুধু আলো নাই
ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী—তাই আমি চাই
একটি আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে।

কিন্তু এতদিন পর সুপ্রিয় আসিয়াছে, আগে আসিল না কেন? আজ সুপ্রিয়র কথা শুনিয়া অজানা কি বেদনায় তাহার দুই নয়ন অকারণ অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে কেন? প্রজারা আসিয়া দর্শন চাহিল, কিন্তু,

আজ নহে, আজ নহে! সকলের কাছে
মিনতি আমার! আজি মোর কিছু নাহি।
রিক্ত চিত্ত মাঝে মাঝে ভরিবারে চাহি
বিশ্রাম প্রার্থনা করি ঘুচাতে জড়তা!

কিন্তু একদিকে মালিনী, আর একদিকে ক্ষেমংকর, এই দুই সংঘাতকে সুপ্রিয় শান্ত করিবে কি করিয়া? ক্ষেমংকর যে তাহার চিরন্তন বন্ধু, সে যে তাহার ভাই, প্রভু।

—সূর্য সে আমার, আমি তার রাহু,
আমি তার মহামোহ; বলিষ্ঠ সে বাহু,
আমি তাহে লৌহপাশ! বাল্যকাল হতে
দৃঢ় সে অটল চিত্ত, সংশয়ের স্রোতে
আমি ভাসমান! তবু সে নিয়ত মোরে
বন্ধুমোহে বক্ষোমাঝে রাখিয়াছে ধরে
প্রবল অটল প্রেমপাশে, নিঃসন্দেহে
বিনা পরিতাপে।

কিন্তু এমন যে বন্ধু তাহাকেও ডুবাইতে হইল। ক্ষেমংকরের বিদেশ হইতে সৈন্য আনিয়া নবধর্ম উৎপাটন করিবার সংকল্প, মালিনীর প্রাণদণ্ডের সংকল্প, আসন্ন বিদ্রোহ-সজ্জার সংবাদ

সুপ্রিয় রাজার কাছে প্রকাশ করিয়া দিল। মালিনীকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস ধীরে ধীরে শুনাইল। মালিনীই যে তাহাকে নব জন্মভূমির সন্ধান দিয়াছে, নব মানবধর্মের আস্বাদন দিয়াছে তাহাও জানাইল। সেই মালিনীরই প্রাণদণ্ড দিতে ক্ষেমংকর যখন সৈন্য লইয়া আসিতেছে, তখন

প্রচণ্ড আঘাতে সেই
ছিঁড়িল প্রাচীন পাশ এক নিমেষেই!
রাজারে দেখানু পত্র। মৃগয়ার ছলে
গোপনে গেছেন রাজা সৈন্যদলবলে
আক্রমিতে তারে। আমি হেথা লুটাতেছি
পৃথ্বীতলে—আপনার মর্মে ফুটাতেছি
দন্ত আপনার।

মালিনী ক্ষেমংকরের জন্য দুঃখ অনুভব না করিয়া পারিল না।

—হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলেনা হেথা মোর গৃহদ্বারে
সৈন্য সাথে? এ ঘরে সে প্রবেশিত আসি
পূজ্য অতিথির মত—সুচির প্রবাসী
ফিরিত স্বদেশে তার।

রাজা বিদ্রোহ দমন করিয়া ক্ষেমংকরকে বন্দী করিয়া লইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন। যথাসময়ে সংবাদ-দানের পুরস্কারস্বরূপ সুপ্রিয়কে তিনি রাজ্যখণ্ড এবং মালিনীকে দান করিয়া পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন, কিন্তু,

কিছু নহে, কিছু নহে, খাব ভিক্ষা করে
দ্বারে দ্বারে। * * *
* * * রাজহস্তে পুরস্কার।
কি করেছি? আশৈশব বন্ধুত্ব আমার
করেছি বিক্রয়—আজি তার বিনিময়ে
লয়ে যাব শিরে করি আপন আলয়ে
পরিপূর্ণ সার্থকতা? তপস্যা করিয়া
মাগিব পরম সিদ্ধি জন্মান্ত ধরিয়া—
জন্মান্তরে পাই যদি তবে তাই হোক্
বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙ্গি সপ্তস্বর্গ লোক
চাহিনা লভিতে!

—রাজা ক্ষেমংকরের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন স্থির করিলেন। মালিনী তাহার ক্ষমা মাগিয়া লইল। অগত্যা রাজা বিচারে তাহার বীরত্বের পরীক্ষা লইবেন স্থির করিলেন। ক্ষেমংকর আসিয়া দাঁড়াইলেন, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনিয়া এতটুকু বিচলিত হইলেন না। কোনও কিছু প্রার্থনা করিলেন না, শুধু বলিলেন, 'বন্ধু সুপ্রিয়রে শুধু দেখিবারে চাহি।' সুপ্রিয় আসিল, ক্ষেমংকর প্রশ্ন করিলেন বন্ধু, এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কেন করিলে সুপ্রিয়র কিছু বলিবার নাই, শুধু,

—বন্ধু এক আছে
শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিশ্বাস,
সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহারি বিশ্বাস,
প্রাণসখে ধর্ম সে আমার!

কিন্তু কে বলিবে, 'অন্তর্জ্যোতির্ময়, মূর্তিমতী দৈববাণী' মালিনীর সেই শুভ্র মুখখানি তাহাকে ভুলায় নাই, কে বলিবে মালিনীর চোখের দৃষ্টির মধ্যে সে তাহার পিতৃধর্ম আহুতি দেয় নাই! সত্যই সুপ্রিয় তাহাই করিয়াছে, মিথ্যা সে বলিবে কেন?

—সত্য বুঝিয়াছি সখে!
মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারীমূর্তি ধরি! * * *
* * * * *
ওই দুটি নেত্রে জ্বলে যে উজ্জ্বল শিখা
সে আলোকে পড়িয়াছে বিশ্বশাস্ত্রলিখা—
যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেম স্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের স্নেহ।
* * * ধর্ম বিশ্ব লোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেম-ক্রোড়ে—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দ বেদনে
চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে!
ওই ধর্ম মোর।"

ক্ষেমংকরও তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু দেখিয়াছে বলিয়াই সে তার নিজের ধর্ম, তার অহংকারের ধর্ম অন্যের কাছে খাট হইতে দিবে কেন?

—উদারতা এত কি উদার!
কেহ বা ধর্মের লাগি সহি নির্যাতন
অকালে অস্থানে মরে চোরের মতন,
কেহ বা ধর্মের ব্রত করিয়া নিষ্ফল
বাঁচিবে সম্মানে সুখে! এ ধরণীতল
হেন বিপরীত ধর্ম এক বক্ষে বহে—
এত বড় এত দৃঢ় কভু নহে নহে!

সত্য কি মিথ্যা কি আজ আর তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই

—সকল সংশয়
আজিকে লইয়া চলি অসংশয় ধামে,
দাঁড়াই মৃত্যুর পাশে দক্ষিণে ও বামে
দুই সখা, লয়ে দুজনের প্রশ্ন যত!
সেথায় প্রত্যক্ষ সত্য উজ্জ্বল উন্নত;—
* * * *
—দুইটি অবোধে
আনন্দে হাসিব চাহি দোঁহে দোঁহাকারে
সব চেয়ে বড় আজি মনে কর যারে
তাহারে রাখিয়া দেখ মৃত্যুর সম্মুখে।

এই বলিয়া ক্ষেমংকর অগ্রসর হইয়া সুপ্রিয়কে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন, কহিলেন,

—এস তবে এস বুকে
বহুদূরে গিয়েছিলে এস কাছে তবে,
যেথায় অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হবে!
লহ তব বন্ধু হস্তে করুণ বিচার—
এই লহ—

বলিয়াই সুপ্রিয়ের মাথায় হাতের লোহার শিকল দিয়া সজোরে আঘাত করিলেন। সুপ্রিয় মাটিতে পড়িয়া গেল, আর উঠিল না। ক্ষেমংকর মৃতদেহের উপর পড়িয়া ঘাতককে ডাকিলেন, রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া খড়্গ আনিতে বলিলেন। মালিনী রাজার কাছে ক্ষেমংকরের ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন জানাইয়া মূছিত হইয়া পড়িল।

"মালিনী"র আখ্যানবস্তু অত্যন্ত সরল ও স্বচ্ছ, কিন্তু সুর গভীর ও গম্ভীর। ঘটনার স্রোত অতি স্বচ্ছ সরল ভাবে অন্তিম পরিণতির দিকে দ্রুত নিরবচ্ছিন্ন বহিয়া গিয়াছে; এবং একেবারে শেষ দৃশ্যে অন্তিম সর্বনাশ যখন 'বন্ধু তাই হোক' এই তিনটি মাত্র বাক্যের ভিতর দিয়া পাঠক বা দর্শকের চিত্তপটে জাগিয়া উঠে, তখন এক মুহূর্তে মনে হয়, আর উপায় নাই, এইবার সমস্ত বিশ্বের প্রলয় ঘনীভূত হইয়া উঠিল! এই সর্বশেষ পরিণতি সর্বতোভাবে নাটকীয়। "বিসর্জন" বহুভাষী, বিচিত্র ভূমিকায় কথাবার্তাগুলি এত বিস্তৃত, আত্মবিশ্লেষণ এত বিশদ যে "মালিনী"র স্বল্পভাষণের পরিমিতি ও সংযম, আখ্যানবস্তুর সংগতি ও সংহতি "বিসর্জনে" আমরা আশাই করিতে পারি না। দু'টি নাটকই ট্র্যাজেডি কিন্তু তাহা সত্ত্বেও "মালিনী"র ট্র্যাজেডি এত ঘনীভূত এবং এত প্রবল এবং এত স্বল্পকালবিস্তৃত যে, "বিসর্জনে"র ট্র্যাজেডি সেই তুলনায় অনেকটা তরল ও নিষ্প্রভ। পাঠকের অথবা দর্শকের মনের পুঞ্জীয়মান বেদনা মাঝে মাঝে লাঘব করিবার চেষ্টা "বিসর্জনে" আছে, "মালিনী"তে তাহা অনুপস্থিত, এবং সেই হেতু "মালিনী"র ট্র্যাজেডি অনেক ঘন ও নিবিড়। এই সব কারণে, আমার মনে হয়, "বিসর্জন" অপেক্ষা "মালিনী" শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সার্থকতর, নাটকীয় গুণের দিক হইতেও তাহাই। অথচ আশ্চর্য এই, "মালিনী" বাংলা দেশে "বিসর্জনে"র জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। "মালিনী"র একান্ত সুনিবিড় ট্র্যাজিক সর্বনাশী পরিণতিই কি তাহার কারণ?

তাহা ছাড়া "বিসর্জন" নাটক হওয়া সত্ত্বেও যে কোনও পাঠক বা দর্শকই স্বীকার করিবেন, আগেও আমি বলিয়াছি, ইহার রচয়িতার মানস একান্তই গীতিকাব্যীয় মানস। "চিত্রাঙ্গদা" ও "বিদায়-অভিশাপে" যেমন পাত্রপাত্রীর উক্তির ছলে মানব হৃদয়ের কোনও চিরন্তর আবেগের বা মুহূর্তের অনুভূতির প্রকাশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলা সত্ত্বেও তাহা লিরিকেরই স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণবিশিষ্ট, "বিসর্জনে"র বিভিন্ন চরিত্রগুলিও তাহাই। জয়সিংহ, রঘুপতি, অপর্ণা, গোবিন্দমাণিক্য ইহারা সকলেই এক একটি চিরন্তন হৃদয়াবেগের প্রতীক, এবং ইহাদের অধিকাংশ উক্তি ও চলন গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। "মালিনী"তে এই লিরিক্-লক্ষণ অনুপস্থিত বলিলেই চলে; ইহার ভূমিকাগুলিও কতকাংশে হৃদয়াবেগের প্রতীক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের চলন বলন নাটকীয়। প্রত্যেকটি দৃশ্যের উদ্ঘাটন আকস্মিক, দ্রুত চলমান ঘটনার স্রোত আকস্মিকভাবে দক্ষিণে বামে ঘুরিয়া যায় এবং থাকিয়া থাকিয়া পাঠক ও দর্শকের চিত্তকে ঝাঁকুনি দিয়া সজাগ করিয়া দেয়। চরিত্রগুলি কোথাও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই; তাহাদের প্রত্যেকেরই গতি ও পরিণতি আছে। মালিনী অপর্ণা নয়; ক্ষেমংকরও জয়সিংহ নয়, অথবা সুপ্রিয়ও রঘুপতি নয়। "মালিনী"র আখ্যানবস্তুর স্বচ্ছ সরলতার একটি প্রধান কারণ, ইহার দ্রুত ঘটনাস্রোতের মধ্যে কোন বাহ্য অথবা অবান্তর কাহিনীর গ্রন্থি-বন্ধন নাই। "বিসর্জনে"র মধ্যে যেমন মূল কাহিনী ছাড়া মূল কাহিনীকেই সমৃদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অন্য দুইটি কাহিনীর অবতারণা আছে, "মালিনী"তে তাহা নাই, একটি মাত্র সহজ সরল স্রোত শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছ রহিয়া গিয়াছে।

মালিনীর চরিত্র-চিত্রণ লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। টম্‌সন্ সাহেব বলিয়াছেন, মালিনী

"* * * is a very unconvincing figure till upwards the end, where she wavers from her half attraction towards Supriya, drawn by the quiet fierce strength of Kshemankar. * * * Why does Malini plead for Kshemankar, after he has killed Supriya? When I spoke of the play as sketchy, I was thinking of the way in which Rabindranath in Malini herself, suggests questions for whose solution he provides no data. He has drawn the lines of her figure so tenuously that her thoughts and actions are seen as if moving through a mist of dreams. * * * The poet has given us no means of judging, but has left Malini a beautiful faintly drawn outline."

টম্‌সন্ সাহেব মালিনী unconvincing figure এই অভিযোগ কেন করিলেন, বুঝা শক্ত; আর, এমনই বা কি প্রশ্ন কবি মালিনী সম্বন্ধে তুলিয়াছেন, যাহার উত্তরের সুযোগ তিনি আমাদের দেন নাই। এমন কিছু কুয়াসার জালও যে মালিনীর ছবিটিকে আমাদের চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহাও মনে হইতেছে না। তবে এ প্রশ্ন সত্যই উঠিতে পারে, সুপ্রিয়কে যে ক্ষেমংকর হত্যা করিলেন সেই ক্ষেমংকরেরই প্রাণভিক্ষা মালিনী কেন চাহিল? প্রশান্তবাবু বলেন,

"It is very difficult to be quite sure—so many interpretations are possible—but in Malini, there seems to be a conflict. She is torn between two impulses—or perhaps an ideal and an impulse, the life preached by Gautama and the other life of love and friendship. Both were vague, I think. Was she in love with Supriya? Or with Kshemankar? Or was she in love with neither? I do not know, but you feel as if there was a deeper conflict."

মালিনীর মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল এবং দুই বিরোধী ভাব ও আদর্শের মধ্যে তাহার চিত্ত একটু আন্দোলিত হইয়াছিল সে কথা সত্য, কিন্তু কোথাও তাহা খুব তীব্র হইয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই, এবং সে সুপ্রিয়কে ভালবাসিত, না ক্ষেমংকরকে, না কাহাকেই নয়, এ প্রশ্ন উঠিবার সুযোগই বা কোথায়? আর সুপ্রিয়কে যে ক্ষেমংকর হত্যা করিলেন, সেই ক্ষেমংকরেরই প্রাণভিক্ষা মালিনী কেন চাহিল, এ প্রশ্নের উত্তরও খুব কঠিন বলিয়া মনে হয় না।

মালিনীর প্রথম পরিচয় যখন আমরা পাই তখন দেখি সে এমন একটা ধর্মের আভাস মাত্র পাইয়াছে, যে ধর্ম সহজেই একটা তরুণ চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া লয়, এবং তাহার বৃহত্তর আদর্শের চরণতলে জীবনকে উৎসর্গ করিবার ইঙ্গিত জানায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রেরণাও জাগাইয়া তোলে। এই প্রেরণাই রাজান্তঃপুর ছাড়িয়া মালিনীকে পথে বাহির করিয়া আনে। সেইখানে আসিয়া সে সর্বপ্রথম সুপ্রিয়র পরিচয় লাভ করে। এই সুপ্রিয় তরুণ, ধর্মপ্রাণ, স্থিরচিত্ত ও মহৎ। সুপ্রিয়র এই পরিচয় মালিনী প্রথমেই পায় নাই, কিন্তু প্রথম পরিচয়েই সুপ্রিয় তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং মালিনীর আত্মোৎসর্গ সুপ্রিয়র সমস্ত হৃদয় ও মনকে অভিভূত করিয়াছিল। কিন্তু তখনও মালিনী সুপ্রিয়কে ভালবাসে নাই, নবজাগ্রত নারীচিত্তের মধ্যে তখনও প্রেমের কুঁড়ি দেখা দেয় নাই। সে কুঁড়ি দেখা দিল তখন যখন সুপ্রিয় আসিয়া তাহার কাছে আত্মনিবেদন করিল, যখন সে বলিল

দেবি, লহ মোর ভার
যে পথে লইয়া যাবে, জীবন আমার
সাথে যাবে. সর্ব তর্ক করি পরিহার
নীরব ছায়ার মত দীপবর্তিকার।

যখন সে বলিল,

ভুলাও, ভুলাও,
যত জানি সব জানা দূর করে দাও!
পথ আছে শত লক্ষ শুধু আলো নাই
ওগো দেবি জ্যোতির্ময়ি—তাই আমি চাই
একটি আলোকরেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে।

একথার পর মালিনীর মধ্যে সত্য সত্যই একটু চঞ্চলতা জাগে। সুপ্রিয় মালিনীর কাছে যাহা চাহিয়াছিল তাহা হয়ত একটু প্লেটোনিক; হৃদয়ের মধ্যে একটা অভাব যাহা ঠিক বুঝিতে বা ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, যাহা আমাদের প্রতিদিনের মানবজীবনের ভালবাসা এবং বৃহত্তর ভাবময় জীবনের ভালবাসার একটা সংমিশ্রণ, যে-ভালবাসা মনস্তত্ত্বের দিক হইতে একটু জটিল; সুপ্রিয়র মনের অনুভূতি হয়ত তাহাই ছিল। কিন্তু মালিনীর মনে এমন কিছু জটিলতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রথম সূর্যের তাপ লাগিয়া যেমন ফুলের কুঁড়িগুলি মেলিতে থাকে, সুপ্রিয়র মনের তাপ লাগিয়া তেমনই করিয়া মালিনীর মনের কুঁড়িটিও তখন শুধু নয়ন মেলিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। এইজন্যই ত

হে ব্রাহ্মণ, চলে যায় সকল ক্ষমতা,
তুমি যবে প্রশ্ন কর, নাহি পাই কথা!
বড়ই বিস্ময় লাগে মনে!
হায় বিপ্রবর!
যত তুমি চাহিতেছ আমি যেন তত
আপনারে হেরিতেছি দরিদ্রের মত!

এমন করিয়া ত কেহ তাহার কাছে আত্মনিবেদন করে নাই; তাহার প্রতি এমন করিয়া ত কেহ আকৃষ্ট হয় নাই, এমন প্রশ্নপ্রার্থী হইয়া কেহ ত আসে নাই! কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ও যে আছে মনের মধ্যে। সেই সংশয় তাহার মনের কুঁড়িটিকে ভাল করিয়া ফুটিতে দিতেছে না। সেও ত সুপ্রিয়কে সঙ্গীরূপে পাইতে চায়, কিন্তু এ কি তাহার জীবনের সঙ্গীরূপে না তার ধর্মের ও কর্মের—ইহার উত্তর ত সে নিজে দিতে পারে না, তবু সঙ্গীরূপে তাহাকে পাইতে সে চায়। একা তাহার ভয় জাগিয়া উঠিতেছে, হৃদয় তাহার কাঁপিয়া উঠিতেছে, মনে হয় সে বড় একাকিনী—সুপ্রিয়কে সে চায়। এ চাওয়া কি শুধুই বন্ধুরূপে, শুধুই মন্ত্রগুরুরূপে! বোধ হয় নয়। তাহাই যদি, তবে আজ সে দর্শনাভিলাষী প্রজাদের দেখা দিতে পারিতেছে না কেন, এত শূন্য নিজেকে বোধ করিতেছে কেন, কেন সে বলিতেছে,

আজ নহে, আজ নহে! সকলের কাছে
মিনতি আমার! আজি মোর কিছু নাহি!
রিক্ত চিত্ত মাঝে মাঝে ভরিবারে চাহি—

বন্ধুই, সঙ্গীই যদি সে চাহিত, সুপ্রিয়র চাইতে যোগ্যতর সঙ্গী পাওয়া ত কঠিন হইত না। কিন্তু সুপ্রিয়কেই তাহার চাই; তাহার সুখ দুঃখ যত, গৃহের বার্তা যত, সব কিছু যে সে আত্মীয়ের মত প্রত্যক্ষ দেখিতে, পাইতে চায়। তারপর, রাজা যেখানে সুপ্রিয়কে পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন, যেখানে কোন পুরস্কারই সুপ্রিয় লইতে চাহিল না, শুধু মালিনীর কাছে

চাহিল তাহার শুভকামনা, তখন মালিনীর বুকের মধ্যে কান্না যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল, বলিতে পারিল না, কিন্তু মনের মধ্যে গুমরাইয়া উঠিল

ওহে রমণীর মন
কোথা বক্ষোমাঝে বসে করিস্ ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয় বিরহিতা
কপোতীর প্রায়।—

তারপর সেই দৃশ্যেই সুপ্রিয় যখন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, তখন রাজা বুঝিলেন

বহুদিন পরে মোর মালিনীর ভাল
লজ্জায় আভায় রাঙা! কপোল উষার
যখন রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার
তপন উদয় হতে দেরি নাই আর!
এ রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার
হৃদয় উঠিছে ভরি—বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি অতক্ষণে
বিকশি উঠিল—দেবী নারে, দয়া নারে
ঘরের সে মেয়ে।

পিতা কন্যার মনের কথা ঠিকই বুঝিয়াছেন। সত্যই, আমাদের মানবজীবনের প্রতিদিনের যে প্রেম ও ভালবাসা, সুপ্রিয়র প্রতি মালিনী সেই প্রেম ও ভালবাসারই আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু তাহা খুব বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, ভাল করিয়া তাহা ফুটিতে পারে নাই, শুধু তাহার উন্মেষ হইয়াছিল মাত্র।

কিন্তু সুপ্রিয়কে যদি সে ভালই বাসিত, তবে সুপ্রিয়র হত্যাপরাধে অপরাধী ক্ষেমংকরের ক্ষমাভিক্ষা সে করিল কেন? ইহার উত্তর স্পষ্ট। সুপ্রিয়র মুখেই ক্ষেমংকরের মহত্ত্বের ইতিহাস, তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ইতিহাস সে শুনিয়াছে, এবং তাহার আদর্শের তাহার কর্মের একান্ত বিরোধী সে হইলেও সে তাহার নিষ্ঠার প্রতি, দৃঢ়তার প্রতি, শক্তির প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধা অনুভব না করিয়া পারে নাই। সেই জন্যই সুপ্রিয়-হত্যার পূর্বে যখন সে একদিকে সুপ্রিয়র প্রতি একটা বেদনাময় ভালবাসার অনুভূতিতে 'প্রিয় বিরহিতা কপোতীর' ন্যায় কাঁদিতেছে, তখনই আর একদিকে সে পিতার কাছে ক্ষেমংকরের প্রাণভিক্ষা মাগিয়া লইতেছে। তারপর, ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে যখন শেষ দেখিতে চলিলেন তখন অজানা আতঙ্কে মালিনীর হৃদয় শিহরিয়া উঠিয়াছিল, সে দেখিয়াছিল, "কি যেন পরম শক্তি আছে ওই মুখে বজ্রসম ভয়ংকর!" সর্বশেষে সেই দৃশ্য—ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়র শেষ আলাপন। সে আলাপনও মালিনীকে অভিভূত না করিয়া পারে নাই—সম্মুখে দাঁড়াইয়াই ত সে সব শুনিয়াছে, দেখিয়াছে! কিন্তু সুপ্রিয়র হত্যার পর শেষ মুহূর্তে যে সে "মহারাজ! ক্ষম ক্ষেমংকরে" বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল, তাহা ক্ষেমংকরকে শ্রদ্ধা করিত বলিয়া নয়, তাহাকে সে ভালবাসিত এমন কোন সন্দেহও করিবার কারণ কিছু নাই। খুব কিছু ভাবিয়া বা বুঝিয়া যে সে তাহা করিয়াছিল তাহাও নহে; আপন অন্তরের ক্ষমাগুণও যে তাহার স্বতঃই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও মনে হয় না। বস্তুত ভাবিবার বুঝিবার কোনও অবসরই তখন ছিল না; অন্তরের কোনও ধর্মই তীব্র আবেগকম্পিত আকস্মিকতার মধ্যে আত্মবিকাশ করিতে পারে না। আমার মনে হয় এই শেষ মুহূর্তের অপূর্ব অভিব্যক্তি

কোনও ভাবের, কোনও চিন্তার বা কোনও অনুভূতির প্রকাশই নয়। মালিনীর মনকে জানিবার এবং বুঝিবার জন্য এই অভিব্যক্তির কোনও মূল্য নাই ; কিন্তু রসসৃষ্টির দিক হইতে এই অভিব্যক্তি অপূর্ব, অতুল ; তুলির একটি অস্পষ্ট রেখায় রবীন্দ্রনাথ এখানে যে বস্তুর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা তাঁহার নাট্যে খুব বেশি নাই। মালিনী সারাটি দৃশ্য সেখানে দাঁড়াইয়া—তাহার সম্মুখ দিয়া একটি ভয়কম্পিত দণ্ড কাটিয়া গিয়াছে ; তাহার শেষে তাহারই সম্মুখে-হঠাৎ সুপ্রিয় হতপ্রাণ হইয়া ভূমিলগ্ন হইয়াছে, ক্ষেমংকর সেই মৃতদেহের উপর পড়িয়া ঘাতককে ডাকিয়াছে, রাজা খড়্গ আনিতে আদেশ দিয়াছেন,— সকলের ভূমিকাই ত শেষ হইল, কিন্তু মালিনী করিবে কি ? এমন কি সে করিবে, যাহাতে নাটকের রসবোধ ক্ষুণ্ণ হইবে না, যাহাতে তাহার চরিত্রের সংগতি রক্ষা পাইবে, নাটকের শেষ পরিণতিটি রক্ষা পাইবে। ক্ষেমংকরের ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া সে কি করিতে পারে, কি সে বলিতে পারে—আর সেখানে তাহার উপস্থিত না থাকিলেই বা সে দৃশ্যের সম্পূর্ণতা কোথায় ? এই সর্বশেষের ক্ষমাভিক্ষা শুধু যে নাট্য-কৌশলের দিক হইতেই সুন্দর ও সম্পূর্ণ তাহা নয় ; মালিনীর সমগ্র চরিত্রটিকেও এই কথা কয়টি একটি নূতন মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। একথা সত্য যে, সে আমাদের চোখে একটু অস্পষ্ট হয়ত হইয়াছে, একটু স্বচ্ছ আবরণে যেন তার পরিচয় ঢাকা পড়িয়াছে , কিন্তু এই অস্পষ্টতা, এই স্বচ্ছ আবরণের জন্যই সে রসসৃষ্টি হিসাবে আমাদের কাছে আরও সুন্দর, আরও মধুর হইয়াছে।

আমি আগেই বলিয়াছি, একটা আইডিয়া একটা প্রত্যয় "বিসর্জন" ও "মালিনী" এই দুইটি নাটকেই বিভিন্ন ভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে . তবে "বিসর্জনে" এই প্রত্যয়টা সমস্ত ঘটনার অন্তরালে না থাকিয়া কতকটা সম্মুখে আসিয়া স্থান দাবি করিয়াছে, "মালিনী"তে তাহা অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে, এতটা উৎকট হইয়া দেখা দেয় নাই। "বিসর্জনে"ও তাহা হইলে রসসৃষ্টি হিসাবে নাটকটি আরও অপূর্ব, আরও সুন্দর হইত সন্দেহ নাই। দু'টি নাটকেই এই সত্যটি ব্যক্ত হইয়াছে একটি তরুণী নারীচিত্তকে আশ্রয় করিয়া , "বিসর্জনে" নিকটতর করিয়াছে অপর্ণা, "মালিনী"তে মালিনী। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটকগুলিতেও আমরা দেখিব কোনও বালক অথবা বালিকাকে আশ্রয় করিয়াই কবি-হৃদয়ের অনুভূত প্রত্যয়গুলি রূপায়িত হইয়াছে। এ কৌশল যে নাট্যবস্তুর রস ও রহস্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তাহা ছাড়া সেই প্রত্যয়গুলির রূপ এবং প্রকাশও সুন্দর এবং জীবন্ত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে।

চার

গান্ধারীর আবেদন (১৩০৪)
সতী (১৩০৪)
নরকবাস (১৩০৪)
লক্ষ্মীর পরীক্ষা (১৩০৪)
কর্ণ-কুন্তী সংবাদ (১৩০৬)

"কথা"-গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে "কাহিনী"র এই নাট্য-কাব্যগুলির কতকটা আলোচনা করিয়াছি। ইহাদের মূল্য যে কাব্য হিসাবেই বেশি, তাহার ইঙ্গিতও সেখানেই করিয়াছি, কিন্তু কাব্যমূল্য আছে বলিয়াই নাটকীয় গুণ ইহাদের নাই, একথা বলা চলে না

বিশেষ ভাবে 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' সম্বন্ধে একথা কিছুতেই প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই নাট্যকাব্যগুলি সম্বন্ধে সকলের চেয়ে বড় ও মূল্যবান কথা হইতেছে, নিত্য শাশ্বত মানবধর্মের অম্লান মহিমার প্রকাশ এবং দৃপ্ত নাটকীয় ভঙ্গিমায় এবং কাব্যের সুর-সুষমায় সেই মহিমার জয়গান। একমাত্র 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অন্য ধরনের। কথাবার্তার ভঙ্গিতে, লঘু তালের ছন্দে এই নাট্যকাব্য রচনাটির মধ্যে আগাগোড়া অনাবিল হাসির স্রোত তরতর্ মুখরতায় চঞ্চলিত, ভাষণ ও প্রতিভাষণ উজ্জ্বল ইস্পাতের তীক্ষ্ণতায় ঝলকিত। এই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা ও মুখর চঞ্চলতার উপর রানী কল্যাণীর চরিত্র-মহিমাটি সুকোমল সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' একাধিকবার অভিনীত হইয়াছে, এবং সে অভিনয় যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, অভিনয়োপযোগী গুণ ইহার আছে এবং ইহার অনাবিল হাস্যরস উপভোগ্য।

এই ধরনের reading drama রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সৃষ্টি করিলেন। একথা সত্য যে "চিত্রাঙ্গদা" ও "বিদায় অভিশাপে"র মতন গীতিমাধুর্য এবং কাব্য-সুষমাই ইহাদেরও বৈশিষ্ট্য; কিন্তু তাহা হইলেও 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' এবং কতকাংশে 'সতী' নাট্যকাব্যটির মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রচিত্রণের নাটকীয় বৈশিষ্ট্য দৃপ্ত ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

'গান্ধারীর আবেদনে' গান্ধারীর চরিত্রে একদিকে পুত্রস্নেহ ও স্বামিধর্ম এবং অন্যদিকে সত্য নিত্যধর্ম; ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রেও পুত্রস্নেহ ও নিত্য মানবধর্মের বিরোধ যে-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার নাটকীয় সম্ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ যাইতে দেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের পরিপুর্ণ আত্মপ্রকাশ নাই, তাহার কারণ, তিনি পুত্রস্নেহে অন্ধ এবং আত্মদৌর্বল্যে পীড়িত ; কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি গান্ধারীর ধর্মদীপ্তির সম্মুখীন হ'ন, সেই মুহূর্তেই এই সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, এবং গান্ধারীর দীপ্তির সম্মুখে তাঁহার দুর্বলতা ধিক্কৃত ও লজ্জিত হয়। সত্য নিত্যধর্মের মুখামুখি না হইলেও সেই ধর্মের দাবি যে কি তাহা তিনি জানেন, এবং দুর্যোধনকে অধর্ম হইতে ফিরাইতে চেষ্টাও করেন, আবার গান্ধারীর সম্মুখে ক্ষীণ বিচলিত কণ্ঠে পুত্রের রাজধর্মের অমোঘ বিধানের সমর্থনও করেন। এই দুর্বলতাকে জয়মাল্য দিবে কে? তাই, ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন ও গান্ধারী উভয়ের কাছেই পরাজিত। ধৃতরাষ্ট্রের এই সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বলীলা গান্ধারীর দৃপ্ত দীপ্তি অপেক্ষাও নাটকীয়। গান্ধারীর হৃদয়ও পুত্রস্নেহে উদ্বেলিত ; কিন্তু সেই স্নেহের বলেই তিনি অধর্মরত পুত্রকে ত্যাগ করিয়া ধর্মকেই রাখিতে চান। তাঁহার আশীর্বাদের অধিকারী দুর্যোধন-বৈরী পঞ্চপাণ্ডব; অন্তরের মধ্যে একদিকে পুত্রের প্রতি স্বভাবজ মাতৃস্নেহ, অন্যদিকে অধর্মরত সেই পুত্রের প্রতি ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিরাগ, একদিকে অনন্ত লজ্জা, অন্যদিকে অপরিসীম দুঃখ, সব কিছু লইয়া অবিচল কণ্ঠে ধর্মের দীপ্তি অনির্বাণ রাখা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইল, তিনিই পারিলেন পাণ্ডবদের উপর এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করিতে,

সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল
উদিবে হে বৎসগণ। বায়ু হতে বল,
সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্যক্ষমা
কর লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর।
* * * নিত্য হউক নির্ভর
নির্বাসন বাস। বিনাপাপে দুঃখভোগ

অন্তরে জলন্ত তেজ করুক সংযোগ—
বহ্নিশিখা দগ্ধ দীপ্ত সুবর্ণের ন্যায়।
সেই মহাদুঃখ হবে মহৎ সহায়
তোমাদের।—সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্মরাজবিধি,—যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ, তখন জগতে
দেব নর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে।
মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক সব মোর আশীর্বাদ
পুত্রাধিক পুত্রগণ। অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক মন্থন।"

এই দ্বন্দ্ব গান্ধারীর চরিত্রে নাটকীয় মহিমা লাভ করিয়াছে।

'সতী' নাট্য কবিতাটিতে নাটকীয় সম্ভাবনা স্ফূর্তি পাইয়াছে পিতা বিনায়ক রাও'র চরিত্রে। একদিকে সমাজধর্ম ও চিরাচরিত সংস্কার, অন্যদিকে স্বভাবজ পিতৃস্নেহ, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব নাটকীয় দীপ্তি লাভ করিয়াছে সেইক্ষণে যখন দেখা গেল সংস্কারান্ধ মাতা রমাবাই মাতৃস্নেহ মাতৃধর্ম ভুলিয়া সংস্কারের মোহে কন্যাকে তুলিয়া দিতেছেন পরপুরুষের চিতায়।

কিন্তু নাটকীয় ভঙ্গিমা ও কাব্য-সুষমা সম্পূর্ণ সংগতিলাভ করিয়াছে, এবং নাটকীয় দীপ্তি সর্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে', কর্ণ ও কুন্তী উভয়েরই মানসিক দ্বন্দ্বের কাব্যময় প্রকাশের মধ্যে। কর্ণের চিত্তে একদিকে পালয়িত্রী মাতা সূতজায়া রাধার প্রতি মমত্ব ও কর্তব্যবোধ, দুর্যোধনের প্রতি বীরের ধর্মবোধ, অন্যদিকে গর্ভদাত্রী মাতার এবং একস্তন্যপায়ী ভ্রাতৃবর্গের প্রতি নবজাগ্রত একাত্মবোধের চেতনা, এই দুইয়ে মিলিয়া যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার নাটকীয় সম্ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্যের অনতিপ্রসার ভূমিকার মধ্যে যথাসম্ভব বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। কর্ণের বীরধর্মের মহনীয় দীপ্তি কুন্তীর মাতৃহৃদয়ের এবং কুরুক্ষেত্র রণধর্মের পটভূমিকায় সমস্ত নাট্যকাব্যটিকে এমন একটি করুণ অথচ সুদৃঢ় মর্যাদা দান করিয়াছে যাহার ফলে নাটকীয় দ্বন্দ্ব যেন আরও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। কুন্তী যে কর্ণের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া আপন প্রার্থনা জানাইতে গিয়াছিলেন তাহা যে শুধু মাতৃধর্মের প্রেরণায়ই নয়, পাণ্ডবদের বিজয় কামনার স্বার্থপ্রেরণাও তাহার মধ্যে ছিল এই ইঙ্গিতও নাট্যাভাস লাভ করিয়াছে কুন্তীর ভূমিকায়, এবং এই স্বার্থলোভের ইঙ্গিতই কর্ণের চিত্তকে বিমুখ করিয়া বীরধর্মে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। ইহার সূক্ষ্ম নাটকীয় অভিব্যক্তি রচনাটির মধ্যে ব্যর্থ যায় নাই।

'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' দুইটিরই উপাদান ভারত কথা হইতে আহৃত; 'নরকবাসে'র উপাদান জোগাইয়াছে পৌরাণিক আখ্যায়িকা; আর, 'সতী'র বর্ণিত ঘটনা 'মিস্ ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়ার্থ সাহেব-রচিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে সংগৃহীত'। এই চারিটি নাট্যকাব্যেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ধর্মবোধ সবলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বকীয় ধর্মবোধই বা বলি কেন, ইহাই তদানীন্তন বাঙালী শিক্ষিত সমাজের সামাজিক ধর্মবোধ। এই সত্য শাশ্বত নিত্য ধর্মবোধই উনবিংশ শতাব্দীর মানস-প্রেরণা। এই

প্রেরণা য়ুরোপে মুক্তি পাইয়াছিল; ইহার সম্বন্ধে সামাজিক চেতনা জাগিয়াছিল ফরাসী বিদ্রোহের ফলে, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধনার ডানায় ভর করিয়া এই প্রেরণা শিক্ষিত বাঙালীর মনকে সমাজধর্ম, রাজধর্ম, ব্যবহারিক ধর্মের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া এক সত্য নিত্য মানবধর্মের সন্ধান দিয়াছিল। এই মানবতার ধর্ম অতীতেও ছিল; য়ুরোপে ছিল, ভারতবর্ষেও ছিল, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে সামাজিক চেতনা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সামাজিক চেতনার জন্ম এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিত্য শাশ্বত ধর্মবোধের জন্ম তাই কিছু আকস্মিক নয়। এই মানবতার ধর্ম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত; এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ রবীন্দ্র-চিত্তকে গড়িয়াছে, রবীন্দ্র-কবি-মানসকেও গড়িয়াছে। সেইজন্য রবীন্দ্র-কবিমানসের অন্যতম বাণী হইতেছে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সত্য শাশ্বত মানবধর্মের জয়গান। রাজধর্ম, ব্যবহারিক ধর্ম, সমাজধর্ম, লৌকিকধর্ম প্রভৃতি নানা কক্ষে মানুষ ধর্মকে ভাগ করিয়াছে; এক ধর্ম অন্য ধর্মকে স্বচ্ছন্দে অবমাননা করে, এবং তাহার ফলে মানবধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিমানস ক্ষুব্ধ, পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়। চেতনাবান কবি অথবা রূপকার, ধর্ম অথবা সমাজ-নায়ক সেই ক্ষোভ ও পরাজয়কেই এমন রূপে ও বর্ণে সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন যে, তাহার বলে পরাজিত ও বিপর্যস্ত মানব-ধর্মই খণ্ডিত ধর্মবোধের উপর জয়ী হয়। রবীন্দ্রনাথ এই চারিটি নাট্যকাব্যে তাহাই করিয়াছেন এবং সার্থক ভাবেই করিয়াছেন; "বিসর্জন", "মালিনী" প্রভৃতি নাট্যপ্রয়াসের মধ্যেও তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। "কথা"-গ্রন্থের অনেক কবিতায়ও এই মানবধর্মের সন্ধানই মুখ্য বক্তব্য। 'গান্ধারীর আবেদনে' দুর্যোধনের রাজধর্মের কাছে গান্ধারীর মানবতার নিত্যধর্ম লাঞ্ছিত ও পরাজিত। 'সতী'নাট্যে অমাবাইর সত্য নিত্য পতি ও সন্তানধর্ম সামাজিক আচারধর্মের পায়ে অবলুণ্ঠিত; 'নরকবাসে' রাজা সোমকের সত্য নিত্য পিতৃধর্ম ক্ষাত্রধর্মের গর্বের নিকট আহত ও অবমানিত, 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে' কুন্তী সমাজধর্মের ভয়ে আদিম মাতৃধর্ম পালন করেন নাই, সেইজন্যই পরে কর্ণের বীরধর্মের কাছে কুন্তীর মাতৃধর্মের দাবী পরাভূত হইতে বাধ্য হইল। কিন্তু সকলক্ষেত্রেই এই লাঞ্ছনা ও পরাজয়, পরাভব ও অবমাননার ভিতর দিয়াই সত্য মানবধর্ম তাহার বিজয়বার্তা ঘোষণা করিয়া গেল; এইখানেই কবির সৃষ্টি-প্রয়াসের সার্থকতা। তবু, যে খণ্ডিত রাজধর্ম বা সমাজধর্ম, লোকাচার বা ব্যবহারিক ধর্মের সংকীর্ণতার প্রতি আমাদের মন বিরূপ হয়, সেই খণ্ডিত ধর্মের যুক্তি ও ভাষণ যাহাদের মুখ হইতে বাহির হইতেছে তাহারা কেহই ক্ষীণ-মানস অথবা দুর্বলকণ্ঠ নহেন; দুর্যোধন অথবা ভানুমতীর যুক্তি ও বাক্য-ভঙ্গিমা, কর্ণের যুক্তি বা ভাষণ তাহাদেরই উপযুক্ত, তাহারা প্রত্যেকে যে যে ধর্মে বিশ্বাসী সেই সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কলাকৌশল অতুলনীয়। তাহা ছাড়া, এই কাব্য-নাট্য ক'টিতে প্রাচীন কাব্য ও পুরাণ ইতিহাসের কাহিনীগুলি যে অতুলনীয় মহিমা ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে, যে নূতন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে, যে নূতন অর্থ-নির্দেশ লাভ করিয়াছে তাহা সম্ভব হইয়াছে নূতন যুগের নূতন মানসদৃষ্টির বলে, এবং সে-সম্বন্ধে কবির সচেতন সৃষ্টি-প্রতিভার সহায়তায়।

"কথা"-গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা পূর্বেই আমি বলিয়াছি যে "কথা" ও "কাহিনী" এই দুই গ্রন্থেরই উপাদান আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে আহৃত। ইহা কিছু আকস্মিক নয়। আমাদের অতীত ইতিহাসের অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা ও কাহিনীর মধ্যে যে ত্যাগ, ক্ষমা, বীরধর্ম এবং মানব-মহত্ত্বের যে-সব গুণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই এই

গ্রন্থ দুইটির প্রাণরস জোগাইয়াছে, এবং পরে ইহারই ধারা গীতিকবিতাকারে প্রার্থনায় রূপান্তরিত হইয়া "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানব-মহত্ত্বের, মানবের চিরন্তন সত্য নিত্য ধর্মের যে মহান রূপ আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে থাকিয়া থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার উপলব্ধিতে ধরা দিয়াছে, এবং এই দুই গ্রন্থে রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি, ফরাসী বিপ্লবের ফলে য়ুরোপে যে-চিন্তাধারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল তাহার আদর্শ ছিল সর্ববন্ধনমুক্ত মানবধর্মের আদর্শ, সত্য নিত্য ধর্মের আদর্শ। উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদেই বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের মনে সেই আদর্শের প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, শতাব্দীর শেষাশেষি বাঙালীর চিত্তে স্বাজাত্যবোধ জাগিবার ফলে এই আদর্শ আরও গভীরভাবে মুদ্রিত হয়, এবং রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই এই আদর্শ শ্রেষ্ঠ বাণীরূপ লাভ করে। এই সত্য নিত্য মানবতার আদর্শ আসিল অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধনার ডানায় ভর করিয়া, কিন্তু রবীন্দ্র-মানসের চেষ্টা হইল এই আদর্শের সন্ধান ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করা। সেই চেষ্টা সার্থক কাব্য ও নাট্য-রূপান্তর লাভ করিল "বিসর্জনে", "মালিনী"তে "কথা"-গ্রন্থের গাথাগুলিতে, "কাহিনী"-গ্রন্থের নাট্যকাব্যগুলিতে।

পাঁচ

ব্যঙ্গকৌতুক : হাস্যকৌতুক (১২৯২-১৩০০)
গোড়ায় গলদ (১২৯৯)
শেষরক্ষা (১৩৩৫)
বৈকুণ্ঠের খাতা (১৩০৩)
চিরকুমার সভা (১৩৩২)
তাসের দেশ (১৩৪০)

একটু মনঃসংযোগ করিয়া যাহারা "মানসী"-কাব্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এই গ্রন্থে কয়েকটি নিছক ব্যঙ্গ কবিতা আছে। 'বঙ্গবীর', 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ', 'ধর্মপ্রচার' প্রভৃতি কবিতাগুলি প্রায় সবই ১২৯৫'র রচনা। বঙ্গাব্দ ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশকে বাংলা দেশের সংকীর্ণ সমতল জীবনধারায় যেমন নূতন প্রবাহের সঞ্চার হইতেছিল, তেমনই আর একদিকে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংকীর্ণ গতানুগতিক জীবনযাত্রার অনেক ফাঁকি অনেক দুর্বলতা, অনেক মিথ্যা-আত্মপ্রবঞ্চনা, অনেক অসংগতি ও অসামঞ্জস্য, অনেক হাস্যকর এবং কৌতুকাবহ ধারণা ও আচরণ শিক্ষিত মনের স্বচ্ছ বোধ ও বুদ্ধিকে পীড়িত করিতেছিল। স্পর্শকোমল রবীন্দ্রচিত্তে ইহা লইয়া বেদনার অন্ত ছিল না! সমসাময়িক নানা বিতর্ক, নানা সমস্যা ও আলোচনা উপলক্ষ করিয়া শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও এই ফাঁকি ও অসামঞ্জস্যের দিকটা ক্রমশ উদ্ঘাটিত হইতেছিল। কবিতার দিক হইতে "মানসী"তেই সর্বপ্রথম দেশের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং দেশবাসীর চরিত্রের নানা ছিদ্রের দিকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং সুতীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপে তিনি তাহাদের আঘাত করিলেন। কিন্তু এই আঘাতের চেষ্টা কবিতারও আগে দেখা দিয়াছিল এক ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ নাট্যে এবং নিবন্ধ রচনায়। নাটকীয় পাত্রপাত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তির ভিতর দিয়াই এই শ্লেষ ও বিদ্রূপ অধিকতর স্পষ্টতা ও দীপ্তিলাভ করে, এই চেতনা নিশ্চয়ই কবির মনে ছিল।

এই শ্লেষ ও বিদ্রূপের আশ্রয়ে দেশের হিত চেষ্টা ছাড়া নিছক আমোদ প্রমোদের একটা ইচ্ছাও যে কবির মনে ছিল, একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথ তখন "বালক" ও "ভারতী" পত্রিকার নিয়মিত লেখক; এই দু'টি পত্রেই লেখকের ব্যঙ্গ রচনার প্রথম প্রবর্তন। ১২৯২ সালের বৈশাখের "ভারতী"তে বাহির হইল, 'রসিকতার ফলাফল', আর ঐ বৎসরেই "বালকে" চলিতেছে তদানীন্তন বাঙালী সমাজকে আশ্রয় করিয়া শ্লেষ ও ব্যঙ্গময় নানাপ্রকার রসরচনা। "হাস্য-কৌতুকে"র সব ক'টি ব্যঙ্গ নাট্যই ১২৯২-৯৩ সালে "বালকে" প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নাট্যগুলি প্রকাশের মুখবন্ধ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

"সূর্যের আলো নহিলে গাছ ভাল করিয়া বাড়ে না, আমোদ প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভাল করিয়া বাড়িতে পারে না।

"আমোদ কর একথা যে বলিতে হয় এই আশ্চর্য। কিন্তু আমাদের দেশে একথাও বলা আবশ্যক। আমরা হৃদয় মনের সহিত আমোদ করিতে জানি না। আমাদের আমোদের মধ্যে প্রফুল্লতা নাই, উল্লাস নাই, উচ্ছ্বাস নাই। * * * দায়ে পড়িয়া, কাজে পড়িয়া, ভাবনায় পড়িয়া সময়ের প্রভাবে আমরা ত সহজেই বুড়া হইয়া পড়িতেছি, এইজন্য কাহাকেও অধিক আয়োজন করিতে হয় না। ইহার উপরেও যদি খেলার সময় আমোদের সময় আমরা ইচ্ছা করিয়া বুড়োমির চর্চা করি, তবে যৌবনকে গলা টিপিয়া বধ করিতে হয়। যতদিন যৌবন থাকে নূতন নূতন ভাব নূতন নূতন জ্ঞান সহজে গ্রহণ করিতে পারি, নূতন কাজ করিতে অনিচ্ছা বোধ হয় না। * * * বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষি জ্ঞান করি—বিজ্ঞলোকের, কাজের লোকের পক্ষে সে-গুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা আমরা বুঝিনা যে যাহারা কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে।" ("বালক", জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২, পৃঃ ৮৯)

এই দুই উদ্দেশ্য-সমন্বয়ের মধ্যে "হাস্যকৌতুক-ব্যঙ্গকৌতুকে"র নাট্য কৌতুকগুলির সৃষ্টি। "হাস্যকৌতুকে"র ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য।

"এই ক্ষুদ্র কৌতুক নাট্যগুলি হেঁয়ালিনাট্য নাম ধরিয়া "বালক" ও "ভারতী"তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড (charade) নামক একপ্রকার নাট্য খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল—আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবে না। এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকে আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।"

য়ুরোপীয় শারাডের সঙ্গে এই নাট্যকৌতুকগুলির সাদৃশ্য অল্পই; শারাডের হেঁয়ালি একান্তভাবেই কয়েকটি শব্দ এবং সেই শব্দগুলির অর্থও অন্যার্থের উপর নির্ভর করে, এবং তাহারই আশ্রয়ে হেঁয়ালি গড়িয়া উঠে। এই কৌতুকনাট্যগুলি মূলত তাহা নয়, যদিও একাধিক ক্ষেত্রে লেখক শব্দ ও শব্দার্থকে আশ্রয় করিয়া এক ধরমের হেঁয়ালি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। সে-চেষ্টা সর্বত্র যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করে নাই, এবং তাহা লইয়া পাঠকের বিব্রত হইবারও কোনও কারণ নাই। ইহাদের সার্থক সাহিত্য মূল্য কৌতুকের। ঘটনার সচরাচর অঘটনতায় অথবা বাড়াবাড়িতে, উক্তি প্রত্যুক্তির অতিশয়তার এবং আবেষ্টন রচনার অসাধারণতা এবং আতিশয্যের মধ্যেই এই ধরনের কৌতুকের মূল; ইহাদের স্বীকার করিয়া না লইলে কৌতুকটুকু উপভোগ করা যায় না। যে-মুহূর্তে লেখক এই আতিশয্য ও অসাধারণত্বটুকু পাঠকের স্বীকৃতির মধ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন, সেই মুহূর্তেই তাঁহার কৌতুক সৃষ্টির সূত্রপাত। কিশোর মনে আমোদ ও কৌতুক সঞ্চার করিবার প্রয়াস এই নাট্যগুলিতে সাফল্য লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কত অভিনয়ে দেখিয়াছি শুধু কিশোরদের কেন, যুবক-প্রৌঢ় বৃদ্ধদের মধ্যেও হাসির হররা পড়িয়া যায়। খুঁটাইয়া দেখিতে গেলে

নাটকীয় সংস্থানের দোষত্রুটি বাহির করা যায় না, এমন নয় ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের নানা তুচ্ছ কথা, দোষ ত্রুটি ইত্যাদি লইয়া নিছক কৌতুক উপভোগে তাহারা কিন্তু বাধা সৃষ্টি করে না। "হাস্য কৌতুকে"র সব ক'টি নাটকই অতি ক্ষুদ্রকায়; বেশ কয়েক মিনিট হাসাইয়া মাতাইয়াই তাহাদের ছুটি। এই হাস্যও আবার একেবারে নির্মল অট্টহাস্য, সূক্ষ্ম গভীর রসিকতার চাপা হাসি নয়, কিংবা তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গের বিদ্যুৎঝলক নয়—ইহাদের আগাগোড়াই হাস্য-কৌতুক বিস্তৃত, যেন একেবারে শরৎকালের সকালবেলার সোনালী রৌদ্র। "হাস্যকৌতুকে"র প্রত্যেকটি নাট্যই এই উক্তির সাক্ষ্য দিবে, বিশেষভাবে, 'রোগীর বন্ধু', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'আর্য ও অনার্য', 'একান্নবর্তী', 'অন্ত্যেষ্টি সৎকার', ও 'গুরুবাক্য'। নাটকীয় সংস্থান নয়, ঘটনার বিন্যাসও ততটা নয়, কৌতুকাবহ বিষয়বস্তু এবং উক্তি-প্রত্যুক্তির কৌতুকময়তার মধ্যেই এই নাট্যগুলির হাস্য ও কৌতুকের মূল।

"ব্যঙ্গ-কৌতুকে" দুইটি নাট্য আছে—'স্বর্গীয় প্রহসন' এবং 'বশীকরণ'। দু'টির মধ্যে 'বশীকরণ'ই উল্লেখযোগ্য। জানি না কেন 'বশীকরণ' আজও যথেষ্ট সমাদর লাভ করে নাই, কিন্তু আমার ত মনে হয়, এক 'চিরকুমার সভা' ছাড়া ঠিক এই ধরনের সার্থক ব্যঙ্গ নাট্য ও প্রহসন রবীন্দ্রনাথ আর রচনা করেন নাই। ঘটনা বিন্যাসে, নাটকীয় গতি ও সংস্থানে, সর্বোপরি বিষয়বস্তুর সংহত সমগ্রতায় 'বশীকরণে'র সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য ; অথচ সমস্ত নাটকটি দাঁড়াইয়া আছে কৌতুকাবহ ভ্রান্তিবিলাসের উপর। একটির পর একটি ভুলের আশ্রয়ে অফুরন্ত কৌতুকের সৃষ্টি—বাংলা দেশের জলবায়ুব পরিবেশে একটি নিখুঁত comedy of errors, এবং তাহাকেই আশ্রয় করিয়া মত, বুদ্ধি ও হৃদয়াবেগের সংঘর্ষ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কৌতুকাবহ দ্বন্দ্ব ও জটিলতার সৃষ্টি করে তাহারই উপর এই স্বল্পকায় ব্যঙ্গ নাটকটির নির্ভর। ১৩৪৮র ২৫শে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে "উত্তরায়ণে"র বারান্দায় কবিব দৃষ্টির নিচেই ইহার শেষ অভিনয় দেখিবার সুযোগ যাঁহাদের ঘটিয়াছে তাহারই সাক্ষ্য দিবেন, এই নাটকটির অপূর্ব অভিনয়-সম্ভাবনার। ইহার ব্যঙ্গ-চতুর উক্তি-প্রত্যুক্তি, ইহার স্বচ্ছ অনাবিল হাস্যরস, সুতীক্ষ্ণ অথচ পরোক্ষ শ্লেষ এবং সমসাময়িক মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ-মানসের দ্বন্দ্ব-চেতনার সংহত সংক্ষিপ্ত নাটকীয়রূপ অধিকতর সমাদরের অপেক্ষা রাখে বলিয়া আমার বিশ্বাস। 'স্বর্গীয় প্রহসন' এই তুলনায় অনেক শিথিল, ইহার শ্লেষ অতি-প্রত্যক্ষ এবং ব্যঙ্গ একটু স্থূল।

কিন্তু "হাস্য-কৌতুক" এবং "ব্যঙ্গ-কৌতুকে"র কৌতুক-নাট্যগুলির আলোচনায় বাংলা দেশের সমসাময়িক শিক্ষিত সমাজ-মানসের একটু আলোচনা অপরিহার্য। দু'টি তারিখ ও ঘটনা এ-সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। একটি, ১২৯০ সালে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নব্যহিন্দু ধর্মান্দোলনের সূত্রপাত ; আর একটি ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-পদ গ্রহণ। শেষোক্ত ঘটনাটির দুই মাস আগে (১২৯১, শ্রাবণ) "প্রচার" ও "নবজীবন" নামে দুইটি মাসিকপত্র প্রকাশ আরম্ভ হয় ; প্রথমটির সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র, দ্বিতীয়টির অক্ষয়চন্দ্র সরকার। এই পত্রের প্রথম সূচনায় রবীন্দ্রনাথ গান, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, কিন্তু পরে আর নয়। ইহাদের প্রকৃত ধারক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি। এই প্রত্যেকটি নামই এক একটি সমসাময়িক ইতিহাস ; সে-ইতিহাস আলোচনার

স্থান এই গ্রন্থ নয়। আমি শুধু ইঙ্গিতগুলি তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে এক নূতন বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম জাঁকাইয়া তুলিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রের কলুটোলার বৈঠকখানার সাহিত্য-সঙ্গত ধর্ম-সঙ্গতে রূপান্তরিত হইল। দেখিতে দেখিতে ধর্ম-সঙ্গত রূপান্তরিত হইল ধর্মান্দোলনে। "চূড়ামণি মহাশয় আলবার্ট হলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রসঙ্গত ধর্মব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের দোহাই জাঁকাইয়া দিতে লাগিলেন" ('অক্ষয়চন্দ্র সরকারের আত্মকাহিনী,' "বঙ্গভাষার লেখক", ৬৪৫ পৃঃ)। অবিজ্ঞানী শিক্ষিত বাঙালী সমাজ মন্ত্রমুগ্ধের মত চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তব্য চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র অভিভূত হইলেন না, এ কথা সত্য, চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম-বিজ্ঞান বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধিকে টলাইতে পারিল না। তবু, যে নব্য হিন্দুতন্ত্র নানা আবর্তনের মধ্য দিয়া বিবর্তিত হইয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন তাহার শ্রেষ্ঠ সমর্থক ও ব্যাখ্যাতা। এই নব্য হিন্দুতন্ত্রই তাহার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যান লাভ করিতেছিল "প্রচার" ও "নবজীবনে", বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্বে' এবং নিয়মিতভাবে অন্যান্য নিবন্ধে। এই সব নিবন্ধ-কথিত ব্যাখ্যা ও মতামত লইয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ বিতর্ক ও বিরোধ-ইতিহাসের সূত্রপাত। সমসাময়িক পত্র ও পত্রিকায়, বিশেষভাবে একদিকে "প্রচার" ও "নবজীবন", অন্যদিকে "ভারতী" ও "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা"য় সেই ইতিহাস পাওয়া যাইবে। কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের বিতর্কে কোন পক্ষেই শ্রদ্ধার অভাব ছিল না; এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গশ্লেষেও কখনও বঙ্কিমকে আঘাত করেন নাই। তবে চূড়ামণি মহাশয়ের প্রভাবে চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সমসাময়িক লেখকেরা যে নব্য হিন্দু ধর্মবিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতেছিলেন, কবিতায়, প্রবন্ধে ও নাট্যে ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সুতীক্ষ্ণ কষাঘাতে তাহাকে জর্জরিত করিতে রবীন্দ্রনাথ কখনও ত্রুটি করেন নাই। চূড়ামণি মহাশয় শিক্ষিত বাঙালী মনকে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত চন্দ্রনাথ বসু স্বয়ং। চন্দ্রনাথবাবু এককালে ছিলেন নাস্তিক, একান্তভাবে যুক্তিবাদী, বুদ্ধিনির্ভর, সেই চন্দ্রনাথবাবুই চূড়ামণি মহাশয়ের প্রভাবে বুদ্ধি ও যুক্তি ফুঁ দিয়া উড়াইয়া হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার-সংস্কার ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ধর্মের দীপ্তি দেখিতে আরম্ভ করিলেন—জাতিভেদ, উৎকট আষাঢ়ি, গুরুবাদ, বাল্যবিবাহ, ধর্মবিলাস, কুসংস্কার ইত্যাদি সমস্তই ধর্মের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দেখিতে পাইলেন। এই ধরনের ভাবতন্ত্রের ছাপ ত "চতুরঙ্গ" উপন্যাসের গোড়ার দিকে সুস্পষ্ট। কিন্তু যে-ভাবতন্ত্র পরবর্তী কালে "চতুরঙ্গে" অপূর্ব সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির বলে আত্মানুসন্ধানে রূপান্তরিত হইয়াছে, সমসাময়িককালে সেই ভাবতন্ত্রের প্রতি একান্ত বিরাগ ছাড়া রবীন্দ্র কবিচিত্তে আর কোনও ভাবানুভূতি ছিল না। চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ লোকদের সাম্প্রদায়িক মতামতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বিতর্কে নামিয়াছিলেন, এবং বৎসরের পর বৎসর তিনি ইহাদের অন্ধ গোঁড়ামির প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। কিন্তু, বিতর্ক হইতেছে বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধ, অথচ এই বিতর্কের একদিকে বুদ্ধি অনুপস্থিত, যুক্তি নির্বাক, শুধুই সংস্কার-অহমিকার এবং ধর্মীয় আস্ফালনের মিথ্যা কোলাহল। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, শুধু বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়া এই অহমিকা ও আস্ফালনকে পরাস্ত করা যায় না। বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে আশ্রয় লইতে হইল শ্লেষ ও ব্যঙ্গের। তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক "মানসী"র ব্যঙ্গ কবিতায়, "হাস্যকৌতুক" ও "ব্যঙ্গকৌতুকে"র ব্যঙ্গ রচনা ও ব্যঙ্গ নাট্যগুলিতে। বস্তুত "হাস্য-কৌতুকে"র 'আর্য ও অনার্য', 'একান্নবর্তী', 'সূক্ষ্মবিচার' ও 'গুরুবাক্য' এই নাটক কয়টি এবং "ব্যঙ্গ-কৌতুকে"র অধিকাংশ রস রচনা এবং শেষ নাটক দুইটি,

"সঞ্জীবনী"তে প্রকাশিত 'দামু ও চামু' নামক ব্যঙ্গ কবিতা ("কড়ি ও কোমলে"র প্রথম সংস্করণে কবিতাটি ছাপা হইয়াছিল, পরে পরিত্যক্ত হয়), "বালকে" প্রকাশিত 'শ্রীচরণেষু' ও 'চিরঞ্জীবেষু' পত্রমালা, জোড়াসাঁকো হইতে প্রিয়নাথ সেন মহাশয়কে লিখিত পত্রে একটি ব্যঙ্গ কবিতা ("ভারতী", ১২৯২, চৈত্র), "মানসী"র ব্যঙ্গ-কবিতাগুলি প্রভৃতি সমস্তই সমসাময়িক ধর্ম ও সামাজিক সমস্যাগত তর্ক-বিতর্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত। এই দ্বন্দ্বই তদানীন্তন শিক্ষিত ও সচেতন সমাজ-মানসের পরিচয়।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এই কৌতুকনাট্য, ব্যঙ্গকবিতা এবং রসরচনাগুলির শ্লেষ ও ব্যঙ্গ এত তীক্ষ্ণ, কষাঘাত এত তীব্র ও প্রায় হৃদয়হীন যে, অনেক সময় মনে হয় লেখক সহৃদয় সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়া এই সমস্যাগুলিকে দেখেন নাই ; সমসাময়িক বিতর্কের উত্তাপ ও আতিশয্য এত বেশি ছিল যে, হয়ত তাহা সম্ভবও হয় নাই। যাহাই হউক, যে কারণেই হউক, এই শ্লেষ ও ব্যঙ্গ গভীর বেদনাবোধ সঞ্জাত নয় ; যে দরদীচিত্ত, যে সহৃদয় সহানুভূতির দৃষ্টি রবীন্দ্র-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, এবং "কড়ি ও কোমল" এবং "মানসী'র দেশ ও সমাজ সম্বন্ধীয় অনেক কবিতায় যে সুগভীর বেদনাবোধ স্বপ্রকাশ, এই ব্যঙ্গনাট্যগুলিতে তাহার পরিচয় নাই। কবির পরবর্তী অনেক রচনায় তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গের বিদ্যুৎদীপ্তি থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই সেই শ্লেষ অপূর্ব করুণায় মণ্ডিত, গভীর বেদনার মধ্যে তাহার মূল। "বশীকরণ" নাটকটিতেই লক্ষ্য করা যায়, ব্যঙ্গশ্লেষের তীব্রতা সত্ত্বেও শ্লেষ ও ব্যঙ্গের যাহা বিষয় সেই দুর্বলতা ও অসংগতিগুলির প্রতি লেখকের একটু স্নেহমিশ্রিত করুণাও আছে। এই করুণা ও বেদনার অনুভূতিই ব্যঙ্গ ও শ্লেষকে গভীরতর রসের দীপ্তি দান করে। অবশ্য নিছক কৌতুক ও আমোদের জন্যই যে নাট্যগুলির রচনা তাহাদের সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য নয়, এবং "হাস্যকৌতুকে" তেমন কয়েকটি রচনাও আছে। "হাস্য-কৌতুকে"র কয়েকটি নাটিকা নিছক আমোদের জন্যই রচনা ; ব্যক্তিগত জীবনের নানা কৌতুকাবহ বিকৃতি ও অসংগতিই তাহাদের উপজীব্য। আবার কয়েকটি নাটিকায় সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থা, অহংবুদ্ধি ও বিজ্ঞানপ্রীতির আতিশয্য, দেশসেবার নানা ত্রুটি ও ছলনা প্রভৃতির প্রতি ব্যঙ্গ ও শ্লেষ সুস্পষ্ট। ইহাদের প্রত্যেকটিই যে সার্থক ব্যঙ্গরচনা এমন বলা যায় না, যেমন 'পেটে ও পিঠে'র রসামোদ সঞ্চারের চেষ্টা একান্তই স্থূল। "ব্যঙ্গ-কৌতুকে" একটি একক-নাট্য (monologue) আছে, 'বিনি পয়সার ভোজ'। এই নাটিকাটিতে নাটকীয় গুণ কিছু নাই, পাঠ্য নাট্য হিসাবেই ইহা বিচার্য ; কিন্তু এমন অনাবিল, ব্যঙ্গশ্লেষবিহীন হাস্যরসের ধারা খুব কম রসরচনার মধ্যেই দেখা যায়। 'বিনি পয়সার ভোজ' সত্যই একটি অনবদ্য রসরচনা।

"গোড়ায় গলদ" রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য নাটক, প্রথম প্রহসন রচনা—১২৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। একেবারে পূর্ণাঙ্গ পঞ্চাঙ্ক নাটক, দৃশ্যের পর দৃশ্য ঘটনার পূর্বাপর যথাযথ বিন্যাসে একটি হাস্যকর কৌতুকাবহ নাটকীয় সংস্থান মিলনের চরম পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। "বশীকরণে"র মতন "গোড়ায় গলদে"র ঘটনাবস্তু এবং ঘটনাগত কৌতুকের মূল ভ্রান্তিবিলাস ; ইহাও বাংলা দেশের একান্ত পারিবারিক ঘরোয়া আবেষ্টনীর মধ্যে কৌতুক ও করুণায় মিশ্রিত একটি মধুর comedy of errors যাহার আবর্তনে ঘটনা জটিল হইতে জটিলতর হয় এবং কৌতুক ঘনীভূত হইতে থাকে, কিন্তু যাহার পরিণতিতে থাকে সকল জটিলতার গ্রন্থিচ্ছেদ, সকল ভ্রান্তির নিরসন এবং পরিপূর্ণ মিলন। উক্তি-

প্রত্যুক্তির মধ্যে তত নয়, বরং কৌতুকের মূলে থাকে ঘটনারই ভ্রান্তিগত জটিলতা; এই ভ্রান্তিমূল-ঘটনার আবর্তই হাস্য ও কৌতুকাবহ রসপরিবেশ সৃষ্টি করে। "গোড়ায় গলদে"র অনাবিল কৌতুকরস এই ভ্রান্তিমূল-ঘটনার আবর্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত। নারীকে লইয়া যুবক মনের উত্তেজনা ও কৌতূহল, পুরুষকে লইয়া কিশোরী চিত্তের উৎসাহ ও কল্পনা আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অনেক সময় যে কৌতুকাবহ আবর্তের সৃষ্টি করে, লেখক নিঃশেষে সেই আবর্তকে শ্লেষ ব্যঙ্গহীন নাটকীয় কৌতুকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রই নিজ নিজ স্বরূপে, আপনাপন বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে, বিশেষ ভাবে নলিনাক্ষ, কমল ও ইন্দু। কিন্তু "গোড়ায় গলদে" সর্বাপেক্ষা যাহা প্রশংসনীয় তাহা ইহার ব্যঙ্গকষাঘাতবিহীন নিরবচ্ছিন্ন কৌতুক। প্রত্যেকটি চরিত্র ও ঘটনার আবর্ত যত হাস্যকরই হউক না কেন, তাহার প্রতি লেখকের যেন একটু কৃপামিশ্রিত স্নেহ ও করুণার পক্ষপাতও আছে, কাহারও প্রতি তিনি নিষ্ঠুর নির্মম নহেন: তাহাদের লইয়া তিনি কৌতুক করিয়াছেন, কিন্তু আঘাত করেন নাই। 'কমেডি'র ত কোনও বাংলা প্রতিশব্দ নাই, বাধ্য হইয়াই প্রহসন বলিতেছি; "গোড়ায় গলদ" যথার্থ 'কমেডি', ঠিক প্রহসন নয়, এবং কমেডি-নায়িকাদের যাহা হওয়া উচিত, ইন্দুমতি ও কমলমুখী ঠিক তাহাই—বুদ্ধিতে দীপ্ত, বাক্যে তীক্ষ্ণ, হাস্যে মধুর ও উজ্জ্বল, সাহসে ও চাতুর্যে দক্ষ। এমন যে নলিনাক্ষ সেও স্পষ্ট এবং জীবন্ত; অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলিও সমান অকুণ্ঠ, সজীব, উদার। "গোড়ায় গলদ" সত্যই 'কমেডি'-হীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'কমেডি'।

কিন্তু তবু "গোডায় গলদ" অভিনয়োপযোগী গুণে কতকটা দুর্বল। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য শিথিল এবং বাক্যবহুল; নেপথ্যবিধান ও স্বগতোক্তি কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটু বিসদৃশ লাগিতে বাধ্য; একাধিক ক্ষেত্রে একই সময়ে বাইরে বন্ধুদের হাস্যালাপ, অন্দরে মেয়েদের ঠাট্টা ও মন্তব্য—বস্তুত যাহা দুইটি দৃশ্য—একই সঙ্গে চলিতেছে। তাহা ছাড়া, মাঝে মাঝে নায়ক নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি একটু বেশি কথায় ভারাক্রান্ত। এই সব দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে কতকটা সচেতনতা কবির মনে নিশ্চয়ই ছিল। সাঁইত্রিশ বৎসর পর ১৩৩৫ সালে তিনি "গোড়ায় গলদে"র একটি মার্জিত রূপ প্রকাশ করেন, নামকরণ হয় "শেষরক্ষা"। "গোড়ায় গলদে" জোরটা ছিল গোড়াকার ভুলটার উপর, "শেষরক্ষা"য় জোরটা পড়িল শেষের পরিণতিটার উপর। নাট্যমঞ্চে "শেষরক্ষা" অভিনয়-সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। বস্তুত "গোড়ায় গলদে"র কোনও ত্রুটিই "শেষরক্ষা"য় আর নাই। আয়তনে না হউক, ঘটনাবিন্যাসে "শেষরক্ষা" দৃঢ় ও সংহত; উক্তি-প্রত্যুক্তি সংক্ষিপ্ত এবং সেই কারণেই সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ; এবং হাস্যরস আরও মার্জিত।

"বৈকুণ্ঠের খাতা" "গোড়ায় গলদে"র পরবর্তী প্রহসন, ১৩০৩ সালের চৈত্রমাসে প্রকাশিত। তিনটি দৃশ্যে স্বল্পকায়, সংক্ষিপ্ত সংঘটন-নির্ভর এই নাটকটি অনিবার্যভাবে হাস্যে উজ্জ্বল করুণায় মধুর ছোট গল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। নিজের রচনার খাতাটির সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠের দুর্বলতা, তাহার স্বার্থলেশহীন সর্বসহা আপনভোলা চিত্তটিকে লেখক কি করুণার কি প্রীতির দৃষ্টিতেই না দেখিয়াছেন। এই নাটকটিও ব্যঙ্গলেশবিহীন অনাবিল হাস্যরসে ভরপুর; এমন যে বৈকুণ্ঠ তাহাকে লইয়াও তিনি হাস্য পরিবেশন করিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্রকেই সহানুভূতি দিয়া ভালবাসা দিয়া বুঝিবার চেষ্টা কোথাও ব্যর্থ হয় নাই, বিশেষত বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশকে, এমন কি, তিনকড়িকেও। প্রত্যেকটি চরিত্রই সুস্পষ্ট,

উজ্জ্বল ; তিনকড়ি ত একেবারে অনবদ্য। বৈকুণ্ঠের মত অসাংসারিক লোক ত সংসারে হাসিরই পাত্র, কিন্তু এই ধরনের চরিত্রের পশ্চাতে যে একটি অনাবিল মধুর ও সুন্দর হৃদয় গোপন থাকে, লেখক অপূর্ব সহৃদয়তায় তাহা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। কেদারের মত লোক ত বৈকুণ্ঠ-অবিনাশের মতন লোকদের সুবিধা লইয়াই তাহাদের স্বার্থবুদ্ধি বিস্তৃত করে, এবং সংসারে সাফল্য লাভের সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায় ; বৈকুণ্ঠ-অবিনাশ, বিশেষভাবে বৈকুণ্ঠ জাতীয় লোকেরা সমাজে হাস্যকৌতুকেরই খোরাক, কিন্তু সেই বৈকুণ্ঠকে দিয়াই যে লেখক পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করাইলেন, তাহাকে আমাদের চিত্তের নিকটতর করিলেন, এখানেই লেখকের অদ্ভুত কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথের আর কোনও হাস্যপ্রধান নাটকেই এই ধরনের সকরুণ মাধুর্য ও সহৃদয়তার পরিচয় নাই ; বস্তুত "বৈকুণ্ঠের খাতা"কে প্রহসন মাত্র বলিতে আমার অত্যন্ত আপত্তি। আমার ত মনে হয়, ইহার অনাবিল হাস্যরস ইহার মূল রস নয় ; ইহার মূল রস করুণার ও মাধুর্যের, হাস্যরস সঞ্চারী রস মাত্র।

"চিরকুমার সভা"র প্রথম আবির্ভাব উপন্যাসরূপে ১৩০৭-০৮ সালের "ভারতী" পত্রিকায়। ১৩১১ সালে হিতবাদী সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে ইহার নাম "চিরকুমার সভা"ই ছিল, কিন্তু ১৩১৪ সালের গদ্য-গ্রন্থাবলীর ৮ম ভাগে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ইহার নামকরণ হয় "প্রজাপতির নির্বন্ধ"। ১৩৩২ সালের বৈশাখ মাসে কবি উপন্যাসটিকে পরিবর্তিত করিয়া একটি নাটক রচনা করেন, এবং তখন "চিরকুমার সভা" নাম পুনঃপ্রবর্তিত হয়। এই নাটকের মধ্যে অনেক অংশ সম্পূর্ণ নূতন, অনেকগুলি গানও নূতন, কিন্তু উপন্যাসের খানিকটা অংশ পরিত্যক্ত হয়। "চিরকুমার সভা" বারবার নাট্যমঞ্চে অপূর্ব সার্থকতায় অভিনীত হইয়াছে ; বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কম নাটকই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এতটা অভিনয়-সাফল্য লাভ করিয়াছে।

"চিরকুমার সভা" উপন্যাসটি সাময়িক পত্রিকার তাগাদায় লেখা। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী তখন "ভারতী"র সম্পাদিকা, তিনি কবিকে বলিয়া পাঠান, অবিলম্বে একটি সামাজিক প্রহসন চাই। সঙ্গে সঙ্গে রচনারও সূত্রপাত। সময়টা তখন বড় জটিল। স্বামী বিবেকানন্দ তখন বাংলাদেশে ও বাংলার বাহিরে কৌমার্যব্রতধারী এক নূতন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছেন ; বস্তুত দেশে তখন কৌমার্যব্রতের প্রতি একটা নূতন অনুরাগ শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যাইতেছে। এই কৌমার্যব্রত এই সংসার-বৈরাগ্যগত সন্ন্যাসের আদর্শ কবি রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগে নাই, নূতন করিয়া যে ভাল লাগে নাই তাহা নয়, কোনদিনই ভাল লাগিত না। প্রথমে কৈশোরে রচিত "প্রকৃতির প্রতিশোধে"ই তাহার প্রমাণ আছে। "চিরকুমার সভা" রচনা করিতে বসিয়া এই সন্ন্যাস-সাধনার জীবনাদর্শ তাঁহার মনের পশ্চাতে ছিল, এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ সুউজ্জ্বল কষাঘাতে সেই আদর্শকে তিনি বিপর্যস্ত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। শুধু "চিরকুমার সভা" উপন্যাসেই নয়। "ক্ষণিকা" প্রায় সমসাময়িক কাব্য, এই কাব্যেই একটি কবিতা আছে,

আমি হবো না তাপস, হবো না হবো না,
যেমনি বলুন যিনি,
আমি হবো না তাপস, নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী।

অর্ধ ঠাট্টায় অর্ধ সংকল্পে "ক্ষণিকা"র এই কবিতাটিতে যাহা বলা হইয়াছে, জীবনদর্শনের

পরিপূর্ণ গভীরতায় ঠিক তাহাই বলা হইল "নৈবেদ্য"র 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' কবিতাটিতে। মনে রাখা প্রয়োজন এই কবিতাটিও একই বৎসরে রচিত।

অথচ, এক ধরনের সন্ন্যাসের আদর্শ রবীন্দ্রনাথেরও ছিল এবং "চিরকুমার সভা" উপন্যাসেও সে-আদর্শের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে শ্রীশের জবানীতে ; কিন্তু সে-সন্ন্যাসী চিরকুমারও ন'ন, সংসার-বিরাগীও নহেন। উত্তর কালে "শারদোৎসব-প্রায়শ্চিত্ত-রাজা"য় এবং অন্যান্য নাটকেও কবি এক ধরনের সন্ন্যাসী গড়িয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু সে-সন্ন্যাসী কৌমার্যব্রতধারী ইহানন্দবিমুখ কঠোর তপোগর্ভ সন্ন্যাসের আদর্শে গঠিত নয় ; শ্রীশের সন্ন্যাসের আদর্শও তাহা নয়।

ইহা ছাড়া আর একটা জিনিসও এই সময় কবির মনের মধ্যে ছিল ; সমসাময়িক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা ইত্যাদি হইতে তাহা ধরা পড়ে। ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় ; এবং তাহার পর হইতে উহাকে আশ্রয় করিয়া দেশের জনগণের জীবনের নানা তথ্য সংগ্রহ, পল্লী-সংস্কার, পল্লী-সমাজ-সাধন ইত্যাদি নানাবিষয়ের দিকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের প্রথম দুই দশকে রবীন্দ্রচিত্তে এই দিকটা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল ; "চিরকুমার সভা" তাহার স্পর্শ এড়াইতে পারে নাই। চন্দ্রনাথবাবুর অনেক উক্তিতে এই চিন্তার অনেক ব্যাখ্যান সুস্পষ্ট, অথচ সেই চন্দ্রনাথবাবুকে লইয়াই লেখক হাস্য-পরিহাসের ত্রুটি করেন নাই, যদিও এই সব ব্যাখ্যান ঠিক প্রহসনের বিষয় নয়। চন্দ্রনাথবাবুর কথাগুলি যে রবীন্দ্রনাথের নিজের তাহা সমসাময়িক প্রবন্ধ-রচনাতে সুস্পষ্ট ; তবে, একথা সত্য যে চন্দ্রনাথবাবুর এই সব মতামত ও ব্যাখ্যান শুধুই ঘটনাবস্তুর আশ্রয় মাত্র ; রসের আশ্রয় হইতেছে চিরকৌমার্যের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপময় দৃষ্টিভঙ্গি। মত ও ব্যাখ্যানগুলি বরং অনেক ক্ষেত্রে এত দীর্ঘ ও বিস্তৃত, এত সুস্পষ্ট ও সরল বিশ্বাস-গভীর যে ব্যঙ্গরহস্যময় পরিহাসোজ্জ্বল প্রহসনে অনেক সময় তাহা অবান্তর বলিয়াই মনে হয় ; এমন কি, বোধ হয় তাহাতে ব্যঙ্গরস খানিকটা ক্ষুণ্ণই হইয়াছে। চন্দ্রনাথবাবুর কথাগুলি ত সত্যই হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিবার মতন নয় ; তাহা ছাড়া এই সব বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান নাটকটির লঘু স্বচ্ছন্দ হাস্যোজ্জ্বল গতিকেও যেন খানিকটা ব্যাহত করিয়াছে। সুখের বিষয়, এই অবান্তর ব্যাখানগুলি অবান্তর হইয়াই আছে, সাক্ষাৎ প্রহসনের সঙ্গে তাহার যোগ অল্পই, পাঠকের বা দর্শকের মনকে তাহা টানিয়া রাখে না।

"চিরকুমার সভা" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, বা উহার অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন কি হাস্যপরিহাসে উজ্জ্বল, কি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঝলকিত এই নাটকখানি ! ঘটনাবস্তুর সংস্থান, কথাবার্তার চালচলনের ভঙ্গি, চিত্ত ও চরিত্র-প্রকৃতি সমস্তই একটি তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল সকাল বেলার রৌদ্রালোকে যেন ঝল্‌মল্ করিতেছে। এত ব্যঙ্গ এত বিদ্রূপ অথচ কোনও রূঢ়তা, কোনও নিষ্ঠুরতা তাহাকে স্পর্শও করে নাই, সুকোমল রুচিকেও কোথাও তাহা আঘাত করে নাই। প্রত্যেকটি চরিত্রই সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল, এমন কি ছোটখাট চরিত্রগুলিও ; আর, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে সহৃদয় সহানুভূতির স্পর্শও সুস্পষ্ট। হাস্যে পরিহাসে বাঙালী জীবনের একটি দিক এমন পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে, এমন সার্থক পরিচয়ে সাহিত্যে রূপান্তরিত হওয়ার অপেক্ষা ছিল। "চিরকুমার সভা" যথার্থ প্রহসন।

"তাসের দেশ" প্রকাশিত হয় '১৩৪০'র ভাদ্রে। নাটকটি ব্যঙ্গবহুল, তবু ইহাকে ব্যঙ্গনাট্য বলিতে ইচ্ছা হয় না, প্রহসন ত নয়ই ; ব্যঙ্গবহুল হওয়া সত্ত্বেও ইহা ব্যঙ্গমূলীয় নয়।

ইহার মূলে একটা গভীর তত্ত্ব আছে, এবং সেই তত্ত্বকে পাঠক ও দর্শকচিত্তের নিকটতর করার উদ্দেশ্য নাটকটিতে সুস্পষ্ট। তাসের সংকেতের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভিতর দিয়া এই তত্ত্বটিকে লেখক উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। বলিবার একটা কথা "চিরকুমার সভা"য়ও আছে, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে লেখকের উদ্দেশ্য আছে অন্তরালে, এবং কথাটিও শুধু অবলম্বন মাত্র; কথাবস্তুগত ব্যঙ্গ এবং তাহার নাট্যরূপই প্রধান। কিন্তু উত্তরকালের অনেক সাংকেতিক বা প্রতীকীনাট্যে যেমন "তাসের দেশে"ও তেমনই কথাটাই হইয়া উঠিয়াছে প্রধান, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপটা গিয়াছে আড়ালে; তাহা ছাড়া, সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও নাট্যমঞ্চে বিভিন্ন চরিত্রের সাজসজ্জায় হাবভাবে চালচলনে কথাবার্তায় ভঙ্গিতে অর্থাৎ এক কথায় তাসের সংকেতচিত্র এবং অভিনয়ে যতটা স্পষ্ট, নাটকটি পাঠের সময় ততটা নয়। তাসের প্রতীকটিরও প্রতীক হিসাবে কোনও অনিবার্যতা নাই, তত্ত্বের সঙ্গে যেন বহির্বাসের মতন জড়াইয়া আছে মাত্র, এবং এই বহির্বাসটাই যেন ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের বস্তু, অথচ তত্ত্বটা মনন-প্রধান। যে 'আষাঢ়ে গল্পে'র ইহা নাটকীয় রূপ, সেই গল্পেই ত গল্পের চেয়ে সংকেতটাই মূল্যবান। "তাসের দেশে"ও ব্যঙ্গ এবং নাট্যের চেয়ে সংকেতটা মূল্য দাবি করে বেশি; অথচ অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, শুধু মঞ্চ ও বেশবিন্যাস বা এককথায় নাটকীয় প্রয়োজন-সমৃদ্ধিতে শুধু ব্যঙ্গসাফল্য নয়, অপূর্ব অভিনয় সাফল্যও লাভ করিয়াছে এই সাংকেতিক নাটকটি।

'একটি আষাঢ়ে গল্প' রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ছোট গল্পগুলির অন্যতম, বহু বৎসর পর রচিত "তাসের দেশে" ইহার অভিনয়-রূপান্তর ঘটিয়াছে, কথায়, গানে, তত্ত্বে ও বিদ্রূপে ইহার আদিমরূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। "তাসের দেশ" আমাদেরই এই জড় সনাতনপন্থী দেশ, যে-দেশের মন অলস, অনড়, নির্জীব, পরিবর্তন-বিমুখ, জীর্ণ নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধা। সেই কাগজের ছুরি, তিরি, ছক্কা, পাঞ্জার তাসের দেশে কোথা হইতে আসিল দুই সাহসী দুরন্ত লক্ষ্মীছাড়া রাজপুত্র ও সদাগর পুত্র। তাহারা আনিল মুক্তির গান, অশান্ত উদ্দাম চঞ্চলতা, নিয়মের অবাধ্যতা। তাসের দেশে ভাঙন ধরিল, স্বাধীন ইচ্ছা জাগিল, প্রাণশক্তি উদ্বোধিত হইল, কাগজের পাঞ্জা ছক্কা তাসের মানুষ রক্ত-মাংসের সজীব মানুষ হইয়া উঠিল। ইহাই "তাসের দেশে"র তত্ত্ব, এই তত্ত্বই বিভিন্ন রূপে ও ভাষায় আছে "ফাল্গুনী"তে, আছে "অচলায়তনে," আছে অসংখ্য কবিতায়, অথচ "ফাল্গুনী-অচলায়তনে" তাহার কি সুন্দর মধুর গভীর রূপ। আসল কথা, এ তত্ত্ব এত সুন্দর ও গভীর, এত চিরন্তন যে ব্যঙ্গমূলীয় সংকেতে প্রতীকে তাহার রহস্য যথার্থ সৌন্দর্য গরিমায় উদ্ভাসিত হইবার সুযোগ পায় না, অন্তত "তাসের দেশে" তাহা হয় নাই। তবু, ইহার স্থানে স্থানে যে কাব্যময় কল্পনা, যে সুরচ্ছন্দ থাকিয়া থাকিয়া মুক্তি পাইয়াছে, যে-ব্যঞ্জনা মাঝে মাঝে সংকেতাশ্রয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ছয়

রবীন্দ্রনাথ একান্ত গীতধর্মী কবি, একথা সকলেই জানেন। তাঁহার এই গীতধর্মী মানস শুধু যে বিচিত্র কাব্যরূপের মধ্যেই প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহা নয়; নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস এমন কি প্রবন্ধ-রচনায়ও এই মানসের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। যে সাহিত্য-রূপের মধ্যে কল্পলোকের সংকেত ও রহস্য প্রকাশের অবসর বেশি, মনের লীলা যেখানে অবাধে

পক্ষ বিস্তারের সুযোগ পায়, রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের প্রসার এবং বৈচিত্র্যও সেইখানেই তত বেশি। কিন্তু যেখানে এই বস্তু-জগতের ঘটনা ও পরিবেশের তরঙ্গলীলা এই ইন্দ্রিয় জগতের সকল দৃশ্য বস্তুকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, বস্তু-পরিবেশ সম্বন্ধে একান্তভাবে চিত্তকে সজাগ রাখে, রবীন্দ্র-মানস সেই জাগ্রত বিক্ষুব্ধ বিচিত্রতার মধ্যে সহজ বিহারের আনন্দ খুঁজিয়া পায় না, সর্বদাই তাহার পশ্চাতে সংকেত রহস্যময় ইন্দ্রিয়াতীত ভাব-বস্তুটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তবে তাহার প্রতিভা তৃপ্তি পায়। সেইজন্যই আমার মনে হয় শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় যখন বলিয়াছিলেন

"—রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ছোটগল্পে, উপন্যাসে, যুরোপীয় সাহিত্যের যে মূল সুর তাহার বিচিত্র খেলা আছে, বিশ্বমানবিকতায় তিনি বাল্‌জাক, ব্রাউনিং, হুগো প্রভৃতি কোনো লেখক হইতেই নূন্যতর ন'ন বটে, তবে তাঁর মানব সৃষ্টিতে সেই বৈচিত্র্য কোথায়, সে বাস্তবতা কোথায়, সে অভিজ্ঞতার স্তরপর্যায় কোথায়, সে উত্থানপতনের তরঙ্গমালা কোথায়, সে পাপপুণ্যের ঘাত-প্রতিঘাত কোথায়, যাহা সমুদ্রের মত য়ুরোপীয় সাহিত্যকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে। এইজন্য লিরিক কাব্যে যেখানে বস্তুর বালাই নাই, শুধু ভাবের লীলা সংগীতে তিনি ক্রন্দমান সেখানে তিনি অতুল। এইজন্য ছোট গল্পে যেখানে ঘটনার চেয়ে ঘটনার মর্মনিহিত সুরটিই রচনার যোগ্য সেখানেও তাঁর তুলনা নাই, কিন্তু নাট্যোপন্যাসে নয়, অবশ্য রূপক নাট্য বাদে।"

তখন তিনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথ ঠিক বাল্‌জাক্, ব্রাউনিং বা হুগোর যুগের লেখক নহেন, পৃথিবীর চিন্তাধারা, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শ সে যুগ হইতে অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে। ঘটনার স্তর-পর্যায়, উত্থান-পতনের তরঙ্গমালা মানব হৃদয়কে বিচিত্র দোলায় দোলা দেয়, চিত্তকে সংক্ষুব্ধ করে এ কথা সত্য, কিন্তু য়ুরোপীয় সাহিত্যও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেই এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল যখন সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, বাস্তব ঘটনার তরঙ্গলীলার মধ্যে, মানুষের জীবনের সংক্ষুব্ধ সংগ্রামের আপাত অভিভবের মধ্যে বুদ্ধি ও কল্পনাকে নিবদ্ধ হইতে দিলে অন্তরের সংকেত রহস্যটিকে ধরা যায় না; তাহাকে খুঁজিতে হইবে সকল ঘটনার সকল সংগ্রামের গভীরে যেখানে ঘটনার অর্থটি নিহিত। সেইজন্য কি ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ, কি ইব্‌সেন, কি মেটারলিংক, কি ইয়েট্‌স, সকলের রচনার মধ্যেই পাই একটি নীরবতার সাধনা, একটি মুখর স্তব্ধতার পূজা—ইহাদের, বিশেষ করিয়া মেটারলিংকের বা ইয়েট্‌সের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে আছে একটি মগ্ন চৈতন্যের রাজ্য যেখানে একটি মানবাত্মা অপর একটি মানবাত্মার সঙ্গে, প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে বাক্যহীন ভাষায় কথা বলে। কর্ম-ক্লান্ত সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধ য়ুরোপের মর্মস্থল হইতে একটি আর্তনাদ ইহাদের শ্রুতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে-আর্তনাদের সান্ত্বনা ইহারা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে শুরু করিয়া প্রথম মহাসমর পর্যন্ত য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই জিনিসটিই শিল্পরূপ পাইয়াছে যে, শান্তি ও নীরবতার মধ্যেই মানুষ মানুষকে চিনিতে পারে ও জানিতে পারে; উত্থান-পতনের, ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গমালার মধ্যে নয়, মানুষের একটুখানি শান্ত দৃষ্টির মধ্যে, একটি মুহূর্তের নীরব পরিচয়ের মধ্যে, একটি মাহেন্দ্রক্ষণের হস্তস্পর্শের মধ্যেই জীবনের রহস্য নিহিত আছে, সেই একটি মুহূর্তেই যাহা জানিবার, বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার, তাহা আমরা জানিতে, বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারি। ইহাই হইতেছে প্রাক্ প্রথম মহাসমর য়ুরোপীয় সাহিত্যের মূল সুর, য়ুরোপে ইহার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের সাহিত্যনায়কেরা। মেটারলিংক নিজেই তাহার একটি প্রবন্ধে এই সুরের আভাস প্রদান করিয়াছেন,

"Indeed, it is not in the actions but in the words that are found the beauty and greatness of tragedies that are truly beautiful and great, and this is not solely in the words that accompany and explain the action, for there must perforce be another dialogue beside the one which is superficially necessary And, indeed, the only words that count in the play are those that at first seemed useless, for it is therein that the essence lies. Side by side with the necessary dialogue you will almost find another dialogue that seems superfluous, but examine it carefully, and it will be borne home to you that this is the only one that the soul can listen to profoundly for here alone it is the soul that is being addressed.' ('The tragical in daily life" "The treasure of the humble" p. 111)

মেটারলিংক অন্যত্র বলিয়াছেন,

"It is no longer a violent exceptional moment that passes before our eyes— it is life itself Thousands of laws there are mightier and more venerable than those of passion . ..It is only in the twilight they can be seen and heard, in the meditation that comes to us at tranquil moments of life"

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই সংকেত-রহস্যের অনুগামী কবি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক। কিন্তু সাহিত্যের এই যে বিশিষ্ট সুর, ইহা রবীন্দ্রনাথের কাছে একেবারে নূতন কিছু নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সমস্ত মর্মকে উদ্ঘাটন করিয়া এই আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সত্যকেই জীবনে সাধনা করিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের আদিপর্বের সমস্ত সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার ভিতর হইতে এই চিরন্তন সত্যটিকেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন ঘটনা ও কর্মকৃতির ভিতর তাঁহার কবিধর্ম ততটা বিকশিত হয় নাই, যতটা হইয়াছে তাহা হইতে নির্যাসিত ঘনরসের ভিতর। তিনি যখন পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন তখন যাহা দৃশ্য যাহাকে ধরিতে ছুঁইতে ভোগ করিতে পারা যায়, তাহার মধ্যে তিনি আনন্দসৃষ্টি করিতে পারেন নাই, খুঁজিয়াছেন সংকেতকে, অরূপকে, রূপাতীতকে। জীবনের দৈনন্দিন অসংখ্য ঘটনার উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু মন ডুবিয়া গিয়াছে তাহাদের অনেক নিচে, সেই অন্তরের তলদেশে যেখানে কোনও কথা নাই, কোনও কাজ নাই, আছে শুধু একটি প্রশান্ত স্থির অথচ সুতীব্র অনুভূতির সুর।

গান ও কবিতা, নাট্য ও নিবন্ধ, গল্প উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ অজস্র রচনা করিয়াছেন; কিন্তু, আজ যদি কেহ প্রশ্ন করে, কোন্ বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা সম্যকরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে হঠাৎ তাহার কিছু জবাব দিতে পারা যায় না। তবে একটা জিনিস খুব সত্য বলিয়া মনে হয় যে, মানব-চিত্তের দ্বন্দ্ব যেখানে যত নিবিড় ও প্রবল, সংগ্রাম যত সূক্ষ্ম ও বিচিত্র, অথচ কার্যের মধ্যে, বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে, দৃশ্য ঘটনার মধ্যে যাহার প্রকাশ খুব কম এবং সেই অনুপাতে হৃদয়ের মধ্যে যাহার অনুভূতি খুব তীব্র, মানব চিত্তের সেই রহস্যের গভীরতা যেখানে যত বেশি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেইখানে তত বেশি ফুটিয়াছে। সেইজন্য দেখি যেখানে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত খুব বেশি, জগৎ ও জীবনের উত্থান-পতনের তরঙ্গমালা যেখানে ঠেলাঠেলি করিয়া মরিতেছে, শতকণ্ঠের কোলাহল যেখানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেইখানে মূক হইয়া গিয়াছেন। সেই কলহের মধ্যে সেই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে উত্থান-পতনের তরঙ্গ-লীলার মধ্যে তিনি নিজেকে কখনও ভাল করিয়া জড়াইতে পারেন নাই, দূরে থাকিয়া এ সকলের অন্তরের মধ্যে যে মূল সুরটি তাহাই

ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্য নাটক বলিতে সাধারণত যে ঘটনা-বহুল বৈচিত্র্যবহুল সাহিত্যের রূপ আমরা বুঝিয়া থাকি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সে-নাটকের সৃষ্টি নাই। তাঁহার হাতে নাটক যে-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা মোটেই ঘটনাগত নহে, ভাবগত। এবং এইজন্য রবীন্দ্র-নাট্যের একটা বিশেষ রূপ আছে, তাহা বাংলা নাট্য-সাহিত্যে ত নাই-ই, সংস্কৃত নাট্যেও ঠিক তেমনটি দেখা যায় না। কিন্তু ঘটনার লীলাবৈচিত্র্যই যাহার প্রাণ, যেমন সাধারণ নাট্য ও উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেইখানে সার্থক হইতে পারে নাই। সেইজন্যই উপন্যাস তাঁহার হাতে ততটা জমিয়া উঠে নাই, যতটা জমিয়াছে ছোটগল্প, যেখানে বস্তুর ঠেলাঠেলি নাই, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নাই, আছে শুধু বস্তুর পশ্চাতে ঘটনার পশ্চাতে বস্তুর ও ঘটনার ভাবরূপ। সেইজন্যই গীতিকাব্যে, ভাবনাট্যে, ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। উপন্যাসেও সেইখানেই তিনি সার্থকতা লাভ করিয়াছেন যেখানে এক একটি চরিত্রের মধ্যে মানবচিত্তের অতি সূক্ষ্ম সুকঠিন ভাবরহস্যকে তিনি রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন; সেখানে তিনি অতুল।

আমার ত মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাব ও চিন্তাকে যখন একটা সাংকেতিক রহস্যের ভিতরে নাট্যরূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহার মধ্যে তিনি শিল্পময় জীবনকে ততটা স্থান দিতে চাহেন নাই, যতটা চাহিয়াছেন সমস্ত জীবনকে একটা পরিপূর্ণ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করিতে। আমাদের প্রতিদিনের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের, আমাদের কাল্পনিক ও ব্যবহারিক জগতের পশ্চাতে, আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রকৃতির পশ্চাতে যে সব সুমহান সত্য নিরন্তর বিচিত্র ছন্দে আলোড়িত হইতেছে তাহাকেই রূপ দান করিতে। তাঁহার কবিতাগুলিতে আমরা দেখি জীবনের নানান বিচিত্র দুঃখ ও বেদনা তৃপ্তি ও আনন্দের অনুভূতিকে তিনি খণ্ড খণ্ড ভাবে উপভোগ করিয়াছেন, এক ভাবলোক হইতে অন্য ভাবলোকের মধ্যে ধীরে ধীরে আপনার রূপতৃষ্ণা রসতৃষ্ণাকে রূপায়িত করিয়াছেন, কিন্তু নাটকের মধ্যে ঠিক এই জিনিসটির অভিজ্ঞতা আমরা খুব কমই পাই। সেখানে আমরা পাই, জীবনের যে ভাবলোকের মধ্যে যখন তিনি বাস করিয়াছেন তাহার সমস্ত খণ্ড ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা ও অনুভব এক হইয়া গিয়া একটা পরিপূর্ণ সত্যকে ব্যক্ত করিতেছে। "শারদোৎসব" হইতে আরম্ভ করিয়া কি "ডাকঘর" কি "ফাল্গুনী", কি "মুক্তধারা", কি "রক্তকরবী" সর্বত্রই এই জিনিসটা কেমন করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে আমরা ক্রমে তাহা প্রত্যক্ষ করিব।

নাটক বলিতে সাহিত্যের একটা বিশেষ ভঙ্গিমাকে আমরা বুঝিয়া থাকি যাহা কাব্য কিম্বা উপন্যাস হইতে পৃথক। কবি যখন কাব্য রচনা করেন, তখন তিনি নিজেই আপন মনে কথার পর কথা বিচিত্র ছন্দে গাঁথিয়া তোলেন। প্রাচীন মহাকাব্য ছিল আবৃত্তির জন্য; এখনকার গীতিকাব্যও ঠিক আবৃত্তির জন্য না হইলেও আপন মনে পাঠ করিবার জন্য। তাহার রস ও সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য কবিকে কিংবা পাঠককে তাঁহার সঙ্গে আর কাহারও উপস্থিতিকে কল্পনা করিতে হয় না। উপন্যাসেও তাহাই; উপন্যাস স্বয়ং-সম্পূর্ণ। লেখক তাঁহার কল্পনা ও সৃষ্ট চরিত্রের সার্থকতার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন মনে করেন উপন্যাসের মধ্যে সবটুকুই বলিবার ও প্রকাশ করিবার সুযোগ যথেষ্ট। কিন্তু নাটকে কিছুতেই তাহা সম্ভবপর নয়। উপন্যাসে ভাবের ও ঘটনার বিবৃতি আছে, বর্ণনা আছে; কিন্তু নাটকে আছে কথার ও গতির সাহায্যে বাস্তব ঘটনার অনুবৃত্তি বা অনুকরণ। অভিনয়ের সাহায্য ছাড়া নাটকে বর্ণিত কথা ও সৃষ্ট চরিত্রকে পূর্ণতর করিয়া দর্শকের আঁখির

দৃষ্টি ও মনের অনুভবের মধ্যে ফুটাইবার সুযোগ নাই, তাহার জন্য নির্ভর করিতে হয় অভিনেতার উপর, রঙ্গমঞ্চের উপর। সেইজন্যই সাহিত্যের এই বিশেষ রূপ অভিনেতা ও অভিনয়-মঞ্চ ও দর্শকের সঙ্গে একান্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; শুধু পুস্তকের মধ্যে তাহার সমস্ত কথা ও ঘটনার বিবৃতি পাঠ করিয়া নাট্যরসের সম্পূর্ণ উপলব্ধি কিছুতেই হয় না। নাটক পড়িবার সময় সর্বদাই এমন করিয়া সজাগ রাখিতে হয় যে তাহার বর্ণিত সমস্ত বস্তু ও দৃশ্য যেন চোখের উপর অভিনীত হইতেছে, কিন্তু উপন্যাসে ইহার ততটা প্রয়োজন অনুভব করা যায় না। নাটকের এই বিশেষ ভঙ্গি আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাচীন গ্রীক নাটক হইতে আরম্ভ করিয়া বহু দিন- পর্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছে; আমাদের কালিদাস-ভবভূতির নাটক, গ্রীসের য়্যাটিক্ ট্র্যাজেডি, ইংলণ্ডের ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি, অথবা তাহার পরে রোমাণ্টিক যুগেব নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের নাটকের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। অভিনয়েব পাত্রপাত্রীর, রঙ্গমঞ্চের ও প্রেক্ষাগৃহের সজ্জা ও ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি নাট্য-রীতির আদর্শ দেশে দেশে যুগে যুগে পরিবর্তিতও হইয়াছে, কিন্তু নাটকের এই মূল সূত্রটিকে এ পর্যন্ত কেহ অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাটকের এক নূতন রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি হঠাৎ হয় নাই; ইহার পশ্চাতে একটু ইতিহাস আছে। ইংরেজী সাহিত্যে ব্লার্ড সন্থার্থ, শেলি, ফরাসী সাহিত্যে বদ্‌লেয়ার প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষকে তাহার সমস্ত কথা ও কর্মকে, প্রকৃতিকে, তাহার সমস্ত প্রকাশকে একটা অপরূপ অবাস্তব রহস্যের দিক হইতে—ইংরেজীতে যাহাকে বলি symbolical বা mystical দিক হইতে—বুঝিবার ও জানিবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে। এই প্রয়াস সব চেয়ে বেশি করিয়া ফুটিয়াছে নাট্যে, কবিতায় ও ছোট্ট গল্পে; তাহারই ফলে মেটারলিংক্, স্ট্রিণ্ড্‌বার্গ, ইয়েটস্, আন্দ্রিফের রূপক-নাট্য। এই রূপক-নাট্য অভিনয়মঞ্চ বা দর্শককে যেন কতকটা অবজ্ঞা করিয়াই চলিয়াছে; নাটক বলিতে আমরা এতদিন যাহা বুঝিয়া আসিয়াছি, রূপক-নাট্যের মধ্যে তাহার সবটুকু যেন কিছুতেই পাই না। অভিনীত না হইলেও ইহার মর্ম কথাটিকে বুঝিবার, ইহার রস ও সৌন্দর্য উপভোগ করিবার সুযোগের কিছু অভাব হয় না। না হইবার কারণও আছে। পূর্বে যে মগ্নচৈতন্যের রাজ্যের কথা, নীরবতার সাধনা, স্তব্ধতার পূজার কথা বলিয়াছি তাহা রূপক বা রূপাতীত রাজ্যের সৃষ্টি। সে-সৃষ্টির মধ্যে বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব নরনারীর সত্যকার কোনও স্থান নাই; নাটকের প্লটের, তাহার নরনারীর গতিব বা কর্মের কোন প্রাধান্য সেখানে নাই বলিলেও চলে। কোন চরিত্র হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভিনয়-মঞ্চের উপর চুপ করিয়াই কাটাইয়া দেয়; কেহ হয়ত দু'টি একটির বেশি কথা বলে না, কেহ হয়ত প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিতই থাকিয়া যায়, কেহ হয়ত গানের পর গান গাহিয়াই চলে—খুব একটা সচল গতি, একটা দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম মঞ্চের উপর মুখর করিয়া তুলিবার সুযোগ সেখানে খুব কমই পাওয়া যায়। সেই জন্যই দেখা গিয়াছে রূপক-নাট্য অভিনয়ের জন্য সব সময় একটা অভিনয়-মঞ্চেরও দরকার হয় না, যে কোনও গৃহে অথবা মুক্ত আকাশের নিচে একটা স্থান নির্দিষ্ট করিয়া আগাগোড়া একই দৃশ্যপটের সম্মুখে সবটুকু অভিনয় করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী", "শারদোৎসব", "ডাকঘর" প্রভৃতি নাটকের অভিনয়-সজ্জা সেই জন্যই এত সহজ, সরল ও নিরলংকার। না হইবে বা কেন? রূপক-নাট্য প্রথম হইতেই দৃশ্য বাস্তব-ঘটনাকে, বাস্তব-চরিত্রকে কিছুটা অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, মানিয়া লইয়াছে ঘটনার ও চরিত্রের যাহা রূপ তাহার

পশ্চাতের অরূপ অপ্রকাশকে, ইন্দ্রিয়-প্রকাশের পশ্চাতে অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিতকে, এই অরূপ অতীন্দ্রিয় জগৎই সাংকেতিক রহস্য-নাট্যের জগৎ। সেই হেতুই দর্শক ও অভিনয়-মঞ্চ কতকটা লেখকের বিচার-বিবেচনার পশ্চাতে পড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে এবং নাটকের মধ্যে যে সত্য ও যে-ভাবের প্রকাশ লেখকের উদ্দেশ্য সেই সত্যটাই সমস্ত ঘটনার সমস্ত কথাবার্তা চালচলনের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার Gerhart Hauptmann-এর কথায় এই রূপক নাট্যের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

Action upon the stage will I think give way to the analysis of character and to the exhaustive consideration of the motives which prompt men to act Passion does not move at such headlong speed as in Shakespeare's day so that we present not the actions themselves but the psychological states which cause them "

ইহাই সাংকেতিক রহস্য নাট্যের রূপ। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাট্য প্রয়াসগুলি এই রূপ, এই ভঙ্গিমার ভিতর দিয়াই রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এক হিসাবে এই রূপক নাট্যগুলি ছোটগল্পের নাট্যরূপান্তর মাত্র। মেটারলিংকের "L 'Intruse," "Les Sept Princes," "L 'Interieur" প্রভৃতি নাটকগুলি যাহারা পড়িয়াছেন, ইয়েটসের নাটক, রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর", 'অচলায়তন," "রক্তকরবী" প্রভৃতি যাহারা পড়িয়াছেন, তাহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের নাটকগুলির সত্যকার কোন প্লট নাই, কোনও গল্প নাই। যুরোপীয় সাহিত্য সমালোচকেরা ত এই ধরনের নাটককে সোজা no-plot plays বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই যে রূপকের কথা বলিতেছি ব্যঞ্জনার কথা বলিতেছি, ইহার অর্থ কি?

আমাদের চিত্তে এক এক সময়ে এক একটা কল্পানুভূতির স্পর্শ আসিয়া লাগে এমন একটা রাজ্যের আভাস আমরা পাই, যাহাকে এই দৃশ্য বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আনিয়া কিছুতেই রূপ দেওয়া যায় না, যে-রাজ্যের সঙ্গে আমাদের এই প্রতিদিনের সংসারের কোনও মিল, কোনও যোগ নাই, অথচ মনের মধ্যে এই অনুভূতি এত তীব্র, এত প্রবল, এত সত্য যে, তাহাকে কিছুতেই এড়ান যায় না, তাহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই যে কল্পানুভূতি ইহার আভাস মানুষকে দিতে হইবে, কাজেই কবিকে, লেখককে আমাদের বাস্তব জগতের ভাষা এবং কর্মকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কবি যখন এই আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনই বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে অন্তরের অধ্যাত্ম-চিন্তাধারার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহাতেও কবির অতৃপ্তি থাকিয়া যায়, কারণ, যে কথার যে ভাষার যে-কর্মকৃতির আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেন, তাহারা কিছুতেই তাঁহার সূক্ষ্ম সুগভীর ভাব ও অনুভূতিকে পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। কাজেই কথাগুলি কর্মকৃতিগুলি তাঁহার নিকট শুধু ছায়া মাত্র, আভাস মাত্র, গভীরতর অর্থের দিকে শুধু ইঙ্গিত করে মাত্র, তাহাকে পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে পারে না। প্রায়ই দেখা যায় এই ধরনের রচনার মধ্যে অতি ছোট একটি কথা, অতি সাধারণ একটু আলাপ, নগণ্য ক্ষুদ্র একটি প্রাণী একটি অতীন্দ্রিয় অবাস্তব গভীরতর জগতের আভাস দেয়, অথচ কিছুতেই তাহাকে সুনির্দিষ্টভাবে বুঝা যায় না। সেই জন্যই প্রতীকী কবিতায়, নাট্যে, সমগ্র সাহিত্য-বস্তুটি জুড়িয়া একটি মায়াময় কুহেলিকা যেন সব কিছুকে ঢাকিয়া রাখে, পাঠকের চিত্তের উপর একটা মায়াস্পর্শ বুলাইয়া দেয় এবং মনের

মধ্যে একটা স্বপ্নরাজ্য গড়িয়া তুলে। "ফাল্গুনী"র কিংবা "শারদোৎসবে"র কিংবা "ডাকঘরে"র হঠাৎ-বলা অনেকগুলি কথা আমরা ধরিতে বা বুঝিতে পারি না; বাস্তবিক পক্ষে সে-কথাগুলি ধরিবার বা বুঝিবার জন্য নয়, অনেকগুলি কথা মিলিয়া একটা অনুভবের আভাসমাত্র মনের মধ্যে জাগাইবার জন্য। 'মহারাজ, আমার কথা বুঝবার জন্য নয়, বাজবার জন্য' ("ফাল্গুনী"), এ-কথাটার একটা অর্থ আছে। সত্যই, প্রতীকী রচনায় সব কথা বুঝিবার জন্য নয়, শুধু মনের মধ্যে একটা সুর বাজাইবার জন্য; ইহাই রূপক-রচনার সবখানি। "ডাকঘরে"র ঠাকুর্দা অথবা অমল, অথবা ডাকহরকরা প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রায়ই কতকটা হেঁয়ালি; "রক্তকরবী"র রঞ্জন, রাজা, নন্দিনী, এদের কিছুতেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, কারণ সমগ্র রচনাটি কোথাও ইহাদের ব্যক্তিত্বের দিকে, ইহাদের কর্মকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে না, করে আমাদের দৃশ্য বস্তুর ও জগতের প্রত্যন্ত প্রদেশের সীমা ছাড়াইয়া একটা কল্পজগতের দিকে। রঞ্জন, নন্দিনী, অমল, এরা সবই সেই কল্পজগতের অধিবাসী, কাজেই এদের ভাষা রাজা অথবা কবিরাজ মশায় বা ঠাকুর্দা ইহারা সহজে বুঝিতে পারে না; আর আমরা পাঠকেরাও তাহাদের কথার সুরটুকু শুধু ধরিতে পারি, কথাটিকে পারি না, কায়াটি ছায়ার মত মিলাইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সব প্রতীকী নাট্যেই পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রে যাহাকে বলে ঘটনা বা action তাহা নাই বলিলেই চলে, শুধু একটু কাঠামো মাত্র আছে; তাহারই ভিতর দিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া মানব-মনের ও প্রকৃতি-জগতের একটি সুমহান সুমধুর সত্য আমরা আবিষ্কার করি। মানুষ যে অনির্বচনীয় অন্ধকারের মধ্যে তাহার অন্তরের মণিটিকে হারাইয়াছে, কবি যেন একটু জ্যোতির ইঙ্গিতে সকলকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে চাহেন। কবিরাজ আসিয়া চরক-সুশ্রুত হইতে শ্লোক উচ্চারণ করেন, রাজা শারদোৎসব করিতে বাহির হ'ন, অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, লোহার জাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া রাজা সকলের সঙ্গে উৎসবে যোগদান করেন, ঘটনা হিসাবে ইহাদের মূল্য কতটুকু? ইহারা ত মায়া ছায়া মাত্র, কিন্তু ইহারাই এক একটি অমূল্য সত্যকে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। অমল মরিয়া যায়, উপনন্দ বসিয়া বসিয়া প্রভুর ঋণ শোধ করে, আর নন্দিনী-রঞ্জন প্রাণ দেয়, কিন্তু ইহারা যে সত্যের আভাস দিয়া যায় সেই আভাস, সেই অনুভূতিই নিত্য, শাশ্বত। ইহারা যাহা করে তাহা একটা চঞ্চল মুহূর্তের প্রকাশ মাত্র, ইহাদের কর্মকে বুঝি অন্তরের নিত্য অনুভব দিয়া। ইহাদের রূপের মধ্যে ইহাদের সীমার মধ্যে একটা অপরূপের অসীমের আভাস সুস্পষ্ট। সাহিত্যের কোনও কোনও রূপ যে এই ধরনের সংকেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহার কারণ এই যে, মানুষের ভাষা অথবা কর্মকৃতি কিছুতেই মানব-মনের সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতিকে ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, লেখক অথবা কবিকে বাধ্য হইয়াই তখন অন্য কিছুর আশ্রয় খুঁজিতে হয়, অথচ তাহা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। সংকেত-নাট্য কি কবিতায় যে একটা অস্পষ্টতা, একটা কুয়াশার জাল ছড়াইয়া থাকে তাহার কারণ ইহাই। অথচ আমরা জানি, এই যুগে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ভাষাসম্পদ বা ঘটনার পরিবেশ-রচনার ক্ষমতা আর কাহারই বা আছে! মানব-মনের কত সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতিকে তিনি তাঁহার অনির্বচনীয় ভাষায় রূপায়িত করিয়াছেন, কত বাক্যহীন মূককে ভাষা দিয়াছেন, কিন্তু এমন সূক্ষ্মতর গভীরতর অনুভূতিও কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে যাহা ফুটাইয়া তুলিতে তিনি ভাষা পান নাই, মূক হইয়া গিয়াছেন, এবং আকার-ইঙ্গিতে তাহার আভাস মাত্র দিয়াছেন। অমল কি তাহার দূরের অজানার অনুভূতিকে ভাষা দিতে পারিয়াছে,

রঞ্জন কি তাহার ভালবাসাকে কথায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছে, নন্দিনী কি তাহার জটিল অনুভূতিকে ফুটাইতে পারিয়াছে? কবির মনে ইহাদের প্রত্যেকের অনুভূতি অতি তীব্র, অতি একান্ত ভাবে সত্য, কিন্তু সেই সুতীব্র অনুভূতি, সুনিবিড় সত্যের সম্মুখে কবির ভাষা মূক হইয়া যায়, শুধু অস্পষ্ট গুঞ্জন-ধ্বনি জাগিয়া থাকে।

ইহাই সংকেতের, প্রতীকের রূপ। কিন্তু, এ-রূপ রবীন্দ্রনাথ পাইলেন কোথায়? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এ-রূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে নূতন নয়। এ-কথা সত্য যে, আমাদের বাংলা সাহিত্যে সাংকেতিক রহস্যের এই বিশেষ অভিব্যক্তি কোথাও দেখা যায় নাই, সংস্কৃত সাহিত্যেও খুব কমই আছে; কিন্তু আমাদের দেশের ভাব ও চিন্তাধারার মধ্যে ইহার সন্ধান আমরা যথেষ্টই পাই। ইন্দ্রিয় জগতের পশ্চাতে অতীন্দ্রিয় জগৎকে জানিবার সাধনা, ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তির অন্তরাত্মার সন্ধান লইবার ব্যগ্রতা, সকলের কর্মের পশ্চাতে চরম সত্যকে পাইবার চেষ্টা ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনার সর্বোত্তম আদর্শ; ভারতবর্ষের ইতিহাসের মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে, আদর্শকে জানিয়াছেন। পরিণত যৌবনকাল হইতেই তাঁহার প্রবন্ধে কবিতায় এই অরূপকে অতীন্দ্রিয়কে জানিবার একটা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে এবং মনের মধ্যে সত্যের আভাস ও ভাবের অনুভূতি ক্রমে যতই তীব্র ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এই অরূপ অতীন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি ততই আরও অস্পষ্ট, আরও কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া দেখা দিয়াছে। 'খেয়া' হইতে আরম্ভ করিয়া এই প্রতীক-সংকেত অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতি বহুদিন আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে; মনের এই অতি সূক্ষ্ম, সুতীব্র, একান্ত সত্য ভাব ও অনুভূতিই তাঁহাকে এই সাংকেতিক রহস্যের জগতে আনিয়া পৌঁছাইয়াছে।

কিন্তু এই ধরনের নাটকের যে-রূপ, অর্থাৎ "ডাকঘরে", "অচলায়তনে", "ফাল্গুনী"তে, "মুক্তধারায়", "রক্তকরবী"তে নাটকের যে রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও কি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি? হঠাৎ এ কথায় কি যে জবাব দিতে হইবে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষের কি প্রাচীন কি আধুনিক কোনও সাহিত্যেই এই ধরনের নাটকের সাক্ষাৎ আমরা পাই না; দেশের অতীত ও বর্তমান কোনও নাট্যরূপের সঙ্গেই এই নাটকগুলির একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। সংস্কৃত নাটকের যে রূপ ও অভিনয়-রীতি আমরা জানি, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার যে নাট্য-রীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, রবীন্দ্রপ্রতীকনাট্যের রূপ ও অভিনয়-রীতি তাহার সহিত কোনই যোগ স্থাপন করিতে পারে না। আমাদের দেশের যাত্রাভিনয় বা কথকতার নাট্য-রীতির সঙ্গেও যে কোনও গভীর সাদৃশ্য আছে তাহাও মনে হয় না। অথচ, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় নাট্যসাহিত্যে এই ধরনের নাট্যরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অতএব যদি বলি, রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট নাট্যরূপ সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজস্ব সৃষ্টি নহে, কতকটা পাশ্চাত্য রূপ দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহা হইলে খুব ভুল করিব কি? মনে রাখিতে হইবে, আমি প্রতীক-সংকেতের রূপের কথা বলিতেছি না, রচনারীতির কথা বলিতেছি না, ভাব বা অনুভূতির স্বরূপের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি শুধু নাট্যরূপের কথা। কথাটাকে ভাল করিয়া খুলিয়াই বলিতেছি।

য়ুরোপে সেক্‌স্‌পীয়র হইতে আরম্ভ করিয়া মোটামুটি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নাটকের একটা নির্দিষ্ট রচনা-রীতি এবং একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি চলিয়া আসিতেছিল। এখনও যে তাহা চলে না, এমন কিছুতেই বলা যায় না, তবে তাহার আদর কতকটা কমিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা নাটকে আমরা কতকটা প্রাচীন সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাটক

রচনা-রীতির ও অভিনয়-পদ্ধতিরই প্রভাব দেখিতে পাই। কিন্তু সেক্স্পীয়র অথবা তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারেরা মানুষের ইন্দ্রিয়-সংগ্রামকে অভিনয়-মঞ্চে নানান ঘটনার সাহায্যে যেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যেমন করিয়া সে-সংগ্রামকে ভাষা দিয়াছেন, উনবিংশ শতকের শেষার্ধে পাশ্চাত্য নটগুরুরা সে-ভাষা ও সে-রূপ লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা, বিশেষ করিয়া ষ্ট্রিণ্ডবার্গ, মেটারলিংক, ইয়েট্স, আন্দ্রিফ, হাউপ্টম্যান প্রভৃতি সাহিত্য-নায়কেরা নাট্য-রীতির একটা আমূল পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন বর্তমান মানবের ভাব ও চিন্তাধারা উন্নত, মার্জিত ও সংস্কৃত এবং জীবনের দৈনন্দিন ইন্দ্রিয়-সংগ্রামের ধারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল। এই নবলব্ধ জীবনের সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতিকে ফুটাইবার জন্য নাটকের নূতন রচনা-রীতি নূতন প্রয়োগ-পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইবে। শুধু কাব্যের নয়, নাটক-রচনা এবং অভিনয়ের মধ্যেও সংকেতের, প্রতীকের আভাস ও প্রকাশকে ফুটাইতে হইবে; বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের জন্য ইন্দ্রিয়ের যে সংগ্রাম তাহাকে নয়, অরূপকে জানিবার, অতীন্দ্রিয়ের আস্বাদন লাভের জন্য আত্মার যে নিরন্তর সংগ্রাম, তাহাকে রূপ দিতে হইবে। হ্যামলেট অথবা ওথেলোর মধ্যে অরূপ আত্মার যে চিরন্তন সংগ্রামের অস্পষ্ট আভাস, তাহাকেই সমগ্র নাটকটির ভাবে ও ভাষায় পরিপূর্ণ করিয়া রূপায়িত করিতে হইবে, বহিরিন্দ্রিয়ের যে-সংগ্রাম ওথেলো অথবা হ্যামলেটের কর্মকৃতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে নয়। ভাবের মধ্যে, চিন্তাধারার মধ্যে এই পরিবর্তনের ফলেই য়ুরোপের প্রতীক-নাট্যের যে-রূপ তাহার সৃষ্টি। তাহারই ফলে মেটারলিংকের যত একাঙ্ক নাটক, ষ্ট্রিণ্ডবার্গের নাটক, আন্দ্রিফের নাটক, ইয়েট্স্-এর নাটক প্রভৃতির সৃষ্টি। আমি পূর্বেই বলিয়াছি রূপ অপেক্ষা অরূপ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অতীন্দ্রিয়ের আভাস চিরকাল রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে দোলাইয়াছে; কবিতায় তাহার প্রকাশ বিশেষভাবে "খেয়া" হইতেই দেখা গিয়াছে, কিন্তু নাটকে এই অপরূপের, সংকেতের যে প্রকাশ-রীতি ও ভঙ্গি তাহা সহজে দেখা যায় নাই। একটা রূপকে, একটা ভঙ্গিমাকে হয়ত তিনি খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু তাহা সহজে তিনি পান নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাংকেতিক রহস্য-নাট্য "শারদোৎসব" রচিত হইয়াছিল ১৩১৫ সালে। তাহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য, কাব্য-নাট্য অনেক রচনা করিয়াছিলেন। "বাল্মীকি-প্রতিভা", "মায়ার খেলা" হইতে আরম্ভ করিয়া "বিসর্জন-মালিনী" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নাটকের যে-রূপ অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে কিছুতেই "শারদোৎসব", "ডাকঘর", "মুক্তধারা", "রক্তকরবী"র রচনারূপের সঙ্গে একপঙ্ক্তিতে স্থান দিতে পারা যায় না। "শারদোৎসব" হইতে আরম্ভ করিয়াই পুরাতন নাট্যরূপ হঠাৎ একেবারে বদলাইয়া গেল। এই নব নাট্যরূপ যে কি বস্তু তাহার আভাস পূর্বেই দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার মনে হয় এই বিশিষ্ট নাট্যরূপের বিকাশ একেবারে আপনা হইতে হয় নাই। "মালিনী"র পর, "শারদোৎসবে"র আগে রবীন্দ্রনাথ আর কোনও উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেন নাই। "মালিনী" রচিত হইয়াছিল ১৩০৩ সালে; "শারদোৎসব" রচিত হইয়াছিল ১৩১৫ সালে। এই সুদীর্ঘ বার তের বৎসরের পর "শারদোৎসবে" যে সংকেত-নাট্যের রূপ দেখা দিল তাহা পূর্বতন নাট্য-রূপ হইতে একেবারেই পৃথক। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, নাটকের মধ্যে অরূপের অতীন্দ্রিয়ের প্রকাশ কি রূপে কি ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা যায় তাহা হয়ত তিনি খুঁজিতেছিলেন; এই সুদীর্ঘ বার বৎসরের নীরবতার অবকাশে তিনি তাহার আভাস লাভ করিলেন, দেশের অতীত সাহিত্য সাধনার মধ্যে নয়, নিজের সৃষ্টি-প্রচেষ্টার মধ্যে বলিয়াও

মনে হয় না, পাইলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য-সাধনার নাট্যরূপের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর অরুণোদয়ের পূর্বেই এই বিশিষ্ট নাট্য-রূপ যেখানে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই নাট্যরূপ দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারেন নাই। নহিলে সুদীর্ঘ একযুগ পরে "শারদোৎসবে", "অচলায়তনে", "ডাকঘরে" হঠাৎ "রাজা ও রাণী", "বিসর্জনে"র নাট্য-রূপ বদলাইয়া গিয়া নূতন রূপ অবলম্বনের কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

আমি সমস্ত জিনিসটাকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া ভুল করিলাম কি না জানি না; ইহাও হইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই নব নাট্য-রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন, পাশ্চাত্য নাট্য-রূপ দ্বারা একেবারে প্রভাবিত হন নাই। এ-সম্ভাবনাকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করিব না; তবে বিশ্ব-সাহিত্যের ধারাস্রোতের মধ্যে ফেলিয়া রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাট্যগুলির রূপ ও ভঙ্গি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমার কাছে এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-কথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই নব নাট্যরূপের প্রভাবই রবীন্দ্র নাট্যকে সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত করিতে পারে নাই; তিনি সেই রূপের আভাস মাত্র পাইয়াছিলেন, ছায়াটিকে মাত্র জানিয়াছিলেন; তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের পথ তাঁহাকে নিজেই আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। কারণ, য়ুরোপীয় প্রতীকী নাট্যের রূপ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী নাট্যের রূপ এই দুয়ের মধ্যে কতকটা পার্থক্য একটু মনোযোগী পাঠকের চোখে ধরা না পড়িয়াই পারে না। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। আমি একবার বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কোনও কোনও নাটকের অভিনয়ের জন্য একেবারেই কোনও বিশেষ অভিনয়-মঞ্চের প্রয়োজন হয় না; "শারদোৎসব", "অচলায়তন", "রাজা" প্রভৃতি নাটককে দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে কয়েকবারই ইহাদের অভিনয় হইয়াছে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে উদার আকাশের তলে গাছপালা লতাপাতার একান্ত প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে। শুধু নাটকবর্ণিত চরিত্রগুলিই সেই অভিনয়কে সমৃদ্ধ করে না; উদার আকাশ, উন্মুক্ত প্রান্তর, প্রকৃতির আপন দুলাল পত্রপুষ্পগুলিও সেই অভিনয়ে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যোগদান করে, নহিলে কিছুতেই অভিনয়টি সার্থক হইয়া উঠে না। প্রকৃতির মধ্যে নাটকের এই যে ভাষা আবিষ্কার, এই যে একটা সত্যকার যোগ, ইহা পাশ্চাত্য নাট্য-রূপ ও রীতির মধ্যে খুব কমই পাই। "শকুন্তলা" নাটকের শকুন্তলার পতিগৃহ গমনের দৃশ্যটি একবার সকলকে স্মরণ করিতে বলি। আশ্রমের বৃক্ষলতা, আশ্রম-মৃগটি সেখানে না থাকিলে সে-দৃশ্যটি এমন করিয়া ফুটিতে পারিত কি? রবীন্দ্রনাথ এই বস্তুটিকে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং নাট্য-রীতির মধ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত শ্রদ্ধেয় অজিতবাবু অন্য সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-নাট্যের রূপকের এবং পাশ্চাত্য নাট্যের রূপকের ভাবধারার কতখানি পার্থক্য তাহার একটু আভাস মাত্র দিবার জন্য এই সম্পর্কে তাহা অজিতবাবুর ভাষাতেই উল্লেখ করিতেছি।

"মেটারলিংকের Intruder' পড়ি, আর রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' পড়ি—Intruder'-এ মৃত্যুর আগমনের যে-সব রূপক দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিতান্তই বাহ্যিক, কখনো কখনো বালসুলভ কল্পনাত্মক! আজ কেমন একটা শিরশিরে হাওয়া দিয়াছে, বাগানে মালীর কাস্তের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শুনা যাইতেছে, এ সব সূচনার মধ্যে মৃত্যুর বাহ্যভীতির দিকটা আছে, তার গভীরতর মাধুরী নাই। 'ডাকঘরে'র মৃত্যু সমস্ত জীবনের বিচিত্র সৌন্দর্যকে সুদূরে বিলম্বিত করিয়া সেই সুদূরের আহ্বানকে মৃত্যুর আহ্বান করিয়াছে, এবং 'তমসঃ পরস্তাৎ' মৃত্যুরাজকে বালসখা করিয়া তাঁর আবির্ভাবকে অত্যন্ত আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে।"

"রক্তকরবী"র মধ্যে দেখি, নাটকীয় চিত্রে-চরিত্রে রঞ্জনের স্থান কোথাও নাই, একবারও তাহার দেখা আমরা কোথাও পাই না। অথচ, যতক্ষণ নাটকটি পাঠ করি অথবা অভিনীত হইতে দেখি আমাদের সমস্ত মনটা পড়িয়া থাকে রঞ্জনের উপর, সে-ই নন্দিনীর এবং আমাদের সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে। "ডাকঘরে"ও দেখি ডাকহরকরা কোথাও নাই, রাজা কোথাও দেখা দেন না, অথচ তাহারাই অমলের মনকে, আমাদের মনকে টানে। "রাজা"-নাটকেও রাজাকে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ এই রাজার জন্যই যত না আমাদের আকুলতা! এই যে নাটকের কেন্দ্রবস্তুটিকে এমন করিয়া নাটক হইতে বাহির করিয়া দিয়া দূরে নাগালের সীমার বাহিরে বসাইয়া রাখিয়া আমাদের মনকে টানা, এই ভঙ্গিও যেন রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব। দূরের অসীমের তৃষ্ণাকে এমন সুন্দর করিয়া ফুটাইবার কৌশলটি পাশ্চাত্য রূপক-নাট্য-রচয়িতাদের কাহারও মধ্যে থাকিলেও এমন তীব্র হইয়া কোথাও বোধ হয় নাই। এই রকম ছোটখাট অথচ কুশলী দৃষ্টান্ত আরও হয়ত দেওয়া যাইতে পারে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, রূপক-নাট্যের বিশেষ ভঙ্গির ছায়াটিকে হয়ত রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য নাটক হইতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু কায়া তাঁহাকে নিজের সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, এবং তাহার বিকাশের পথ তিনি নিজেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এই ধরনের নাটককে সত্যকার নাটক বলিতে কাহারও কাহারও আপত্তি আছে; বিদেশেও হইয়াছে, আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে এ আপত্তি কেহ কেহ তুলিয়াছেন। সাহিত্য-কথার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে এ আপত্তির কথা একদিন তুলিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপক-নাট্যের অভিনয় সাফল্যের প্রশ্নও উঠিয়াছিল। প্রথম কথাটির উত্তর আমার মনে আছে। তাহার মর্মকথা এই, 'নাটক বলিতে আপত্তি যদি কাহারও থাকে তাহার উত্তরে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। তুমি ইহাকে 'নাটক' না বলিয়া যদি বল 'কবিতা' অথবা 'কবিতা' না বলিয়া যদি বল আর কিছু, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না, 'নাটক' নামের প্রতি এমন কিছু মায়া আমার নাই। আমি যদি আমার মনের ভাব ও অনুভূতিকে মধুর করিয়া সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলেই আমার সৃষ্টি সার্থক, তুমি ইহাকে কি নামে অভিহিত করিবে সে ভাবনা আমার নয়।' এমন সুন্দর সহজ সম্পূর্ণ কবিজনোচিত উত্তর আর কি হইতে পারে! তবু, সাহিত্য-সমালোচকের বিশ্লেষণ-দৃষ্টি দিয়া দেখিলেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিশেষ রূপকে 'নাটক' বলিয়া অভিহিত করিতে আমার কোনও দ্বিধাবোধ নাই। দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে কোনও উত্তর পাইবার সুযোগ সেদিন হয় নাই, কিন্তু আমার মনে হয় সে-সম্ভাবনা যদি অল্পও হয়, তাহা হইলেও রবীন্দ্র-নাট্যের শিল্পমূল্যের, তাহার রস ও সৌন্দর্যের কিছু হ্রাস হইবে না। এ-কথা সত্য যে, কবিগুরুর প্রায় নাট্যেই দু'টি একটি চরিত্রের কথায় ও ভঙ্গিমায় এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ থাকে, যাহা অভিনয়ের সময় দর্শক ও শ্রোতার দৃষ্টি ও শ্রবণকে এড়াইয়া যায়, গভীরতর অনুভূতিকে স্পর্শ করিবার অবসর পায় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কি শান্তিনিকেতনে কি কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে অভিনীত রূপক-নাট্যের অভিনয় যখনই দেখিয়াছি, তখনই ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, সমগ্র সত্যটি, সমগ্র রহস্যটি কখনও দর্শকের অনুভূতিকে স্পর্শ এবং তাহার প্রয়োগ-কলা ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন দর্শকের শিল্প ও সৌন্দর্যবুদ্ধি উদ্রিক্ত না করিয়া পারে না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে আজও তাঁহার কোনও রূপক নাট্যই সার্থকতায় অভিনীত হইতে পারে নাই, আমার মনে হয় তাহার কারণ নাটকের সূক্ষ্ম এবং জটিল রীতি ভঙ্গি ততটা নয়, যতটা

অভিনেতাদের মধ্যে সূক্ষ্মভাব ও অনুভূতিকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতার অভাব, অল্প কথা ও নীরবতার মধ্য দিয়া, অতি তুচ্ছ ঘটনা-পর্যায়ের ভিতর দিয়া অন্তরের অত্যন্ত তীব্র অথচ অস্পষ্ট ভাবাভাসকে রূপদান করিবার নিপুণতার অভাব, এবং অভিনয়ের মধ্যে নাটক-বর্ণিত ঘটনার মধ্যে, উত্থান-পতনের তরঙ্গ-লীলার মধ্যে শুধু বহিরিন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির, শুধু দৃশ্য-জগতের ইন্দ্রিয়-সংগ্রামের আস্বাদন লাভের ইচ্ছা। আমাদের জীবনের অজ্ঞাত রাজ্যের অজানা রহস্যের বিচিত্র দ্বন্দ্বের পরিচয় লাভের প্রয়োজন যদি থাকে, অরূপের অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম অনুভূতি যদি আমাদের মহত্তর রস ও সৌন্দর্য-বুদ্ধিকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে, এই কথা যদি আমাদের দেশের অভিনেতা ও দর্শকেরা কখনও উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্যের অভিনয় সাফল্য লাভ না করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। অন্তত রবীন্দ্রপ্রতীকীনাট্যের মধ্যে অভিনয়-ব্যর্থতার কোনও কারণ আছে বলিয়া ত আজও বুঝিতে পারিতেছি না।*

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই যুগের সাংকেতিক রহস্যময় নাটক-রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন ও থাকিবেন, তাহা তাঁহার প্রতীক-সাহিত্যের জন্য নয়, কিংবা তাঁহার এই নব নাট্য-রূপের জন্যও নয়। তাঁহার নাটকের শিল্প-সৌন্দর্য, কথার অপূর্ব ভঙ্গিমা, ভাষার সরল সৌন্দর্য, এগুলিও তাঁহাকে প্রতীক-নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমরত্ব দিবে না। তিনি স্মরণীয় থাকিবেন, নাটকের মধ্যে তিনি আমাদের জীবনকে যে পূর্ণ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার জন্য, যে অরূপ অতীন্দ্রিয় সংকেত-রহস্যময় অনুভূতির আভাস দিয়াছেন তাহার জন্য। আমি পূর্বেও বলিয়াছি, নাট্যের মধ্যে তিনি শিল্পময় সৌন্দর্যময় জীবনকে ততটা স্থান দেন নাই, যতটা চাহিয়াছেন সৌন্দর্যের উৎসটিকে জানিতে, আত্মার আকাঙ্ক্ষার বস্তুটিকে লাভ করিতে। অরূপ রূপের অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সন্ধানে কবিচিত্তের এই যে যাত্রা, আত্মার বিচিত্র অনুভূতি ও উপলব্ধির যে-ইতিহাস তাহাই রবীন্দ্রনাথের প্রতীক-নাট্যগুলিকে অমরত্ব দান করিবে। রবীন্দ্রনাথ ত শুধু রূপের বা ভঙ্গিমার কুশলী কারু নহেন, তিনি যে প্রাণরসের স্রষ্টা, তিনি যে মানব ও প্রকৃতির রহস্যকে উদ্ঘাটিত করেন। তাঁহার খুব অস্পষ্ট মায়াময় কাব্য অথবা নাট্য-রূপের মধ্যেও এমন একটা সহজ সরল রস ও সৌন্দর্যের অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়, যাহা মনকে একটু দোলা না দিয়া পারে না। বড় বড় কথায়, বহু বাক্যবিন্যাসের সাহায্যে সুকঠিন তত্ত্ব বা উপদেশ প্রচারের চেষ্টা তাঁহার কাব্যে অথবা নাট্যে কোথাও নাই, তবু একটা সুন্দর সত্যের পূর্ণ পরিণতির ইঙ্গিত তাঁহার সবগুলি প্রতীক রহস্য-নাট্যের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই সত্যের ইঙ্গিত, এই পরিণতির আভাসই রবীন্দ্রপ্রতীকনাট্যের অন্তর্র-রহস্য।

সাত

শারদোৎসব (১৩১৫)

ঋণশোধ (১৩২৮)

প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬)

পরিত্রাণ (১৩৩৬)

---

* তাহা যে নাই তাহা আজ প্রমাণিত হইতেছে ; শম্ভু মিত্র মশায়ের "ডাকঘর" বা "রক্তকরবী" অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই একথার সাক্ষ্য দিবেন। (পঞ্চম সংস্করণের সংযোজন)

রাজা (১৩১৭)

অরূপরতন (১৩২৬)

অচলায়তন (১৩১৮)

গুরু (১৩২৪)

ডাকঘর (১৩১৮)

ফাল্গুনী (১৩২১)

মুক্তধারা (১৩২৯)

রক্তকরবী ১৩৩১)

"শারদোৎসব" রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঋতু-প্রশস্তির নাটিকা। প্রথম শান্তিনিকেতনে এবং পরে নানাস্থানে এই নাটিকা বারংবার অভিনীত হইয়াছে। ইহার স্বচ্ছ ও সতেজ অনাবিল গতি, নিরংলকার সারল্য এবং রূপক-বিবর্জিত ভাবরহস্যের আবেদন পাঠক অথবা দর্শকের সহজ রসবোধকে পরিতৃপ্ত করে। কবির পরবর্তী নাটকগুলির সংকেত ও প্রতীকরহস্য "শারদোৎসবে" নাই। আছে শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যে মানুষ যে উৎসবানন্দ অনুভব করে, উপভোগ করে, তাহার প্রতি কবিমানসের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কবি মনে করেন আনন্দকে সত্যভাবে উপভোগ করা যায় ছুটির মধ্যে, অবসরের মুক্তির মধ্যে ; এই ছুটি ও মুক্তি মানুষ অর্জন করে কর্মের ভিতর দিয়া, দুঃখের তপস্যার ভিতর দিয়া ; দুঃখই বস্তুত মানুষকে আনন্দের অধিকারী করে, কর্ম এবং কর্তব্যের ঋণশোধেই মানুষের যথার্থ ছুটি ও মুক্তি। উপনন্দ শারদীয় উৎসবের আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া প্রভুর ঋণশোধ করিবার জন্য নিজের উপর দুঃখের সাধনাকে ডাকিয়া লইযাছিল। কবির ধারণা, এই উপনন্দর সঙ্গেই শরৎ প্রকৃতির আনন্দের যোগ, কারণ সে দুঃখের সাধনা দিয়া আনন্দের ঋণশোধ করিতেছে ; এই দুঃখের রূপই শারদীয় সৌন্দর্য, ইহাই আনন্দ ও মাধুর্য। উপনন্দও ঠিক এই দৃষ্টি দিয়াই তাহার কর্মের দায়কে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল কিনা, সে প্রশ্ন হয়ত এখানে অবান্তর। কবির ধারণায় সে পারিয়াছিল, এবং এই ধারণাই রাজ-সন্ন্যাসীর ভূমিকায় রূপ পাইয়াছে। এই মনন-ভঙ্গিকে ব্যক্ত করিবার জন্যই উপনন্দর সৃষ্টি। যত সব ছেলে মেয়ে তাহারা সব ঠাকুরদাদাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে উৎসবের আনন্দে মাতিবার জন্য, উপনন্দ শুধু নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়া একমনে নিজের কর্তব্যে রত প্রভুর ঋণশোধের চেষ্টায়। ইহার মধ্যে একটু বেদনাবোধ আছে বই কি ! কিন্তু কবি এবং কবিরই মনের প্রতীক রাজ-সন্ন্যাসী বলেন, এই বেদনাই আনন্দ, এবং আনন্দের সন্ধান উপনন্দই পাইয়াছে ; কাজেই রাজসন্ন্যাসী তাহারই মধ্যে পাইলেন তাহার আনন্দের সাথী। এই দৃষ্টিভঙ্গি কবিজনোচিত ও রোমান্টিক, সন্দেহ নাই, এবং এই বিশেষ ভাব-রহস্যকে কবি রসোত্তীর্ণ করিয়া পাঠক ও দর্শকের অধিগম্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, গান ও ভাষণের এবং ইহার পরিবেশের সাহায্যে। এই ভাবরহস্যকে রসোত্তীর্ণ করিতে সাহায্য করিয়াছে ইহার সহজ নিরলংকার ভাষণ, ইহার সুর ও ইঙ্গিত, এবং উপনন্দ ও ঠাকুরদাদার চরিত্র।

অন্যান্য নাটক-নাটিকাগুলির মতন "শারদোৎসব"ও একটা 'আইডিয়া'র বাহন। এই 'আইডিয়া'টি কি তাহার একটু আভাস উপরে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। কবি নিজেও একাধিকবার বিভিন্ন স্থানে এই নাটিকার অন্তর্নিহিত 'আইডিয়া'টি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি

তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটি একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎ প্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধুলা ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেছে, কেন না ঐ ছেলেটার সঙ্গেই শরৎ প্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ করছে, সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম! * * * আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পাবে, ভয়ে কিংবা আলস্যে, কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে, জগতে সে-ই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই, ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।" ('আমার ধর্ম,' "প্রবাসী", ১৩২৪, পৌষ, ২৯৭ পৃঃ)

অন্যত্র কবির ব্যাখ্যা এইরূপ,

"* * * হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিলন সার্থক হয় * * *। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটেছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড় হয়ে উঠে। * * * তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় প'রে চারিদিক হতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে। সেই হৃদয়ে যদি কোনো রং না লাগে, কোন গান জেগে না ওঠে তা হলে মানুষ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

"সেই বিচ্ছেদ দূব করবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই একটি নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে? লক্ষেশ্বর সেই বণিক আপনাব স্বার্থ নিয়ে টাকা উপার্জন নিয়ে সকলকে সন্দেহ করে ভয় কবে ঈর্ষা করে সকলের কাছ থেকে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করে বেড়াচ্ছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে? সেই রাজা যিনি আপনাকে ভুলে সকলের সঙ্গে মিলতে বা'র হয়েছেন, লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায় সোনাকে সে তুচ্ছ করে। লোভকে সে বিসর্জন দেয় বলেই লাভ সহজ হয়ে সুন্দর হয়ে তার হাতে আপনি ধরা দেয়।

"কিন্তু এই যে সুন্দবকে খোঁজবার কথা বলা হলো, সে কি? সে কোথায়? সে কি একটা পেলব সামগ্রী একটি সৌখীন পদার্থ? এই কথাবই উত্তরটি এই নাটকের মাঝখানে রয়েছে।

"শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসে উপনন্দ তার প্রভুর ঋণশোধ করছে। রাজ-সন্ন্যাসী এই প্রেম-ঋণ শোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গেব সৌন্দর্যটি দেখতে পেলেন। তাঁর তখনি মনে হলো শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। * * *

"রাজসন্ন্যাসী উপনন্দকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ঐই ঋণশোধই যথার্থ ছুটি যথার্থ মুক্তি। * * * তাই তিনি উপনন্দকে বলেছিলেন, তুমি পঙ্‌ক্তিব পর পঙ্‌ক্তি লিখছ, আর ছুটিব পর ছুটি পাচ্ছ। * * *

"উপনন্দ তার প্রভুব নিকট হইতে প্রেম পেয়েছিল, ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বেয়ে সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠছে ততই সে মুক্তিব আনন্দ উপলব্ধি করছে! দুঃখই তাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণেব সঙ্গে ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাই কুশ্রীতা।" ('শারদোৎসব' "বিচিত্রা" ১৩৩৬, আশ্বিন ৪৯১ পৃঃ)

কিন্তু তত্ত্ব যাহাই হউক, এবং সে-তত্ত্ব যুক্তি-গ্রাহ্য হউক বা না হউক সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি হইতেছে তাহা বস্তু ও ঘটনার, কল্পনা ও অনুভূতির প্রকাশ-শৃঙ্খলার অমোঘ ও অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা দিতেছে কিনা। উপনন্দের ঋণশোধের মধ্যেই যে রহিয়াছে উৎসবের অন্তর্নিহিত আনন্দের যোগ, এই তত্ত্বকথাটা ব্যক্ত হইতেছে শুধু রাজ-সন্ন্যাসীর ভাষণের মধ্যে, তাহার কর্মকৃতির মধ্যে, কতকটা ঠাকুরদাদার ভাষণ এবং কর্মের মধ্যেও। কিন্তু উপনন্দ নিজে তাহার ঋণশোধের কর্মের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিল কি? অন্তত তাহার ভাষণ ও কর্মের মধ্যে সে পরিচয় সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই, বরং কর্তব্য তাহার কাছে কতকটা বেদনার ভার, যদিও সে ভার সে স্বেচ্ছায় বরণ

করিয়াছে। রাজ-সন্ন্যাসীর আনন্দের সন্ধান তাহার নিজের দেহমনকে আনন্দে উল্লসিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে-সন্ধান উপনন্দ পায় নাই, উৎসবমত্ত ছেলেরাও পায় নাই ; তাহারা সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি নকল করার কাজে লাগিয়াছে বটে, এবং হয়ত তাহার মধ্যে সন্ন্যাসীর চিত্তানন্দ ছেলেদের মনেও সংক্রামিত করার চেষ্টা আছে, কিন্তু তাহা কতকটা 'আইডিয়া প্রকাশের' প্রয়োজনে, কতকটা মেকানিক্যাল। ছেলেদের আনন্দ দায়িত্ববোধহীন এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক! আসল কথাটা হইতেছে, নাটকের অন্তর্নিহিত 'আইডিয়া'টা কেন্দ্রীকৃত হইয়াছে শুধু সন্ন্যাসীর চরিত্রে, সে-আনন্দবোধের ও অনুভূতির স্পর্শ আর কাহারও খুব বেশি জাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; উপনন্দ বরং একটু বেদনা-ভারাক্রান্তচিত্ত বলিয়াই মনে হয়, এবং ঠাকুরদাদা ও ছেলেদের সহজ আনন্দোল্লাস কতকটা অন্যজাতীয়, ভারমুক্ত, তত্ত্বনিরপেক্ষ। এই দুই আনন্দের মধ্যে একটি সংযোগ-সাধনের প্রয়াস নাটকে আছে বটে, কিন্তু তাহা খুব সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া ওঠে নাই বলিয়াই যেন মনে হয়। তাহার ফলে অন্তর্নিহিত 'আইডিয়া'টিই যেন বড় হইয়া দেখা দেয় নাটকটির রূপ ও সৌন্দর্য ছাড়াইয়া।

তাহা ছাড়া উৎসবানন্দ ভোগ করিবার পক্ষে যে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা সেই লক্ষেশ্বর হইতে মুক্তি-কামনার, তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিবার সজ্ঞান অনুভূতি কাহারও মধ্যে নাই, রাজ-সন্ন্যাসীর মধ্যেও নয়। বরং উপনন্দ ও রাজ-সন্ন্যাসী এই দুইজনেই এই বাধার দুঃখ ও বেদনাকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার পাওনা মিটাইবার মধ্যেই যেন যথার্থ মুক্তি, ইহারই দিকে ইঙ্গিত করিতেছেন। রাজ-সন্ন্যাসী যে কার্ষাপণ গুণিয়া দিয়া উপনন্দকে লক্ষেশ্বরের কবল হইতে মুক্ত করিয়া লইয়াছেন তাহার মধ্যেও এই ইঙ্গিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি উৎসবানন্দ ভোগের পক্ষে কতখানি সহায়ক, তাহাও সাহিত্য-বিচারের মধ্যে আসিয়া পড়ে। কবি মানসের পরিচয়ের জন্যও এই ইঙ্গিতের বিচার অপরিহার্য। একথা বলা যাইতে পারে, লক্ষেশ্বর-রূপ বাধা হইতে মুক্তি-কামনার সজ্ঞান অনুভূতি না থাকিয়া ভালই হইয়াছে ; বরং উপনন্দ যে তাহার কবলে আবদ্ধ এবং উৎসবানন্দ হইতে বঞ্চিত এই বাধার দ্বারাই এই বাধার স্বরূপ ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই যুক্তি যথার্থ, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আরও ভাল হইত যদি উপনন্দের আত্মদান সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইত, যদি উপনন্দের মুক্তির কোন উপায়ই না থাকিত ; তাহা হইলে এই বাধার সামাজিক স্বরূপ আমাদের মধ্যে আরও নিবিড় ভাবে প্রকাশ পাইত, আরও ঘনীভূত হইত। উপনন্দ নিঃশেষে আপনাকে প্রভুর ঋণশোধের চক্রে নিষ্পেষিত করিয়া প্রমাণ করিয়া যাইত, সে অশেষ, অক্ষয় ; তাহা অপেক্ষা লক্ষেশ্বরের বড় পরাজয় আর হইত না! কিন্তু নাটকে যাহা আছে তাহাতে লক্ষেশ্বরকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, উপনন্দ নিজেকে নিজের বলে মুক্ত করে নাই, রাজ-সন্ন্যাসী তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন পাওনাদারের পাওনা মিটাইয়া।

কিন্তু, "শারদোৎসব" উপভোগ্য তাহার তত্ত্ব বা 'আইডিয়া'র জন্য নয় ; উপভোগ্য ইহার কবিজনোচিত রোমান্টিক পরিবেশের জন্য, ইহার সরল সহজ রূপক-বর্জিত ভাষণের জন্য, সর্বোপরি ইহার গীতি-মাধুর্যের জন্য।

এই "শারদোৎসব" নাটক ১৩২৮ সালে "ঋণশোধ" নামে পুনর্লিখিত এবং কতকটা পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয়।

"প্রায়শ্চিত্ত" নাটকটি রচিত হয় ১৩১৬ সালের গোড়ায় ; ইহার বিষয়বস্তু "বৌ-

ঠাকুরানীর হাট” নামীয় উপন্যাস হইতে গৃহীত; “মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতই হইয়াছে।” বিষয়বস্তু এক হইলেও চরিত্র-পরিচয় দুই গ্রন্থে সর্বত্র একরূপ নয়। “বৌ-ঠাকুরানীর হাট”-গ্রন্থের আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি, কাজেই বিস্তারিত চরিত্রালোচনার প্রয়োজন এখানে নাই। উদার ও মধুর চরিত্র বসন্ত রায়ের নূতন কিছু পরিচয় এই নাটকে নাই, বিভা, সুরমা এবং উদয়াদিত্যেরও নাই। তবে ঘটনা সংস্থানের কৌশল অনেক পরিণত এবং ভাষণ-ভঙ্গি নাটকীয়; পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের পরিচয় একটু নূতন। দ্বিতীয়বার বিবাহোদ্যত, রমাই-ভীত বরবেশী রামচন্দ্র বিভার কথা স্মরণ করিয়া যখন বলিতেছেন, “সেনাপতি, আমি তোমাকে গোপনে বলছি, কাউকে বলোনা, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পারছিনে। কাল রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি”, এবং ফর্নাণ্ডিজকে আদেশ করিতেছেন মোহনকে খবর দিয়া বিভাকে পূর্বাহ্নেই দুঃসংবাদ জানাইয়া সাবধান করিয়া দিতে, তখন রামচন্দ্রের চরিত্রে নূতন আলোকপাত হইতেছে, এবং দানব রামচন্দ্রের হৃদয়ে মনুষ্যধর্মের স্পর্শ লাগিতেছে। বিভার জীবনের ট্র্যাজেডি তাহাতে আরও ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, এবং তাহা কবি-জনোচিত সমাপ্তি লাভ করিয়াছে উপসংহারে। এই উপসংহার “বৌ-ঠাকুরানীর হাট”-গ্রন্থের উপসংহার অপেক্ষা অধিকতর কলাকুশলতার পরিচায়ক, এবং বিভা-চরিত্রের মধুরতর ও সহজতর সমাপ্তি।

কিন্তু “প্রায়শ্চিত্ত”-নাটকের লক্ষণীয় বস্তু হইতেছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর সৃষ্টি। এই ভূমিকাটি “বৌ-ঠাকুরানীর হাট”-গ্রন্থে নাই। রবীন্দ্র-নাটকে এই জাতীয় রসিক অথচ বৈরাগী, আত্মভোলা, চিরনবীন, সদানন্দময়, নির্ভীক, সত্যসন্ধ, স্বচ্ছ, সুনির্মল, অত্যাচার অবিচারের চিরশত্রু, দুঃখী দুর্গতদের পরম সুহৃৎ, নিত্য সত্যধর্মের পরম সাধক এবং রহস্য-ইঙ্গিতময় একটি চরিত্রের উদ্বোধন প্রথম আমরা দেখি “শারদোৎসব”-নাটকে ঠাকুরদাদার চরিত্রে। এই চরিত্রই স্বল্প রূপান্তরে দেখা যায় “প্রায়শ্চিত্ত” এবং “মুক্তধারা” নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে, “অচলায়তনে” দাদাঠাকুর চরিত্রে, “ফাল্গুনী”তে সর্দার বা বাউল চরিত্রে, “ডাকঘর”, “রাজা” ও “অরূপ রতন” নাটকে ঠাকুরদাদার ভূমিকায়। “এই একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর” যত দুঃখ, যত অত্যাচার অবিচার, যত বেদনার ভার সব অক্লেশে বহন করেন, হাসিয়া খেলিয়া গান গাহিয়া গুরু তত্ত্বকথাকে লঘু হাওয়ায় ভর করাইয়া সকল ভারকে হালকা করিয়া দেন। এই দাদাঠাকুর প্রত্যেকটি নাটকের সদা উন্মুক্ত প্রশস্ত প্রসারিত গবাক্ষ, এই গবাক্ষ দিয়াই যত পুঞ্জীভূত ব্যথা বেদনা যত বদ্ধ দূষিত বাতাস সব বাহির হইয়া যায়, এই গবাক্ষ দিয়াই সত্য এবং ন্যায় ধর্মের ভারমুক্ত স্বচ্ছ সহজ সুনির্মল আলোকের দীপ্তি ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করে। ইনিই যেন তাহার লঘু উন্মুক্ত প্রশস্ত ডানায় সমস্ত নাটকীয় বিষয়বস্তুটিকে অক্লেশে বহন করিয়া লইয়া যান। নাটকীয় চরিত্র হিসাবে এইখানেই তাহার সার্থকতা, আঙ্গিকের দিক হইতে এইখানেই তাহার যথার্থ মূল্য; তবে প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই তাহার দেখা পাই বলিয়া এবং প্রায় একইরূপে পাই বলিয়া 'একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর' আমাদের কাছে তাহার নূতনত্ব কতকটা হারাইয়া ফেলিয়াছেন; আমরা দেখিবা মাত্রই তাহাকে চিনিয়া ফেলি এবং রবীন্দ্র-নাটকের একটি অতি সুপরিচিত আঙ্গিক হিসাবেই তাহাকে স্বীকার করিয়া লই। এই দাদাঠাকুরটি না থাকিলে কবির নিজের কথাটি নাটকে আর বলা হয় না, নিজের মনটি আর প্রকাশ করা হয় না, কাজেই তিনি প্রায় অপরিহার্য।

বহুদিন পর, ১৩৩৬ সালে "প্রায়শ্চিত্ত" কিছু পরিবর্তিত হইয়া "পরিত্রাণ" নামে প্রকাশিত হয়।* পুরাতন নাট্য-রচনাকে নূতন রূপ দিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা প্রথম দেখা যায় "অচলায়তনে"র (১৩১৮) পরিবর্তিত রূপ "গুরু" নাটিকায় (১৩২৪), এবং দুই বৎসর পর "রাজা" (১৩১৭) নাটকের রূপান্তর "অরূপরতন"-নাটকে (১৩২৬)। পরে এই চেষ্টা আরও অনেক রচনাতেই দেখা গিয়াছে, যথা, "শারদোৎসবে"র রূপান্তর "ঋণশোধে" (১৩২৮) "প্রায়শ্চিত্তে"র রূপান্তর "পরিত্রাণে" (১৩৩৬) "রাজা ও রাণী"র রূপান্তর "তপতী"তে (১৩৩৬)। ইহার ফল যে সর্বত্রই ভাল হইয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

"প্রায়শ্চিত্ত" অথবা "পরিত্রাণ" দুইটিই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত নাটক; "রাজা ও রানী"র রূপান্তর "তপতী"ও তাহাই। ইহারা বিসর্জনোত্তর নাট্যপর্বের রচনা হওয়া সত্ত্বেও ইহাদিগকে প্রতীক রহস্যময় বস্তুনিরপেক্ষ মানসিক আকূতির নাট্যপ্রয়াস-গুলির সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। ন্যায় ও সত্যধর্মের একটা অধ্যাত্ম আকূতি ইহাদের মধ্যেও আছে কিন্তু তাহা প্রতীক অথবা সাংকেতিক রহস্যময় নয়।

"রাজা" নাটকে এই রহস্যময় সাংকেতিকতার উপস্থিতি আবার নূতন করিয়া দেখা যাইতেছে। ইহার মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ তাহা কোনও ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নয়, বিভিন্ন চরিত্রের কল্পনা ও ভাবধারাকে আশ্রয় করিয়া। চোখের সম্মুখে যাহা ঘটিতেছে তাহার অংশ অত্যন্ত অল্প, সেই অল্পের মধ্যেও খানিকটা অবান্তর; অধিকাংশই অদৃশ্য। প্রধান নায়ক যিনি সেই রাজাকে মঞ্চের উপর কখনও দেখাই যায় না। ভাব-কল্পনার দৃষ্টি যোগ করিতে না পারিলে এই নাটকের এবং এই ধরনের সংকেতধর্মী নাটকের সবটা কিছুতেই দেখিতে পাওয়া সম্ভব নয়।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, "রাজা", "অচলায়তন" ও "ডাকঘর" এই তিনটি নাটকই "গীতাঞ্জলি ও "গীতিমাল্যে"র মাঝখানে রচিত। যে অধ্যাত্ম আকূতি, যে ভাগবত মানস-লীলা এই যুগের কাব্যে আমরা দেখিয়াছি, স্বভাবতই তাহা এই তিনটি নাট্যপ্রয়াসের মধ্যেও দেখা যাইতেছে। অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষার যে বিচিত্র অনুভূতির রূপ "খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে" ধরা পড়িয়াছে, তাহাই সমস্ত গীতধর্ম লইয়া নাট্যে সংকেত-রহস্যে রূপান্তরিত হইয়াছে এই তিনটি প্রচেষ্টায়।

১৩২৬ সালের শেষাশেষি, অভিনয়োদ্দেশ্যে কবি "রাজা" নাটকটিকে সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করিয়া "অরূপ রতন" নামে প্রকাশ করেন। "রাজা" ও "অরূপ রতন" একাধিকবার অভিনীত হইয়াছে। কবি একাধিক স্থানে এই নাট্যপ্রয়াস দুইটির অন্তর্নিহিত 'আইডিয়া' নিজের অননুকরণীয় ভাষায় ও ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে বুদ্ধির জোরে সে বাহিরের জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ

* "১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে [কবি] এই নাটককে আরও কিছু পরিবর্তন করিয়া 'পরিত্রাণ' নামে প্রকাশ করেন। ইহাতেও ধনঞ্জয় চরিত্র আছে। এখানেও রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহায় প্রজাদের পক্ষ লইয়া উদয়াদিত্য রাজকুমার এবং সুরমা যুবরাজ-মহিষী বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ পালন করিয়া চলিয়াছেন, এবং পুনঃপুনঃ কারাবরণ ও মৃত্যু পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। এই নাটক দুইখানি [প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ] প্রাচীন-ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া লেখা হইলেও ইহাদের মধ্যে আমাদের দেশের আধুনিক কালের রাজনৈতিক অবস্থার ছায়া পড়িয়াছে।" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "রবিরশ্মি" ২য় খণ্ড, ৮৫ পৃঃ।

করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না, নইলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভুলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা একথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাঁধিয়া গেল, সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল, যে-প্রভু কোন বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে সকল দেশে, সকল কালে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়, এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।" ("অরূপ রতন" নাটিকার ভূমিকা)।

সুদর্শনা অন্ধকার ঘরের রাজাকে প্রথম চিনিতে পারেন নাই, পারিয়াছিলেন শুধু সুরঙ্গমা দাসী ও সত্যসন্ধ ঠাকুরদাদা। তাহারা নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্যে সেই রাজাকে পাইয়াছিলেন, সুদর্শনার সৌভাগ্য হয় নাই সে অভিজ্ঞতা লাভের।

"আপনার অভিজ্ঞতার ভিতরে ভগবানকে না পাইলে কি আর পাওয়া। পড়িয়া ত আছে শাস্ত্রের রাজপথ। কিন্তু অন্ধকারের স্বামী চাহেন না, আমরা সেই মজুরখাটা সরকারী পথ ধরিয়া তাঁহার মন্দিরে যাই। শাস্ত্রের আলোকে তিনি বিশেষ করিয়া আমারই নহেন, সেখানে তিনি সরকারী। এই অন্ধকার কক্ষে তিনি আমার চেষ্টার দ্বারা প্রেম-নিয়ন্ত্রিত সেবার দ্বারা বিশেষ করিয়া ব্যক্তিবিশেষের। * * * অন্ধকারের সাধনা যাঁহার সম্পূর্ণ হইয়াছে তিনি রাজাকে সব স্থানেই দেখিয়া থাকেন, ভুল তাঁহার হয় না। ঠাকুরদাদা এই সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, রাজাকে ভুল করিবার সম্ভাবনা তাঁহার নাই। সুরঙ্গমার পক্ষেও সেই কথা। ('রাজা নাটকের আলোচনা', "শান্তিনিকেতন পত্রিকা", ১৩৩২, শ্রাবণ)।

তবু রানী সুদর্শনা সুরঙ্গমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, সে কথা ত পরের জ্ঞান ও অনুভবের কথা।

"রানী ভুল করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুক্তির উপায় তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। সুবর্ণকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, সুন্দর বলিয়াই। সুন্দরের প্রতি আসক্তিই তাঁহার রক্ষার বীজমন্ত্র। তিনি যখনই জানিতে পারিলেন, এ সৌন্দর্য প্রকৃত নহে, ইহার সহিত সত্যের যোগ নাই, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ, তার ভিতরে মানুষ নেই। এমন অপদার্থের জন্য নিজেকে এত বড় বঞ্চনা করেছি।' কিন্তু বঞ্চিত যাহা হইয়াছে তাহা রানীর চোখ, হৃদয় নহে। * * * এতদিনে রানীর ভুল ভাঙ্গিল, চোখের উপর বিশ্বাস টুটিল, চোখে যাহা সুন্দর লাগে তাহার চেয়ে গভীরতর সৌন্দর্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিল, তাঁহার অন্ধকার ঘরের সাধনা পূর্ণ হইল। এইবার তিনি অন্ধকার ঘরের স্বামীকে আলোকের প্রাসাদে পূজা দিতে পথের ধুলায় বাহির হইলেন। ('রাজা নাটকের আলোচনা', "শান্তিনিকেতন পত্রিকা", ১৩৩২, শ্রাবণ)।

অন্যত্র কবি বলিয়াছেন,—

"রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তারপরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে পাপের মধ্য দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ।" ("আমাদের ধর্ম", 'প্রবাসী", ১৩২৪, পৌষ, ২৯৭ পৃঃ।)

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাটকে ভাবগত দ্বন্দ্ব ছাড়া দৃশ্যগত দ্বন্দ্ব রচনার চেষ্টাও আছে। ভাবগত দ্বন্দ্ব ত খুবই স্পষ্ট, দৃশ্যগত দ্বন্দ্ব সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সচেতন। "রাজা" নাটকেও তাহার প্রমাণ আছে, এবং ইতিপূর্বেই অন্যত্র তাহা আলোচিত হইয়াছে। এইস্থানে তাহা উদ্ধার করা যাইতে পারে।

"এটি নাটকখানির একদিকে অন্ধকার-গৃহচারিণী রানী, অন্যদিকে বসন্তের উৎসবে উন্মত্ত বহুজনাকীর্ণ নগরী। * * * 'ডাকঘরে' দেখিতে পাই পথপার্শ্বে বাতায়নে একাকী রুগ্ন বালক অমল, সম্মুখের পথে

স্ফীতকায় সংসার তাহার যোড়ল দইওয়ালা পাহারাওয়ালা ফকির ও ঠাকুরদার দল লইয়া ছুটিয়াছে। 'শারদোৎসবে' বেতসিনীতীরচারী বালক উপনন্দ ঋণশোধে ব্যস্ত ; অন্যত্র ছুটির আনন্দে বালকের দল, ঠাকুরদাদা, লক্ষেশ্বর ও সম্রাট বিজয়াদিত্য। 'রক্তকরবী'তে একই দৃশ্য। রুদ্ধ ধনভাণ্ডারের দেওয়ালের বহু ঊর্ধ্বে ছোট একটি বাতায়নের মতো স্বর্ণসন্ধানী যক্ষপুরীর বুকের উপরে রঞ্জনের ভালোবাসার কাজল-পরা নন্দিনী। এখানেও সেই একই পালা। অন্ধকার ঘরে সুদর্শনা। এই কক্ষটিতে রাজাকে তাঁহার উপলব্ধি করিতে হইবে প্রথমে ; তারপরেই না তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিবে বাহিরের আলোকে।" ('রাজা নাটকের আলোচনা' "শান্তিনিকেতন পত্রিকা", ১৩৩২, শ্রাবণ)।

"অচলায়তন" নাটক রচিত হয় ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে ; ছয় বৎসর পর ১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসে এই নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত অভিনয়োপযোগী সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহার নাম "গুরু"।*

এই নাটকটিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের বাংলাদেশের উদার পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট শিক্ষিত স্বাধীনতাকামী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজ-মানসের রূপ রূপকের আশ্রয়ে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের সমগ্র ইতিহাসের এইরূপ সুস্পষ্ট সজ্ঞান বোধের পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর খুব বেশি ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। আমাদের দেশে শতাব্দীর সঞ্চিত স্তূপীকৃত শাস্ত্রপুঁথি, আচার নিয়মের বিধিবিধানের ক্রমসংকুচীয়মান রেখার বিচিত্র গণ্ডি, অহোরাত্র মন্ত্রতন্ত্র পাঠের গুঞ্জনধ্বনি, বর্ণ ও জাতির অভিমান অহংকার যে অলীকছায়ার স্বপ্নের অচলায়তন গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে বাঙালীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তমানস একদিন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। একজটা দেবীর কাল্পনিক ভয়কে এই মানস একদিন অস্বীকার করিয়াছিল, বলিয়াছিল হাজার বৎসরের এই বন্ধ দুয়ার, উত্তর দিকের বন্ধ জানালা মিথ্যা। বারংবার এই বন্ধ দুয়ার গুরুর আবির্ভাবে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে ; বারংবার মিথ্যা অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া উত্তর-পশ্চিম পূর্ব-দক্ষিণ হইতে উন্মুক্ত বাতাস, জ্ঞান মহাগুরুর রূপ ধরিয়া সবেগে সজোরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাদের সঞ্জীবিত ও সচেতন করিয়াছে। অচলায়তন গড়িয়া তুলিলে এইভাবেই তাহা ভাঙিয়া পড়ে, ইহাই ঐতিহাসিক নিয়ম, ইহাই ভারতবর্ষের, বাংলাদেশের ইতিহাস, এই ঐতিহাসিক শিক্ষাটি, এই সজ্ঞান বোধটি "অচলায়তনে" ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গুরু যখন আসেন শোণপাংশু অস্পৃশ্য অন্ত্যজ হরিজনদের লইয়াই আসেন, বিদ্রোহের উন্মত্ত কোলাহল লইয়াই আসেন, পঞ্চক তাহার পূর্বাভাস, আচার্য তাহার দ্যোতক। অচলায়তনের বন্ধ দরজা যখন খুলিয়া যায়, প্রাচীর যখন ভাঙিয়া পড়ে তখন মনে হয়, পঞ্চকেরই হইল জয়, গুরুই হইলেন ঐতিহাসিক সত্য, বিদ্রোহই হইল জয়ী। কিন্তু ইহাই কি শেষ কথা? রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, তাহা শেষ কথা নয়। পঞ্চক সত্য হউক, ইহা নিশ্চয়ই কাম্য, কিন্তু মহাপঞ্চক কি একান্তই মিথ্যা? ইহারা দুই সহোদর ভাই, একজন বিদ্রোহের প্রতীক, আর একজন নিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের। বিদ্রোহই একমাত্র সত্য নয়, ঐতিহ্যবোধ এবং একান্ত নিষ্ঠাও অন্যতম সত্য। মহাপঞ্চকের এই সজাগ ঐতিহ্যবোধ ও নিষ্ঠাই বিদ্রোহের ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন সাধনার নূতন সভ্যতার ইমারৎ গড়িয়া তোলে।

---

*শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের কর্ণওআলিস স্ট্রীটের বাড়ির ছাদে "প্রথমে যেদিন অচলায়তন নাটক পাঠ করেন, সেদিনই উহার নাম 'গুরু' রাখিবার ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা 'অচলায়তন' নামটিকেই অধিক সমর্থন করাতে তাহাই বহাল থাকিয়াছিল। এখন এই অচলায়তন শব্দটি বাংলা ভাষার একটি বিশেষ গূঢ়ার্থক মূল্যবান শব্দ হইয়া উঠিয়াছে।" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "রবিরশ্মি" ২য় খণ্ড, ১১০ পৃঃ।

এই নূতন সাধনায় মহাপঞ্চকেরও প্রয়োজন আছে ; তাই ত পঞ্চকের প্রশ্নের উত্তরে দাদা-ঠাকুর বলিলেন, এখানেও মহাপঞ্চকের "অনেক কাজ। * * * কি করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ ভয় জীবন মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করবার রহস্য ওর হতে আছে।" আবার বিদ্রোহীদেরও প্রয়োজন আছে ; তাই পঞ্চক সুভদ্রকে বলে, "এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলি উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত দরজা জানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।"*

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই নাটকের রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

"যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, * * * অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

আমি ত মনে করি য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে [১৯১৪-১৮] সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেকদিনের টাকার প্রাচীর, মনের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন তার জন্য আয়োজন অনেকদিন থেকে চলছিল। য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল, তাই তো হঠাৎ আগুন জ্বললো, তাইতো সাত রাজার লড়াই বেধে গেল, তাই তো যে ছিল রানী তাকে রথ ছেড়ে, আপন সম্পদ ছেড়ে পথের ধুলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্ছে। * * *" ('আমার ধর্ম' "প্রবাসী," ১৩২৪, পৌষ, ২৪৭ পৃঃ)।

"ডাকঘর" রচিত হয় ১৩১৮ সালের শেষাশেষি। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা, বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকেত-রহস্যময় গীতধর্মী এই নাটকটি রচিত হইয়াছিল তিনদিনে, শান্তিনিকেতন আশ্রমের পরিবেশের মধ্যে। প্রথম অভিনীত হইয়াছিল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ; উপস্থিত ছিলেন গান্ধীজি, লাজপৎ রায়, মালবীয়জি, টিলক, খাপার্দে প্রভৃতি দেশনায়কেরা

---

*রবীন্দ্র-জীবনী রচয়িতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "অচলায়তনে"র এই সমাজবোধটি সুন্দর ধরিয়াছেন ; তাঁহার বক্তব্য উদ্ধৃতির যোগ্য। "উপাখ্যানটির মধ্যে পঞ্চক ও মহাপঞ্চক দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি : ইহারা পরস্পরের সহোদর ভ্রাতা, সুতরাং সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। অথচ একজন বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি, অপরজন মূর্তিমান নিষ্ঠা। * * * মোট কথা নিষ্ঠা ও নিষ্ক্রমণের মধ্যে বিরোধ বাধিয়াছে। কিন্তু কবি এই বিরোধকেই চরম বলিয়া স্বীকার করিলেন না। গুরু আসিলেন, অচলায়তনের প্রাচীর ধ্বংস হইল, বাহিরের আকাশ দৃশ্যমান হইল, বাহিরের বাতাস আয়তনের প্রাঙ্গণে বহিল। অস্পৃশ্য দর্ভক শোণপাংশু সকলে আসিল। মনে হইল পঞ্চকের জয়, বিদ্রোহেরই জয়। কিন্তু মহাপঞ্চকের নিষ্ঠাকে কেহ অশ্রদ্ধা করিতে পারেন না। সেই বিধ্বস্ত আয়তনেই নূতন করিয়া সাধনার আয়োজন হইল, নিষ্ঠার মধ্যেই সত্যের রশ্মি আসে। চঞ্চলতাই জীবনের একমাত্র লক্ষণ নহে, চঞ্চল বিদ্রোহ সমাহিত হইলে সত্যকে অন্তরে পাইবার অবসর হয়।

"* * * রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের মনের মধ্যে যে কথাটি বিশেষভাবে জাগিতেছিল তাহারই রূপ এই নাটকে। ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই বিদ্রোহী ; তিনি চিরদিনই হিন্দু সমাজের জীর্ণ সংস্কার ও মলিন আচারকে আঘাত করিয়াছেন। কিন্তু সাময়িক হিন্দু-ব্রাহ্ম বিতর্কে তিনি নিজেকে হিন্দু বলিয়া হিন্দু জাতির সংস্কৃতির মূল আদর্শকেই সর্বোচ্চ স্থান দিলেন।

"তিনি ব্রাহ্ম বটে, তবে তিনি হিন্দুও। তিনি একাধারে পঞ্চকের বিদ্রোহও মহাপঞ্চকের নিষ্ঠা। হিন্দু সমাজের অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিলে যখন সর্বজাতি সর্বমানব সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে, সেই দিনই হিন্দু সার্থক। রবীন্দ্রনাথ সেই হিন্দুত্বকে বিশ্বাস করেন যাহা প্রগতিকে স্বীকার করে ও সংস্থিতিকেও ত্যাগ করে না। এই সময়ের দ্বন্দ্ব তাঁহার অবচেতন মনে এই নাটকীয় রূপ লইয়াছিল। "রবীন্দ্র-জীবনী" ১ম খণ্ড, ৪৯৫-৯৬ পৃঃ।

রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে, 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'। "ডাকঘরে" এই সুদূরের সংকেত, অজানার ইঙ্গিত সকরুণ গীতিমাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অমল, সুধা, ঠাকুরদাদা, ডাকহরকরা ও অদৃশ্য রাজাকে কেন্দ্র করিয়া এমন সুন্দর করুণ একটি রহস্য ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, এবং এমন সুকৌশলে শেষ পর্যন্ত সে-রহস্যটিকে ধরিয়া রাখা হইয়াছে, যাহার তুলনা অন্য সাংকেতিক রহস্যময় নাট্যগুলিতে নাই। একটি গানও এই নাটকে না থাকা সত্ত্বেও এমন গীতধর্মী নাটক রবীন্দ্রনাথ আর রচনা করেন নাই; সমস্ত নাটকটিই যেন একটি সংগীত যাহার সুরের রেশ বহুক্ষণ মনের মধ্যে বাজিতে থাকে, যাহার ক্ষীণ সৌরভ সমস্ত বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে।

রুগ্ন বালক অমল অভিজ্ঞ বিষয়ী মাধব দত্তের পোষ্যপুত্র; সম্পর্কে সে অমলের পিসামশায়। অপত্যসম মমতায় মাধব রুগ্ন অমলকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে; কবিরাজ বলিয়াছে, বাইরের হাওয়া লাগিলেই রোগ দুরারোগ্য হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু অমল বিছানায় শুইয়া বাইরের আকাশ দেখিতে পায়, দূরের ইঙ্গিত তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। জানালার পাশ দিয়া দইওয়ালা হাঁকিয়া যায়, মালীর মেয়ে সুধা ফুল তুলিতে যাইবার সময় তাহার সঙ্গে দুই চারিটি কথা বলিয়া চলিয়া যায় দূরের পথ ধরিয়া, পাঁচমূড়া পাহাড়ের চূড়া ঐ দেখা যায় দূরে, সেখানকার বিচিত্র দেখা-না-দেখা ছবি মনকে টানে উহার কাছে, রাঙা মাটির পথ কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশ দিগন্তে গিয়া মিশিয়াছে—এ সমস্তই যেন সুদূরের, অজানার ডাক, তাহারই ইঙ্গিত। সেই ইঙ্গিত আসে অদৃশ্য এক রাজার নিকট হইতে, বহন করিয়া আনে ডাকহরকরা। সংসারী যাহারা, বিষয়ী যাহারা, তাহারা অঙ্কের হিসাব মানিয়া চলে, হাতের মুঠায় যাহা ধরিয়া ভরিয়া রাখা যায় তাহাতেই তাহাদের বিশ্বাস; সুদূরের আহ্বান, অজানার ইঙ্গিত তাহারা শুনিতে পায় না, দেখিতে পায় না। কিন্তু অমলের কিশোর মন তাহার সহজ বোধ দিয়া অনুভূতি দিয়া সহজেই সেই ইঙ্গিত দেখিতে পায়, সে-আহ্বান শুনিতে পায়; নিরাসক্ত সহজ এবং সরল ঠাকুরদাদাও পারেন। তাহারা জানেন, ডাকহরকরা রাজার নিকট হইতে সেই আহ্বানের সেই ইঙ্গিতের লিপি বহন করিয়া আনিতেছে। বিশ্বজগতের যত কিছু রং ও আলো, গন্ধ ও বর্ণ, শব্দ ও ধ্বনি, সুর ও গান, প্রেম ও ভালবাসা যাহা কিছু মানুষের চিত্তকে তার রুদ্ধ আবেশান্ধকার হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে তাহা সমস্তই ত রাজার ডাকঘরের লিপি; প্রতি মুহূর্তেই রাজা এই লিপি পাঠাইয়া সমস্ত স্পর্শালু হৃদয়কে ডাকিতেছেন সুদূরের পথে, ইঙ্গিত করিতেছেন অজানার নিরুদ্দিষ্ট দিগন্তে। অমল বিছানায় শুইয়া ডাকহরকরার হাত হইতে সেই লিপির প্রতীক্ষা করিতেছে। একদিন সে আসিল মৃত্যুর রূপ ধরিয়া। অমলের রুদ্ধ রুগ্ন জীবনের অবসান হইয়া গেল, মাধব দত্ত বা কবিরাজের আসক্তি ও বিধিবিধান তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, কিন্তু অমল সুদূরের আকুতির সঙ্গে এই ধরণীর যোগ রাখিয়া গেল তাহার সুধার প্রেমস্মৃতির মধ্যে। বস্তুত "ডাকঘরে" মানবচিত্তের যেটুকু পার্থিব রস ও রহস্য তাহা সুধাকে কেন্দ্র করিয়াই। অমল যে শুধু প্রতীক মাত্র হইয়া পড়ে নাই তাহা সুধার জন্যই। যবনিকা পাতের অব্যবহিত পূর্বে নাটকের শেষ কথা "সুধা তোমাকে ভোলেনি", এই কথাটিই নাটকটিকে একান্ত রূপকময়তা হইতে বাঁচাইয়াছে, এবং ইহাতে মানব-রসের সঞ্চার করিয়াছে। বালক অমল সুদূরের আহ্বান, অজানার ইঙ্গিতানুভূতির প্রতীক হিসাবেই সত্য; তাহা না হইলে রুগ্ন বালক-চিত্তের প্রকাশ হিসাবে অমলকে খানিকটা 'মরবিড' বা দুঃখ-বিলাসী এবং অতিরিক্ত প্রবীণ এবং প্রাজ্ঞ বলিয়াই মনে হয়।

তাহার ভাষণ একটু অতিরিক্ত চিন্তাভারগ্রস্ত এবং বালক বা কিশোর হিসাবে একটু বেশি কবিসুলভ।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই নাটকের অমল চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজের বাল্যাবস্থার রুদ্ধ পীড়িত দুঃখভারগ্রস্ত কবি-মানসের প্রতিরূপ খানিকটা দেখিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যাখ্যা আমারও কতকটা সত্য বলিয়া মনে হয়।

["ডাকঘরে অমলের যে-চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা যেন তাঁহারই বাল্যকালের রুদ্ধজীবনের কথা। রুদ্ধগৃহে বালকের চিত্ত বাহিরের প্রত্যেকটি ঘটনায় সাড়া দিতেছে। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার অধিকার তাহার নাই: নিষেধের বাধা তাহাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার কল্পনাশীল মন সমস্ত দেখিতেছে, সমস্ত যেন উপভোগ করিতেছে, বাহিরের সহিত মিলিত হইবার জন্য অন্তরের নিরন্তর ক্রন্দন চলিতেছে; কিন্তু সে-মিলন সম্ভব হইতেছে না। কবিরাজরূপী সংসার ও মোড়লরূপী সমাজ রহিয়াছে। সকলের অন্তরই রাজার কাছ হইতে পত্র আসিবার অপেক্ষায় উদ্গ্রীব। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই সময় একটা রুদ্ধজীবনের ব্যর্থতা কোথায় যেন পীড়িত করিতেছে। বাহিরে যাইবার জন্য প্রাণ চঞ্চল; সেই তাহার চিরদিনের ক্রন্দন, সেই নিজের বেষ্টনী হইতে মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা; তাহারই সুর ধ্বনিয়াছে এই নাটকে।" "রবীন্দ্র-জীবনী", ১ম খণ্ড, ৪৯৭-৯৮ পৃঃ।]

"ডাকঘর" রচনার প্রায় চারি বৎসর পর, ১৩২১ সালের ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ বসন্তোৎসবের নাটক "ফাল্গুনী" রচনা করেন। ইহার ভিতর কবি একবার য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। "ফাল্গুনী" বসন্তের প্রশস্তি-সংগীত। বসন্তোৎসব যৌবনের উৎসব, যুবকেরা সব উৎসবে যোগদানের জন্য উন্মুখ; কিন্তু এই উৎসব ত দায়িত্ব-বিরহিত কর্তব্য-নিরপেক্ষ আমোদোৎসব মাত্র নয়। "শারদোৎসবে"র ধুয়াটিও ঠিক তাহাই। এই আনন্দোৎসবের অধিকারী তাহারাই যাহারা জরার অবসাদ হইতে মুক্ত, যাহারা মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিয়াছে, যাহারা চিরনবীন, প্রাণ যাহাদের অফুরন্ত। "ফাল্গুনী"র এই যে বাণী, এই বাণীর সঙ্গে "বলাকা"র যৌবনের জয়গানের যোগ অভিন্ন, কারণ দুই-ই একই সময়ের একই মানসের কবিকল্পনা। এবং "ফাল্গুনী" যে "সবুজপত্রে"ই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিতও নিরর্থক নয়।

"ফাল্গুনী"র মর্মবাণী কবির অনবদ্য ভাষায় ও ভঙ্গিতে ব্যক্ত করাই ভাল।

জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস ক'রে তার সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি; নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাড়াই, তখন দেখি যে-সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে যায়, সেই সর্দার মৃত্যুর তোরণ-দ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন ক'রে তবে সেই নব-জীবনের আনন্দে পৌঁছানো যায়। তাই যুবকেরা বললে, আনব সেই জরা-বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা এই বসন্ত-উৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন ক'রে নির্জীব করতে চায়, তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব-বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। * * * ফাল্গুনীতে বাউল বলছে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করছে, আর বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ। যারা মরে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারা পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে, আমরা পথের বিচার করিনি, আমরা পাথেয়র হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। * * * বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র এ কাদের পত্র? যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে, তারাই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি আঁকড়ে থাকতে পারত, তা' হলে জরাই অমর হতো, তা' হলে পুরাতন পুঁথির কাগজে সমস্ত অরণ্য হয়ে যেত

* * *। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চির নবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। * * * মানুষ তার জীবনকে সত্য ক'রে, বড় ক'রে, পেতে চাচ্ছে। তাই মানুষের সভ্যতায় যে জীবনটা বিকশিত হ'য়ে উঠছে, সে ত কেবলই মৃত্যুকে ভেদ করে। * * *"

"ফাল্গুনী"র এই মর্মবাণীর মধ্যে যে সুসম্পূর্ণ সুসমঞ্জস ইতিহাসবোধ এবং সমাজ ও বৃহত্তর মানব-সভ্যতার আবর্তন বিবর্তন সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান-দৃষ্টি ধরা পড়িয়াছে, সাহিত্যে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। আমাদের এই জরাগ্রস্ত সমাজে এই বোধ ও দৃষ্টির সামাজিক চেতনা ছিল না বলিলেই চলে, তাহার সাহিত্যিক রূপ ত ছিলই না। আমাদের মৃত্যুভীত জরাগ্রস্ত জীবনই কবির মনে এই চেতনা জাগাইয়াছে, তাহার অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, এবং সেই অনুভূতি অপূর্ব কাব্যময় রূপান্তর লাভ করিয়াছে। "ফাল্গুনী"র মূল সুরের সঙ্গে "বলাকা"র মূল সুরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে, একথা যে কোনও বিদগ্ধ রসিক পাঠকের কাছেই ধরা পড়িবে। তাহার কারণ সুস্পষ্ট, এই দুই গ্রন্থ একই কালের একই কবি-মানসের সৃষ্টি, এবং একই সামাজিক চেতনাদ্বারা উদ্বুদ্ধ। এই চেতনা আমাদের জীবন ও যৌবনের বন্দীদশা সম্বন্ধে, আমাদের মৃত্যুভীতি সম্বন্ধে, আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত স্থবিরত্ব সম্বন্ধে, আমাদের অবিপ্লবী মনোভাব সম্বন্ধে। সামাজিক চেতনা, সমাজ-সত্তা সম্বন্ধে যথার্থ বোধ ও বিজ্ঞান দৃষ্টি কি ভাবে কতখানি গীতধর্মী কাব্য ও নাট্যরূপ লাভ করিতে পারে, কতখানি রহস্যময় সাহিত্যরূপ লাভ করিতে পারে, "অচলায়তন" ও "ফাল্গুনী", "মুক্তধারা" ও "রক্তকরবী" বাংলা নাট্য-সাহিত্যে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

"ফাল্গুনী" অভিনয় হইবার প্রাক্কালে কবি অভিনয়ের ভূমিকাস্বরূপ "বৈরাগ্য সাধন" নামে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন এবং দুইই একত্রে অভিনীত হয়। এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি "ফাল্গুনী"র ভূমিকা ত বটেই, ব্যাখ্যা এবং কৈফিয়ৎও বলা যাইতে পারে। ইহা অবোধ অরসিকদের "ফাল্গুনী" বুঝাইবার চেষ্টা, এবং এ চেষ্টা স্বপ্রকাশ, ইহার সাহিত্যমূল্য যে খুব বেশি, বলা যায় না। চুয়ান্ন বৎসরের রবীন্দ্রনাথ "বৈরাগ্য সাধন"-অভিনয়ে কবিশেখরের ভূমিকায় যে চঞ্চল জীবন-রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, 'ফাল্গুনী"-অভিনয়ে বাউলের ভূমিকায় যে শান্ত সমাহিত জীবন চেতনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কল্পনা সেই চিত্তেই সম্ভব যে চিত্ত "ফাল্গুনী"র জীবনধর্মকে একান্তভাবে অনুভব করিতে সমর্থ। আর রূপ সজ্জা ও অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা নাই বলিলাম, যাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহাদের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। "ফাল্গুনী' শিক্ষিত বিদগ্ধ বাঙালীর ও বঙ্গ-সাহিত্যের চিত্ত-মরুদেশে নূতন প্রাণরসের সঞ্চার করিয়াছে, গতিশীল সবল প্রাণশক্তির লীলা গানে, ভাষণে, সৌরভে শুধু এই নাটিকাকেই যে সুন্দর ও সার্থক রূপদান করিয়াছে তাহাই নয়, বাঙালীর চিন্তাধারাকেও নূতন প্রাণশক্তি দান করিয়াছে।

"ফাল্গুনী"র উৎসর্গপত্র উল্লেখযোগ্য, শুধু রবীন্দ্র-জীবনের তথ্যহিসাবে নয়, রবীন্দ্র-মানসের পরিচয় হিসাবে, "ফাল্গুনী"র পাদটীকা হিসাবে।

"যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গু নদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্তমরুর তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের এবং সেই সঙ্গে সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মত সমর্পণ করিলাম।"

"ফাল্গুনী"-রচনার প্রায় সাত বৎসর পর ১৩২৮ সালে পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন নাটক রচনা করেন, "মুক্তধারা"। এই সাত বৎসরে কবির জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে মানসিক-পরিবেশও অনেকখানি বদলাইয়াছে। কবি যখন "ফাল্গুনী" লিখিতেছিলেন, "বলাকা"র যৌবনধর্মী জীবন-প্রাচুর্যের কবিতাগুলি

লিখিতেছিলেন তখন য়ুরোপের মহাসমর চলিতেছে, তাহার মধ্যে তিনি শক্তি ও যৌবনের লীলাপ্রাচুর্যই দেখিয়াছিলেন এবং তাহারই জয়গান করিয়াছিলেন; রাত্রির তপস্যা দিনের আলোক টানিয়া বাহির করিবে, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই অমৃত লাভ হইবে, এই আশাই কবি করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে মহাসমর শেষ হইয়াছে; শান্তি ও সভ্যতা ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কবি ও মনীষীদের স্বপ্ন সত্য ও সার্থক হয় নাই, পৃথিবীব্যাপী মানুষ মুক্তি লাভ করে নাই, অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ধনিকের যন্ত্রসভ্যতার লৌহশৃঙ্খল তাহাকে আরও নূতন করিয়া দৃঢ়তর করিয়া বাঁধিয়াছে, পরৈশ্বর্যলোলুপ জাতীয়তা ও সাম্রাজ্যবাদের যূপকাষ্ঠে সে আরও বেশি করিয়া বাঁধা পড়িয়াছে। য়ুরোপে, আমেরিকায়, জাপানে সেই মানুষের চেহারা কবি ইতিমধ্যে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহার অন্তরের পরিচয় তিনি লইয়া আসিয়াছেন এই সব দেশের মনীষীদের সঙ্গে বহুল ভাব ও চিন্তা বিনিময় হইয়াছে; স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধের সংকীর্ণতার চেহারাটা ভাল করিয়া দেখিয়াছেন; nationalism সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা বিদেশে করিতে হইয়াছে, চীনের উপর জাপানের অত্যাচারের মূল কারণটাও ধরিতে পারিয়াছেন. "ঘরে বাইরে"-উপন্যাস উপলক্ষ করিয়া অন্ধ জাতীয়তা-বোধের অপদেবতার চেহারাটা দেশবাসীকেও দেখাইয়াছেন; অমৃতসর-অনাচার হইয়া গিয়াছে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন; গান্ধীজীর অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম পর্বের অবসান হইয়া সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা চলিতেছে; পূর্ণাঙ্গ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অসংখ্য ঘটনাবর্তের মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিলাম, এবং তাহাও সন তারিখের যথাক্রম ধরিয়া করিলাম না; বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনও নাই। শুধু এই কথাটি মনে রাখিলেই চলিবে যে, ১৩২৩ সালে একবার জাপান ও আমেরিকায় ঘুরিয়া আসা ছাড়া ১৩২৭ ও '২৮ সালে এক বৎসরেরও বেশি য়ুরোপের সর্বত্র এবং আমেরিকায় কাটাইয়াছেন, এবং সে-য়ুরোপ ও আমেরিকা সমরোত্তর পাশ্চাত্য জগৎ। ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে ইহার বেশি আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই মনে করি। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তনের ছয় মাসের মধ্যেই "মুক্তধারা" এবং দুই বৎসরের মধ্যে "রক্তকরবী" রচিত হয়। এই দুইটি নাটকেরই ভাব ও চিন্তার পটভূমি হইতেছে সমরোত্তর য়ুরোপ, অথবা সাধারণ ভাবে যুদ্ধপরবর্তীযুগের সমগ্র পৃথিবী, বিষয়বস্তুর পটভূমি যদিও কাল্পনিক ভারতবর্ষের কোনও এক কল্প কালের কাল্পনিক রাজ্যের। অর্থাৎ কোনও একটি বিশেষ রূপকের মধ্য দিয়া আমাদের বিশেষ কালের একটি বিশেষ চিন্তাধারা কবির অনুভূতির মধ্যে ধরা দিয়াছে এই দুইটি নাটকেই। য়ুরোপে ধনিক-কবলিত এই যান্ত্রিক-সভ্যতা যে-রূপে ও আকারে দেখা দিয়াছে আমাদের দেশে তাহা সেই রূপে ও আকারে দেখা দেয় নাই একথা সত্য, সামাজিক পরিবেশও এক নয় তাহাও সত্য, তবু এই সভ্যতার ধর্ম সর্বত্রই এক, এবং চিন্তাধারাও একই। একথা সত্ত্বেও, স্বভাবতঃই মনে হয় আমাদের স্বদেশের বস্তুপটভূমি এবং দেশীয় পরিবেশ রবীন্দ্র-চিত্তে এই চিন্তাধারা ও অনুভূতি সঞ্চার করে নাই; করিয়াছে সমরোত্তর য়ুরোপ, ও য়ুরোপই তাহাকে এই নূতন চৈতন্য দিয়াছে. এবং সেই চেতনায় দেশের পরিবেশ ও পটভূমিকে তিনি নূতন করিয়া দেখিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা প্রত্যক্ষগোচর ছিল না তাহা এই চৈতন্যের বলে বোধ ও অনুভূতির গোচর হইয়াছে, কবির নিজের ও তাঁহার অগণিত পাঠকের। এই পটভূমি মনের পশ্চাতে রাখিয়া "মুক্তধারা" ও "রক্তকরবী" পাঠ করিলে উহাদের মর্মোদ্ধার সহজ হইবে।

উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ তাঁহার শিল্পী যন্ত্ররাজ বিভূতিকে দিয়া বহু কৌশল ও পরিশ্রমের ফলে শিবতরাই রাজ্যের জল-চলাচলের যে মুক্তধারা তাহা বাঁধ বাঁধিয়া বন্ধ করিয়াছেন ; উদ্দেশ্য শিবতরাইয়ের অবাধ্য প্রজাদের বশ মানান। জলসরবরাহের পথ বন্ধ হওয়াতে অশেষ কষ্টে পড়িয়া প্রজারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়াছে ; দেশে দুর্ভিক্ষ, খাজনা দিতে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে। যুবরাজ অভিজিৎকে পাঠান হইয়াছে প্রজাদের শাসন করিবার জন্য। অভিজিৎ প্রেমের দ্বারা সস্নেহ হিতসাধন দ্বারা প্রজাদের বশ করেন, এবং উত্তরদিকের নন্দীসংকটের গড় ভাঙ্গিয়া দেন। তাহাতে শিবতরাইয়ের লোকদের বাণিজ্যের খানিকটা সুবিধা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে উত্তরকূটের ক্ষতি হয়। উত্তরকূটবাসীদের স্বদেশ ও স্বাজাত্যাভিমান প্রবল, সেই প্রীতি ও অভিমানে তাহারা শিবতরাইবাসীদের সর্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত নয় ; বস্তুত তাহারা মুক্তধারার বাঁধ তুলিয়া তাহাই করিয়াছে। রাজসভায় যুবরাজ অভিজিতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া তাহারা তাহাকে সেখানকার শাসনভার হইতে মুক্ত করিয়া উত্তরকূটে ফিরাইয়া আনিল। নূতন শাসনকর্তা হইয়া গেলেন রাজার শ্যালক ; তাহার অত্যাচারে দুদিনেই প্রজারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষের উপর আবার শাসকের অত্যাচার ; শিবতরাইয়ের ক্ষুব্ধ ক্রন্দন মুক্তধারার বাঁধের গর্জনে ডুবিয়া গেল। শিবতরাইয়ের দুঃখ উত্তরকূটের অধিবাসীদের আনন্দোৎসবের কারণ হইল ; মুক্তধারার বাঁধ তাহাদের গর্ব ও ঐশ্বর্যের উৎস। কিন্তু এই বাঁধ বাধিতে কত মজুরের আবশ্যিক-শ্রম লাগিয়াছে, কত তরুণ প্রাণ ইহার নির্মম দাবির নিচে বলি হইয়াছে। তাহাদের ক্ষীণ ক্রন্দন উৎসবের উন্মত্ততার মধ্যেও শোনা যাইতেছে : 'সুমন্, আমার সুমন…' বলিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়, সুমনের মা অম্বা ; পাগল বটুক সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া হাঁকিয়া চলে, 'সাবধান বাবা, যেওনা ওপথে…বলি দেবে…নরবলি !' এদিকে অভিজিৎ রাজার কাকা বিশ্বজিতের কাছে শুনিযাছেন, তিনি রাজকুলের কেহ নহেন, রাজা মুক্তধাবার নিকট তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়া পুত্রস্নেহে পালন করিতেছেন মাত্র। তিনি রাজকুলের নহেন, তিনি ব্যক্তিবিশেষের নহেন, তিনি সকলের তাঁহার কোন বন্ধন নাই, সকলের সঙ্গে তিনি বন্ধনে যুক্ত, তাঁহার বিশেষ কোন ঘর নাই, সকল ঘরই তাঁহার ঘর, তিনি সকল দেশের সকল জাতিব। উত্তরকূটের উৎসবের সঙ্গে তাই তাঁহার কোন যোগ নাই, সেখানে মানবাত্মা পীড়িত ও লাঞ্ছিত ; অম্বার কান্না, পাগল বটুকেব ক্ষোভ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। তিনি যন্ত্রবাজ বিভূতিকে, উত্তবকূটবাসীকে শিবতরাইয়ের সর্বনাশ হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিজ্ঞানগর্বে গর্বিত, ঐশ্বর্যে উন্মত্ত, স্বদেশাভিমানে অন্ধ বিভূতি ও উত্তরকূটবাসী সে-কথা শুনিবে কেন ? রাজাজ্ঞায় অভিজিৎ বন্দী হইলেন। বন্দীশালায় আগুন লাগিল। রাজখুল্লতাত বিশ্বজিৎ যুবরাজকে উদ্ধার করিয়া মোহনগড়ে লইয়া যাইতে চাহিলেন ; যুবরাজ রাজী হইলেন না। যুবরাজ বন্দীশালায় নাই শুনিয়া উত্তরকূটের লোকেরা পাগলের মত তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে ; সেই অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ তাহারা শুনিতে পাইল, রুদ্ধ জলস্রোত মুক্তি পাইয়া গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, যন্ত্ররাজ বিভূতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই দিশাহারা উন্মত্ত জনসংঘের দুয়ারে কুমার সঞ্জয় সংবাদ বহন করিয়া আনিল, যুবরাজ অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যে যন্ত্রকে তিনি ভাঙ্গিয়াছেন সেই যন্ত্রও তাহার প্রতিশোধ লইয়াছে, আহত যুবরাজ অভিজিৎ স্রোতের মুখে পড়িয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন কেহ বলিতে পারে না।

যে-ভাবে এই নাটকের আখ্যান-বস্তুটি বিবৃত করিলাম তাহাতে মুক্তধারার কবিত্ব মাধুর্য ধরা পড়িবার কথা নয়, সে-কবিত্ব ছড়াইয়া আছে অভিজিতের মুক্ত-মানসের গভীর দ্যোতনায়, ব্যঞ্জনাময় ভাষণের মধ্যে, ধনঞ্জয়ের গানে ও ভাষণে, ভৈরবপন্থীদের গানে। তাহা ছাড়া সর্ববন্ধনমুক্ত মানবাত্মার চিরন্তন যে-আদর্শ, সকল বন্ধনকে আঘাত করিয়া ছিন্ন করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার যে শাশ্বত আদর্শ সকল যুগের সকল মানবাত্মাকে দুর্নিবার বেগে টানিয়াছে তাহার পরিচয়ও নাটকটিতে সুস্পষ্ট; এবং সে-আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে নাটকীয় আখ্যান বিন্যাসের কলাকৌশলের মধ্যে, ধনঞ্জয় ও অভিজিতের চরিত-রেখা ও ভাষণের মধ্যে। কিন্তু, সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে "মুক্তধারা"য় সমসাময়িক সমাজ-মানসের চেতনা। আমাদের কালে স্বদেশ ও স্বাজাত্যাভিমান মানুষকে কিরূপ অন্ধ ও স্বার্থলোলুপ করিয়া তুলিয়াছে, জড-যান্ত্রিকতা মানুষের প্রাণকে লইয়া তাহার মনুষ্যত্ব লইয়া কি ভাবে ছিনিমিনি খেলিতেছে, মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত যন্ত্র কি করিয়া মানুষের মস্তিষ্ককে ছাড়াইয়া যাইতেছে, এ সমস্তই আধুনিক সমাজ-মনকে অল্পবিস্তর আলোড়িত করিতেছে। "মুক্তধারা" এই আলোড়নের কাব্যময় রূপ। রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিক-সভ্যতার যুগকে একান্তভাবে অস্বীকার করেন না। কিন্তু যে-যান্ত্রিকতা মানুষকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরাগ সর্বজনবিদিত। সেই বিরাগের প্রকাশ "মুক্তধারা"য়ও আছে। প্রভু-জাতির দৌরাত্ম্য এবং পরাধীন জাতির দুঃখের রূপও সুস্পষ্ট। অবশ্য, বলা যাইতে পারে, যান্ত্রিকতার প্রতি কবির বিরাগ কাযকারণ-বিচারলব্ধ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত নয়, যন্ত্র যে মানুষকে অতিক্রম করিয়া যায় তাহা যন্ত্রের অথবা যান্ত্রিকতার দোষ নয়, এমন কি যন্ত্ররাজ বিভূতিরও নয়, তাহা সমাজ-ব্যবস্থারই দোষ! আপাতদৃষ্টিতে শুধু মনে হয়, যন্ত্রটাই দোষী, যন্ত্রনির্মাতাই বুঝি দোষী। সেই জন্য যন্ত্ররাজ বিভূতির সঙ্গে যুবরাজ অভিজিতের যে দ্বন্দ্ব তাহা সমাজ-চৈতন্যের সজ্ঞান পরিচয় নয়; অভিজিৎ যন্ত্রটাকে আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু যাহারা যন্ত্রের সাহায্যে মানুষকে দাস করিয়াছে, তাহাদের আঘাত করেন নাই। কিন্তু, এ ত হইল যুক্তির কথা, এই যুক্তি হয়ত কবির অনুভবের মধ্যে ধরা দেয় নাই; কিন্তু তিনি এই যান্ত্রিকতাকে যে-দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন, যে-ভাবে ইহাকে অনুভবের মধ্যে পাইয়াছেন তাহার সমস্ত রূপটিই যে "মুক্তধারা"য় আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে। অভিজিৎ যুবরাজ, কিন্তু তিনি রাজার পুত্র নহেন, রাজা তাঁহাকে মুক্তধারার ঝরনার নিচে কুড়াইয়া পাইয়া পুত্রের মতন লালন করিয়া যৌবরাজ্য দিয়াছেন, এ খবর অভিজিৎ জানিলেন খুড়ামহারাজ বিশ্বজিতের মুখে সক্রিয় বিরোধের পূর্বাহ্নে। আখ্যানবস্তুর জন্য কিংবা নাটকীয় সংস্থানের জন্য এই জ্ঞানের কি খুব প্রয়োজন ছিল? রাজার ঔরসজাত পুত্রের পক্ষে কি এই ধরনের মনন অথবা ক্রিয়া সম্ভব ছিল না? তাহা না হওয়ায় গল্পের দিক হইতে অথবা গল্পার্থের দিক হইতে লাভ কি এবং কোথায় হইল? একথা অবশ্য সহজবোধ্য যে, কবি হয়ত অভিজিৎ-মানসের পরিবেশটিকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন যাহাতে স্বভাবতই মনে হইবে কি জন্ম-ব্যাপারে, কি শিক্ষায় দীক্ষায় সকলভাবে সে সর্ববন্ধনমুক্ত, সর্বসংস্কারমুক্ত, স্বীয় শ্রেণী ও সমাজ-সংস্কার হইতে সে বিচ্যুত, সে বৃন্তহীন পুষ্পের মত আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সবচেয়ে দৃঢ় যে বন্ধন সেই জন্মের বন্ধনেও সে কাহারও সঙ্গে জড়িত নয়, এবং সেইজন্যই সমস্ত বন্ধনকে অস্বীকার করা তাহার পক্ষে সহজ হইয়াছে, রাজসিংহাসনের, রাজধর্মের সংস্কার, প্রভুধর্মের সংস্কার কিছুতেই তাহার জীবন-স্রোতকে

বাঁধিতে পারে নাই, যন্ত্ররাজ বিভূতির বাঁধও নয়। "গোরা"-উপন্যাসে গোরার জন্মরহস্যের মধ্যেও এই ধরনের একটা যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয়। সেকথা যথাস্থানে আমি আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু, ইহা কি যথেষ্ট যুক্তিসহ? বুদ্ধদেব ত রাজবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও ত যুবরাজ ছিলেন, জন্মের বন্ধনে তিনি শুদ্ধোদনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এবং তিনি তাহা জানিতেন ; কিন্তু তাঁহার পক্ষে ত সম্ভব হইয়াছিল সর্ববন্ধনমুক্তির সাধনা করা, তাহাতে কৃতকার্য হওয়া এবং সেই সর্ববন্ধন মুক্তির বাণী প্রচার করা, কথায় ও কর্মে, বচনে ও জীবনে। তিনি জন্মের বন্ধনে কাহারও সঙ্গে জড়িত নহেন, এ-জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার হয় নাই। এই ধরনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়। শিল্পের দিক হইতে রসেব দিক হইতে যদি লাভবান হওয়া যাইত তাহা হইলে ইহাতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার যেন মনে হয়, তেমন ভাবে লাভবান আমরা হই নাই। একটু রহস্যময় পরিবেশ-সৃষ্টি হয়ত ইহাতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট লাভ নয়, বরং যেন মনে হয়, যে-মুহূর্তে অভিজিৎ জানিলেন জন্মের বন্ধনে তিনি রাজা, রাজবংশ বা রাজ-সিংহাসনের সঙ্গে জড়িত নহেন সে-মুহূর্তেই তাঁহার জীবনে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব অনেকটা শিথিল ও তরল হইয়া গেল, অন্তত সবচেয়ে বড একটা বাধা ও বন্ধনের বাঁধ বিনা চেষ্টায় বিনা আঘাতেই অতি সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। গোরার জীবনেও তাহাই। ভারতবর্ষে ভারতীয় সাধনা ও ঐতিহ্যের ক্রোড়ে ভারতীয় রক্তের ডোরে নাড়ীব বন্ধনে বাঁধা গোরাব জীবনে যে-দ্বন্দ্ব ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, যেমন করিয়া তাহার মন ও চিত্ত সেই দ্বন্দ্বে আবর্তিত হইতেছিল, তাহা শিথিল ও তরল হইয়া গেল, এমন কি সমস্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া গেল সেই মুহূর্তে যে-মুহূর্তে তাহার জন্মরহস্যের যবনিকা উত্তোলিত হইল, যে-মুহূর্তে সে জানিল সে আনন্দময়ীর পুত্র নয়, অভারতীয় এক অজ্ঞাত আইরিশ যুবকের পুত্র। সর্ববন্ধনমুক্ত মানবতার সন্ধান ও প্রতিষ্ঠাই যাহার আদর্শ জন্মের বন্ধনও তাহার কাছে অন্যতম বন্ধন মাত্র, অন্য সকল বন্ধনের মত তাহাকে অতিক্রম করার মধ্যেও মুক্তির মূল্য নিহিত, পাশ কাটিয়া এড়াইয়া গিয়া নয়। মহাভারতকারের কবিমানস কিন্তু তাহা করে নাই।

সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্॥

কর্ণ তাঁহার জন্মের বন্ধনকে অস্বীকার করেন নাই, তাহাকে স্বীকার করিয়াই তাঁহার পৌরুষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কুন্তীর নিকট হইতে যখন তিনি তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত জানিয়াছিলেন তখন যদি তিনি তাহা মানিয়া লইয়া পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতেন, এবং সেই মানিয়া লওয়ার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার পৌরুষই শুধু অবমানিত হইত তাহাই নয়, কর্ণ চরিত্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য শিথিল ও তরল হইয়া যাইত। কর্ণ রাধাপুত্র বলিয়াই নিজকে জানিতেন, কিন্তু এই জ্ঞানের বন্ধনকে তিনি এড়াইয়া যান নাই, কুন্তীর নিকট জন্মবৃত্তান্ত জানিবার পরও নয়, তিনি মুখোমুখি হইয়া সেই বন্ধনকে স্বীকার করিয়াছেন। গোরা ও অভিজিৎ দুইজনই যেন তাহাকে এড়াইয়া গিয়া নিজেদের এক সুকঠিন দ্বন্দ্ব হইতে বাঁচাইয়াছেন।

"প্রায়শ্চিত্ত"-নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী এখানেও আছেন, এবং প্রায় একই রূপে ও আত্মায় ; আর, খুড়ামহারাজ যে "বৌ-ঠাকুরানীর হাট"-উপন্যাস অথবা "প্রায়শ্চিত্ত"-নাটকের রাজা বসন্তরায়ের অতি নিকট আত্মীয় তাহা খুব অমনোযোগী পাঠকের চোখও এড়াইবে না বলিয়াই মনে হয়।

"মুক্তধারা" একান্তভাবে নাট্যধর্মী ; 'আইডিয়া'র বাহন হওয়া সত্ত্বেও, কাব্যময় হওয়া সত্ত্বেও ইহার নাটকীয় রসই প্রধান এবং প্রথম উপভোগ্য। ইহার ঘটনা-সংস্থান, চরিত্রাভিব্যক্তি এবং ভাষণও একান্তই নাটকীয়, কিন্তু প্রায় একই যুক্তি ও গল্পার্থের বাহন হওয়া সত্ত্বেও "মুক্তধারা"র পরবর্তী নাটক "রক্তকরবী" সম্বন্ধে একান্তভাবে একথা বলা চলে না। "রক্তকরবী" গীতধর্মী, "রক্তকরবী" নাটকীয় কাব্য। নাটকীয় রস "রক্তকরবী"তে অনুপস্থিত। "মুক্তধারা"য় ঘটনার আবর্ত আছে, হয় মঞ্চের উপর না হয় দর্শকের মনের ভিতর। "রক্তকরবী"তে এই আবর্ত নাই ; একটি মাত্র সংস্থান গল্পের মধ্যে স্থির হইয়া আছে। একদল লোক, তাহারা সমাজের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজ-মানসের বিভিন্ন স্তরের প্রতীক ; তাহারা সকলেই লোভের, প্রথা ও সংস্কারের শৃঙ্খলে নিজেদের কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ। সেই কারাগারের জানালার লোহার জালের বাহির হইতে প্রেম ও প্রাণশক্তির প্রতীক, মুক্ত জীবনানন্দের প্রতীক নন্দিনী হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিতেছে, 'চলে এস, চলে এস। তোমাদের সকল শিকল ছিঁড়ে মুক্ত জীবন-প্রাচুর্যের প্রেম ও আনন্দের জগতে চলে এস।' আর, তাহার সেই উন্মাদন আহ্বানে কারাগারের ভিতরে যত লোক সকলে চঞ্চল ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, সকলের হৃদয়ের দ্বারে আঘাত লাগিয়াছে। এই ত গল্পার্থ, ইহাই ত গল্পের সংস্থান। এই সংস্থানের মধ্যে প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিজ নিজ শ্রেণী ও স্তরের বিশিষ্টরূপে বিশিষ্ট মানস লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে অসাধারণ শিল্পকৃতিত্বে, গভীর সামাজিক চেতনায়। এই ধরনের স্বল্পপরিসর গল্প-সংস্থানের ভিতর এবং গীতধর্মী গল্পার্থের মধ্যে যথেষ্ট ঘটনাবর্ত ও নাটকীয় সম্ভাবনা উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়।

"রক্তকরবী" রচিত হইয়াছিল ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মকালে, শিলঙের শৈলবাসে ; তখন ইহার নামকরণ হইয়াছিল "যক্ষপুরী"। দেড় বৎসর পর অনেক কাটাছাঁটা করিয়া ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের "প্রবাসী"তে যখন উহা সর্বজনগোচর হয় তখন ইহার নাম হইল "রক্তকরবী"। নাম লইয়া বিব্রত হইবার কিছু কারণ নাই, সেক্সপীয়রকে স্মরণ করিয়া বলা যাইতে পারে নামে কিছু আসে যায় না, তবু আমার মনে হয় "যক্ষপুরী" নামটি এই নাটকের পক্ষে সার্থকতর ছিল, যদিও "রক্তকরবী" নাম অধিকতর কবিত্বময়।

যক্ষপুরীর রাজার রাজধর্ম প্রজাশোষণ ; তাহার অর্থলোভ দুর্দম। সেই লোভের আগুনে পুড়িয়া মরে সোনার খনির কুলিরা। রাজার দৃষ্টিতে কুলিরা ত মানুষ নয়, তাহারা স্বর্ণলাভের যন্ত্রমাত্র, তাহারা ৪৭ক, ২৬৯ফ মাত্র, তাহারা জড় যান্ত্রিকতার যন্ত্র-কাঠামোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র, মানুষ হিসাবে তাহাদের কোনও মূল্য নাই। মনুষ্যত্ব, মানবতা এই যন্ত্রবন্ধনে পীড়িত ও অবমানিত। জীবনের প্রকাশ সেই যক্ষপুরীতে নাই। প্রেম ও সৌন্দর্য হইতেছে জীবনের প্রকাশের সম্পূর্ণ রূপ, নন্দিনী তাহার প্রতীক, এই নন্দিনীর আনন্দ-স্পর্শ যক্ষপুরীর রাজা পান নাই তাঁহার লোভের মোহে, সন্ন্যাসী পান নাই তাঁহার ধর্মসংস্কারের মোহে, মজুররা পায় নাই অত্যাচার ও অবিচারের লোহার শিকলে বাঁধা পড়িয়া, পণ্ডিত পায় নাই তাঁহার পাণ্ডিত্যের এবং দাসত্বের মোহে। সেই যক্ষপুরীর লোহার জালের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক, প্রাণশক্তির প্রতিমূর্তি নন্দিনী হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিল ; যক্ষপুরীর কারাগারের ভিতরে একমুহূর্তে সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল, মুক্ত জীবনানন্দের স্পর্শ সকলের দেহে মনে লাগিল, এ যে বসন্তের বাতাস! রাজা নন্দিনীকে পাইতে চাহিলেন যেমন করিয়া তিনি সোনা আহরণ করেন তেমন করিয়া, শক্তির বলে কাড়িয়া লইয়া পাওয়ার মতন করিয়া, ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়ার মতন করিয়া ; কিন্তু তেমন করিয়া প্রেম ও

সৌন্দর্যকে লাভ করা যায় কি? নন্দিনীকে তিনি তাই পাইয়াও পান না; বাতাস আসিয়া গায়ে লাগে কিন্তু তাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারেন না। এমন যে মোড়ল সে-ও বিচলিত হইল, সে-ও নন্দিনীকে ভালবাসিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ পাইল বিরোধের মধ্য দিয়া। পণ্ডিত, কিশোর, কেনারাম, সকলেই চঞ্চল হইল এই জীবনানন্দের রূপ দেখিয়া, প্রাণ প্রাচুর্যের মধ্যে বাঁচিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া জালের বাহিরের দিকে হাত বাড়াইল। নন্দিনী রঞ্জনকে ভালবাসে, নন্দিনীই রঞ্জনের মধ্যে এই প্রেম জাগাইয়াছে; কিন্তু সে ত যন্ত্রের বন্ধনে বাঁধা, এবং সেই যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত তাহাকে বিনাশ করিয়া প্রেমকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল, জীবনের সঙ্গতি নষ্ট করিয়া দিল। ইহাই যান্ত্রিকতার ধর্ম বলিয়া কবি বিশ্বাস করেন, অনুভব করেন। নন্দিনীর প্রেমাস্পদ বলি হইল যান্ত্রিকতার যূপকাষ্ঠে, এবং তাহারই মধ্য দিয়া জীবন হইল জয়ী আবার প্রেমকেই সন্ধান করিয়া ফিরিয়া পাইবার জন্য। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি; এই দৃষ্টিভঙ্গি বহু কবিতায়, গাথায়, নাট্যে, গল্পে তিনি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

"রক্তকরবী"তে সমাজ-চেতনা "মুক্তধারা"র মতন এতটা প্রকাশ্যে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে না; "রক্তকরবী"র দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক, আগেই বলিয়াছি, ইহা গীতধর্মী। এই কবি-মানস লইয়াই রবীন্দ্রনাথ বর্তমান জড়-যান্ত্রিকতা ও জীবনধর্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সন্ধান করিয়াছেন। ইহা সত্য হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, তবে "রক্তকরবী" তাহারই কাব্যময় রূপ।

আট

গৃহপ্রবেশ (১৩৩২)
শোধবোধ (১৩৩২)
পরিত্রাণ (১৩৩৬)
তপতী (১৩৩৬)
কালের যাত্রা (১৩৩৯)
চণ্ডালিকা (১৩৪০)
বাঁশরী (১৩৪০)

১৩৩২ সালে "চিরকুমার সভা"র অভিনয়-সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি পুরাতন গল্প ও নাটককে নূতনভাবে নাট্যরূপ দিতে আরম্ভ করেন! সেই বৎসরই 'কর্মফল' গল্প রূপান্তরিত হইল "শোধবোধ"-নাটকে এবং 'শেষের রাত্রি' গল্প "গৃহপ্রবেশে"। দু'টিই মোটামুটিভাবে সামাজিক নাটক এবং দু'টিই সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল।

গল্প হিসাবে "শেষের রাত্রি" নিখুঁত। ইহার মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের আত্মপ্রতারিত জীবনের যে সুগভীর ফাঁকি ও বেদনা এবং তাহারই প্রেক্ষাপটে মাসির স্বার্থলেশহীন ছলনায় করুণ ও ব্যথিত হৃদয় যে দীর্ঘ নিস্তব্ধ সুরাবেগ সঞ্চার করিয়াছে, আশায় ঊর্ধ্বশিখ প্রেমের নিষ্ঠুর ব্যর্থতার একটি করুণ চাপা কান্নার যে নিরবচ্ছিন্ন গীত ধ্বনিয়া তুলিয়াছে, খুব কম গীতধর্মী গল্পেই তাহার তুলনা মেলে। কিন্তু নাটকীয় গুণে এই গল্প দুর্বল; বস্তুত ইহা নাট্যধর্মী গল্পই নয়। "গৃহপ্রবেশে" ডাক্তার ও অখিলের চরিত্র

কল্পনায়, তাহাদের কথাবার্তায়, কয়েকটি মধুর গানের অবতারণায় এবং ঘটনার বিন্যাসে গল্পটিকে একটু নাটকীয় দৃশ্যগত করিয়া তোলার চেষ্টা করা হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে আগাগোড়া একটি মৃত্যুপথযাত্রীর আত্মপ্রতারিত জীবনের রুগ্ন, দুঃখভারগ্রস্ত দৃশ্য প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এক মর্মান্তিক ব্যথার দুঃসহভার দর্শকের চিত্তের উপর পাথরের মত যেন চাপিয়া বসিয়া থাকে, কোথাও যেন এতটুকু ফাঁক নাই। যে-সব দৃশ্যে মণি বা প্রতিবেশিনী বা ডাক্তারের অবতারণা আছে সেখানেও মাসি যেভাবে যতীনকে আগলাইবার চেষ্টা করিতেছেন, নির্মম সত্যকে ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, সে-চেষ্টাটাও মর্মান্তিক। মাত্র দুই তিনটি খণ্ডদৃশ্যে অখিলের বা অন্য দু'একটি আশ্রয়ে লেখক পাঠক ও দর্শকের মনের উপর হইতে এই ব্যথার ভার সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এমন কি অখিলের আশ্রয়ে একটু হাসির চেষ্টাও করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অত্যন্ত স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত, এবং সেক্ষেত্রেও হিমি এক মস্ত বাধা। দাদার দুঃখভার তাহাকেও স্পর্শ করিয়াছে, এবং অখিলের লঘুতার উপর সে যেন চাপিয়া বসিয়া আছে। মণির চরিত্র কল্পনা একটু অস্বাভাবিক, কিন্তু "শেষের রাত্রি" গল্পে সে-অস্বাভাবিকত্বটুকু প্রায় চোখেই পড়ে না; সুরাবেগে উচ্ছ্বসিত গীতধর্মী গল্পে তাহা ধরা পড়িবার কথাও নয়; কিন্তু নাটক, বিশেষভাবে পরিবার বা সমাজের আবেষ্টনে যে নাটকের গড়ন তাহাতে বস্তুঘনিষ্ঠতা না থাকিলে দৃশ্যগত নাটক শিথিলমূল হইয়া পড়ে। "গৃহপ্রবেশে" এই শিথিলতা ধরা পড়িয়া যায়, মণির অস্বাভাবিকত্ব প্রকট হইয়া উঠে; পাটের বাজারের উল্লেখ কিংবা অখিলের মতন সাংসারিক চরিত্রের অবতারণা সত্ত্বেও "গৃহপ্রবেশ" দর্শকচিত্তে যথেষ্ট বস্তুসচেতনতা সঞ্চার করে না। গল্পে যেমন নাটকটিতেও তেমনই, মাসি চরিত্রের কল্পনাই একমাত্র সত্য ও সার্থক কল্পনা; এই চরিত্রটিই গল্প ও নাটক উভয়েরই একমাত্র দীপ্তি, এবং এই চরিত্রেরই যাহা কিছু নাটকীয় ধর্ম। "শেষের রাত্রি" গল্পের ইংরেজী অনুবাদের নামকরণ হইয়াছিল 'Mashi'; ইহার ইঙ্গিত সার্থক। বস্তুত, গল্প এবং নাটক উভয়ের দিক হইতে "শেষের রাত্রি" বা "গৃহপ্রবেশ" নামকরণ কোনটিই যথেষ্ট অর্থবহ নয়; "গৃহপ্রবেশ" যদি বা খানিকটা প্রাসঙ্গিক, "শেষের রাত্রি" তাহাও নয়। মাসি কথাটি কথা হিসাবে অর্থ ও বর্ণহীন হইলেও এই গল্প ও নাটক সম্পর্কে ইহার চেয়ে সার্থক নামকরণ আর কিছু হইতে পারে না। তাহা ছাড়া "গৃহপ্রবেশে" পুত্রহীনা মাসি চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও জটিলতাই যাহা কিছু নাটকীয় গুণের মূলে, এবং এই চরিত্রই "গৃহপ্রবেশ"কে দৃশ্যকাব্যের মেরুদণ্ড দান করিয়াছে।

নাটকীয় গুণে "শোধবোধ" অধিকতর সার্থক। "শোধবোধে"র সমাজাশ্রয় নগর-নির্ভর বিলাসপুষ্ট উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজ। নলিনী ওরফে নেলী, সতীশ, নন্দী, চারু, সুকুমারী, শশধর, মিঃ লাহিড়ী প্রভৃতি সকলেই এই সংকীর্ণ সমাজাশ্রিত নারী ও পুরুষ এবং ইহাদের সকলেরই চলনবলন ধরনধারন সমস্তই এই সমাজের আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; নেলীর সঙ্গে চারুর, সতীশের সঙ্গে নন্দীর অথবা সুকুমারীর সঙ্গে বিধুমুখীর যে পার্থক্য তাহা এই সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-জটিলতারই বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপ। এই দ্বন্দ্ব-জটিলতা যে-সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার কার্যপরম্পরাগত ঘটনা-পরিণতিই "শোধবোধে"র নাটকীয় মূল। এই মূলকে সমৃদ্ধতর করিয়াছে মাতৃত্বলাভের পর সুকুমারীচিত্তের পরিবর্তন এবং সতীশের ভাগ্যবিপর্যয়জনিত ঘটনায় বিবর্তন। এই পরিবর্তন-বিপর্যয়-বিবর্তনের মধ্যে দু'টি চরিত্র

স্থির ও অচঞ্চল— নলিনী ও শশধর। সমস্ত পরিবর্তন-বিপর্যয়ের মধ্যে এই দুইজন কখনও কেন্দ্রচ্যুত হয় নাই, এবং ইহারাই ঘটনার আবর্তকে কেন্দ্রচ্যুত হইতে দেয় নাই। দিলে এই নাটকের পরিণতিই হইত অন্য রকম। "শোধবোধ" যথার্থ 'কমেডি'; শেষ দৃশ্যে নলিনীর সঙ্গে সতীশের মিলন ঘটনার যুক্তি পরম্পরাগত। দুঃখ ও ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়াই যে প্রেম সার্থকতর পরিণতিতে পৌঁছায়, লেখকের এই মানসাদর্শ এই লঘু মিলনান্ত নাটকটিতেও উপস্থিত। কিন্তু শেষদৃশ্যের অব্যবহিত পূর্বে পিস্তলের সাহায্যে সতীশের আত্মহত্যার চেষ্টা, মুহূর্তের মধ্যে হরেনকে হত্যার ইচ্ছায় সে-চেষ্টার রূপান্তর, এবং সুকুমারী ও শশধরের অবলম্বনে উভয় চেষ্টার ব্যর্থতা ও সকল মুশকিলের আসান একটু মেলোড্র্যামাটিক এবং একটু অবাস্তর বলিয়াই মনে হয়। যে সমাজ ও পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে এই নাট্যবস্তুর বিন্যাস তাহাতে পিস্তলঘটিত দৃশ্যটা একটু অসমঞ্জস, তাহা ছাড়া যে-পরিণতি লেখকের মনে ছিল তাহা ঘটাইবার জন্য এই স্নায়ুদুর্বল উন্মত্ত কয়েকটি মুহূর্তের অবতারণার অনিবার্য প্রয়োজনও কিছু ছিল না।

"গৃহপ্রবেশ শোধবোধ" রচনার তিনবৎসর পরই পুরাতন নাটককে নূতনরূপে রূপান্তরিত করিবার আর এক পর্ব শুরু হয়। ১৩৩৬ সালে "গোড়ায় গলদ" রূপান্তর লাভ করে "শেষরক্ষা"য় ও "প্রায়শ্চিত্ত" "পরিত্রাণে", এবং "রাজা ও রানী" "তপতী"তে। 'শেষরক্ষা'ও "পরিত্রাণ" সম্বন্ধে অন্যত্র বলিয়াছি, "তপতী" সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহার প্রায় সবটুকুই রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়া দিয়াছেন "তপতী" গ্রন্থের ভূমিকায়। ইহার গল্পবস্তু "রাজা ও রানী"র, কিন্তু তৎসত্ত্বেও "তপতী" একেবারে স্বতন্ত্র নূতন নাটকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। একথা সত্য "রাজা ও রানী" নাটকীয় গঠন ও ঘটনা-বিন্যাসে শিথিল, একটু মেলোড্র্যামাটিক চমকপ্রদ; এবং ইহার ত্রুটি বিচ্যুতি কবিকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় নাই। "তপতী"র ভূমিকায় কবি বলিতেছেন,

"রাজা ও রানী আমার অল্পবয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

"সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো। এইটেই রাজা ও রানীর মূল কথা।

"রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে, তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা বিভক্ত। এই নাটকেই অন্তিমে কুমারের মৃত্যুর দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

"অনেক দিন ধ'রে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। * * * এটিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত ক'রে একে অভিনয় যোগ্য করবার চেষ্টা করছিলুম। দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কার দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলাম এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদগতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শোধ করেছি।"

ইহা ঠিক যে আঙ্গিকের দিক হইতে "তপতী" "রাজা ও রানী" অপেক্ষা দৃঢ় ও সংহত "রাজা ও রানী"তে যে-তত্ত্বটা লেখক ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন বিক্রম ও সুমিত্রার প্রেমের গতি, প্রকৃতি ও পরিণতির মধ্য দিয়া, তাহা "তপতী"তে সুস্পষ্ট রূপ লইয়াছে, এবং কুমার ও ইলার অপ্রাসঙ্গিক গল্পটা খসিয়া পড়াতে বিক্রম-সুমিত্রার আখ্যানটি স্পষ্টতর হইয়াছে, নাটকটিও সংহত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষতিও কি হয় নাই? "রাজা ও রানী"র

রানী সুমিত্রা মানবী ছিলেন, মানবীয় দোষগুণে চরিত্রটি ছিল ঘনিষ্ঠতর নিকটতর; কিন্তু "তপতী"র রানী ত্যাগের কঠোর তপস্যায় মানবীয় দোষগুণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রায় যেন দেবীর পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন, এবং গল্পবস্তুনিহিত তত্ত্বটি যেন আত্ম-প্রচারে উন্মুখ হইয়াছে। কাজেই একথা মনকে অধিকার করে, জীবনের যে-পর্বে "রাজা ও রানী"র 'রূপান্তর ঘটিল' "তপতী"তে রবীন্দ্রনাট্যের সেই পর্বে কবিচিত্তে তত্ত্বের প্রতি অনুরাগ অনস্বীকার্য, এবং যে-তত্ত্ব "তপতী"তে তাহাই আছে একটু অন্য ভঙ্গিতে "রাজা"য়, ও "অরূপ রতনে"। ত্যাগ ও নিরাসক্তির তপস্যার ভিতর দিয়াই প্রেম ও মিলন হয় পূর্ণ ও সার্থক, ইহার মধ্যে জীবন-দর্শনের কোনও বিরোধিতা নাই; কিন্তু মানুষের মানবীয় কর্মকৃতি লইয়া যে নাটক, সেই ক্ষেত্রে মানুষ তপস্যার আগুনে পুড়িয়া দেবত্ব লাভ করিলে নাটকীয় বস্তু-চেতনা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়। অথচ প্রতীকী নাট্যে—যেমন "রাজা" ও "অরূপ রতনে"—এই অভিযোগ অবান্তর। "তপতী" নাটকে প্রতীক ধর্মের স্পর্শ লাগিয়াছে অথচ যথার্থ প্রতীকী নাটক হইয়া উঠে নাই। তাহা হইলে বোধ হয় এই অসঙ্গতিটুকু ধরা পড়িত না।

"কালের যাত্রা" ও "চণ্ডালিকা" উভয়ই রূপক নাট্য; প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৯'র ভাদ্রে এবং দ্বিতীয়টি ঠিক এক বৎসর পর ১৩৪০'র ভাদ্রে। "কালের যাত্রা"র দুইটি নাটিকা, একটি 'রথের রশি' আর একটি 'কবির দীক্ষা'। 'রথের রশি'র পূর্বতন রূপ 'রথযাত্রা' প্রকাশিত হইয়াছিল "প্রবাসী"তে ১৩৩০'র অগ্রহায়ণে; তাহারই একটু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ 'রথের রশি'। এই ছোট্ট রূপক নাটিকাটি আধুনিক গণসচেতন ভারতীয় মানসের 'ম্যানিফেস্টো'। ভারতবর্ষে মহাকালের রথ অচল হইয়া গিয়াছে; ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে; পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্রের হাতে সমাজযন্ত্র চালনার সমস্ত ভার কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে আজ সমাজ-রথ অচল। পুরোহিতের মন্ত্র, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য, ধনপতির ধনবল কিছুই সে-রথ আর চালাইতে পারিতেছে না—শাস্ত্র, শস্ত্র, ধন সমস্তই আজ অর্থহীন। এমন সময় হৈ হৈ করিয়া আসিয়া পড়িল অগণিত শূদ্রের দল, উন্মত্ত জলস্রোতের মত; যে শূদ্রের দল এতদিন মহাকালের রথের চাকার তলায় পিষ্ট হইয়া মরিয়া আসিয়াছে আজ তাহারা আসিয়াছে অচল রথ সচল করিতে। অগণিত শূদ্রের অমিত ঐক্যশক্তির বলে রথ চলিল, চলিল চিরাচরিত প্রথাবদ্ধ বাঁধাধরা পথে নয়, নূতন পথে, প্রশস্ততর পথে। শূদ্র শক্তির হইল জয়। এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন কবি। সকলে কবির কাছে এই অপূর্ব অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,

> "এ কী উল্টাপাল্টা ব্যাপার, কবি? পুরুতের হাতে চল্‌লো না রথ, রাজার হাতে না, মানে বুঝলে কিছু!" কবি বলিলেন, "ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু, মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—নীচের দিকে নামলো না চোখ, রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ। মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে-বাঁধন, তাকে ওরা মানেনি। * * * পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছে মাটি। রথের দড়ি প'ড়ে থাকে বাইরে! সে থাকে মানুষে বাঁধা—দেহে দেহে প্রাণে-প্রাণে। সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল। * * * এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না। * * * আজকের মতো বলো সবাই মিলে, যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে; যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।"

বলা বাহুল্য, এই রূপকের প্রত্যক্ষ আশ্রয় সমসাময়িক সমাজ-মানস। সমসাময়িক

বাংলা ও ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজচেতনায় যে পৃথিবীর আদর্শ ক্রমশ স্বীকৃতির পথে ধরা দিতেছিল-তাহারই প্রকাশ এই নাটিকাটিতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে, কবি একান্তভাবে শূদ্র-শাসিত সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পনাও করিতেছেন না। মহাকালের রথ অচল হইয়াছিল শূদ্র-শক্তিকে একান্তভাবে অস্বীকার করা হইয়াছিল বলিয়া; পুরোহিততন্ত্র, ধনতন্ত্রকেই একান্তভাবে সকল শক্তির উৎসরূপে স্বীকার করা হইয়াছিল বলিয়া। তাহার ফলেই হইয়াছিল তালভঙ্গ, ছন্দ পতন, ভারসাম্যের হানি। তাল মিলাইয়া, ছন্দ বাঁচাইয়া ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চল, একদিকে ঝোঁক বেশি দিও না, তাহা হইলেই মহাকালের রথ চলায় বিঘ্ন হইবে না—ইহাই যেন কবির যুক্তি। একান্ত সাম্প্রতিক মানসে এ-যুক্তি স্বীকৃতি লাভ নাও করিতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে 'রথের রশি'র ব্যঞ্জন এ-যুক্তি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এবং এ-যুগে শূদ্রশক্তির মধ্যেই যে রথ চালনার কর্তৃত্ব নিহিত সে-ইঙ্গিত বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। তত্ত্বমূলীয় রূপক হওয়া সত্ত্বেও 'রথের রশি'তে নাটকীয় গতি অব্যাহত, এবং সমাজ-বিবর্তনের ইঙ্গিতগুলি বিভিন্ন চরিত্রের বচনবাচনে সুস্পষ্ট। আধুনিক গণ-চেতনা সমৃদ্ধ মানসে এই নাটিকাটি অধিকতর সমাদরের অপেক্ষা রাখে।

'কবির দীক্ষা' রচনাটিকে যথার্থ নাটক বলা কঠিন। কোনও ঘটনা নাই, কোনও গতি নাই, আছে শুধু দুইজনের কথাবার্তা, এবং তাহাদের চারিত্রিক বিবর্তন কিছুই নাই—যাহা আছে তাহা শুধু একটু তত্ত্ব, ত্যাগের কাব্যীয় দর্শন। শিবমন্ত্রের উপাসক কবি ভিক্ষার মন্ত্রে, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু এই ভিক্ষা, এই ত্যাগ নেতিধর্মী নয়, শূন্যসার স্তবপূজা নয়।

"ত্যাগের রূপ দেখ ঐ ঝরনায়, নিয়ত গ্রহণ করে, তাই নিয়তই করে দান। * * * দারিদ্র্যে তাঁরই মহত্ত্ব, মহৎ যিনি ঐশ্বর্যে। মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন বলে নয়, আমাদের দানকে করতে চান সার্থক। * * * কিছু তিনি চাননি কুকুর-বেড়ালের কাছে। অন্ন চাই বলে ডাক দিলেন মানুষের দ্বারে। বেরোলো মানুষ লাঙল কাঁধে। যে-মাটি ফাঁকা ছিল প্রকাশ পেল তাতে অন্ন। বললেন চাই কাপড়—হাত পেতেই রইলেন। বেরোলো ফলের থেকে তুলো, তুলোর থেকে সুতো, সুতোর থেকে কাপড়। ভাগ্যে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি অসীম তাই মানুষ সন্ধান পায় অসীম সম্পদের। নইলে দিন কাটতো কুকুর-বেড়ালের মতো। তোমরা কি বলো সবচেয়ে সন্ন্যাসী ঐ কুকুর-বেড়াল। * * * মানুষকে যদি দেউলে করেন তিনি, তবে ভিক্ষু-দেবতার ভিক্ষা হবে যে অচল। তাঁর ভিক্ষার ঝুলির টানে মানুষ হয় ধনী, যদি দান করতেন ঘটতো সর্বনাশ। * * * প্রাণে ধনই হলো আনন্দ, যাকে বলি রস। যেখানে রসের দৈন্য, ভরে না সেখানে প্রাণের কমণ্ডলু। * * * মানুষের যিনি শিব তিনি বিষপান করেন বিষকে কাটাবেন বলে। ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও দ্বারে দ্বারে রব উঠলো তাঁর কণ্ঠে, সে ভিক্ষা মুষ্টি ভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা। নির্ঝরিণীর স্রোত যখন হয় অলস তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান। দুর্বল আত্মার তামসিক দানে দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জ্বলে।"

বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে ভারতের রাষ্ট্রসাধনার ভিক্ষা ও ত্যাগের ওপর জোরটা পড়িয়াছিল বেশি, দারিদ্র্য বস্তুটাকে একটা সুমহান আদর্শ হিসাবে দাঁড় করাইবার চেষ্টাও দেখা দিয়াছিল, এমন কি এই পর্বের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তাটার প্রকৃতিই ছিল নঙর্থক ও নেতিবাচক। রবীন্দ্র-কবিচিত্ত ইহাকে স্বীকার করে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্ব যে রবীন্দ্রনাথের পুরাপুরি স্বীকৃতি লাভ করে নাই, ইহাও তাহার আংশিক হেতু। রবীন্দ্রনাথের ভিক্ষা ও ত্যাগের ধর্ম অভাবাত্মক যে নয় তাহা কবির পূর্বজীবনের অনেক রচনায়ও সুস্পষ্ট। ঐশ্বর্যে যে সমৃদ্ধ দারিদ্র্য তাহারই অলংকার; ভিক্ষা ও ত্যাগের গর্ভে থাকা চাই অসীম বিত্ত ও চিত্তসমৃদ্ধি। দারিদ্র্য আদর্শ নয়, ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধিই

আদর্শ; ভিক্ষা ও ত্যাগের শুভ্র দীপ্তি ফুটিতে পারে তাহারই প্রেক্ষাপটে। 'কবির দীক্ষা' রচনাটিতে এই তত্ত্বটুকুই ব্যক্ত হইয়াছে; কবি-মানসের ইতিহাসের দিক হইতে এই তথ্যটুকু মূল্যবান।

"বাঁশরী" নাটক নগরাশ্রয়ী সামাজিক নাটক; "পরিত্রাণ" বা "তপতী", "কালের যাত্রা" বা "চণ্ডালিকা" ইহাদের কাহারও সঙ্গে এই নাটকের কোনও সম্বন্ধ নাই, না ভাবে ইঙ্গিতে না নাটকীয় ধর্মে। বরং "গৃহপ্রবেশ" "শোধবোধে"র সঙ্গে ইহার খানিকটা একগোত্রীয়তা আছে, যদিও তাহা অত্যন্ত দূরবর্তী। ভাষায় ও বচনভঙ্গিতে "বাঁশরী" "দুই বোন-মালঞ্চ-চার অধ্যায়" উপন্যাসেব সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা, এমন কি, এই হিসাবে "শেষের কবিতা"র ব্যঙ্গ ও epigram-সমৃদ্ধ বঙ্কিম ও চতুর বাক্‌ভঙ্গি ও ভাষার সঙ্গে এই গ্রন্থের একটা দূর আত্মীয়তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়, যদিও পরবর্তী উপন্যাসগুলির মতনই "বাঁশরী"র ভাষার বা বাক্‌ভঙ্গিতে "শেষের কবিতা"র শানিত দীপ্তি, আলো ঝল্‌মল্ চমক অনেক দুর্বল ও স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। নাটক হিসাবে "বাঁশরী" দুর্বল; ইহার ঘটনা-সংস্থানে অথবা চরিত্রের বিবর্তনে নাটকীয় ধর্মের উপস্থিতি স্বল্পই। সুষমার, বিশেষ ভাবে বাঁশরীর চরিত্রে, সোমশংকরের চরিত্রে দ্বন্দ্ব নাই, এ কথা বলা চলে না, কিন্তু সে দ্বন্দ্ব চিত্তগত, মনের মধ্যেই তাহার লীলা; একমাত্র বাঁশরীর চিত্তদ্বন্দ্ব-নাটকীয় কর্মকৃতির মধ্যে কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে, এবং এই গ্রন্থের যাহা কিছু নাটকীয় গুণ তাহা শেষের দিকে প্রধানত বাঁশরী-পুরন্দর, বাঁশরী-সোমশংকর এবং আংশিক ভাবে অন্য দু'একটি দৃশ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও, বারবারই এ কথা মনে হয়, "বাঁশরী"র গল্পবস্তু বড় গল্প বা ছোট উপন্যাসেব, যথার্থ নাটকের নয়, এবং সেই হিসাবে মনে হয় "বাঁশরী" "দুই বোন-মালঞ্চে"র মত আর একটি ছোট উপন্যাস হিসাবেই হয়ত অধিকতর সার্থকতা লাভ করিত।

"বাঁশরী"র চিত্তদ্বন্দ্ব একটু জটিল। যে-সোমশংকরের সঙ্গে বাঁশরীর অন্তরের গ্রন্থি সেই সোমশংকর পুরন্দর-নির্দিষ্ট ব্রতের আহ্বানে সুষমার সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চলিয়াছে, অথচ সুষমা ও সোমশংকরের মধ্যে হৃদয়গত কোন ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠে নাই। এ-মিলন প্রয়োজনের মিলনে। যাহার ব্রতাদর্শের প্রেরণায় এই মিলন ঘটিতেছে, সুষমা সেই সন্ন্যাসী পুরন্দরের অনুরাগিণী; পুরন্দর তাহা জানিয়া শুনিয়াই নিজে উদ্যোগী হইয়া এই প্রয়োজনের মিলন ঘটাইতেছে। সোমশংকর ভালবাসে বাঁশরীকে; সুষমা যে তাহাকে ভালবাসে না তাহাও সে জানে, এবং তাহা জানিয়াও পুরন্দরের আহ্বানে এই প্রয়োজনের মিলনমালা গলায় পরিতে রাজী হইয়াছে; কিন্তু বিবাহ-বন্ধনের পুর্বমুহূর্তে পারস্পরিক পরিপুর্ণ আত্মনিবেদনের যে-দৃশ্য দর্শক ও পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল সেখানে নায়িকা সুষমা নহে, সে-নায়িকা বাঁশরী, এবং নায়ক সোমশংকর। সোমশংকর হৃদয়ের মধ্যে পাইল বাঁশরীকে প্রেমের চিরন্তন সঙ্গিনীরূপে, আর প্রতিদিনের প্রয়োজন, পুরন্দর-নির্দিষ্ট ব্রতাদর্শের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পাইল সুষমাকে। পুরন্দরেরই প্রয়োজনের জন্য সুষমা পুরন্দরকে ছাড়িতে বাধ্য হইল। আর বাঁশরী, সে সোমশংকরকে পাইল হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের একটি আত্মগত আদর্শের মধ্যে; পরিপুর্ণ তৃপ্তিতে প্রতিদিনের প্রেমসঙ্গের কামনা অবলীলায় সে প্রত্যাখ্যান করিল।

যে-সমাজশ্রেণী এই নাটকের আশ্রয়, সেই শ্রেণীতে পুরন্দরের এই প্রতিষ্ঠা দর্শক ও পাঠকচিত্তে নিঃসংশয় বিশ্বাস বহন করে না; তাহার ব্রতাদর্শ অস্পষ্ট, এবং কিসের জোরে

সুষমা ও সোমশংকরকে, বিশেষ করিয়া সোমশংকরকে এই অনুরাগলেশবিহীন প্রয়োজন-সর্বস্ব মিলনে তিনি বাঁধিতে পারিলেন তাহার কোনও ইঙ্গিতই নাটকে নাই। তাহা ছাড়া, পুরন্দর চরিত্রের চমক এত বেশি, এত বেশি রহস্যময় যে এই ধরনের বস্তু-ঘনিষ্ঠ সামাজিক নাটকে এতটা চমক এতটা রহস্য বস্তুপ্রত্যয়কে শিথিল করিয়া দেয়। ক্ষিতীশ চরিত্র খুব জীবন্ত এবং বাঁশরী চরিত্রের নাটকীয় দীপ্তি অনেকখানি সম্ভব হইয়াছে ক্ষিতীশকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু কি গল্পে কি চরিত্রে ক্ষিতীশের কোনও স্বকীয় মহিমা নাই, তাহার নিজস্ব কোনও দীপ্তি নাই, সে স্থিতদণ্ড নয়, অথচ এই নিজস্ব দীপ্তি ও স্বকীয় মহিমায় আর আর প্রত্যেকটি চরিত্রই উজ্জ্বল—বাঁশরী ত বটেই, পুরন্দর, সোমশংকর এমন কি সুষমাও।

"বাঁশরী" নাটক হিসাবে খুব উল্লেখযোগ্য হয়ত নয়, কিন্তু এই গল্পবস্তু রবীন্দ্র-মানসের একটা দিকে অতি সুস্পষ্ট আলোকপাত করে। রবীন্দ্র-মানসে নরনারীর প্রেম ও যৌবনসম্বন্ধগত এক অভিনব প্রত্যয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রত্যয় গড়িয়া উঠিয়াছে একটা জীবনদর্শনকে আশ্রয় করিয়া। দেহ ও আত্মার পৃথক অস্তিত্ব, সমাজ-সম্বন্ধের অতীত, প্রয়োজন চেতনার অতীত প্রেমের একটা ব্যাপ্ত ও নিগূঢ় আদর্শগত দিক এবং বিবাহ বন্ধনগত ব্যবহারিক দিক, এই দুইদিকের পৃথক অস্তিত্ব এই প্রত্যয়ের অন্তর্গত। "বাঁশরী" নাটকেও এই প্রত্যয় ধরা পড়িয়াছে : সোমশংকরের প্রেমের একতম তীর্থ বাঁশরী, সেই তাহার গূঢ়তম জীবনের একমাত্র আশ্রয়, যাহা কিছু হৃদয়-বন্ধন তাহা বাঁশরীর সঙ্গে, কিন্তু সে বিবাহ করিতেছে সুষমাকে। প্রতিদিনের জীবনের ব্যবহারিক দিককে সার্থকতা দিবার জন্য। এই প্রত্যয়, এবং যে-জীবনদর্শনকে এই প্রত্যয় আশ্রয় করিয়াছে সে-সম্বন্ধে আমি এই গ্রন্থের অন্যত্র, উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে কতকটা বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছি ; এখানে ইঙ্গিতটুকু মাত্র রাখিয়া যাইতেছি।

নয়

শেষ বর্ষণ (১৩৩৩)
বসন্ত (,,)
সুন্দর (,,)
নটীর পূজা (,,)
নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা (১৩৩৪)
নবীন (১৩৩৭)
শাপমোচন (১৩৩৮ ?)
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৩৪২)
পরিশোধ (১৩৪৩)

এই পর্যায়ের সব ক'টি গ্রন্থই গীতি ও নৃত্যনাট্য ; গান ও নৃত্যই তাহাদের বাহন ; গান ও নৃত্যই এই রচনাগুলির রস-সঞ্চারের মূলে। ইহাদের মধ্যে নাটকীয় গতি-পরিণতির, নাটকীয় রসের সন্ধান অবান্তর। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর ইহাদের রসসংবেদন, অত্যন্ত গূঢ় ও ব্যাপ্ত ইহাদের ব্যঞ্জনা। অনুভূতির বিশুদ্ধতায়, ভাবের গভীরতায়, উপলব্ধির সূক্ষ্ম সজীবতায় এবং আনন্দের সর্বব্যাপী অথচ সংযত উল্লাসে ইহারা অনেক ক্ষেত্রে

গীতিকবিতার রস-সংবেদনকেও অতিক্রম করিয়া যায়। নাটকের দিক হইতে ইহাদের বিচার ও আলোচনা করিতে গেলে ইহারা কি করিয়া যেন হাতের মুঠা এড়াইয়া উড়িয়া যায়। কোনও সাহিত্য-সংজ্ঞায় বাঁধিয়া ইহাদের পরিচয় দিবার চেষ্টা নিতান্তই বিড়ম্বনা। বস্তুত, ইহাদের মূল্য কাব্যের ক্ষেত্রে, সুর ও নৃত্যের রসমাধুর্যের ক্ষেত্রে, লোকোত্তর জীবনরস আস্বাদনের ক্ষেত্রে। নৃত্যে, গীতে, আবৃত্তিতে ইহাদের অভিনয় এমন একটি অপূর্ব আনন্দলোক সৃষ্টি করে যেখানে বিশ্লেষণ-বুদ্ধি স্তব্ধ হইয়া যায়। যে-আনন্দ যে-উপলব্ধি কবির দৃষ্টি ও মনে তাহা দর্শক ও পাঠকচিত্তে সঞ্চার করিয়া দিয়াই তাঁহার দায়িত্ব-মুক্তি ; ইহাদের সম্বন্ধে তথ্যবিচার অবান্তর, তত্ত্ববিচারও সংক্ষিপ্ত, ভাবকল্পনার রূপটাই প্রত্যক্ষ ও সর্বব্যাপী এবং তাহার প্রায় সবটুকুই সুরে ও সংগীতে প্রকাশমান। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি শুধু গানের মালা দিয়াই গাঁথা, যেমন “সুন্দর” ও “নবীন” ; ইহাদের যাহা কিছু নাট্যরূপ তাহা শুধু নৃত্যের মধ্য দিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে ; ইহাদের গানের সুরের মত এই নৃত্যরূপও একান্তভাবে ভাবানুগামী। দু'একটি রচনার, যেমন “শাপমোচন”, “নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা” ও “পরিশোধে”র মঞ্চ-রূপায়ন মূকাভিনয়ে ; গান ও নৃত্যকে আশ্রয় করিয়াই লেখকের ভাবকল্পনা প্রসারিত হইয়াছে। “নবীনে'' তবু গদ্য ব্যাখ্যানের সাহায্যে গানগুলিকে গাঁথা হইয়াছে ; “সুন্দর”, “শাপমোচন”, “নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা” কিংবা “পরিশোধে” তাহাও নাই। “নটরাজ”ও কতকটা শেষোক্ত পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত, যদিও “নটরাজে” গান ও নৃত্যের সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া চলিয়াছে কবিতা আবৃত্তি। চরিত্রাশ্রয়ী আলাপনেব সাহায্য মাত্র না লইয়া শুধু নৃত্যে ও সংগীতে ভাবকল্পনাকে বিস্তৃত করা এবং লেখকের আনন্দোপলব্ধি দর্শকের চিত্তে সঞ্চারিত করার এই অপূর্ব নাটকীয় কৌশল আধুনিক সাহিত্যে ও অভিনয়-কলায় বহুদিন অনভ্যস্ত ও অনাবিষ্কৃত ছিল , অথচ, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য, এমন কি বাংলাদেশের এক জাতীয় লোকাভিনয়ে এই কৌশল একান্ত অপরিচিত ছিল না। শুধু নৃত্য ও সংগীত আশ্রয় করিয়া ভাবকল্পনাব বিস্তার এবং দর্শকচিত্তে কাব্য ও নাটকীয় রসের সঞ্চার, ইহাই ভারতীয় ঐতিহ্যে নাট্যের আদিমতম রূপ, এবং এই রূপ সমাজের নিম্নতম স্তরে নিরক্ষব জনসাধারণের শিল্পমানসকেও অধিকার করিয়াছিল। কোনও কথাব আশ্রয় না লইয়া শুধু নাচিয়া ও গান গাহিয়া নিজেদের ভাব ও কল্পনাকে ব্যক্ত করা এবং সেই সূত্রে দর্শকের চিত্তে একটা বিশিষ্ট নির্দিষ্ট রসোপলব্ধি সঞ্চার করা, ইহাই যেন ছিল আমাদের বৃহত্তর গণসমাজের সহজতম নাটকীয় প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কল্প-মানসে এই রূপই আরও সূক্ষ্ম, আরও সমৃদ্ধ হইয়া এই বিশিষ্ট নৃত্যনাট্যলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুত, এই ধরনের নাট্যরচনায়, কি গানে কি আলাপনে, কথার মূল্য খুব বেশি নয়, কথাকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া যায় গানের সুর এবং নৃত্যের ছন্দ ও ভঙ্গি। “নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা''র বিজ্ঞপ্তিতে কবি তাই বলিতেছেন, ''এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে , এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে-প্রাণীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময়ে তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয় !”

''শেষবর্ষণ” প্রথম অভিনীত হয় কলিকাতায় ১৩৩২'র ভাদ্রে, ''বসন্ত'' কলিকাতায় ম্যাডান রঙ্গমঞ্চে ১৩২৯'র ফাল্গুনে এবং ''সুন্দর'' শান্তিনিকেতনে ১৩৩১'র ফাল্গুনে। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে ''ঋতু উৎসব'' নামে যে-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহাতে পুরাতন ''শারদোৎসব''

ও "ফাল্গুনী"র সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটি নাট্য-রচনাও ঋতু-ক্রমানুযায়ী সন্নিবিষ্ট হয়। বর্ষার শেষ হইতে বসন্তের শেষ পর্যন্ত যে-ঋতুরূপ স্পর্শকোমল কবিচিত্তে ক্ষণে ক্ষণে ভাবের ও কল্পনার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছিল তাহাকে কখনও গানে, কখনও নাটকীয় কথায় ভঙ্গিমায় রূপান্তরিত করিবার প্রয়াস এই রচনাগুলিতে। শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয় ও তাহার জীবনচর্যার আদর্শ ও আবেষ্টন এই রচনাগুলির পশ্চাদপটে; বস্তুত এই পর্যায়ের প্রায় সব রচনাই, বিশেষভাবে ঋতু-উৎসবাশ্রয়ী রচনাগুলি আশ্রমবাসীদের উপভোগ ও উপলব্ধির জন্যই রচিত। জীবনচর্যার যে সূক্ষ্ম ও সৌন্দর্যময় কল্পাদর্শ কবির মনে তাহাই তিনি সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনচর্যায়। এই রচনাগুলির স্বাভাবিক পরিবেশও আশ্রমিক আদর্শ ও আবেষ্টনের পরিবেশ। এই আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্ররূপ তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল; এই ফুল, এই পাখি, এই বৃষ্টি, এই খর রৌদ্র, এই শালবন, আমলকীর ডাল, উদার মাঠ সব কিছুকে লইয়া মাটির পৃথিবীর প্রতি তাঁহার যে সুগভীর প্রীতি ও ভালবাসা শেষ জীবনে গভীর হইতে গভীরতর হইতেছিল তাহা বিশেষভাবে এই আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই। সেই ভালবাসার আনন্দ, কল্পনাদর্শের মধুর উজ্জীবন রস তিনি সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার আশ্রমের মানসপুত্রকন্যাদের মধ্যে। তাহাদের উপলক্ষ করিয়া তাঁহার অগণিত দেশবাসীও সেই আনন্দের অংশীদার হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা সত্য যে, ইহাদের অভিনয়োৎসব শান্তিনিকেতন আশ্রম-পরিবেশে যত সত্য ও সার্থক, অন্যত্র ততটা কিছুতেই নয়।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে "বিচিত্রা" মাসিক পত্রিকায় "নটরাজ" এবং ১৩৩৪'র "মাসিক বসুমতী"তে "ঋতুরঙ্গ" নাম দিয়া দুইটি রচনা প্রকাশিত হয়। এই রচনা দুইটি কবিতা ও গানের সমষ্টি। পরে এইগুলিই একত্র করিয়া সাজাইয়া "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা" নামে নৃত্য, গীত ও আবৃত্তি সম্বলিত অভিনয়োপযোগী একটি অখণ্ড রচনা "বনবাণী" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে। "শেষবর্ষণ", "বসন্ত", "সুন্দর" বা "নবীন" যেমন অন্তিম বর্ষা ও বসন্ত এই দুইটি ঋতুর সৌন্দর্য-বন্দনা "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা"ও তেমনই ষড়ঋতুর লোকোত্তর সৌন্দর্য-বন্দনা। ভাবের সূক্ষ্ম শুচিতায় সৌন্দর্যময় নিসর্গ-বর্ণনায়, অনুভূতির গভীরতায়, অনবদ্য চিত্রমহিমায়, নিবিড় ঐতিহ্য গরিমায়, সর্বোপরি ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র পৃথক রূপকে একটি অখণ্ড রূপ ও রস-সমগ্রতায় "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা" এবং ঋতুউৎসবাশ্রয়ী অন্যান্য রচনা আমাদের দেশের বিভিন্ন ঋতুগত কবিকল্পনাকে যে প্রায় স্পর্শসহ প্রায় দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দিয়াছে, বিভিন্ন ঋতুগুলির মধ্যে যে নূতন অর্থ ও ব্যঞ্জনায়, নূতনতর অনুভূতি ও উপলব্ধির আনন্দ-বেদনায় অভিজ্ঞতার সন্ধান দিয়াছে তাহার তুলনা আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য-ঐতিহ্যে আর কোথাও দেখা যায় না। গানের পর গান গাঁথিয়া এবং তাহার সঙ্গে নৃত্য ও আবৃত্তি জুড়িয়া দিয়া কোনও কথা বা কাহিনীর আশ্রয় না লইয়া শুধু সুর ও নৃত্যের অবলম্বনে যে একটা সমগ্র নাটকীয় রূপ দাঁড় করান যায়, একটা অখণ্ড নাটকীয় রস-সমগ্রতা গড়িয়া তোলা যায়, এই সাহিত্য রচনাগুলির অভিনয় না দেখা পর্যন্ত তাহা বিশ্বাস করাই যায় না। গান ও কবিতাকে যে একটা দৃশ্যগত রূপ দেওয়া যায় শুধু খণ্ড গান ও খণ্ড নৃত্যের খণ্ড খণ্ড ভাবমূর্তিতে নয়, একটা পরিপূর্ণ সমগ্র মূর্তি দেওয়া যায়, সব গান, সব নৃত্য, সব আবৃত্তিকে পর পর গাঁথিয়া একটা অভিনয়গ্রাহ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দেওয়া যায়, ইহা যে কত বড় কবিকর্ম, কত বড় নাটকীয় কৌশল তাহা অনেক সময় উপলব্ধি করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ

প্রযোজিত "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা"র অভিনয়োৎসব যাঁহারা দেখিয়াছেন আশা করি তাঁহারা সকলেই একথা স্বীকার করিবেন। এই দিক দিয়াই ইহার নাটকীয় সার্থকতা বিচ্ছিন্নভাবে এই গান বা আবৃত্তিগুলি শুনিলে, নাচগুলি দেখিলে ইহার নাটকীয় সমগ্র রূপটি ধরা পড়ে না, যদিও খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রত্যেকটিরই পৃথক মূল্য অনস্বীকার্য; সে-মূল প্রধানত তাহাদের কাব্যমূল্য অথবা সুর তাল ও ছন্দের মূল্য।

যত লোকোত্তর জীবনরসের আস্বাদনের ক্ষেত্রই হউক না কেন এই রচনাগুলি—আমি বিশেষভাবে ঋতু-উৎসবাশ্রয়ী রচনাগুলির কথাই বলিতেছি—ইহাদের কল্পনামানসের বক্তব্য কিছু আছে। "শেষবর্ষণ" ও "বসন্ত" ত সোজাসুজি "শারদোৎসব-ফাল্গুনী"র আদর্শেই রচনা; তবে ইহাদের গল্পবস্তু আরও সহজ ও সংক্ষিপ্ত। এখানেও রাজা ও কবির উপস্থিতি লক্ষণীয়। রাজা ও রাজসভা ঘোরতর বিষয়ী, উৎসবের আনন্দের মধ্যেও তাঁহাদের বিষয়াসক্তি আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিতে দেয় না, তাঁহাদের বিষয়-কামনা প্রকৃতির সঙ্গে মানবচিত্তের নিগূঢ় মিলনের পথে বাধার প্রাচীর তুলিয়া দেয়। কবি হইতেছেন অনাবিল সৌন্দর্যের পূজারী, বিষয়ের প্রতি আসক্তি তাঁহার নাই। এই কবি যখন প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় মিলনের আনন্দে আত্মলীন হইয়া যান, তখন সেই আনন্দের স্পর্শ লাগে রাজারও চিত্তে; রাজা তখন বিষয়কর্ম ভুলিয়া কবির সঙ্গে সেই আনন্দ-নৃত্যে মাতিয়া উঠেন, রাজসভার অর্থসচিব তিনিও অর্থের চিন্তা ভুলিয়া গিয়া সেই নৃত্যে যোগদান করেন। তখন উৎসব হয় পূর্ণ ও সার্থক। ঋতু উৎসবের ইহাই অন্তরের কথা; নিসর্গের সঙ্গে মানব চিত্তের নিগূঢ় পরিপূর্ণ মিলনেই বিশ্বের আনন্দোৎসব পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে। "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা"র ভিতরের কথাটি আরও গভীর।

> "নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের এই মর্ম।"

নটরাজ কাল-দেবতা। নটরাজের নৃত্য জীবন-নৃত্য। মহাকালের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে অবিরাম, তাঁহার নৃত্যের ছন্দেই বিশ্ব আবর্তিত হইতেছে, ঋতুচক্র আসিতেছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া। তাঁহারই নৃত্যের বিচিত্র আবেগের রঙ্গে বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র রং ও আবেগ। তাঁহাকে ঘিরিয়া সমগ্র ভারতীয় কল্প-মানসের সুগভীর ঐতিহ্য আবর্তিত। "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা"র পালাগানের ভিতর দিয়া মহাকালের এই গভীর নৃত্যলীলা, বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র রং ও আবেগ, ঐতিহ্যের গভীরতম ব্যঞ্জনা কবি আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর করিয়াছেন; আমাদের আহ্বান করিয়াছেন সেই নৃত্যচ্ছন্দকে আত্মসাৎ করিয়া চিত্তকে বন্ধনমুক্ত করিতে, আমাদের মধ্যে বিদ্রোহী যত অণু-পরমাণু আছে নৃত্যের ছন্দ-বশ্যতার মধ্যে আনিয়া তাহাদের সৌন্দর্যের মধ্যে এক অখণ্ড সামঞ্জস্য দান করিতে। ঐতিহ্য ও আধুনিক বিজ্ঞান, বহির্লোকের বিচিত্র রূপ ও অন্তর্লোকের সুগভীর উপলব্ধির রসে ব্যঞ্জনায় এমন অপূর্ব কাব্য ও নাট্য রূপায়ন সাহিত্যে সুদুর্লভ।

"নটীর পূজা—শাপমোচন—নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা—পরিশোধ" এই সব ক'টি রচনাই কোনও না কোনও কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থগরিমায়, ভাবব্যঞ্জনায়, সার্থক ঐতিহ্য ইঙ্গিতে নাটকীয় সংস্থানে এবং অভিনয়োপযোগিতায় ইহাদের মধ্যে "নটীর পূজা" সর্ব শ্রেষ্ঠ। বস্তুত, "নটীর পূজা" কবির পরিণত বয়সের সকল নাট্যরচনার মধ্যে

সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রতীকী নাট্য ইহাকে কিছুতেই বলা চলে না, কিন্তু নিছক লোকোত্তর রসের দৃশ্যকাব্য হিসাবে ইহা "ডাকঘর—অরূপ রতনে"র সঙ্গে নিঃসন্দেহে একাসন দাবি করিতে পারে। "শাপমোচন—নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা—পরিশোধ" কাহিনী আশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও তিনটিই শুধু নৃত্য ও গীতের সাহায্যে মূকাভিনয়ের জন্য রচিত; "শাপমোচন" গদ্যছন্দে একটি কথিকা, "পুনশ্চ"-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ১৩৩৮-৩৯ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথাকলি নৃত্যের প্রবর্তন হয়। এযাবৎ যে-ধরনের নৃত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল সেগুলি খণ্ড নৃত্য, এ সব নৃত্যে একটি অখণ্ড সমগ্র নৃত্যরূপ গড়িয়া উঠিবার কোনও অবকাশ নাই। কথাকলি নৃত্যের লক্ষ্যই হইতেছে একটি ভাবকে নৃত্যের সাহায্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমগ্ররূপে ফুটাইয়া তোলা; কিন্তু কথাকলি নৃত্য বৈয়াকরণিক রীতি-নিয়মের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা হইল ইহাকে সেই ব্যাকরণ-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি অখণ্ড সমগ্র ভাববস্তুর বাহন করিয়া তোলা। কথার সাহায্য যেটুকু তাহা শুধু গানের মধ্য দিয়া। "শাপমোচন" এই চেষ্টার প্রথম ফল। যে বৌদ্ধ আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া "রাজা" নাটক, তাহারই কাব্যরূপ 'শাপমোচন' কবিতা, এবং তাহারই আভাস লইয়া ইহার দৃশ্যরূপ। ইহার গানগুলি প্রায়ই পূর্বরচিত গীতিনাট্য হইতে সংকলিত; নৃত্যরূপটাই ইহার অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য। "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা"ও "চিত্রাঙ্গদা"-কাব্যের গান ও নৃত্যরূপ; এই কাব্যের সুর ও সুষ্ঠু গীতোচ্ছ্বাস একান্তভাবে গান ও নৃত্যেরই উপযোগী। এই গান ও নৃত্যের ভিতর দিয়াই "চিত্রাঙ্গদা"র ভাববস্তু দৃষ্টি-গ্রাহ্য রসরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই ভাববস্তুর আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি, এখানে আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। শুধু নিজের রূপের উপর নয়, নিজের দেহের উপর ঈর্ষান্বিত হওয়া, নিজের রূপ ও দেহকে আশ্রয় করিয়া অন্যকে পাইতে হইল, ইহার জন্য দেহ ও সৌন্দর্যের উপর একটা হিংসা, ইহা যে গান ও সৌন্দর্যময় নৃত্যভঙ্গির ভিতর দিয়া কি সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, ইহার অভিনয় যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। "পরিশোধ" ও ঐ-নামীয় পুরাতন একটি কথা-কবিতার ("কথা ও কাহিনী") নৃত্যনাট্য রূপ, তবে "পরিশোধ" "শাপমোচন" বা "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা"র মতন সার্থক অভিনয়-রূপ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার ভাববস্তুর মধ্যেও নাটকীয় দ্বন্দ্ব-বিবর্তনের সুযোগ কম।

আগেই বলিয়াছি, কি ভাব-ব্যঞ্জনায়, কি গল্পসমৃদ্ধিতে, কি নাটকীয় বস্তু-মহিমায় ও বিন্যাসে, কি অভিনয়-গরিমায়, "নটীর পূজা" এই পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার অভিনয়ে শ্রীমতীর ভূমিকায় নন্দলাল-দুহিতা গৌরী যে-নৃত্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য-আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়; তবু এ-প্রসঙ্গে সেই অপার্থিব লোকোত্তর রসের অপূর্ব রূপাভিব্যক্তির কথা অনুল্লিখিত থাকিলে "নটীর পূজা"র অভিনয়-গরিমার ইঙ্গিত সম্পূর্ণ হইবে না। সত্যই গৌরী সেদিন তাঁহার নৃত্যের মধ্য দিয়া দিব্য যজ্ঞাগ্নি স্পর্শ করিয়াছিলেন। এমন অপরূপ নৃত্য আধুনিক কালে ত কোথাও দেখি নাই। গানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীর নৃত্যভাবাভিব্যক্তি অতুলনীয়; সংযত ভক্তির শুভ্র শুচিতার এমন নিখুঁত সৌন্দর্যময় অভিনয় যে হইতে পারে তাহা না দেখিলে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হয় না। বিশুদ্ধ অভিনয়োপযোগী দৃশ্যকাব্য বা নাটক হিসাবেও "নটীর পূজা" অকপট প্রশংসার দাবি রাখে। সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত গল্পের বিবর্তনের মধ্যে একটা নাটকীয় গতি সুস্পষ্ট, এবং আরও সুস্পষ্ট ঘটনা ও চরিত্রগত দ্বন্দ্বলীলা। যে-যুগের ও যে-ধর্মের আদি

রূপের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের বিকাশ তাহার ঐতিহাসিক রূপ ও আবেষ্টন এমন, পরিপূর্ণ সার্থকতায় এমন রস সমগ্রতায় গড়িয়া তোলাও অপরূপ কবিকর্ম ; ভাবকল্পনার এমন বস্তুময়তা এই ধরনের সূক্ষ্ম লোকোত্তর জীবনরসের নাটকে সত্যই সুদুর্লভ। ইতিহাসের তথ্য কবিকল্পনার স্পর্শে ও ভাবানুভূতির ব্যঞ্জনায় কত গভীর, সত্য ও সার্থক রূপ লাভ করিতে পারে, নাটকীয় দ্বন্দ্বের বিবর্তনের ভিতর দিয়া অতি সূক্ষ্ম ভাবানুভূতিও কত স্পর্শগ্রাহ্য বুদ্ধিগ্রাহ্য অভিনয়-রূপ লাভ করিতে পারে "নটীর পূজা" তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রানী লোকেশ্বরীর অন্তর্নিহিত গভীর চিত্তদ্বন্দ্ব, অঙ্কের পর অঙ্কে আবর্তিত হইয়া চতুর্থ অথবা শেষ অঙ্কে যে মহান পরিণতির মধ্যে মুক্তি পাইল, সেই রানী লোকেশ্বরী তাঁহার সমস্ত দ্বন্দ্ববিক্ষোভ লইয়া এই নাটকের নাটকীয় দীপ্তির মানদণ্ডরূপে বিরাজমান। এই মানদণ্ডের একদিকে শুচিশুভ্র স্থিতচিত্ত অবিচল শ্রীমতী ও তাহাকে ঘিরিয়া মালতী ও ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা; অন্যদিকে নিষ্ঠুর, গর্বদৃপ্তা রাজমহিষী রত্নাবলী ও তাহার রক্ষিণীদল। দৃশ্যপটের পশ্চাতে সম্রাট অজাতশত্রু এবং সশিষ্যদল দেবদত্তও সক্রিয় ; সেখানেও দুই চিত্তধারার দ্বন্দ্ব। অজাতশত্রু দ্বিধাচারী, সন্দেহদোলায় দুল্যমান ; দেবদত্তও সমান মিথ্যাচারী, কিন্তু মিথ্যাকে সে বিশ্বাস করে, তাহাকেই সত্য বলিয়া জানে, এবং সেই জানা ও বিশ্বাসে সে দৃঢ় ও নিষ্ঠুর। অজাতশত্রুর এই দ্বিধাচার এবং দেবদত্তের দৃঢ়তা মঞ্চের আড়ালে থাকিয়াও নাটকীয় দ্বন্দ্বসংঘাতের উপর উজ্জ্বল আলো ফেলিয়াছে। শ্রীমতী এই নাটকের সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ ও মধুর চরিত্র, এবং সে-ই পাঠক ও দর্শকের মনকে অনুক্ষণ টানিয়া রাখে নিজের চরিত্র মহিমায়, তাহার আবেষ্টনের সৌরভে, কিন্তু নিঃসন্দেহে এই নাটকের যাহা কিছু নাটকীয় দীপ্তি তাহা রানী লোকেশ্বরীর। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার দীপ্তি অক্ষুণ্ণ। শ্রীমতীর দীপ্তি ব্যক্তিগত, তাঁহার নিজস্ব জীবনাদর্শগত ; লোকেশ্বরীর দীপ্তি শিল্পগত, কবিকর্মগত। নাটকটির কারুনৈপুণ্যও অদ্ভুত। ইহাতে পুরুষের ভূমিকা একটিও নাই, অথচ নাই যে তাহা নাটকটি পাঠের অথবা অভিনয়ের সময় একবারও মনে পড়ে না ; বিম্বিসার, অজাতশত্রু, দেবদত্ত ইহারা যেন ছায়ার মতন নাটকীয় গল্পবস্তুর পশ্চাতে সঞ্চরমান। নাটকটিতে চারিটি অঙ্ক, আর ছোট্ট একটি সূচনা। সমস্ত ঘটনাবস্তু একটি দিনের মধ্যে সংহত—সেদিন বৈশাখী-পূর্ণিমা, ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব। অতি প্রত্যূষে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর দুয়ারে ভিক্ষু উপলির ভিক্ষা-প্রার্থনায় দিনের সূচনা এবং শ্রীমতী চরিত্রের উন্মেষ, আর সেইদিনই সন্ধ্যায় রাজপ্রসাদেরই অশোক তরুমূলে ভগ্ন ধর্মচৈত্য ও ভগ্নপ্রায় আসনবেদীর সম্মুখে শ্রীমতীর তনুত্যাগ। এই একটি দিনের দুই প্রান্তের সীমার মধ্যে একটি যুগের গভীর অর্থ ও ব্যঞ্জনাময় সংস্কৃতি ও ইতিহাস তাহার সব কয়টি প্রধান নায়ক-নায়িকাকে টানিয়া আনিয়া, মাত্র কয়েকটি দৃশ্যের ঘটনাবর্তের মধ্য দিয়া এমন গভীর সংহত সমগ্রতায় তুলিয়া ধরা, এ যে কত বড় নাটকীয় কর্ম তাহা সহসা অনুভব করা যায় না।

"নটীর পূজা" নৃত্যপ্রধান নাটক নয়, ভাবপ্রধানও নয়, বস্তুপ্রধান। তবু, শ্রীমতীর নৃত্যরূপ এই নাটকটির একটি বিশেষ গরিমা, এবং এই নৃত্যরূপ "নটীর পূজা"কে সমসাময়িক কালে একটা বিশেষ মূল্য দিয়াছে। বস্তুত, এই পর্বের গীতি নৃত্যনাট্যগুলিতে সূক্ষ্মভাবানুভূতির অভিনয়গ্রাহ্য, দৃশ্যগ্রাহ্য রূপ হিসাবে নৃত্যরূপ একটা বিশেষ মূল্য দাবি করে ; এবং তাহার বিবর্তনের ইতিহাসেরও একটা ইঙ্গিতময় বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম চেষ্টা ছিল গান ও আলাপনের আশ্রয়ে নাটকীয় ভাববস্তু পাঠক ও দর্শকের চিত্তে সঞ্চারিত করা ; সে-চেষ্টা "শারদোৎসব-ফাল্গুনী-রাজা-অরূপরতন" প্রভৃতি

প্রতীকীনাট্যে তিনি বহু আগেই করিয়াছিলেন। এ-পর্বের "শেষবর্ষণ" ও "বসন্ত" এই ধারাই অনুসরণ করিয়াছে; তবে আলাপনের চেয়ে গান প্রাধান্য পাইয়াছে বেশি। ধীরে ধীরে ভাববস্তুর সঞ্চার-কৌশল আশ্রয় করিতেছে গানকে; আলাপন-নির্ভরতা ক্রমশ যাইতেছে পশ্চাতে সরিয়া। ভাবকল্পনার মূর্তি যেন ক্রমশ বিশুদ্ধতর হইতেছে। পরবর্তী স্তরে আলাপন একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, যেমন "সুন্দর" ও "নবীনে"; অবশ্য "নবীনে" গানগুলির ভাবসংযোগ ব্যাখ্যা করিবার জন্য কিছু গদ্য আবৃত্তি আছে। নৃত্যও আছে গানগুলির সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তাহা খণ্ডনৃত্য, ভাবমূর্তির সমগ্রতা তাহাতে নাই; গানই প্রধান আশ্রয়, নৃত্য আনুষঙ্গিক মাত্র। শেষতম স্তরে কিন্তু ভাবমূর্তির সমগ্রতার এক অপরূপ রূপ এবং তাহার বিকাশ গানের মধ্যে ততটা নয় যতটা নৃত্যের মধ্যে, এমন কি নৃত্যই তাহার প্রধান বাহন। "শাপমোচন-নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা-পরিশোধ" এই পর্যায়ের। এই রচনাগুলিতে ভাবমূর্তির বিশুদ্ধতম অভিনয়-গ্রাহ্য রূপ—খণ্ড মূর্তি নয়, সমগ্র মূর্তি। সূক্ষ্মতম বিশুদ্ধতম ভাবকল্পনার রূপকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করিতে হইলে যে নৃত্যরূপের আশ্রয়ই অপরিহার্য একথা যেন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "নৃত্য-নাট্য চিত্রাঙ্গদা" তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। "নটীর পূজা" উপলক্ষেও এই উক্তি প্রযোজ্য, কারণ এই নাটকের ভাববস্তুর সূক্ষ্মতম বিশুদ্ধতম অনুভূতিটিও শ্রীমতীর নৃত্যের ভিতর দিয়াই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ লাভ করিয়াছে। শ্রীমতীর নৃত্যই ত নাটকটির সমস্ত কথা ও ভাববস্তুকে একটি রসসমগ্রতা দান করিয়াছে। নাটক বা দৃশ্যকাব্যের যাহা আদিমতম রূপ তাহা যে এত সূক্ষ্ম, এত বিশুদ্ধ, এত গভীর রসপরিণতি লাভ করিতে পারে তাহা কি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখাইয়া না দিলে আমরা দেখিতে পাইতাম!

ছোট গল্প

এক

সত্য কবিয়া বলিতে গেলে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ছোট গল্পেব স্থষ্টিই করিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহাব আগে আমাদেব সাহিত্যে ছোট গল্প বলিয়া কিছু ছিল না, পরেও যে অসংখ্য ছোট গল্প বচিত হইয়াছে তাহাব মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির সঙ্গে সমান পর্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পাবে, এমন গল্পেব সংখ্যা খুব বেশি নয়। অথচ বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পেব সংখ্যাদৈন্য কিছু আছে, এখন আর এমন কথা চলে না। ববীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পেব স্থষ্টি যে কেন হয় নাই, একথা ভাবিলে একটু বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বতোমুখী প্রতিভা কখনও ছোট গল্প রচনাব দিকে আকৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। পরিসরে অথবা আয়তনে ছোট, এমন দু'একটি গল্প তাঁহার আছে, কিন্তু ছোট গল্প বলিতে কথা-সাহিত্যের যে বিশেষ প্রকাশটিকে বুঝি, বঙ্কিমচন্দ্রের এই গল্পগুলিকে সে পর্যায়ে ফেলিতে পারি না। স্বল্প পরিসরের মধ্যে জীবনের একটি ক্ষুদ্র তুচ্ছ খণ্ডাংশকে, কোনও একটি বিশেষ অভিব্যক্তিকে বা বাস্তবানুভূতিকে, দু'একটি ঘটনার আবর্তে, ভাব ও কল্পনার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত করিয়া তাহাকে স্বাভাবিক পরিণতি দান করা, বস্তুর কোনও একটি বিশেষ পরিচয়কে রূপান্বিত করিয়া তোলা, ছোট গল্পের এই যে সুকঠিন কলাকৃতি, রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে ইহার প্রকাশ নাই বলিলেই চলে। অথচ আমাদের বাংলা দেশে কিছুদিন আগে পর্যন্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের পারিবারিক জীবনযাত্রার যে ধারা ছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া ছোট গল্পের উপাদানই ছিল বেশি। উপন্যাসের সুবৃহৎ জগতে তাহার প্রবেশাধিকার বড় ছিল না; জীবনের যে বৈচিত্র্য, ঘটনার যে তরঙ্গপর্যায়, যে চঞ্চল রসসমৃদ্ধ জীবনলীলা উপন্যাসের প্রাণ, সমস্যার যে বিচিত্র জটিলতা উপন্যাসের ঘটনাস্রোতকে আবর্তে চঞ্চল ও ঘনীভূত করিয়া তোলে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাহার প্রসার খুব বেশি ছিল না। যাহা ছিল, তাহার দিকেও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ও হৃদয় বেশি আকৃষ্ট হয় নাই, তাঁহার সাহিত্যস্থষ্টিতে সে পরিচয়ও খুব বেশি নাই। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের উপাদান খুঁজিয়াছেন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাহিরে; আমাদের মন্দগতি ও ধীরপ্রবাহ তাঁহার চিত্তে উপন্যাসের রোমান্স সঞ্চার করিতে পারে নাই। কি পল্লীতে কি নগরে আমাদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল ও সহজ যদিও আজ তাহা নানান কারণে জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। পারিবারিক আক্রোশ সামাজিক দলাদলি যথেষ্টই ছিল, উইল চুরি লইয়া, অন্যান্য দুই চারি রকমের জটিলতর সামাজিক ও অথবা পারিবারিক ব্যাপার লইয়া হয়ত দ্বন্দ্ব আন্দোলন ইত্যাদিও হইত; এসব উপাদান লইয়া রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে গল্প-উপন্যাস কম রচিত হয় নাই। কিন্তু তাহার রকম ও বৈচিত্র্য খুব বেশি নাই, কিম্বা খুব উৎকৃষ্ট সাহিত্যস্থষ্টিও তাহা লইয়া হয় নাই; দুই চারিটি মাত্র উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত আছে, যেমন, "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "স্বর্ণলতা"। কিন্তু আমাদের জীবনের বাহিরের এই সহজ ও স্থূলভগোচর দিকটা ছাড়া আর একটি

গোপন নিভৃত দুর্লভগোচর দিক আছে। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া, একটু সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয় লইয়া এই নিভৃত দিকটির দিকে তাকাইলে সহজেই দেখা যায় রাষ্ট্রে, সমাজে ও পরিবারে আমাদের দৈনন্দিন জীবন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষোভে আন্দোলিত, বিচিত্র দুঃখ-বেদনায় পীড়িত, সুখ ও আনন্দে উদ্বেলিত। প্রতিদিনের কর্ম-কোলাহলে সহজে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের মুখরতার মধ্যে তাহার ক্ষীণ আহ্বান সহজেই বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু বৃহত্তর জগৎ বলিতে আমাদের কিছু ছিল না, তাহার মুখরতাও বাংলাদেশে বহুদিন পর্যন্ত শোনা যায় নাই। বলিয়াছি, আমাদের জীবন এক সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্বল্পপরিসর ছিল, এখনও যে তাহা নয় এমন বলা চলে না, কিন্তু স্বল্পপরিসর ছিল বলিয়াই জীবনে আমাদের কোন আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কোনও দুঃখ এবং বেদনা-বোধ, সুখ, এবং আনন্দানুভূতি ছিল না এমন নয়। মানুষের মন ও হৃদয়ের যত কিছু বিচিত্র ভাব ও অনুভূতি আমাদের অন্তরের মধ্যে নানারূপে ও রসে চিত্রিত, বর্ণে ও গন্ধে নন্দিত হইত ; কিন্তু তাহা প্রকাশের কোন পথ ছিল না, তাই তাহার স্বরূপ কাহারও জানা ছিল না, জীবনের এই দুর্লভগোচর দিকটাকে জানিবার আগ্রহও ছিল না। জীবনের এই সব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনা ও খণ্ডাংশ এবং তাহার তুচ্ছতর সুখ দুঃখ লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। অথচ ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বলিয়াই, পরিসর ইহাদের কম বলিয়াই ইহাদের মধ্যে ছোট গল্পের উপাদানও বেশি করিয়াই ছিল।

রবীন্দ্রনাথই বাংলা-সাহিত্যে সর্বপ্রথম আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর বহির্বিকাশের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া জীবনের তলদেশে যে নিভৃত ফল্গুধারাটি তাহা আমাদের দেখাইয়া দিলেন। দেখিলাম, সেখানে ঘরের কোণে, নদীর ঘাটে, সহস্র তুচ্ছ পরিচিত ও আবেষ্টনে কত সহস্র তুচ্ছ ঘটনা খুঁটিনাটি উপলক্ষ করিয়া আমাদের জীবনে বিচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষা অবিরত স্পন্দিত হইতেছে, অসংখ্য ক্ষুদ্র বিক্ষোভ আন্দোলিত হইতেছে। আমাদের দৈনন্দিন কার্যের মধ্যে সেখানে অপরূপ মাধুর্য সুগভীর ভাবরসে বিধৃত হইয়া আছে। আমাদের বৈচিত্র্যবিহীন বাহিরের জীবন সেখানে বৈচিত্র্যে ভরপুর, আবেগে চঞ্চল, সেখানে তাহার কোনও দৈন্য নাই, কোন অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিচিত্তের অপূর্ব সুগভীর সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়া আমাদের জীবনের এই নিভৃত গোপন প্রবাহটি আবিষ্কার করিয়া তাহাকে আপন ভাব ও কল্পনায়, রূপে ও রসে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। আমরা একটি নূতন জগৎ ও জীবনের সন্ধান পাইয়া বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

কিন্তু জীবনের এই প্রবাহটি খুঁজিয়া পাওয়ার মধ্যে কবিগুরুর কোন সজাগ চেষ্টা ছিল একথা যেন আমরা কখনও মনে না করি। রবীন্দ্রনাথ কবি, এবং তাঁহার কবিপ্রতিভা একান্তভাবে লিরিক্ বা গীতিকবিতার প্রতিভা। সরস সাবলীল গীতবহুল ছন্দের মধ্যে সুর ফুটাইয়া তোলা, একটি অনাহত ধ্বনি বাজাইয়া তোলাই গীতি-কবিতার ধর্ম ; স্বল্পের মধ্যেই তাহা উচ্ছ্বসিত, যদিও তাহার অধিকাংশই অব্যক্ত, খণ্ডের মধ্যেই তাহার পূর্ণতা, যদিও তাহার রেশটুকু অশেষ। এক হিসাবে ইহাই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট গল্পেরও ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের লিরিক্ প্রতিভার সমৃদ্ধির তুলনা নাই, সেই অতুলনীয় সমৃদ্ধি লইয়া তিনি যখন আমাদের জীবনের দিকে তাকাইলেন, বাংলাদেশের সহজ অনাড়ম্বর জীবন-প্রবাহ যখন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তখন সংকীর্ণ বৈচিত্র্যবিহীন জীবনে বহির্বিকাশ

তাঁহার কবিচিত্তে রসানুভূতির সঞ্চার করিতে পারিল না ; তাঁহার গীতপ্রবণ হৃদয়কে সহজেই দোলা দিল জীবনের নিভৃত গোপন প্রবাহটি যেখানে জীবনের খণ্ডাংশের মধ্যেই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে দুঃখ ও বেদনার, সুখ ও আনন্দের এক একটি সুর পূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে, অথচ সেখানেই তাহা শেষ হইয়া যায় নাই, অন্তরের মধ্যে তাহা গুঞ্জন করিয়া বাজিতে থাকে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ ছোট গল্পই একান্তভাবে গীতিকবিতার ধর্ম লাভ করিয়াছে ; চিত্তের একটা বিশেষ মুড্ বা ভাব হইতেই তাঁহার বেশির ভাগ গল্পগুলি অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। এক কথায় ইহাই বলা যায় যে, যে-মনোধর্ম, মনের যে বিশেষ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভাকে গীতধর্মী করিয়াছে সেই মনোধর্ম, সেই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁহাকে গোড়ার দিকে তাঁহার ছোটগল্পের উৎসেরও সন্ধান দিয়াছে। গল্পগুলির আলোচনার সময় ক্রমেই একথা আরও পরিষ্কার হইবে, কিন্তু পূর্বাহ্নেই বলিয়া রাখা ভাল যে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট গল্প তাঁহার গীতিকবিতারই আর একটি দিক ; একটু আল্‌গা করিয়া বলিতে গেলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতিকবিতারই গদ্যরূপ।

দুই

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির রচনা যে সময়টাতে আরম্ভ হয়, এবং জীবনের যে পর্বটিতে অধিকাংশ গল্পগুলি রচিত হয়, সেই উদ্ভব ও বিকাশের সময়টির প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিলে, তাঁহার ছোটগল্পের উৎসটিকে, ধর্মটিকে, আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। তাঁহার বেশির ভাগ গল্প রচিত হইয়াছিল মোটামুটি ভাবে ১২৯৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩১০ সালের মধ্যে ; অবশ্য তাহার পরেও আরও কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ গল্প ১৩১৪ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩২৫ সালের মধ্যে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ গল্পের মূলধর্মটি ঐ ১২৯৮—১৩১০ সালের রচনাগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। এই বার বৎসরের একটি যুগ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের স্বর্ণযুগ ; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সৃষ্টি যেন বান ডাকিয়া আসিল। "সোনার তরী" হইতে আরম্ভ করিয়া "চিত্রা", "চৈতালি", "কাহিনী", "কল্পনা", "কথা", "ক্ষণিকা"র কবিজীবন একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া "সোনার তরী", "চিত্রা" ও "চৈতালি"র কবিতাগুলিতে সমস্ত বিশ্বজীবনের সঙ্গে কি সহজ ও আনন্দপূর্ণ তাঁহার যোগ ; সকল কাজ, সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁহার অপূর্ব বিস্ময়কর সৌন্দর্য-বোধ। অতি তুচ্ছতম জিনিসটিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতেছে না ; জলে যে হাঁসগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, নদীর চরে যে লোকটি বসিয়া বসিয়া বাঁখারি চাঁচিতেছে, গ্রামের যে মেয়েটি ঘাটে বসিয়া অঙ্গের বসন ফেলিয়া দিয়া গা ঘসিতেছে, সবই তাঁহার চোখে পড়িতেছে, সব কিছুর মধ্যেই তিনি অপরিসীম প্রেম ও সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিতে পাইতেছেন, সকল জিনিস মিলিয়া তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব মায়ালোক সৃজন করিতেছে। সৃষ্টির প্রতি তাঁহার একটি অপূর্ব ভালবাসা, একান্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এই সময়ের কবিজীবনের মধ্যে বারবার প্রকাশ পাইয়াছে। মনের যখন এই অবস্থা, জীবনের অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি জিনিসগুলিও যখন তাঁহার নিকট অপূর্ব বলিয়া মনে হইতেছে, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ হইয়া যখন তিনি প্রকৃতির অতি তুচ্ছ সামান্য ব্যাপারটিকেও অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া মনে করিয়া আকুল আগ্রহে তাহা

উপভোগ করিতেছেন, তখন, ভাবকল্পনার ঠিক এই পরম মাহেন্দ্রক্ষণটিতে তাঁহার ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত হইল এবং দেখিতে দেখিতে সেই অবস্থার মধ্যেই তাঁহার অধিকাংশ গল্পগুলি রচিত ও প্রকাশিত হইয়া গেল।

সেই প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মবোধ, জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিকেও পরম রমণীয় ও অপূর্ব রহস্যময় বলিয়া অনুভব করা, তাহাদের প্রতি অপূর্ব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, আপনাকে একান্তভাবে নির্লিপ্ত করিয়া দিয়া একমনে জীবনটিকে প্রকৃতির সকল অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া উপভোগ করা—এসমস্তই তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যেও অপূর্ব রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শুধু তাঁহার কাব্যসৃষ্টি হইতেই নয়, কবির এই সময়কার জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য করিলেও তাঁহার ছোটগল্প রচনার উদ্ভবের সময়টি আমরা বুঝিতে পারিব এবং তাহাতে এই গল্পগুলির বিশেষ ধর্মটি আরও সহজে আমাদের কাছে ধরা দিবে। 'পোস্টমাস্টারে'র মতন একটি সুপ্রসিদ্ধ গল্প ১২৯৮ সালে লেখা। এই সময়, বরং ইহার কিছুদিন আগে হইতেই কবি জমিদারি দেখাশুনার ভার লইয়াছেন, এবং তাঁহার দিনগুলি কাটিতেছে পূর্ব-বাংলার এক নদীর উপরে নৌকায় ভাসিয়া ভাসিয়া—সাজাদপুরে, শিলাইদহে। অপূর্ব আনন্দময়, বৈচিত্র্যে ভরপুর এই সময়কার জীবনযাত্রা। বাংলাদেশের একটি নির্জন প্রান্ত, তাহার নদীতীর, উন্মুক্ত আকাশ, বালুর চর, অবারিত মাঠ, ছায়া-সুনিবিড় গ্রাম, সহজ অনাড়ম্বর পল্লীজীবন, দুঃখে পীড়িত অভাবে ক্লিষ্ট অথচ শান্ত সহিষ্ণু গ্রামবাসী, সব কিছুকে কবির চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে, আর কবি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে পুলকে শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে তাহার অপরিসীম সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করিতেছেন। এমনি করিয়াই ধীরে ধীরে বাংলাদেশের পল্লীজীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিল, গ্রামের পথঘাট, ছেলেমেয়ে, যুবাবৃদ্ধ সকলকে তিনি একান্ত আপনজন বলিয়া জানিলেন। "ছিন্নপত্রে" এই সময়কার প্রত্যেকটি চিঠিতে কবি নিজেই বারবার এসব কথা বলিয়াছেন। পল্লীজীবনের এই সব নানান বেদনা ও আনন্দ যখন তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল তখন তাঁহার ভাব ও কল্পনার মধ্যে আপনা-আপনি বিভিন্ন গল্প রূপ পাইতে আরম্ভ করিল, তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনা ও ব্যাপারকে লইয়া এই সব বিচিত্র সুখদুঃখ অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হইতে লাগিল। মানব-জীবনের বিচিত্র ঘটনা প্রকৃতির ভাষাময় আবেষ্টনেব সঙ্গে এক হইয়া গেল। ইহারই প্রেরণা পাইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল; এক একদিন এক একটি ছোটখাট ঘটনার সূত্র ধরিয়া এক একটি গল্প মনের মধ্যে জমিয়া উঠিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন (বাংলা বোধ হয় ১৩০১ সাল হইবে) শিলাইদহ হইতে একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

> আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনেব সুখে থাকি, এবং কৃতকার্য হতে পাবলে পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লিখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির অবসব একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে।

এই ভাবে এই দিনটিতে 'মেঘ ও রৌদ্রে'র মতন একটি সুবিখ্যাত ছোটগল্পের সৃষ্টি হইল। এই ভাবেই, দুই বৎসর আগে (২৯ জুন, ১৮৯২) সাজাদপুরের কুঠিতে একদিন

গ্রামের পোস্টমাস্টারের আগমন উপলক্ষ করিয়া 'পোস্টমাস্টার' গল্পটির সৃষ্টি হইল। 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ী, 'ছুটি' গল্পের ফটিক এরাও এই সময়কার সৃষ্টি।

'পোস্টমাস্টার' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম গল্পগুলির অন্যতম। আমি যে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের একশ্রেণীর গল্পগুলি একান্তভাবে গীতধর্মী, এই গল্পটি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। একটি স্বজনহারা নিঃসহায় গ্রাম-বালিকার স্নেহলোলুপ হৃদয় আসন্ন স্নেহবিচ্যুতির আশঙ্কায় কি সকরুণ অশ্রুসজল ছায়াপাত করিয়াছে এই গল্পটির উপর! রবীন্দ্রনাথের এই গীতধর্মী গল্পগুলির একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে কবির কল্পলোকের মানুষগুলি, তাহার ঘটনার আবেষ্টনটি, বাহিরের চতুর্দিকের জগতের সঙ্গে, প্রকৃতির ছায়া-আলো-গন্ধ-বর্ণ-ধ্বনি ও ছন্দের সঙ্গে একান্তভাবে মিশিয়া যায়, এবং বিশ্বজগতের পারিপার্শ্বিক ভাষাময় আবেষ্টনের সঙ্গে এক হইয়া গিয়া একটি সুরের জগৎ সৃষ্টি করে, 'সকল ঘটনার একটি আকাশ সৃজন করে'। এই 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি এবং এই রকম বহু গল্পের মধ্যে এই বিশেষত্বটি চোখে না পড়িয়াই পারে না। স্বজন হইতে দূরে, এক নিভৃত পল্লীতে দরিদ্র পোস্টমাস্টারের জীবন প্রথম প্রথম প্রায় নির্বাসন তুল্য বলিয়াই মনে হইত। মাঝে মাঝে একা-একা ঘরে বসিয়া বসিয়া তিনি একটি 'স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি'র সঙ্গ কামনা করিতেন, নিজের ঘরের ছেলেমেয়ে স্ত্রীর কথা তাঁহার মনে হইত। এই কামনাটুকু গল্পটিতে কি সুন্দর একটি করুণ সুরের রূপ লইয়াছে।

এই গল্পটিতেই, বিদায় যখন ঘনাইয়া আসিল, রতন পোস্টমাস্টারের সম্মুখ হইতে এক দৌড়ে পলাইয়া গেল। আর, ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার ধীরে ধীরে নৌকার দিকে চলিলেন।

"যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল—বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, একটি সামান্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি, কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরবেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি? পৃথিবীতে কে কাহার?"

কলাকৌশলের দিক হইতে এই তত্ত্বের উদয় না হইলেই ভাল হইত; তবু, যাহাই হউক, এমনই করিয়া পোস্টমাস্টার ও রতনের দুঃখ একটা উদাস-সকরুণ পরিসমাপ্তি লাভ করিল, এবং সেই অব্যক্ত মর্মব্যথা যেন সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া একটি অপূর্ব সুরের জগৎ সৃষ্টি করিল। এইরকম সুরের জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার অনেকগুলি গল্পেই।

'একরাত্রি' গল্পটিতে সেই ঝড়ের রাত্রে বানের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ-ব্যথিত প্রাণী "মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদন" লাভ করিয়াছিল, যাহার সমস্ত ইহজীবনে "কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল, সেই রাত্রিটি শুধু সেই ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারের কাছেই তুচ্ছজীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা" হইয়া রহিল না, তাহার জীবনের সমগ্র ট্র্যাজেডিটুকুও সেই একটি রাত্রির একটি সুরের মধ্যে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিল। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিতেও ইহার পরিচয় আছে। এই গল্পগুলিতে ঘটনা অথবা চরিত্রবাহুল্য বলিতে কিছুই নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু কেবল একটি সকরুণ অনুভূতির সুরের মধ্যেই গল্পের পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির মধ্যে মানুষ ও ঘটনার সঙ্গে প্রকৃতির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের, নিবিড় ঐক্যের পরিচয় আছে সে-পরিচয় অনেক গল্পেই পাওয়া যায় কিন্তু তাহা একটি পরিপূর্ণ গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে 'সুভা' গল্পে মূক বালিকার সহিত মূক প্রকৃতির নিবিড় ঐক্যসম্বন্ধের মধ্যে। নানান কাজে ও ব্যবহারের ভিতর দিয়া, অদ্ভুত সরস ও সহজ বর্ণনার সাহায্যে মানবচরিত্রের বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা অনেক লেখকের মধ্যেই দেখা যায়, কিন্তু অপূর্ব শিল্পকুশলী রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া মনের বিভিন্ন বিচিত্র ভাব ও চিন্তাধারার সঙ্গে বিশ্বজগতের বিচিত্র ভাব প্রকাশের নিবিড় ভাবগত ঐক্যের সৃষ্টি করেন, এবং তাহার ফলে তাঁহার এক একটি গল্প যেমন করিয়া কল্পলোকের স্বপ্ন ও সংগীতমাধুর্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তেমন প্রকাশ আর কাহারও মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না।

'মহামায়া' গল্পটিতে আমার এই কথার খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। 'মহামায়া' তাহার দীপ্ত চরিত্র লইয়া এক দুর্ভেদ্য অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রাজীবের নিকটে আপনাকে রহস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে, রাজীব তাহার নাগাল পায় না, "কেবল একটা মায়াগণ্ডির বাহিরে বসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অচল অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে।" এমন সময়

"একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়াছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মাজিত রূপার পাতের ন্যায় ঝকঝক করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কিনা বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কি ভাবিল জানিনা, কিন্তু তাহার মনে হইল আজ যেন সমস্ত পূর্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।"

তারপর কি করিয়া রাজীবের রহস্য টুটিয়া গেল, মহামায়া একটি উত্তর না দিয়া এক মুহূর্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, আর তাহার সেই "ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল" তাহা ত সকলেই জানেন। সমস্ত গল্পটির মধ্যে একটি অপূর্ব রহস্য কি সুন্দর ভয়ংকর রূপে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়া কিরূপে নিবিড়তর বিদায়-রহস্যের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল, ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। ইহার মধ্যে যে শুধু একটা সবল কল্পনা-শক্তির পরিচয় আছে তাহা নহে, একটা খুব বড় ভাব-লোকের স্পর্শও সমস্ত রহস্যটিকে একটি অপূর্ব অভিব্যক্তি দান করিয়াছে। কিন্তু এই যে গল্পের ঘটনা বর্ণনা ও চরিত্র চিত্রণের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির সঙ্গে একটা নিবিড় ঐক্যের সৃষ্টি করা, ইহা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির একটা বিশেষ কলাকৌশল, এবং ইহার প্রভাবটুকুও অতি চমৎকার। সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়, এবং উপরে যে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে, এই বিশেষ কৌশলটি অবলম্বনের ফলে প্রত্যেকটি গল্পেরই ঘটনা ও চরিত্র একটি ভাবগাম্ভীর্য, একটি অপূর্ব প্রশান্তি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এই কৌশলটি রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে আয়ত্ত করিয়াছেন একথা যেন কেহ মনে না করেন। ইহা তাঁহার কবিচিত্তের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিরই ফল, মানুষকে, মানবজীবনের বিচিত্র

ঘটনা ও প্রকাশকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখা তাঁহার কবিহৃদয়ের ধর্ম, ইহাই তাঁহার অদ্ভুত ভাবলোকধ্যান, যাহার স্পর্শে পৃথিবীর ধুলামাটি, আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যাহা কিছু তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, দুঃখবেদনায় ব্যথিত, সমস্তই সোনা হইয়া গিয়াছে, অপূর্ব রূপে ও রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই ধ্যানের স্পর্শে, যে-বস্তু লইয়া তাঁহার কারবার, সেই বস্তুরই রূপ অনেক সময় একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে; তাহাকে দেখিয়া আর চেনা যায় না। বরং মনে হয়, কবি বস্তুর যে-রূপ আমাদের দেখাইলেন সেইরূপই তাহার সত্য রূপ। ব্যক্তিবিশেষের দুঃখকে, কোনও সবিশেষ ঘটনাসংশ্লিষ্ট বেদনাকে তিনি সকলের দুঃখ, সকলের বেদনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাকে একটা অচঞ্চল শুভ্র, সংযত, শুচিময় অবসানের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছেন, কোনও ক্ষুব্ধতায় কোনও বিক্ষোভের মধ্যে তাহার সমাপ্তিটুকু আন্দোলিত হইতে দেন নাই। তিনি তাঁহার চরিত্র ও ঘটনা-বস্তুগুলিকে পৃথিবীর ধুলামাটির সঙ্গে সৃষ্টির এক পর্যায়ভুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন, এবং মানুষের দুঃখকে বেদনাকে সুখকে শান্তিকে সৃষ্টির সকল দুঃখ ও বেদনা, সুখ ও শান্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন। আগে যে 'কাবুলিওয়ালা', 'পোস্টমাস্টার' ও 'মহামায়া' গল্পের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতেই এই কথার ভাল প্রমাণ আছে, কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর প্রমাণ আছে 'অতিথি' গল্পটিতে। কিশোর তারাপদ কোথাও স্থির হইয়া থাকে না, কাহারও নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে না, মতিবাবু, অন্নপূর্ণা অথবা চারু কারও স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের মধ্যেও সে শেষ পর্যন্ত বাঁধা পড়িল না। তাহার চলিষ্ণু চিত্ত একদিন 'বর্ষার মেঘ-অন্ধকার রাত্রে আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব-পৃথিবীর নিকট চলিয়া গেল।' এই সমস্ত স্নেহবন্ধন উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবার ব্যাপারটির সঙ্গে যে দুঃখ বেদনা জড়িত হইয়া আছে, যে ট্র্যাজেডির আভাস আছে, তাহাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পিত ঘটনাবস্তু ও ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না, তাঁহার স্বাভাবিক ভাবলোক-বিহারী মন এই চলিয়া যাইবার ব্যাপারটিকে সমস্ত বিশ্বসংসারের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিল।

> দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল, পুবে বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ফুলিয়া উঠিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল, নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল,—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে পৃথিবী কাঁপিতেছে, মেঘ উড়িতেছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে।"

এই দ্রুত চলমান চরাচরের মধ্যে কিশোর তারাপদই বা স্থির হইয়া থাকিবে কেন? ইহাই রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, তাঁহার ধ্যানলোকের স্পর্শমণি, যাহার ছোঁয়ায় সকল বস্তু এক অখণ্ড রসপরিণামের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। বস্তুকে লইয়াই তাহার প্রত্যেক সৃষ্টির সূত্রপাত, কিন্তু তাঁহার কল্পনা বস্তুকে ছাড়াইয়া রসের ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়া গিয়া ভাবলোকের কল্পমায়ার মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। ইহাই তাঁহার প্রতিভার মূলকথা।

যে কল্পাদর্শের কথা এইমাত্র বলিলাম তাহার স্পর্শ 'দুরাশা' গল্পটিতে একটি সুরাবেগের সঞ্চার করিয়াছে। এই গল্পটির স্বল্প পরিসরের মধ্যে ঘটনাবাহুল্য প্রচুর, তাহার বৈচিত্র্যও কম নয়; কিন্তু বস্তুত গল্পটি দুর্বার অজেয় প্রেমের একটি প্রশস্তিগীতি মাত্র। একটি সুর যেন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত স্পন্দিত, শুধু মাঝে মাঝে বাধা পাইয়া যেন আরও দ্বিগুণবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারী একটি ব্রাহ্মণের গৌরবর্ণ, ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মত সু-উন্নত দেহ ও তাহার দৃপ্ত ব্রাহ্মণের গর্ব এক নবাবপুত্রী মুসলমান

দুহিতার মুগ্ধ হৃদয়কে শ্রদ্ধায় ও প্রেমে বিনম্র করিয়া তুলিল। সেই দুর্বার প্রেমে ষোড়শী নবাবপুত্রী অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইল; এবং বাহির হইয়া প্রথমেই তাহার সংসার-দেবতার নিকট হইতে অত্যন্ত নিষ্ঠুর নিষ্করুণ সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু কিছুতেই পরাভব মানিল না।

"মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার পবিত্র ব্রাহ্মণের পদতলে দূর হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম, হে ব্রাহ্মণ! তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম, কিছুই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই।"

কিন্তু নবাবপুত্রীর প্রেম ব্রাহ্মণের মনে কোনও ভাবান্তর আনিল না; নীরবে সেই ব্রাহ্মণ মুসলমান-দুহিতার সেই পবিত্র প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেল। তারপর সেই নবাবদুহিতার সুকঠিন কৃচ্ছ্রসাধনা আরম্ভ হইল। একদিকে সেই ব্রাহ্মণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়াস, আর একদিকে নিজের মুসলমানী সংস্কার দূর করিয়া আপনাকে একান্ত করিয়া ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিবার অপূর্ব চেষ্টা। দুর্জয় দুর্বার প্রেমের কাছে কিছুই আর অসম্ভব রহিল না; সে সমস্ত পূর্বসংস্কার ধীরে ধীরে বিসর্জন দিল, সংস্কৃত শিখিল, ভক্তিভরে ব্রাহ্মণের সমস্ত শাস্ত্রপাঠ করিল। ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় সে অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইল।

"আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবন-শেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তি লাভ করিলাম।"

এই ভাবে সে যখন দেহে এবং মনে প্রতিদিন ও প্রতিমুহূর্তে তাহার আরাধ্য দেবতার নিকটবর্তী হইতেছে, সে যখন ভাবিতেছে তাহার তরী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার জীবনের পরমতীর্থ অনতিদূরে, তখন তরী হঠাৎ ডুবিয়া গেল, পরমতীর্থ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সে দেখিল,

"বৃদ্ধ কেশরলাল, ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্র-পৌত্রী লইয়া ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

বুঝিল, যে-ব্রাহ্মণ তাহার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল তাহা অভ্যাস মাত্র, সংস্কার মাত্র! যে-ব্রাহ্মণের পদতলে সে তাহার সমস্ত জীবন ও যৌবন বিসর্জন দিয়াছে, চরম নিষ্করুণ ব্যর্থতা লইয়া সেই জীর্ণভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন ব্রাহ্মণের নিকট সে তাহার শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। একটি অপূর্ব ঊর্ধ্বশিখ প্রেমের জ্যোতি যেন হঠাৎ এক ফুৎকারে নিভিয়া গেল। সমস্ত গল্পটি যেন একটি মেঘাচ্ছন্ন কাহিনী, একটি দৃপ্ত সুগম্ভীর রাগিণী যেন একটি পরম ব্যথার মধ্যে আত্মবিসর্জিত, একটি গভীর অচঞ্চল আবেগ যেন হঠাৎ মরুমরীচিকার মধ্যে ক্রন্দনরত।

এই গীতধর্ম শুধু তাঁহার "সাধনা"র যুগে লিখিত, সেই পদ্মাচরের মাধুর্যপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যে লিখিত গল্পগুলির মধ্যেই আবদ্ধ নয়। বহুদিন পরে লিখিত কয়েকটি গল্পের মধ্যেও এই পরিচয় সহজে পাওয়া যায়। ১৩২১ সালে আশ্বিন ও কার্তিক মাসে লিখিত দুইটি গল্প হইতে এই সুরধর্মের পরিচয় লওয়া যাক। 'শেষের রাত্রি' গল্পটিতে ঘটনা বা চরিত্র-চিত্রণ বলিতে বিশেষ কিছু নাই, শুধু মাসীর স্নেহ-দুর্বল শঙ্কিত চরিত্রটি একটি অপরূপ মাধুর্যে ফুটিয়াছে। যতীন নিজের মনে নারী-দেবতার একটি পীঠস্থানে তাহার স্ত্রী মণিকে

বসাইয়া রাত্রিদিন তাহার প্রেমের পূজা নিবেদন করিতেছে, মণি ফিরিয়াও তাকায় না, বেদনায় যতীনের মন ভরিয়া ওঠে। কিন্তু তাহার আশা পরাভব মানে না, প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেক ব্যাপারে সে আত্ম-প্রতারিত; আর, মণি যে তাহাকে দূরে রাখিয়াই চলে, একথা জানিলে যতীন দুঃখ পায়, মাসী তাহা জানেন বলিয়া তিনিও মণির মিথ্যা পরিচয়ে যতীনকে প্রতারণা করেন। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের এই আত্মপ্রতারণার মিথা আবরণ প্রায় খসিয়া পড়িতে চলিয়াছে। সেই চরম ক্ষণে সেই রোগ-বিকারের মধ্যেও যতীন তাহার স্খলিতপ্রায় প্রেমের ছদ্মাবরণটি প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে। কি করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস-ক্ষুব্ধ এই মিথ্যা প্রয়াস। সমস্ত গল্পটির মধ্যে, বিশেষ করিয়া তার পরিসমাপ্তির মধ্যে ঊর্ধ্বশিখ প্রেমের নিষ্ঠুর ব্যর্থতার একটি করুণ চাপা কান্নার সুর; দুঃখে দুর্বল, ব্যথায় অস্ফুট একটি রাগিণী কি নিবিড় স্পন্দনের মধ্যে অবিরত আহত!

ইহার কয়েকদিন পরে লেখা 'অপরিচিতা' গল্পটিও যেন একটি গানের উচ্ছ্বসিত সুরে বাঁধা। গল্পটির প্রথম পর্বের মধ্যে বিশেষ কিছু নাই—বিবাহের দেনা-পাওনা লইয়া আমাদের সমাজে অহর্নিশ যা ঘটিয়া থাকে তাহারই একটি চিত্র। অবশ্য উহাতে হইতে-পারিত-শ্বশুর শম্ভুনাথের শান্ত অথচ তেজোদৃপ্ত চরিত্রের পরিচয়ের মধ্যে এবং পরে ট্রেনে কল্যাণীর সহজ দৃপ্ত উজ্জ্বল ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটু নৈপুণ্য আছে, সমাজে ইহা নূতনও বটে। কিন্তু গল্পটি তাহার গানের রূপ লাভ করিয়াছে শেষের পর্বে; এবং সেই গানের একটি মাত্র ধুয়া, তাহা সেই অপরিচিতার অন্তরতম অনির্বচনীয় কণ্ঠের একটি মাত্র শব্দ, "জায়গা আছে"। কি করিয়া ঘটনাচক্রে চারি বৎসর পরে এক রেলওয়ে স্টেশনে সাতাশ বৎসরের যুবকের সঙ্গে এই অপরিচিতার দেখা হইয়া গেল, কি করিয়া তাহার মনের মধ্যে সেই অপরিচিতা একটি অখণ্ড আনন্দের মূর্তি ধরিয়া, একটি সুরের রূপ ধরিয়া জাগিয়া উঠিল, কি করিয়া উভয়ের পরিচয় লাভ ঘটিল, কিন্তু তারপরেও দুইজনে কেমন করিয়া আবার মিলনের মধ্যেই বিচ্ছেদকে বরণ করিয়া লইল, গল্পের মধ্যেই তাহার সবিশেষ পরিচয় আছে। কল্যাণী বিবাহে রাজী হইল না, মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিল।

"কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজো বাজিতেছে......। আর সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল, "জায়গা আছে", সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। ......তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি। না, কোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা—"জায়গা আছে।" নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াইব কোথায়? তাই বৎসরের পর বৎসর যায়,—আমি এইখানেই আছি।...ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না, কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।"

বাস্তব জীবনে কি হয় জানি না, হয়ত সেখানে সমস্ত জীবন অন্যরকম সমাপ্তিলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু যে ভাবলোকধ্যান এই গল্পটিতে প্রকাশ পাইয়াছে, সাহিত্যে তাহার মূল্য যে আছে, এই গল্পটিই তাহার প্রমাণ। গল্পের এমন গীতিমাধুর্য, এমন অপূর্ব রস-পরিণতি, এমন অপরূপ সুরসমাপ্তি আমি অন্য কোনও ছোটগল্পের মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

একান্তভাবে গীতধর্মী গল্পগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের একশ্রেণীর কয়েকটি বিশেষ গল্প আছে, যাহার মধ্যেও এই সুরধর্মই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পগুলিতেও প্লট্ বা আখ্যানভাগ বলিতে কিছুই নাই; থাকিলেও তাহার মূল্য খুব বেশি কিছু নয়; সমস্ত কাহিনীটিতে আখ্যান ভাগটিকে ছাড়াইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে

মনের একটা বিশেষ 'মুড্', মানসিক বিকৃতির একটা অপূর্ব গীতিময় প্রকাশ; অন্তত "নিশীথে" ও "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পে এই গীতিধর্মই সব কিছুকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই গল্পগুলির একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে; এবং সেইদিক হইতে আলোচনা করিয়া শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গল্পগুলিকে একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। আমাদের প্রতিদিনের বাস্তব-জীবনের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অতিপ্রাকৃত ও ভৌতিক রহস্যের আবির্ভাব ও অভিব্যক্তিই সেই উপাদান। শ্রীকুমার বাবু এই উপাদান লইয়া রচিত গল্পগুলির খুব চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন; বলিয়াছেন,—

"সাধারণ বাঙালী জীবনের সহিত অতি-প্রাকৃতের সংযোগ-সাধন একদিক দিয়া বিশেষ সহজ, অপর দিক দিয়া বিশেষ আয়াসসাধ্য। সহজ এই জন্য যে, আমাদের মধ্যে এখনও কতকগুলি বিশ্বাস ও সংস্কার সজীব ভাবে বর্তমান আছে, যাহাদের অতি-প্রাকৃতের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। আবার অন্য দিকে, আমাদের সাধারণ জীবন এতই বিশেষত্বহীন ও ঘটনাবিরল যে, ইহার মধ্যে মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ের দ্বারা অতি-প্রাকৃতের অবতারণা নিতান্ত দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের গল্পমধ্যে উভয়বিধ গল্পেরই উদাহরণ মিলে।"

কিন্তু উপাদান লইয়া সাহিত্য নয়, উপাদান বিশ্লেষণ দ্বারা সাহিত্যসৃষ্টিকে ভোগও করিতে পারি না। আমি বুঝিতে চাই লেখকের মনের সেই বিশেষ ধর্মটিকে, তাহার বিশেষ ভঙ্গিটিকে যাহার সহায়তায় সেই উপাদান একটা রসময় রূপ লাভ করে। সেইদিক হইতে দেখিলে এই ধরনের গল্পগুলিকে একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করিবার কারণ কিছু নাই; কারণ যে সুরধর্ম যে কল্পনার ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পে এ পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, অতিপ্রাকৃত ভৌতিক রহস্যাবৃত এই গল্পগুলিতেও সেই সুরধর্ম, সেই কল্পনার ঐশ্বর্যই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু তাহাই নয়; ইহার উপরে কলাকৌশলের দিক হইতেও রবীন্দ্রনাথের একটা বৈশিষ্ট্য এই গল্পগুলিকে সহজে লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকুমারবাবু সত্যই বলিয়াছেন, বাস্তব জীবনের সহিত অতি-প্রাকৃতের সমন্বয়-সাধন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার; তিনি দেখাইয়াছেন, এ বিষয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী কোলরিজকেও

"অতি-প্রাকৃতের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিতে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছে,—নৈসর্গিকের সীমা লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, শরীরী প্রেতের আবির্ভাব ঘটাইতে হইয়াছে। * * * যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে তাঁহাকে এই অনৈসর্গিকের অবতারণা করিতে হইয়াছে তাহাতেও অজ্ঞাত অপরিচিতের সুদূর রহস্য মাখানো * * * পরিচিত-মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া তাহাকে মায়া-তরী ডুবাইতে হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য কুহকবলে আমাদের অতিপরিচিত গৃহাঙ্গনের মধ্যে অতি-প্রাকৃতকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এবং নৈসর্গিকের সীমা ছাড়াইয়া এক পদও অগ্রসর হন নাই।'

এই ধরনের গল্প রবীন্দ্রনাথের খুব বেশি নাই। গল্পরচনার আদিপর্বে লেখা 'সম্পত্তিসমর্পণ' ও কয়েক বৎসর পরে লেখা 'গুপ্তধন' গল্প দু'টি নিতান্তই আমাদের সহজ ভৌতিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে বিশেষ কোন কলাকৌশল, কল্পনার কোন সমৃদ্ধি প্রকাশ পায় নাই; শুধু গল্প বলিবার জন্যই যেন এই গল্পগুলির রচনা, রসসৃষ্টির কোন প্রয়াস এই গল্পগুলির মধ্যে বিরল; অতীন্দ্রিয় অনৈসর্গিকের রহস্য কিছু নিবিড় হইয়া উঠিয়া মনের মধ্যে মায়াজালের সৃষ্টি করে না। 'কঙ্কাল' গল্পটিতে এই মায়াজাল-সৃষ্টির প্রয়াস তবু কতকটা দেখা যায়, কিন্তু তাহাও একটি রূপ-যৌবনগর্বিতা প্রেমমুগ্ধা মৃতানারীর বিগতজীবনের কাহিনীমাত্র। যে মৃতানারী এক

সুষুপ্ত যুবকের মস্তিষ্কবিকৃতির মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া এই কাহিনী যুবককে শুনাইতেছে, তাহার কথাবার্তায়, হাসিতে, ইঙ্গিতে মৃত্যুলোকের সেই সুগভীর ভয়-শিহরণ ও অতীন্দ্রিয় রহস্য নিবিড় হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। 'জীবিত ও মৃত' গল্পটিও কতকটা এইরূপ, যদিও সেখানে কাদম্বিনীর মনোবিকারের কাহিনীটুকু একটু জটিল ও অদ্ভুত। লেখকের কল্পনা কাদম্বিনীর মানসিক বিকৃতির স্বরূপটিকে আবিষ্কার করিয়াছে সত্য, কিন্তু খানিকটা অসাধারণ বলিয়াই হউক বা অন্য কারণেই হউক এই মনোবিকৃতির রহস্যটুকু খুব বুদ্ধি ও ভাবগ্রাহ্য হইয়া পাঠকের মনকে অধিকার করিয়া বসে না, তাহার মনকে কল্পনার রসে অভিষিক্ত করিয়া দেয় না। বাড়ির লোকেরা জানে কাদম্বিনী মরিয়াছে, শ্মশানে তাহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে; এবং শ্মশান-প্রত্যাগতা কাদম্বিনী নিজেও নিজকে মৃত বলিয়াই মনে করিতেছে, ভাবিতেছে 'আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন? ...জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি, আমি যে আমার প্রেতাত্মা।' আর যেখানেই সে যাইতেছে, সেখানে সকলেই তাহাকে প্রেতাত্মা বলিয়াই মনে করিতেছে। কিন্তু এমন করিয়া প্রতিদিন প্রতি কার্যে প্রতি ঘটনায় জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংঘর্ষ কাদম্বিনী কেমন করিয়া সহিবে, সহিয়া কেমন করিয়া মৃতের মতন হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? কাজেই অবশেষে তাহাকে মরিয়া প্রমাণ করিতে হইল যে সে মরে নাই। সুকৌশল ঘটনা-সন্নিবেশে গল্পটির সমগ্র আখ্যানভাগ সুন্দর দানা বাঁধিয়াছে, বিশেষ করিয়া জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংঘর্ষের ট্রাজেডির শেষ অধ্যায়টুকু, যেখানে কাদম্বিনী অনেকদিন পরে অনুভব করিল যে, সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্তভাবেই আছে, মধ্যে কোনও বিচ্ছেদ কোনও ব্যবধান জন্মায় নাই। তৎসত্ত্বেও গল্পটির অনুভূতি পাঠকের মনকে মৃত্যুকালের অশরীরী কোনও ভয়াবহ রহস্যে কম্পিত করে না, চিত্তকে নিবিড় কল্পনারসে ভরিয়া দেয় না।

এই ধরনের গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে রসঘন ও রহস্য-নিবিড় গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে, এই বিশেষ ধরনের গল্পের এমন অপূর্ব কলাকৌশল, রহস্য-নিবিড় বর্ণনা-ভঙ্গি, অপরূপ কল্পনার ঐশ্বর্য, সর্বোপরি এমন উচ্ছ্বসিত সুরপ্রবাহ দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। শ্রীকুমারবাবু সত্যই বলিয়াছেন 'ভাষার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা ও সাংকেতিকতায় এক De Quincey-র "Dream Visions" ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অনুরূপ কিছু ইংরেজি সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।' গল্পটির পরিবেশ রচিত হইয়াছে শুস্তা নদীর তীরে বরীচ নগরে আড়াই-শ বছর আগেকার তৈরি দ্বিতীয় শা' মামুদের ভোগবিলাসের নির্জন প্রাসাদে। তাহার কক্ষে একদিন

> 'অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইয়াছে। সেই সকল চিত্তদাহে সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে; সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতন খাইয়া ফেলিতে চায়।'

এমনই রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে লেখকের কল্পনা ছাড়া পাইয়াছে। সেই অবাধ কল্পনা ও সংগীত-প্রবাহের মধ্যে যেন অবাস্তব কোথাও কিছু নাই, অস্পষ্ট কুহেলিকার আবরণ যাহা কিছু বা ছিল সব ঘুচিয়া গিয়াছে। তুলার মাশুল-আদায়কারী নির্জন প্রাসাদবাসী যে ভদ্রলোকটি এই গল্পের নায়ক, সূর্যাস্তের পর হইতে সে যেন আর নিজের মধ্যে থাকে না, মোগলাই-খানা খাইয়া, ঢিলা পায়জামা, মখমলের ফেজ, দীর্ঘচোগা ও ফুলকাটা কাবা পরিয়া, রুমালে আতর মাখিয়া,

'শত শত বৎসরের পূর্বেকার কোন এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটি অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠে, একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়ে।'

তখন সম্মুখে শুস্তার জলে বিজন প্রাসাদের সিঁড়িতে, তাহার কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে এক রহস্যময় ইন্দ্রজাল বিস্তৃত হয়। এক একটি রাত্রি যেন এক একটি স্বপ্নময় নিরবচ্ছিন্ন সংগীত; বুঝি এই স্বপ্ন এই সংগীতের শেষ কোথাও হইত না যদি প্রতিদিন প্রত্যুষে জনশূন্য পথে পাগলা মেহের আলীর 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও', চীৎকার এই নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন ও সংগীতপ্রবাহের মধ্যে অকস্মাৎ একটা বাধার মতন আসিয়া নিক্ষিপ্ত না হইত। প্রতিরাত্রির স্বপ্ন-সংগীতের আবর্তের মধ্যে সেই বহুদিনবিস্মৃত বাদশাহী ঐশ্বর্যের দীপ্তি ও লালসা, অতৃপ্ত কামনা ও সম্ভোগের ক্ষুব্ধ হতাশা যেন সব সজীব মূর্তি ধরিয়া সেই বিজন প্রসাদের কক্ষে কক্ষে জাগিয়া বসিয়া আছে, তাহার মধ্যে মায়া বা বিভ্রম কোথাও কিছু নাই। এই অপূর্ব কল্পনার পাখার উপর ভর করিয়া একটির পর একটি রাত্রি যেন স্বপ্ন-সংগীতের মালা গাঁথিয়া চলিয়াছে। গল্পের মধ্যে কোন্ কবির কল্পনা এমন করিয়া সুরের শতদল মেলিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সংগীতপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়াছে? এই কল্পনার ঐশ্বর্য, এই সুরধর্মই 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে এমন রসময় ভাষারূপ দান করিয়াছে; তাহার উপাদান এক্ষেত্রে তুচ্ছ। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত না দিয়া পারিলাম না।

"আবার সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম কে যেন গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, যেন আমার খাটের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণ ভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার কাছে চাপিয়া ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও! আমাকে উদ্ধার কর।

"আমি কে। আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব। আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমান কামনা-সুন্দরীকে টানিয়া তুলিব। তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী। তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুর কুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? তোমাকে কোন্ বেদুইন দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মত মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের পৃষ্ঠে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জ কাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গনিয়া দিয়া সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সংগীত, নূপুরের নিক্কণ, এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা কটাক্ষের আঘাত। কি অসীম, কি ঐশ্বর্য, কি অনন্ত কারাগার। দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে, শাহেন্‌শা বাদ্‌শা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে,—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাবশী, দেবদূতের মত সাজ করিয়া খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রভাবে ভাসমান হইয়া তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?"

কি অপূর্ব এই প্রশস্তি সংগীত! এমনই সংগীত-প্রবাহ চলিয়াছে এক রাত্রি হইতে অন্য রাত্রিতে। তাহার বর্ণনার ভঙ্গিতে, ভাষার ধ্বনিতে, শব্দের চয়নে কি সুন্দর সুর, কি অপরূপ মাধুর্য! প্রত্যেকটি বাক্যে, তাহার ইঙ্গিতে ও ব্যঞ্জনায় কত কথা কত ইতিহাস যেন প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কলাকৌশলের দিক হইতে গল্পের 'সেটিং'টিও খুব লক্ষ্য করিবার। ইহার আরম্ভিক ভূমিকা যেমন স্বল্পপরিসর, ইহার সমাপ্তিও তেমনি আকস্মিক; অন্য গাড়ী আসিবার অবসরে স্টেশনের বিশ্রামকক্ষে এই গল্প বর্ণনার সূত্রপাত,

সেইখানেই ইহার আকস্মিক সমাপ্তি। খাঁটি গল্পভাগের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ খুব অল্পই; গল্পের আরম্ভ ও সমাপ্তির জন্য পাঠককে কিছু প্রস্তুত হইতে হয় না। রং ও রেখায় দীপ্ত সবল সুন্দর একটি ছবি যেন কাঠের কঠিন ও সুনির্দিষ্ট একটি ফ্রেমের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া আছে।

'নিশীথে' গল্পটি আরও সহজ ও স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে; উহার জন্য কোনও বিজন প্রাসাদ বা কোনও অতীত যুগের মধ্যে কল্পনাকে পক্ষমুক্ত করিতে হয় নাই। আমাদের প্রতিদিনের অতি সহজ কথা এবং কাজকর্মের মধ্যেই কেমন করিয়া অতীন্দ্রিয় অতিপ্রাকৃত জগতের মায়াজাল বিস্তৃত হয়, দৈনন্দিন তুচ্ছ একান্ত স্বাভাবিক কথা ও কর্মকে আশ্রয় করিয়া অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ আকস্মিক একটা সাময়িক মনোবিকার ঘটাইয়া দেয়, এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া কবির কল্পনা সমস্ত আখ্যানটিকে রসে রহস্যে সুনিবিড় করিয়া তোলে, এই গল্পটি তাহার একটা সরস ও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রুগ্না স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কোনো এক উদ্বেলিত মুহূর্তে স্বামীর পক্ষে বলা সহজ "তোমার ভালোবাসা আমি কোনও কালে ভুলিব না"। কিন্তু কথাটা শুনিয়া রুগ্না স্ত্রীও হা হা করিয়া সুতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া উঠিয়াছিল। সে হাসির মধ্যে স্ত্রীর লজ্জা ও সুখের অনুভূতি একটু হয়ত ছিল, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি ছিল অবিশ্বাস ও পরিহাসের তীব্রতা! সেই এক বিহ্বল মুহূর্তের কথাটা যে কত মিথ্যা তাহা ধরা পড়িয়া গেল রুগ্না স্ত্রীর মৃত্যুশয্যার আড়ালে নূতন প্রেমের সঞ্চারে, গোপনে গোপনে নূতন করিয়া নূতন মানুষের সঙ্গে প্রেমের লীলায়। মৃত্যুশয্যাশায়িনীর চোখেও বুঝি বা তাহা ধরা পড়িয়াছিল, তাহার হৃদয়ের ডাঁটায় বুঝি বা টান পড়িয়াছিল। তাই, মনোরমা যখন তাহাকে দেখিতে আসিল, রুগ্না অবহেলিতা স্ত্রী চম্‌কিয়া উঠিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে? ও কে, ও কেগো?" স্ত্রী ত মরিল, স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহও করিল। কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অবহেলা অপরাধ ও মিথ্যাচরণের গুরুভার তাহার বুকের উপর অনুক্ষণ চাপিয়া রহিল, মনোরমাও সহজভাবে স্বামীকে গ্রহণ করিতে পারিল না।

"আমি যখন আদরের কথা বলিতাম প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিতে চেষ্টা করিতাম, মনোরমা হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কি খট্‌কা লাগিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

কিন্তু তবু আর এক বিহ্বল মুহূর্তে বলিতে হইল, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে কোনওকালে আমি ভুলিতে পারি না।" এই কথা শুনিয়াই একদিন রুগ্না প্রথমা স্ত্রী অবিশ্বাস ও পরিহাসের সুতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়াছিল। আবার যখন সেই কথাটি নূতন করিয়া দ্বিতীয়া স্ত্রীকে প্রেম জানাইবার জন্য নিবেদন করিতে হইল, তখন এক মুহূর্তেই তাহার নিজের মিথ্যা নিজের ফাঁকি নিজের কাছেই অত্যন্ত ক্রুর নিষ্ঠুর রহস্য লইয়া উন্মুক্ত হইয়া পড়িল; এবং পরক্ষণেই একটা অতীন্দ্রিয় ভৌতিক শিহরণে নিজেই কাঁপিয়া উঠিল, একটা মানসিক বিকার তাহার সমস্ত সত্তাকে অধিকার করিয়া বসিল। সেই মুহূর্তেই 'বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া ঝাউ গাছের মাথার উপর দিয়া কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নিচ দিয়া গঙ্গার পূর্বপার হইতে পশ্চিম পার পর্যন্ত সেই অবিশ্বাস ও পরিহাসের হাহা-হাহা-হাহা হাসি দ্রুতবেগে বহিয়া গেল।' আর সেই যে মৃত্যুপথযাত্রিনীর 'ও কে, ও কে, ও কে গো' প্রশ্ন তাহাও অনুতপ্ত অপরাধগ্রস্ত স্বামীকে অব্যাহতি দিল না। এই যে প্রেমবিহ্বল স্বামীর পাশে পাশে নবপরিণীতা নূতন

স্ত্রী, আকাশ বাতাস পথ ঘাট বিশ্বজগতের যাহা কিছু সবই যেন উহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কেবলি প্রশ্ন করিতেছে, ও কে, ও কে, ও কে গো? নির্জন পদ্মার চর পর্যন্ত সেই এক হৃদয়বিদারক প্রশ্ন তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল; জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমিতে শুনা যায় ও কে, ও কে, ও কেগো? রাত্রির অন্ধকার সুষুপ্তির মধ্যে কে যেন অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে থাকে ও কে, ও কে, ও কেগো? কি অপূর্ব সহজ ও স্বাভাবিক এই ভৌতিক শিহরণ! অতি-প্রাকৃতের এই স্পর্শ দৈনন্দিন জীবনে আমরা কতই না অনুভব করিয়া থাকি। এক একটা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া তুচ্ছ এক একটা কথা, একটা ছবি, এমন অনপনেয় রেখায় আমাদের মনের পটে আঁকা হইয়া যায়, মনকে এমন গুরুভারে পীড়িত করিয়া মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়—তখন সেই কথা সেই ছবিটা যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহার প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছবি যেন সকলদিক হইতে সমস্ত জীবনকে চাপিয়া ধরিয়া মৌন আর্তনাদে উৎপীড়িত করে, কিছুতেই তার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। 'নিশীথে'র গল্পভাগ এই প্রকার মনোবিকৃতি হইতেই উদ্ভূত, কিন্তু লেখকের সুদূরবিসর্পী কল্পনার ঐশ্বর্য, তাঁহার স্বাভাবিক কবিচিত্তের সুরধর্ম ইহাকে একটি অতুলনীয় রসময় রহস্যঘন রূপ দান করিয়াছে। এই অতি-প্রাকৃতের শিহরণ যখন এক একটা চূড়ায় আসিয়া উঠিয়াছে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উঁচু পর্দায় আসিয়া চড়িয়াছে, সেইখানেই এই কল্পনার-মুক্তগতি ও সহজ সুরধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়—ম্লান জ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র বকুলবেদীতে, জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ পদ্মাচরের উপর, অথবা অন্ধকার রাত্রিতে বোটের মধ্যে মশারির নিচে। শেষ দৃষ্টান্তটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"তখন অন্ধকারে কে একজন মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অভ্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে? ও কে? ও কেগো?"—

"তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্তেই মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা-হাহা একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম, নগর, পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোক-লোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে,—ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল—ক্রমে যেন তাহা সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল—এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই কল্পনা করি নাই, আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে, কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল, তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমনি আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল,—ও কে, ও কে, ও কে গো! আবার আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল:—ও কে, ও কে, ও কে গো! সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেল্‌ফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!"

অতি-প্রাকৃতের এই ভৌতিক শিহরণ সঞ্চারের সার্থক প্রয়াস 'মণিহারা' গল্পেও দেখিতে পাই। পত্নীপ্রেমবঞ্চিত স্বামীর পত্নীবিয়োগে শোকভারগ্রস্ত চিত্তের বিকার হইতেই এই গল্পের সৃষ্টি; কিন্তু ইহার মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় ভৌতিক রহস্য তাহা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে গল্পের শেষ দিকে। এবং সেখানেও যে এই অতীন্দ্রিয় অতি-প্রাকৃতের রহস্য খুব নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, এমন মনে হয় না; কল্পনার ঐশ্বর্যও খুব দীপ্তি লাভ করিতে পারে

নাই, বর্ণনার সাংকেতিকতায় অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতিও খুব উঁচু পর্দায় পৌছিতে পারে নাই। তবে গল্পের প্রথমভাগে ফণীভূষণ ও মণিমালিকার পরস্পরের হৃদয়লীলার পরিচয়ের মধ্যে লেখকের সুতীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণ-ক্ষমতা ও সহজ বোধশক্তির আশ্চর্য প্রমাণ আছে। ইহা ছাড়া, শ্রীকুমারবাবু খুব নিপুণতার সহিত গল্পটির একটি বিশেষত্বের দিক ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহা একটি মনোযোগী পাঠকমাত্রের চোখে ধরা না পড়িয়াই পারে না। তাহা এই,

"এই তুষার-শীতল, মৃত্যুরহস্যগূঢ় স্বপ্নকাহিনীব চাবিদিকে একটা ইস্পাতেব মত শক্ত বাস্তবতার বন্ধন দেওয়া হইয়াছে। এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত যিনি বর্ণনা করিযাছেন তাঁহার চক্ষে স্বপ্নজড়িমার লেশমাত্র নাই, বরং একটা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি শাণিত ছুরিকাগ্রভাগেব ন্যায় চক্ চক্ কবিতেছে। স্ত্রীপুরুষের পবস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে আদিম রহস্য ও বর্তমান যুগের সমাজে সেই সনাতন নীতির বৈপরীত্য—এই অতি গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ আলোচনার মধ্যে, বুদ্ধি তর্কের অতীত অতীন্দ্রিয় জগতের ভয়াবহ ইঙ্গিতটি আশ্চর্য সুসংগতির সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পের উপসংহারটিও আবার বাস্তব সত্যকে প্রাধান্য দিয়া একটা সংশয়াকুল সন্দেহবিজড়িত অনিশ্চয়ের মধ্যে গল্পটিকে হঠাৎ শেষ করিয়া দিয়াছে।"

তিন

কিন্তু গীতিমাধুর্য অথবা সুরধর্ম এবং কল্পনার ঐশ্বর্যই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির একমাত্র বিশেষত্ব নয়। কতগুলি গল্পের মধ্যে আছে—এবং তাহাদের সংখ্যা কম নয়—লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, সহজ অনুভূতি, এবং অপরূপ মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয়। মানব-হৃদয়ের প্রেমের প্রবাহ যেখানে ফল্গুসম গোপন, জীবনযাত্রার বাঁকে বাঁকে জটিল, সামাজিক ও পারিবারিক বিধিনিষেধ রীতিবন্ধনের মধ্যে যেখানে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক হৃদয়-বৃত্তির বিচিত্র লীলাগুলি আহত ও সংকুচিত, শঙ্কিত ও বাধাপ্রাপ্ত, সেখানেও কবি তাঁহার সহজ সহানুভূতি দিয়া, অন্তর্দৃষ্টি দিয়া, একান্ত আত্মীয়তা বোধের সাহায্যে গল্পের উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং অপরূপ মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার সহায়তায় স্নেহ প্রেম প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলার যথার্থ স্বরূপ ও তাহাব বিকাশ আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। আমাদের সমাজে ও পরিবারে হৃদয়বৃত্তির যত লীলা প্রায় সবই প্রকাশ পায় কতকগুলি অতি পরিচিত সমাজসম্মত সম্বন্ধের মধ্যে, তাহার স্রোত বহিয়া চলে কতকগুলি বাঁধাধরা খাতের মধ্য দিয়া। কিন্তু এই পরিচিত বাঁধাধরার মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন একটি সহজ স্বাভাবিক, অথচ অপ্রত্যাশিত সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ জীবনধারা এমনভাবে আন্দোলিত হয় যে, তাহার মধ্যে ছোট গল্পের উৎসের সন্ধান পাওয়া কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। পল্লী-জীবনের যে আবেষ্টন ও পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গল্প-রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই পল্লীজীবনই আমাদের পরিবার ও সমাজে হৃদয়বৃত্তির এই বিচিত্র লীলাব বিচিত্রতর প্রকাশের দিকে তাঁহার কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিল। 'দেনা-পাওনা' গল্পটি ১২৯৮ সালে 'পোস্টমাস্টার' গল্পটিরও আগেকার লেখা। গল্পটির বিশেষ কিছু সাহিত্য-মূল্য যে আছে, এমন নয়। তবু এই গল্পটির উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে গল্পরচনার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পরিবার ও সমাজের নানান বিধানের ফলে ব্যক্তিজীবনে যে নিদারুণ দুঃখ ও বেদনা জমা হইয়া আছে তাহা কবিচিত্তে কি ভাবে রসসঞ্চার করিয়াছে, তাহার একটি প্রথমতম দৃষ্টান্ত হিসাবে। 'দেনা-পাওনা'র মতন আরও দুই চারিটি গল্পে ঠিক এই জিনিসের

পরিচয় আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের রসবৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্যে তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই। অথচ অতি সহজ একটি হৃদয়বৃত্তি নিষ্করুণ হেলা ও বিদ্রূপে যে কি অসহায়ভাবে পীড়িত ও লজ্জিত হয়, তাহার অতি সুন্দর পরিচয় আছে 'গিন্নী' নামক ছোট গল্পটিতে। স্বভাবতঃই লাজুক মুখচোরা বালক আশু একদিন তাহার একান্ত স্নেহের ছোট বোনটির সঙ্গে বসিয়া একমনে পুতুল খেলিতেছিল; এমনই তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া ফেলিলেন। বোনের সঙ্গে বসিয়া পুতুলখেলার মধ্যে স্নেহলীলার যে অপূর্ব একটি অভিব্যক্তি আছে, পণ্ডিতমশাইর নিষ্করুণ হৃদয়কে তাহা স্পর্শও করিল না; তিনি এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া ইস্কুলে সকল ছাত্রদের সমক্ষে তাহার নামকরণ করিলেন, 'গিন্নী' বলিযা, এবং ছোট্ট ঘটনাটিকে সবিস্তারে লঘু রসিকতায় হালকা করিয়া তাহাকে কৌতুকে ও বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করিলেন। যে স্নেহের লীলা আশুর কাছে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, এই বিদ্রূপের লাঞ্ছনায় সেই বোনের সহিত স্নেহের খেলাই জীবনের একটি সর্বপ্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া তাহার কাছে বোধ হইতে লাগিল। এমনই করিয়া একটি সহজ হৃদয়বৃত্তি পীড়িত ও সংকুচিত হইল। এই ক্ষুদ্র কথাটি বলিতে গিয়া গল্পটির মধ্যে এমন একটি সকরুণ সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার তুলনা প্রতিদিনের বাস্তবজীবনে কমই দেখা যায়। পারিবাবিক বিবোধ ও কলহ ব্যক্তিগত স্নেহ ও ভালবাসার সম্বন্ধকে কি ভাবে সংকুচিত করে, 'ব্যবধান' গল্পটিতে তাহার পরিচয় আছে। অতি সাধারণ ঘটনা, আমাদের পারিবারিক জীবনে নিয়তই এমন ঘটিতেছে, অথচ তাহা বনমালী ও হিমাংশুমালীর পবিত্র স্নেহ ও ভালবাসাব মধ্যে কি করিয়া যে একটি ব্যবধানের সৃষ্টি করিল, এবং সেই সম্বন্ধকে কুণ্ঠিত ও পীড়িত কবিয়া তুলিল তাহার অত্যন্ত সহৃদয় বর্ণনা এই গল্পটিতে আছে। গল্পটির গঠন পারিপাট্যও খুব নিপুণ।

কিন্তু যে কয়টি গল্পের উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে কোন জটিলতা নাই। যে স্নেহ বা প্রীতির সম্বন্ধকে আমরা তুচ্ছ বলিয়াই বিচার করিয়া থাকি, কবি তাঁহার সকরুণ হৃদয়তায় আমাদের হৃদয়বৃত্তির সেই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র প্রকাশগুলির সৌন্দর্য তাহাদের পীড়া ও সংকোচ আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন মাত্র। মাত্র কয়েকটি গল্প তাঁহার গল্পরচনার প্রথম অধ্যায়ে রচিত। বাঙালীর পরিবার ও সমাজ-সম্পর্ক, অথবা তাহার বিচিত্র বিধান ও আবেষ্টন এই গল্পগুলির মধ্যে কোনও আবর্তের সৃষ্টি করে নাই, হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলা তখনও কোনও অতর্কিত অসামাজিক কোনও জটিলতা ঘনাইয়া তোলে নাই। কিন্তু কবির কাছে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যতই নিকটতব হইতে লাগিল, মানুষ তাহার অন্তরের গোপন প্রবাহটির বিচিত্রলীলা লইয়া যতই তাঁহার প্রিয় হইতে প্রিয়তর হইতে লাগিল, ততই তিনি দেখিতে পাইলেন, আমাদের নিয়মবদ্ধ সংকীর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যেও মনোবৃত্তির যে লীলা তাহার বৈচিত্র্য অপরিসীম, এবং তাহার ক্ষুব্ধ জটিলতায় আমাদের অতি পরিচিত মনগুলিও পীড়িত ও উদ্বেলিত। ইহার প্রথম সরস পরিচয় পাই আমরা ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে লেখা 'মধ্যবর্তিনী' গল্পটিতে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির যেটি প্রবলতম, সেই প্রেম একটি সহজ পাবিবারিক জীবনযাত্রাকে কি ভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, এবং তিনটি মানুষের জীবনকে কি ভাবে ক্ষুব্ধ ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার অপূর্ব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, তাহার মধ্যে অপূর্ব রস ও আবেগ সঞ্চারে রবীন্দ্রনাথ যে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, ইহার পর্ববর্তী কোনও গল্পেই তাহা পাওয়া যায় না এবং পরেও খুব বেশি গল্পে পাই না। বহুদিন ভুগিয়া রোগমুক্তির পর

হরসুন্দরীর মনে একটি প্রবল আনন্দ, বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হইল, তাহার মনে হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। এবং এই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া সে এক সুবৃহৎ ত্যাগ করিয়া বসিল—পুত্রহীনা হরসুন্দরী এক রকম জোর করিয়াই স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করাইল, এবং শুধু তাহাই নয়, নববধূ শৈলবালাকে স্বামীর কাছে সোহাগিনী করিয়া তুলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিল। কিন্তু যেদিন সে দেখিল নিবারণ তাহাকে ছাড়িয়া একান্ত করিয়া শৈলবালাকেই লইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল এবং সর্বনাশা প্রেমের সুগভীর গহ্বরে আত্মবিসর্জন করিল, তখন তাহার বুকের মধ্যে বেদনা যেন টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল। কোথায় গেল সেই বল, যে-বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবন সে আপনার প্রেমের দাবির অর্ধেকাংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে! আর নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে একটি যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়াছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দুর্দমনীয় প্রেমবাসনার অত্যাচারে তাহার বুদ্ধি বিবেচনা এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উলট্‌ পালট্‌ হইয়া গেল, এবং অবশেষে নিদারুণ সর্বনাশের মধ্যে হঠাৎ যখন সে একদিন জাগিয়া উঠিল, তখন ততদিনে শৈলবালা ক্রমাগত আদর সোহাগ পাইয়া নিজের মধ্যে নিজে অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া একান্ত আত্মসর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় অহংকার আছে কিন্তু তৃপ্তি নাই, নারী-জীবনের যথার্থ সুখের আস্বাদ নাই। এদিকে শৈলবালার ভোগের সন্তুষ্টি বিধান করিতে গিয়া নিবারণ যখন সর্বস্বান্ত হইল, তখন তাহার অসন্তোষ ও অসুখের আর শেষ নাই; দেহমনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য হইতে সে বঞ্চিত হইল। অবশেষে 'শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারেব সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে ক্ষুদ্র বালিকার অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন নষ্ট হইয়া গেল। তাহার পর আবাব নিবারণ নূতন করিয়া পুরাতন হরসুন্দরীকে ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃতা বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।' গল্পটির কাঠামো যেমন করিয়া বিবৃত করিলাম তাহাতে গল্পের বিশেষ ধর্মটি হয়ত ধরা পডিবে, কিন্তু একটি মানুষের জীবনে সজাগ প্রেমের জাগরণ তিনটি প্রাণীর সমগ্র জীবন-ধারার মধ্যে কেমন একটা ঘূর্ণাবর্তেব সৃষ্টি করিয়াছে, তিনটি মন, বিশেষভাবে হরসুন্দবীব মন, কি ভাবে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব-লীলায় আন্দোলিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ কবিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যে বস-সৃষ্টিবের ক্ষমতা, যে অপূর্ব মনোবিশ্লেষণেব প্রতিভা দেখাইয়াছেন, যেমন করিয়াই গল্পটির সারাংশ উদ্ধৃত করি না কেন, কিছুতেই তাহাব মধ্যে তাহাব পবিচয় মিলিবে না।

এই আশ্চর্য মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতাব পরিচয় 'সমাপ্তি' গল্পটিতেও আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আছে অপূর্ব কাব্যসৃষ্টিব সার্থক চেষ্টা। বন্য মৃগের মত দুরন্ত চঞ্চলা বালস্বভাবা মৃন্ময়ীকে যখন ধরিয়া বাঁধিয়া জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল, তখন প্রথম প্রথম অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার বন্য স্বভাব কিছুতেই পোষ মানিল না, সমস্ত দেহমন তাহার বহুদিন পর্যন্ত বিদ্রোহী এবং নিজের ঘরে প্রকৃতিব মুক্ত আবেষ্টনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল, বালসুলভ চপলতা কিছুতেই তাহার ঘুচিল না। কিন্তু তাহার এই অদ্ভুত ব্যবহারে স্বামী অপূর্ব যখন তাহাকে বাপের বাড়ি রাখিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য কলিকাতা চলিয়া গেল, তখন হঠাৎ কি এক অদৃশ্য প্রভাবে যেন সমস্ত আমূল পরিবর্তিত হইয়া গেল। হঠাৎ যেন তাহার মনে হইল, সমস্ত গৃহে এবং গ্রামে কেহ লোক নাই, হঠাৎ এক মুহূর্তে যেন তাহার বাল্যজীবন অপসারিত হইয়া যৌবনস্বপ্নে সমস্ত আকাশ ছাইয়া গেল, হঠাৎ যেন কেমন

করিয়া বাল্য অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। বিস্মিত ব্যথিত মৃন্ময়ীর সমস্ত স্মৃতি 'সেই আর একটি বাড়ি, আর একটি ঘর, আর একটি শয্যার কাছে গুণ্ গুণ্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।' এই অতর্কিত আমূল পরিবর্তন, এ যেন এক সোনার কাঠির স্পর্শ, এবং এই স্পর্শটুকু এমন সুন্দর মনোরম করিয়া কবি ফুটাইয়াছেন যে, তাহার মধ্যে একটি অতি সুকোমল দরদ-বোধ যেন স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিতে শশিভূষণ ও গিরিবালার মধ্যে স্নেহে সুকোমল যে একটি শুদ্ধ পবিত্র সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে-সম্বন্ধের স্বরূপটি হয়ত শশিভূষণ বা গিরিবালা কাহারও যথেষ্ট স্পষ্ট করিয়া জানা ছিল না, আমাদেরও তাহা স্পষ্ট করিয়া জানিবার উপায় নাই; কিন্তু সেই সুকোমল সম্বন্ধটি এমন একটি সকরুণ বিচ্ছেদ ব্যথার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে যে, তাহাতে সমস্ত মন ব্যথিত হইয়া উঠে। এই গল্পটিতেও কবির অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণের ক্ষমতা সুপরিস্ফুট; কিন্তু গল্পটিতে অবান্তর ঘটনা বাহুল্য এত বেশি, এবং সেই ঘটনাগুলিও এত খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন যে সমগ্র গল্পটি জমাট বাঁধে নাই, এক কথায়, রসঘন হইয়া উঠিতে পারে নাই। শ্রীকুমার বাবু সত্যই বলিয়াছেন, "গল্পটি শশিভূষণের জীবন-কাহিনীর কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশের সমষ্টি বলিয়া আর্টের পরিণত ঐক্য লাভ করিতে পারে নাই।"

কিন্তু 'দিদি' গল্পটি নিখুঁত অপূর্ব—কি ইহার চরিত্র-বিশ্লেষণের ক্ষমতায়, কি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে, কি ঘটনাসংস্থানে, কি ইহার করুণ সমাপ্তিতে। জয়গোপালের স্ত্রী শশিমুখীর মনে স্বামী-বিরহে যখন প্রবল প্রেমাবেগ জাগিয়া উঠিতেছে, যখন সে 'নির্জনঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিত-যৌবনা নববধূর সুখস্বপ্ন' দেখিতেছে, ঠিক তখনই পিতৃমাতৃহারা ছোটভাইটিকে লইয়া স্বামীর সহিত তাহার এক বিরোধের সূত্রপাত হইল; এবং ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল। ছোট একটি ছিদ্র অবলম্বন করিয়া এই বিরোধ ক্রমে অত্যন্ত 'বিকট বীভৎস আকার' ধারণ করিল। শশীর মন ছোটভাইটিকে সকল অসুখ অবিচার হইতে রক্ষা করিতে প্রাণপণে আকুল, অথচ স্নেহলেশহীন অবিচারী স্বার্থপরায়ণ স্বামীর প্রতি তাহার প্রেমের টানও কম নয়। মনের মধ্যে এই নীরব দ্বন্দ্বের আন্দোলনটি গল্পের মধ্যে অতি চমৎকার রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, এবং শশীর শান্ত নীরব সহিষ্ণুতা এই রূপটিকে আরও করুণ মাধুর্যে ভরিয়া তুলিয়াছে। 'দৃষ্টিদান' গল্পটি মিলনান্তক, কিন্তু আরও সুন্দর, আরও মধুর; এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এমন একটা স্নিগ্ধ সুকোমল সংযত প্রেমাবেগ দ্বারা উচ্ছ্বসিত, এমন মৃদুসৌরভ, সংগীত, সৌন্দর্য এবং সুকুমার চিরতারুণ্য দ্বারা আপ্লুত যে, কোনও ভাষায়, কোনও কথায় তাহা ব্যক্ত করা একেবারেই অসম্ভব। প্রত্যেকটি কথায়, প্রত্যেকটি চিত্রে ও বর্ণনায় একটি পেলব সুকোমল মাধুর্য সমস্ত গল্পটিকে যেন একটি ফুলের মতন ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অথচ তাহার মধ্যে কি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়, কবি যেন চোখ দিয়া কিছু দেখেন নাই, মন দিয়া সমস্তই অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার অন্ধ মানসকন্যাটির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যেন অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। চোখ দিয়া সমস্ত জীবন ও প্রকৃতিকে দেখিবার ও ভোগ করিবার যে সুবিধা, তাঁহার দৃষ্টিহীনা কন্যাটির জন্য যেন তিনি তাহা বিসর্জন দিয়াছেন। মনের স্বচ্ছ গভীর অনুভূতি-দৃষ্টির যে-জগতে তাঁহার কন্যাটির বাস, তিনি-ও যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই জগতের অধিবাসী হইয়াছেন, নহিলে বুঝি দৃষ্টিহীনার সহজ অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম সুগভীর অনুভূতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ এমন করিয়া কিছুতেই ফুটাইয়া তোলা সম্ভবপর হইত না। অবস্থা স্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর যখন পরিবর্তন আরম্ভ হইল, ন্যায় অন্যায় ধর্ম অধর্ম সম্বন্ধে তাহার মনের বেদনাবোধ যখন অসাড় হইয়া আসিতে

লাগিল, তখন সেই দৃষ্টিহীনা সহজেই সব বুঝিতে পারিল। "একদিন একজন ধনিলোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুইদিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, কি বলিল আমি কিছুই জানি না,—কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফুল্লতার সঙ্গে অন্য নানাবিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তখন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তি-দ্বারা বুঝিলাম, তিনি আজ কলঙ্ক মাখিয়া আসিয়াছেন।" তারপর হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে যখন স্বামীর নূতন প্রেমাবেগের সঞ্চার হইতেছে, তখন তাঁহার এই নূতন অনুভূতি দৃষ্টিহীনা স্ত্রীর নিকট হইতে তিনি প্রাণপণে গোপন করিতেছেন; কিন্তু দৃষ্টিহীনা নারী অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়া সকলই বুঝিতেছে, দেখিতেছে। "অথচ পত্রদ্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার (হেমাঙ্গিনীর) খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতাম, যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যখন একটু প্রবেশ করে সেই দিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে—তেমনই তাঁহার ভিতরে একটুও যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয়, সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি।" দৃষ্টিহীনার এমন অনবদ্য সহজ অথচ সূক্ষ্ম অনুভূতির এমন অপূর্ব পরিচয় সাহিত্যে খুব কমই দেখা যায়। এই গল্পটির সুকোমল মৃদু মাধুর্য 'মাল্য-দান' গল্পটিতেও আছে। কুড়ানি কুড়াইয়া পাওয়া মেয়ে, বনের হরিণ-শিশুর মত সরল, তাহার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণও হয় নাই। একটি অপরিচিত যুবকের সম্মুখে তাহাকে লইয়া প্রেমের ও বিবাহের কত কৌতুক, অথচ কিছুই সে বুঝিতে, কিছুরই মর্ম সে গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু, একদিন সেই স্বল্পপরিচিত যুবকটি যখন চলিয়া গেল, তখন বাহিরে রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের প্রাণের আনন্দের মধ্যে, "ঐ বুদ্ধিহীনা বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারিদিকের সংগত কোন অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা! কি হইল, কেন এমন হইল, তা'র পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা কিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন? যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প, তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল? জগতের এই সহজ উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে?" তারপর দেখিতে না দেখিতে মৃগশিশু কুড়ানি কখন হৃদয়ভারাতুরা যুবতী নারী হইয়া উঠিল! "কোন্ রৌদ্রের আলোকে—কোন্ রৌদ্রের উত্তাপে তাহার বুদ্ধির উপরকার সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।" এবং সর্বশেষে আরও দুঃখ বেদনার ভিতর দিয়া একটা ব্যর্থ সার্থকতার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল। কুড়ানির ও যতীনের মনোবৃত্তি স্ফুরণের যে-চিত্র এই গল্পটিতে আছে তাহার মধ্যে কবির সহজ ও স্বাভাবিক সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির ও ভাষার গীতময়তার পরিচয় অতি চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে।

'মাস্টার মশায়' গল্পটি অত্যন্ত সরল, গৃহশিক্ষকের সঙ্গে তাহার ছাত্রের স্নেহসম্পর্কের একটি কাহিনী। অথচ, এই অতিপরিচিত মনোবৃত্তিটি তাহার সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশের পথ না পাইয়া নিজের মধ্যে পীড়িত ও সংকুচিত হইয়া মরিয়াছে। মাতৃহারা বেণুগোপাল তাহার পিতার ক্রমবর্ধমান অবহেলা ও ঔদাসীন্যের হাত হইতে মুক্তি পাইতে গিয়া সর্বনাশ করিয়া বসিল তাহার, যে তাহাকে সকলের চাইতে বেশি স্নেহ করে। অথচ এই সর্বনাশ যে মাস্টারমশাই হরলালের সর্বনাশ তাহা সে বুঝিল না। তাহার একান্ত স্নেহের পাত্রই যে তাহাকে অন্ধকার গহ্বরে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে, একথা ত সে

কাহাকেও বলিতে পারে না, মা-কেও না ; আর মুখ ফুটিয়া বলিতে কি, ভাবিতে গেলেও যে তাহার দেহমন সমস্ত অসাড় অবসন্ন হইয়া আসে, অথচ অন্যদিকে লজ্জা, অপমান, দুঃখ কাল ঘন মেঘের মত যেন সমস্ত জীবনকে ঘেরিয়া আসিয়াছে, মুক্তির কোনও পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই। ভাবিতে ভাবিতে স্বাভাবিক বুদ্ধি যখন লয় পাইল, মস্তিষ্কে যখন বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল, সমস্ত জীবন যখন দুর্বহ হইয়া একটা চঞ্চল বিক্ষোভের মধ্যে তাহার অবসান খুঁজিতে লাগিল, তখন জীবনের এই দুশ্ছেদ্য জটিল ট্র্যাজেডিটুকু একটা অদ্ভুত ভঙ্গি অবলম্বন করিয়া একটি শান্ত অচঞ্চল সুগভীর অনুভূতির মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল। এই বিশেষ ভঙ্গিটুকুর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কল্পমায়ার, তাহাব বিশেষ কবি-মানসের অপূর্ব পরিচয় আছে। ব্যাপারটি কিছুই নয় ; এই সহায়সম্বলহীন নৈরাশ্যান্ধকারময় বর্তমান ও ভীষণতর ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার দেহমনের চৈতন্য বিলুপ্ত হইল ; এবং এই প্রকাণ্ড মানসিক আঘাত সহ্য করিয়া সে আর বাঁচিয়া উঠিতে পারিল না। কবির হাতে যখন এই প্রবল মানসিক বিক্ষোভ ক্রমে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, ট্র্যাজেডি যখন প্রায় চরমে আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন এক অপূর্ব কৌশলের ফলে সমস্ত ট্র্যাজেডিটুকু যেন একটি সোনার কাঠির ছোঁয়ার এক অপরূপ রূপে মণ্ডিত হইয়া একটি পরিপূর্ণ ভাবলোকের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল। "সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া গেল··· মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।···সে যে মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন একমুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। ···মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই।···যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল, তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল।···বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র মিলাইয়া গেল,—হরলালের শরীর মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল,—ঐ গেল তপ্ত বাষ্পের বুদ্‌বুদ্ একেবারে ফাটিয়া গেল,—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।" ইহাতে যে শুধু সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে একটি অপূর্ব কল্পমায়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই নয় ; সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে প্রকৃতির ভাষায় রূপান্তরিত করিবার, প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে তাঁহাকে একান্তভাবে যুক্ত করিয়া অভিব্যক্তি দান করিবার যে বিশেষ শিল্পকৌশল একান্তই রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, এই গল্পটির পরিসমাপ্তির মধ্যে তাহারও পরিচয় আছে। অথচ আমি আগেই বলিয়াছি, এই শিল্পকৌশল কিছু সজ্ঞান চেষ্টা নয়, ইহা তাঁহার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির, বিশেষ অনুভূতিরই একটি প্রকাশ ; সৃষ্টির মর্মস্থলে একটি বিরাট ঐক্যানুভূতির অভিব্যক্তি।

'রাসমণির ছেলে' গল্পটি প্রকৃতপক্ষে দুইটি গল্প। কালীপদর যে বাল্যজীবন সুদৃঢ় সুকঠোর মাতৃশাসন ও উদার শিথিল পিতৃস্নেহের মধ্যে কাটিয়াছে, সেই বাল্যজীবনের পরিচয়টুকু সম্পূর্ণ করিতে গিয়া ছোট একটি গল্পের অবতারণা করিতে হইয়াছে। তাহার মধ্যে পতিপ্রেম ও মাতৃস্নেহ তাহার সমস্ত স্নিগ্ধ কোমল মাধুর্য ও সুকঠোর দৃঢ়তা লইয়া কি করিয়া অপূর্ব রূপে ফুটিয়া উঠিল, একটি বালকের সুকোমল হৃদয় পিতৃহৃদয়ের শিথিল উদার স্নেহের মধ্যে দায়িত্বলেশহীন সুখপরায়ণ যথেচ্ছাচারী হইয়া গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনার মুখে মাতার সুদৃঢ় শাসনে কি করিয়া সংযত হইয়া গেল, এবং কি করিয়া মাতার একান্ত অন্তরঙ্গ

হইয়া ক্রমে সে বুঝিল যে, পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া কিছুই পাওয়া যায় না, এবং সে মূল্য দুঃখের মূল্য, এই ছোট খণ্ড-গল্পটির মধ্যেই তাহার সমস্ত পরিচয় আছে। একটু বিকৃত ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা একটি গল্পের ভিতর আর একটি গল্প। সত্য বলিতে কি, ইহার পরে রাসমণি চরিত্রের নূতন পরিচয় আর কিছু পাই না; শুধু পরিচয় বলিয়াই নয়, তাঁহার দেখাও আর পাই না, যতটুকু পাই তাহা কালীপদর মধ্যেই; এবং কালীপদর যে পরিচয় ইহার পরে আছে, তাহারও সূচনা এই খানেই আমরা পাইলাম। এই গল্পাংশটির সঙ্গে পরবর্তী অংশটির খুব একটা নিবিড় ঐক্য কিছু নাই, শুধু ঐ ভবানীচরণের বিগত বংশাভিমান ও উইল চুরির ব্যাপারটি ছাড়া। যাহা হউক, লেখাপড়া শিখাইয়া ছেলেকে মানুষ করিবার জন্য রাসমণি ছেলেকে কলিকাতা পাঠাইলেন, মাতার আশীর্বাদ কালীপদকে রক্ষাকবচের মত ঘিরিয়া রহিল। রাসমণি এইখানেই বিদায় লইলেন। ইহার পরবর্তী গল্পাংশে রাসমণির স্থান কোথাও নাই। কিন্তু ভবানীচরণ যে নিজের কোল ছাড়িয়া কালীপদকে কলিকাতা পাঠাইতে রাজী হইলেন, তাহা কালীপদকে মানুষ করিবার জন্য নয়; তিনি ভাবিলেন কালীপদ লেখাপড়া শিখিয়া উইল চুরির প্রতিশোধ লইবে, সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনিবে এবং বিলুপ্ত বংশ গৌরবকে ফিরাইয়া আনিবে। কালীপদ মাতার আশীর্বাদের বর্মে নিজেকে আবৃত করিয়া কলিকাতায় জীবন কাটাইতে লাগিল; তাবপব একদিন যখন সেই বর্মে আঘাত লাগিল, তাহার মাতৃআশীর্বাদের উপর যখন লাঞ্ছনা বর্ষিত হইতে আরম্ভ করিল, তখন সে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তবু আত্মার পরাভব, কিছুতেই স্বীকার করিল না, নিজের দুঃখের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতেই অপমানিত হইতে দিল না। মায়ের আশীর্বাদ অক্ষয় হইয়া রহিল, কিন্তু কালীপদ বাঁচিল না। কিন্তু বীর সৈনিকের মত মাতার আশীর্বাদের পতাকা বহন করিবার উজ্জ্বল সাধনার মধ্যে এই গল্পাংশটির সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে নাই; সে সৌন্দর্য ফুটিয়াছে শৈলেন্দ্রের চরিত্রের বিশ্লেষণে, এবং ভবানীচরণের জীবনের ট্র্যাজেডির মধ্যে। প্রথমটায় শৈলেন অর্থ ও অভিজাত্যের গর্বে কালীপদকে অবজ্ঞা করিয়াই চলিত, লজ্জিত ও অপদস্থ করিতেও সংকুচিত হইত না; তারপর একদিন সে বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা যখন চরমে উঠিল, এবং কালীপদ যখন বেদনায় ভাঙিয়া পড়িল, তখন শৈলেনের ব্যবহারের এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল; এবং তখন পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সে কোনও কিছুই বাকি রাখিল না। এই পরিবর্তনের মধ্যে এবং শৈলেনের পূর্বকার চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে অপূর্ব মনোবিশ্লেষণের পরিচয় আছে, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া কালীপদর চরিত্রে যে দৃঢ়তা ও সংযম এবং একান্ত নিষ্ঠা যে ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহারও নৈপুণ্য কম নয়। কালীপদ মরিল; স্বামীর কথা ভাবিয়া 'রাসমণি নিজের শোককে ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না, তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল।' কিন্তু ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হইয়া উঠিল ভবানীচরণের জীবনে। কালীপদ কলিকাতা গিয়াছিল 'সীতা উদ্ধার' করিতে, ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইতে; ভবানীচরণ এই ভরসা নিয়া বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপদ যখন মরিল, তখন আর কিছুই আশা করিবার, আকাঙ্ক্ষা করিবার রহিল না, রহিল কেবল পিতৃহৃদয়ের দুঃখ ও ব্যথা। এমন সময় এক নিশীথ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে বন্দিনী সীতার উদ্ধার হইল, উইল পাওয়া গেল, ঘরের লক্ষ্মী ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তখন কালীপদ নাই—উইলের কি প্রয়োজন, ঘরে লক্ষ্মী থাকিল কি না-ই থাকিল, তাহাতেই বা কি ক্ষতি!

কিন্তু এমন করিয়া কয়টি গল্পের উল্লেখ করা সম্ভব? আমি কয়েকটি প্রধান প্রধান গল্পের উল্লেখ করিলাম মাত্র। আমাদের হৃদয়-বৃত্তির বিচিত্র লীলার মধ্যে, পরিবার ও সমাজের সরল ও জটিল আবেষ্টনে তাহার বিচিত্র পরিচয়ের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সহজ অনুভূতি অবাধ বিহারের আনন্দলাভ করিয়াছে, নিজের সুকোমল দরদবোধ দিয়া আমাদের হৃদয়বৃত্তির সেই সূক্ষ্ম জটিল লীলাগুলিকে তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং তাঁহার এই সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণ অপূর্ব রসে ও সৌন্দর্যে এই গল্পগুলির মধ্যে সর্বত্র অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 'ঠাকুর্দা' গল্পে ঠাকুর্দার চরিত্রে, 'পণরক্ষা' গল্পে বংশীবদন ও রসিকের জটিল স্নেহ সম্পর্কের মধ্যে, 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পে পরিবারের দাবির সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেমের দাবির বিরোধ ও অসংগতিতে বনোয়ারিলাল ও কিরণলেখার যে পরিচয় আছে তাহার মধ্যে, 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর চরিত্রে যে শান্ত সুগভীর সহিষ্ণুতা একটা দুঃখের মূর্তি ধারণ করিয়াছে তাহার মধ্যে, এবং এমনই ধরনের আরও অনেক গল্পেই কবি হৃদয়ের এই সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, সহজ দরদবোধ ও অপূর্ব মনোবিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

একথা আজ সর্বজনবিদিত, ছোট গল্প রচনার যখন সূত্রপাত তখন রবীন্দ্রনাথ বৈষয়িক কর্মোপলক্ষে পদ্মার সুবিস্তীর্ণ সুপ্রসারিত বুকের উপর অথবা পদ্মারই শীর্ণ শাখানদীর উপর বোটে করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। "ছিন্নপত্রে" বারবার তাহার প্রমাণ মিলিবে। এক একদিন এক এক বস্তু পরিবেশ ও মানসমণ্ডলের মধ্যে এক একটি গল্প কি করিয়া রূপ লইতেছে, "ছিন্নপত্রে", অন্যান্য চিঠিপত্রে এবং নিবন্ধে তাহা ধরা পড়ে। বজরার ছাতের উপর বসিয়া অথবা তাহার জানালার ভিতর দিয়া তিনি নদীর দুই তীরের বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, টুক্‌রো বিচ্ছিন্ন এক একটি অংশ জীবনের, অথচ সেই খণ্ডিত অংশই চলমান পল্লীজীবন স্রোতের প্রেক্ষাপটে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়াছে। সেই জীবন-স্রোতের মধ্যে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই, নিজেকে জলস্রোতধৃত জন ও জীবন-স্রোতের মধ্যে ভাসাইয়া দেন নাই, বরং নদীর মতই নিরাসক্ত ভাবে সেই জীবনস্রোতের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া, তাহার দুই তীর ছুঁইয়া ছুঁইয়া ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছেন; এক মুহূর্তে তীর এবং তীরের মানুষ তাঁহার একান্ত আপন হইয়াছে, তাহাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে নিজেকে জড়াইয়াছেন, পর মুহূর্তেই তাহাদের নির্দয়ভাবে ছাড়িয়া চলিয়াও গিয়াছেন—'পোস্টমাস্টার', 'অতিথি' প্রভৃতি গল্পেই ত তাহার প্রমাণ! এই যে জলস্রোতের উপর বসিয়া জন ও জীবনস্রোত দেখা, এই দেখার রহস্যই আদিপর্বে রবীন্দ্র-ছোটগল্পের রহস্য। একদিকে পরম আত্মীয়তা পরম অন্তরঙ্গতা, লোকালয়ের জীবনযাত্রার সঙ্গে একান্ত সুনিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও ভালবাসা, আর একদিকে জলস্রোতের মতই পরম নির্লিপ্ত নির্বিকার ঔদাসীন্য। একদিন কবি অতি তুচ্ছ ঘটনাকেও নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে জড়াইয়া ধরেন, আর একদিন এক বৃহৎ প্রেম বৃহৎ ঘটনাকেও নিষ্ঠুরভাবে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যান। নিত্য পরিবর্তনশীল পদ্মাতীরের জীবনস্রোত ও নিত্য পরিবর্তনশীল পদ্মার জলস্রোত এই দুইয়ে মিলিয়া কবির কল্পনাকে দ্রুত উদ্দীপ্ত করিয়াছে।

পূর্ববাংলার পদ্মার বুকে বসিয়া মানস চক্ষে বাংলার যে-রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই বাংলা দেশের বিশিষ্ট ও সমগ্র রূপ। বাংলা দেশের যে বিশিষ্ট প্রাকৃতিক রূপ, গ্রীষ্মে বর্ষায় শরতে শীতে, বিশেষভাবে বর্ষায় বাংলাদেশ যে রূপ পরিগ্রহ করে সে-রূপ ত এই ছোটগল্পগুলির মধ্যেই আমরা প্রথম দেখিলাম। তাঁহার আগে কোনও সাহিত্যিক রচনাতেই সে-রূপ আমরা দেখি নাই। এই বৃহৎ-ব্যঞ্জনাময় গভীর রূপের

বর্ণনা গল্পগুলিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, পরবর্তী জীবনে বাংলার আর এক রূপ—নিঃস্ব, গৈরিক রুদ্র, বিরাগী রূপ—তিনি দেখিয়াছিলেন রাঢ় দেশের বিস্তীর্ণ গৈরিক প্রান্তরে, তাহার ঢেউ খেলান খোয়াই'র মধ্যে। কিন্তু ছোট গল্পে বাংলার সেই রূপ বিস্তৃত হয় নাই, হইয়াছে উত্তর কালের কবিতায়।

শুধু প্রাকৃতিক রূপের কথাই বা বলি কেন, বাংলাদেশও বাঙালীর অন্তরে তাহার সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রকৃতির রূপও প্রথম আমরা দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিতেই। নগর ও পল্লাবাসী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জন-মানবের পরিচয় এই গল্পগুলিতেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। যে সমবেদনা ও সহানুভূতি না থাকিলে দৃষ্টি স্বচ্ছ উদারতা লাভ করে না কিংবা উন্মুক্তই হয় না, সেই সমবেদনা ও সহানুভূতিরই অভাব ছিল রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলাসাহিত্যে; তাহাছাড়া এই দিককার সুবৃহৎ বাংলাদেশ ত অনাবিষ্কৃতই ছিল। রবীন্দ্র-ছোটগল্পে যে মানুষগুলির সঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম পরিচিত হইলাম, হয়ত তাহাদের চারিদিকে ভাবাতিশয্যের একটু অস্পষ্ট মায়াজাল বিস্তৃত আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা যে একান্তই বাঙালী, একান্তই আমাদের আত্মীয় আমাদের প্রতিবেশী এটুকু চিনিয়া লইতে এতটুকু দেরি হয় না। তাহাদেব সত্য ও সার্থকরূপ এই ত প্রথম ধরা পড়িল। আমাদের সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অসংগতি, রাষ্ট্রীয় বিক্ষোভ ও আত্মসম্মানবোধের বিকাশ, আমাদের শক্তি ও দুর্বলতা, দুঃখ ও ঐশ্বর্য, সব জড়াইয়া সব কিছুকে লইয়াই আমাদের জীবন; সেই জীবনস্রোতের উপরই অগণিত চরিত্রগুলির দৈনন্দিন লীলা। তাহার প্রেক্ষাপটে আমরা যখন পোস্টমাস্টার, রামসুন্দর, নিরুপমা, রামকানাই, শশিভূষণ, রাধামুকুন্দ, তারাপদ, হিমাংশু, বনমালী, গিরিবালা, চন্দরা, ছিদাম, দুঃখিরাম, ঈশান, কৈলাসচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, মোক্ষদাসুন্দরী প্রভৃতিদেব দেখি তখন মনে হয়, ইহারা ত আমাদেরই ঘরের লোক, অথচ ইহাদের পরিচয় এতকাল জানিতাম না। বস্তুত এক এক সময় মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই গল্পগুলি না লিখিলে বাংলাদেশ বুঝি আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত! কিন্তু একথা সত্য হউক বা না হউক, এই গল্পগুলির মধ্যে কবিচিত্তের যে গভীর ভালবাসা, যে সহানুভূতিময় দৃষ্টি বংলাদেশেব সূক্ষ্ম গভীর ঘনিষ্ঠ ও সমগ্ররূপ পাঠকচিত্তের নিকটতর করিয়াছে, যে মধ্যবিত্ত ও পল্লীবাসী দরিদ্র বাঙালী সমাজ-মানসকে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত করিয়াছে রবীন্দ্রপূর্ব বাংলাসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই, এক মধ্যযুগীয় পল্লী-গীতিগুলি ছাড়া।

একথা আমি অন্যত্র বলিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের জন্ম যদিও অভিজাত পরিবারে, কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছে আভিজাত্য ও সম্পদের আবেষ্টনের মধ্যে, তাহা হইলেও তাঁহার মনন-কল্পনা আশ্রয় করিয়াছে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজকে। সুতরাং আশ্চর্য হইবার কারণ নাই যে, ছোট গল্পগুলিতে যাহাদের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার ইতিহাস রূপায়িত হইয়াছে, তাহারা কেহই আভিজাত্য ও অর্থসমৃদ্ধির দিক হইতে তাহার নিজের শ্রেণীভুক্ত নয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ কোনওদিনই সজ্ঞানে কিছু শ্রেণীবোধ মুক্ত ছিলেন না; তাহার প্রয়োজনও হয়ত তিনি বোধ করেন নাই। কারণ, শ্রেণী, সমাজ, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি মানব রচিত সীমার বাহিরে নিজকে রাখিয়া মানুষকে দেখিবার মতন স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি তাহার বরাবরই ছিল। যখন যাহাদের কথা তিনি বলিয়াছেন—সে নয়ানজোড়ের জমিদার কৈলাসচন্দ্র হউক, অথবা দুখিরামই হউক, অথবা উলাপুরের পোস্টমাস্টারই হউক—তখন নিছক মানুষ হিসাবেই তাহাকে দেখিয়াছেন তাহার বিশিষ্ট স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে

রাখিয়া ; নিজের শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম কোনও কিছুর চেতনাই তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নাই। এই স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিকে এমন গভীর কাব্যময় অথচ বাস্তবরূপ দান করিয়াছে।

তবে একথাও সত্য যে আদিপর্বের রবীন্দ্র-ছোটগল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই। লেখক একান্ত ভাবেই চেষ্টা করিয়াছেন শুধু আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে, আমাদের বুদ্ধি ও সমাজচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে ততটা নয়। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র বাঙালীর দুঃখ ও দৈন্য, লাঞ্ছনা ও অপমান, অত্যাচার ও অবিচার, অন্যায় ও অসংগতি উদ্‌ঘাটিত করিয়া বারবারই তিনি তাহাদের সত্য পরিচয় আমাদের চিত্তের নিকটতর করিয়াছেন, কিন্তু এই সবের পশ্চাতে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার যে কি নির্মম নিষ্ঠুর অথচ অচেতন অবিচার থাকিতে পারে সে-সম্বন্ধে আমাদের কোনও ইঙ্গিত তিনি দান করেন নাই। সাম্প্রতিক বোধ ও বুদ্ধি আশা করে লেখকের নিকট হইতে এ দায়িত্বের স্বীকৃতি। গল্পগুলির মধ্যে অনেক জায়গায় লেখক নিয়তি কিংবা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে কঠোর ও জ্বলন্ত প্রতিবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন সবল লেখনীতে, কিন্তু একথাও সত্য, এসমস্তই অধিকাংশ জায়গায় ব্যক্তিগত দুঃখ ও অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া ; বৃহত্তর সমাজগত দুঃখ ও অভিযোগের ইঙ্গিত তাহারা বহন করে না। আদিপর্বের গল্পগুলিতে এই পরিচয় অনুপস্থিত ; তাহা পাওয়া যাইবে 'নষ্টনীড়' হইতে আরম্ভ করিয়া গল্পাবলীর দ্বিতীয় পর্বে।

চার

হৃদয়-বৃত্তির যে-লীলা বৈচিত্র্যের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, এই বৈচিত্র্যের কোনও সীমা নাই শেষ নাই। এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে ছোট-গল্পগুলির আলোচনা করিয়াছি তাহার সবগুলির মধ্যেই হৃদয়বৃত্তির যে লীলাবৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমাদের কাছে অল্পবিস্তর পরিচিত, তাহাদের উদ্ভব আমাদের জীবনের মর্মস্থল হইতে, এবং পাঠকের কাছে তাহাদের আবেদন হৃদয়ের সুগভীর ভাবানুভূতির মধ্যে, তাহাদের চিত্তের সহজ দরদবোধের মধ্যে। 'পোস্টমাস্টার' কিংবা 'সমাপ্তি' কিংবা এই ধরনের যত গল্প, এই গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে আমাদের সুগভীর হৃদয়-দেশটি যেন রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, হৃদয়ের ভাঁটায় যেন টান পড়ে, সমগ্র মর্মস্থলটি যেন কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে। ইহাদের আবেদন অত্যন্ত স্বচ্ছ, সহজ, সরল। সমস্ত ঘটনা ও সমস্যাকে অতিক্রম করিয়া ইহারা সরাসরি অন্তরের গহন দেশে গিয়া ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের পরিবারের ও সমাজের এই চিরপরিচিত জীবনধারার মধ্যেও হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম বিচিত্রলীলা এক এক সময় এমন এক একটি অপরূপ উপায়ে বিকশিত হইয়া উঠে, এমন এক একটি অপ্রত্যাশিত পরিণতি লাভ করে যেগুলিকে সমসাময়িক কালের সামাজিক ও পারিবারিক বিধিবিধান অনুসারে অন্যায় হয়ত বলিতে পারি, কেহ কেহ হয়ত অধর্মও বলিবেন, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুতেই বলিতে পারি না। আমাদের অন্তরের ভাবানুভূতির মধ্যে তাহাদের আবেদন সহজ ও সরল নয়, স্বচ্ছও হয়ত নয়, হয়ত তাহারা আমাদের চিত্তকে রসে ভরিয়া দেয় না, মর্মস্থলটিকে নাড়া দেয় না,

কিন্তু আমাদের বুদ্ধির মধ্যে চিন্তার মধ্যে তাহারা জোর করিয়া আসন পাতিয়া বসে, সেখানে কিছুতেই তাহাদের দাবী অস্বীকার করিতে পারি না। চারিদিক বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অন্তরের সূক্ষ্ম অলিগলিগুলির সন্ধান লইলে সেগুলিকে একান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়; এবং আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাবৃত্তি তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করে। হৃদয়বৃত্তির এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লীলাগুলির সম্বন্ধে বহুদিন আমরা কিছু সচেতন ছিলাম না, রবীন্দ্রনাথও হয়ত ছিলেন না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের কিংবা লেখকের চেতনাবোধ থাকিলেও অন্যায় বোধে অসামাজিক বোধে সেখানে আত্মপীড়ন ও সংকুচনের সীমা ছিল না। আজ হৃদয়বৃত্তির এই অজ্ঞাত ও অনাদৃত লীলাগুলি সম্বন্ধে আমরা কমবেশি সচেতন হইয়াছি, আমাদের বুদ্ধি দিয়া, চিন্তা দিয়া সেগুলিকে আমরা নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছি, এবং অন্যায় বলিয়া মনে করিলেও কিছুতেই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পে ও উপন্যাসে হৃদয়বৃত্তির এই নূতন আবিষ্কৃত লীলা-জগৎ খুব বড় একটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু তাহাতে বুদ্ধির লীলা ও সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ প্রতিভাই একান্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, অন্তরের সুগভীর ভাবরসে সর্বত্র তাহা অভিষিক্ত হয় নাই, বস্তুর যথার্থ রূপে ও পরিচয়ে তাহা আশ্রিত নয়, হৃদয়ের সহজ দরদবোধ তাহাকে সর্বদা আবেগে ও সৌন্দর্যে পরিপ্লুত করিতে পারে নাই। সেইজন্যই এই ধরনের গল্পে যুক্তির প্রাখর্য, বর্ণনার চাতুর্য যতটা প্রকাশ পাইতেছে, রসের গভীরতা, সহজ সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় ততটা পাওয়া যাইতেছে না। বর্তমান বাংলা কথা-সাহিত্যের এই নূতন অধ্যায়ের সূচনা রবীন্দ্রনাথের একশ্রেণীর ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যেই সর্বপ্রথম দেখা যায়, এবং এই গল্পগুলি সাধারণত পরবর্তী কালের রচনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাংলা কথা-সাহিত্যের এই নবধর্মের অগ্রদূত হইলেও শুধু মাত্র বুদ্ধির দীপ্তিতেই তাঁহার এই ধরনের গল্পগুলি আলোকিত হয় নাই, যুক্তির প্রাখর্য ও বর্ণনার চাতুর্যই তাহার মধ্যে কখনও একান্ত হইয়া উঠে নাই ; বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে মিশিয়াছে হৃদয়ের সহজ দরদবোধ, যুক্তির প্রাখর্যের সঙ্গে অন্তরের সুগভীর রসানুভূতি, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে সহজ সৌন্দর্যবোধ, বর্ণনা-চাতুর্যের সঙ্গে অপূর্ব কলা কৌশল, বাস্তব সত্যের সঙ্গে ভাবলোকের সত্য ও সৌন্দর্য।

যাহা হউক, এই ধরনের গল্পগুলির প্রথম পরিচয় 'নষ্টনীড়', ১৩০৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে লেখা। এই গল্পটি হইতেই রবীন্দ্র-ছোটগল্পেও দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। 'নষ্টনীড়'কে ছোটগল্প বলিতে কাহারও কাহারও আপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু ঘটনার যে স্তর পর্যায়, যে আবর্ত, যে সংক্ষুব্ধ সুগভীর ঘাত-প্রতিঘাত উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, তাহার পরিচয় 'নষ্টনীড়' গল্পে নাই। কাজেই আয়তনে প্রায় ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা সত্ত্বেও 'নষ্টনীড়'কে ছোট গল্প পর্যায়ে উল্লেখ করাই সংগত। যাহাই হউক, এই গল্পটিতে মনস্তত্ত্বমূলক একটি সমস্যা অতি সুনিপুণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

চারুবালা ভূপতির স্ত্রী, অমল চারুর সমবয়সী দেবর। ভূপতি সংবাদ-পত্র সম্পাদনায় ব্যস্ত, নিরবসর কাজের লোক। স্ত্রীর দিকে চাহিবার অবসর তাহার ছিল না, স্ত্রীর ভালবাসা যে মূল্য দিয়া কিনিতে হয়, একথা তাহার মনে কখনও জাগে নাই। তাহার একটা সাধারণ সংস্কার ছিল স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, 'স্ত্রী ধ্রুবতারার মত নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে,—হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না।' এই সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া ভূপতি কর্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সংগ্রামে চারুকে সঙ্গদান করিবার জন্য রহিল অমল এবং চারুর এক ভাজ, মন্দাকিনী। মন্দাকিনীর রুচি এবং প্রবৃত্তি একটু স্থূল, বুদ্ধি একান্তই সাংসারিক। অমল শৌখীন তরুণ, কল্পনা-প্রবণ এবং সাহিত্যে যশোলিপ্সু। চারু তাহার নিরবচ্ছিন্ন অবসর অমলের আবদার দিয়া, অমলের সাহিত্য লিপ্সার গাছে জল ঢালিয়া এবং বাতাস দিয়া, এবং নানাপ্রকারে অমলের সঙ্গ আহরণ করিয়া ভরিয়া তোলে। এইভাবে চারু এবং অমলের মধ্যে একটা মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিল; তাহারও বেশি, অমলের সঙ্গ উপলক্ষ করিয়া চারুর যৌবন বিকশিত হইতে লাগিল। 'চারু ও অমলের সখিত্বে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দুই জনের আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে সুমিষ্ট কৌতুকাবহ ছিল।' কিন্তু ক্রমশ অমলের সাহিত্য-যশোলিপ্সার গাছে ফুল ফুটিল, এবং তাহার সৌরভ চারু এবং অমল এই দুইজনের জগৎ অতিক্রম করিল। অমল চারুকে অতিক্রম করিল; আগে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল শুধু চারুর কাছে, এখন সে দশজনের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দাঁড়াইয়া শতজনের প্রতিষ্ঠার দাবি করিল। চারু তাহাতে ব্যথিত হইল, অমল যে ক্রমশ তাহার নীড় হইতে বাহির হইয়া ডানা মেলিতেছে, ইহাতে তাহার নবজাগ্রত নারীত্বে সে আঘাত পাইল। মন্দাকিনী এতদিন অমলকে বিশেষ একটা কেহ বলিয়া মনে করে নাই। আজ তাহার স্থূল রুচি ও প্রবৃত্তি লইয়া 'মন্দা যখন দেখিল অমল চারিদিক হইতেই শ্রদ্ধা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মস্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তরুণ মুখে নব গৌরবের গর্বোজ্জ্বল দীপ্তি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল।' সেই মোহে অমল নিজেকে ধরা দিতে বাধ্য হইল। এদিকে তখন চারুর মনে ঈর্ষার ছায়া ঘনাইতে আরম্ভ করিয়াছে। স্থির করিল, সেও সাহিত্য সৃষ্টি করিবে, এবং অমলকে দেখাইয়া দিবে, মন্দাকিনীর চেয়ে সে অনেক বড়, অনেক বেশি কাম্য। কিন্তু হইল বিপরীত। চারুর রচনা ও অমলের রচনা পাশাপাশি রাখিয়া কাগজে যে সমালোচনা বাহির হইল তাহাতে চারুরই হইল জয়, সমালোচক অমলকে নিন্দাবাণে লাঞ্ছিত করিলেন। চারু ও অমলের ব্যবধান বাড়িয়াই গেল, এবং অমল ক্রমশ মন্দার দিকেই আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। চারুর মনে একদিকে ব্যবধানের বেদনা, আর একদিকে ঈর্ষার জ্বালা; এই দুইয়ের নিষ্পেষণে যখন তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত ও ভারাক্রান্ত, তখন ভূপতির কর্মসমুদ্রে সংবাদপত্র-তরণী টলমল করিয়া উঠিল মন্দার স্বামী উমাপদর চক্রান্তে। ম্লানমুখে চিন্তাভারাতুর হৃদয়ে বহুদিন পরে ভূপতি শান্তি খুঁজিতে আসিল স্ত্রী চারুর কাছে। কিন্তু চারু তখন 'নিজের দুঃখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জানালার কাছে অন্ধকারে বসিয়াছিল।' ভূপতি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। ইতিমধ্যে মন্দা স্বামীকে লইয়া বিদায় হইয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যেই ভূপতির সংবাদপত্র-তরণীও ভরাডুবি হইল। চারু তখনও নিজের দুঃখভারে অবনত, ভূপতির বিপদের দিকে দৃষ্টি দিবার মত হৃদয়ের অবস্থা তাহার নয়। কিন্তু সে বিপদ যে কত বড় এবং সেই বিপদ ও দায়িত্ব মাথায় লইয়া দাদা যে একা অসহায়ের মতন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন তাহা শুধু বুঝিল অমল। একমুহূর্তে সে তাহার নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইল, নিজের কর্তব্যবোধে মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিল, এবং হয়ত বা নিজের অতীতের দায়িত্বলেশহীন জীবনযাত্রার জন্য ব্যথিতও হইল। এমন সময় সুযোগ আসিল অমলের বিবাহের, এবং বিবাহের পরই শ্বশুরের খরচে বিলাত যাইবার। বিনা দ্বিধায় এবং বিনা বাক্যব্যয়ে অমল রাজী হইল এবং, বিবাহের পরই বিলাত চলিয়া গেল। তাহার প্রতিজ্ঞা, মানুষ হইয়া উঠিয়া দাদার বিপদের অংশ মাথায় লইতে হইবে। সে জানিল না, বুঝিতেও পারিল না, দাদার সুখ ও শান্তির নীড়টি ইতিমধ্যেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এদিকে

চারু আশ্চর্য হইল, ব্যথিত হইল এই ভাবিয়া যে অমল এত সহজে বিবাহ করিতে রাজী হইল কি করিয়া, এত সহজে তাহাদের মধুর সম্বন্ধ ভুলিতে পারিল কি করিয়া, এবং তাহাকে একটি কথাও না বলিয়া একান্তভাবে চলিয়াই বা যাইতে পারিল কি করিয়া। 'নিজের হৃদয়-প্রাচুর্যের সহিত তুলনা করিয়া চারু অমলের শূন্য হৃদয়কে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্বেগ তপ্তশূলের মত তাহার অভিমানকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল।' চারু নিজে ভাবিয়াছিল, অমল চলিয়া যাওয়ার আগে তাহাদের এই ব্যবধান সে নিজেই ঘুচাইয়া ফেলিবে, কিন্তু 'বিদায় দিবার সময় চারুর মুখে কোনও কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল, চিঠি লিখ্‌বে ত অমল? অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল—চারু ছুটিয়া গিয়া শয়নঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।' তারপর আরম্ভ হইল দিনের পর দিন নীরব ক্রন্দন। 'অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে। * * * এ মরুভূমির কথা সে কিছুই জানিত না।' * * * 'অবশেষে চারু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল—নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করায় ক্লান্ত হইল—হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল। ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব।'

"গৃহকার্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত—অমল, অমল, অমল! সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত—বৌঠান, কি বৌঠান! চারু সিক্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিত—অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন? আমি তো কোনও দোষ করি নাই! তুমি যদি ভাল মুখে বিদায় লইয়া যাইতে, তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না। অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত, চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত, অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই! একদিনও না, এক দণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠপদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।

"এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃপুরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামীর বা পৃথিবীর আর কাহারও কোনও অধিকার রহিল না। * * * তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে, এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশখানা আবার মুখে দিয়' পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

"এই রূপে মনের সহিত দ্বন্দ্ববিবাদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার শান্তিলাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে লাগিল। * * *"

কিন্তু বৃথাই চারুর এই চেষ্টা, বৃথাই এই সাধন-যোগ। এবং বৃথাই ভূপতির নানা উপায়ে নানা চেষ্টায় চারুকে অন্তরের মধ্যে একান্ত আপন করিয়া ধরিবার। মনের সঙ্গে লুকোচুরি করিয়া তাহার দিন কাটিয়া যায়। কিন্তু একদিন ভূপতি জানিল, সমস্ত বুদ্ধি ও চৈতন্য দিয়া বুঝিল, তাহার নীড় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর তাহা জোড়া লাগিবে না। 'সংসার একেবারে তাহার কাছে শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।' কিন্তু সে কিছু বলিল না, কোলাহল করিল না, শুধু বুঝিতে চেষ্টা করিল। চারু আর একবার শেষ চেষ্টা হয়ত করিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝিল, নষ্টনীড় আবার গড়িয়া তোলার চেষ্টা বৃথা।

গল্পটির কাঠামো অত্যন্ত শুষ্ক ও নীরস করিয়া উপরে বিবৃত করা হইল। যে সুচারু ও সুনিপুণ ঘটনা-সংস্থান এই অত্যন্ত সুকুমার, অসামাজিক ও অপ্রত্যাশিত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে, যে সুকোমল হৃদয়বৃত্তির বিকাশ এই গল্পটির উপজীব্য তাহার পরিচয় এই বিবৃতির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। তবু, এই বিকাশের মূলে যে-যুক্তি আছে, তাহাকে এই নীরস সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মধ্যে হয়ত ধরা যাইতে পারে। লেখক নিজের সুগভীর সহানুভূতির দ্বারা অন্তরের মধ্যে এই গল্পের যাহা অন্তর্নিহিত সত্য তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও জানেন, অমল ও চারুর মধ্যে যে সুকুমার সম্বন্ধ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া শেষ পর্যন্ত চারু ও ভূপতির নীড় নষ্ট করিয়া দিল তাহা অসামাজিক, তাহা আমাদের চিরাচরিত সামাজিক সংস্কারকে আহত করে, প্রেমবিকাশের এই পরিবেশ আমাদের সামাজিক বুদ্ধি স্বীকার করে না। ভূপতি যেদিন আবিষ্কার করিল, তাহার নীড় চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেদিন তাহার দুঃখ যে কত গভীর তাহাও লেখক জানেন, কিন্তু এই সত্যকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না যে, ঘটনার যে পৌর্বাপর্যের ভিতর দিয়া অমল ও চারুর বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, তাহাতে এই প্রেম-বিকাশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, শুধু স্বাভাবিক নয়, বাস্তব জীবনে তাহা নিয়তই ঘটিয়া থাকে। লেখক ঘটনার পর ঘটনা, পরিবেশের পর পরিবেশ যেমন করিয়া সাজাইয়াছেন তাহাতে পাঠকের চিত্তেও লেখকের উপলব্ধ সত্য শুধু যে নিকটতর হয় এমন নয়, সে-সত্যকে সে স্বীকার না করিয়া পারে না। কারণ, ঘটনা ও পরিবেশ লেখক যেমন করিয়া বিন্যাস করিয়াছেন তাহাতে তাহারা শুধু ঘটনা ও পরিবেশ মাত্র থাকে নাই, তাহারা হইয়া উঠিয়াছে একটি সুসম্বদ্ধ যুক্তিমালা। এই দিক দিয়া গল্পটির কলাকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না; এবং এই ধরনের সমস্যামূলক গল্পে ও উপন্যাসে এই কলাকৌশলই প্রধান বস্তু যাহার বলে সমস্যাগত সত্য সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়। সমস্যাগত সত্যকে তর্ক করিয়া কবি অথবা লেখক যখন পাঠকচিত্তের নিকটতর করিতে চাহেন তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য; আমাদের সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু ঘটনা ও পরিবেশ এমন সুচারু, সুনিপুণভাবে বিন্যাস করা যাইতে পারে যাহার ফলে সমস্যার অন্তর্নিহিত সত্য যুক্তি-শৃঙ্খলায় মীমাংসিত সত্যের রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যেমন হইয়াছে 'নষ্টনীড়ে'; তখন আমাদের সমাজবুদ্ধি ও সংস্কার আহত হইলেও সত্যকে আর অস্বীকার করিতে পারি না, চারু অথবা অমল কাহাকেও সমর্থন করিতে না পারিলেও তাহাদের সম্বন্ধকে অস্বাভাবিক বলিতে পারি না, সমাজ স্বীকার না করিলেও মন সমস্তই স্বীকার করিয়া লয়। তখন আমরা চারু অথবা ভূপতি কাহারও দুঃখেই ব্যথিত না হইয়া পারি না, কে কতটুকু দায়ী সে বিচার তখন একান্ত অবান্তর। এবং, সমাজনীতি কতটা পীড়িত হইয়াছে বা হয় নাই, তাহাও অবান্তর।

'নষ্টনীড়' গল্পটি উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের ক্রম-পরিবর্তনও লক্ষ্য করিবার। কি কাব্য রচনায়, কি গল্প-উপন্যাস রচনায়, এপর্যন্ত সর্বত্রই আমরা দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনা আমাদের চিরাচরিত সংস্কার, শতাব্দী-সঞ্চারিত ধ্যান-ধারণা, ধর্ম ও সমাজবোধ, এমন কি প্রচলিত সৌন্দর্যবোধকেও খুব অতিক্রম করিয়া যায় নাই। এসব সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন এপর্যন্ত কবির মনে জাগে নাই। এক কথায় তিনি আমাদের সংস্কার ও পরিবেশ, ঐতিহ্য ও আবেষ্টন, সমাজ ও রাষ্ট্র সব কিছু স্বীকার করিয়া লইয়াই এযাবৎ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু, এই স্বীকৃতি সজ্ঞান স্বীকৃতি নয়, কার্যকারণ

বিচারলব্ধ নয়, একান্তই সহজ সংস্কারগত। এই সহজ সংস্কারই বহুদিন তাঁহার সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলে প্রেরণা জোগাইয়াছে, বিশেষ করিয়া কাব্যে ও ছোটগল্পে। কিন্তু সহজ প্রেম ও সৌন্দর্যতন্ময়, গীতিমাধুর্যময় জীবনে একদিন প্রশ্ন ও সংশয়ের দ্বিধা জাগিল, "কল্পনা" গ্রন্থ-হইতেই তাহার সূচনা লক্ষ্য করা যায়; গভীর মহাজীবনের ইঙ্গিত "নৈবেদ্য-খেয়া" পর্যায়ে সুপরিস্ফুট। একদিকে এই নবজাগ্রত দ্বিধা সংশয় যেমন তাঁহাকে জীবনের গভীরতার দিকে আহ্বান করিতেছে, অন্যদিকে এই দ্বিধা সংশয়ই তাঁহাকে আমাদের সামাজিক সংস্কার ও ঐতিহ্যের কার্যকারণ সম্বন্ধের মূল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত করিতেছে। তাহার প্রথম পরিচয় আমরা পাইলাম 'নষ্টনীড়' গল্পে। এই গল্পেই আমরা প্রথম সুস্পষ্ট আভাস পাইলাম একান্ত ভাবধর্মী রবীন্দ্র-কবিচিত্তে যুক্তিধর্মের স্পর্শ লাগিয়াছে। কাব্য এবং ছোট গল্পেও ইহার বিকাশ আমরা দেখিব আরও অনেক পরে,—"বলাকা"য়, "পলাতকা"য়, "স্ত্রীর পত্র", "পাত্র ও পাত্রী", "পয়লা নম্বর", "নামঞ্জুর" প্রভৃতি গল্পে, "চতুরঙ্গ" "ঘরে বাইরে" প্রভৃতি উপন্যাসে। এই সব কাব্য, গল্প ও উপন্যাসে লেখকের যে সমাজবোধ ও বুদ্ধি আমরা প্রত্যক্ষ করি, সমাজ-সত্তা সম্বন্ধে যে চেতনা লেখকের এই সাহিত্য-সৃষ্টিকে নূতন ভাব ও দৃষ্টি দান করিল, বাংলা সাহিত্যে এই সামাজিকচেতনা, কার্যকারণ জ্ঞানলব্ধ সমাজবোধ ও বুদ্ধি আমরা এতকাল লক্ষ্য করি নাই। এই নূতন ভঙ্গি ও দৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক জগতের সীমার মধ্যে আনিয়া পৌঁছাইয়াছে; এবং ইহার বলেই তিনি আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সামাজিক চেতনা, কার্যকারণ-জ্ঞানলব্ধ সমাজবোধ রবীন্দ্রনাথের মনে হঠাৎ জাগে নাই।

বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকের শেষাশেষি হইতেই বাংলা দেশে একটা নবজীবনের সাড়া জাগিতেছিল, বাঙালী জীবনে শতাব্দী ধরিয়া যে গ্লানি ও অপমান, যে দুঃসহ বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল তাহা একদিন বঙ্গচ্ছেদের নির্মম আদেশকে উপলক্ষ করিয়া দেশের উপর ভাঙিয়া পড়িল—এক মুহূর্তে দেশের মূর্তি বদলাইয়া গেল। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র সর্ববিষয়ে যেন দেশ সচেতন হইয়া উঠিল, একটা প্রবল ভাবোন্মাদনায় দেশ মাতিয়া উঠিল, এবং সে-উন্মাদনা ভাষা পাইল রবীন্দ্রনাথের গানে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়। বাংলা দেশের সেই কয় বৎসরের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই একথা বলিবেন, রবীন্দ্রনাথই ছিলেন এই স্বদেশী-যজ্ঞের উদ্গাতা। এই সময়কার রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদির বিষয় হইতেছে আমাদের শিক্ষা, আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের জীবনাদর্শ। অর্থাৎ আমাদের স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধ জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি একেবারে তাহাদের মর্মমূলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন, এবং তাহা হইতেই জাগিল প্রশ্ন, সংশয়, লাভ হইল কার্যকারণ বিচারসাপেক্ষ জ্ঞান। অথচ, আশ্চর্য এই, সঙ্গে সঙ্গে তখন লিখিতেছেন "খেয়া"-গ্রন্থের কবিতা।

"খেয়া"র কবি তাঁহার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিলেন "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি"তে। ইতিমধ্যে য়ুরোপে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গেল, কবি নোবেল পুরস্কার পাইলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইল, মহাযুদ্ধ-পরবর্তী য়ুরোপের নূতন সামাজিক চেতনা তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। বাহিরের জগতে ও জীবনে একটা মহাপরিবর্তন এই কয় বৎসরের মধ্যে সাধিত হইয়া গেল। কবিচিত্তে কি তাহার স্পর্শ লাগিল না? বোধ হয় ভাল করিয়াই

লাগিল, গভীর ভাবেই লাগিল। তাহার ফলেই ত আমরা পাইলাম "বলাকা", "পলাতকা", পাইলাম "চতুরঙ্গ", "ঘরে বাইরে"; পাইলাম "স্ত্রীর পত্র", "পাত্র ও পাত্রী", "পয়লা নম্বর" প্রভৃতি গল্প।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি পত্রাকারেই লিখিত, স্বামীর নিকট স্ত্রীর পত্র। আমাদের সমাজে নারীর কোনও মূল্য ছিল না এ কথা বলা চলে না; কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে, মা হিসাবে নারীর প্রতি একটি রোম্যান্টিক দৃষ্টি ও তজ্জনিত প্রীতি এবং শ্রদ্ধাও ছিল, কিন্তু পারিবারিক সম্পর্ক নিরপেক্ষ নারী হিসাবে নারীর মূল্য কিছুই ছিল না; শুধু আমাদের দেশে নয়, কোনও দেশেই ছিল না। এই নারীর মূল্য অপেক্ষাকৃত বর্তমান যুগের আবিষ্কার, আর্থিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফল। য়ুরোপে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশে এই ফল, এই আবিষ্কারের সূচনা দেখা দিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই, কিন্তু তাহার প্রকাশ দেখা গেল সে-শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে এবং পূর্ণতার বিকাশ আমরা দেখিলাম (প্রথম) মহাযুদ্ধের পর। সে ঢেউ যে আমাদের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রতটে আসিয়া লাগিল তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল 'স্ত্রীর পত্রে'।

'স্ত্রীর পত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল "সবুজপত্র" মাসিক-পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩২১)। আমাদের পুরাতন জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে "বলাকা"র কবিতায় যে-বিদ্রোহ ধ্বনিত হইতেছিল, তাহারই সুর ধরা পড়িল এই গল্পেও। নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের আভাস 'হৈমন্তী' গল্পেও আছে, কিন্তু 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে 'স্বামিচরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন' মৃণাল স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিল,

"আমি তোমাদের মেজ বৌ। আজ পনের বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেচি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। * * * [বিন্দুর] ভালবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম, যা আমি জীবনে আর কোনও দিন দেখিনি! সেই আমার মুক্তস্বরূপ। * * * আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেচি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েচি। আমার আর দরকার নেই। * * * [বিন্দুর] উপরে তোমাদের যত জোরই থাক না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানব জন্মের চেয়ে বড়। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভা'য়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়, সেখানে সে অনন্ত। তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র। আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ। তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমায় দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার জায়গা নেই। আমার এই অনাবৃত রূপ যাঁর চোখে ভাল লেগেছে, সেই সুন্দর আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখচেন। এইবার মরেচে মেজ-বৌ। * * * আমিও বাঁচবো। আমি বাঁচলুম।"

কোথায় গেল সেই সুকুমার গীতিমাধুর্য, ভাব-কল্পনার লীলা যাহা ছিল রবীন্দ্র-ছোটগল্পের প্রাণ? এ যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণজর্জরিত জীবনসমস্যা, এ যে তীব্র কণ্টকিত আঘাত; এ যে চিন্তাবৃন্তের মূল ধরিয়া টান, সমাজ-ব্যবস্থার মূল সম্বন্ধে শুধু প্রশ্নমাত্র নয়, তাহাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা! 'নষ্টনীড়' গল্পের কলাকৌশলের নিপুণতা 'স্ত্রীর পত্রে' নাই। মৃণালের বক্তব্য এক পক্ষীয়, যুক্তি-শৃঙ্খলাও তেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু যুক্তি-শৃঙ্খলার অভাব পূরণ করিয়াছে জীবন-সমস্যার সত্য,

এবং মৃণালের নারী-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের বিকাশ যে-ভাবে হইয়াছে তাহাতে ঢাকা পড়িয়াছে গল্পটির আদর্শ প্রচারের ভঙ্গি।

'স্ত্রীর পত্রে'র বিদ্রূপবাণ ব্যর্থ যায় নাই। প্রমাণ, "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের 'মৃণালের পত্র' এবং ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'স্বামীর পত্র' নামক দুই প্রতিবাদ। প্রমাণ, পরবর্তী যুগের সাহিত্যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর বিদ্রোহবাণী।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণাল নারীত্বের যে-মহিমা ঘোষণা করিল তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনি "পলাতকা"র 'মুক্তি' নামক কবিতায়; সেখানে বাইশ বৎসর বিবাহিত জীবন যাপনের পর দীর্ঘ অসুখের ছল করিয়া মৃত্যু যখন অবহেলিত একটি মেয়ের জীবনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তখন সেই মেয়েটির হেলাফেলার জীবনে প্রথম বসন্ত দেখা দিল, নারীত্বের পরিপূর্ণ মহিমার আভাস যেন সে পাইল :

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দ আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।

* * * *

তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণে ধুলায় পড়ে থাক
মরণ বাসর ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু
হেলা আমায় করবেনা সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে-সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হেথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী!
দাও খুলে দাও দ্বার
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পেও এই একই কথা। মৃণাল নারীত্বের পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করিল বিন্দুর অবজ্ঞাত বঞ্চিত জীবন ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া, আর 'মুক্তি' কবিতার মেয়েটি সেই মহিমাকেই জানিল নিজেরই বঞ্চিত জীবনের শেষ অধ্যায়ে মৃত্যু-দূতের আহ্বান পাইয়া। নারীত্বের প্রতি আমাদের রোম্যান্টিক প্রেম ও শ্রদ্ধার অন্তরালে যে বৃহৎ বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা আত্মগোপন করিয়া আছে, 'স্ত্রীর পত্র' গল্প ও 'মুক্তি' কবিতা আমাদের সেই সামাজিক প্রবঞ্চনাকে গোপনতা হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে।

'পয়লা নম্বর' (১৩২৪) গল্পটি আপাত-দৃষ্টিতে দাম্পত্য-সম্বন্ধের বিশ্লেষণ চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু ইহার আর একটি গভীরতার দিক আছে, সেটি ইহার সামাজিক চেতনার দিক। অদ্বৈতচরণ একাগ্র জ্ঞানান্বেষী চিন্তাবিলাসী যুবক, সংসারানভিজ্ঞ ও অন্যমনস্কচিত্ত। সে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিজের বন্ধুমণ্ডলীর

পরিবেশের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত। সে জগতের মধ্যে তাহার স্ত্রী অনিলার কোনও স্থান ছিল না, এবং অদ্বৈতচরণও নিশ্চিন্ত ছিল এই ভাবিয়া যে পুরোহিতের কাছ হইতে যখন একজনকে স্ত্রী বলিয়া পাওয়া গিয়াছে তখন সে নিশ্চয়ই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। ইহার চেয়ে স্ত্রী সম্বন্ধে বেশি কিছু ভাবিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অনিলার হৃদয় ছিল, এবং সে হৃদয় সজীব পদার্থ। এই সজীব পদার্থটির জগৎ ক্ষুদ্র হইলেও সেখানে ঘাত-প্রতিঘাতের অভাব ছিল না, এবং সেই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া একটি ক্ষুব্ধ নারী হৃদয় গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল। অদ্বৈতচরণ তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই; বুঝিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। এমন সময় সিতাংশুমৌলির আবির্ভাব, যে-সিতাংশুর হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য তাহার সাংসারিক ঐশ্বর্যের চেয়ে কম নয়। অদ্বৈতচরণ যাহা কখনও দেখে নাই বুঝে নাই, সিতাংশু তাহা দেখিল এবং বুঝিল; সে দেখিল অন্তরের দিক হইতে অনিলার বেদনা কত বড়, কত গভীর। সিতাংশুর সমস্ত হৃদয় নিংড়াইয়া এই কথা উচ্চারিত হইল—

'আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু দেখবার মত দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটলো। চোখের উপর ঘুমের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুইয়ে দিয়েছ। আজ আমি নব জাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম, যে-তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার আমি তা পেয়েছি, আর কিছু চাইনে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই।"

এই স্তব শুনাইয়া অনিলার চিত্ত সে জয় করিল, অনিলার নিকট হইতে কোনও সাড়া সে পাইল না, কিন্তু তাহার বিদ্রোহ-ধূমায়িত হৃদয়ে আগুন ধরাইয়া তাহাকে সে গৃহছাড়া করিল। অনিলা অদ্বৈতর গৃহ ছাড়িল, সিতাংশুর গৃহেও গেল না। জ্ঞানগর্বিত অদ্বৈতচরণ প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইবার পর ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে দেখিতে চেষ্টা করিল। 'যুগ যুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে টিঁকে রয়েছে এমন সব জিনিসকে আমি কি চিনতে শিখিনি?'

"কিন্তু হঠাৎ দেখলুম এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের জ্ঞানীটা মূর্ছিত হয়ে পড়লো, আর কোন আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগলো।"

এ যেন "চতুরঙ্গ"-গ্রন্থের সেই 'আদিম জন্তুটা'! তারপর রেশমের লাল ফিতায় বাঁধা সিতাংশুর লেখা চিঠির তাড়া যখন পড়া শেষ হইল তখন সে নিজেকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল—

'সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পত্রের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখলুম। আমার চোখের উপরকার ঘুমের পর্দা কত মোটা পর্দা না জানি! পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি চেয়েছিলুম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিইনি। আমি আমার দ্বৈতদলকে এবং নব্যন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড় করে দেখেছি। সুতরাং যাকে আমি কোনদিনই দেখিনি, এক নিমেষের জন্যও পাইনি, তাকে আর কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কি বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করবো?"

কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, সেই আদিকালের প্রাণীটা এই প্রবোধে সান্ত্বনা মানিল কি? লেখকের রচনায় কার্যকারণ বিচারলব্ধ জ্ঞান জয়ী হইয়াছে, যুক্তিশৃঙ্খলা অনুসরণ করিয়া পাঠক অদ্বৈতচরণের আত্মপ্রবোধকে স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। কিন্তু আদিকালের প্রাণীটার ক্ষুধা নিবৃত্তি লাভ করিবে কি ?

গল্প হিসাবে 'পাত্র ও পাত্রী' (১৩২৪) খুব সার্থক রচনা নয়। আমাদের সমাজে

বিবাহ ব্যাপারে পুরুষ নারীর প্রতি কিরূপ নির্মম ও অপৌরুষেয় ব্যবহার করিয়া থাকে, মানবিকতার দাবি ও যুক্তিকে কি নির্দয়ভাবে পীড়িত করিয়া থাকে তাহারই কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তে গল্পটি গাঁথা। তাহাদের মধ্যে রস ও রূপবন্ধনের কোনও নিবিড় ঐক্য নাই। কিন্তু কলাকৌশলের কথা ছাড়িয়া দিলে গল্পটির মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে-সমস্ত সুগভীর মন্তব্য আছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যে-দীপ্তি আছে, যে-সামাজিক চেতনার পরিচয় আছে তাহা কোনও পাঠকেরই দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দুঃখ ও ত্যাগের, বিপদ ও লাঞ্ছনার, কলহ ও কোলাহলের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কত যে ফাঁকি, কত যে আত্মবঞ্চনা, কত যে ক্ষুদ্র মন প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহার খানিক পরিচয় পাওয়া যায় 'নামঞ্জুর গল্পে' (১৩৩২)। অমিয়ার দেশসেবার মধ্যে প্রচ্ছন্ন খ্যাতির লোভ এবং দশজনের সকামপ্রশংস-দৃষ্টির মোহ তাহাকে গৃহে সত্যকার ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক পীড়িত ভাইয়ের সেবার কথা ভুলাইয়া তাহাকে টানিয়া লইয়াছে জনসংঘের মাদকতার মধ্যে, অসহায় নারীত্বের কর্তৃত্বের আত্মতৃপ্তির মধ্যে। গৃহে রুগ্ন ভ্রাতা, বাহিরে সে অসংখ্য দেশভ্রাতার মধ্যে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে মত্ত; গৃহে যে নিঃসহায় ভীরু নারী ভীত কম্পিত হৃদয় লইয়া পীড়িত ভ্রাতার সেবায় উন্মুখ তাহার প্রতি সে ঈর্ষান্বিত, বাহিরে সে অসহায় নারীর জন্য আশ্রম পরিকল্পনায় ব্যস্ত। যে স্বদেশ-সমাজ-কর্মবিলাসী অনিল অমিয়ার সহকর্মী সে অমিয়ার প্রেমানুরাগী এবং তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু যখনই সে শুনিল অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত তখন কোথায় গেল তাহার প্রেম, কোথায় তাহার দেশ ও সমাজ-ধর্ম। এ সবের মধ্যে যে ফাঁকি, যে বিরাট আত্ম-প্রবঞ্চনা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহা কল-কোলাহলের মধ্যে সহজে আমাদের চোখে পড়ে না, হৃদয়কে স্পর্শ ও বুদ্ধিকে জাগ্রত করে না। কিন্তু লেখক আমাদের হৃদয়কে আবেগে পীড়িত না করিয়াও তাঁহার বুদ্ধির ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায় ঘটনা-পর্যায় এমন সুনিপুণ ভাবে বিন্যাস করিয়াছেন, চরিত্রগুলি এমন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, ঘটনা ও চরিত্র মিলিয়া হইয়া উঠিয়াছে একটি যুক্তি-শৃঙ্খলা। এবং তাহার ফলে হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়াও 'নামঞ্জুর' গল্প আমাদের বুদ্ধিকে চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

'নামঞ্জুর'-গল্পের চার বৎসর পর, ১৩৩৬র বর্ষাকালে—বোধ হয় শ্রাবণ মাসে—রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রকর' নামে একটি গল্প রচনা করেন; ঐ বৎসরের কার্তিকের "প্রবাসী"তে তাহা ছাপা হয়, এবং পরে "গল্পগুচ্ছে"র দ্বিতীয় সংস্করণের তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। গল্পটি আলোচনা করিবার মতন কিছু নয়। অতি সুপরিচিত প্রেম ও আদর্শবাদ সমন্বিত রোম্যান্টিক্ কল্পঐতিহ্যময় একটি কাহিনী অতি সাধারণ ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত। রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্যুতি এই গল্পটিতে অনুপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ ইহার পর বহুদিন আর কোনও উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প রচনা করেন নাই, এবং করেন নাই বলিয়া দুঃখ করিবারও কিছু নাই। যে-প্রসার ও বৈচিত্র্য আমরা তাঁহার ছোট গল্পের মধ্যে দেখিয়াছি তাহার তুলনা নাই। আমাদের পুরাতন সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা, তাহাদের আবেষ্টন ও পরিবেশের মধ্যে যাহা কিছু রূপ, রস ও গন্ধ তাহা তিনি সর্ব অঙ্গে মনে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার সমস্ত রসমাধুর্য নিঃশেষে তাঁহার বিচিত্র গল্পরাজির মধ্যে পরিবেশন করিয়াছেন।' বাংলা দেশের পুরাতন প্রচলিত জীবনধারার যত কিছু দুঃখ ও বেদনা, যত কিছু সৌন্দর্য-মাধুর্য সমস্তই তাঁহার স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টি ও অনুভূতির

মধ্যে ধরা দিয়াছে, এবং অপূর্ব সহৃদয়তায় তিনি তাহা রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সেইখানেই তাঁর সৃষ্টিপ্রচেষ্টা নিঃশেষ হইয়া যায় নাই।

যে নূতন জীবনধারা, যে নূতন ভাব ও চিন্তা-জগৎ আমাদের প্রাচীন জীবনধারা, ভাব ও চিন্তা-জগতের তটে আসিয়া আঘাত করিতেছে এবং যে অভিনব ভাব ও চিন্তা-সম্পদের সৃষ্টি করিতেছে রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সের ক্ষীয়মাণ শক্তির মধ্যে তাহাও অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অনুভূতিকে তাহা স্পর্শ করিয়াছে, এবং সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে। একান্তভাবধর্মী বাংলা সাহিত্য যে আজ যুক্তি ও চিন্তাধর্মের সঙ্গে সমন্বয় অন্বেষণ করিতেছে, তাহার ইঙ্গিত ত রবীন্দ্রনাথই আমাদের দিয়া গিয়াছেন, এবং সে-ইঙ্গিত তাঁহার ছোট গল্পের মধ্যেও সুস্পষ্ট। তিনি কবির দিব্যদৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন, এই নূতন ভাবসম্পদকে আশ্রয় করিয়া, এই নূতন সমাজ-চেতনা ও জীবন-সমস্যাকে ঘিরিয়াই নবযুগের নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে, আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করিবে; বুদ্ধির স্তরের ভিতর দিয়া দুর্গম যাত্রা অতিক্রম করিয়া ইহারাই একদিন অন্তরের মাধুর্যরসের সন্ধান লাভ করিবে। এই সব নূতন ভাবসম্পদ, নূতন সমাজ-চেতনা নূতন জীবন-সমস্যা ইহারাই একদিন বাংলা ছোট গল্প ও উপন্যাসের উপজীব্য হইবে, রবীন্দ্রনাথই সে-আভাস আমাদের দিয়াছেন।

আজিকার বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও উপন্যাসে সে-আভাস স্পষ্টতর হইতেছে, সুখের কথা সন্দেহ নাই, না হওয়াই অস্বাভাবিক। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ সুনিবিড়। বাংলা দেশে সেই জীবনের তটে আজ বিশ্বজীবনের উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া নিরন্তর আঘাত করিতেছে। বাঙালী জীবনে, ভারতীয় জীবনে কর্মধারা চিন্তাধারার মধ্যে বিপুল আবর্তন পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবেই। রবীন্দ্রনাথ যে নূতন সাহিত্যের নূতন জীবনের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অঙ্কুরোদ্গম আমরা দেখিতেছি, কিন্তু সেই অঙ্কুর কবে বৃক্ষে পরিণত হইবে, এবং সে বৃক্ষে কবে আমরা পরিণত ফল প্রত্যক্ষ করিব তাহা নির্ভর করিতেছে আধুনিক সাহিত্য-স্রষ্টাদের বুদ্ধির উপর, সমাজচৈতন্যের উপর, অন্তর্দৃষ্টি ও সৃজন-প্রতিভার উপর।

পাঁচ

রবীন্দ্র-গল্পরচনার পর্ব ইতিপূর্বেই তাঁহার সমস্ত সম্ভাবনা প্রায় নিঃশেষ করিয়াছিল। তবু, বহুদিন, প্রায় দশবৎসর পর ১৩৪৬—৪৭এ রবীন্দ্রনাথ আরও তিনটি গল্পরচনা করেন,—'রবিবার', 'শেষ কথা' ও 'ল্যাবরেটরি'—এবং পর পর তাহা "আনন্দ বাজারে"র বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৪৭'র পৌষমাসে গল্প তিনটি একসঙ্গে গাঁথিয়া "তিনসঙ্গী" নামে প্রকাশ করা হয়। বস্তুত সুদীর্ঘ দশ বৎসর পর, এই তিনটিই তাঁহার সার্থক গল্প রচনা, এবং ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছোট গল্পসৃষ্টির পর্ব সমাপ্ত। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এই তিনটি গল্পই তাঁহার শেষ দান।

এই দশ বারো বৎসরে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিবর্তন লক্ষণীয়। "তিনসঙ্গী"তে "গল্পগুচ্ছে"র রবীন্দ্রনাথকে খুঁজিতে গেলে মূঢ়তাই প্রকাশ পাইবে। এমন কি 'পয়লা নম্বর—পাত্র ও পাত্রী—নামঞ্জুর' গল্পগুলির লেখকও "তিন-সঙ্গী"তে অনিবার্য বিবর্তন লাভ করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে "যোগাযোগ-শেষের কবিতা-দুই বোন-মালঞ্চ-চার অধ্যায়ে" গল্প বলার ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি এক নূতনতর রূপায়তন সৃষ্টি করিয়াছে, মননে ও ভাবকল্পনায় সমাজ-বস্তুর নূতনতর অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হইয়াছে। কবিতায় গদ্যের যে দৃঢ় কঠোর সংহত রূপ, যে আবেশহীন সহজ সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত রূপ, এবং তাহাব পশ্চাতে যে বোধ ও বুদ্ধি ক্রিয়াশীল তাহাও বহুদিন অভ্যস্ত হইয়াছে, "পুনশ্চ-শেষসপ্তক-শ্যামলী"র কবিজীবন তাহার প্রভাব-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে মনন-কল্পনা ও বাক্‌ভঙ্গির মধ্যে। পুরাতন নাটকের বিষয়বস্তু লইয়া প্রত্যক্ষ, শাণিত এবং বৈদ্যুতিক বাক্‌ভঙ্গিসমন্বিত যে নূতন এক নাট্যরূপ "পরিত্রাণ-তপতী-তাসেব দেশ-বাঁশরীতে" গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাহাও বহুদিন অভ্যস্ত হইয়াছে। এই সব বহু অভ্যাসেব মধ্যে ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গিব ক্রমবিবর্তনও সুস্পষ্ট। চলিত ভাষা ত "ঘরে বাইরে-স্ত্রীর পত্র" হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সেই ভাষাই ক্রমশ আর দৃঢ, কঠিন ও সংক্ষিপ্ত, সংহত রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ কবিল। প্রথম দিকে, এমন কি, "যোগাযোগ" এবং "শেষের কবিতা"তেও লালিত্য ও সাবলীলতাব দিকে ঝোঁক সুস্পষ্ট, কিন্তু "মালঞ্চ-চার অধ্যায়ে", "তপতী-বাঁশরী"তে, এমনকি "পুনশ্চ শ্যামলী"তেও এই লালিত্য ও সাবলীলতা খসিয়া পড়িয়াছে, ভাষা দৃঢতা ও সংহতির দিকে ঝুঁকিতেছে। যে বাক্‌ভঙ্গি ছিল মধুর ও লীলায়িত, রূপকে-প্রতীকে আচ্ছন্ন, আবেগে আবেশে কম্পমান ও লীলায়িত, এমন কি স্থানে স্থানে শিথিল, সেই বাক্‌ভঙ্গি ক্রমশ যে-রূপ লইতে আরম্ভ করিল তাহা প্রত্যক্ষ, শাণিত বিদ্যুৎঝলকিত, ভাবে ও ব্যঞ্জনায়, অর্থে ও ধ্বনিতে সুস্পষ্ট ও সবল। "যোগাযোগ-শেষের কবিতা"তেই এ ঝোঁক স্পষ্ট হইল, উপমা ও এপিগ্রামে ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি বিদ্যুৎদ্যুতিময় হইয়া উঠিল। "বাঁশরী" নাটকে, শেষ তিনটি উপন্যাসে ভাষা ও বাকভঙ্গির এই দ্যুতি ব্যঙ্গে পরিহাসে বক্রোক্তিতে একই সঙ্গে লঘু ও তবল, শাণিত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 'গদ্য'-কবিতাগুলিতেও মাঝে মাঝে এই বৈশিষ্ট্য ধবা পড়ে, কিন্তু বিশেষ ভাবে পড়ে এই যুগেব নাটকে ও উপন্যাসে। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যের, গভীর অর্থপূর্ণ বাক্যেব অভাব নাই, কিন্তু সেই সব বাক্য ও মন্তব্যের অর্থাপেক্ষা তাহাদের বাক্‌ভঙ্গিই পাঠকের মন ও দৃষ্টি কাড়িয়া লয়, বলিবাব ভঙ্গি যেন অর্থকে ছাপাইয়া ছাডাইযা যায়। দৃঢ় ও সংহত ভাষা এবং প্রত্যক্ষ ও শাণিত বাক্‌ভঙ্গি, ইহাই সুদীর্ঘ বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত সাব।

শুধু যে ভাষা এবং বাক্‌ভঙ্গিই বিবর্তিত হইয়াছে তাহাই নয়, মনন-কল্পনাও বিবর্তিত হইয়াছে। ভাষা দৃঢতা ও সংহতিব দিকে ঝুঁকিয়াছে দৃষ্টি ঐ দিকে ঝুঁকিয়াছে বলিয়া, বাক্‌ভঙ্গি শাণিত ও প্রত্যক্ষ হইয়াছে দৃষ্টি শাণিত ও প্রত্যক্ষ হইয়াছে বলিয়া। আগে বস্তু ও জীবনকে কবি দেখিতেন আবেগ আবেশেব দৃষ্টি দিয়া, সৃষ্টির সমগ্রতার মধ্যে, সুব ও রহস্যবিস্ময় ছিল সেই দৃষ্টির ধর্ম। এই সুর ও বিস্ময় 'নষ্টনীড়' ও 'স্ত্রীব পত্র'ব মতন গল্পেও উপস্থিত। পুর্বতন দৃষ্টিতে মানুষ ছিল বিশ্বপ্রকৃতিব অংশ, তাহার প্রেম, তাহাব দুঃখ ও বেদনা, সুখ ও আনন্দ, তাঁহাব দৈনন্দিন জীবন সমস্তই ছিল এক বৃহৎ জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শনের মধ্যে বিধৃত। সমসাময়িক মানুষ ও তাহাব সমাজের, দেশ-কালের বিশেষ সীমার মধ্যে বিশিষ্ট ইঙ্গিতময় যে বস্তুরূপ তাহার স্বীকৃতি এই দৃষ্টিব মধ্যে ততটা নাই। ভাল মন্দ'র কথা নয়, কিন্তু এখন তিনি বস্তু ও জীবনকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন আবেগ ও আবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সৃষ্টির সমগ্রতা হইতে বিচ্যুত করিয়া। মানুষ এখন আর ততটা বিশ্বপ্রকৃতির অংশ নয়, ততটা লেখকের জীবনাদর্শদ্বারা তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত নয়, এ দুই হইতে একেবারে মুক্তও হয়ত নয়, তবে চেষ্টাটা মুক্তির দিকেই। দেশে কালে

আবদ্ধ সমসাময়িক মানুষ ও তাহার প্রেম, তাহার দুঃখ ও বেদনা, তাহার সুখ ও আনন্দ সমস্তই লেখকের দৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়িতে চাহিতেছে বস্তুর কতকটা সাম্প্রতিক বাস্তব রূপে।

কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির এই বিবর্তন সহসা হয় নাই; অকারণেও হয় নাই। সহসা যে হয় নাই তাহা কতকটা ধরা পড়ে "শেষের কবিতা"তেই, কিন্তু দৃষ্টি তখনও রোম্যান্টিক ভাব কল্পনায়, সুরে ও আবেশে আচ্ছন্ন। প্রথম দিকে তাহা ধরা পড়িতে আরম্ভ করিল চিঠিপত্রে, নিবন্ধে, নানা বুদ্ধিমূলক আলোচনা প্রসঙ্গে। ধীরে ধীরে তাহা সঞ্চারিত হইল কাব্যে, বিশেষভাবে 'গদ্য'-কবিতায়, দু'একটি সামাজিক ও প্রতীকী নাট্যে, এবং অন্তত একটি বড় গল্প বা উপন্যাসে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িল "তিনসঙ্গী"র গল্প তিনটিতে। সুতরাং এই বিবর্তনের বিভিন্ন প্রকাশের বিভিন্ন স্তর মোটামুটি ধরিতে পারা কিছু কঠিন নয়। যাহা হউক, এই বিবর্তন সহসা যেমন হয় নাই, তেমনই অকারণেও হয় নাই। মোটামুটি বাংলা ১৩৩০ সাল হইতেই বাংলা কথাসাহিত্যে আমাদের দেশের সমসাময়িক মানুষ ও সমাজ জীবনকে তাহাদের কতকটা সাম্প্রতিক রূপে ধরিবার একটা চেষ্টা দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু তখন বহুদিন পর্যন্ত সে-চেষ্টা বুদ্ধির মধ্যে সকল ক্ষেত্রেই খুব সচেতন ছিল, এমন নয়। চিন্তা তখনও অপরিস্ফুট, ভাব-কল্পনা রোম্যান্টিকতায় আচ্ছন্ন, প্রকাশ অত্যন্ত এলোমেলো, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত ও বিপথগামী। রবীন্দ্রেতর অন্যান্য লেখকদের রচনায় তখন ইহা খুব স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িয়াছিল; সমসাময়িক সাহিত্যালোচনায় তাহা লইয়া বিতর্কও হইয়াছিল প্রচুর। যাহা হউক, সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সমস্যাগুলি যতই প্রকট হইতে আরম্ভ করিল, বিদেশী সাহিত্যেও যখন অন্যান্য দেশের মানুষের সাম্প্রতিক বস্তুরূপ যতই আমাদের চিত্তের নিকটতর হইতে আরম্ভ করিল ততই আমরা এ-বিষয়ে বেশি সজাগ হইতে আরম্ভ করিলাম। সাহিত্যেও ধীরে ধীরে তাহা রূপ লইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের অধিকাংশ লেখকই উচ্চ অথবা নিম্ন মধ্যবিত্তসমাজের লোক এবং তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, ভাবকল্পনার অভিজ্ঞতা এই সংকীর্ণ সমাজের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ, সেই হেতু এই সমাজের লোকদেরই জীবনযাত্রা এবং তাহার দ্বন্দ্ব-সমস্যা ইত্যাদি কতকটা সাম্প্রতিক বস্তুরূপে আমাদের লেখকদের চিত্তে ও তাঁহাদের মনন কল্পনায় ধরা পড়িল। দু'একক্ষেত্রে তাহা এই সংকীর্ণ সমাজগণ্ডির সীমা অতিক্রম করিয়াছে ও করিতেছে, কিন্তু মোটামুটিভাবে এখনও তাহার আশ্রয় নগরনির্ভর চাকুরীজীবী পরাশ্রয়ী উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ। রবীন্দ্রনাথও গল্পে-নাটকে-উপন্যাসে সেই সমাজের গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। নাটকে কোথাও কোথাও তাঁহার দৃষ্টি ও ভাবকল্পনা সংকীর্ণ সমাজাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর সমাজে বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে সাম্প্রতিক কালকে তিনি আশ্রয় করেন নাই, করিয়াছেন ভারত ইতিহাসের প্রাচীন কালকে, অথবা তাহারই কোনও প্রতীককে, যেমন "কালের যাত্রা"য়, "চণ্ডালিকা"য়। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সেক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, কিন্তু সে-দৃষ্টি একান্ত সাম্প্রতিক কাল ও একান্ত সাম্প্রতিক মানুষকে আশ্রয় করে নাই। বরং কবিতায়, বিশেষভাবে 'গদ্য'-কবিতায় বৃহত্তর সমাজের সাম্প্রতিক মানুষের বস্তুরূপ ধরা পড়ে আরও স্পষ্টভাবে, কিন্তু গীতি-কবিতায় মন ও জীবন বিশ্লেষণের কোনও সুযোগ নাই, এবং সেইহেতু মন ও জীবনগত দ্বন্দ্বগুলি পরিস্ফুট হইবার সুযোগও নাই। "তিনসঙ্গী"র গল্পগুলিতে লেখক সে-চেষ্টা করিয়াছেন; সাম্প্রতিক মানুষের বুদ্ধি ও

হৃদয়বৃত্তিতে বর্তমান সমাজ-জীবন যে দ্বন্দ্ব ও সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার বিশ্লেষণের এবং রসপরিণতি দানের একটা চেষ্টা লেখক করিয়াছেন। সে-চেষ্টা কতখানি সার্থক হইয়াছে বা হয় নাই, যে সংকীর্ণ সমাজ তাঁহার এই গল্পগুলির আশ্রয় সেই সমাজের সাম্প্রতিক বস্তুরূপ কতটা উদ্ঘাটিত হইয়াছে, কতটা আমাদের চিত্তের গোচর হইয়াছে বা হয় নাই যথাস্থানে তাহার আলোচনা অবান্তর হইবে না। ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ ও দর্শন এবং জীবন সংস্কারের সঙ্গে বর্তমান জীবন-চর্যার যে দ্বন্দ্ব তাহাও হয়ত এই গল্পগুলিতে রূপ পাইয়া থাকিবে; সে-প্রশ্নও অবান্তর নয়। বিশুদ্ধ রস-সৃষ্টির বাহিরে গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে সমসাময়িক কালের একটা দাবি থাকিতে বাধ্য; সমসাময়িক পাঠক-চিত্তে সমসাময়িক রচনার রসচেতনা কালের দাবি মেটানর অপেক্ষা রাখে, একথা একেবারে অস্বীকার করা চলে না।

'রবিবার' গল্পটির নায়ক অভীক একাধারে আর্টিস্ট ও যান্ত্রিক, কিন্তু গল্পে তাহার প্রকৃতির যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা প্রধানত আর্টিস্টের। ধর্মবিশ্বাসে সে নাস্তিক বলিয়াই নিজের পরিচয় দেয়, এই নাস্তিক নাস্তিক্যের খাঁটি সংজ্ঞায়। সে ধনী আচারনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণের সন্তান, কিন্তু আচার ও বিশ্বাসে মত-পার্থক্যের জন্য পিতার ত্যাজ্যপুত্র, এবং স্বেচ্ছায় দুঃখব্রতী। তাহার চিত্তে সকলপ্রকার গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যময় অস্বীকৃতি; সে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন, তাহার কথায়বার্তায় চলনবলনে শিল্পীমনের চোখ-ঝল্‌সান আলো ও অহংকার, তাহার কথা শুধু অর্থময় বাক্য নয়, কতকটা বাণীবিলাস; তাহার আকাঙ্ক্ষা, দুর্ধর্ষ শিল্পী হইবে সে, এবং বিশ্ববিজয়ী যশ কিনিয়া আনিবে লণ্ডন প্যারিসের বাজার হইতে—নিজের দেশে তাহার মূল্য বুঝিবার মত প্রতিভার অভাব। নায়িকা বিভার সঙ্গে যখন তাহার আলাপ কলেজের প্রথম ধাপের কাছে, তখন অভীকের বয়স আঠারো, 'তাহার চেহারায় নবযৌবনের তেজ ঝক্‌ঝক্ করছে।' বিভা পিতৃমাতৃহীনা, প্রভূত ধনের উত্তরাধিকারিণী, কিন্তু সে-ধন ট্রাস্টিদের মুঠোয়, বিভা শুধু মাসহারা পায়। বিভা অভীকের ছবি বুঝে না, প্রশংসাও করে না; অভীকের নাস্তিকতাও তাহার কাছে শ্রদ্ধেয় নয়; কিন্তু অভীকের পৌরুষ এবং আত্মবিশ্বাস, তাহার শিল্পী মনের অহংকার, তাহার বুদ্ধির দীপ্তি এবং গ্রাহ্যলেশহীন জীবনযাত্রা বিভাকে অভীকের অনুরাগিণী করিয়াছে, কিন্তু কোনওদিনই সে তাহার ভালবাসা সুস্পষ্টভাবে অভীককে জানায় নাই, অভীকের অনুরাগকে গভীরভাবে স্বীকার করে নাই, কিন্তু অভীকের বিবাহ-প্রস্তাবেও সে রাজী হয় নাই। অথচ সে যে তাহা করে নাই এবং পারে নাই তাহার জন্য অন্তরে বেদনারও অন্ত নাই। রূপে নয়, লাবণ্যে, বুদ্ধি ও শিক্ষায়, সংযমে ও আত্মত্যাগে বিভা যেন "শেষের কবিতা"র লাবণ্য, আর অভীক ঐ গ্রন্থেরই অমিত; সমস্যা, গল্পসংস্থানও প্রায় এক। যাহাই হউক, বিভা জানে অভীক সাধারণভাবে মেয়েদের ভালবাসে, সে ভালবাসা ও ভাল লাগা নাস্তিকের, তাহাতে বন্ধন নাই; কিন্তু তাহার খেয়ালখেলার দাবিও বিভা হাসিয়া বিনা দ্বিধায় মিটাইতে এতটুকু সংকোচ করে না। কিন্তু এত কিছুর পরেও এত কিছুর মধ্যেও বিভার শ্রদ্ধা ও আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র অন্যত্র—সে ব্যক্তিটি আর একটি শোভনলাল, তাহার নাম অমর বাবু। গণিতে তাহার অসামান্য প্রতিভা, সুযোগ পাইলে দ্বিতীয় রামানুজম হইতে পারেন। অমরবাবু দরিদ্র, তাহার সাহায্যের অছিলায় বিভা তাহার কাছে গণিতের পাঠ নেয়। সে শুনিয়াছে, অমরবাবু বিদেশে যাইবার জন্য ধীরে ধীরে টাকা সঞ্চয় করিতেছেন। বিভা আশা করে, অমরবাবুর গৌরব একদিন দেশেরই গৌরব

হইবে। সেই অমরবাবু পাইলেন কোপেনহেগেনে সর্বজাতির ম্যাথামেটিক্স কনফারেন্সে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে একতম প্রতিনিধিত্বের আমন্ত্রণ। কিন্তু পাথেয়ের অভাব। বিভা স্থির করিয়াছে নিজের গায়ের সঞ্চিত অলংকার বিক্রয় করিয়া এই পাথেয় সে সংগ্রহ করিয়া দিবে, সেই উপলক্ষে দিবে তাহার স্বদেশকে। অভীকের মনে লাগিল ধাক্কা; সেই ধাক্কায় সে জাগিয়া উঠিল; বুঝিল বিভার স্বরূপ। কিন্তু বিভা গায়ের অলংকার বেচিয়া সেই অর্থ সংগ্রহ করিবে, এই অশিল্পীজনোচিত প্রস্তাব সে সহ্য করিতে পারিল না। নিজেই এক 'ক্রিমিন্যাল পুণ্যকর্মে' সংগ্রহ করিল পাঁচ হাজার টাকা এবং সেই টাকা আনিয়া ধরিল বিভার সম্মুখে অমরবাবুর জন্য। তারপর এক ফাঁকে বিভার গলার হারখানি স্মরণচিহ্ন রূপে চুরি করিয়া লইয়া জাহাজের স্টোকার হইয়া চলিল বিলাতে, বিভার অজ্ঞাতে। তারপর বিভার দিনগুলো যাইতে লাগিল 'পাঁজর-ভেঙে-দেওয়া বোঝার মতন।' 'ওর মন কেবলি বলতে লাগিল, রাগ কোরো না, ফিরে এস, আমি তোমাকে আর দুঃখ দেব না। অভীকের সমস্ত ছেলেমানুষি, ওর অবিবেচনা, ওর আবদার, যতই মনে পড়তে লাগল, ততই জল পড়তে লাগল ওর দুই চক্ষু বেয়ে, কেবলি নিজেকে পাষাণী বলে ধিক্কার দিলে।' এখানেই গল্পের শেষ হইতে পারিত, কিন্তু এমন সময় আসিয়া পড়িল স্টীমারের ছাপমারা অভীকের সুদীর্ঘ এক পত্র। সে-পত্রে অভীকের আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মব্যাখ্যা, গল্প হিসাবে যাহার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অভীক-পরিচয় আগেই জানা হইয়া গিয়াছে, তবে যে অভীক-বিবর্তনটুকু বাকি ছিল সেটুকু আছে পত্রের শেষ প্যারাগ্রাফে। এই বিবর্তন অভীকের নিজের নূতন স্বরূপ আবিষ্কার, বিভার কাছে একান্ত আত্মনিবেদন।

"বী, আমার মধুকরী, জগতে সবচেয়ে ভালবেসেছি তোমাকে। সেই ভালোবাসায় কোন একটা অসীম সত্য-ভূমিকা আছে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বলো তোমাদের ঈশ্বর, তা হলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্যে। আবার আমি ফিরব—তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস, সমস্ত চোখ বুজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে, তুমি তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ো তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়, যাতে বুদ্ধির বাধা নিয়ে তোমার সঙ্গে এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ আর কখনো না ঘটে। তোমার কাছ থেকে আজ দূরে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, যুক্তিতর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে আমাকে—আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।"

"শেষ কথা"-র নায়ক নবীনমাধব কৈশোরে ও তরুণ যৌবনে ছিল বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। সি-আই-ডি ও পুলিশের হাত এড়াইয়া সে পলাইয়া গিয়াছিল আমেরিকায়; সেইখানে দীক্ষা লইয়াছিল যন্ত্রবিদ্যায় ফোর্ডের কারখানায়। তারপর নয় বৎসর কাটিল খনি ও খনিজবিদ্যা শিখিতে এবং পরে য়ুরোপের নানা জায়গা নানা দেশ ঘুরিয়া দেশে আসিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছে এক দেশীয় রাজ্যের জিয়লজিক্যাল সার্ভের কর্মকর্তা হিসাবে। তরুণ যৌবনে মেয়েদের সম্বন্ধে নবীনমাধব ছিল অন্যমনস্ক, সে ছিল তখন বিপ্লবী, কর্মযোগী সন্ন্যাসী; বিদেশের সুদীর্ঘ প্রবাসেও সে নারী সম্বন্ধ লইয়া ভাবের কুহকে মনকে জমাট বাঁধিতে দেয় নাই। সে ছিল 'জন্ম-পাড়াগেঁয়ে'; মেয়েদের সম্বন্ধে তাহার 'সেকেলে সংকোচ' কিছুতেই ঘুচে নাই; তাহা ছাড়া তাহার স্বভাবটাই কড়া, ভাবালুতায় আর্দ্র-চিত্ত সে ছিল না, এবং যতদিন বিদেশে ছিল 'নিজেকে পাথরের সিন্দুক ক'রে তার মধ্যে নিজের সংকল্পকে' ধরিয়া রাখিয়াছিল। দেশে আসিয়া স্থিতি লাভ

করিয়াও সে বিবাহ করে নাই, বরং বিবাহ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া আসিয়াছে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে নিজের কর্মসাধনায় খনিজ ধনের সন্ধানে। সেইখানে ঘটিল অঘটন এবং সঙ্গে সঙ্গে গল্পের সূত্রপাত। একদিন সন্ধ্যার মুখে কাজের শেষে বাড়ি ফিরিবার পথে দেখিল একটি বাঙালী মেয়ে 'গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে একমনে লিখছে একটি ডায়রির খাতা নিয়ে! এক মুহূর্তে আমার কাছে প্রকাশ পেলে একটি অপূর্ব বিস্ময়।' 'যে আঘাতে মানুষের নিজের অজানা একটি অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কি করে! বরাবর জানি আমি পাহাড়ের মত খট্‌খটে নিরেট। ভিতর থেকে উছলে পড়লো ঝরনা।' বিজ্ঞানী নবীনমাধব নিজেকে আবিষ্কার কবিল, তাহার বিজ্ঞানী বুদ্ধিতে মেয়েটির অন্তর-রহস্যের আলোচনা জাগিয়া উঠিল, খুঁজিতে আরম্ভ করিল মেয়েটির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ। সহজেই জানিল, ভবতোষ নামে একটি ছেলের সঙ্গে অচিরার এক'সময় ছিল গভীর প্রণয়, বিবাহ সম্বন্ধ পাকাপাকি হইয়াছিল। তারপর ছেলেটি গেল বিলাতে আই-সি-এস-এ ঢুকিতে, অচিরার দাদামশায় সরলবুদ্ধি পণ্ডিত অধ্যাপক অনিলকুমার সরকারের অর্থানুকূল্যে। তারপর পরীক্ষায় পাশ করিয়া ছাপরায় অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াই বিবাহ কবিয়া বসিল ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ একজন মুরুব্বির মেয়েকে। 'লজ্জায় ক্ষোভে নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে মর্মাহত মেয়েটিকে নিয়ে' বৃদ্ধ সরলচিত্ত অধ্যাপক অন্তর্ধান করিলেন ছোটনাগপুরের জঙ্গলে এক বাংলোয়। ইতিহাস যেমন জানা হইল, তেমনই পরিচয়ও একদিন ঘটিয়া গেল এক অদ্ভুত উপায়ে। যাহাই হউক, অচিরার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল, সঙ্গে সঙ্গে সরলচিত্ত অধ্যাপকের সঙ্গেও। তারপর মাঝে মাঝে আহারের নিমন্ত্রণ আর Time-Space, বায়লজি, কোয়াণ্টাম্ থিয়রি, Behaviourism প্রসঙ্গের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে অচিরার সঙ্গে নবীনমাধবের পরিচয় ঘনীভূত হইতে লাগিল। কখনও হাস্যকৌতুকে, কখনও গভীর গম্ভীর আলাপনে, পরস্পর চিত্তবিশ্লেষণে নিজেদেব পারস্পরিক পবিচয় নিবিড় হইল। বিজ্ঞানীর নৈর্ব্যক্তিক সাধনায় আর প্রেমিকার নৈর্ব্যক্তিক প্রেম-তপস্যায় ধীরে ধীরে ব্যক্তির স্পর্শ লাগিতে আরম্ভ করিল, আদিম বলের অন্ধ প্রাণশক্তি ভিতরে ভিতবে উভয়কেই দুর্বল করিতে লাগিল। ব্যর্থপ্রেম মর্মাহত অচিরার ছিল অবাঙ্‌মানসগোচর নৈর্ব্যক্তিক প্রেম তপস্যা, নবীনমাধবের ছিল দীর্ঘকালের প্রয়াসে চিত্তশক্তিতে গড়িয়া-তোলা নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞান-সাধনা। অচিরা বুঝিল সে ক্রমশ নবীনমাধবের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, নবীনমাধবও অচিবার প্রতি, এবং তাহাতে দুইজনেরই সাধনা ও আদর্শ খর্ব ও দুর্বল হইয়া যাইতেছে। কাজেই শেষ কথার সময় যখন আসিল তখন সে এই আদিম প্রাণশক্তির অন্ধতা, ছায়াচ্ছন্ন বলের মোহ হইতে নিজেব নৈব্যক্তিক তপস্যাকে যেমন জোর করিয়া মুক্ত করিয়া লইল, তেমনই বিজ্ঞানীর নৈর্ব্যক্তিক সাধনাকেও মুক্ত করিয়া দিল এই প্রাণ শক্তির আকর্ষণ হইতে, নিজেব কামনা হইতে, নিজের প্রবৃত্তি রাক্ষসীর হাত হইতে। অচিরা দাদামশায়কে লইয়া ফিরিয়া গেল অধ্যাপকের পুরাতন কর্মস্থলে; নবীনমাধব ফিরিয়া গেল নিজের বিজ্ঞান-সাধনার মধ্যে। নবীনমাধব বলিতেছে, "মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগলো—বুঝলুম একেই বলে মুক্তি: সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হোলো—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।"

"তিনসঙ্গী"র সবচেয়ে চমক্-লাগান এবং সব চেয়ে বড় এবং ঘটনাবহুল গল্প 'ল্যাবরেটরি'। এঞ্জিনিয়ার নন্দকিশোর প্রথম সরকারী চাকুরিতে এবং পরে ব্যবসায়ে বিস্তর টাকা করিয়াছিলেন। তিনি মারা যান প্রৌঢ় বয়সে কোন এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে। তাঁহার সাধনা-মন্দির ছিল এক বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরি, এবং তাঁহার উপার্জিত অর্থের অধিকাংশ এই ল্যাবরেটরির প্রয়োজনেই ব্যয়িত হইয়াছিল। নন্দকুমার ছিলেন একরোখা একগুঁয়ে মানুষ, সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্যই করিতেন না। একসময়ে ব্যবসার খাতিরে তিনি যখন পাঞ্জাবে তখন তাঁহার সোহিনী নামে বিশবছরের একটি সঙ্গিনী জুটিয়াছিল, সুন্দর সুকঠোর তাহার চেহারা, তাহার মধ্যে 'ঝক্‌ঝক্ করছে ক্যারেক্‌টারের তেজ'। নন্দকিশোর তাহাকে নিজের বিজ্ঞানব্রত-সাধনার সঙ্গিনী এবং নিজের আদর্শের একান্ত অনুরাগিণী করিয়া লইয়াছিলেন। নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর স্বামীর ল্যাবরেটরিই হইয়া উঠিল তাহার পুজা-মন্দির; এই ল্যাবরেটরিকে বিজ্ঞানমন্দির করিয়া গড়িয়া তোলা এবং স্বামীর সাধনা অব্যাহত রাখাই হইল তাহার একমাত্র আদর্শ। তাহাদের একটি অতি সুন্দরী মেয়ে ছিল—নীলা। প্রথম যৌবনেই অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাষ্প তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল; মুগ্ধের দল তাহার চারিদিকে আসিয়াছিল ভিড় করিয়া। তাহার প্রথম বয়সের জ্বালামুখী আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিল এক মাড়োয়ারী যুবক, কিন্তু অব্যবহিত পরেই সে টাইফয়েডে মারা যায়। কিন্তু এই বৈধব্যই নীলাকে দিল মুক্তি উদ্দাম দুর্দান্ত কামনার রঙীন স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে। সোহিনী মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধানে লাগিয়া গেল তাহার স্বামী যাহাদের বৃত্তি দিয়াছিলেন সেই সব ভাল ছাত্রের মহলে। এমন পাত্র সে চায় যে বিজ্ঞানসাধনায় একাগ্রচিত্ত, যে তাহার স্বামীর ল্যাবরেটরির ভার লইবে, এবং স্বামীর সাধনাকে অব্যাহত রাখিবে। শেষ পর্যন্ত তাহার চোখ পড়িল রেবতী নামে একটি ছেলের উপর, একচিত্তে সে বিজ্ঞান-সাধনা করে এবং ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানাচার্য মহলে একটু প্রতিষ্ঠাও লাভ করিয়াছে। তাহার প্রথম দিকের অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরী সোহিনীর অনুরাগী সুহৃৎ, শুভার্থী বন্ধু ও পরামর্শদাতা। তাহাকে আশ্রয় করিয়া সোহিনী রেবতীকে সুকৌশলে নিজের মেয়ের রূপমোহের মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা করিল, ইচ্ছা ওরই সঙ্গে দিবে মেয়েকে বিবাহবন্ধনে বাঁধিয়া, এবং একসঙ্গেই বাঁচাইবে মেয়েকে এবং স্বামীর আদর্শকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সোহিনী আবিষ্কার করিল, তাহার মেয়েটি একেবারে 'মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা', বুঝিতে পারিল, নীলা 'ভাঙন-ধরানো মেয়ে'। ওর হাতে 'যা পড়বে তা আস্ত থাকবে না।' সোহিনী স্থির করিল, ল্যাবরেটরি পাব্‌লিক ট্রাস্ট করিয়া দিবে, এবং রেবতীকে করিবে ট্রাস্টের প্রেসিডেণ্ট; নীলাকে রেবতীর কাছে ঘেঁষিতে দিবে না, নীলার আগুন যদি লাগে রেবতীর মনে তাহা হইলে রেবতী জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর পুজা-মন্দিরও। সোহিনীর তাহা সহিবে না। ব্যবস্থা ভালই চলিতেছিল, রেবতীও বুঁদ হইয়া লাগিয়াছিল নিজের কাজে। কিন্তু এদিকে নীলা তুলিল জল ঘুলাইয়া। 'হাইয়ার স্টাডি' ক্লাস এবং 'জাগানী' ক্লাব আশ্রয় করিয়া নীলার চারিদিকে জুটিল একদল মুগ্ধ ও লুব্ধ যুবক যাহাদের লোভ যেমন নীলার সৌন্দর্য ও যৌবনের প্রতি, তেমনই নীলার মায়ের অগাধ অর্থ ও সম্পত্তির দিকে। তাহাদের এবং নিজের কামনার চক্রান্তে পড়িয়া নীলা এই অর্থ ও সম্পত্তির দিকে হাত বাড়াইল এটর্নী বঙ্কুবাবুর সহায়তায়। সোহিনী অধ্যাপক চৌধুরীর মুখে সে-খবর পাইল, বলিল, 'রাজকন্যাটি মাটির দরে বিকোবে তা জানি, কিন্তু আমি বেঁচে

থাকতে রাজত্ব সস্তায় বিকোবে না…মানবো না আপনার কার্যকারণের আমোঘ বিধান যদি আমার ল্যাবরেটরির উপর কারো হাত পড়ে। আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুরি খেলে সহজে। আমি খুন করতে পারি, তা সে আমার নিজের মেয়ে হোক, আমার জামাই-পদের উমেদার হোক।' এই বলিয়া কোমর-বন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিয়া দেখাইল। ঘটনার চক্রান্ত এমনই, ইহারই কয়েকদিনের মধ্যে সোহিনীকে যাইতে হইল আম্বালায় আইমার মৃত্যুশয্যায় তাহাকে দেখিতে। যাইবার আগে মেয়েকে ডাকিয়া আবার ছুরি দেখাইয়া বলিয়া গেল, "এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এলে যদি হিসেব নেবার সময় হয় তো হিসেব নেব।" সোহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগে নীলা গোপনে ল্যাবরেটরিতে ঢুকিয়া নিজের দেহের এবং রূপের মোহ বিস্তার করিয়া রেবতীকে বাঁধিল ফাঁদের মধ্যে। 'এই সুযোগটাকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরে নীলার উন্মত্ত যৌবন আলোড়িত হয়ে উঠেছে।' রেবতীকে নীলার যথেষ্ট পছন্দ নয়, কারণ 'পাণ্ডিত্যের চাপে তাহার পৌরুষের স্বাদ ফিকা হইয়া গিয়াছে'। তবু নীলা জানে তাহাকে বিবাহ করা নিরাপদ, যেহেতু বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দিবার শক্তি তাহার নাই। তাহা ছাড়া ল্যাবরেটরির সঙ্গে যে লোভের বিষয় জড়ান আছে তাহার পরিমাণ প্রভূত। সুকৌশলে মোহজাল বিস্তার করিয়া সে রেবতীকে বিবাহে রাজী করাইল। 'জাগানী সভা' তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল, তাহার সুপ্ত অহংবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল, নীলার কামনার ছোঁয়াচ লাগিল দেহে। সর্বশেষ দৃশ্যে এক নামজাদা রেস্তোরাঁতে সান্ধ্যভোজ, 'নিমন্ত্রণ কর্তা স্বয়ং রেবতী ভট্টাচার্য, তার সম্মানিতা পার্শ্ববর্তিনী নীলা'। পঁয়ষট্টি জন অতিথির পানে ও ভোজনে হাস্যকলরোলে রেস্তোরাঁ মুখরিত। এমন সময় হঠাৎ প্রবেশ করিল সোহিনী; সে জানিয়া শুনিয়াই আসিয়াছিল যে এই ভোজের ছলনায় এখানে চলিতেছে দলিলপত্র ঘাঁটিয়া ল্যাবরেটরির ফণ্ডে ছিদ্র আবিষ্কারের চেষ্টা। সেইদিন সোহিনী সকলের সম্মুখে নীলাকে বলিল তিরস্কৃত কণ্ঠে, 'কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস…তিনি জানতেন সব…সকল কথা খোলসা করে তিনি দলিল রেজেষ্ট্রি করে গেছেন। পঁয়ষট্টি জন বন্ধু ধীরে ধীরে অন্তর্ধান করিল। সোহিনী আজ সর্বপ্রথম বুঝিল, 'রেবতী পণ্ডিত কিন্তু রেবতী নির্বোধ, পিসির আঁচল ধরিয়া সে মানুষ হইয়াছিল; এখনও সে মেয়ে মানুষের আঁচলধরা শিশু। তাহাদের হাতে-ধরা দুধের বাটি হইতে সে দুধ খায়; রেবতী বৃদ্ধ খোকা'। কিন্তু এদিকে যে রেজেষ্ট্রি আপিসে বিবাহের নোটিশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। নীলা জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরিয়ে নিতে চাও নাকি, সার আইজাক নিউটন।" বুক ফুলাইয়া রেবতী বলিল,- "মরে গেলেও না।" সোহিনীর তাহাতে আপত্তি নাই, "কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে শত হস্ত দূরে।" রাজকন্যা মাটির দরে বিকাইয়া যাক্ তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু ল্যাবরেটরি বাঁচাইতেই হইবে। মেয়েই ত সে ল্যাবরেটরিকে বাঁচাইল; সোহিনী লোক চিনিতে পারে নাই! রেবতী অহংকৃত নিবুর্দ্ধিতায় বলিল বটে, বিবাহ "হবেই, নিশ্চয় হবে," কিন্তু সেত নির্বোধ, বৃদ্ধ খোকা; যথার্থ পৌরুষ তাহার কোথায়? "একটা ছায়া পড়ল দেওয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রেবি, চলে আয়।' সুড়্ সুড়্ করে রেবতী পিসিমার পেছন পেছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।"

অত্যন্ত নীরস সংক্ষিপ্ত এই বিবৃতিতে গল্প তিনটির ভাবার দৃঢ় সংহতি এবং প্রত্যক্ষ

ও দ্রুতগতি, শাণিত, উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত ও অর্থগর্ভ বাক্য ও বাক্‌ভঙ্গি ধরা পড়িবার কথা নয়, কিংবা চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা তাহাদের ইঙ্গিতও নয়। সে-ইঙ্গিত ছড়াইয়া আছে গল্পের গতি ও বিবর্তনের মধ্যে, কথাবার্তার ভঙ্গি, অর্থ ও ব্যঞ্জনার মধ্যে, লেখকের সুগভীর মন্তব্যরাজির মধ্যে। "গোরা"-পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে যেমন, এই গল্পগুলির রসও তেমনই অনেকাংশে গল্প বলিবার ভঙ্গির মধ্যে, ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির মধ্যে নিহিত। সংক্ষিপ্ত গল্প-বিবৃতিতে সে-রসের আস্বাদন পাওয়া যাইবে না।

তবু এই সংক্ষিপ্ত নীরস বিবৃতির মধ্যেই ধরা পড়িবে, এই তিনটি গল্পেরই আশ্রয় সাম্প্রতিক-উচ্চ মধ্যবিত্ত নগর-নির্ভর বাঙালী সমাজ, যে-সমাজকে আশ্রয় করিয়াছে লেখকের "শেষের কবিতা" ও পরবর্তী উপন্যাসগুলি। এই সমাজের একটা অংশে অন্তঃসারশূন্য, দায়িত্বহীন, চটুল, অর্ধ-ইঙ্গ, বাক্যবিলাসী এক ধরনের যুবক-যুবতীদের চলাফেরা সর্বদাই চোখে পড়ে। এই মানুষগুলি যেমন ফাঁপা তেমনই ফাঁপা ইহাদের সমাজ, ইহাদের জীবনযাত্রা। অথচ সাম্প্রতিক নাগরিক জীবনের পরিবেশে এই অন্তঃসারশূন্য মানুষগুলির বহু আড়ম্বর এবং কোলাহলের সীমা নাই। ইহাদের এবং ইহাদের পরিবেশটি লেখক আঁকিয়াছেন সুনিপুণ তুলিকায় 'ল্যাবরেটরি' গল্পে, জাগানী ক্লাবের চিত্রে, নীলার বর্ণনায় ও কর্মে-বচনে, 'রবিবার' গল্পে শীলা ও পাকড়াশী গিন্নীর বর্ণনায়, 'শেষ কথা' গল্পে 'সিনেমামঞ্চ-পথবর্তিনী রং মাখানো বাঙালী মেয়ে, যারা জাত-বান্ধবী' তাহাদের প্রতি ইঙ্গিতে। জাগানী ক্লাবের ছবিটি একেবারে নিখুঁত, এবং যে শ্লেষ ও ব্যঙ্গে সমস্ত চিত্রটি দীপ্ত, তাহাতেই গল্পাংশটির প্রত্যেকটি চরিত্র, বিশেষভাবে নীলা ও রেবতীর, এমন কি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ব্রজেন্দ্র হালদারের চরিত্র উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, অথচ ব্রজেন্দ্র হালদার গল্পের কতটুকুই বা জায়গা লইয়াছে! 'রবিবার' গল্পটিতেও শীলা অল্প জায়গাই জুড়িয়া আছে, একটি ক্ষুদ্র পার্শ্বচরিত্র ছাড়া ত সে আর কিছুই নয়, তবু তাহার ছবিটি কি নিখুঁত এবং বাস্তব! এই সব ফাঁপা মানুষগুলির উপর লেখকের তিক্ততার প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পে পরে "শেষের কবিতা"য় সিসি-লিসি-কেটির এবং তাহাদের সমাজের চিত্রে ও বর্ণনায়। তবু, "শেষের কবিতা"তেও রবীন্দ্রনাথ এতটা তিক্ততা প্রকাশ করেন নাই ; কিন্তু এই সব মানুষগুলির অপদার্থতা, ইহাদের চটুল, বাক্যসর্বস্ব, ফ্যাশানসর্বস্ব জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার ব্যঙ্গ ও শ্লেষ তীব্রতর তীক্ষ্নতর হইতে লাগিল, এবং শেষ পর্যন্ত নীলা ও জাগানী ক্লাবকে কেন্দ্র করিয়া লেখকের সমস্ত তিক্ততা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কষাঘাতে রূপান্তরিত হইল। 'শেষ কথা' গল্পের 'সিনেমামঞ্চপথবর্তিনী, জাত-বান্ধবী বাঙালী মেয়ে'র মতন ব্যঙ্গ কষাঘাত আর কি হইতে পারে!

সাম্প্রতিক জীবনের পরিচয় অন্য দিক দিয়াও এই গল্পগুলির মধ্যে আছে ; যেমন, অভীক চরিত্রের যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব তাহা কতকটা ত সাম্প্রতিক কালেরই দ্বন্দ্ব, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা দেশকালের সীমা বহির্ভূত সার্বদেশিক ও সর্বসাময়িক রূপ যে প্রচ্ছন্ন তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, অভীক চরিত্র রবীন্দ্রনাথ কিছু নূতন সৃষ্টি করেন নাই ; সে-চরিত্রাঙ্কন লেখকের অভ্যস্ত ; অভীক ত "শেষের কবিতা"র অমিতেরই প্রতিচ্ছবি। নারীপ্রেম সম্বন্ধে আর্টিস্টকুলের যে-যুক্তি অভীকের মুখে শোনা যায়, তাহার ভাষাটাই আধুনিক, বক্তব্যটা বহু পুরাতন ; তাহা ছাড়া ভালবাসার যে-রহস্য বিভা-অভীককে ঘিরিয়া রূপ লইয়াছে তাহাও চিরন্তন না হউক, পুরাতন ত নিশ্চয়ই ; সাম্প্রতিক সমাজ-বেষ্টন তাহার পরিবেশ মাত্র রচনা করিয়াছে। সমসাময়িক দেশ এবং

কালের বিশেষ এবং বিশিষ্ট কোনও ইঙ্গিত এই রহস্তের মধ্যে মূর্তি পায় নাই। 'রবিবার' গল্পেও নবীনমাধব নামে ও পরিচয়ে মাত্র বর্তমান বিংশ শতকীয় পৃথিবীর যান্ত্রিক ও বিজ্ঞানী, কিন্তু বিজ্ঞান ও যন্ত্র সভ্যতার বিশিষ্ট সাম্প্রতিক ইঙ্গিত না আছে নবীনমাধবের চরিত্রে, না গল্পের পরিবেশে, না ঘটনার তরঙ্গ লীলায়। অচিরাও সুপরিচিত এবং তাহার রূপ নারীর কল্যাণী রূপ, যে-রূপ দেখিয়াছি লাবণ্যে, বিভায় এবং তাহারও আগে সুচরিতায়। এই কল্যাণী নারীরূপের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত বিভা ও অচিরায় নূতন করিয়া ধরা পড়িল মাত্র। আর অচিরার দাদামশায়কে, সেই আত্মভোলা সরল অথচ জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপককে, আগেও একাধিকবার দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথেরই গল্পে উপন্যাসে। এই ধরনের মানুষ সম্বন্ধেও লেখকের পক্ষপাত অনিবার্যভাবে ধরা পড়িয়া যায়। একমাত্র 'ল্যাবরেটরি' গল্পেই সমসাময়িক কাল কিছুটা তাহার মর্যাদা লাভ করিয়াছে কবির সচেতন কল্পনায়। নন্দকিশোরের মন ও কর্ম দু'য়েতেই আধুনিক কালের কতকটা স্পর্শ অনস্বীকার্য। তাহার সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারের অস্বীকৃতি, তাহার খেয়াল ও আদর্শ, তাহার সংস্কারমুক্ততার পশ্চাতে আধুনিক কালের রূপ কিছুটা প্রত্যক্ষ। আর যা আছে তাহা নীলা ও জাগানী ক্লাবের পরিচয়ের মধ্যে। সোহিনীর চরিত্রেও সে স্পর্শ লাগিয়াছে। তাহার চরিত্রের দুই দিক—একদিকে অবিচল আদর্শনিষ্ঠা, আর একদিকে সর্বপ্রকার সংস্কার বৈরহিত্য, এমন কি প্রথাগত দেহ সংস্কার হইতেও মুক্তি—এ দুই দিকের একটা সুসমঞ্জস শিল্পরূপ লেখকের ভাবকল্পনার মধ্যে সঠিক গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; তৎসত্ত্বেও একই চরিত্রে যে এই দুই আপাতবিরোধী দিক পাশাপাশি বাস করিতে পারে এই চেতনা অনেকটা আধুনিক কালের বিজ্ঞানী মনের। দৃষ্টির কিছুটা বিবর্তন যে ঘটিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট; অন্তত 'রবিবার' ও 'ল্যাবরেটরি' গল্প দুটিতে লেখক যে আধুনিক মনকে বুঝিতে, ধরিতে ছুঁইতে সজ্ঞানে চেষ্টা করিতেছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবশ্য এ চেষ্টা ব্যক্তি-মনের প্রেমসম্পর্কিত ভাবনা-কল্পনার মধ্যেই আবদ্ধ, এবং এই প্রেম-ভাবনাও একটি বিশেষ মুষ্টিমেয় শ্রেণীর। বলা বাহুল্য এই বিশেষ শ্রেণীগত মানুষের প্রেমলীলায় ও ভাবনায় বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের দায়িত্ব ও প্রভাবের স্বীকৃতি নাই, তাহা একান্তই ব্যক্তিগত। "শেষের কবিতা"তেই তাহা জানা গিয়াছিল। যাহাই হউক, সেই বিশেষ শ্রেণীর এই ধরনের দায়িত্বহীন, আদর্শবিহীন, কামনা-নির্ভর, বিলাসাশ্রয়ী প্রেমলীলা ও ভাবনা লেখকের সমর্থন লাভ করে নাই। অভীকের মত আত্মসচেতন বুদ্ধিগর্বিত যুক্তিনির্ভর যুবককেও তিনি শেষ পর্যন্ত আদর্শ নির্ভর প্রেমের দুয়ারে মাথা নত করাইয়া ছাড়িয়াছেন; প্রেমের ব্যাপারে বুদ্ধি যে বাধা, যুক্তিতর্ক যে কাঁটার বেড়া তাহা স্বীকার করাইয়া লইয়াছেন। সাম্প্রতিক কাল হয়ত তাহা নির্বিবাদে মানিয়া লইবে না। 'ল্যাবরেটরি' গল্পে নীলা ও জাগানী ক্লাবের প্রতি যে ব্যঙ্গকষাঘাত তাহা আধুনিকতার উপর নয়; তাহারই মুখোশ পরিয়া ময়ূরপুচ্ছালংকৃত দাঁড়কাকের মতন যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদেরই উপর। সোহিনীর আত্যন্তিকী আদর্শ-নিষ্ঠার সঙ্গে বর্তমান বুদ্ধি বা বিজ্ঞানবাদের কোনও বিরোধ নাই; বস্তুত 'রবিবার' গল্পে যেমন 'ল্যাবরেটরিতে'ও তেমনই, আদর্শের দিকেই ঝোঁকটা প্রবল, এমন কি, এক এক সময় মনে হয় চরিত্রগুলিও লেখক সৃষ্টি করিয়াছেন আদর্শেরই অবলম্বন হিসাবে। কিন্তু সোহিনী আগাগোড়া জোর করিয়া যে শারীরিক ও মানসিক বেপরোয়া ভাবটা দেখাইয়াছে, 'মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর' বলিয়া অধ্যাপক চৌধুরীর সঙ্গে যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছে তাহা একান্তই জোর করিয়া আধুনিকতার বড়াই,

আধুনিকতার ছদ্মবেশ। এ যেন লেখকের নিজের বুদ্ধি ও সংস্কারের সঙ্গে তথাকথিত আধুনিকতার লড়াই ; জোর করিয়া সংস্কার ভাঙিবার চেষ্টা! ইহা যে একান্তই সজ্ঞান প্রয়াসগত তাহার প্রমাণ, গল্পের দিক হইতে এই প্রসঙ্গ অবান্তর, গল্পের পরিবেশের সঙ্গে এই প্রসঙ্গের কোনও যোগ নাই, সর্বোপরি প্রসঙ্গটির বস্তুমূল একান্তই শিথিল। অথচ, নীলা যখন দেহের খোসাটাকে লইয়া ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে অথবা রেবতীর সঙ্গে ছিনিমিনি খেলিতেছে তখন কোনও অসংগতিই চেখে পড়েনা, বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে এই বস্তুপ্রসঙ্গটুকুও খাপ খাইয়া যায় ; সেখানে ত স্পষ্টতই দেখিতেছি আধুনিকতার ছদ্মবেশই লেখকের বক্তব্য ও বর্ণনীয় বিষয়।

রবীন্দ্র-মানসের বৈশিষ্ট্য 'রবিবার' কিংবা 'ল্যাবরেটরি' গল্পে নাই, আছে 'শেষ কথায়'। জীবন-সায়াহ্নের এই গল্পটিতেই "গল্পগুচ্ছে"র পুরাতন রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁহার সুপক্ক পরিণতরূপে আবার দেখা দিয়াছেন। "গল্পগুচ্ছে"র আবহাওয়া ও পরিবেশ, সেই কবিত্বময় নিসর্গবর্ণনা, ব্যঞ্জনাময় নিসর্গ পরিবেশ, মানব চিত্তের উপর প্রকৃতির দুর্নিবার প্রভাব, সেই বিদগ্ধ ও বিজ্ঞানী মনের সমস্ত যুক্তি ও বুদ্ধির কাঠিন্য ভেদ করিয়া চরম প্রাণের সজীবতার মধ্যে প্রেমের পক্ষ বিস্তার, সব যেন আবার দেখিলাম 'শেষ কথা' গল্পটিতে। অথচ এই গল্পটিতেই যথার্থ আধুনিকতার ও দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক বিবর্তনের চিহ্নও বর্তমান। আদিম বন-প্রকৃতির মধ্যে যে অন্ধপ্রাণশক্তির দুর্দমনীয় লীলা, সেই লীলাই নবীনমাধব ও অচিরার বহুদিনের সাধনায় ও তপস্যায় গড়া চিত্তশক্তিকে ধীরে ধীরে দুর্বল করিয়া আনিতেছিল। অচিরার আদর্শের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ চিত্তশক্তিকে জয়ী করিয়া লইলেন প্রকৃতির অন্ধপ্রাণশক্তির উপরে। 'দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। * * * মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে—তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়', এ-উক্তি আধুনিক বস্তুবাদী মনের। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিরন্তর যে-সংগ্রাম সেই সংগ্রামই ত জীবন, এবং এই সংগ্রাম-সমুদ্র মন্থন করিয়াই আদর্শের অমৃতের সৃষ্টি।

অবশ্য, অচিরা বহুদিনের সাধনায় যে-আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছিল সে-আদর্শ কতখানি বস্তুধর্মানুযায়ী, কতখানি নয়, এ প্রশ্ন অবান্তর না হইলেও 'শেষ কথা'র গল্পপ্রসঙ্গে তাহার স্থান নাই বলিলেই চলে। জীবনে এই আদর্শের স্থান যে আছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাজেই ইহার বস্তুমূল সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ অল্পই। তবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, অচিরাই রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রের আদর্শ। বস্তুত অচিরা, বিভা, "শেষের কবিতা"র লাবণ্য, "গোরা"র সুচরিতা ইহারা সকলেই একই স্বভাব ও প্রকৃতির মেয়ে; ইহাদের বুদ্ধি যত দীপ্ত শিক্ষা যত উন্নত রুচি ও প্রবৃত্তি তত সংযত, ত্যাগের মহিমা তত উজ্জ্বল; ইহাদের চারিদিকে একটি শুভ্রশুচিতা এবং নিরাসক্ত অথচ গভীর প্রেমের জ্যোতি দীপ্যমান। ইহারা প্রিয়তমের প্রতিভা ও আদর্শকে নিজের প্রয়োজনের বা কামনার সীমায় আবদ্ধ করিয়া প্রেমের মহিমাকে খর্ব করে না, বরং নিজেরাই সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কীর্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়, নিজেদের সুখ ও স্বার্থ বলি দিয়া প্রিয়তমের ললাটে বিজয়টীকা আঁকিয়া দেয়। বিভার সঙ্গে লাবণ্যের অন্য একটি বিষয়েও ঐক্য লক্ষণীয়। ইহাদের মত শুচিশুভ্র, সংযত, বুদ্ধিদীপ্ত মেয়েরাও ভালবাসে সেই সব পুরুষকেই যাহারা প্রথাগত সংস্কার ও গতানুগতিক রীতি ও চিন্তাকে শুধু অস্বীকার করে না, উপেক্ষা করে, বুদ্ধির শাণিত ছুরিতে চিরাচরিত অভ্যাস ও পদ্ধতিকে টুক্‌রা টুক্‌রা

করিয়া কাটিয়া মাড়াইয়া চলে, যাহারা আত্মসচেতন এবং পৌরুষদীপ্ত, এবং যাহাদের কথায়, দৃষ্টিতে, চলনে ও ব্যবহারে শিল্পীমনের অব্যাহত অবারিত বিদ্যুৎঝলকিত প্রকাশ। তাহারা অমিত ও অতীকের মত পুরুষ। কিন্তু সেই মেয়েরাই শ্রদ্ধায় ও পরমনির্ভরতায় আত্মনিবেদন করে অমর অথবা শোভনলালের মতন বিনয়নম্র, আড়ম্বরলেশহীন, ধীর ও শান্তচিত্ত লোকদের নিকট। নারীচিত্তের এই পরমরহস্য বারবার রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনাকে উদ্রিক্ত করিয়াছে। বস্তুত, অন্যত্র যেমন, এই গল্প তিনটিতেও নারীচরিত্রগুলিই উজ্জ্বলতর; বিভা, অচিরা, সোহিনী, শীলা, নীলা, ইহারাই গল্পগুলিকে দীপ্ত করিয়া রাখিয়াছে।

উপন্যাস

এক

বাংলা সহিত্যে সার্থক ছোট গল্প যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন রবীন্দ্রনাথ, সার্থক উপন্যাসের সূচনা করিয়া গিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আমাদের সাহিত্যে উপন্যাসের দৃঢ় সুপ্রশস্ত রাজপথ কাটিয়া দিয়া গিয়াছেন তিনিই। যে সূর্যালোকদীপ্ত বাস্তব জীবন, যে সংঘাতবিক্ষুব্ধ জীবন ও সমাজ-প্রবাহ এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মায়াঘন বর্ণচ্ছটার যে বিচিত্র-সমারোহ, যে গীতধর্মী কাব্যময় ভাব ও বর্ণোচ্ছ্বাস এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কার্যকারণধর্মী সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এখনও পর্যন্ত আমাদের উপন্যাসের উপজীব্য তাহার সমস্তই সূচনা করিয়া গিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তবনিষ্ঠা রোম্যান্সের রামধনুর রঙে রহস্যমণ্ডিত, অতিপ্রাকৃতের স্পর্শে অসাধারণ; বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিগূঢ় ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার উপন্যাস এই রহস্য ও অতিপ্রাকৃতের কল্পনায়, কাব্যের ঝংকারে, সতেজ আদর্শবাদে এবং সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক সমারোহে রোম্যান্সধর্মী। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে য়ুরোপীয় এবং বাংলা সাহিত্যেও ইহাই ছিল উপন্যাসের প্রকৃতি। সামাজিক প্রয়োজনেই, সামাজিক বিবর্তনের ফলেই এই প্রকৃতির উদ্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উত্তরাধিকার লইয়াই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসযাত্রার সূত্রপাত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র নহেন, দুই মানসও বিভিন্ন; রবীন্দ্রনাথের কাল বঙ্কিমচন্দ্রের কালও নয়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমাজধর্মের চেতনাও এক নয়।

এই বিভিন্নতার স্বরূপ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে; তাহাতে রবীন্দ্র-উপন্যাসের ধর্ম আবিষ্কার সহজ হইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মানস যে-যুগের পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল সে-যুগ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধ্যান ধারণাপুষ্ট ভারতীয় মানসের প্রথম সাংস্কৃতিক প্রকাশের যুগ। পশ্চিমের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে উনবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে বাংলার শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে মানসিক আলোড়নের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে অনেকটা স্থিতি লাভ করিয়াছে। শিক্ষিত বাঙালী আপন সংবিৎ অনেকটা ফিরিয়া পাইয়াছে, এবং নবলব্ধ জ্ঞান ও চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত হইয়া নিজের ঘরের, নিজের জাতির দিকে নূতন দৃষ্টি লইয়া তাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারই দেশ তাহারই চিরপরিচিত আবেষ্টন তাহারই কাছে নূতন করিয়া ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট, এবং নূতন বিধানে প্রথম আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সরকারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; এক কথায় তিনিই তদানীন্তন বিকাশোন্মুখ শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ ও সেই সমাজ-মানসের প্রতীক। এই সমাজ-মানস অত্যন্ত জটিল।

লর্ড কর্নওআলিস যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন করিয়াছিলেন বাংলা দেশে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেই তাহার অনিবার্য ফল ধীরে ধীরে দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ফলে দেশের প্রাচীন বড় বড় সামন্ত পরিবারগুলি, ছোটবড় রাজবংশগুলি ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্তে একান্তভাবে ভূমি-

স্বত্বাধিকারী নূতন এক জমিদার সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মধ্যস্বত্বাধিকারী এবং চাকুরিজীবী, ক্রমবর্ধমান নানা বৃত্তিজীবী এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীও গড়িয়া উঠিতেছে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি হইতেই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই নবজাগ্রত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারা তখনও একটা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই, তাহা তখনও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই, সেই জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ, দ্বন্দ্ব সমস্যা তখনও পরিষ্কার হইয়া দেখা দেয় নাই। আর আচণ্ডাল যে অগণিত জনসাধারণ তাহাদের জীবন-প্রবাহ এত সরল, এত দীন ও রিক্ত যে বঙ্কিমচন্দ্রের মানস অথবা তদানীন্তন মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের পরিধির মধ্যে তাহাদের কোনও স্থান ছিল না বলিলেই চলে, অন্তত বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের জীবনধারার মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের উপাদানের সন্ধান পান নাই, সজাগ চেষ্টাও হয়ত তাঁহার ছিল না। বাকী রহিল সদ্য বিলুপ্ত প্রাচীন সামন্ত সমাজ, এবং এই সমাজেরই ধ্যান-ধারণায় ও ঐতিহ্যে পুষ্ট ভূমি-স্বত্বাধিকারী নূতন জমিদার সমাজ। এই দুই সমাজই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপজীব্য, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানস দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই সমাজের জীবনধারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

আগেই বলিয়াছি, প্রাচীন সামন্ত-সমাজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার স্মৃতি তখনও তপ্ত। তাহার নানা শৌর্য বীর্য, নানা উদ্বেলিত বিক্ষোভ, নানা বিরোধী আদর্শের সংগ্রামের কাহিনী, গোষ্ঠীস্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল অতীত তখন প্রথম নবজাগ্রত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-মানসকে নানা ভবিষ্যৎ কল্পনায় নাচাইতে আরম্ভ করিয়াছে; এই নিকট অতীতের ছায়াময় অস্পষ্টতার মধ্যে নূতন পাশ্চাত্য ধ্যানধারণাপুষ্ট মানস তাহার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আহরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারই মধ্যে আত্মগৌরবের সন্ধান করিতেছে। অথচ এই অতীত নিকট অতীত হইলেও সে-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন, বিকৃত ও ছায়াময়। এই ধরনের অস্পষ্ট অতীতকে কেন্দ্র করিয়াই রোম্যাণ্টিক ভাব-কল্পনা মুক্তি পায়। বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল। মধ্যযুগে মুসলমান আমলের অবসানের যুগ, এক বিরাট শূন্যতা ও অরাজকতার যুগ। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অধিকাংশই এই যুগের কথা ও কাহিনী লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিক জ্ঞান যেখানে অসম্পূর্ণ, খণ্ডায়িত, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চস্তরের ঐতিহাসিক কল্পনার সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বল্পজ্ঞাত বা অজ্ঞাত অতীত ছায়াময় হইতে বাধ্য, এবং ছায়াময় বলিয়াই উপন্যাসে তাহা রোম্যান্সের সজীব ও বর্ণবহুল চিত্রণের এবং অতি প্রাকৃতের অসাধারণতার মায়াস্পর্শের অপেক্ষা রাখে; শুধু অপেক্ষা রাখে না, এই জাতীয় পরিবেশের মধ্যেই আদর্শবাদী কবিমানস রোম্যাণ্টিক ভাব-কল্পনার সাহায্যে নিজেকে মুক্ত করিবার স্বাভাবিক প্রবণতা প্রকাশ করে। উপন্যাসে কাব্যের ঝংকারও এই রোম্যাণ্টিক ভাব-কল্পনারই অন্যদিক। আর বঙ্কিমের উপন্যাসে যে সতেজ আদর্শবাদের পরিচয় আছে তাহাও এই যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজমানসেরই প্রকাশ। এই মানস কতকটা গড়িয়া উঠিয়াছিল মিল্, বেন্থাম্, কোঁৎ, ফরাসী বিদ্রোহের ইতিহাস পড়িয়া, কতকটা গড়িয়া উঠিয়াছিল ভারতের দূর ও নিকট অতীতের নবলব্ধ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া। এই দুই ভাবধারার সংঘাতের ফলে নূতন এক আদর্শমালা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসকে আশ্রয় করিতেছিল, এই আদর্শমালায় বলিষ্ঠ স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বাজাত্যবোধই সর্বাপেক্ষা সজীব ও বর্ণময়। কিন্তু এই বোধ তখনও গোষ্ঠী ও ধর্মমহিমায় আচ্ছন্ন।

ভূমি-স্বত্বাধিকারী নূতন অভিজাত শ্রেণীও বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকে সৃষ্টি-প্রেরণা দিয়াছে;

অন্তত দুইটি উপন্যাসে তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু যেহেতু, এই শ্রেণী-মানসের সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর, ইহাদের জীবন প্রবাহ বিচ্ছিন্ন ছায়াময় অতীতের কাহিনী নয়, স্পষ্ট জীবন্ত বর্তমান, সেই হেতু বঙ্কিমের এই ধরনের উপন্যাস অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠ, ইহাদের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের অসাধারণত্বের স্পর্শ অনেকাংশে সংযত, এবং আদর্শবাদী কবিমানসও বাস্তবনিষ্ঠা দ্বারা নিয়মিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগের অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতন যুক্তিবাদী, তদানীন্তন বাঙালীর কল্পমানসে যুক্তিধর্মের স্পর্শও লাগিয়াছে। সেই হেতু কার্যকারণধর্মী ঘটনা ও মনোবিশ্লেষণও বঙ্কিম-মানসের অন্যতম ধর্ম। এই বিশ্লেষণ গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা যথেষ্ট দীর্ঘায়ত নয়, ঘটনা ও মনোবিকাশের স্তরগুলি যথেষ্ট পরিমাণে এবং পরিপূর্ণ সূক্ষ্মতায় বিকশিত হইয়া উঠে নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া একটা বিশেষ অবস্থার মর্মভেদ করিয়া আবার সংকুচিত হইয়া অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে আর কিছু না হউক পাঠকের মনে বাস্তবতার অনুভূতি ক্ষুন্ন হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ হয়ত ছিলেন না, কারণ বাস্তবনিষ্ঠাপেক্ষা আদর্শ ও রোম্যান্সনিষ্ঠা ছিল তাঁহার প্রবলতর।

১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩২ বৎসর। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" ১২৮৮-৮৯, এবং দ্বিতীয় উপন্যাস "রাজর্ষি" ১২৯২ সালে রচিত হয়। কিন্তু তাঁহার প্রথম সার্থক উপন্যাস "চোখের বালি" রচিত হয় ইহার দশ বৎসর পর, ১৩০৮ সালে, এবং এই সময় হইতে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যেই সমাজ-মানস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চেতনার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় উপন্যাসে অথবা ছোট গল্পে যতটা প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া সম্ভব, কাব্যে, বিশেষভাবে গীতি-কবিতায় তাহা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প অধিকাংশই কমবেশি গীতধর্মী হওয়ার ফলে সেখানেও এই পরিচয় গীতিকাব্যের মতই কতকটা অপরোক্ষ।

যাহাই হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের কাল ও রবীন্দ্রনাথের কালের মধ্যে বাংলাদেশে যে সামাজিক বিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহা এইবার দেখা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতকের শেষাশেষি, বিংশ শতকের গোড়ায় বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ পুরাপুরি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বরূপ বিশিষ্ট রেখা ধরিয়া সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার ধ্যান ধারণা ও আদর্শ, তাহার অন্তর্নিহিত মানসিক দ্বন্দ্ব, তাহার জীবন সংগ্রাম ইত্যাদি সমস্তই এই পঞ্চাশ বৎসরে অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে। তাহার জীবন প্রবাহ একটি বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইতেছে এবং বেগবান তরঙ্গমুখর সেই ধারাটি অন্যান্য শ্রেণীর বা সমাজ-অংশের জীবন ধারাকে ছাপাইয়া যাইতেছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসই প্রগতিশীল এবং সমাজের সকল প্রকার কর্মে ও প্রতিষ্ঠানে ইহাদেরই আধিপত্য, এই শ্রেণীই সামাজিক আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার নিয়ন্তা। বঙ্কিমের কালে মধ্যবিত্ত সমাজের এই প্রতিষ্ঠা ছিল না। দ্বিতীয়ত, ভূমি স্বত্বাধিকারী অভিজাত সমাজের প্রতিষ্ঠা তখনও অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু যেহেতু তাহাদের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে ভূমি ও প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রবিধিব্যবস্থা অটুট রাখার উপর সেই হেতু তাহাদের মনোভাব ও আদর্শ রক্ষণশীল, প্রগতি-বিরোধী। এই সমাজ-শ্রেণীর অধিকাংশই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধ্যান ধারণা হইতে নিজেদের অনেকাংশে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। স্বল্প সংখ্যক মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি পরিবার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এই আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহারা অভিজাত সমাজের লোক হইলেও তাহাদের মানস মধ্যবিত্ত-সমাজাদর্শেই গঠিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই অভিজাত

সমাজ-মানসের মধ্যে একদিকে যেমন প্রবল ছিল পৌরাণিক হিন্দুসংস্কৃতির নাগর ও গ্রাম্য প্রকাশের ধারা, অন্যদিকে তেমনই ছিল সুদূর দিল্লী-আগ্রা-লক্ষ্ণৌ-পাটনার নিম্নস্তরের ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতির ধারা; অবশ্য শেষোক্ত ধারা জীবনের দেউড়ি পার হইয়া অন্দরমহলে ততটা প্রবেশ করিতে পারে নাই। তৃতীয়ত, প্রাচীন সামন্ত-সমাজের স্মৃতি এই পঞ্চাশ ষাট বৎসরে একেবারেই ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে; এই স্মৃতি বঙ্কিমের কালে বিকাশোন্মুখ মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসকে যে-ভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের কালে সেই স্মৃতির সেই জোর আর ছিল না। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের কালের চেহারার তফাৎ সংক্ষেপে এইটুকু।

রবীন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার শীলে ও শালীনতায় তদানীন্তন বাংলাদেশের অভিজাত সমাজের শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলির অন্যতম, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির দুইধারার শ্রেষ্ঠ সঙ্গমস্থল। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, এই অভিজাত পরিবার ও সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া, লালিতপালিত হইয়াও তাঁহার নিজের মন রস আহরণ করিয়াছে মধ্যবিত্ত সমাজ-মানস হইতে। প্রিয়নাথ সেন, লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সতীশচন্দ্র সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, অজিতচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় প্রভৃতি তাঁহার সকল বন্ধু সুহৃৎ সহকর্মী সকলই মধ্যবিত্ত-সমাজের লোক। এই প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অভিজাত-মানস আশ্রিত পুষ্ট ও বর্ধিত। এই মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র সুখ-দুঃখ, অন্তর ও বাহিরের বিচিত্র সরু মোটা দ্বন্দ্ব, কলহ ও আনন্দ-কোলাহল, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য ও বিষাদ, আদর্শের বিরোধ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদি সমস্তই রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।

উপরোক্ত সামাজিক বিবর্তনের ফলেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে ধর্ম ও প্রকৃতির বিভিন্নতার সৃষ্টি। প্রাচীন সামন্ত-সমাজের ছায়াময়ী স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিদায় লইল। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের স্মৃতির সঙ্গে দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়া বলিষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গেল, ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ধরা পড়িয়া গেল, তাহার অস্পষ্ট খণ্ডতা প্রকট হইয়া উঠিল, জীবনের প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার স্রোতে ঐতিহাসিক সমারোহ ভাসিয়া গেল, পড়িয়া রহিল প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম, দৈন্য ও রিক্ততা, তাহার উদ্বেলিত বিক্ষোভ ও আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে বিদায় লইল বঙ্কিমের রোম্যান্টিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, অতিপ্রাকৃতের অসাধারণত্বের মায়াময় স্পর্শ। প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিক জীবনে অসাধারণতার অতিপ্রাকৃতের স্পর্শের কোন অবকাশ নাই। বঙ্কিমের রোম্যান্স ছিল বাহ্য-বৈচিত্র্য ও আকস্মিক অপ্রত্যাশিত সংঘটন-নির্ভর; মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসের প্রকাশে ইহাদের আর কোনও প্রয়োজনীয়তা রহিল না। রবীন্দ্রনাথও রোম্যান্টিক, কিন্তু তাহার রোম্যান্টিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি অন্য প্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্স আশ্রয় করিয়াছে প্রকৃতির সহিত মানবমনের গভীর আত্মীয়তাকে, জীবনের অতীন্দ্রিয় রহস্যলোককে, মানবমনের সূক্ষ্ম গভীর সমাহিত ভাবলোককে। এই রোম্যান্স একান্তই অন্তর্মুখী, এই প্রকৃতির 'রোম্যান্স বাহিরের ঘটনা-বৈচিত্র্য অথবা আকস্মিক অসাধারণত্বের কোন অপেক্ষা রাখে না। এই রোম্যান্সই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পগুলিকে

গীতধর্মী করিয়াছে, এবং এই রোম্যান্সই রবীন্দ্র-উপন্যাসে কাব্যের ঝংকার ও সুষমা দান করিয়াছে।

আমি আগে বলিয়াছি, সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠ, কিন্তু বাস্তবানুভূতি যে সূক্ষ্ম ও সুবিস্তৃত কার্যকারণসম্বন্ধ-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে, বঙ্কিমের উপন্যাসে সেই দীর্ঘায়ত তথ্য ও মনোবিশ্লেষণ নাই। কেন নাই, সংক্ষেপে তাহার হেতুও আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জের ভিড়ের মধ্যে, বর্ণবহুল তথ্য ও চরিত্রের সমারোহের মধ্যে তাহার অবসরই বা কোথায়। সামাজিক উপন্যাসেও যেখানে জীবন-সমালোচনা কল্পনার রঙে রঞ্জিত এবং মহৎ আদর্শের দীপ্তিতে আলোকিত সেখানেও এই বিস্তৃত বিশ্লেষণের অবসর অল্প। যে মধ্যবিত্ত-সমাজ রবীন্দ্র-উপন্যাসের উপজীব্য সেই মধ্যবিত্ত-সমাজ ঘটনাবহুল নয়, তথ্য-সমৃদ্ধ নয়; তাহার জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহ ধীর ও মন্থর, সাধারণ ঘটনা স্বাভাবিক কারণে সংঘটিত হওয়াই এই সমাজের সাধারণ নিয়ম, ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ গ্লানি বিরোধ যাহা কিছু দেখা দেয় এই জীবনে, তাহাও স্বাভাবিক কারণেই, সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধী আদর্শের সংঘর্ষের ফলে। মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের এই স্বাভাবিক প্রবাহের চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে সূক্ষ্ম সুবিস্তৃত সুনিপুণ বিশ্লেষণ লাভ করিয়াছে। এই জীবনের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্ব সমস্যা গ্লানি বিরোধ কলহ আনন্দ ঘাতপ্রতিঘাত সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া বিস্তৃত করিয়া কার্যকারণ-পরম্পরায় এমনভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যাহার ফলে পাঠকের মনে বাস্তবানুভূতি দৃঢ় ও প্রবল হইয়া মুদ্রিত হয়, এবং সমাজের বিচিত্র চিন্তা ও কর্মপ্রবাহ, বিচিত্র ধারণা ও আদর্শ, এক কথায় সমাজজীবন সম্বন্ধে চেতনা জন্মায়। এই হিসাবেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বঙ্কিম-উপন্যাসাপেক্ষা অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠ; রবীন্দ্রোপন্যাসে বাস্তবানুভূতি প্রবল। তাঁহার পরবর্তী পর্যায়ের ছোটগল্পে এবং "চোখের বালি" হইতে আরম্ভ করিয়া সকল উপন্যাসেই এই বাস্তবনিষ্ঠা মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের অন্তর্নিহিত বিরোধগুলিকে দ্বন্দ্বসমস্যাগুলিকে টানিয়া বাহির করিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সম্বন্ধে চেতনাই সামাজিক চেতনা। এই গভীরতর বাস্তবনিষ্ঠাই রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম ও প্রধান এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্যের প্রধান হেতু। এই গভীরতর বাস্তবতাই পররর্তীকালে মধ্যবিত্ত সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া নূতনভাবে সত্য ও বাস্তবানুভূতি সঞ্চার করিতেছে।

সাধারণভাবে এই সামাজিক পটভূমি মনের পশ্চাতে রাখিয়া এবং রবীন্দ্র-উপন্যাসের ধর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি উপরের কথা কয়েকটি স্মরণে রাখিয়া এইবার এক একটি করিয়া কালানুক্রমিক উপন্যাসগুলি আলোচনা করা যাইতে পারে।

দুই

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট (১২৮৮—৮৯)

রাজর্ষি (১২৯২)

"বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" ও "রাজর্ষি" এই দুইটি উপন্যাসই বঙ্কিমচন্দ্রের চক্রবর্তীছত্র-ছায়ায় বসিয়া লিখিত। বাংলা সাহিত্যে তখনও বঙ্কিম-রমেশের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুরা মরশুম চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২০—২৪ বৎসর। বয়সটা এমন যখন নিজেকে নিজে খুঁজিয়া পাওয়াটা খুব সহজ নয়, অথচ প্রতিবাসীজনের প্রভাব এড়াইয়া চলা

আরও কঠিন। তাহার উপর "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" রচনা যখন আরম্ভ হয়, তখন 'হৃদয় নামক অরণ্যে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছেন; সমস্ত চিন্তা ও আবেগ তখনও অস্পষ্ট কুয়াশার জালে আচ্ছন্ন। এই সময়ের "সন্ধ্যা-সংগীত" এমন কি কতকাংশে "প্রভাত-সংগীত"-কাব্যেও যেমন, এই দু'টি উপন্যাসেও তেমনই বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্বের পরিচয় বিশেষ কিছু নাই। এই অস্ফুট অপরিণত অবস্থার প্রকাশগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন, "ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংস্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গণ্ডিবদ্ধ হইয়া মানুষ হইয়াছিলাম তাহাতে লিখিবার সম্বল পাইব কোথায়?" ("জীবন-স্মৃতি", ২২০ পৃঃ)। প্রায় এই সময়কার সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে অন্যত্র বলিতেছেন, "তখন বিদ্যাও ছিল না, জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প, তাই গদ্যপদ্য যাহা লিখিতাম তাহার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশি।" ("জীবন-স্মৃতি", ২৬১ পৃঃ)। এই অপরিণত মানসের সৃষ্টি সম্বন্ধে কবির নিজের এই বিশ্লেষণ ও মন্তব্য অপেক্ষা যথার্থতর বিচার আর কিছু হইতে পারে না। এই বিচার সমসাময়িক কাব্য-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যে পরিমাণে সত্য ঠিক সেই পরিমাণেই সত্য প্রথম দুইটি উপন্যাস প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও। ইহাদের মধ্যেও বস্তু যেটুকু আছে ব্যক্তি-মানসের উদাস অনুপলব্ধ ভাবুকতা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি; লেখকের নিজের চিত্ত ও মন যেমন এই সময় অস্পষ্ট কুহেলিকায় আচ্ছন্ন উপন্যাস দু'টির অধিকাংশ চরিত্রই তেমনই অস্পষ্ট, অগভীর কুয়াশায় আচ্ছন্ন। দুইটি উপন্যাসেই ঘটনা-বিন্যাস ও জীবন-সমালোচনা অত্যন্ত সহজ, জটিলতা বিহীন, অবিমিশ্র গুণ বা অবিমিশ্র দোষ প্রত্যেকটি চরিত্রের ধর্ম, অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় অথবা বিরোধী আদর্শ বা উপাদানের সমন্বয় কোনও চরিত্রে বা ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে নাই বলিলেই চলে।

"বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" ও "রাজর্ষি" দুইই পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত, দুয়েরই ঘটনা-বিন্যাস ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে বিধৃত। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্যকোলাহলময় রঙ্গভূমি ছায়ার মত অস্পষ্ট, ইতিহাস একটা অর্থহীন আশ্রয় মাত্র; ইতিহাসের জীবন ও উদ্দীপনা উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার কোনও পরিচয় কোথাও নাই। প্রতাপাদিত্য অথবা বসন্তরায়, গোবিন্দমাণিক্য অথবা রঘুপতি ইহারা প্রত্যেকেই এক-একটি ধর্ম ও প্রকৃতির এক-একটি বিশেষ প্রতিমূর্তি, ইতিহাসের নায়ক না হইলেও ইহাদের কোনও ক্ষতি ছিল না। যে জটিল মানস-জীবন ও কর্মপ্রবাহের সুনিপুণ বিশ্লেষণ ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রকে বিচিত্রতা দান করিয়া জীবনের সমগ্র রূপ গড়িয়া তোলে সেই বলিষ্ঠ কল্পনার এবং কার্য-প্রণালীর পরিচয় এই উপন্যাস দু'টিতে নাই। থাকিবার কথাও নয়। প্রথমত, রবীন্দ্রমানস তখনও অপরিণত, বস্তুর সঙ্গে তাহার পরিচয় তখনও বিশেষ কিছু হয় নাই, জীবনের অভিজ্ঞতাও অল্প। দ্বিতীয়ত, যে-ইতিহাসের কাঠামোকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন সে-আশ্রয় তাহার কাছে অর্থহীন, তাহা অস্পষ্ট বিস্মৃতির স্মৃতিমাত্র; সেই ইতিহাসের সঙ্গে ইতিহাসগত মানুষগুলির যেন কোনও সহজ প্রাণের সম্বন্ধ নাই। সেই যুগের অধিকাংশ উপন্যাস ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল মাত্র। এই দু'টি উপন্যাস সম্বন্ধে ইতিহাসের আশ্রয় সেই হেতু অবান্তর। "বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে" যশোহর ও চন্দ্রদ্বীপের পারিবারিককলহ, এমন কি ফর্নাণ্ডিজ অথবা পাঠান দস্যুদ্বারা রায়গড়-রাজ বসন্তরায়ের হত্যা, "রাজর্ষি"তে মোগলসৈন্যের অক্রমণ অথবা শাহ সুজার রাজধানী, উপন্যাসের

দিক হইতে ইহারা কোনও মূল্যই বহন করে না, ইহারা কিছুই উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রকে সার্থকতা দান করে না।

তবু, এই দু'টি উপন্যাসেও রবীন্দ্র-মানসের বিশেষ ধর্মটি কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এই অপরিণত বয়সেও ইতিহাসের অর্থহীন কল-কোলাহল এবং বাহ্য ঘটনা-বৈচিত্র্যের পশ্চাতে তিনি স্নেহ-প্রেম-প্রীতিপূর্ণ উদার মুক্ত প্রাণের অখণ্ড শান্তির সন্ধান করিয়াছেন ; এই উদার মুক্তি ও শান্তিই তাঁহাকে ইতিহাসের ও সাধারণ মানব-সংসারের চঞ্চল কর্মপ্রবাহ হইতে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। "বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে" প্রতাপাদিত্যের নির্মম ক্রূরতা ও হিংস্র ভীষণতার, রামচন্দ্রের নির্বোধ ঔদ্ধত্যের পাশে পাশে যদি বসন্তরায়ের মুক্ত উদার প্রাণের আনন্দময় সারল্য, বিভার কারুণ্যমণ্ডিত বিষাদগ্রস্ত মুখশ্রী, উদয়াদিত্যের ভাগ্য-বিপর্যস্ত জীবনের ম্লানিমার কথা চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে সহজেই বুঝা যাইবে শেষোক্ত চরিত্রগুলির স্বচ্ছ সহজ মুক্ত জীবনধারার প্রতিই লেখকের পক্ষপাত বেশি। "রাজর্ষি"তেও রঘুপতি, নক্ষত্ররায় অপেক্ষা গোবিন্দমাণিক্য ও কোমল-হৃদয় হাসি ও তাতার, জয়সিংহের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনের সৌন্দর্যের প্রতিই কবির পক্ষপাত। এই স্বচ্ছ কোমল সুকুমার, মুক্ত উদার জীবন-প্রবাহই রবীন্দ্র-কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে। অবশ্য, চরিত্র-সৃষ্টির দিক হইতে রঘুপতিই সকলের চেয়ে জীবন্ত এবং সে-ই সর্বাপেক্ষা লেখকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতির উপরই তিনি সমস্ত বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রের কোনও প্রসার নাই, সহজ ও সরল না হইলেও তাহার মধ্যে খুব বিরোধী উপাদানের সংগ্রাম নাই। তাহার পরিচয় অন্যান্য চরিত্রের মত খণ্ডিত ও একদেশী, অনেকটা অস্পষ্ট ভাবুকতায় আচ্ছন্নও বটে! বিরোধী উপাদানের সংগ্রাম একমাত্র রঘুপতি চরিত্রেই আছে, এবং সেই হেতুই এ-চরিত্র জটিল ও জীবন্ত ; কিন্তু এই দুটি বিরোধী আদর্শ ও দ্বন্দ্ব খুব সমন্বায়িত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, এক প্রকৃতির উপর আর এক প্রকৃতির প্রভাব যেন নাই। নক্ষত্ররায়েরও প্রাক্-সিংহাসন লাভের জীবনের মধ্যে কোনও মিশ্র বা বিরোধী গুণের সমাবেশ নাই। তবে সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরে ভিতরে যে মানসিক বিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে লেখকের খুব সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় এই অপরিণত ভাবকল্পনার মধ্যেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। "বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে" প্রতাপাদিত্যের চরিত্রও গোবিন্দমাণিক্যের মত খণ্ডিত ও একদেশী ; উপন্যাস-গত চরিত্রের যে প্রসার ও নমনীয়তা চরিত্রকে বাস্তব ও জীবন্ত করিয়া তোলে, যে বিরোধী উপাদানের দ্বন্দ্ব উপন্যাস-গত চরিত্রকে জটিল গভীর ও রহস্যময় করিয়া তোলে প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে অথবা এই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রে তাহার পরিচয় কমই আছে ; ঘটনাসংস্থানের মধ্যেও তাহা নাই। উদয়াদিত্য, সুরমা অথবা বিভার জীবনেও উপন্যাসোচিত গভীরতা অথবা জটিলতা কিছুই নাই। আর বসন্তরায় ত সহজ সরল উদার আনন্দের প্রতিচ্ছবি মাত্র। এই বৃদ্ধ "একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মত, অম্লরসের আভাসমাত্র বর্জিত!" কিশোর রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে তাঁহার সেই বয়সের কাব্যরচনার একটি শ্রোতা লাভ করিয়াছিলেন ; তাঁহার নাম শ্রীকণ্ঠবাবু।

"* * * ভালো লাগিবার শক্তি ইঁহার এতোই অসাধারণ যে মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচক পদ লাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য। বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মত—অম্লরসের আভাসমাত্র বর্জিত—তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশও ছিল না। মাথাভরা টাক, গোঁফ-দাড়ি কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখ-বিবরের মধ্যে

দন্তের কোনো বালাই ছিল না, বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের পার্সিপড়া রসিক মানুষ, ইংরাজির কোনো ধার ধারিতেন না। তাঁহার বাম পার্শ্বের নিত্য সঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার এবং কণ্ঠে গানের আর বিরাম ছিল না!

"পরিচয় থাক আর নাই থাক স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষমাত্রেরই প্রতি তাঁহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না। *** সকল মানুষের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধটি স্বভাবত নিষ্কণ্টক ছিল; তিনি কাহারো সম্বন্ধেই সংকোচ রাখিতেন না, কেননা তাঁহার মনের মধ্যে সংকোচের কারণই ছিল না।

"তিনি এক একদিন আমাকে সঙ্গে করিয়া একজন য়ুরোপীয় মিশনরির বাড়িতে যাইতেন। সেখানে তিনি গিয়া গান গাহিয়া, সেতার বাজাইয়া, মিশনরির মেয়েদের আদর করিয়া, তাহাদের বুটপরা ছোট দুইটি পায়ের অজস্র স্তুতিবাদ করিয়া সভা এমন জমাইয়া তুলিতেন যে তাহা আর কাহারো দ্বারা কখনই সাধ্য হইত না। আর কেহ এমনতরো ব্যাপার করিলে নিশ্চয়ই তাহা উপদ্রব বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু শ্রীকণ্ঠবাবুর পক্ষে আতিশয্যই নহে, এই জন্য সকলেই তাঁহাকে লইয়া হাসিত, খুশি হইত।

"আবার তাঁহাকে কোন অত্যাচারকারী দুর্বৃত্ত আঘাত করিতে পারিত না। অপমানের চেষ্টা তাঁহার উপরে অপমান রূপে আসিয়া পড়িত না। ***

"কেহ দুঃখ পায় ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না, ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল! এইজন্য বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস বা শকুন্তলা হইতে কোনো একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইয়া, তিনি দুই হাত মেলিয়া নিষেধ করিয়া অনুনয় করিয়া কোনো মতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।" ("জীবন-স্মৃতি", ৫৩-৫৮ পৃষ্ঠা)

এই সময় রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদকর্তা বসন্তরায়ের পদাবলীর খুব অনুরক্ত পাঠক ও শ্রোতা ছিলেন; এই পদকর্তার পদাবলী সম্বন্ধে তিনি আলোচনাও করিয়াছিলেন। কিশোর জীবনের স্মৃতি হইতে শ্রীকণ্ঠবাবুর চরিত্রটি এবং পদকর্তা বসন্তরায়ের নামটি এই দুইটিকে মিলাইয়া যেন লেখক রায়গড়ের রাজা বসন্তরায়টিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধরনের স্বচ্ছ মুক্ত উদার সদানন্দ-জীবনের প্রভাব সাংকেতিক রহস্যময় রবীন্দ্র-নাট্যগুলিতে সুস্পষ্ট।

তিন

চোখের বালি (১৩০৮)

নৌকাডুবি (১৩১০-১১)

কোনও একখানি উপন্যাস যদি কোনও সাহিত্যে উপন্যাসের প্রচলিত ধর্ম ও প্রকৃতি একেবারে বদ্‌লাইয়া দিয়া নূতন যুগের সূচনা করিয়া থাকে, নূতন বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"। প্রায় পনেরো বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনা করিলেন; ইতিমধ্যে তাঁহার কবি-জীবন "কড়ি ও কোমল-মানসী-সোনার-তরী-চিত্রা-চৈতালি-কল্পনা"র সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া "নৈবেদ্যে" আসিয়া পৌছিয়াছে; বিচিত্র কর্ম ও চিন্তাপ্রবাহ তাঁহার জীবনকে বিচিত্র ছন্দ বিচিত্র অনুভূতিতে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই পনের-ষোল বৎসরে জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার কম হয় নাই, বস্তুর-সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়ার ফলে নিজের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে চেতনাও কম হয় নাই। এই সুদীর্ঘ কালের জীবন-ইতিহাসের মধ্যে তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট। মধ্যবিত্ত-সমাজের মানুষ, তাহার সুখ ও দুঃখ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, শক্তি ও দুর্বলতা, আনন্দ ও বিরোধ সকলই ইতিমধ্যে তাঁহার নিকটতর হইয়াছে, এবং সমসাময়িক কালের ভাবাদর্শের ছোঁয়াচও তাঁহার চিত্তে

লাগিয়াছে : শুধু লাগিয়াছে নয়, তাঁহার মগ্ন-চেতনার মধ্যে সেই সব ভাবাদর্শ ও বাস্তব জীবনধারা নূতন অনুভূতি, নূতন অনাস্বাদিত রসের সঞ্চার করিয়াছে। "চোখের বালি"তে ইহারা সমস্তই রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।

"চোখের বালি" 'নষ্টনীড়' গল্পের সমসাময়িক রচনা। দুইয়েরই ধর্ম এক ; কাঠামো এবং আশ্রয় বিভিন্ন। "চোখের বালি" বাংলা সাহিত্যে প্রথম সমাজ-জীবনাশ্রিত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-মূলক সমস্যানিষ্ঠ উপন্যাস। এই ধরণের উপন্যাসের পর্ব-সূচনা হইল এই গ্রন্থটি দ্বারা। ইহার আগে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ছিল প্রধানত ঘটনা নির্ভর ; ঘটনার সুন্দর যথাযথ সমাবেশেই ছিল উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ; "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" এবং "রাজর্ষি"ও সেই আদর্শকেই অনুসরণ করিয়াছে। "চোখের বালি" ঠিক ইহার বিপরীত ; ইহার আখ্যানভাগ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, দীর্ঘায়ত ইহার চরিত্র চতুষ্টয়ের মনোবিশ্লেষণের ধারা। ঘটনার পৌর্বাপর্য মনোবিকাশের সহায়ক মাত্র। সমস্ত গল্পভাগ এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলা যায় ; কিন্তু তাহা আখ্যানমাত্র, তাহার মধ্যে বাস্তবানুভূতি নাই ; বাস্তবানুভূতির সঞ্চার হয় তখন যখন আমরা জানিতে পারি বিনোদিনী ও আশা, মহেন্দ্র ও বিহারীর চিত্ত-গহনের নানা চিন্তা ও ভাবের আনাগোনার খবর, তখনই তাহারা প্রকাশ্যে যাহা করে তাহার সত্য অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই ধরণের বিশ্লেষণ, মানুষের বিচিত্র কর্মের ও চিন্তার কার্যকারণ-সম্বন্ধটিকে আবিষ্কার করার এই জাতীয় প্রয়াস, এবং বস্তুর অন্তর্নিহিত ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা "চোখের বালি"ই বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করিল।

"চোখের বালি" প্রকাশিত হইয়াছিল নবপর্যায় "বঙ্গদর্শনে"র প্রথম বৎসরে। "নৈবেদ্যে"র কবিতা রচনা তখন সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। "সাধনা"র যুগে যেমন, এখনও তেমনিই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্ফুরণ সকল দিকে। কবিতা ও উপন্যাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মপ্রচেষ্টা, নানা ভাবাদর্শের সংগ্রাম ইত্যাদি সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক আলোচনা ইত্যাদি চলিতেছে। অথচ আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির কত প্রভেদ! "নৈবেদ্য"র সুরের সঙ্গে "চোখের বালি"র জীবন-দর্শনের মিল খুঁজিয়া পাওয়া সত্যই কঠিন ; "অথবা "চোখের বালি"র সঙ্গে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ', 'আমাদের সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' ইত্যাদি লইয়া যে তর্ক বিতর্ক আলোচনা তাহারই বা যোগ কোথায় ; অথচ একটু গভীরভাবে দেখিলে মনে হয়, বিভিন্ন দিকে কবি-মানসের এই যে স্ফুরণ, তাহা আমাদের জীবন সম্বন্ধে কবিচিত্তে একটি পূর্ণ অখণ্ড দর্শন গড়িয়া তুলিতেই সহায়তা করিয়াছে, সমাজ-জীবন সম্বন্ধে গভীরতর চেতনা সৃষ্টি করিতেই সাহায্য করিয়াছে। বিভিন্ন দিকে সাহিত্য প্রচেষ্টার বিভিন্ন সুর আপাতদৃষ্টিতে যতটা বিচ্ছিন্ন মনে হয়, সত্য সত্যই তাহা ততটা বিচ্ছিন্ন নয়, তাহারা এক অখণ্ড জীবন-দর্শনের খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন রূপ মাত্র।

"চোখের বালি"র ঘটনা-বিন্যাস কতকটা শিথিল। তাহা ছাড়া সমস্ত গল্পভাগ আগাগোড়া এত সহজ সরলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে এমন জটিল মানসিক ভাঙাগড়ার মধ্যেও কোথাও গল্প খুব জমাট ও দৃঢ় হইয়া উঠে নাই। অথচ তাহার সুযোগ ছিল। যে-বিনোদিনীর চিত্র লেখক আঁকিয়াছেন এবং আমাদের ধ্যান ও বিশ্বাসের মধ্যে তাহার সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই বিনোদিনী যখন তাহার গ্রামের বাড়িতে একচিত্তে বিহারীর ধ্যানে মগ্ন তখন হঠাৎ পাগলের মতন মহেন্দ্র একদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ; আর একদিন বিনোদিনী তাহার তৃষিত বুভুক্ষিত দেহচিত্ত একেবারে মহেন্দ্রর হাতে প্রায়

তুলিয়াই দিয়াছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই শ্লেষবিদ্ধ হইয়া নিজকে সংকুচিত করিয়া লইয়াছিল; আরও একদিন সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এলাহাবাদে যমুনার নির্জন পরিবেশের মধ্যে বিনোদিনী বিহারীকে পাইয়াছিল একান্তভাবে নিজের করপুটের মধ্যে। এই সমস্তই গল্পের চরম মুহূর্ত, এবং এই সব মুহূর্তের নাটকীয় সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট।. কিন্তু এই সব চরম মুহূর্তেও লেখক অবিচলিত; তাঁহার মানসিক প্রশান্তি ও সংযম এত বেশি যে তিনি এই সব চরম মুহূর্তেও কোথাও তাহার সরল সহজ বর্ণনা ভঙ্গিকে এতটুকু গতিবেগ কিংবা মোহাবেগ দান করেন নাই, কোথাও তাহাকে নাটকীয় বঙ্কিমগতি দান করিয়া পাঠককে মোহগ্রস্ত করিয়া তুলেন নাই। সমস্ত গল্পটি যেন একটি সমতল রেখা, উত্তেজিত মুহূর্ত আছে প্রচুর, কিন্তু লেখকের মনে উত্তেজনা নাই, রচনায়ও নাই। নাই যে তাহার কারণ লেখকের একান্ত প্রশান্ত সংযত মানস যাহা "সোনার তরী", "চিত্রা" "কল্পনা"র অনেক কবিতায়ও সুস্পষ্ট, আর এক কারণ তাহার অখণ্ড রোম্যাণ্টিক জীবন-দর্শন। বিনোদিনী সম্বন্ধে, মহেন্দ্র সম্বন্ধে, বিহারী সম্বন্ধে গোড়া হইতেই তিনি একটি সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস ধারণা তাঁহার মনে স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়া লইয়াছেন; তাহা কতটুকু বাস্তবনিষ্ঠ, কতটুকু নয়, সে-প্রশ্ন পরে আলোচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু এই সুস্পষ্ট ধারণানুযায়ীই তিনি গল্পের চরম মুহূর্তগুলি যেমন গড়িয়াছেন, তেমনি গড়িয়াছেন চরিত্রগুলির ব্যবহার, এবং ভাষার এবং বর্ণনার গতি। বর্ণনা যদি বিচলিত হয়, আবেগ-চঞ্চল হয়, তাহা হইলে চরিত্রগুলির পরিণতি সম্বন্ধে যে-ধ্যান লেখকের মনে আছে তাহা অবিচলিত থাকিবে কি? কোনও চরিত্রেরই চরম সম্পূর্ণ সর্বনাশ ত লেখকের ধ্যানের মধ্যে ছিল না, কাজেই চরম উত্তেজিত মুহূর্তে বর্ণনাকে চঞ্চল করিয়া, নায়ক নায়িকাকে চঞ্চল করিয়া তাহাদের সর্বনাশ ঘটাইলে পাঠকের মনে জীবন-দর্শনের অখণ্ডতা অটুট থাকিবে কি?

"চোখের বালি"র ঘটনাস্রোত চরিত্রগুলির নিজস্ব গভীর উৎস হইতেই প্রবাহিত। আশা, বিহারী, মহেন্দ্র, বিনোদিনী এই চারিজনের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই উপন্যাসের বিচিত্র ও জটিল ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়াছে। এই চারিজনের মধ্যেও আবার মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর চিত্তদ্বন্দ্বই জটিলতর, সে জটিলতাকে ঘনীভূত করিয়াছে আশা ও বিহারীর সম্বন্ধ, এবং চারিজনের আকর্ষণ বিকর্ষণকে নূতন ফাঁসে, জটিলতর গ্রন্থিতে জড়াইয়াছেন রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা। পুত্রসর্বস্ব, অভিমানী রাজলক্ষ্মী নিজেই পুত্রবধূ আশাকে একহাতে খর্ব করিয়াছেন, আর এক হাতে পরোক্ষভাবে বিনোদিনীকে দিয়া পুত্রকে প্রলুব্ধ করিয়াছেন। অন্নপূর্ণার অপরাধ আশার মাসি হওয়া। এ-অপরাধে তাহার কোনও হাত ছিল না; কিন্তু তিনি মহেন্দ্রের অপরাধে নিজেকে দোষী মনে করিয়া কাশীবাস করিতে গিয়া মহেন্দ্রের দুর্দম প্রবৃত্তির যথেচ্ছচারিতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গেলেন। আশা কতকটা অস্পষ্ট ও ছায়াময়, মহেন্দ্রের উন্মত্ত অসংযত হৃদয়াবেগ ও বিনোদিনীর দীপ্তির পাশে সে কতকটা নিষ্প্রভ, প্রায় অবলুপ্ত; তাহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় একটু মাত্র পাওয়া যায় মহেন্দ্রের দ্বিতীয়বার গৃহত্যাগের পর ধীরে ধীরে, এবং পরে একেবারে শেষদিকে রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুশয্যায় বিহারীর উপর নির্ভরে এবং মহেন্দ্রের প্রতি ব্যবহারে। অনেক ঝড় অনেক বিপ্লবের পর সে যেন সত্য মনুষ্যত্ব লাভ করিল। বিহারীর ব্যক্তিত্বও ফুটিল অনেক বিলম্বে; প্রথম দিকে ত তাহার কোন সত্তাই নাই, সে-শুধু মহেন্দ্র-চরিত্রকে ফুটাইতে সহায়তা করিয়াছে মাত্র। তাহার এই ব্যক্তিত্বকে টানিয়া বাহির করিয়াছে বিনোদিনী, সে-ই তাহাকে তাহার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তাহার যৌবনোন্মেষ ঘটাইয়াছে। বালির

বাগানে দরিদ্র কেরানীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার যখন সে স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইয়াছে, তখন একান্ত কর্তব্যনিষ্ঠ বিহারীর সর্বপ্রথম মনে হইল, "এ কাজে কোনো সুখ নাই কোনো রস নাই, কোনো সৌন্দর্য নাই, ইহা কেবল শুষ্ক ভার মাত্র। কাজের কল্পনা বিহারীকে কখনও ইতিপূর্বে এমন করিয়া ক্লিষ্ট করে নাই।" এই বালির বাগানেই "বিহারীর মধ্যে যে যৌবন নিশ্চলভাবে সুপ্ত হইয়াছিল, যাহার কথা সে কখনো চিন্তাও করে নাই, বিনোদিনীর সোনার কাঠিতে সে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে।" তারপর তাহার পরিপূর্ণ উন্মেষ ঘটিল এলাহাবাদে বিহারীর নির্জন ঘরে বিনোদিনী যেদিন বিহারীর পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। মহেন্দ্রের শ্লেষ ও অপমান হইতে বিনোদিনীকে রক্ষা করিবার জন্য বিহারী যখন বিবাহের প্রস্তাব করিল তখনই আমরা বিহারীর স্বাধীন সত্তার প্রথম ও শেষ এবং একমাত্র পরিচয় পাইলাম।

মহেন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই কারণ তাহার সম্বন্ধে সকল কথাই লেখক নিজেই বলিয়া দিয়াছেন; এক হিসাবে মহেন্দ্র-চরিত্রই এই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও পূর্ণ বিশ্লেষিত। যে অসংযত ও অস্বাভাবিক মাতৃভক্তি ও নববধূ-প্রেম লইয়া তাহার জীবন আরম্ভ, যে প্রবল আত্মাভিমান প্রথম হইতেই তাহার মধ্যে স্ফীতিলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, সেই অসংযম ও আত্মাভিমানই তাহাকে বিনোদিনীর সম্মোহনে ভুলাইয়াছে, এবং তাহারাই আবার বিনোদিনীকে দূরে সরাইয়া তাহার প্রতি বিমুখও করিয়াছে। মহেন্দ্র গোড়া হইতেই spoilt child; না চাহিতেই, নিজের যোগ্যতার প্রমাণ না দিয়াই সে সব কিছু পাইয়াছে, এমন কি আশাকেও। বিহারীর হাত হইতে আশাকে এত সহজে সে পাইয়াছে, বিহারীর বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাস সে এত সহজে লাভ করিয়াছে যে, স্বতঃই সে মনে করিয়াছিল, কোনও মূল্য না দিয়া যোগ্যতার পরিচয় না দিয়াই সে বিনোদিনীকে পাইবে। দুর্বল, অসংযত, আত্মাভিমানী মহেন্দ্র সে পরিচয় দিতে পারিল না। স্বভাবে সে দীন, চরিত্রে সে দুর্বল! হঠাৎ মনে হয়, মহতী বিনষ্টিই এই জাতীয় লোকদের একমাত্র পরিণতি হওয়া উচিত, কিন্তু তাহাকেই কিনা লেখক ফিরাইয়া দিলেন তাহার আশাকে, তাহার সুখের সংসারের মধ্যে! ইহাই কি হইল সুবিচার! আর জীবন ও যৌবন যাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে অথচ পরিপূর্ণ মূল্য দিয়া যে জীবন ও যৌবনকে কামনা করিল সেই বিনোদিনীকেই দিলেন উভয় হইতেই নির্বাসন! কিন্তু, এ বিস্ময়-প্রশ্ন বোধ হয় খণ্ডিত জীবন-দর্শন-জাত। দীনস্বভাব, দুর্বলচরিত্র বলিয়াই মহেন্দ্রকে একেবারে মহতী বিনষ্টির গহ্বরে ঠেলিয়া দিতে হইবে কেন? শাস্তি সে ত যথেষ্ট পাইয়াছে; বিনোদিনীকে সে হারাইয়াছে, যে মোহ-মরীচিকা তাহাকে পথভ্রান্ত করিয়াছিল তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে, বিহারীর শ্রদ্ধাও সে হারাইয়াছে এবং যে-আশার কাছে সে ফিরিয়া আসিল সেই আশা আগেকার আশা নয়, এই আশা বাড়ীর কর্ত্রী, বিহারী তাহার রক্ষক ও সুহৃৎ এবং এই আশার কাছে মহেন্দ্রকে অপরাধীর মতন আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে; যে সুখের সংসারে সে ফিরিয়া আসিয়াছে সে-সংসারেও আগে তাহার যে জায়গা ছিল, এখন "সে-জায়গা ঠিক আর তেমনটি নাই।" এতগুলি মূল্য তাহার কাছ হইতে আদায় করিয়া লইয়া তবে লেখক তাহাকে মহতী বিনষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ইহাই অখণ্ড জীবন-দর্শন; জীবনের খণ্ডিত রূপের মধ্যেই মহতী বিনষ্টির স্থান আছে, অখণ্ড রূপের মধ্যে নাই। আর শিল্পীর প্রধান

কর্তব্য ত মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনায়, ভাব ও অনুভবের মধ্যে বিশ্বাস সঞ্চার করা ; সেই দিক দিয়া মহেন্দ্রর এই পরিণতি লেখক যে-ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা কিছু অবিশ্বাস্য নয়, অস্বাভাবিকও নয়, অবাস্তব ত নয়ই।

কিন্তু বিনোদিনী চরিত্রের পরিণতি সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা চলে না। সে-ক্ষেত্রে আর্ট ও জীবন-দর্শন এই উভয় দিক হইতেই একটু আপত্তি করিবার আছে। কিন্তু সে-কথা বলিতে হইলে বিনোদিনীর চরিত্র একটু বিস্তৃত করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হয়। জীবন-বঞ্চিত অতৃপ্ত-কাম বিনোদিনীর যৌন-জীবনে ব্যক্তিত্ব-বোধই তাহার চরিত্রে যাহা কিছু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। মহেন্দ্রের যৌবন ত তাহারই ভোগ্য ছিল, ঘটনাচক্রে তাহা হয় নাই, তাহার জায়গায় বসিয়াছে আশা, সেই আশাকে অবলম্বন করিয়া যখন সে মহেন্দ্রের জীবনে অবতীর্ণ হইল, তখনই ঘূর্ণাবর্তের সূচনা। ঈর্ষাদগ্ধ বিনোদিনী ধীরে ধীরে অতি সুকৌশল প্রেমাভিনয়ের যে-মোহজাল বিস্তার করিল মহেন্দ্র তাহার মধ্যে নিজকে ধরা দিল। কিন্তু বিনোদিনী সহজেই কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল মহেন্দ্র দীনস্বভাব, দুর্বল, ব্যক্তিত্বহীন, তাহার উপর নির্ভর ও বিশ্বাস করা চলে না। অথচ মহেন্দ্ররই পাশে পাশে ছায়ার মত যে সঙ্গী, সেই বিহারী অচল, অটল, গভীর ও দৃঢ়চরিত্র। কাজেই মহেন্দ্রর উপর তাহার অশ্রদ্ধা ও বিরাগ ক্রমশ যতই বাড়িতে লাগিল, ততই সে বিহারীর প্রতি উন্মুখ হইতে আরম্ভ করিল। মহেন্দ্রর উপর যদি সে নির্ভর ও বিশ্বাস করিতে পারিত, তাহা হইলে সে যে মহেন্দ্র ও আশার দাম্পত্যপ্রেমের উপর জয়ী হইয়াছে, এই মনে করিয়াই হয়ত সে তাহার দেহমনের মহাবুভুক্ষার উপরও জয়ী হইতে পারিত, প্রণয়িনী বিনোদিনী বিজয়িনী বিনোদিনীর কাছে হয়ত হার মানিত। কারণ, মহেন্দ্রর প্রতি তাহার যে আকর্ষণ তাহা ঈর্ষাজনিত, অধিকার বোধজনিত, মহেন্দ্রের উপর সে-অধিকার প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলেই সে-আকর্ষণের বিলুপ্তি। সে-অধিকার প্রতিষ্ঠার অর্থ ছিল মহেন্দ্র ও আশার সর্বনাশ। যাহাই হউক, তাহা হইল না। ধীরে ধীরে বিহারীর প্রতি তাহার অনুরাগ বিকশিত হইয়া উঠিল, এবং একদিন অনিবার্য বেগে যখন তাহা আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিল তখন অন্তরের অকৃত্রিম আবেগে বিহারীর পা বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়োনা, মন্দকে ভালবাসিয়া একটু মন্দ হও ঠাকুরপো"। কিন্তু বিহারীর কাছে প্রত্যাখ্যান ছাড়া আর কিছু সে পাইল না। তাহা সত্ত্বেও, এর পরেও যখন মহেন্দ্র ভিখারীর মতন বিনোদিনীর পায়ে পায়ে ফিরিল, যখন বিনোদিনী একদিনের, এক মুহূর্তের জন্যও মহেন্দ্রর হাত হইতে তৃষ্ণার জল পান করিল না, তখন এই আশাই একান্ত করিয়া পাঠকের মনকে, বুদ্ধিকে অধিকার করে যে, বিনোদিনীকে যে লেখক নষ্ট হইতে দিলেন না, মহেন্দ্রর সর্বগ্রাসী প্রবৃত্তি হইতে যে তাহাকে রক্ষা করিলেন সে শুধু বিহারী-তীর্থে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবেন বলিয়া। কিন্তু লেখক তাহা করিলেন না। এলাহাবাদের নির্জন ঘরে বিনোদিনী যখন বিহারীকে সব কথা খুলিয়া বলিল, অনাবিল-হৃদয় বিহারী বিশ্বাস করিল, বিশ্বাস করিয়া সর্বপ্রথম যখন সে তাহার ব্যক্তিত্ব-বোধনের প্রমাণ দিল, বিনোদিনীর প্রেমকে সার্থকতা দিবার জন্য ভালবাসিয়া শ্রদ্ধা করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল, তখন কিনা বিনোদিনী বলিয়া বসিল, "ছি ছি, একথা মনে করিতে লজ্জা হয়! আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না! ছি ছি একথা তুমি মুখে আনিয়ো না। * * * ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি একাজ

করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না। * * * ভুল করিয়োনা,—আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে, আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাক, আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।" কিন্তু, এই বিনোদিনী কোন বিনোদিনী? এই বিনোদিনীর সঙ্গে ত লেখক আমাদের পরিচয় করান নাই। এই কল্পলোকের, রোম্যান্স রাজ্যের অধিবাসিনী বিনোদিনীকে ত আমরা জানি না। হঠাৎ বিনোদিনীর এই অভাবনীয় অস্বাভাবিক পরিণতি কি করিয়া হইল, কেন হইল? না ইহা আর্টের দিক হইতে সত্য, না অখণ্ড জীবন-দর্শনের দিক হইতে। গল্পের ভিতর হইতে অনিবার্যভাবে এই বিনোদিনী গড়িয়া উঠে নাই; যে স্থূল বাস্তবতা বিনোদিনী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তাহার সঙ্গে এই ধরনের কল্পলোকের আদর্শবাদের সংযোগ ও সমন্বয় কোথায়? আর অখণ্ড জীবন-দর্শনের দিক হইতেই বা ইহার যৌক্তিকতা কোথায়? ঘটনা-চক্রে যে জীবন-বিড়ম্বিত, সে জীবনকে পাইবার জন্য মূল্য ত কম দেয় নাই, তবু তাহার কলঙ্ক-স্পর্শবিহীন প্রেম প্রেমের তীর্থে পৌঁছিয়া জীবনের সার্থকতা পাইবে না কেন? যে-যুক্তি দিয়া সে বিহারীকে নিরস্ত করিল সে-যুক্তি ত সামাজিক যুক্তি, তাহা না আর্টের যুক্তি, না অখণ্ড জীবন-দর্শনের। আর্টের যুক্তি হইতে হইলে কার্যকারণ-সম্বন্ধের ইঙ্গিতের প্রয়োজন ছিল, তাহা এক্ষেত্রে নাই, আগেই বলিয়াছি, বিনোদিনীর এই শেষ পরিচয় অনিবার্যভাবে গড়িয়া উঠে নাই। একথা আমি ভুলি নাই, বাংলাদেশের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থায় সামাজিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে যৌন-ব্যক্তিত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও বিধবা-জীবনের পরিণতি এইরূপই ছিল। কাজেই সমাজ বুদ্ধির দিক হইতে বিনোদিনীর পরিণাম একান্ত সত্য ও বাস্তবনিষ্ঠ। কিন্তু সমাজ-বুদ্ধির বাস্তবতা ও আর্টের বাস্তবতা ত এক নয়। লেখক বিনোদিনীকে একটা অনিবার্য পরিণামের দিকে লইয়া যাইতেছিলেন পাঠকের মনের একান্ত বাস্তবানুভূতির মধ্য দিয়া, কিন্তু শেষ সীমায় পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্বে হঠাৎ সামাজিক বাস্তবনিষ্ঠা তাহার শিল্পী-মানসকে অভিভূত করিয়া দিল, বিনোদিনীর অনিবার্য পরিণাম না ঘটাইয়া তাহাকে তিনি কল্পলোকের ভাবাদর্শের মধ্যে বিসর্জন দিলেন! জীবন যাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে শিল্পী রবীন্দ্রনাথও তাহাকে বঞ্চনা করিলেন!

তবু, বিনোদিনীই "চোখের বালি"র একমাত্র সত্য। সে-ই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত গল্পটিকে উদ্দীপ্ত ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার দৃপ্ত যৌবনের উজ্জ্বল দীপ্তিই উপন্যাসটির প্রাণ। সে শয়তানী নয়, সে তাহার অবরুদ্ধ কামনার, অতৃপ্ত যৌন বাসনার আগুনে সংসার পোড়ায় নাই, নিজকেই শুধু সে দীপ্তিমতী করিয়াছে। কোথাও সে পাঠকের শ্রদ্ধাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করে নাই। ক্ষুরের ধারের মত দুর্গম পথেই সে আনাগোনা করিয়াছে, অথচ কোথাও তাহার পায়ের নীচে এতটুকু ক্ষতচিহ্ন নাই। বিনোদিনী বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর স্ফুটতর স্পষ্টতর বিস্তৃততর রূপ; বিনোদিনী রবীন্দ্রনাথের দামিনী, শরৎচন্দ্রের অভয়া ও কিরণময়ীর পূর্বাভাস।

সমাজ-সত্তার রূপ "চোখের বালি"তে কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটু আলোচনা এখানে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। বিংশ শতকের সূচনা হইতেই বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের নূতনতর জটিলতা, বিভিন্ন ভাব ও চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতি রবীন্দ্র-ধ্যান-ধারণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বাঙালীর সুবৃহৎ পরিবার ও গোষ্ঠী-জীবনের ভাঙনের

আভাস ইতিপূর্বেই দেখা গিয়াছিল; বঙ্কিমের উপন্যাসে তাহার ছায়া লক্ষ্য করা খুব কঠিন নয়। সে-আভাস বিংশ শতকের গোড়ায় স্পষ্টতর হইল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ দৃঢ়তর হইল; ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয় করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কিন্তু এ-সমস্তই হইল মধ্যবিত্ত-সমাজের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে; কারণ, আগেই বলিয়াছি, বৃহত্তর বাঙালী সমাজের মধ্যে এই শ্রেণীই সামাজিক প্রগতির মুখপাত্র, সামাজিক ধ্যান ধারণার নিয়ন্তা। এই সব নূতনতর জটিলতর সমাজ-সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রমানসের আয়তনভুক্ত হইতে বিলম্ব হয় নাই। এই মধ্যবিত্ত-সমাজের সমস্যা, দায় ও কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন ঐতিহ্যবোধ রবীন্দ্রমানসের বিশিষ্ট লক্ষণ।

সুবৃহৎ পরিবার ও গোষ্ঠী জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের বিদ্রোহ "চোখের বালি"র অনেক জায়গায় সুস্পষ্ট ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "নবযৌবনা নববধূর সমস্ত মিষ্টরস যে কেবল ঘরকন্নার দ্বারা পিষ্ট হইতে থাকিবে", স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধ ইহা সহ্য করিতেই রাজী নয়। মহেন্দ্র একাধিকবার ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ গোষ্ঠীবদ্ধ পরিবারে স্বাভাবিক বিস্তার ও মুক্তিলাভ করিতে পারে না; আধুনিক স্বামী-স্ত্রী এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্বাধীন অস্তিত্ব কামনা করে। শ্বশ্রূ-শাসিত পরিবারে বধূ হওয়াই নারীর অস্তিত্বের একমাত্র পরিচয় নয়, তাহার অন্যতর পরিচয় হইতেছে স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের সম্মিলিত স্বাধীন গোষ্ঠীজীবনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচয়। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ একান্ত সাম্প্রতিক বাঙালী সমাজে নারীকে স্বামী হইতে পৃথক করিয়া নারী হিসাবে নারীর একান্ত স্বাধীন অস্তিত্বও কামনা করিতেছে; রবীন্দ্রনাথেরই পরবর্তী উপন্যাসে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের এই চেতনারও পরিচয় পাওয়া যায়।

এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধেরই অনিবার্য প্রকাশ নারীর যৌনস্বাধীনতাবোধ। এই বোধ সমাজে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে তাহা বঙ্কিম-চেতনার বহির্ভূত ছিল না। "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র রোহিণী-চরিত্রে তাহার পরিচয় আছে; কিন্তু যেহেতু এই বোধ তখনও প্রবল হইয়া উঠে নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাহা একান্তই নূতন, সমসাময়িক সমাজবুদ্ধির পরিপন্থী, সেই হেতু রোহিণী বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই, দরদ ও সহানুভূতিও আকর্ষণ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের কালে রোহিণী বিনোদিনীতে বিবর্তন লাভ করিয়াছে; নারীর যৌন-স্বাধীনতাবোধের রূপ প্রচলিত সংস্কারকে আহত করা সত্ত্বেও আমাদের বোধ ও বুদ্ধির মধ্যে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সামাজিক প্রগতির সাহিত্যিক প্রকাশের এইটুকুই পার্থক্য।

"নৌকাডুবি" "চোখের বালি"র দুই বৎসর পরের রচনা, ১৩১০-১১ সালের নবপর্যায় "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উপন্যাস "স্মরণ", "উৎসর্গ" প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থের, 'স্বদেশী সমাজ', 'সফলতার সদুপায়' প্রভৃতি বিখ্যাত সামাজিক ও রাজনীতিক প্রবন্ধের প্রায় সমসাময়িক। তখনকার বাঙালী পাঠক "নৌকাডুবি" পড়িয়া কি মনে করিয়াছিল, জানি না, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আমরা একটু বিস্মিত হই এই ভাবিয়া যে,"চোখের বালি" রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে দুই বৎসর পর "নৌকাডুবি"র মত রোম্যান্টিক ঘটনা-নির্ভর উপন্যাস কি করিয়া নিঃসৃত হইল। আর্ট এবং মননশীলতা এই উভয় দিক হইতেই "নৌকাডুবি" "চোখের বালি" অপেক্ষা অপরিণত, অথচ কালগণনার দিক হইতে "নৌকাডুবি"

"চোখের বালি"র পরের রচনা।* এই অপরিণতি ঘটনা-সংস্থানের শিথিলতা ও বিষয়বস্তুর দুর্বলতার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। "নৌকাডুবি"-উপন্যাস লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের রচনা নয়, মাসিক-পত্রের তাগাদায় মাসের পর মাস বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন ভাবে লেখা। "বঙ্গদর্শনে"র অনেক পাতাই রবীন্দ্রনাথকে নিজের লেখা দিয়া ভরাট করিতে হইত; এবং যে-বৎসর "নৌকাডুবি" "বঙ্গদর্শনে" ছাপা হইতে আরম্ভ হয়, সেই বৎসর সম্পাদকের হাতে ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাস আর ছিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া রবীন্দ্রনাথকে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল। অন্তরের প্রেরণায় আর প্রয়োজনের তাড়নায় রচনার মধ্যে পার্থক্য কিছু আশ্চর্যের কথা নয়!

"নৌকাডুবি"র ঘটনা-বিন্যাস ত সোজাসুজি রোম্যান্স-প্রবণ কল্পনার সৃষ্টি। আধুনিক মন উপন্যাসে এতটা আকস্মিক ঘটনার উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চায় না। সমস্ত গল্পটিই প্রায় আকস্মিক ঘটনার ফ্রেমে বাঁধা; রমেশ ও কমলার জটিল সম্বন্ধের গ্রন্থি গড়িয়া উঠিয়াছে একটি আকস্মিক বিপর্যয়ের উপর; কমলা ও নলিনাক্ষের পুনর্মিলনও প্রায় সর্বাংশেই দৈবঘটনা-নির্ভর। কমলা যে রমেশের স্ত্রী নয়, একথা আবিষ্কার করিতে রমেশের তিন মাস লাগাটা একটু অস্বাভাবিক, যে-ভুলের উপর রমেশ-কমলার জটিল সম্বন্ধটি দিনের পর দিন ক্রমশ জটিলতর হইতেছিল তাহা এত দীর্ঘ-বিলম্বিত যে তাহাও একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। এ ভুল ভাঙান, এবং সমস্ত জটিলতার অবসান ঘটান এমন কঠিন অসম্ভব ব্যাপার কিছু ছিল না। তাহা ছাড়া, হেমনলিনীর সঙ্গে বিবাহের আগে রমেশ কেন যে কমলা রহস্য উদ্‌ঘাটনে কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা দেখাইল না তাহারও খুব একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এতগুলি বাধা অতিক্রম করিতে পারিলে তবে "নৌকাডুবি"র সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য এবং বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয়লাভ সহজ হয়।

এই নিষ্ঠা ও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায় কমলার চরিত্রে। তাহার প্রণয়াবেগ কি করিয়া ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, কি করিয়া রমেশের দিকে উন্মুখ হইয়াছে, এবং দ্বিধায় আন্দোলিত ও সংকুচিত রমেশের দুর্বল সন্দেহাকুল ব্যবহারে কি করিয়া ধীরে ধীরে প্রীতি ও ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, কি করিয়া শৈলজার সংস্পর্শে আসিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার প্রেমের অপূর্ণতা ও অবাস্তবতা সম্বন্ধে সচেতন হইল, কি করিয়া রমেশের প্রতি তাহার প্রণয় বিরাগে রূপান্তরিত হইল, তাহা অতি নিষ্ঠায় ও নিপুণতায় চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু তারপরেই কমলাকে যে-রূপে আমরা দেখি তাহাতে আর তাহার সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তির কোনও পরিচয়ই নাই। হেমনলিনীর কাছে রমেশের যে-চিঠিতে নিজের জটিল জীবন-রহস্য কমলার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইল, তাহাতে সে যে খুব অভিভূত হইল এমন মনে হয় না, যে-আবেগ আমরা তাহার জীবনে দেখিয়াছি সেই আবেগের কোনও প্রকাশই এ ব্যাপারে দেখা গেল না। যে-মুহূর্তে সে জানিল, সে রমেশের স্ত্রী নয়, নলিনাক্ষ তাহার স্বামী, সেই মুহূর্তেই নলিনাক্ষের প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল, এবং তাহাকে ফিরিয়া পাইবার আগ্রহে সে চক্রবর্তী-পরিবারের স্নেহ-চক্রান্তের মধ্যে জড়াইয়া পড়িল, যে-রমেশের সঙ্গে সে এতদিন ঘর করিল, মেলামেশা করিল, সেই রমেশের কথা একবারও মনে পড়িল না, একথা ভাবিতে বাস্তবানুভূতি অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয় বই কি!

---

* শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত তাঁহার "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"-গ্রন্থে "নৌকাডুবি"কে "চোখের বালি"র আগেকার রচনা বলিয়াই ভুল করিয়াছেন! ২০০ এবং ২০৪ পৃঃ (১ম সং)

কমলার এই ব্যবহার এবং নলিনাক্ষের অতি-মানুষিক জীবন-ভঙ্গি দুইয়ে মিলিয়া এই পুনর্মিলন ব্যাপারটিকে কেমন যেন একটু রোম্যান্টিক করিয়া তুলিয়াছে।

রমেশ আগাগোড়াই দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল। যে-সমস্যা তাহার জীবনে দেখা দিয়াছিল সে-সমস্যা তাহার চরিত্র অপেক্ষা বড় এবং কঠিন। কমলার সঙ্গে ব্যবহারে যে-দ্বিধা ও দুর্বলতা সে দেখাইয়াছে, হেমনলিনীর সঙ্গেও তাহাই। নলিনাক্ষের নাম জানা বা তাহার সন্ধান পাওয়া হয়ত তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু কমলা-রহস্য সে কমলা ও হেমনলিনী উভয়ের কাছেই যে-কোনও মুহূর্তেই উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিত। কিন্তু নিজের দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বলতায় তাহা পারে নাই। একটা শঙ্কিত অস্থিরতা তাহার আগাগোড়া সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে সুস্পষ্ট; সহজ সরল পথে নিজে সে অতি সহজেই সমস্ত সমস্যা ঘুচাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু সে চলিয়াছে স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া। হেমনলিনীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম এবং একটা সহজ ভদ্রতা ও শুচিতাবোধ তাহাকে দিয়াছে প্রবৃত্তি-সংযম; সেই সংযমের সঙ্গে এই একান্ত দুর্বল দৈব-নির্ভরতা মিলিয়া তাহার জীবন-সমস্যাকে এতটা দীর্ঘায়ত ও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

হেমনলিনীর মূল্য ঐতিহাসিক। যে শান্ত একনিষ্ঠ প্রেমে সে আত্ম-সমাহিত সেই প্রেমের গৌরবে সে ফুটিয়া উঠে নাই; নলিনাক্ষের শিষ্যা অথবা ভাবী পত্নীরূপেও তাহার পরিচয় খুব স্পষ্ট নয়। তাহার চরিত্রের একদিকের সুস্পষ্ট আকৃতি ধরা পড়ে শুধু পিতা অন্নদাবাবুর সঙ্গে সূক্ষ্ম সহানুভূতি-সম্বন্ধের মধ্যে। কিন্তু সাধারণ ভাবে তাহার নীরব, সংযত, সমাহিত স্বভাব, সূক্ষ্ম অনুভবক্ষম মন ও হৃদয়, কোমল অথচ দৃঢ়বীর্য, বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখে অচঞ্চল অবিচল দীপ্তি নারীত্বের এক নূতন পরিচয় বহন করিয়া আনিয়াছে, এবং এই পরিচয়ই জীবনের পূর্ণতর অভিজ্ঞতায়, বিচিত্রতর রসে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হইয়া পরে সুচরিতায়, লাবণ্যে, কুমুদিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। হেমনলিনী ইহাদের সকলের পূর্বাভাস।

"নৌকাডুবি"র গল্প-বর্ণনার ভঙ্গি অত্যন্ত লঘু ও সরল; গল্প-বর্ণিত চরিত্রগুলিও অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সহজ। বর্ণনার ভাষা যেমন কোথাও অবেগ-কম্পিত নয় তেমনই চরিত্র ও ঘটনা-বিশ্লেষণের মধ্যেও কোথাও খুব গভীর ও জটিল আলোড়নও কিছুই নাই। সেই সুদীর্ঘ স্টীমার-যাত্রায়ই কেবল রমেশ ও কমলার মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে একটা গভীর আবর্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সচেতন লেখক তখনই রমেশ ও চক্রবর্তী খুড়াকে গল্পের মধ্যে আনিয়া সমস্ত মেঘ কাটাইয়া গল্পের স্বচ্ছ সরল প্রবাহ ফিরাইয়া আনিয়াছেন। অনেক তপশ্চর্যা, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রমেশের সঙ্গে যখন হেমনলিনীর দেখা হইল, কিংবা নলিনাক্ষের নিকট হইতে যখন সে বিদায় লইল, তখন সেই সব দৃশ্যেও খুব গভীর আবেগ বা আকুলতার বা রহস্যময়তার আভাস পাওয়া যায় না। নলিনাক্ষ ও কমলার মিলনদৃশ্যেও খুব নিবিড় রহস্যময় আনন্দানুভূতির ইঙ্গিত নাই। লেখকের মানসিক সংযম ও প্রশান্ত প্রকৃতিই এই মৃদু স্বচ্ছন্দ সমতল গতি ও বর্ণনা-ভঙ্গির উৎস।

চার

গোরা (১৩১৪-১৫)

"গোরা" ১৩১৪-১৫ বঙ্গাব্দে রচিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই "প্রবাসী" মাসিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। "গোরা" বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত একমাত্র উপন্যাস যে-উপন্যাসে সমগ্র

শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বিশেষ যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা ও আদর্শ, সমস্ত বিক্ষোভ ও আন্দোলন, ধর্ম ও জাতীয় জীবনের নূতন আদর্শ-সন্ধানের সমস্ত ভাবাবেগ ও চিন্তা-বিপর্যয়, যুক্তিতর্কের উত্তাপ, অনুভূতির উদ্দীপনা, বুদ্ধি ও বীর্যের দীপ্তি, এক কথায় একটি সমগ্র দেশ ও জাতির পুরোগামী এক শ্রেণীর সমগ্র জীবনধারা রূপ গ্রহণ করিয়াছে। একমাত্র এই উপন্যাসটিতেই বৃহত্তর অর্থে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও আদর্শের সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষের ব্যক্তিগত সংযোগের অবস্থান লইয়া সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস দেখিতে পা য়া যায়। বস্তুত, "গোরা"র প্রসারিত পটভূমি, ইহার সুবিস্তৃত পরিধি, বিশাল, ও গভীর জাতীয়-সত্তার তুলনা আজ পর্যন্তও বাংলা উপন্যাসে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনই ইহাদের একমাত্র পরিচয় নয়; ব্যক্তিগত পরিচয় অতিক্রম করিয়া ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি বৃহত্তর সত্তা আছে, সে-সত্তা বৃহত্তর সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একান্ত সাম্প্রতিক সাহিত্যে ইহাই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য; এই হিসাবেই বর্তমান যুগে উপন্যাসই মহাকাব্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। "গোরা" মহাকাব্যের প্রসার ও গভীরতা লইয়া বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং আজ পর্যন্ত একমাত্র আধুনিক উপন্যাস।

"গোরা"র এই বৈশিষ্ট্যের মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে বাংলা দেশের সমসাময়িক ভাব ও আদর্শ-সংঘাতের, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র-আবর্তের এবং তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের একটু পরিচয় সংক্ষেপে লওয়া প্রয়োজন।* উনবিংশ শতকের শেষদিক হইতেই আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় বিক্ষোভ ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতেছিল; সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রভুত্বের ঔদ্ধত্য ও অবিচার ভারতবাসীর, বিশেষভাবে ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীর মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিল। এই রাষ্ট্রীয় বিক্ষোভ হইতেই স্বাজাত্যবোধ এবং জাতীয় আত্মানুসন্ধানের সূচনা দেখা দেয়। উনবিংশ শতকের শেষদিক হইতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নানা ভাবুক ও কর্মী নানাভাবে দেশের বিচিত্র জীবনাদর্শের মধ্যে, আপাতবিরোধী বিচিত্র ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতির মধ্যে মূলগত ঐক্যের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই চেষ্টা আরও প্রবল হইয়া দেখা দেয় বিংশ শতকের গোড়ায়। বাংলা দেশের যে-কয়জন মনীষী এই ঐক্যাদর্শ-সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু অন্যতম নহেন, প্রধানতম। রবীন্দ্রনাথ এই ঐক্যাদর্শের সন্ধান পাইলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের ত্যাগ ও তপোবনাদর্শের মধ্যে, মন্ত্রসাধনা, বৃহত্তর আধ্যাত্মিক সাধনা এবং গভীরতর অর্থে বর্ণাশ্রম-আদর্শের মধ্যে। "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে তাহার পরিচয়ও সুস্পষ্ট। ১৩০৮ সালে নবপর্যায় "বঙ্গদর্শনে"র সম্পাদনভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শ প্রচারে ব্রতী হন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে তাঁহার যে বিতর্ক হয় তাহাতে তিনিই প্রথম বলেন যে, সংকীর্ণ অর্থে সামাজিক ব্যাধি বা তাহার প্রতীকার বলিয়া কিছুই নাই, ব্যাধি সমগ্র জাতীয় জীবনের, এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই তিনি আমাদের সমগ্র জীবনাদর্শের, জীবন-সমস্যার ব্যাখ্যা করিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ লইয়া যে-আলোচনা ("বঙ্গদর্শন", ১৩০৮, জ্যৈষ্ঠ) তাহার মধ্যেও তিনি একই আদর্শের কথা বিভিন্ন দিক দিয়া বিচার করিলেন। 'নেশন' ও 'ন্যাশানলিজম্', হিন্দু ও হিন্দুত্ব, হিন্দুসমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁহার আদর্শ ও চেতনা এই সময়ই গড়িয়া উঠে। এই সময়ই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়। এই সব পরিচয়, তর্কবিতর্ক

* বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-জীবনী", ১ম খণ্ড, ৩৫২-৪০১ পৃঃ।

ও আলোচনা ইত্যাদি উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্র-মানসের মধ্যে আমাদের জাতি, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, সাধনা ইত্যাদি সব কিছু লইয়া একটা অখণ্ড জীবনাদর্শ, সমগ্র জীবনদর্শন গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। 'ব্রাহ্মণ', 'চীনাম্যানের চিঠি', 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'অত্যুক্তি', 'রাষ্ট্রনীতি' ও 'ধর্মনীতি', প্রভৃতি প্রবন্ধ ও আলোচনায়, 'রাজকুটুম্ব', 'ঘুষাঘুষি', 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' 'ধর্মপ্রচার', প্রভৃতি বক্তৃতা ও প্রবন্ধে এই অখণ্ড-জীবনাদর্শের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত বক্তৃতাটির মধ্যেই একথাও আছে যে, মানুষ যখন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মসাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলিয়া গ্রহণ করে তখন ধর্ম-সাধনা খণ্ডিত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়। ধর্ম কোনও বিশেষ কালের মধ্যে, স্থানের মধ্যে, বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে, শাস্ত্র ও আপ্তবাক্যের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই। এই সব প্রবন্ধ, আলোচনা ও বক্তৃতাবাজির মধ্যে এমন সব যুক্তি, ভাবোদ্দীপনা, চিন্তাপর্যায়, এমন কি বাক্যভঙ্গি ও বক্তব্যাংশ আছে যাহা "গোরা"-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের চরিত্রে, ব্যবহারে, কথাবার্তায়, তর্কবিতর্কে একেবারে রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে "নৌকাডুবি" উপন্যাসেই নলিনাক্ষ, হেমনলিনী, অন্নদাবাবুর মধ্যে ইহার কতকটা রূপ মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। যাহা হউক, বাহিরের নানা ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতে মনের মধ্যে এই ভাবে যখন একটা অখণ্ড জীবনাদর্শ রূপ লইতেছে, ঠিক এমন সময় ১৩১২ সালে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল।

শতাব্দী-সঞ্চিত দুঃসহ বেদনা ১৩১০ সালে আন্দোলনের সূচনা হইতেই দেশের শিক্ষিত নরনারীর চিন্তায় ও কর্মে রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। এই আন্দোলন দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার মূল ধরিয়া টান দিল। রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়িলেন না; শুধু যে বাদ পড়িলেন না তাহা নয় তিনিই হইলেন অন্যতম কর্ণধার। দেশের কথা', 'স্বাদেশিকতা' ইত্যাদি সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন হইল, ("বঙ্গদর্শন", ১৩১১, ২১০-.৪), স্বাদেশিকতাকে তিনি স্বদেশের উর্ধ্বে স্থান দিলেন না, আন্দোলনের ভাবাবেগকে তিনি কর্মের মধ্যে রূপ দিতে চাহিলেন; 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন। 'ছাত্রগণের প্রতি সম্ভাষণ', 'সফলতার সদুপায়', 'প্রাইমারী শিক্ষা', 'অত্যুক্তি', 'দেশীয় রাজ্য', 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', 'বিজয়া সম্মিলনী' ইত্যাদি বক্তৃতা ও আলোচনা উপলক্ষ করিয়া তদানীন্তন বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শ একটি তাঁহার মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিল। বিলাসের ফাঁস', 'রাজা ও প্রজা', 'শিক্ষা-সমস্যা', 'আবরণ', 'জাতীয় শিক্ষা', 'ততঃ কিম' ইত্যাদি প্রবন্ধে এই আদর্শ আরও স্পষ্ট হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ লক্ষ্য করিতেছিলেন, আমাদের সমসাময়িক সমাজ এবং রাষ্ট্রচিন্তা ও ভাবাদর্শ বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত, সমগ্রতা হইতে বিচ্যুত ও খর্বিত। নেতৃত্ব ও কর্মপদ্ধতি লইয়াও সংকীর্ণ মননশীলতার পরিচয় তাঁহার কাছে ধরা পড়িয়া গেল; কর্মীদের মধ্যেও বিরোধ দেখা দিল। "সন্ধ্যা", "যুগান্তর", "বন্দেমাতরম্" ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া দেশের যুবচিত্তে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রসার লাভ করিল আর, জামালপুরের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা উপলক্ষ করিয়া আমাদের অন্তরের বিরোধও অত্যন্ত উৎকটভাবে প্রকট হইয়া উঠিল। এই সব চিন্তা ও ঘটনার আবর্তের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজ-চিন্তার যে রূপান্তর ঘটিতে আরম্ভ করে তাহার সর্বপ্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে ("প্রবাসী", ১৩১৪, শ্রাবণ)। এদিকে কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী-বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ সম্পূর্ণ হইল; বিপ্লবী রুদ্রপন্থা বোমাপর্বে রূপান্তরিত হইল। 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা', 'সদুপায়' প্রবন্ধে, কিন্তু বিশেষ করিয়া 'পূর্ব ও পশ্চিম'

প্রবন্ধে রবীন্দ্র-সমাজমানসের রূপান্তর আরও সুস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল ; স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া, ধীরে ধীরে নানা আবর্তের ভিতর দিয়া আর এক রবীন্দ্রনাথে রূপান্তরিত হইলেন, তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলিতে সুস্পষ্ট ধরা যায়। এই উভয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই "গোরা" উপন্যাসের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই বিচিত্র ভাব ও চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়াই "গোরা"র বিভিন্ন চরিত্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। সমসাময়িক চিন্তা ও কর্মধারা হইতে বিচ্যুত করিয়া দেখিলে ইহাদের সবটুকু পরিচয় কিছুতেই পাওয়া যায় না। "গোরা"র সাহিত্য-বিশ্লেষণের আগে সেই জন্যই ইহার পশ্চাতে যে সমাজ-মানস ক্রিয়াশীল তাহার পরিচয় লওয়া প্রয়োজন হইল।

কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলা প্রয়োজন যে, এই ক্রিয়াশীল, গতিশীল সমাজ-মানসের পরিচয়ই "গোরা"-উপন্যাসকে ইহার সুসমৃদ্ধ সাহিত্যমূল্য দান করে নাই। যে বুদ্ধি ও অনুভব-দীপ্ত তর্কজাল, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শ ও মতামতের আলোড়ন "গোরা"য় এতখানি জায়গা জুড়িয়া আছে তাহার উপর উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য এতটুকু নির্ভর করে না। এ-সব আদর্শ ও মতামত সত্য কি মিথ্যা, লেখকের পক্ষপাত কোন আদর্শ ও মতামতগুলির উপর বেশি, সে-প্রশ্নও সাহিত্যালোচনায় অবান্তর। "গোরা" মহৎ ও বৃহৎ উপন্যাস সাহিত্যিক কারণেই। সে-কথা বোধ হয় একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। "গোরা"য় গোরা অথবা বিনয় অথবা সুচরিতার মুখে যে-সমস্ত যুক্তিতর্কজাল বিস্তার লাভ করিয়াছে, যে-সমস্ত আদর্শ ও মতবাদ রূপায়িত হইয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই তাহাদের হৃদয়ের গভীর আলোড়নে আলোড়িত, তাহারা শুধু যুক্তি বা মতবাদ মাত্র থাকে নাই, তাহারা হইয়া উঠিয়াছে বাণীমূর্তি। তাহাদের জীবনের প্রত্যেকটি কর্মকৃতি তাহাদের যুক্তি ও আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহারা প্রত্যেকেই তাহাদের যুক্তি ও আদর্শের জীবনরূপ! তাহাদের জীবন-দর্শনের সঙ্গে তাহাদের জীবনের কোনও পার্থক্য নাই। গোরা, বিনয়, ললিতা ও সুচরিতা যে-ভাবে আবর্তিত বিবর্তিত হইয়াছে, তাহা একান্তভাবেই তাহাদের যুক্তিতর্ক ও মতামতের অনুগামী। এক কথায় এই সব মতামত ও যুক্তিতর্ক উপন্যাসগত চরিত্রগুলিকে শুধু সমৃদ্ধ করে নাই, উপন্যাসটিকে শুধু মনন-সমৃদ্ধি দান করে নাই, চরিত্র-গুলিকে রূপায়িত করিবার জন্যই এইসব তর্কজাল ও আদর্শ-বিরোধের প্রয়োজন ছিল। উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থানও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এই সব তর্ক ও মতামত। এক-একটা বিশেষ ঘটনার পরিস্থিতি কোন একটা বিশেষ যুক্তিকে বস্তুধর্মের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে, অথবা কোনও বিশেষ যুক্তি বা মতকে পরিপূর্ণ রূপ দিবার জন্য একটা বিশেষ ঘটনার পরিবেশ ইচ্ছা করিয়াই লেখক সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত "গোরা"য় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ; তাহা আর পাঠককে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই! "গোরা" বৃহৎ ও মহৎ ইহার সুনিপুণ-ঘটনা সংস্থানের জন্য, গোরা-বিনয়-ললিতা-সুচরিতার চরিত্র-বিকাশের ধারা ও গতিভঙ্গির জন্য ইহার মনন সমৃদ্ধির-জন্য, ইহার গভীর ও সুউচ্চ আদর্শ মহিমার জন্য, ইহার কবিকল্পনার জন্য, ইহার বস্তুধর্মের দৃঢ়তার জন্য। সমাজ-মানসের দ্যোতনা "গোরা"র এই সাহিত্য-মহিমাকে দৃঢ় বস্তুভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতনতর সমৃদ্ধি দান করিয়াছে।

আগেই বলিয়াছি, "গোরা"-গ্রন্থের বিভিন্ন চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও প্রত্যেকেরই একটা বৃহত্তর সামাজিক সত্তা আছে, এবং প্রত্যেকটি চরিত্রই এই বৃহত্তর সত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ; এত বেশি সচেতন যে সকলেরই চেষ্টা এক-একটা বিশেষ মতের বিশেষ

চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন নিয়ন্ত্রণ। তাহারা সকলেই যেন এক একটি চিন্তাধারার মুখপাত্র। ইহাদের যুক্তিতর্কজালে "গোরা"র আকাশ অনেকখানি আচ্ছন্ন। পরেশবাবুর অবাস্তব অবিমিশ্র ধর্ম ও সত্যানুগত জীবনের ভাষা, বিনয়ের সুকুমার হৃদয়ের দ্বিধাকণ্টকিত জীবনের ভাষা, আর গোরার মুখের ভাষায় ভারতীয় আত্মবোধের যে পরিচয় হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যের তাড়নায় সবেগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এ সমস্তই এত সহজে আমাদের এত বেশি পরিচিত হইয়া যায় যে, গোরা, বিনয় অথবা পরেশবাবু, এমন কি পানুবাবু, আনন্দময়ী ইত্যাদিকে দেখা মাত্রই আমরা বলিতে পারি কাহার যুক্তি-তর্ক, চিন্তাধারা কোন পথে প্রবাহিত হইবে, কোন্ বাঁকে কখন মোড় ফিরিবে। ইহার ফলে "গোরা"র চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট দীপ্তি ও উজ্জ্বলতা, যথেষ্ট গভীরতা লাভ করে নাই, এমন অভিযোগ মাঝে মাঝে শোনা যায়। ব্যক্তিগত জীবন সমাজ-বোধ ও স্বদেশ চেতনার নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে জীবনের প্রয়োজন এবং আর্টের প্রয়োজনের মধ্যে একটা বিরোধ বাধিয়াছে, এই রকম একটা প্রশ্ন "গোরা" সম্বন্ধে মাঝে মাঝে উঠিয়া থাকে।

আমার মনে হয়, "গোরা"র চরিত্র চিত্রণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে এই প্রশ্ন অথবা অভিযোগ করা চলে না, যদিও পরেশবাবু বা আনন্দময়ী সম্বন্ধে ইহা কতকটা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু এই দুজনেই আমাদের প্রতিদিনের সংসারের সেই জাতীয় জীব যাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বলিয়া কোন পদার্থই নাই। ইঁহারা দুজনেই আদর্শচরিত্র নর ও নারী, কিন্তু তাঁহাদের এই আদর্শ চরিত্রের বিকাশ কি করিয়া হইল, কোন পথে হইল তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ইঁহারা দুইজনেই অবাস্তব রক্তহীন জীব। যে-অভিযোগের কথা আগে বলা হইয়াছে তাহা গোরা অথবা বিনয়, ললিতা অথবা সুচরিতা সম্বন্ধে একেবারেই সত্য নয়। গোরা তর্ক করিয়াছে প্রচুর, তাহার যুক্তিতর্ক, মতবাদ ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাহার জীবনের কোনও বিচ্ছেদ নাই, একথাও সত্য, কিন্তু তাহা তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা স্ফুরণে কোন বাধার সৃষ্টি করে নাই। তাহার দীর্ঘায়ত যুক্তিজাল তাহার মুখের কথা মাত্র নয়, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও সমাজ বোধের আস্ফালন মাত্র নয়, তাহার প্রত্যেকটি যুক্তি ও ভাষণ অন্তরের গভীর আবেগে ও প্রেরণায় আলোড়িত, দ্বন্দ্বসংগ্রামে উদ্বেলিত, হৃদয়ের গভীরতম উৎসের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ গাঢ় ও গভীর। বিনয়ের প্রতি তাহার সম্বন্ধ, আনন্দময়ীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বারবার তাহার যুক্তি ও মতবাদকে খণ্ডিত, দ্বিধাগ্রস্ত ও পরিবর্তিত করিয়াছে, তাহার সমস্ত যুক্তিতর্কের পশ্চাতে একটি গভীর ও সরল প্রাণের সুকুমার স্পন্দন পাঠকের অনুভূতিকে স্পর্শ না করিয়া পারে না। সুচরিতার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ বিকাশের মধ্যে এই পরিচয় আরও সুস্পষ্ট। মতবাদের, যুক্তিতর্কের সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই গোরার অন্তরে প্রেমের রক্তকমল ফুটিয়াছে; তর্ক-মন্থনের ফলেই গোরার হৃদয় সমুদ্রও মন্থিত হইয়াছে। গোরা পরম উৎসাহে প্রবল আগ্রহে সুচরিতার সঙ্গে তাহার মতবাদ লইয়া তর্ক করিয়াছে, তাহা সুচরিতাকে তাহার মতানুবর্তিনী করিবার জন্য ত বটেই, কিন্তু সেই উৎসাহ ও আগ্রহের পশ্চাতে আছে তাহার অবচেতন চিত্তের বিপুল প্রেমাবেগ। এই প্রেমাবেগই গোরার যুক্তিতর্ককে প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত কম্পিত করিয়াছে। যুদ্ধসজ্জার বহিরাবরণ, যুক্তিতর্কের বর্ম ভেদ করিয়া এক অসতর্ক মুহূর্তে নির্জন গঙ্গাতীরে একদিন যে-প্রেম বিদ্যুচ্চমকের মত

দেখা দিয়াছিল, সেই একটি মুহূর্তই শুধু গোরার সুগভীর ব্যক্তিজীবনের একমাত্র পরিচয় নয়, প্রতিদিনের তর্কবিতর্কের মধ্যেও অবচেতন চিত্তের এই প্রেম প্রচ্ছন্ন। অবিমিশ্র যুক্তিতর্কের প্রশ্রয় গোরা দেয় নাই, কিংবা দেশাত্মবোধের জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখাইতে গিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব কোথাও পীড়িত হয় নাই, একথা অবশ্য বলা যায় না ; তবু সমগ্র ভাবে দেখিলে, তাহার ব্যক্তিত্ব, তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবন প্রদীপ্ত সূর্যের মতন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিনয়, সুচরিতা ও ললিতা সম্বন্ধেও একথা সত্য। ইহারা প্রত্যেকেই জীবন্ত ও বাস্তব, প্রাণরসে সমৃদ্ধ। বিনয়ও তর্ক করিয়াছে ; গোরার মতবাদ অপেক্ষা গোরার প্রতি তাহার স্নেহ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাহার নিজের যুক্তিতর্ককে হয়ত তত জোরাল করিয়া তুলিতে পারে নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার মতবাদ কম যুক্তিসহ নয়। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের স্নেহবন্ধনই তাহাকে সুকঠিন দ্বন্দ্বের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, এবং এই দ্বন্দ্বই তাহার ব্যক্তিত্বকে মতবাদের অভিভবের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। যুক্তিতর্ক-জাল সমস্তই তাহার হৃদয়বৃত্তি দ্বারা গভীর ভাবে আলোড়িত ও প্রভাবান্বিত। আর সুচরিতা ও ললিতার ত কথাই নাই। সুচরিতার হৃদয়ের গভীর স্তরে প্রেমের নিঃশব্দ পদসঞ্চার, তাহার দুর্নিবার পরিবর্তন, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব সমস্তই তাহার ব্যক্তিত্বের দ্যোতক। ললিতার সহজ অধিকার বোধ, সুচরিতার প্রতি ক্ষণিক ঈর্ষা, অস্থির চাঞ্চল্য, দৃপ্ত তেজস্বিতা, এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহ-ঘোষণা প্রভৃতি সমস্তই তাহার গভীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এই জন্যই "গোরা" সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে যে-আপত্তি উঠিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমার একটু আপত্তি আছে।

পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই একটু ইঙ্গিত করিয়াছি। পরেশবাবু অপেক্ষা আনন্দময়ী অনেক সহজ ও স্বাভাবিক। তাহার বিকাশ ও পরিণতি পাঠকের বাস্তব-বোধকে পীড়িত করে না। অবশ্য একথা সত্য, আনন্দময়ীর পূর্বপরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত, তাহার চরিত্র-বিশ্লেষণও উপন্যাসে খুব দীর্ঘায়ত নয় ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে স্বচ্ছ, মুক্ত সহজ ও সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়, যে সর্ব-সংস্কারমুক্ত সহজ সকরুণ অন্তর্দৃষ্টি, যে সুগভীর অভিজ্ঞতা ও সুতীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় তাহার কর্মে ও ভাষণে, আচারে ও ব্যবহারে আমরা দেখিতে পাই তাহার উৎস সন্ধান করিতে সুদূর বিসর্পী কল্পনার আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন হয় না। নিঃসন্তান আনন্দময়ীর কোল জুড়িয়া গোরা যেদিন আসিয়া বসিল সেইদিন হইতেই তিনি তাঁহার আবাল্য সংস্কার যাহা কিছু তাহা বিসর্জন দিয়াছিলেন ; অজ্ঞাত আইরিশ যুবক-জাত গোরাকে কোলে লইয়া সে-সংস্কার পালন করা কিছুতেই চলিত না। আর, যে সহজ সকরুণ অন্তর্দৃষ্টির বলে তিনি গোরা অথবা বিনয় অথবা সুচরিতার মনোজগতের সমস্ত সূক্ষ্মলীলাই 'দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ' দেখিতে পাইয়াছেন, সেই অন্তর্দৃষ্টিও একান্তভাবেই মাতৃহৃদয়ের সন্তান-বাৎসল্যের দৃষ্টি : এই মাতৃহৃদয় দিয়াই তিনি গোরার হৃদয়-মনের সূক্ষ্মতম তন্তুগুলির স্পন্দন দেখিতে ও অনুভব করিতে পারিয়াছেন, এবং গোরার বেলায় পারিয়াছেন বলিয়াই বিনয় অথবা সুচরিতা অথবা ললিতার বেলায়ও তাহা কঠিন হয় নাই। সর্বসংস্কারমুক্ত, মতামত-নিরপেক্ষ, সুগভীর সহানুভূতি-দৃষ্টিসম্পন্ন, সকল চিত্তের পরমাত্মীয়, সকল সংকীর্ণতা মলিনতা মুক্ত এবং সুগভীর বোধ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই মহীয়সী মহিলাটির উপন্যাসগত চরিত্রের একমাত্র রহস্য-চাবি হইতেছে গোরা স্বয়ং।

পরেশবাবু আনন্দময়ীর মতন এত স্বচ্ছ ও সহজ নহেন, তাঁহার বোধ ও বুদ্ধি, অনুভব

ও অন্তর্দৃষ্টি সহজ-সংস্কারগত নয়। তাঁহার কর্ম ও ভাষণ যুক্তি-শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অধ্যাত্মবোধ সত্য, এবং অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাঁহার ভাষণ ও তাঁহার জীবন দুইয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায় নাই; এক কথায় তাঁহার যুক্তিতর্কের ভাষণে তাহার হৃদয়ের আলোড়নের স্পর্শ লাগে নাই। তাহা ছাড়া, তাঁহার অধ্যাত্মবোধের চেহারাটা অনেকটা পাণ্ডুর ও বর্ণহীন; সে-অধ্যাত্মবোধ তাঁহার চরিত্রকে মহিমান্বিত করে নাই, ব্যক্তিত্বের দ্যুতি দান করে নাই। একমাত্র সুচরিতা ছাড়া আর কেহই তাঁহার দ্বারা তেমন করিয়া প্রভাবান্বিতও হয় নাই, কিন্তু তাহাও পরেশবাবুর কৃতিত্বে ততটা নয় যতটা সুচরিতার সকৃতজ্ঞ স্নেহ-ব্যাকুল হৃদয়ের উন্মুখ ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে। কন্যা ললিতা কতকটা যে প্রভাবান্বিত হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু সে-প্রভাব এত শিথিল ও তরল প্রথম আঘাতেই তাহার ভিত্তি শুধু যে ভাঙিয়া পড়িল তাহাই নয়, সে-প্রভাবকে অতিক্রম করার চেষ্টাই হইয়া উঠিল প্রবল। পানুবাবু এবং নিজের স্ত্রী বরদাসুন্দরীর কথা দূরে থাক, যে দুইজন তাঁহার হৃদয় মনের একান্ত নিকটবর্তী ছিল তাঁহার বর্ণহীন বস্তুহীন জীবন সেই দুইজনকেও শেষ পর্যন্ত তাঁহার নিজের সমাজের অধ্যাত্মাদর্শের পরিধির মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সমগ্র গ্রন্থটিতে এতখানি জায়গা জুড়িয়া থাকিয়াও, সুউচ্চ বেদীতে বসিয়া মহৎ আদর্শানুপ্রেরিত এত কথা কহিয়াও সকল ঘটনাবর্তের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত থাকিয়াও কোথাও যেন তিনি নাই, কোথাও যেন তাঁহার এতটুকু প্রভাবের চিহ্নও নাই। এমন আদর্শ চরিত্র, অথচ পারিপার্শ্বিকের দিক হইতে তিনি এত অপ্রয়োজনীয়, এমন নিষ্প্রভ, এমন দীপ্তিহীন, শক্তিহীন, বর্ণহীন, জীবনহীন! শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনে এই প্রশ্ন অনিবার্য, পরেশবাবুর মতন লোকের অধ্যাত্মবোধ কি গভীরতর অর্থে সত্য ও সার্থক? উপন্যাসটির ভিতরেই এই প্রশ্নের যে উত্তর আছে তাহা যে একান্তই সত্য ও বাস্তবনিষ্ঠ এ-সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই। পরেশবাবুর সার্থকতা পরেশবাবুতেই, ঐখানেই তাঁহার শেষ; ব্যক্তি জীবনের বাহিরে বৃহত্তর পরিবার অথবা সমাজ জীবনে এই ধরনের চরিত্রের কোন সার্থকতা নাই। আর, উপন্যাসেও সার্থকতা ততটুকুই যতটুকুর প্রয়োজন ইহাদের অসার্থকতা দেখাইবার জন্য। অথচ একান্ত ভাবধর্মী ধর্মসাধনার ইতিহাসে এই ধরনের চরিত্র যে বিরল নয় তাহা ত সকলেই জানেন। এক সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের একশ্রেণীর লোকদের ধর্মসাধনা এই পথেই প্রবাহিত হইয়াছিল, এবং ইহারা না পারিয়াছিলেন নিজেদের ধর্মাদর্শকে বাঁচাইতে, না পারিয়াছিলেন পরকে নিজেদের অধ্যাত্ম-মহিমায় অনুপ্রাণিত করিতে। ব্রাহ্ম-সমাজের আয়তনের মধ্যে পরেশবাবুর মতন লোককে যাঁহারা চলাফেরা করিতে দেখিয়াছেন কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, এ-চরিত্র কতখানি সত্য ও বাস্তবনিষ্ঠ, তাঁহারাই বুঝিবেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ কত সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ।

ঠিক এই কথাই সমান জোরের সঙ্গে বলা চলে পানুবাবু ও বরদাসুন্দরী সম্বন্ধেও। ব্রাহ্ম-সমাজের মুক্তধারা একদিন দেশের মধ্যবিত্ত সমাজে যে নূতন জীবন-প্রবাহ বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহার স্রোতের মুখে ইঁহাদের মত অনেকেই ভাসিয়া আসিয়াছিলেন। অধ্যাত্মপ্রেরণা বা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রগতিমূলক উন্নত সমাজাদর্শের অন্তরপ্রেরণা কিছুই ইঁহাদের ছিল না, সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাও কিছু ছিল না; অথচ সংকীর্ণ ধর্ম ও সমাজগণ্ডির যে নিম্নস্তরের গর্ব এই জাতীয় লোককে স্ফীত, সংকীর্ণ, বিকৃত, বিপরীত, অনুদার ও অনুভব-অক্ষম করিয়া তোলে তাহা ইঁহাদের পরিপূর্ণ মাত্রায়ই ছিল। নিজেদের ধর্ম ও

সমাজগণ্ডি সম্বন্ধে ইহারা অতি-সচেতন, এবং বৃহদাদর্শের আড়ালে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণ চেষ্টার সুযোগ ইহারা সহজেই খুঁজিয়া পান। অথচ ইহাদের আধ্যাত্মিক দর্প ও নিজেদের ধর্ম ও সমাজের উৎকর্ষ সম্বন্ধে উগ্র ও অভ্রান্ত বিশ্বাস শুধু যে ব্রাহ্মসমাজের এই জাতীয় জীব সম্বন্ধেই সত্য, তাহা নয়, যে কোনও নব ধর্ম ও সমাজান্দোলনের পক্ষেই ইহা সত্য ; সকল নব আন্দোলনের স্রোতেই এই ধরনের জীব কিছু ভাসিয়া আসে। তবু ব্রাহ্ম-সমাজ সম্পর্কে এই ধরনের চরিত্রাভাস উপন্যাসের গল্পবস্তুটিকে বাস্তব নিষ্ঠার দীপ্তি দান করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

অন্যদিকে চিরবহমান হিন্দুসমাজের মহিম ও হরিমোহিনী পানুবাবু ও বরদাসুন্দরীর সঙ্গে যে-ভাবে অপূর্ব ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে হয়। মহিম গোরা ও বিনয়ের সুউচ্চ আদর্শের আড়ালে আশ্রয় লইয়া স্থূল বিষয়বুদ্ধিতে যতটুকু স্বার্থ সুবিধা আদায় করিয়া লওয়া যায় তাহার জন্য সচেষ্ট। সে একান্তই বণিকধর্মী, স্থূল ; কোন সূক্ষ্ম দ্বিধাদ্বন্দ্বের জটিলতা তাহার মধ্যে নাই ; এক হিসাবে সেও পানুবাবুর মতনই একান্ত আত্ম-সচেতন। পানুবাবু ও মহিম একই জাতীয় জীব, দুই আধারে দুই রূপ লইয়াছে মাত্র। ঠকিবেনা বলিয়া সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিন্তু এই হিন্দু-সমাজের মধ্যেই মহিম অপেক্ষাও চতুর স্থূল সাংসারিক বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকের অভাব নাই, সে মহিমেরই জামাতা অবিনাশ। এই ধরণের জীব বিষয়বুদ্ধিতে একজন আর একজনকে হারাইবার জন্য সচেষ্ট। এমন জীবকেও হিন্দুসমাজে চলাফেরা করিতে অনবরতই দেখা যায়। হরিমোহিনীর চরিত্র কিন্তু এতটা সহজবোধ্য নয় ; এ-চরিত্র একটু নূতন এবং এই ধরনের বিকাশ ও পরিণতি সচরাচর দেখা যায় না। হরিমোহিনী সম্পত্তিবিচ্যুতা পরমুখাপেক্ষী কুণ্ঠিতা হিন্দুবিধবা। কিন্তু সুচরিতার উপর স্নেহাতিশয্য তাহাকে কতকটা অভাবনীয় পরিণতি দান করিয়াছে। তাহার উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে-সব কৌশল তিনি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে বিষয়বুদ্ধি ও অধিকারবোধ সম্বন্ধে চেতনার অভাব নাই। এবং এই বোধ ও চেতনার ছলনা ও সাহসের কাছে গোরাকে হার মানিতে হইয়াছে। যে-বিষয়বুদ্ধির অভাবে দেবররা তাঁহার সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া কাড়িয়া লইয়াছিল, সে বিষয়বুদ্ধিই বৃদ্ধবয়সে অবস্থা-সংকটে ঘটনার আবর্তে কি করিয়া এমন ভাবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিল তাহা ভাবিলে একটু বিস্মিত হইতে হয় বৈ কি ? শুধু সুচরিতার প্রতি স্নেহাতিশয্যের যুক্তি দিয়া ইহাকে যেন ব্যাখ্যা করা যায় না !

মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়লভ্য উচ্চশিক্ষা বিনয়কে একটা সহজ উদারতা দিয়াছে। গোরা তাহার একান্ত সুহৃৎ, এবং দুজনে গভীর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। গোরার সুদৃঢ় মতামতের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু সে-শ্রদ্ধা গোরার প্রতি প্রীতি হইতেই সঞ্জাত ; তাহার উদার সুকুমার হৃদয় ও বুদ্ধির পক্ষে গোরার যুক্তি ও মতামত, তাহার জীবন-দর্শন অতিরিক্ত মাত্রায় দৃঢ় ও অনমনীয়। ললিতাকে অবলম্বন করিয়া পরেশবাবুর বাড়িতে এবং ব্রাহ্ম-সমাজে যখন তাহার গতিবিধি আরম্ভ হইল তখন নব ধর্মান্দোলনের আদর্শ তাহার উদার হৃদয়কে আরও বিস্তার ও প্রসারতা দান করিল। ইহার কৃতিত্ব অনেকাংশে ললিতার, এবং কতকাংশে গোরারও। গোরার দৃঢ় অনমনীয়তাও বিনয়কে প্রসারিত করিতে কম সহায়তা করে নাই। গোরার সঙ্গে তর্কে সে সর্বদাই পর্যুদস্ত, তবু সে সর্বদাই উদার ও প্রশস্ত হৃদয়বৃত্তির পথই সমর্থন করিয়াছে। আর ললিতা তাহার জীবনে যে বিবর্তন আনিয়াছে তাহা ত অনস্বীকার্য। "চোখের বালি"তে বিনোদিনী যদি বিহারীর

ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন করিয়া থাকে, "গোরা"র বিনয়ের ব্যক্তিত্ব উদ্বোধন করিয়াছে ললিতা। পূর্বজীবনে বিনয় ছিল গোরার ছায়ামাত্র; ললিতা প্রথম-দর্শনেই তাহা আবিষ্কার করিয়াছিল, এবং তাহা তাহার ভাল লাগে নাই। নিষ্করুণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও নির্মম আঘাতের পর আঘাত করিয়া ললিতা বিনয়কে গোরার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াছে, এবং তাহাকে স্বীয় ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট রেখা দান করিয়াছে; এক কথায় ললিতাই বিনয়কে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই সুকঠিন প্রয়াসের প্রত্যেকটি স্তর লেখক অতি কৌশলে বিন্যস্ত করিয়াছেন। অভিনয় ও স্টীমার-যাত্রার ঘটনা বিষয়-বিন্যাসের দিক হইতে সেই জন্যই সার্থক। বিনয়ের জীবনে প্রেমের প্রথম আবির্ভাব, বিনয়ের উপর প্রথম হইতেই ললিতার অধিকারবোধ, প্রেমের উদ্ভব, বিনয় সম্বন্ধে সুচরিতাকেই লইয়া ললিতার ক্ষণিক ঈর্ষা, গোরার সহিত ললিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গোরা-রাহু হইতে বিনয়ের মুক্তি প্রভৃতিতে স্তরে স্তরে ললিতার যে পরিচয় লেখক অপূর্ব কৌশলে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট পরিণতি আমরা দেখিলাম স্টীমার-যাত্রা উপলক্ষে ললিতার দীপ্ত প্রেমের অকুণ্ঠিত নিঃসংকোচ প্রকাশের মধ্যে। তাহার পর যে-ললিতার পরিচয় সে-ললিতা বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহ লেখকের সমসাময়িক সমাজ চেতনার পরিচয়। ললিতা ব্রাহ্ম পরেশবাবুর কন্যা, বিনয় হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণানুশাসন দ্বারা শাসিত, এ দু'য়ের বিরোধ বিংশ শতকের প্রথম পাদে প্রবল ছিল বৈ কি! কিন্তু সমস্ত বিরোধ, সমস্ত বাধা ললিতাকে ক্রমশ আরও তেজস্বিনী বিদ্রোহিনী করিয়া তুলিল, সে-তেজ ও বিদ্রোহ বিনয়ের মধ্যেও সঞ্চারিত হইল এবং শেষ পর্যন্ত ললিতার দৃপ্ত তেজস্বিতার সম্মুখে সমস্ত কৃত্রিম বাধা ও বিরোধ স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। বিদ্রোহ জয়ী হইল।

ললিতা যদি বিনয়কে পাইল তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে সমস্ত বাধা বিরোধ ঠেলিয়া দিয়া, সুচরিতা গোরাকে লাভ করিল উজ্জ্বল আত্মানুসন্ধানের দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া বৃহত্তর বিস্তৃততর সমন্বিত জীবনরূপের মধ্যে। সুচরিতা তেজস্বিনী বিদ্রোহিনী নয়। পরেশবাবুর স্নেহের মধ্যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবের মধ্যে সে আশ্রয় লাভ করিয়াছে; নম্রতায় ও ভক্তিতে সে আনত, নিজের সম্বন্ধে সে একান্তভাবে উদাসীন। এই সুচরিতাও পানুবাবুকে গ্রহণ করিতে পারিল না; তাহার প্রধান হেতু পানুবাবু নিজে, দ্বিতীয়ত পরেশবাবুর প্রতি তাহার অকুণ্ঠিত প্রশ্নলেশহীন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তাহার শান্ত, নম্র, আত্মসুখ-উদাসীন হৃদয়ে গোরার প্রতি আকর্ষণের সূত্রপাত হইয়াছিল গোরার উপেক্ষায়। সেই উপেক্ষাই সর্বপ্রথম তাহার বেদনার তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিল। তাহার পর হইতে এই আঘাতের আর বিরাম নাই। গোরা তাহার আন্তরিক স্বদেশাভিমানের উচ্ছ্বাসে, প্রবল প্রদীপ্ত জীবনরাগে বারবার সুচরিতাকে সবলে আকর্ষণ করিয়াছে, বারবার তাহার ধর্ম ও সমাজাদর্শের ভিত্তিকে টলাইয়াছে, বারবার তাহার জীবনের মূল ধরিয়া টানিয়াছে। সুচরিতার ধর্মবিশ্বাস বা ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে বিশ্বাস ত শুধু তাহার মুখের কথা মাত্র নয়, সে তাহার অন্তরের সম্পদ যে-সম্পদ সে পরেশবাবুর নিকট হইতে পাইয়াছে। গোরার প্রত্যেকটি আঘাতের পরই সে বারবার জোর করিয়া পরেশবাবুর শিক্ষা ও আদর্শকে জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। বারবারই গোরা সে-মুষ্টি শিথিল করিয়া দিয়াছে, এবং বারবার সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেবলই আন্দোলিত হইয়া ক্রমশ শেষ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্বই, এই আত্মানুসন্ধানই তাহার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিয়া তাহার চারিদিকে কোমল কমনীয় দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়াছে; বারবার কক্ষচ্যুত হওয়া

সত্ত্বেও সে কখনও এই শান্ত কমনীয় দীপ্তি হারায় নাই। বোধ হয় এই কারণেই লেখক সুচরিতার সঙ্গে গোরার যখন মিলন ঘটাইলেন তখন সুচরিতাকে তাহার পূর্ব সংস্কার হইতে পূর্ব ধ্যান-ধারণা হইতে একান্তভাবে বিচ্যুত, বৃন্তচ্যুত করিতে হইল না। গোরা সুচরিতার হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল অস্ফুট প্রেমের ক্ষুদ্র রন্ধ্র পথ দিয়া, যুক্তিতর্কের পথ দিয়া নয়, কিংবা তাহার আদর্শ-মহিমায় ভর করিয়াও নয়। সেই প্রেম যখন ক্রমশ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল তখন সুচরিতা সেই প্রেমের জোরেই গোরার বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার নগ্ন আত্মার জ্যোতির্ময় রূপ দেখিতে পাইয়াছিল।'

গোরা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই কিছু বলা হইয়াছে, কিন্তু গোরার কথা ত বলিয়া শেষ করিবার নয়, তাহাকে বুঝিতে পারাই বড় কথা। "গোরা" গ্রন্থ জুড়িয়া গোরা বসিয়া আছে; গোরার উপস্থিতি সর্বত্র। সে তাহার যুক্তিতর্কের উদ্দীপনায়, সে তাহার স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তিতে, সে তাহার প্রদীপ্ত সুদীর্ঘ আকৃতিতে, সে তাহার চলাফেরায়, সে তাহার কর্মকৃতিতে। তাহার সম্বন্ধে সকল কথাই লেখক সবিস্তারে বলিয়া দিয়াছেন গ্রন্থের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত। স্বদেশের আত্মাকে সে যে-মূর্তিতে দেখিয়াছে, চিনিয়াছে, সেই মূর্তির ধ্যানই তাহাকে সকল কথায় ও কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, এবং সেই কথা ও কর্মের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, দুইয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তাহার ভারতবর্ষের ধ্যান হিন্দু ভারতবর্ষের ধ্যান, তাহার জীবন-দর্শন ও জীবন-সাধনা হিন্দুধর্মের ধ্যান-ধারণাগত, দোষগুণ লইয়া হিন্দু সাধনা ও আদর্শের সমগ্র রূপটিই গোরা তাহার ভারতবর্ষের উপর আরোপ করিয়াছে। হিন্দুর গৌরবময় অতীত, তাহার জাতিভেদ, সমাজ ও ব্যক্তির পরস্পর সম্বন্ধের আদর্শ, মূর্তিপূজা, আচার ও নিয়ম নিষ্ঠা সমস্তই তাহার ভারতধ্যানের সমগ্রতার মধ্যে সমন্বিত হইয়াছে। দেশকে ভালবাসিয়াছে বলিয়াই দেশধর্মের যাহা কিছু বিকার তাহাকেও সে প্রীতি ও সহানুভূতির চোখে দেখিয়াছে। কিন্তু এই ধরনের দেশাত্মবোধ বা স্বদেশ-পূজার মধ্যে ঔদার্য নাই, দৃষ্টির ও বুদ্ধির প্রসারতা নাই, মানব-মহত্ত্বের সুবিপুল আদর্শের স্পর্শ নাই, ভিন্নতর আদর্শকে বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার সুযোগ নাই। এই ধরনের দেশাত্মবোধ স্বধর্ম ও স্বসমাজাদর্শ দ্বারা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ স্বদেশসাধনার পথ হইতে গোরার মুক্তিলাভ ঘটিত না যদি সুচরিতার প্রেম-স্পর্শ তাহার হৃদয়ে আসিয়া না লাগিত! সুচরিতার প্রেম তাহাকে বৃহত্তর সমন্বয়ের পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে, তাহাকে ব্যক্তি-জীবনের দীপ্তি দান করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে-রহস্যকে অবলম্বন করিয়া গোরা বৃহত্তর সমন্বয়ের মধ্যে মুক্তির সন্ধান পাইল, সুচরিতাকে লাভ করিল, সে-রহস্য সম্বন্ধে আমার একটু আপত্তি আছে। এ-আপত্তির কথা আমি অন্যত্রও বলিয়াছি*, এখানেও একটু বিস্তারিতভাবে সে-কথা বলা যাইতে পারে।

গোরা তাহার জীবন-দর্শন ও জীবনাদর্শ লইয়া এমন একটা জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সুচরিতার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল যেখানে সুচরিতার সঙ্গে মিলন এবং নিজের আদর্শ ও সাধনা অক্ষুণ্ণ রাখা দুইই একসঙ্গে চলিতে পারে না। সুচরিতার সঙ্গে মিলন ত শুধু বিবাহমাত্র নয়, তাহা যে বৃহত্তর

* এই গ্রন্থের "নাটক ও নাটিকা" অধ্যায়ে "মুক্তধারা" নাটক সম্পর্কিত আলোচনায় অভিজিৎ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

জীবনাদর্শের মধ্যে মুক্তি। অথচ সুচরিতা ও গোরা দুজনকেই সার্থকতা দিবার জন্ত এই মুক্তি প্রয়োজন। এই মুক্তি দিবার জন্তই প্রয়োজন হইল গোরার জন্ম-রহস্তের অবতারণা। যে-মুহূর্তে গোরা আনন্দময়ীর মুখে তাহার জন্মবৃত্তান্ত শুনিল, সেই এক মুহূর্তেই সে জানিল, হিন্দু ধর্ম ও সমাজের যে-নিয়ম ও আচার ব্যবহারের মধ্যে এতদিন সে নিজের বোধ ও বুদ্ধিকে প্রসারিত করিয়াছে, যে বিশেষ সাধন-পথকে সে নিজের পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সে পথের পথিক হইবার, সেই সমাজের সাধারণ সভ্য মাত্র হইবার অধিকারও তাহার নাই। অথচ তাহার দেশানুরাগ মিথ্যা নয়, অন্তরের গভীরতম স্তরে তাহার মূল। একমুহূর্তে গোরা আজ জানিল দেশানুরাগের সঙ্গে সমাজের প্রচলিত আচার-ব্যবহারের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর সে তাহার জীবনাদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছিল সেই সম্বন্ধের ভিত্তিভূমি মিথ্যা, অলীক কল্পনা মাত্র। কেবল তখনই সম্ভব হইল সুচরিতার সঙ্গে মিলন ও পূর্ণতর মুক্তি। কিন্তু লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, এই মিলন ও মুক্তি গোরা অর্জন করে নাই; তাহার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, তাহার প্রদীপ্ত প্রতিভা কোন মূল্য দিয়া ইহা লাভ করে নাই। মনে হয় যেন সে সুবৃহৎ এক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তির কোনও উপায় ছিল না; এমন সময় এক আকস্মিক রহস্যাবতারণা তাহাকে এই মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়া গেল! ইহা খুব সহজ মীমাংসা সন্দেহ নাই, কিন্তু গোরার পথ ত সহজ মীমাংসা খুঁজে নাই। এই রহস্তের পথ দিয়া গোরার মুক্তি, মন যেন ইহাতে সহজে সায় দিতে চায় না! আমি একথা ভুলি নাই, গোরাকে মুক্তি দিতে হইলে তাহাকে শ্রেণীচ্যুত করা প্রয়োজন। যে সমাজ ও শ্রেণীর পরিবেশের মধ্যে গোরার জীবনাদর্শ ও ধ্যান-ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই হিন্দু সমাজ ও মধ্যবিত্তশ্রেণী অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ, অনমনীয়; সেই শ্রেণী ও সমাজের মধ্যে গোরাকে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার মধ্যে বিপ্লবী মানসের ধর্ম সঞ্চার করা সম্ভব ছিল না। এই জন্মরহস্তের অবতারণার মধ্যে গোরাকে সেই শ্রেণীভ্রষ্ট করার প্রয়াস রবীন্দ্র-চেতনার মধ্যে ছিল, একথা সহজেই বলা যায়। হিন্দুসমাজের আচার-ব্যবহার ও নিয়ম-সংযমের প্রতি গোরার ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাহার দৃষ্টিকে যে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথ জানিতেন। যে সামাজিক পরিবেশ এই নিষ্ঠার জন্মদাতা সেই পরিবেশের বিলুপ্তি ছাড়া গোরার দৃষ্টি মুক্ত ও স্বচ্ছ করিবার উপায় কোথায়? সেই বিলুপ্তির পথ হিন্দুসমাজ হইতে তাহাকে সরাইয়া আনা; জন্মরহস্তের ভিতর দিয়াই তাহা সম্ভব হইল। কিন্তু এ যেন একান্তই দৈবানুগ্রহ। এই অনুগ্রহ ছাড়া গোরাকে শ্রেণীভ্রষ্ট করার অন্য উপায় কি কিছু ছিল না? গোরা-চরিত্রের সঙ্গে যেন এই দৈবানুগ্রহের কল্পনা সহজে করা যায় না। আর, গোরা না হয় এই দৈবানুগ্রহের অবলম্বন করিয়া শ্রেণী ও সমাজভ্রষ্ট হইয়া নিজের মুক্তি পাইল, কিন্তু অন্য যাহাদের এই শ্রেণীবিচ্যুতির প্রয়োজন তাহারা এই দৈবানুগ্রহের সুযোগ পাইবে কোথায়? আমার যেন মনে হয়, এই জন্ম-রহস্তের অবতারণায় গল্পের বস্তুধর্ম একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের চরিত্র-বিকাশের একটা গোড়ার কথা, সমান শক্তিসম্পন্ন পক্ষ-প্রতিপক্ষের সৃষ্টি। যে হার মানিবে, তাহাকে তিনি কোথাও কখনও দুর্বল করিয়া গড়েন নাই। প্রত্যেকের যুক্তিতর্ক সমান দীপ্ত ও ঘাতসহ, প্রত্যেকেই স্ব-মহিমায় সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। কেহই কাহারও কাছে সহজে হার মানিবার মতন দুর্বল নয়। কিন্তু "গোরা"র ব্রাহ্ম ও হিন্দু-ধর্মের তত্ত্বালোচনায় পক্ষপাতলেশহীন দৃষ্টির পরিচয় যেন ততটা নাই। ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মের স্বপক্ষীয় যুক্তিগুলি যুক্তিই রহিয়া গিয়াছে, সে-যুক্তিতে

যেন প্রাণাবেগের স্পর্শ লাগে নাই। পানুবাবু ও বরদাসুন্দরীকে ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র বলা চলে না। পরেশবাবুকেও নয়; তিনি ত কোনও বিশেষ সমাজেরই নহেন। হিন্দুধর্মপক্ষীয়, অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির যে-আদর্শ হিন্দু-ভারতীয় মানসের আশ্রয়, সেই অর্ধেক সত্য ও অর্ধেক কল্পনার হিন্দুধর্ম, হিন্দু-ইতিহাস ও সভ্যতার স্বপক্ষীয় যুক্তিই লেখকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে, সেই সব যুক্তির পশ্চাতেই লেখকের অন্তর্দৃষ্টির প্রেরণা ও প্রাণাবেগের স্পর্শ লাগিয়াছে। অথচ, অন্যদিক দিয়া যে নিয়ম-সংযম, রীতি-নীতি, আচার-নিষ্ঠার উপর প্রচলিত দৈনন্দিন আচরণের হিন্দুধর্ম দাঁড়াইয়া আছে, সেই নিয়ম-সংযম আচার-ব্যবহারের বহিরাবরণের ভিত্তি একমুহূর্তে তিনি টানিয়া ফেলিয়া দিতে সহায়তা করিয়াছেন গোরার শেষ পরিণতির মধ্য দিয়া। কথাটা দাঁড়াইতেছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ গোরার মুখ দিয়া, তাহার জীবনাচরণের ভিতর দিয়া যে-হিন্দু আদর্শের আকৃতি গড়িয়া তুলিয়াছেন, যে-আদর্শের পাদমূলে গোরা পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়াছে, সেই আদর্শ অনেকটা রোম্যান্সধর্মী, অনেকটা ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, যে-ভাবাদর্শের পরিচয় "নৈবেদ্য"-গ্রন্থে ও সমসাময়িক প্রবন্ধে সুস্পষ্ট। "গোরা"-গ্রন্থেও এই ভাবাদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়।

"গোরা"য় সমাজ-চেতনার পরিচয়ের প্রতি ইঙ্গিত ইতিমধ্যে অনেকবারই করিয়াছি। এই উপন্যাসে যে বাস্তবনিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায় তাহা এই সমাজ চেতনার উপরই প্রতিষ্ঠিত। গোরাকে শ্রেণীভ্রষ্ট করার প্রয়াসে এই চেতনার সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, গোরা ও সুচরিতার, বিনয় ও ললিতার বিবাহ-ব্যাপার লইয়া সংস্কারগত আচার পদ্ধতি এবং স্ত্রী-পুরুষের যৌন-ব্যক্তিত্ববোধের মধ্যে যে বিরোধ স্বপ্রকাশ তাহাও বাংলা দেশের সমসাময়িক সমাজচেতনার পরিচায়ক। ইহারা চারিজনই যে এই বিরোধ কাটাইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যেও রবীন্দ্র-মানসের প্রগতি-ধর্ম লক্ষ্য করা যায়। গোরা যে দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে দেশের সংস্কৃতিগত ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর নিজের জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছিল, সে-সম্বন্ধ যে অলীক ও মিথ্যা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা উদ্‌ঘাটন করিয়াও লেখক প্রগতি-সম্পন্ন মনন-ভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুধর্মের. দৃঢ়তাদানের প্রয়াস গোরার জীবনের অন্যান্য কর্মকৃতির মধ্যেও সুস্পষ্ট। সে যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পায়ে হাঁটিয়া দেশের পরিচয় লইতে বাহির হইয়াছিল, গ্রামে গিয়া গ্রামের লোকদের ভাল করিয়া জানিয়া বুঝিয়া ভালবাসিয়া তাহাদের সঙ্গে একটি সহজ সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল, এ সমস্তই দেশপ্রীতি ও স্বদেশ-সেবার দিক হইতে কতকটা রোম্যাণ্টিক ভাব-কল্পনার প্রকাশ হইলেও গোরাচরিত্রকে বাস্তবজীবনের ধর্মানুগত করিবার একটা সজাগ চেষ্টা যে ইহার মধ্যে আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? "গোরা"র ঘটনা-সংস্থানে শিথিল গ্রন্থি যে নাই, তাহা নয়। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। বিনয় ও ললিতার বিবাহ কি রীতি ও পদ্ধতিতে হইতে পারে ইহা লইয়া যুক্তিতর্কজাল প্রায় তিন অধ্যায় জুড়িয়া বিস্তৃত, অথচ এই সুদীর্ঘ পল্লবিত যুক্তিতর্ক-জাল না বিনয় না ললিতা না আর কাহারও চরিত্রের উপর নূতন কোনও আলোকপাত করে, নূতন কোনও বিকাশ বা পরিণতির কোনও আভাস দেয়। সমস্যা-মীমাংসার দিক হইতে তাহার যৌক্তিকতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উপন্যাসের কলাকৌশল বা চরিত্রবিকাশের দিক হইতে তাহার কোনই সার্থকতা নাই। এই ধরনের শিথিল গ্রন্থির দৃষ্টান্ত আরও

দু'একটি দেওয়া যায়। ইহার কারণ অনুমান করা খুব কঠিন নয়। "গোরা"-রচনার সমসাময়িক কালে বাংলা দেশে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ও বাহিরে হিন্দুসমাজের সঙ্গে ধর্ম ও সমাজাদর্শ লইয়া, ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠান লইয়া উদ্দীপ্ত তর্কবিতর্ক শিক্ষিত সমাজকে আলোড়িত করিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ব্রাহ্ম বনাম বৃহত্তর অর্থে হিন্দু সমস্যা লইয়াও বাক-বিতণ্ডা চলিতেছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ তাহাতে খুব বড় একটা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; "গোরা"য় তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাক্-বিতণ্ডায় যুক্তিতর্কজালের সার্থকতা ততখানিই যতখানি চরিত্রবিকাশ বা ঘটনার অন্তর্নিহিত অর্থোদ্ঘাটনের জন্য প্রয়োজন। "গোরা"য় দুই একটি স্থানে মাত্র যুক্তিতর্কজাল এই প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। একান্ত নিকটবর্তী কাল বলিয়া ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব সমস্যাকে দেখিবার সুযোগ হয়ত লেখকের হয় নাই; সেই কারণেও হয়ত ইহারা অপ্রয়োজনে এতখানি জায়গা জুড়িয়া আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন, এই ধরনের শিথিলতার দৃষ্টান্ত "গোরা"র মত বৃহৎ গ্রন্থে দুই একটির বেশি নাই।

এই রূপ ছোটখাট দুই চারিটি ত্রুটি সত্ত্বেও "গোরা" উপন্যাস বাংলা-সাহিত্যে অতুলনীয়। যে সুবৃহৎ ভাবকল্পনার মধ্যে "গোরা"র সৃষ্টি সে ভাবকল্পনার প্রসার বাংলা উপন্যাসে আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের সংকীর্ণ দীনচেতন জীবনধারা অবলম্বন করিয়া "গোরা" বাংলা সাহিত্যে যে প্রবাহের সঞ্চার করিয়াছিল তাহাতে নূতন গতিবেগ আজও দেখা দিল না। "গোরা" বাংলা উপন্যাসে জীবনের যে সমগ্র রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, সেই সমগ্রতার দৃষ্টি আজ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাশ করিল না।

পাঁচ

যে সমগ্র-দৃষ্টি ও জীবন-দর্শনের সমগ্রতার কথা বলিয়া "গোরা"-আলোচনা শেষ করিয়াছি, সেই সমগ্র-দৃষ্টি "গোরা"-পরবর্তী রবীন্দ্রোপন্যাসে অনুপস্থিত। "গোরা"-রচনার পাঁচ বৎসর পর "চতুরঙ্গ" এবং ছয় বৎসর পর "ঘরে বাইরে" রচিত হয়। এই দুইখানি গ্রন্থ হইতেই রবীন্দ্রোপন্যাসের তৃতীয় পর্বের সূচনা, এবং এ-পর্ব কতকটা একান্ত সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাব-কল্পনায়, ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গিতে, বিষয়-বিন্যাসে, সর্বোপরি, জীবন-সমালোচনায় এই পর্বের রচনাগুলি পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি হইতে একেবারেই পৃথক। এ-কথা উপন্যাসগুলি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আরও পরিষ্কার হইবে, কিন্তু এখানেই সাধারণ ভাবে দুই চারিটি কথা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমারবাবু এই পার্থক্যের বিশ্লেষণ সবিস্তারেই করিয়াছেন, এবং এ-বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমি একমত বলিয়া ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই নিরস্ত হইব।

"গোরা" ও "গোরা"-পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে তথ্য ও ঘটনা-বিন্যাসের পৌর্বাপর্য এমনভাবে সজ্জিত, এবং উপন্যাসোক্ত চরিত্র-বিকাশের স্তরগুলি এমন ভাবে গ্রথিত হইয়াছে যে, পাঠকের মনে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা একটা সমগ্ররূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠে। সকল ঘটনা, সকল চরিত্রের আমৃত্যু-সকল তথ্যই উপন্যাসে কথিত হয় না, কিন্তু যতটুকু হয় তাহাতেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু অথবা চরিত্রগুলির একটা সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস রূপ আমাদের

চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে; আংশিক বা খণ্ডিত বর্ণনার মধ্যেই জীবনের সমগ্র রূপ প্রতিফলিত হয়। উপন্যাসের বৃহত্তর ঐক্য জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশকে একত্রে গাঁথিয়া একটা পরিপূর্ণ রূপ দান করে। "চোখের বালি" বা "গোরা" বা বঙ্কিমের যে কোনও সার্থক উপন্যাস হইতেই এ-কথার দৃষ্টান্ত অতি সহজেই আহরণ করা যায়। উপন্যাসের এই সমগ্রতার ধর্ম, বৃহত্তর ঐক্যের ধর্ম "গোরা"-পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে অনুপস্থিত।

দ্বিতীয়ত, "গোরা ও "গোরা"-পরবর্তী বাংলা-উপন্যাসে চরিত্র-বিকাশ আমাদের বোধ ও বুদ্ধির গোচর হয় বিস্তারিত ঘটনা ও মনোবিশ্লেষণের ভিতর দিয়া। এই পর্বের উপন্যাসগুলিতে এই দুইই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; তথ্য সন্নিবেশ বিরল এবং যতটুকু আছে তাহাও অসম্পূর্ণ; মনোবিশ্লেষণও দীর্ঘায়ত নয় এবং তাহার বিভিন্ন স্তর সুস্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা হয় নাই। ঘটনা অথবা মনোবিশ্লেষণের সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা আপাতদৃষ্টিতে ধরাও পড়ে না; তাহার আবিষ্কার নির্ভর করে পাঠকের বুদ্ধি ও কল্পনার উপর। পাঠকের বুদ্ধি ও কল্পনা যদি শিথিল হয় তাহা হইলে ঘটনার মর্ম, অনেক চরিত্রের ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত তাহার বোধ ও অনুভূতি এড়াইয়া যাইতে বাধ্য। অনেক ঘটনার গ্রন্থি আপাতদৃষ্টিতে শিথিল ও আকস্মিক; এই শিথিলতা দৃঢ় হয় যদি বিভিন্ন ঘটনার যোগসূত্রটি আবিষ্কার করা যায়। তাহা কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়, কারণ লেখক তাহা সূক্ষ্ম সংকেতে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। "চতুরঙ্গে"র আলোচনায় একথা স্পষ্ট হইবে। এই যে সূক্ষ্ম সংকেতের আকস্মিক বিদ্যুদ্দীপ্তি, এই দীপ্তির সাহায্যেই মুহূর্তমধ্যে কোনও বিশেষ চরিত্র অথবা ঘটনার সমগ্র ইতিহাসটুকু পড়িয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। দামিনী বা কিটির সকল কথা ত উপন্যাসে বলা নাই, কিন্তু একটি স্থানে স্বল্প কথায় চকিত ঘটনার উপর যে ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত বিদ্যুচ্চমকের মত দীপ্তি পাইয়াছে, সে-ইঙ্গিত যাহার চোখ এড়াইয়া যাইবে সে কিছুতেই দামিনী অথবা কিটিকে বুঝিবে না। সেইজন্য, ঈষন্মুক্ত সংকেত, ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতই এই পর্বের উপন্যাসগুলির ধর্ম।

যে-ধর্মের কথা এইমাত্র বলিলাম তাহা কবির ধর্ম। বস্তুত, কবি-কল্পনার ঐশ্বর্যই এই পর্বের উপন্যাসগুলিকে ইহাদের সাহিত্যমূল্য দান করিয়াছে। কবি-কল্পনার এই সন্ধানী আলোই এক একটি তথ্য ও চরিত্রের মর্মোদ্ঘাটন করে। শুধু যে বর্ণনা বা ভাষার ব্যঞ্জনার মধ্যেই এই কবিধর্ম ব্যক্ত তাহা নয়, এই কবিধর্মের দীপ্তিই উপন্যাসগত বিরলতথ্য ও সূক্ষ্মরহস্যময় চরিত্রগুলিকে আলোকিত করিয়া আমাদের বোধ ও বুদ্ধির গোচর করে। এই কবিকল্পনার দীপ্তি ও ঐশ্বর্যই উপন্যাসগুলির প্রধান আকর্ষণ।

এই পর্বের উপন্যাসগুলি বুদ্ধিপ্রধান। ইহাদের রস ও রহস্য প্রধানত বুদ্ধিগম্য। তথ্য সন্নিবেশই হউক আর চরিত্রই হউক, সমস্তই বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে হয়। ভাষা এবং বর্ণনা ভঙ্গিও বুদ্ধিদীপ্ত। যে সমস্ত পরিবেশ-সৃষ্টি আবেগ-প্রধান হওয়ার সুযোগ ছিল সেগুলিও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতর অস্ত্রে বিশ্লেষিত; হৃদয়বৃত্তির আবেগলীলাই যে বস্তু পরিবেশ বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সেই পরিবেশ এবং চরিত্রও শুষ্ক বুদ্ধির খরতাপে শাণিত ও উত্তপ্ত। ভাবাবেগের মোহকুয়াশা যেন বুদ্ধির প্রখর আলোকে শুকাইয়া উবিয়া গিয়াছে। এই একান্ত বুদ্ধি-প্রাধান্যের সঙ্গে কবি-কল্পনার এক অভিনব সমন্বয় এই উপন্যাসগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই পর্বের উপন্যাসগুলির ভাষা এবং বর্ণনা ভঙ্গিও লক্ষ্য করিবার। দৃঢ় অথচ হ্রস্ব ও সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত ভাষা এপিগ্রামের গভীর ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত অন্তরে ধারণ করিয়া

বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি ও উত্তাপের সঙ্গে সমান তালে পদক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে। শ্রীকুমারবাবু বলিতেছেন,

"Meredith-এর উপন্যাসের মত রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাসে একপ্রকার তীক্ষ্ণ কঠিন বুদ্ধির চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য (intellectual brilliance), দ্রুত অবসরবিহীন সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীর অর্থ-গৌরবের দ্যোতন (epigram) আমাদিগকে পাতায় পাতায় চমৎকৃত ও অভিভূত করে। এইরূপ সংক্ষিপ্ত অর্থ-গৌরবপূর্ণ উক্তি প্রত্যেক উপন্যাস হইতেই প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কল্পনাময় ভাব-বিভোরতার ও ক্ষুরধার বুদ্ধির শাণিত চাকচিক্য—উভয় ধারাই পাশাপাশি বিদ্যমান। লেখকের বর্ণনাভঙ্গিও এই বুদ্ধিবৃত্তির অতিরেকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে—কতকগুলি অধ্যায় যেন প্রথম বর্ণনা বলিয়া মনে হয় না, ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত epigram-সমাকীর্ণ কোন পূর্বতন বর্ণনার সংক্ষিপ্ত সার-সংকলন বলিয়াই বোধ হয়। * * * লেখকের বর্ণনা যেন আখ্যায়িকার সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া epigram-এর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে। * * * উপন্যাসের প্রত্যেক চরিত্রটিরই কথাবার্তা ঠিক একই সুরে বাঁধা, সকলেই epigram-এর ধনুকে টংকার দিতেছে, কেহই ঠিক সরল স্বাভাবিক ভাষায় নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে রাজী নয়। * * * চরিত্রানুযায়ী ভাষায় পার্থক্য রক্ষার চেষ্টা কোথাও দেখা যায় না এবং এই সুরের অভিন্নতা নাটকীয় সুসংগতির প্রবল অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। এই হ্রস্ব, বাহুল্য-বর্জিত ভাষাই উপন্যাসগুলির গতিবেগ প্রচণ্ডরূপে বাড়াইয়া দিয়াছে, কোথাও রহিয়া সহিয়া রসোপভোগের অবসর নাই। কেবল স্থানে স্থানে প্রেমের মুগ্ধ বিহ্বলতা বা ধ্যানমগ্ন আত্ম-বিস্মৃতির বর্ণনাতে লেখক নিজ প্রচণ্ড গতিবেগের পায়ে কবি-কল্পনা ও ভাব-গভীরতার স্বর্ণশৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত সবই উদ্দাম ঝড়ের হাওয়ার মত একটা নিঃশ্বাসহীন চঞ্চলতা উপন্যাসগুলিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। * * * "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা", ২৩২-৩৩ পৃঃ।

শ্রীকুমারবাবুর বিশ্লেষণ ত আমার সত্য বলিয়াই মনে হয়।

ছয়

"চতুরঙ্গ" (১৩২১)
"ঘরে বাইরে" (১৩২২)

"গোরা"-রচনার প্রায় ছয় বৎসর পর, ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন, এই চারি মাসে চারিটি গল্প পৃথক পৃথকভাবে "সবুজ পত্রে" প্রকাশিত হয়; গল্পগুলির নাম ছিল 'জ্যাঠামশায়', 'শচীশ' 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস'। দ্বিতীয় গল্পটি বাহির হইবা মাত্রই বুঝা গেল, ইহারা পৃথক পৃথক গল্প নয়, একটি সুবৃহৎ গল্পের বিভিন্ন অধ্যায় মাত্র। পরে যখন "চতুরঙ্গ" নাম লইয়া গল্প চারিটি একসঙ্গে গ্রন্থাকারে গ্রথিত হইল তখন একথা আরও পরিষ্কার হইল, তখন ভাল করিয়া বুঝা গেল, ভিতরের একটি ঐক্যসূত্রে গল্পগুলি গাঁথা।

"চতুরঙ্গ" লইয়া বাঙালী সাহিত্যিক মহলে একেবারে উল্টা রকমের মতামত শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে "চতুরঙ্গ" শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আবার কাহারও মতে 'রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাস সমূহের মধ্যে "চতুরঙ্গ" সর্বাপেক্ষা কাঁচা ও আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary)'।* শেষের মতটি শ্রীকুমারবাবুর। তিনি বলেন "সমস্ত বিষয়ের আলোচনা অপূর্ণ", "শচীশ ও দামিনীর দ্রুত পরিবর্তনগুলি যেন অনেকটা নিয়মহীন উদ্দাম খেয়ালেরই অনুবর্তন করিতেছে বলিয়া মনে হয়। যেন একটা পাগলা হাওয়া যদৃচ্ছাক্রমে চরিত্রগুলিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও তাহাদের পরস্পর সম্পর্কটিকে অস্থির পরিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে সর্বদা বিবর্তিত করিতেছে। উদ্দেশ্য-গভীরতার অভাব সর্বত্রই পরিস্ফুট।"

* "বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা", ২৩৪ পৃঃ।

এই পর্বের উপন্যাসগুলির আলোচনার গোড়াতেই আমি বলিয়াছি এবং সকলেই তাহা জানেন যে, "চতুরঙ্গ" অথবা "শেষের কবিতা" জাতীয় উপন্যাসগুলি প্রধানত বুদ্ধিগম্য, ইহাদের রসোপলব্ধি বুদ্ধিসাধ্য। সহজ সংস্কার হইতে অথবা ভাবাবেগ হইতে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসারিত হয়, সে-আনন্দ আহরণ এই উপন্যাসগুলি হইতে আশা করা অন্যায়; লেখক তাহা চাহেন নাই, চাহিলে দামিনীর মৃত্যুর করুণ রসবস্তুটিকেও তিনি শুষ্ক আবেগের তাপে উত্তপ্ত করিয়া দু'টি মাত্র কথায় ব্যক্ত করিতেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন, বুদ্ধির দীপ্তি দিয়াই পাঠক শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাসকে বুঝিতে চেষ্টা করুক। এমন কি পরোক্ষে তিনি দামিনীকে দিয়া এবং স্বাভাবিক উপায়ে বিশিষ্ট একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লীলানন্দ স্বামী ও শচীশের একান্ত ভাবমুগ্ধ রসাবেশের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ কটাক্ষই করিয়াছেন। সেইজন্য "চতুরঙ্গে"র প্রত্যেকটি পরিবেশ প্রতেকটি চরিত্র বুঝিতে হইলে জাগ্রত বুদ্ধির আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই; বস্তুধর্মের সঙ্গে সুনিবিড় পরিচয় ছাড়া "চতুরঙ্গের" রসোপলব্ধি সম্ভব নয়। শ্রীবিলাস যে-দৃষ্টি, যে-মননভঙ্গি লইয়া শচীশ ও দামিনীকে জানিয়াছে, বুঝিয়াছে, পাইয়াছে, সেই দৃষ্টি, সেই মনন-ভঙ্গিই "চতুরঙ্গে"র রহস্য-কুঞ্চিকা। প্রভাতবাবু শ্রীবিলাসকে বলিয়াছেন 'বেচারী'। শ্রীবিলাস 'বেচারী' নয়। "চতুরঙ্গে"র একপ্রান্তে চিত্ত-শক্তিতে দৃঢ় জগমোহন, আর এক প্রান্তে বুদ্ধিতে ও বস্তুধর্মে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবিলাস। শ্রীবিলাস জগমোহনের শিষ্যত্ব করিয়াছে, শচীশের সাকরেদি করিয়াছে, লীলানন্দ স্বামীর দলে ভিড়িয়া প্রাণপণে কীর্তন করিয়াছে, দামিনীর ফরমায়েস খাটিয়াছে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাহার দৃষ্টি মতাবিষ্ট বা মোহাবিষ্ট হয় নাই। 'কোনো রাঙা চেলির ঘোমটার নীচে সাহানা রাগিনীর তানে' সে দামিনীকে বিবাহ করে নাই। 'দিনের আলোতে সব দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া বুঝিয়াই' সে একাজ করিয়াছিল। সকল-বস্তুর সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত থাকিয়াও সে যে-ভাবে তাহার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও বুদ্ধি মোহমুক্ত রাখিয়াছে, লেখকও পাঠকের কাছে এই স্বচ্ছ দৃষ্টি ও মোহমুক্ত বুদ্ধির দাবি করিয়াছেন।

গল্প-বস্তুর সমস্ত বিষয়গুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থে নাই একথা সত্য, কিন্তু থাকিতেই হইবে এও ত একটা সংস্কার মাত্র। পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নাই, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ বোধ ও রসোপলব্ধির ইঙ্গিত লেখক রাখিয়া গিয়াছেন; বুদ্ধি ও কল্পনা দিয়া তাহা স্ফুটতর ও স্পষ্টতর করিয়া লওয়া কঠিন নয়। পাঠকের কাছে এইটুকু দাবি করা কিছু অসংগতও নয়।

"চতুরঙ্গে"র প্রথম অধ্যায়টি যাঁহারা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, জ্যাঠামশাই ব্যক্তিটি উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের লোক; নাস্তিক, পজিটিভিস্ট এবং নাস্তিক বলিয়াই চিত্তশক্তিতে দৃঢ়, হিউম্যানিস্ট বলিয়াই হিন্দুসমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহারে অবিশ্বাসী। যতদিন জ্যাঠামশাই ছিলেন ততদিন তাঁহার ধর্ম ও বিশ্বাসই ছিল শচীশের আশ্রয়; জ্যাঠামশায়ের চিত্তবলই তাহার চিত্তবল। সে যে ননীবালাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল তাহা কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায়, লোকহিতের প্রেরণায়; জানিয়া বুঝিয়া নিজের চিত্তবলের উপর নির্ভর করিয়া নয়। বস্তুত জ্যাঠামশায়ের শিষ্যত করিয়াও সে নিজের প্রতিষ্ঠা-ভূমি কিছু পায় নাই, আত্মসত্তার পরিচয়ও নয়। সেইজন্যই জ্যাঠামশায় যখন বিদায় লইলেন তখন লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব লইয়া 'খাওয়াছোঁওয়া স্নানতর্পণ যোগযাগ-দেবদেবী কিছুই মানিতে' সে বাকী রাখিল না। যে ছিল নাস্তিক, জাতধর্ম যে কিছুতেই মানিত না সে একেবারে রসচর্চার রসাতলে ডুবিয়া গেল। উনবিংশ শতকের

শেষপাদে ও বিংশ শতকের গোড়ায় ইহাই ছিল নাস্তিক্যের পরিণতি ; যুক্তিবাদের উত্তুঙ্গ শিখরে যাঁহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, নিছক বুদ্ধি ও যুক্তি যখন তাঁহাদের আর রক্ষা করিতে পারিল না, তখন তাঁহারাই সমস্ত যুক্তি বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়া ভাবের আসমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়া একেবারে নিরবচ্ছিন্ন রসসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, চোখ মেলিয়া দেখিতে পর্যন্ত চাহিলেন না। লীলানন্দ স্বামীর আশ্রয়ে এই রকম যখন শচীশের অবস্থা তখন একদিন সে কি একটা কারণে অসময়ে তা'র শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাঠের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তা'র চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেঝের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, 'পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া কর, দয়া কর, আমাকে মারিয়া ফেল!' এই দামিনী 'মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন রসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মত লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলি ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।' সেই দামিনী ভালবাসিয়া সমুদ্রতীরশায়ী গুহার মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে শচীশের পায়ে নিজেকে লুটাইতে গিয়াছিল। জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক চেতনায় হউক অচৈতন্যে হউক শচীশ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। গুহা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুরাতন ভাববাষ্পাচ্ছন্ন জীবন যখন আরম্ভ হইল তখন ধীরে ধীরে শচীশের মধ্যে আলোড়ন দেখা দিল; 'জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখে দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তা'র পা টলিতেছে।' দামিনীর প্রতি আকর্ষণ অনিবার্য হইয়া উঠিল, এবং শেষ পর্যন্ত সে বলিতে বাধ্য হইল, 'আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, এমন করিয়া তফাৎ হইয়া থাকিও না'। দামিনী ক্রমশ তাহার জীবনে সত্য হইয়া উঠিল, ভিতরে ভিতরে একটি তুমুল অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল, কিন্তু ঠিক এই সময়ে ভাববিহ্বলতার রঙীন ফানুস এক শিষ্যের স্ত্রীর আত্মহত্যা উপলক্ষ করিয়া ফাটিয়া ধূলায় লুটাইল। কিন্তু তাহাতে শচীশের সমস্যা মিটিল না, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়িয়াই চলিল, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে চিত্তের গভীরতর সত্তার একটি সংগ্রাম নিরন্তর তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। দামিনী ত রূপ, সেই রূপতৃষ্ণা শচীশের আছে, কিন্তু তাহার গভীরতর সত্তা অরূপের মধ্যে ডুব মারিবার জন্য ব্যগ্র। শেষ পর্যন্ত সে তাহাই করিল; এক ঝড়ের রাত্রে প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে উদ্বেলিত বিপর্যস্ত দামিনীকে সে বলিল, "যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড় দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।" শচীশের জীবনের মূল ধরিয়া নাড়িয়া দিয়াছিলেন জ্যাঠামশায়; তারপর সে আর কোথাও মূল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, কেবলই এক কক্ষ হইতে আর এক কক্ষে ঘুরিয়া মরিয়াছে; কেবলই ভাবদ্বন্দ্বে দোল খাইয়াছে। 'একদিন সে বুদ্ধির উপর ভর করিয়া দেখিল, সেখানে জীবনের সব ভার সয় না; আর একদিন রসের উপর ভর করিয়া সে দেখিল, সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই।' আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে যে আশ্রয় সে পাইল সেখানে দামিনীর কোনও স্থান নাই। শচীশ সেখানে 'আলেয়ার আলো নয়, সে-যে আগুন।' সে তখন জ্বলিতেছে; 'তা'র জীবনটা একদিক হইতে আর একদিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া' উঠিয়াছে।

দামিনীর জীবন আমাদের সম্মুখে যখন উন্মুক্ত হইল তখন সে ভক্তির দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী নারী। কিন্তু লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে শচীশের অভ্যুদয়ের কিছুদিনের মধ্যেই অঘটন ঘটিতে আরম্ভ হইল। শচীশের দিকে সে সবলে আকৃষ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে

তাহার বাহিরের "বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল। * * * এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তা'র শোভা দেখিতে লাগিল।" কিন্তু শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না। দামিনীর প্রেম শচীশের স্বীকৃতিলাভ করিল না, সেই দামিনী শচীশের কাছে প্রথম প্রত্যাখ্যাত হইল গুহাভ্যন্তরে। প্রত্যাখ্যাতা দামিনী আবার বিদ্রোহিনী হইল। ভক্তির দস্যুবৃত্তির মধ্যে সে কিছুতেই ধরা দিবে না। কিন্তু ধরা দিবে না স্থির করিলেই ত হয় না। একবার যে সে ধরা দিয়াছিল সে ত শচীশের টানে; সে-টান ত তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। অথচ প্রকাশ্য আনুগত্যটা শ্রীবিলাসের প্রতিই বেশী, সেজন্য শচীশের মনে একটু ঈর্ষাবোধও আছে। অনেক ভাবিয়া নিজের সঙ্গে অনেক যুঝিয়া শচীশ দামিনীকে নিজেদের ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গতার মধ্যে আহ্বান করিল। দামিনী ভাবিল, শচীশকে পাইবার পথ বুঝি উন্মুক্ত হইল; ভাবিল, শচীশের পথানুবর্তিনী হইয়া বুঝি সে তাহাকে পাইবে। দামিনী আবার গলিল। কিন্তু গলিলে হইবে কি? আত্ম-সংগ্রামে পীড়িত হইয়াও শচীশ শেষ পর্যন্ত গলিল না এবং অবশেষে দামিনীকে চিরতরে বিদায় দিল! দামিনী বিদায় লইল, কিন্তু বিদায় লইবার আগে কথায় ও কর্মে শচীশকে, শ্রীবিলাসকে, এবং "চতুরঙ্গে"র পাঠককে বুঝাইয়া দিয়া গেল যে, তাহার সমস্ত হৃদয় ও মন শচীশের; শচীশকেই নিঃশেষে সে তাহার সমস্ত সভক্তি প্রেম, সমৃদ্ধ ভালবাসা অর্পণ করিয়াছে। বিদায় লইবার পর এবং শ্রীবিলাসের সঙ্গে বিবাহ হইবার পরও সে শচীশকে ভুলিতে পারে নাই; কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধায় ও প্রেমে সে বারবার তাহাকে স্মরণ করিয়াছে। দামিনী যেদিন শচীশের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতা চলিয়া আসে সেদিন পথে শ্রীবিলাস শচীশকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু কড়া কথা বলিয়াছিল। উত্তরে দামিনী রাগ করিয়া বলিয়াছিল, "দেখ, তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিয়োনা। তিনি আমায় কি-বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কি জান! তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও—আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল, তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে।" তারপরে দামিনীই আবদার করিয়া শচীশকে লইয়া আসিল শ্রীবিলাসের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিবার জন্য, এবং এক বৎসর পরে মৃত্যুশয্যায় যখন সেই পুরাতন বুকের ব্যথা, সেই অন্ধকার গুহায় শচীশের পায়ের লাথি লাগিয়া যে-ব্যথার সৃষ্টি সেই ব্যথা "যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য?"

কিন্তু শ্রীবিলাস শচীশও নয়, দামিনীও নয়। শচীশকে অবলম্বন করিয়া সে জ্যাঠামশায়ের শিষ্যত্ব লইয়াছিল, এবং পরেও শচীশকে উদ্ধার করিতেই সে লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে আসিয়া জুটিয়াছিল, শচীশের টানেই সে দলের স্রোতে ভিড়িয়াও গিয়াছিল। কিন্তু শ্রীবিলাস কখনও ত "ভেদজ্ঞান-বিলুপ্ত একাকারতা বন্যার একটা ঢেউ মাত্র হইতে" চাহে নাই। এই রসসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যস্থানে বসিয়া সে একদিন ভাবিয়াছে, এ রসের তরঙ্গ তাহার সহিবে না, ছুটিয়া সে পালাইবে। সেই আশ্রম হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত সে শচীশ-দামিনীর সমস্ত লীলাটা চোখের উপর দেখিয়াছে। আগাগোড়াই সে ইহাদের সঙ্গে জড়িত; তিনজনের মধ্যে সে একজন, কিন্তু দামিনীর কাছে বরাবরই সে ছিল নিতান্তই গৌণ। অথচ শ্রীবিলাসের হৃদয়ে দামিনীর উত্তাপ যে লাগিয়াছিল তাহার

প্রমাণ ত তাহার বচনে ও কর্মে সুস্পষ্ট; দামিনীও যে তাহার খবর রাখিত না তাহা নয়; কিন্তু শচীশ তাহাকে শেষ বিদায় দিবার আগে পর্যন্ত 'সে খবরটা তাহার কাছে দরকারী খবর ছিল না।' এতদিন 'শ্রীবিলাস যে একটা কিছু, দামিনী সে কথা লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই, বোধ করি আর কোনও দিক হইতে তাহার চোখে বেশী আলো পড়িয়াছিল'। এইবার শচীশের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকিয়া যাওয়ার পর শ্রীবিলাস যখন তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল, তখন 'দামিনী যেন শ্রীবিলাসকে প্রথম দেখিল।'

এই ত অতি সংক্ষেপে শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের পরিচয়। এই পরিচয়ের মধ্যে শচীশ ও দামিনীর যে পরিবর্তন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহা কি খুব দ্রুত? এই পরিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তরই লেখক আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তবে এই উদ্ঘাটনের বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত ও সংকেতময় বলিয়া পরিবর্তনটাই দ্রুত বলিয়া মনে হয়। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিদ্রোহিণী দামিনীকে লীলানন্দ স্বামী কিছুতেই বাগ মানাইতে পারিতেছিলেন না, সেই অবস্থার মধ্যে আশ্রমে শচীশের আবির্ভাব হইল এবং তারপরেই কি করিয়া দেখিতে দেখিতে দামিনীর এক অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গেল, কি করিয়া সে তাহার পাথরের দেবতা শচীশের হাত হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করিল, ইহার সমস্ত ইতিহাসটি বর্ণিত হইয়াছে মাত্র কয়েকটি লাইনে। ইহার পশ্চাতে সুবিস্তৃত অলিখিত ইতিহাস ইঙ্গিতে শুধু ব্যক্ত হইয়াছে। "অঘটন ঘটিতে শুরু হইল। আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না, লেখাও কঠিন।" সত্যই ত, আর লিখিয়া কি হইবে। সমস্ত কথা ত ঐখানেই বলা হইয়া গিয়াছে। ইহার পর দামিনী কি করিয়া স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিল তাহার আভাস দিয়াই লেখক খালাস। এই যে এতবড় পরিবর্তনটা হইল তাহা দ্রুত হয় নাই, দ্রুত সাংকেতিক সংক্ষিপ্ততায় বলা হইয়াছে মাত্র। আর এই পরিবর্তনগুলি 'নিয়মহীন উদ্দাম খেয়ালের অনুবর্তন', তাহাই বা কি করিয়া বলি? শচীশের যে-পরিবর্তন আমরা দেখিলাম তাহা কি নিয়মহীন উদ্দাম খেয়াল; সে যে এক স্তর হইতে আর এক স্তরে বিবর্তিত হইয়াছে তাহা খুব সংগত ও স্বাভাবিক কারণেই। জন্ম-সংস্কারে সে যে খুঁটিতে বাঁধা ছিল, জগমোহন তাহাকে সেখান হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন; বুদ্ধির উপর ভর করিতে গিয়া সেখানে সে দাঁড়াইতে পারে নাই, রসের পালে হাওয়া লাগাইয়া পারে পৌছিতে সে পারে নাই, তখন সে যে পথে নিজের মুক্তি পাইল সে পথ তোমার আমার পথ নয়। এই যে এক খুঁটি হইতে আর এক খুঁটিতে গিয়া বাঁধা পড়া, এবং শেষ পর্যন্ত রূপ-সাধনা ছাড়িয়া অরূপ সাগরে ডুবিয়া যাওয়া, ইহা ত উদ্দাম খেয়াল নয়, ইহা আত্মানুসন্ধান। দামিনীর সঙ্গে তাহার যে আকর্ষণ-বিকর্ষণলীলা তাহাকেও খেয়াল বলিলে অন্যায় বলা হইবে। দামিনীর শোভা সে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছে, সে ত দামিনীকে দেখে নাই, কিন্তু তারপর সে যখন বুঝিল দামিনীর রূপের নেশায় পা তাহার টলিতেছে, তখন হইতেই আরম্ভ হইল দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, একবার নিকটে আসিয়াছে, একবার দূরে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু অবশেষে সে জয়ী হইয়াছে। ইহার পরেও কি করিয়া বলি, শচীশ-চরিত্রে উদ্দেশ্য-গভীরতার অভাব, ইহার পরেও কি করিয়া বলি শচীশের চরিত্র-বিকাশে কার্য কারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই?

দামিনীর চরিত্র সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। দামিনী যে স্থির সৌদামিনী হইয়া আত্মোৎসর্গের শিশিরভরা মুখটি উপরের দিকে তুলিয়া ধরিয়াছিল তাহা লীলানন্দ স্বামীর প্রতি ভক্তিতে বা রস-সাধনার প্রতি শ্রদ্ধায় নয়, শচীশের প্রতি প্রেমে। তারপর আবার

সে যে বিদ্রোহিণী হইল তাহা শচীশের প্রত্যাখ্যানে, এবং পরে আবার যে পাথর গলিল তাহাও শচীশের আহ্বানে। শচীশই তাহার জীবনের কার্যকরণ-সম্বন্ধের মানদণ্ড, এবং দামিনীর আবর্তন-বিবর্তন সেই মানদণ্ডেই বিচার্য। শচীশকে গভীরতর সত্তার মধ্যে লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হওয়াই দামিনীর একমাত্র ধ্যান, একমাত্র আদর্শ; শচীশ তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিল একথা সত্য, কিন্তু তাহার ধ্যান ও আদর্শকে ততক্ষণ সে সত্য ও সার্থক করিয়া লইয়াছে। এবং তাহা করিয়াছে বলিয়াই শ্রীবিলাসের আহ্বানে পরে সে এত সহজে সাড়া দিতে পারিয়াছে।

আসল কথা "চতুরঙ্গ" বা "শেষের কবিতা" বিবরণধর্মী উপন্যাস নয়। নিছক রসসমৃদ্ধ বিবৃতির স্তরের ঊর্ধ্বে উঠিয়া লেখক বুদ্ধির স্তর হইতে ইঙ্গিতে সংকেতে ব্যঞ্জনায় হ্রস্ব সূত্রাকারে ঘটনা ও চরিত্রের গতি পরিণতির আভাস মাত্র দিয়াছেন। যাহা ঘটিতে অনেক সময় লাগিয়াছে, অনেক খড়কাঠ পুড়িয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ কোথাও নাই; এখানে একটি সরল, ওখানে একটি বক্ররেখা দিয়া লেখক কর্তব্য শেষ করিয়াছেন, ইহার সঙ্গে একটু বুদ্ধি ও কল্পনা যোগ করিলেই চিত্রটি সম্পূর্ণ হইতে পারে। এই বুদ্ধি ও কল্পনাকে কোথায় কি ভাবে মুক্তি দিতে হইবে তাহারও ইঙ্গিত-সংকেত রাখিয়া যাইতে লেখক কোথাও ভুলেন নাই। গুহা-দৃশ্যটি পাঠককে স্মরণ করিতে বলি। কি অপূর্ব পরিবেশ-সৃষ্টি! কি অভিনব সংকেতময় ব্যঞ্জনায় রহস্যের অবতারণা! সেই 'আদিম জন্তুটা'র ধর্ম, তাহার গভীর অর্থ, তাহার পশ্চাতের সুদীর্ঘ অলিখিত ইতিহাস কি সবিস্তার বর্ণনার, কার্যকরণ-সম্বন্ধ-বিশ্লেষণের আর কোনও অপেক্ষা রাখে! শচীশের সঙ্গে দামিনীর যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্বন্ধ তাহার সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্বলীলাও লেখক সবিস্তারে বলেন নাই, কিন্তু প্রত্যেক ভাব-পরিবর্তনেই দু'একটি ভাবগর্ভ বুদ্ধিদীপ্ত সংকেতময় সূত্রে যে-রহস্য-ইতিহাস ব্যক্ত করিয়াছেন, কার্যকরণ-সম্বন্ধের শৃঙ্খলা সেইখানে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এই ধরনের সূত্র কত যে এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তাহার হিসাব করা যায় না। ইহারা যে কবিকল্পনায় সমৃদ্ধ তাহাই নয়, ইহারা এক একটি বিদ্যুচ্চমক; যেখানেই ঘটনা ও চরিত্রগুলি চোখের আড়ালে চলা-ফেরা করে, সেইখানেই ইহাদের ক্ষণিক দীপ্তি একমুহূর্তে সব কিছুকে আলোকিত করিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়া দেয়, অন্যমনস্ক হইলেই এই সব বিদ্যুচ্চমক পাঠককে এড়াইয়া যায়, তখন মনে হয় ঘটনাগুলি অসংলগ্ন, চরিত্রগুলি বাত্যাতাড়িত শুষ্কপত্রের ন্যায় উদ্দাম। বস্তুত, তাহা নয়।

"চতুরঙ্গে"র কবিকল্পনার ঐশ্বর্যও লক্ষ্য করিবার। বুদ্ধিদীপ্ত সূত্রগুলির মধ্যে ত সে-পরিচয় আছেই; তাহা ছাড়া, নানা জায়গায়, নানা বর্ণনায়ও এই ঐশ্বর্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। সর্বত্রই এই বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; দুই চারিটি বাক্য মাত্র তাহার সম্বল, অথচ এই সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যেই সমস্ত রহস্য; সমগ্র সত্যটি যেন ঘনীভূত হইয়া আছে। কয়েকটি মাত্র বাক্যে দামিনীর যে বর্ণনা, একটি মাত্র পৃষ্ঠায় নারীহৃদয়ের অতলরহস্যের যে আভাস, দু' তিনটি প্যারাগ্রাফে দামিনীর পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত, কিঞ্চিদধিক এক পৃষ্ঠায় নীলকুঠির ভগ্নাবশেষের যে বর্ণনা, দু'টি প্যারাগ্রাফে বালুচরের বর্ণনা, দু'টী মাত্র পৃষ্ঠায় শচীশের গভীরতর সত্তার নিষ্পলক ধ্যানের যে ইঙ্গিত, ঝড়ের রাত্রের সেই বর্ণনা, দামিনীর স্পর্শে শ্রীবিলাসের অন্তরের নূতন আস্বাদনের বর্ণনা, এ সমস্ত কি ব্যর্থ যাইবার? এখানে এই সব বর্ণনা উদ্ধার করিলেই কি তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করা যাইবে? সে চেষ্টা আর না-ই করিলাম।

তবু "চতুরঙ্গ"কে আমি মহৎ উপন্যাস বলি না। ইহার বস্তুভূমির গভীরতা আছে, কিন্তু প্রসার নাই, মানব সংসারের বিচিত্র বহুমুখীন তরঙ্গলীলার সঙ্গে ইহার যোগ নাই। ইহার জীবন-দর্শন খণ্ডিত, জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ এই উপন্যাসে লাগে নাই। কিন্তু "চতুরঙ্গ" সুন্দর ও সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি! ইহার বুদ্ধির দীপ্তি, রহস্যময় সংকেত, ইহার হ্রস্ব, সূত্রাশ্রিত বর্ণনাভঙ্গি, ইহার জ্ঞানগর্ভ ইঙ্গিতময় বিবৃতি, ইহার সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের ধারা, সর্বোপরি ইহার কবিকল্পনার ঐশ্বর্য ইহাকে যে বিশেষ এবং অভিনব সাহিত্যমূল্য দান করিয়াছে তাহার তুলনা "শেষের কবিতা" ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর একটিও নাই।

এমন অপূর্ব কাব্যগুণসম্পন্ন, এমন গভীর ভাব ও ব্যঞ্জনাময়, এমন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও ভাবানুভূতিময়, এমন শিল্প ও সৌন্দর্যময় হওয়া সত্ত্বেও "চতুরঙ্গ"কে যে মহৎ সাহিত্য, এমন কি মহৎ উপন্যাসও বলিতে পারিলাম না তাহার মূলে সাহিত্যদর্শনগত কারণ নিশ্চয়ই একটা আছে। বহুযুগের অভ্যাসে ও সংস্কারে আমাদের চিত্তে উপন্যাসের একটা সংজ্ঞা দাঁড়াইয়া গিয়াছে; সে সংজ্ঞা আজ আর নূতন করিয়া বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। "রামায়ণ" ও "মহাভারত", বিশেষভাবে "মহাভারত"কে বলি মহাকাব্য; কিন্তু "রঘুবংশ" বা "কুমারসম্ভব"কে বলি খণ্ডকাব্য; দুয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু আয়তনের নয়, প্রকৃতিরও; মহাকাব্যের বস্তুভূমি কেবল গভীরই নয়, তাহার প্রসারিত ভুজাবলী একটা সমগ্র দেশ ও কালকে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজ করে; ইহাই তাহার আয়তনের দিক। তাহা ছাড়া মহাকাব্য সদ্যোক্ত দেশ ও কালের বিচিত্র ও বহুমুখী জীবনতরঙ্গের বিচিত্রতর রূপ ও লীলাকে একটি বিরাট ঐক্য ও সমগ্রতার মধ্যে ধারণ করে; ইহা তাহার প্রকৃতির দিক। "রামায়ণ", "মহাভারত" এই হিসাবে মহাকাব্য। খণ্ড কাব্য বস্তুভূমির ঠিক এই ধরনের প্রসারতা কামনা করে না, বরং খণ্ডিত দেশ ও কালের ক্ষুদ্রতর সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট ভূমির গভীরতা পরিমাপ করে, এবং পাঠকচিত্তে সেই গভীরতার রস সঞ্চার করে। তাহা ছাড়া, খণ্ডকাব্য মানবসংসারের বিচিত্র ও বহুমুখী তরঙ্গলীলাকে সামগ্রিক ঐক্যের মধ্যে দেখিবার প্রয়াস করে না, দেখে তাহার একটা অংশকে একটা বিশেষ দিককে, সমগ্রেরই একটা বিশেষ রূপ হিসাবে। আধুনিক কালে জীবনের সূক্ষ্মতা ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের স্মৃতি ও সংস্কার আমাদের চিত্তে ম্লান হইয়া আসিয়াছে; "রঘুবংশ" বা "কুমারসম্ভবে"র মত খণ্ডকাব্যের প্রচলনও আর নাই। সাক্ষাৎ বস্তুসম্পর্কগত, মানব-সংসারগত, জীবনঘনিষ্ঠ যত চিন্তা ও আবেগ, যত দ্বন্দ্ব ও সমস্যা, যত দুঃখ ও বেদনা, যত সুখ ও আনন্দ ইত্যাদি, আজ স্বতঃই রূপায়িত হইতেছে উপন্যাসে, আর নাটকে। নাটক প্রাচীনকালেও ছিল, এখনও আছে, যদিও এখনকার নাটক রূপে ও প্রকৃতিতে নানাভাবে বিবর্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। তবু, সাধারণভাবে একথা বলা যায়, প্রাচীন খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্যের স্থান আজ যদি আর কোনও সাহিত্যরূপ অধিকার করিয়া থাকে তবে তাহা উপন্যাস। ছোটগল্পের কথা এখানে তুলিয়া লাভ নাই; কারণ ছোটগল্প একেবারে অন্য জাতের রচনা। বস্তুঘনিষ্ঠ মানবসংসারের বিচিত্র তরঙ্গপর্যায়, তাহার উত্থান পতন, সুখ দুঃখ, দ্বন্দ্ব সমস্যা, আনন্দবেদনার মধ্যে দেশকালধৃত ও দেশ-কালাতীত নরনারীর বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করা এবং প্রত্যক্ষগোচর করা আজিকার দিনে একমাত্র উপন্যাসেই সম্ভব। সেই জন্যই বর্তমান কালে উপন্যাসের এত প্রসার ও প্রভাব। কিন্তু এই উপন্যাস ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সাহিত্যে বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, এখনও তুলিতেছে।

তবু, মোটামুটি ভাবে, প্রকৃতির দিক হইতে দু'টি বিভিন্ন পৃথগ্‌মুখী প্রকৃতি বোধও বুদ্ধিগোচর করা যায়। এক ধরনের উপন্যাসে বস্তুভূমির সুবিস্তৃত প্রসার, এবং প্রসারতা যেমন ব্যাপক গভীরতা তেমনই অতলস্পর্শী; শুধু তাহাই নয়, সেই গভীর ও সুবিস্তৃত বস্তুভূমির ও প্রসারিত কালধৃত বিচিত্রবোধ ও চেতনাগত ভাব ও অনুভবগত জীবন-প্রাচুর্যের একটি ঐক্যবদ্ধ সমগ্র রূপের প্রকাশও এই ধরনের উপন্যাসে ধরা পড়ে। অন্তত লেখকের কামনাও উদ্দেশ্য থাকে তাহাই। বর্তমান কালে এই ধরনের উপন্যাস টলস্টয়ের "War and Peace", ডস্টয়ভ্‌স্কির "Crime and Punishment", গর্কির "Mother"। ইহাদের সাধারণভাবে বলা যায় মহৎ উপন্যাস; 'মহৎ' কথাটা নিঃসংশয়ে ইহাদের সম্বন্ধেই ব্যবহার করা চলে। উপন্যাসের আর এক প্রকৃতি দেখি সেই সব বস্তুঘনিষ্ঠ জীবন-সম্বন্ধগত রচনায় যেখানে বস্তুভূমির প্রসারতার দিকে লেখকের দৃষ্টি ততটা আকৃষ্ট নয়, বরং স্বল্পবিস্তৃত ভূখণ্ডের কালসীমাধৃত মানবসংস্কারের একটি অংশে বা একটি দিকে মাত্র তাহার মননকল্পনা বিস্তৃত; বিচিত্র বহুমুখী পরস্পর বিরোধী স্রোত ও তরঙ্গের সামগ্রিক সমন্বয় নয়, দুই একটি স্রোত বা তরঙ্গের বিচিত্র ও গভীর বর্ণ ও রূপবিন্যাসের পরিচয়ই সেক্ষেত্রে লেখকের লক্ষ্য। আধুনিক যুগের অধিকাংশ উপন্যাসই এই প্রকৃতির; "চতুরঙ্গ" ও তাহার ব্যতিক্রম নয়। যখন বলি, "চতুরঙ্গ" মহৎ উপন্যাস নয়, তখন আমার মনের পশ্চাতে টলস্টয়-ডস্টয়ভ্‌স্কি-গর্কির মহৎ উপন্যাসের স্মৃতি ও সংস্কার সক্রিয়। "চতুরঙ্গে" বস্তুঘনিষ্ঠ মানব-সংসারের সুবিস্তীর্ণ প্রসারতা নাই, তাহার উত্থান পতন, শান্তি সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব আলোড়নের বিচিত্র ও বহুমুখী পরিচয় নাই: এই জন্যই "চতুরঙ্গ" মহৎ উপন্যাস নয়। মানব জীবনের একটি প্রধান চিত্তবৃত্তি প্রেম; একটি বিশেষকালের একটি বিশেষ জীবনাদর্শের বিশেষ কয়েকটি আবেষ্টনের বিচিত্র বিরোধী সংস্থানের মধ্যে সেই প্রেমের রূপ ও লীলা কত গূঢ় কত বিচিত্র, কত গভীর, কত বর্ণময়, কত রহস্যময় হইতে পারে, তিনটি মানুষের কর্মকৃতির মধ্যে কত বিভিন্ন রূপ লইতে পারে, তাহারই মনন-কল্পনা লইয়া "চতুরঙ্গ" উপন্যাস। এই মনন-কল্পনার শিল্প-সৌন্দর্যময় প্রকাশ যে কত সুন্দর ও সার্থক হইতে পারে, তাহা ত আগেই সবিস্তারে বলিয়াছি। কিন্তু সুন্দর ও সার্থক হইয়াছে বলিয়াই মহৎ হইবে, এমন ত বলা চলে না। আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে যাহা একটা অংশ, খণ্ডিত, একদেশী, তাহা কিছুতেই সামগ্রিক ঐক্যের যে গুণ তাহা দাবি করিতে পারে না।

বস্তুত এই দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে "গোরা" ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোন উপন্যাসেরই এই মহৎ আখ্যার দাবি নাই। একমাত্র "গোরা"তেই রবীন্দ্রনাথ একটি দেশ ও কালের বিস্তৃত প্রসারতার মধ্যে তদানীন্তন একটি বৃহৎ জীবন-প্রবাহের বিচিত্র তরঙ্গ-পর্যায়কে গভীর ভাবে ধরিতে এবং সমস্ত বৈচিত্র্যকে একটি সমগ্রতার মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং বহুলাংশে সার্থকও হইয়াছিলেন। উত্তর জীবনে "তিন পুরুষের" সূচনায় আবার সে সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল, এবং যে-মনন-কল্পনার মধ্যে "তিন পুরুষের" সৃষ্টি সেই মনন-কল্পনা ভিন্নমুখী না হইলে হয়ত আর একটি মহৎ উপন্যাস সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইত। কিন্তু "যোগাযোগে" বিবর্তিত হইয়া "তিন পুরুষে"র সে-সম্ভাবনা ঘুচিয়া গেল! কি ভাবে তাহা হইল "যোগাযোগ" আলোচনা উপলক্ষে সে-কথা পরে উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুত মহৎ উপন্যাসের জটিল ও সুবিস্তৃত মহাজনারণ্য রবীন্দ্র-কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

প্রশ্ন উঠিবে. "চতুরঙ্গ" বা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাস, যেমন "শেষের কবিতা" বা

"ঘরে বাইরে" বা "যোগাযোগ", মহৎ উপন্যাস নাই বা হইল। উপন্যাস ত একটা সংজ্ঞা মাত্র, তাহার চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু তাই বলিয়া "চতুরঙ্গ" মহৎ সাহিত্য হইবে না কেন? "চতুরঙ্গ"কে মহৎ সাহিত্য বলিতে কেন যে আমার একটু আপত্তি আছে তাহার কারণ দেখাইয়া বলিয়াছি,-ইহার জীবন দর্শন খণ্ডিত, জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ এই উপন্যাসে লাগে নাই। বহুযুগের বহু দেশ ও জাতির যে-সব সাহিত্য-প্রচেষ্টা কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া আজও সগৌরবে বাঁচিয়া আছে, দেশে দেশে যুগে যুগে যাহা মহৎ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে তাহার কারণের মূলে একটা জিনিস সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাইতে পারে, কালিদাসের "শকুন্তলা" বা "কুমার-সম্ভব", সেক্সপীয়ারের ট্রাজেডি-নাট্যগুলি, গ্রীক্-ট্র্যাজেডি-নাট্য, দান্তের "ডিভাইন কমেডিয়া", গ্যয়টের "ফাউস্ট", এবং আধুনিক কালে টলস্টয়ের "War and Peace"। ইহাদের প্রত্যেকটিতেই রচয়িতার একটি জীবন-দর্শন প্রত্যক্ষ, এবং সে জীবন-দর্শনের একটা সমগ্র রূপও সমান প্রত্যক্ষ। এক একজন জীবনকে দেখিয়াছেন এক একটা দৃষ্টিকোণ হইতে, কিন্তু যত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধই হোক সে দৃষ্টিকোণটি, দেখিবার চেষ্টাটা সামগ্রিক, জীবনের একটা সমগ্ররূপ সেই দৃষ্টির মধ্যে ধরা দিয়াছে। পাঠকচিত্ত জীবনের এই সমগ্র রূপটির দৃষ্টিস্পর্শ পাইবার জন্যই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; শিল্পী যখন তাহা চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন, তখন সে আনন্দোল্লাসে গাহিয়া উঠে, এইত পাইলাম! এই সমগ্র রূপটি দেখিবার মধ্যে থাকে একটা ভাবানুভূতির পারম্পর্য, একটা যুক্তিপারম্পর্য, নিয়তি-নিয়মের একটা শৃঙ্খল; এই সব কিছু লইয়া, সব কিছুকে জড়াইয়া গড়িয়া উঠে স্রষ্টার অখণ্ড জীবন-দর্শন। এই জীবন-দর্শনের প্রেরণায় ও আবেগেই উপন্যাসোক্ত ঘটনা ও চরিত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত ও বিবর্তিত হয়। জীবনতাত্ত্বিক যাঁহারা, বিজ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহারাও জীবন-দর্শন রচনা করেন, কিন্তু সে-দর্শনের মূলে থাকে ব্যবহারিক প্রয়োজন-চেতনা, ভালমন্দ-চেতনা, থাকে বিচার, থাকে বুদ্ধি। সে দর্শনের আবেদন বুদ্ধি এবং বিচারের দুয়ারে, সে-দর্শন জ্ঞান সাপেক্ষ। কিন্তু শিল্পী যে-দর্শন রচনা করেন তাহার মূলে এই ধরনের কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজন-চেতনা বর্তমান থাকে না; তিনি শুধু বোধ ও অনুভূতির আলোকে রসসমাহিত চিত্তে জীবনকে দেখেন, সত্য তাঁহার নিকট প্রমাণিত হয় না, প্রতিভাত হয়। যে-মুহূর্তে ব্যবহারিক বা কাল্পনিক প্রয়োজন-চেতনা দ্বারা এই দেখা ব্যাহত হয় তখনই জীবন-দর্শনও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাহত হইয়া যায়। আমাদের মনে হয়, "চতুরঙ্গে" এই জীবন-দর্শনের যে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা প্রয়োজন-চেতনা দ্বারা ব্যাহত।

নরনারীর ব্যক্তিগত প্রেম ও যৌনসম্বন্ধ রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প-বস্তুর আশ্রয়, বিশেষভাবে পরিণত জীবনের অনেক রচনা এই সম্বন্ধগত সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। "চতুরঙ্গ", "শেষের কবিতা", "মালঞ্চ" প্রভৃতি উপন্যাস, "তিন সঙ্গী"র অন্তত দুইটি গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেশ বুঝিতে পারা যায়, যৌবনোন্মেষের "চিত্রাঙ্গদা"য় শুধু নয়, পরিণত বয়সেও এই নরনারী-সম্বন্ধগত সমস্যা নানাদিক হইতে তাঁহার মনকে আলোড়িত করিতেছিল; সেই আলোড়ন "তিনসঙ্গী"র 'রবিবার', 'ল্যাবরেটরি' পর্যন্ত গড়াইয়াছে। "চতুরঙ্গে" দামিনী ভালবাসিয়াছিল শচীশকে এবং সেই ভালবাসায় শচীশের পায়ের লাথি লইয়াছিল বুকে; সেই আঘাতের বেদনায় শেষ পর্যন্ত দামিনীর মৃত্যু। শচীশই তাহার প্রেমের একতম তীর্থ, সেইখানেই তাহার জীবনের একতম আশ্রয়; অথচ শচীশকে সে পাইবে না, একথা যখন সে স্থির নিশ্চয় জানিল, তখন দেখিতে পাইল, বুঝিতে পারিল

শ্রীবিলাস অনুক্ষণ তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া, উন্মুখ আগ্রহাকুল প্রতীক্ষায়। শ্রীবিলাসকে সে সেই "প্রথম দেখিল", এবং বিবাহও করিল; প্রতিদিনের সঙ্গী হিসাবে সে-ই হইল দামিনীর অবলম্বন। দামিনীর এই দৃষ্টি-পরিবর্তনের মধ্যে একটু বৈসাদৃশ্য যে ছিল সে-সম্বন্ধে লেখক কিছু অবহিত ছিলেন না, এমন নয়। তিনি সেই হেতু গল্পবস্তুর শেষতম অধ্যায়ে তাহার ব্যাখ্যাও রাখিয়াছেন। দামিনী বলিয়াছে, শচীশের লাথির ব্যথাই তাহার পরম ঐশ্বর্য, পরম যৌতুক; সে ঐশ্বর্য ও যৌতুক লইয়াই সে শ্রীবিলাসের কাছে আসিতে পারিয়াছে, "নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য"; শচীশের লাথিই তাহাকে শ্রীবিলাসের কোলে আনিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীবিলাসকে বিবাহ করার পর দামিনী দেখিতে পাইল শ্রীবিলাসের ব্যক্তি-মাহাত্ম্য ও হৃদয়-মহত্ত্ব। কিন্তু স্বল্প কয়েকদিনে শ্রীবিলাসকে পাওয়ার আশা মিটিবার কথা নয়, তাই জন্মান্তরে তাহাকে পাওয়ার কামনা বুকে লইয়া দামিনীকে মরিতে হইল। কথাটা দাঁড়াইল এই, প্রেম যাহার সঙ্গে, চিত্তোদ্বোধন যাহাকে অবলম্বন করিয়া, যে কারণেই হউক, বিবাহ তাহার সঙ্গে হইল না; প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গী করিতে হইল অন্য একজনকে। এই জীবন-দর্শন কিছু অবোধ্য নয়, অস্বীকার্যও নয়। এমন কি, একথাও স্বীকার করিতে হয়, এ-দর্শন শুধু সাময়িক বা প্রাসঙ্গিক নয়; ইহাই রবীন্দ্র-প্রত্যয়। "শেষের কবিতা"য় অমিত ও লাবণ্য পরস্পরকে ভালবাসিয়াছিল, তাহাদের উভয়ের চিত্তোদ্বোধন উভয়কে অবলম্বন করিয়া, অথচ সেই লাবণ্যকে অমিত রাখিল দীঘির জল করিয়া তাহাতে সাঁতার কাটিবার জন্য, আর বিবাহ করিল কিটিকে যে কিটি ঘড়ার জল, প্রতিদিন তাহাকে ব্যবহার করিবে বলিয়া। উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তি একটা আছে; "শেষের কবিতা"য় যুক্তিটা একটু রূঢ়, প্রসঙ্গের মর্মগত নয়, "চতুরঙ্গের" যুক্তিটা প্রাসঙ্গিক ও অপূর্ব কাব্যময়। 'রবিবার' গল্পে বিভার চিত্তোদ্বোধন অভীকের আশ্রয়ে, কিন্তু বিবাহের মাল্য বোধ হয় রহিল সেই গণিতের রিসার্চস্কলার অমরের জন্য, অন্তত অভীকের জন্য নয় নিশ্চয়ই। "শেষ কথা" গল্পেও প্রেমোদ্বোধন হইল যে-জিয়লজিস্টটিকে লইয়া, শেষ পর্যন্ত অচিরা তাহাকে দূরে সরাইয়া দিল। এই গল্প দুইটির রোম্যাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি অনস্বীকার্য, তাহা কিছু অন্যায়ও নয়, কারণ তাহাও অন্যতম রিয়্যালিটি। ছোটগল্পে তাহা হওয়া কিছু অস্বাভাবিকও নয়। বিশেষ করিয়া "শেষ কথা" গল্পে ত এই দৃষ্টিভঙ্গি অনবদ্য পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু "চতুরঙ্গ" ও "শেষের কবিতা" উপন্যাসে যে জীবন-প্রত্যয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি রোম্যাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা; কবিকল্পনার প্রেমের সঙ্গে প্রতিদিনের মানবসংসারের প্রেমের একটা যুক্তিসংগত স্বাভাবিক সংযোগের প্রয়াস। "শেষের কবিতা"য় এ-প্রয়াস একেবারেই সার্থকতা লাভ করে নাই; কবিকর্মের দিক হইতেই তাহা অসার্থক। অন্যত্র তাহা সবিস্তারেই বলিয়াছি, এখানে আর উল্লেখ করিলাম না। "চতুরঙ্গে"র কবিকর্ম অনেক উচ্চস্তরের; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মনে হয়, এই জীবন-প্রত্যয় লেখকের গভীরতর অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা সমগ্র ও সুসমঞ্জস রূপ লাভ করিতে পারে নাই। জীবনদর্শন কোথাও যেন খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। দুইটি উপন্যাসেই যেখানে ব্যবহারিক প্রয়োজন-চেতনার স্বধর্মবশে বিবাহ-প্রসঙ্গের কথা আসিয়া পড়িয়াছে এবং সে-বিবাহ অন্যতর ব্যক্তির সঙ্গে, সেইখানেই একটা যুক্তিও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে, একেবারে শেষ স্তরে কথোপকথন বা আত্মব্যাখ্যার ভিতর দিয়া এই যুক্তির প্রয়োজন হইবে কেন? যুক্তির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ঘটনা-বিন্যাস এবং ঘটনার পারম্পর্যই সেই যুক্তি নিজ হইতে বহন করিবে এবং তাহার

অনিবার্য পরিণতি পাঠকচিত্তে সঞ্চার করিবে। পূর্বোক্ত জীবন-দর্শন যদি লেখকের কল্পমানসের অভিজ্ঞতার গভীরতম স্তরে সমগ্র ও সুসমঞ্জস রূপ গ্রহণ পূর্বাহ্লেই করিয়া থাকে তাহা হইলে ঘটনা-বিন্যাসের ভিতর দিয়াই বিবর্তিত হইবে; প্রয়োজন-চেতনার বশে শেষস্তরে তাহা আত্মব্যাখ্যাশ্রয়ী যুক্তির সাহায্যে বুঝাইতে হইবে কেন? পাঠকচিত্তই বা তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিবে কেন? বস্তুত শচীশকে যে দামিনী প্রতিদিনের জীবনসঙ্গী রূপে পাইতে পারে না, শচীশ যে অন্য স্তরের লোক, এ পর্যন্ত ঘটনাবিন্যাস ও যুক্তিপারম্পর্য পরিষ্কার; দামিনীর প্রতি শ্রীবিলাসের হৃদয়াকর্ষণও পরিষ্কার; কিন্তু দামিনী যে শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসকে বিবাহ করিবে শচীশের দেওয়া প্রেমের ঐশ্বর্য ও যৌতুক লইয়া, ঘটনাবিন্যাস ও যুক্তিপারম্পর্যের ভিতর দিয়া তাহার জন্য পাঠকচিত্তের প্রস্তুতি কোথায়, প্রসঙ্গগত যুক্তি কোথায়? যুক্তি যাহা আছে তাহা আত্ম-ব্যাখ্যাগত, তাহা প্রয়োজনগত; প্রয়োজনটা আসিয়াছে আগে পরে যুক্তি দিয়া তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; অবশ্য যে ভাবে তাহা করা হইয়াছে তাহাতে কাব্যময় পরিবেশ রচনার কোনও ত্রুটি নাই। সেই জন্যই আমার মনে হয়, "চতুরঙ্গে" বা "শেষের কবিতা"য় যে-জীবন-দর্শন রবীন্দ্র-কল্পমানসের সৃষ্টি সেই জীবন-দর্শন গভীরতম অভিজ্ঞতাসঞ্জাত নয়; সেই জীবন-দর্শন প্রয়োজন-চেতনা দ্বারা মধ্যপথে কোথাও খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, সমগ্র সুসমঞ্জস রূপের স্পর্শ তাহাতে লাগে নাই।

"ঘরে-বাইরে" উপন্যাসটি ১৩২২ সালের বৈশাখ হইতে ফাল্গুনের "সবুজপত্রে" প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে "বলাকা"র কবিতা রচনা কিছু কিছু চলিতেছে; গদ্যে প্রবন্ধ, আলোচনা ইত্যাদিও প্রচুর লিখিতেছেন।

উপন্যাসটি শেষ হইবার পরে ত কথাই নাই, মাসিক কিস্তিতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাকে লইয়া প্রচুর বাদবিতণ্ডা আরম্ভ হইয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। এই বাদবিতণ্ডার অনেক কথাই সাহিত্যালোচনায় অবান্তর; তবে ইহাকে উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ লইয়া যে দু'একটি কথা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধার করা যাইতে পারে। উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য লইয়া কথা উঠিয়াছিল; উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, হরিণের গায়ে যে দাগ আছে লোকের ধারণা সেই দাগচিহ্নের দ্বারা আলোছায়ার সঙ্গে সে বেমালুম মিশিয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হরিণ হয়ত কিছু জানে না। লেখক সম্বন্ধেও তাহাই। তবে,

> "যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়ত আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। * * * লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করেছে। * * * আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যেসব রেখাপাত করেছে, ঘরে-বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়ছে। কিন্তু এই ছাপের কাজ শিল্পকাজ। ভিতর থেকে যদি কোন সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়। * * * ঘরে-বাইরে গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে লেখকের ভালো-মন্দ লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই রঙিন সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের। * * *" "সবুজপত্র", অগ্রহায়ণ, ১৩২২, ৫২০—২২ পৃঃ।

"ঘরে-বাইরে" গ্রন্থের সামাজিক পটভূমি লক্ষণীয়। "গোরা" আলোচনাতেই আমি ইঙ্গিত করিয়াছি, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বাংলাদেশে যে-দেশাত্মবোধ মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে-আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার তলদেশে মস্ত একটা ফাঁকি

ছিল। উত্তেজনায় যখন ভাঁটা পড়িল তখন সেই ফাঁকির দিকটা ধরা পড়িয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের চোখে শুধু যে তাহা বিসদৃশ হইয়া দেখা দিল তাহাই নয়, তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদও করিলেন। দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে ক্রমশ তাঁহার নিজের চিন্তাধারায়ও একটা আমূল পরিবর্তন দেখা দিল ;(দেশধর্ম ও মানবিকধর্মে যে-বিরোধ একদিন দেখা দিল সে বিরোধে রবীন্দ্র-চিত্তে মানবতার ধর্মই হইল জয়ী ; দেশধর্মের নামে কোনও সংকীর্ণতা, কোনও ক্ষুদ্র চিন্তা, নীচ কর্ম, কোনও মিথ্যাকেই তিনি আমল দিতে রাজী হইলেন না। দেশধর্মকে তিনি মানবিক ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলেন না। এই মানবিক ধর্মে পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।)

(বিংশ শতকের প্রথম পাদে কলিকাতায় এবং বাংলার অন্যান্য শহরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষমতাসম্পন্ন এক উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই শ্রেণীর সামাজিক আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল পরিপূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দেশোত্তর মানবিক ধর্মকে অবলম্বন করিয়া।) এই সামাজিক আদর্শ কতখানি শ্রেণীস্বার্থ-প্রণোদিত, কতখানি নয়, সে প্রশ্ন উপন্যাসালোচনায় অবান্তর। (এখানে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই আদর্শ ও সংকীর্ণ দেশাত্মবোধের সংকীর্ণতর প্রকাশের মধ্যে যে-বিরোধ বাংলা দেশের নগর-জীবনে একদিন দেখা দিয়াছিল এবং সেই বিরোধ উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর নরনারীর দৈনন্দিন ব্যক্তি-জীবনে যে আবর্ত ঘনাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাই "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসের উপজীব্য।

সন্দীপকে স্বদেশী আন্দোলনের মুখ্য প্রতিনিধিদের অন্যতম বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে, কিংবা এই আন্দোলনের যে-দিকটা উপন্যাসে চিত্রিত হইয়াছে সেই দিকটাকেই যদি আন্দোলনের সমগ্র প্রতিকৃতি বলিয়া ধারণা করা যায় তাহা হইলেও অন্যায় করা হইবে। সমস্ত বৃহৎ আন্দোলনেই যেমন, স্বদেশী আন্দোলনও তেমনই সন্দীপের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, বাক্‌সর্বস্ব অথচ স্থূল স্বার্থলোলুপ, মাংসল-স্বভাবসম্পন্ন কতকগুলি লোককে সাধারণ জীবনের গোপনতা হইতে টানিয়া বাহির করিয়া জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার একটা সুযোগ দিয়াছিল ; এবং সেই সুযোগ অবলম্বন করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহারা চরিতার্থও করিয়াছিল। তেমনি নিখিলেশকেও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সামাজিক আদর্শের কথা আগে বলিয়াছি সে-আদর্শ অনেকটা যে শ্রেণীস্বার্থ-প্রণোদিত একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু নিখিলেশের অবচেতন চিত্তেও সেই স্বার্থবোধ নাই। তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ উৎকট; এবং এই স্বাতন্ত্র্যবোধের আদর্শ বৃহত্তর মানবিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ জীবনে মূর্ত করিবার জন্য সে নিজের স্ত্রী বিমলাকে লইয়া পরীক্ষা করিতেও দ্বিধা করে নাই, এবং তাহার জন্য যে দুঃখ ভোগ করিবার তাহাও করিয়াছে। উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবনে এই সুকঠিন আদর্শনিষ্ঠা সচরাচর দেখা যায় না। নিখিলেশ একান্তই আদর্শবাদী।) এমন নিছক আদর্শবাদী, এমন ছায়ামূর্তি যে, তাহার জীবন-দর্শন ও ব্যবহার সাংসারিক বাস্তবতার সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রায় যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে! তাহা সত্ত্বেও সে যে পাণ্ডুর ও বর্ণহীন হইয়া পড়ে নাই সে শুধু তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য ; বিমলার জন্য যে-দুঃখ তাহাকে পীড়িত করিয়াছে, যে-দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহার পরিচয়ই তাহাকে এই পরিণাম হইতে রক্ষা করিয়াছে। আর, বিমলা যে উচ্চ সম্পন্ন ঘরের বংশ ও আভিজাত্য-গৌরবসম্পন্না কুলবধূ, সেই গৌরবই তাহাকে

মহতী বিনষ্টি হইতে বাঁচাইয়াছে; স্বামীর আদর্শবাদ কিংবা স্বামীর প্রতি প্রেমের গভীর উপলব্ধি তাহাকে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত করিতে কিছু সাহায্য করিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। একথা বিমলা-চরিত্রের আলোচনায় স্পষ্টতর হইবে।

কিন্তু, "ঘরে-বাইরে"র চরিত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। লেখক এই গ্রন্থে গল্প বলিবার যে বিশেষ ভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে চরিত্রগুলি নিজেরাই নিজেদের বিশ্লেষণ পরিপূর্ণ ভাবে করিয়া গিয়াছে। এমন কি, বিমলার সঙ্গে সম্বন্ধে তাহার আদর্শবাদের মধ্যে ফাঁকটা যে কোথায় তাহাও নিখিলেশ নিজেই শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছে।

> "আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অসত্যাচার ছিলো। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁৎ করে ঢালাই করবো আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা ত ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে ক'রে গ'ড়ে তুলতে গেলেই মরে-গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়। এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাৎ হয়ে গেছি তা জানতেই পারিনি। বিমল নিজে যা হতে পারতো তা আমার চাপে ফুটে উঠতে পারেনি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ ক্ষইয়ে ফেলচে।"

চন্দ্রনাথ বাবুর মতন নিখিলেশও একটা মতামত ও আদর্শে বিশ্বাসী, এবং সে আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়ই তাহার জীবন ও ব্যবহার নিয়মিত। নির্জনে বসিয়া সে যখন আত্মানুসন্ধান করিয়াছে তখন সে প্রাণাবেগ-চাঞ্চল্যে মাঝে মাঝে স্পন্দিত ও কম্পিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কর্ম ও ব্যবহারে সেই প্রাণাবেগের স্পর্শ কোথাও লাগে নাই, সে-চাঞ্চল্যে কোথাও আদর্শ হইতে সে এতটুকু বিচ্যুত হয় নাই। বিমলাকে লইয়া যখন এতবড় সংগ্রাম চলিতেছে তখনও এক দিন একমুহূর্তের জন্যও তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা সে করে নাই, সে যেন একজন নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র, এবং দর্শকের যে আবেগ-চঞ্চলতা মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়, তাহাও তাহার মধ্যে যেন কোথাও নাই। মোহর চুরির ফাঁকি ধরা পড়িবার পর, এক কথায় মোহমুক্তির পর যখন বিমলার সঙ্গে তাহার পুনর্মিলন হইল তখনও নিখিলেশ যেন অনেকটা নির্লিপ্ত, শীর্ণ ও জীবনহীন। এই নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ততা নিখিলেশকে জীবনধর্মে দীন করিয়া চিত্রিত করিয়াছে।

চন্দ্রনাথবাবু সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। উপন্যাসগত চরিত্র হিসাব তাঁহার একমাত্র সার্থকতা নিখিলেশকে স্পষ্টতর করা, নিখিলেশের চরিত্রের একটা অবলম্বন দান করা। তিনিও নিখিলেশের মতনই আদর্শবাদী, নিখিলেশের আদর্শবাদকে তিনিই স্পষ্টতর রূপ দিয়াছেন। যেখানে নিখিলেশ নিজে নিজের কথা বলিতে বা বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই, সেইখানেই প্রয়োজন হইয়াছে চন্দ্রনাথবাবুর।

"ঘরে-বাইরে"-গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ চরিত্র হইতেছে সন্দীপ ও বিমলা। সন্দীপের চরিত্র যদি বা আপাতদৃষ্টিতে তাহার মতবাদ দ্বারা কতকটা ক্লিষ্ট, বিমলার ক্ষেত্রে তাহাও নয়। জীবনধর্মের পূর্ণ বিকাশ বিমলার চরিত্রেই দেখা যায়। সন্দীপের শক্তি আছে এবং সে-শক্তি ব্যবহার করিবার সমস্ত কৌশল তাহার করায়ত্ত, কিন্তু তাহার চরিত্র বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। বিমলাকে যে সন্দীপ আকর্ষণ করিয়াছে তাহার ক্রমবিকাশ অতি সুনিপুণ; প্রথম সে তাহাকে দেশসেবার সহযোগিতায় অসংকোচ অথচ সসম্মান আহ্বান জানাইয়াছে, ক্রমশ সে সেই আহ্বানের সুর চড়াইয়াছে, তাহাতে রং লাগাইয়াছে, এবং স্তরে স্তরে শেষ পর্যন্ত প্রণয় নিবেদনে গিয়া পৌঁছিয়াছে। তারপর ধীরে ধীরে সন্দীপের

মুখোশ খুলিতে আরম্ভ করিল, ধীরে ধীরে তাহার অর্থলোলুপতা, স্থূল মাংসলতা ধরা পড়িয়া গেল, এবং শেষ পর্যন্ত অমূল্যকে উপলক্ষ্য করিয়া ঈর্ষার ছিদ্রপথ দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা বিমলার কাছে ধরা পড়িয়া গেল। তখন সর্বপ্রথম জীবনে খটকা লাগিল, কোথায় যেন একটা খোঁচা বিঁধিল, এবং ক্রমশ পরাভবের সংশয় তাহার মনকে স্পর্শ করিল। বিমলার চোখেও তাহা ধরা পড়িতে দেরি হইল না। সন্দীপের শেষ প্রস্থানের আগেই আমরা দেখিলাম তাহার আত্মবিশ্বাসের গর্ব, শক্তির দর্প অনেকটা শিথিল, অনেকটা ম্লান, অনেকটা সংকুচিত। শেষ পর্যন্ত একথা সে জানিয়া গিয়াছে যে, তাহার মতন শক্তিমানের কাছে দুর্লভ এমন বস্তুর অস্তিত্বও প্রতিদিনের মানব সংসারে আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই ভাবিয়া লেখকের শিল্পনৈপুণ্যে আশ্চর্য হইতে হয় যে, শেষ পর্যন্ত তিনি সন্দীপকে মোটামুটি অপরিবর্তিতই রাখিয়াছেন, তাহার গর্বিত আত্মপ্রত্যয়কে একেবারে মাটির ধুলায় লুটাইয়া দেন নাই, এতটুকু অনুতাপের স্পর্শ তাহার চিত্তে লাগিতে দেন নাই। সন্দীপ-চরিত্রের অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে। 'সে আইডিয়ার যাদুকর'। তাহার যুক্তি ও বাক্যজালকে সে এমনভাবে সাজাইয়াছে যে, সেই বাক্যচ্ছটার মোহ তাহার চরিত্রকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। নিখিলেশের সঙ্গে তর্কে প্রাণাবেগের স্পর্শ যে কোথাও নাই, তাহা যে শুধু বাক্যমাত্র তাহা ত সুস্পষ্ট, বিমলার সহিত কথাবার্তা ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধেও কোথাও তাহার হৃদয়ের স্পর্শ লাগে নাই। বিমলাকে যদি সে গভীরভাবে ভালবাসিতে পারিত, এবং তাহার অর্থলিপ্সা যদি এতটা উৎকট না হইত তাহা হইলে এই উপন্যাসে ঘটনাচক্র কোনপথে আবর্তিত হইত, বলা যায় না।

আমি আগেই বলিয়াছি, এই উপন্যাসে বিমলাই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত। সে যে পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে দাম্পত্য রাজ্যে স্বামীই একমাত্র পুরুষ। নিখিলেশ তাহাকে যে স্বাধীনতার মুক্ত অঙ্গনে পাইতে চাহিয়াছিল তাহার কোনও প্রয়োজনীয়তা বিমলার ছিল না, স্বামীর সেই আদর্শ সে বুঝিতে পারিয়াছিল কিনা তাহাতেও সন্দেহ করা চলে। আসল কথা, স্বামীর যে অজস্র ভালবাসা সে পাইয়াছিল তাহার জন্য তাহাকে কোনও মূল্য দিতে হয় নাই। কিন্তু নিখিলেশের বাড়ির খোলা দরজা দিয়া স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ যখন অন্দর মহলে আসিয়া পৌঁছিল তখন সেই ঢেউএ বিমলা একেবারে ঘরের বাহিরে সন্দীপের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইল। আন্দোলনের প্রাণাবেগে সন্দীপকে সে সন্দীপ হিসাবে দেখিল না, সন্দীপ তখন তাহার কাছে দেশমাতার শৃঙ্খলমোচনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উৎসর্গীকৃত-জীবন শক্তিমান সেবক। সেই সেবকের কাছে কি করিয়া ধীরে ধীরে সে নিজেকে ধরা দিল, কি করিয়া সে নিজের স্বামীকে সন্দীপের সঙ্গে তুলনায় দুর্বল মনে করিল, কি করিয়া সন্দীপের প্রতি মোহ-বিহ্বলতায় ধীরে ধীরে নিখিলেশ হইতে দূরে সরিয়া গেল, এবং অবশেষে সন্দীপের কামনার মধ্যে ধরা দিতে উদ্যত হইল এ সমস্তই ত স্তরে স্তরে গল্পের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর সন্দীপের জীবনে দেখা দিল দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা, নিখিলেশের দৃঢ় আদর্শবাদ ভিতরে ভিতরে তাহাকেই করিল দুর্বল। তাহার উপর টাকার ব্যাপার লইয়া সন্দীপ-চিত্তের যে কদর্য লোভ ও অসংযম উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল তাহাতেই বিমলার মোহ প্রায় ঘুচিবার উপক্রম হইল, এবং সর্বশেষ স্তরে সন্দীপ যখন তাহাকে আলিঙ্গনের মধ্যে টানিতে চাহিল তখন সুতীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। এইভাবে সন্দীপের নগ্ন নির্লজ্জতা এবং স্থূল ভোগলিপ্সা যখন ধরা পড়িয়া গেল তখন বিমলার একমাত্র চেষ্টা হইল সন্দীপের মোহকবল হইতে মুক্তি, এবং

তখনই প্রয়োজন হইল অমূল্যর। এই অমূল্যকে আশ্রয় করিয়া যে কল্যাণস্নেহ তাহার হৃদয়ে উৎসারিত হইল, সেই স্নেহ ও সহজ সংস্কারই বিমলাকে শেষ পর্যন্ত বিনষ্টির হাত হইতে বাঁচাইল। এই মোহমুক্তির পথে বিমলার কণ্ঠে বারবার যে আত্মগ্লানি ও দুঃখের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এই দুঃখ ও অনুতাপ নিখিলেশের প্রেম হইতে বিচ্যুতির জন্য ততটা নয় যতটা মোহর চুরির কলঙ্কের জন্য, যতটা একান্ত স্নেহভাজন অমূল্যকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিবার জন্য। নিখিলেশের প্রেমের আদর্শ যে সে বুঝিয়াছে, এবং বুঝিয়া সে তাহার নিজের কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন কোনও প্রমাণ গল্পে নাই। বিমলা অবশ্য বুঝিয়াছে, সে নিখিলেশের হাত হইতে প্রেম কেবলই লইয়াছে, কিছুই সে দেয় নাই, এবং সেই হেতু তাহার প্রেম দুর্বল। নিখিলেশও বুঝিয়াছে তাহার প্রেমের আদর্শের মধ্যে কোথাও একটা অত্যাচার ও জবরদস্তি ছিল। কিন্তু, তবুও বাহিরের জীবনে যে-পরীক্ষা তাহাদের হইয়া গেল তাহার ফলে, তাহারা যে নিজেদের আরও একান্ত ও নিবিড় করিয়া পাইল সে-ইঙ্গিত গল্পের কোথাও নাই। বিমলার পক্ষে ত কেবলই মনে হয়, বংশ ও পরিবারোচিত গৌরবের মধ্যে আত্মসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি বজায় রাখা এবং সকলের সন্দেহদৃষ্টি, বিশেষভাবে মেজরানীর ইঙ্গিতোক্তি হইতে নিজেকে বাঁচান, এবং সর্বোপরি অমূল্যর প্রতি স্নেহ, ইহারাই যেন বিমলাকে নিজের কেন্দ্রে ফিরাইয়া আনিল। আহত মুমূর্ষু অবস্থায় নিখিলেশ যখন ফিরিয়া আসিল তখনও বিমলার মানসিক উদ্বেগাকুলতার কোন আভাসও যে আমরা পাই না, তাহাতে এই সংশয় আরও যেন দৃঢ় হয়।

কিন্তু স্বল্পায়তনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব ও অভিনব চরিত্র মেজরানীর। প্রথম স্তরে মেজরানী ঈর্ষান্বিতা নারী, স্বামীসৌভাগ্যান্বিতা বিমলার প্রতি এই ঈর্ষা সহজবোধ্য, বিশেষত যখন স্মরণ করা যায় নিখিলেশের পারিবারিক ঐতিহ্য ও পরিবেশ। এই ঈর্ষা তাহাকে দিয়াছে একটা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সেই দৃষ্টি ও নারীর সহজাত সংস্কারের বলে বিমলার সাজসজ্জা, হাবভাব, ছলাকলা সব কিছুর অর্থ ও উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা তাহার পক্ষে এতটুকু কঠিন হয় নাই। তাহা ছাড়া নিখিলেশের প্রতি তাহার যে স্নেহ সেই স্নেহের সঙ্গে একটু দেহ-লালসার খাদও যে মেশান ছিল তাহাও অস্বীকার করা চলে না। দ্বিতীয় স্তরে, বিমলাকে লইয়া যখন সন্দীপ-নিখিলেশের সংগ্রাম চলিতেছে তখন বিমলার প্রতি মেজরানীর ঈর্ষা বিবর্তিত হইয়াছে দেবরের প্রতি প্রীতিপূর্ণ শঙ্কায় ও সহানুভূতিতে, দেহলালসা বিবর্তিত হইয়াছে সস্নেহ যত্ন, সেবা ও আশ্রয় রচনায়। যে মধুর স্নেহ ও বন্ধুত্ব বাল্যে অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হইয়াছে, যৌবনে তাহাতে ঈর্ষা ও লালসার কিছুটা স্পর্শ হয়ত লাগিয়াছিল, কিন্তু বিমলার প্রেমচ্যুতি ও পদস্খলনের সম্ভাবনামাত্রই সেই ঈর্ষা লালসা দূর হইয়া গিয়া বাল্যের স্নেহ ও বন্ধুত্ব আবার মুক্তি লাভ করিল, এবং মেজরানী নিখিলেশের জীবনের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা দুঃখজ্বালার সঙ্গিনী হইয়া একটি স্নিগ্ধ কোমল আশ্রয়ের মধ্যে তাহাকে ঘিরিয়া রাখিলেন।

"ঘরে-বাইরে"-সম্বন্ধে একটি আপত্তির কথা বলিতেই হয়। এ-আপত্তি সাহিত্যবিচারের অন্তর্গত, যদিও আপাতদৃষ্টিতে আপত্তিটির বিষয়বস্তু সামাজিক সমস্যাগত। এই সমস্যা উত্থাপন করিয়াছেন লেখক স্বয়ং।

নিখিলেশের মুখ দিয়া লেখক স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের একটা আদর্শ গড়িয়া তুলিয়াছেন। সে বিমলাকে পাইতে চাহিয়াছিল, আগেই বলিয়াছি, স্বাধীনতার মুক্ত অঙ্গনে, আমাদের

সংসার স্ত্রীর উপর যে সহজ অধিকার স্বামীর হাতে তুলিয়া দেয় সে-অধিকারে নয়। বাহিরের জীবনের স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়া সে স্ত্রীর প্রেম অর্জন করিবে এই ছিল তাহার সুদৃঢ় পণ। এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াই লেখক বিমলাকে বাহিরের জীবনের স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু যে-সন্দীপ এই সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পুরুষ সে কি নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী? স্বদেশী আন্দোলন ত অনেক পুরুষকেই ব্যক্তিজীবনের শান্তিক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃহত্তর জীবনের মধ্যে মুক্তি দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবন-দর্শন ও কার্যকারণের যুক্তি ত সন্দীপের মতনই ছিল, কিন্তু সকলেই কিছু সন্দীপের মতন অর্থলোলুপ ও স্থূল ভোগলিপ্সু ছিল না। যে-ভাবে লেখক ঘটনার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের মধ্যে যে-কেহ একজন ত একই উপায়ে বিমলার সম্মুখীন হইতে পারিত, এবং স্থূল মাংসলতার পরিচয় না দিয়া বিমলাকে গভীরভাবে ভালবাসিতেও পারিত। তখন সমস্যা কোন দিকে গড়াইত তাহা কে বলিতে পারে? সন্দীপের বেশ যদি ছদ্মবেশ না হইত, তাহার নগ্ন অর্থ ও ভোগলিপ্সা যদি এমন উৎকট ভাবে ধরা না পড়িত, তাহা হইলে বিমলা কি করিত তাহা কে জানে? বিমলার সঙ্গে সম্বন্ধে সন্দীপের কোনও হৃদয়ের উত্তাপ ত লাগে নাই, সে বিমলাকে চাহিয়াছিল তাঁহার কামনার মধ্যে; যদি সে গভীরভাবে ভালবাসিতে পারিত তাহা হইলে ঘটনাচক্র অন্য পথে আবর্তিত হইত না তাহা কে বলিতে পারে? কাজেই, যে-সমস্যা লেখক উত্থাপন করিয়াছেন তাহার যোগ্যক্ষেত্র তিনি রচনা করেন নাই বলিয়া যেন মনে হয়; আদর্শ পরীক্ষার ক্ষেত্র ঠিক যেন সমস্যানুযায়ী হয় নাই। তাহা ছাড়া যে-ভাবে বিমলাকে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া ফিরাইয়া লইয়াছেন, তাহাতেও যে নিখিলেশের প্রেমের আদর্শ জয়যুক্ত হইয়াছে তাহা মনে হয় না, এবং সে-ইঙ্গিত আগেই আমি করিয়াছি। আসল কথা, এই আদর্শকে যে-মানদণ্ডে বিচার করা হইয়াছে তাহা খুব নিরপেক্ষ নয়, সন্দীপকে নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া গড়া হয় নাই। তাহাকে যদি এতটা সংকীর্ণ এতটা নীচভাবাপন্ন বলিয়া চিত্রিত করা না হইত, তাহা হইলে এই পরীক্ষার ভিতর হইতে কে কি-ভাবে বাহির হইত, সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন পাঠকের মনে থাকিয়াই যায়।

"ঘরে-বাইরে"-গ্রন্থেই লেখক উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম চলিত ভাষা ব্যবহার করিলেন, বোধ হয় "সবুজপত্রে"র প্রভাবে। তাহার ফল যে ভাল হইয়াছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। গল্পবস্তুর গতিবেগ তাহাতে বাড়িয়াছে এবং বিষয়বস্তুকে তাহা সমৃদ্ধও করিয়াছে। ঘটনা-সংস্থানের নাটকীয়ত্বও বোধ হয় তাহাতে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া এপিগ্রামদীপ্ত সুতীক্ষ্ণ শাণিত বাক্য ভঙ্গিমায় বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ যে ভাবে দীপ্তিলাভ করিয়াছে তাহাও লক্ষণীয়। যে উন্মত্ত ভাবাবেগ স্বদেশী আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য সে ভাবাবেগ চরিত্রগুলির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া বিচিত্র ঘটনাকে একটা খুব সচল গতি দান করিয়াছে; অন্যদিকে, ঘটনাস্রোতও এত দ্রুত যে চরিত্রগুলিও যেন সেই স্রোতের মুখে অনিবার্য বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। বুদ্ধির দীপ্তিতে "ঘরে বাইরে"ও মহিমান্বিত, কিন্তু এই উপন্যাসের চরিত্র অথবা ঘটনা বিশ্লেষণ "চতুরঙ্গ" অথবা উত্তরকালের "শেষের কবিতা"র মতন এত ভাবগভীর নয়, ইহাদের কবিকল্পনার ঐশ্বর্যও "ঘরে বাইরে" গ্রন্থে তেমন নাই, যদিও নিখিলেশ ও বিমলার ভাষণ মাঝে মাঝে কল্পনার উচ্চ স্তর স্পর্শ করিয়াছে।

সাত

যোগাযোগ (১৩৩৪-৩৫)

শেষের কবিতা (১৩৩৫)

"ঘরে বাইরে" রচনার প্রায় বার বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ আবার উপন্যাস লিখিলেন। এই উপন্যাসের প্রথম নামকরণ হইয়াছিল "তিনপুরুষ"। এই নামে "বিচিত্রা" মাসিকপত্রে আশ্বিন ও কার্তিক এই দুইমাস বাহির হইবার পর কবি পুরাতন নাম বদল করিয়া ইহার নূতন নামকরণ করেন "যোগাযোগ"। এই নূতন নামকরণ উপলক্ষে লেখক একটি সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। এই কৈফিয়তের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন হইল। কবি বলিলেন, সাহিত্যসৃষ্টিতে

"* * * আখ্যান বস্তু, রচনারীতি, চরিত্রচিত্র, ভাষা, ছন্দ, ব্যঞ্জনা, নাট্যরস সবটা মিলিয়ে একটি সমগ্র বস্তু। একেই বলা চলে ব্যক্তিরূপ। বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদ পাই, ব্যক্তির কাছ থেকে তার আত্মপ্রকাশজনিত রস পাই। বিষয়কে বিশেষণের দ্বারা মনে বাঁধি, ব্যক্তিকে সম্বোধনের দ্বারা মনে রাখি। * * * রসশাস্ত্রে মূর্তিটি মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটিও বিষয়ের চেয়ে বড়ো। এই জন্যে বিষয়টাকে শিরোধার্য ক'রে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায়না। * * * গল্প জিনিসটাও রূপ, ইংরেজীতে যাকে বলে 'ক্রিয়েশন'; আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা; অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। 'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামে দোষ নেই'।* কেননা ও নামে গল্পের কোন ব্যাখ্যাই করা হয়নি" * * * কর্তা বলেন, তিন-পুরুষের তিন তোরণওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে এই আমার একটি খেয়াল মাত্র ছিল। এই চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যেই। সুতরাং এই নামটা ত্যাগ করলে আমার গল্পের কোন স্বত্বের দলিল কাঁচবে না। * * * আর একটি নাম ঠাউরেছি। সেটা এতই নির্বিশেষ যে গল্প মাত্রেই নির্বিচারে খাটতে পারে * * * ("বিচিত্রা" অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, ৭৮৯-৯১ পৃঃ)।

সাধারণভাবে এই যুক্তিকে স্বীকার করিতে আমার কোনও আপত্তি নাই, নাম নাম মাত্রই, তাহার সঙ্গে বিষয়বস্তুর যোগ থাকিতেই হইবে, এমন কোনও যুক্তি নাই, বরং না থাকাটাই সুবিধাজনক। সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাবাহী নাম বন্ধনেরই নামান্তর। কিন্তু "তিন পুরুষ" নামটি যখন "যোগাযোগ" উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করা যায়, তখন মনে হয় গল্পবস্তুটির রূপ ও প্রসার সম্বন্ধে গোড়ায় লেখকের মনে যে ধ্যান ছিল সেই ধ্যানের সঙ্গে "তিন পুরুষ" নামের একটা সার্থক যোগ ছিল। কিন্তু সেই ধ্যান "যোগাযোগে" পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই, গল্পবস্তুর রূপ ও প্রসার সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা সূচনায় ছিল তাহার সম্পূর্ণ অংশ "যোগাযোগে" উদ্ঘাটিত হয় নাই। যে অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বৎসরের জন্মদিন লইয়া গল্পের সূচনা সেই গল্প কিছু হটিয়া যাত্রারম্ভ করিয়াছে অবিনাশের পিতামহ আনন্দ ঘোষালের মুহুরিগিরি হইতে, অর্থাৎ মোটামুটি উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদ হইতে। আনন্দ ঘোষালের জীবনেতিহাস প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ আনন্দ ঘোষালের পুত্র মধুসূদন, তৃতীয় পুরুষ অবিনাশ ঘোষাল। এই তিনের প্রথম পুরুষের সংক্ষেপে এবং দ্বিতীয় পুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান ও পরিবেশ সবিস্তারে "যোগাযোগে" বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় পুরুষে অবিনাশ ঘোষালের জন্মের আভাসের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। কেন জানি মনে হয়, এই তিন পুরুষ ধরিয়া বাঙালী

---

* তাহা হইলে "চোখের বালি" "ঘরে বাইরে" সম্বন্ধে কি বলা যাইবে? "তিন-পুরুষ" নামান্তরের হেতু প্রভাতবাবু নির্দেশ করিয়াছেন অন্যরূপ। তিনি বলেন, কবি শুনিয়াছিলেন, ঐ নামে অন্য একখানি উপন্যাস বাংলা ভাষায় ছিল, সেই জন্যই নাম বদলান প্রয়োজন হইয়াছিল। "রবীন্দ্র-জীবনী" ২য় খণ্ড, ৩৪৩ পৃঃ।

সমাজের পারিবারিক জীবনে যে বিবর্তন হইয়াছিল, গ্রন্থ-পরিকল্পনার সূচনায় এই বিবর্তনের ইতিহাস লেখকের মনের পশ্চাতে ছিল; এই প্রসারিত পটভূমির উপরই তিনি "তিন পুরুষে"র বিচিত্র চরিত্রগুলির জীবন-লীলা ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, "যোগাযোগে" তাহা এত সমগ্রতায় উদ্ঘাটিত হয় নাই। মধুসূদন ও কুমুদিনীর বাল্য ও কিশোর জীবনের পরিবেশ, এবং তাদের যৌবনের দাম্পত্য জীবনের সূক্ষ্ম ও স্থূল লীলাই উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য।

এই অধ্যায়েরই অন্যত্র রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি, "তিন পুরুষে"র মূল মনন-কল্পনার মধ্যে মহৎ উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল; সেই মনন-কল্পনা ভিন্নমুখী না হইলে হয়ত "গোরা"র মত আর একটি উপন্যাস সৃষ্টি আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। কিন্তু "যোগাযোগে" বিবর্তিত হইয়া "তিনপুরুষে"র সে সম্ভাবনা ঘুচিয়া গেল। বস্তুত, "গোরা"-পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের সকল উপন্যাসই 'নভেল-ধর্মী', তাহাদের খাঁটি উপন্যাস বলা একটু কঠিন; একমাত্র "যোগাযোগে"ই তবু উপন্যাসের ধর্ম খানিকটা বজায় আছে।

পূর্বোক্ত কারণেই কিনা জানিনা, তবে ইহা অনস্বীকার্য যে উপন্যাসটির আরম্ভ ও শেষ একান্তই আকস্মিক; গ্রন্থ যখন আরম্ভ তখন অবিনাশ ঘোষালের দ্বাত্রিংশৎ জন্মোৎসব, আর যখন শেষ হইল তখন পর্যন্ত অবিনাশ পৃথিবীর আলো দেখে নাই। গল্পবস্তুর গঠনও একটু শিথিল, গল্পের বিভিন্ন অংশ সুদৃঢ় সংহত নয়। মধুসূদনের বংশ ও জীবনের পূর্ব ইতিহাসের কতকটা বিস্তৃত পরিচয় নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কুমুদিনীর বাড়ির সুবিস্তৃত পরিচয় গল্পের ভূমিকার অনেকগুলি পাতা জুড়িয়া আছে; এতটা দীর্ঘায়ত পরিচয় কতকটা অপ্রাসঙ্গিক এবং গল্পবস্তুর আয়তনের তুলনায় অতি মাত্রায় প্রলম্বিত। মুকুন্দলাল ও তাহার স্ত্রীর ট্র্যাজিক্-সম্বন্ধ স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি গল্প; সেই গল্পটি এই দীর্ঘায়ত ভূমিকার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বিপ্রদাস ও কুমুদিনীর স্নেহপ্রীতিমধুর সম্বন্ধের বুনিয়াদটুকু এই ভূমিকার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাহা এইখানে এতটা বিস্তৃত না হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে সত্য পরিচয় কঠিন হইত না। তাহা ছাড়া, কুমুদিনী মধুসূদনের ঘর ছাড়িয়া পিতৃগৃহে চলিয়া আসিবার পর সুদীর্ঘ পৃষ্ঠা জুড়িয়া স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, স্ত্রীর অধিকার লইয়া যে তর্কজাল বিস্তৃত হইয়াছে তাহাও গল্পবস্তুর, দিক হইতে কতকটা অবান্তর। তৃতীয়ত, কুমুদিনী যখন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ফিরিয়া আসিল তখনও মধুসূদন শ্যামার স্থূল দেহমাংসের পঙ্কিলতার মধ্যে নিমজ্জিত। মধুসূদন কুমুদিনীকে ডাকিয়া আনিয়াছে যেহেতু সে গর্ভে ধারণ করিয়া আছে ভাবী বংশধর এবং কুমুদিনীকেও তাহা স্বীকার করিয়াই আসিতে হইয়াছে। কিন্তু সে যে-গৃহে আসিয়াছে সেখানে তাহার স্থান কি জননীরূপে, না শ্যামার পার্শ্বে মধুসূদনের অন্যতম ভোগ্যবস্তু রূপে? এ-প্রশ্নের কোন উত্তর গল্পে নাই। কুমুদিনীর কল্পনায় স্বামীপ্রেমের যে কোমল ও সুকুমার আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল সে-আদর্শ কুমুদিনী-মধুসূদনের পুনর্মিলনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এমন মনে হয় না। কারণ, ইহাদের দুইজনের মধ্যে বিরোধ মূল প্রকৃতিগত এবং সে-বিরোধ এত প্রবল ও তাহার মূল জীবনের এত গভীর স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত যে, বংশধরের সেতুতে সে-বিরোধের দুস্তর মরু বাঁধা পড়িয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। অবিনাশ ঘোষাল তাহার বত্রিশ বৎসরের জীবনে তাহা পারিয়াছিল কিনা, সে-সংবাদও গল্পে নাই; যদি সে না পারিয়া থাকে তাহা হইলে সে পিতা ও মাতার এই বিপরীত সম্বন্ধকে কি ভাবে দেখিয়াছিল, কোন্ পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে তাহার বত্রিশ বৎসরের জীবন কাটিয়াছিল? এসব প্রশ্ন পাঠকের মনে

থাকিয়াই যায়। এক একবার মনে হয় কুমুদিনীর স্বামীগৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যদি গল্পের সমাপ্তি হইত তাহা হইলে "যোগাযোগ" আরও দৃঢ় ও সংহত হইত। কিন্তু লেখকের মনের পশ্চাতে যে তিন-পুরুষের ইঙ্গিত তখনও সচেতন।

কিন্তু লেখকের অপূর্ব কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে কুমুদিনী মধুসূদনের চরিত্র বিশ্লেষণে, ঘটনা-বিন্যাসে এবং তাহাদের দুই জনের অন্তর্বিপ্লবের বর্ণনায়। কুমুদিনী বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব হৃদয়ে লইয়া, নিজেকে স্বামীর হাতে অর্ঘ্যরূপে তুলিয়া দিবে বলিয়া। বিবাহপ্রস্তাবের সূচনামাত্রই সে ইহার মধ্যে অনুভব করিয়াছে দেবতার অদৃশ্য ইঙ্গিত, এবং তাহার পর কোনও সংশয়, কোনও সতর্কবাণীই তাহাকে আর বাধা দিতে পারে নাই। মধুসূদন বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক, ক্ষমতার আধিপত্যকেই সে শক্তির প্রকাশ বলিয়া জানে। সে কুমুদিনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে, তাহার অপমানিত বংশ গৌরবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে, কুমুদিনীর কথা ভাবিয়া এক মুহূর্তের জন্যও তাহার হৃদয়ে কোন রং লাগে নাই। এই মধুসূদনের পরিচয় কুমুদিনী যখন প্রথম পাইল তখন হইতেই শুরু হইল উভয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে পক্ষ দুইটি, কিন্তু আক্রমণটি সমস্তই করিয়াছে মধুসূদন তাহার নীচ, ইতর, প্রভুত্বকামী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া। আর কুমুদিনী সেই আক্রমণকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছে চরম সহিষ্ণুতায়, নিজের আদর্শের মধ্যে মধুসূদনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টায়। সে-চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়াছে তখন সহিষ্ণুতা রূপান্তরিত হইয়াছে ঘৃণায় ও গ্লানিতে, সে তখন মধুসূদনের প্রতি একান্তই বিমুখ, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সংস্কারে বাধে, তবুও সমস্ত দেহমন যেখানে বিমুখ ও বিদ্রোহী সেখানে মৌন অথচ দৃঢ় প্রত্যাখ্যান ছাড়া নিজেকে মুক্ত ও শুচি রাখিবার আর কি-ই বা উপায় আছে। এই বিপুল ও দীর্ঘায়ত সংগ্রামের বিচিত্র বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি, বিভিন্ন চরম মুহূর্তগুলি এমন সূক্ষ্ম, সম্পূর্ণ ও সুনিপুণভাবে বিশ্লেষিত ও রূপায়িত হইয়াছে যে, লেখকের সূক্ষ্ম কারুশিল্প-ক্ষমতার কথা ভাবিয়া অবাক হইতে হয়।

সংগ্রামের প্রথম স্তরে মধুসূদনের মূঢ়, রূঢ়, নির্মম ও ইতর ব্যবহার বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কুমুদিনীর আদর্শের বিসর্জন হইতে বিলম্ব হয় নাই, কিন্তু তাহা হইলেও প্রাণপণ শক্তিতে নীরবে সে সমস্তই সহ্য করিয়াছে। কুমুদিনীর এই একান্ত আত্মবিলুপ্তি, তাহার রূপ ও তাহার ভাব-গভীর হৃদয়ের সৌন্দর্য ধীরে ধীরে মধুসূদনকে একটু দুর্বল করিল, এবং এই দুর্বলতায় সে সর্বপ্রথম কুমুদিনীর কাছে কতকটা নতি স্বীকার করিল।

এই নতিস্বীকার যে নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিল তাহার ফলে গল্পের দ্বিতীয় স্তরের সূচনা। মধুসূদন যতদিন ছিল উৎপীড়ক ততদিন কুমুর পক্ষে সহজ ছিল তাহার প্রতি বিমুখ থাকা, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা, আজ যখন মধুসূদন মাথা নোয়াইল তখন কুমুদিনী সহজ সংস্কারে বশেই বুঝিল ইহা ঐকান্তিক দৈহিক কামনার তাড়নায়। কুমুদিনীর সমস্ত দেহমন ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের লোলুপ অনুনয়ে সে নিজেকে দান করিতে বাধ্য হইল একান্ত অনিচ্ছায়, ঘৃণায় ও অবহেলায়। এই অনিচ্ছার, অবহেলার দানে মধুসূদনের অতৃপ্তি বাড়িয়াই উঠিল, তাহার প্রভুত্বের গর্ব উদ্দীপ্ত হইল, এবং তাহার একমাত্র চেষ্টা হইল কুমুর হৃদয়কে না পাইলেও প্রভুত্বের জোরে কাড়িয়া কুমুর দেহকে পাওয়া।

একদিকে এই গায়ের জোরের টান, আর একদিকে নীরব প্রত্যাখ্যান যখন চলিতেছে তখন মধুসূদন একদিন নবীনের চক্রান্তে ধরা পড়িল। এইবার গল্পের তৃতীয় স্তর। মধুসূদন ভাবিতে শিখিল কুমু তাহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী, সে-ই আনিয়াছে তাহার বিপুল ঐশ্বর্য। বিষয়ী, লোভলিপ্সু মধুসূদন প্রভুত্বের সিংহাসন হইতে নামিয়া এইবার হইল কুমুর দাস। নতজানু হইয়া সে কুমুর প্রেমভিক্ষা করিল। সে তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য কুমুর পায়ে ঢালিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু কুমু আবার সহজ সংস্কার দিয়াই বুঝিল মধুসূদনের ইহা আর এক নূতনতর মোহ, তাহাকে কামনার মধ্যে পাইবার আর এক অভিনব কৌশল। কুমু এই নিবেদনের থালা হইতে কিছুই লইল না, অথবা যাহা লইল তাহা এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাতে আবার মধুসূদনের মোহচ্যুতি ঘটিল। সে এইবার এবং শেষবার বুঝিল, কুমুদিনী তাহার বজ্রমুষ্টির আয়তনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে ধরিবার ক্ষমতা আর তাহার নাই। কুমুর ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা তাহার ইতর প্রবৃত্তিকে আবার মুক্তি দিল।

গল্পের চতুর্থ স্তরে মধুসূদন তাহার দাসী শ্যামার স্থূল দেহলালসার মধ্যে নিজের নির্লজ্জ ও নিঃসংকোচ আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেখানে তাহার প্রভুত্ব প্রকাশের কোনও বাধা নাই, কামনার অবাধ চরিতার্থতায় কোন বাধা নাই, কোনও সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বলীলার অবকাশ নাই, কামনার বস্তুকে দাসীর চেয়ে বেশি সম্মান দিবার প্রয়োজন নাই, শ্যামা তাহা দাবিও করে নাই। তাহা ছাড়া কুমুদিনীর ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় তাহার প্রভুত্বের অহংকার যে-ভাবে অপমানিত হইয়াছে, শ্যামা তাহার সাগ্রহ আহ্বান ও সাদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে সেই অপমানক্ষত অনেকটা জুড়াইতে সাহায্য করিয়াছে। মধুসূদনের পক্ষে শ্যামা জলের মত সুলভ ও সহজ; কুমুদিনীকে বুঝা তাহার স্থূল বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির পক্ষে কঠিন।

যাহা হউক, এই শ্যামা-অধ্যায়ের পর গল্পের আর কোনও বিকাশ নাই। ইহার পরও গ্রন্থ আরও বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু গল্প বিস্তৃত হয় নাই। কুমুদিনী স্বামীর ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, শ্যামা পর্বের মধ্যে সে ফিরিয়া আসিয়াছে, একথা ত আগেই বলিয়াছি। শ্যামা-পর্বে শ্যামার আকর্ষণের স্বরূপ অপূর্ব দক্ষতায় বিশ্লেষিত হইয়াছে; মধুসূদন কি ভাবে কি দৃষ্টিতে তাহা গ্রহণ করিয়াছে তাহাও চরম নৈপুণ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কুমুদিনীকে লইয়া লেখক কি নির্মম পরীক্ষাটাই না করিয়াছেন! এমন কোমল, সুকুমার, মধুর, আত্মজিজ্ঞাসু ও ধ্যানবিমুগ্ধ কল্পলোকের লাবণ্যময়ী নারীকে তিনি মধুসূদনের হাতে তুলিয়া দিয়া কঠোর নিষ্ঠুর বাস্তব জীবনের চক্রে কি ভাবে নিষ্পেষিত করিয়াছেন, ভাবিলে দুঃখ হয় বই কি! কুমু কি human nature's daily food হইবার যোগ্য? অথচ মানবজীবন এইরূপই বিচিত্র, তাহার দাবি দাওয়া এইরকমই কঠোর ও নির্মম। প্রয়োজনের সংগ্রামে সে কাহাকেও রেহাই দেয় না! জানি উপন্যাসগত চরিত্রের যে ব্যক্তিত্বের দীপ্তি থাকা প্রয়োজন কুমুর চরিত্রে সে ব্যক্তিত্বের বিকাশ নাই, তবু কি কোমলতায়, কি কারুণ্যে, কি সুকুমার তুলিতে রবীন্দ্রনাথ কুমুর চিত্রটি আঁকিয়াছেন, কি পরম সহানুভূতিতে তাঁহার আত্মার সৌন্দর্যকে রূপায়িত রসায়িত করিয়াছেন, কি কাব্যসুষমায় তাহার চরিত্রটি মণ্ডিত করিয়াছেন, এবং সেই কুমুকেই তিনি কি না দুঃখের, কি না বেদনার মধ্যে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কি দুঃখ-বেদনাই না বহন করিয়াছেন, অথচ তাঁহার লেখনী এতটুকু বিচলিত হয় নাই! একথা যখন ভাবি, তখন সমস্ত বিচার যেন স্তব্ধ হইয়া যাইতে চায়। কুমুর সঙ্গে বিপ্রদাসের এমন একাত্মবোধ এমন কবিত্বময় ভাষায় এমন পরিবেশের মধ্যে সূক্ষ্ম নিপুণতায় প্রকাশ করা কি আর কোন উপায়েই

সম্ভব ছিল? কুমুর জীবনের একদিকে দাদা বিপ্রদাস; সূক্ষ্ম মমত্বে ও সহানুভূতিতে, প্রাণের গভীরতম স্পন্দনে, হৃদয়ের প্রতি তন্তুতে তন্তুতে, অন্তরের সকল আশা আকাঙ্ক্ষায় দুইটি ভাইবোন যেন একই আত্মার আধারে বিধৃত। আর একদিকে মধুসূদন, বিবাহের সংস্কারে কুমু তাহার গাঁটছড়ায় বাঁধা; অথচ কত বিপরীত তাহাদের চরিত্র! এই বৈপরীত্য তিনটি চরিত্রকেই বিকশিত করিতে সাহায্য করিয়াছে, কুমুদিনীকে স্ফুটতর স্পষ্টতর করিয়াছে। ইহার মধ্যে ভাব-গভীরতা ও অপূর্ব কবিকল্পনার পরিচয় ছাড়া শিল্পকৃতিত্বের পরিচয়ও সুস্পষ্ট।

ছোটখাট চরিত্রের মধ্যে শ্যামার কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মোতির মা ও নবীন দুইজনেই মধুসূদনের সংসারের আশ্রয়পুষ্ট, এবং সেই হিসাবে দুইজনই তাহাদের সামাজিক স্থান সম্বন্ধে সচেতন। অথচ সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতায় তাহারা তাহাদের প্রভুকেও অতিক্রম করিয়াছে। তাহাদের চোখের সম্মুখে যাহা ঘটিতেছে তাহার মর্ম মধুসূদন অপেক্ষাও তাহারা ভাল করিয়া বুঝিয়াছে, এবং সেই ভাবেই তাহাদের কর্তব্য ও জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। আর, নবীনের বুদ্ধি-কৌশলের ফাঁদে ত মধুসূদনও পা না দিয়া পারে নাই।

"যোগাযোগে"র বর্ণনাভঙ্গি হ্রস্ব ও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এই হ্রস্ব সংক্ষিপ্ততা "চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে-শেষের কবিতা"কে যে সচল প্রাণময় গতিবেগ দান করিয়াছে, epigramএর দীপ্তি থাকা সত্ত্বেও "যোগাযোগ" সেই গতিবেগ লাভ করে নাই। ইহার বিবৃতি দীপ্ত কিন্তু গতি মন্থর। তাহার একটা কারণ "যোগাযোগে"র সূক্ষ্ম কারুনৈপুণ্য। প্রসারিত প্রাচীরচিত্রে যদি তুলি ধরিয়া সূক্ষ্ম কারুকায করা যায় তাহাতে রেখার সবল দীর্ঘায়ত ভঙ্গি এবং চিত্রের সমৃদ্ধতা যেমন সহসা দৃষ্টিগোচর হয়না, সুনিপুণ কারুকলার উপরেই যেমন দৃষ্টির গতি মন্থর হইয়া যায়, "যোগাযোগে" ও ঠিক তাহাই হইয়াছে। চরিত্র ও ঘটনা উভয়েরই বিশ্লেষণ এই কারুনৈপুণ্যর পরিচয়।

গল্পের বাক্যভঙ্গি তীব্র শাণিত, বুদ্ধির দীপ্তি এবং epigramএর সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গময় ঔজ্জ্বল্যে ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি যেন রৌদ্রকিরণে ঝলকিত মৃদু উদ্বেলিত জলস্রোতের মতন দীপ্ত ও শাণিত। এপিগ্রামের বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানগর্ভ ভাষায় কুমুদিনী, মধুসূদন, বিপ্রদাস ত কথা বলেই, লেখকের বিশ্লেষণও তদনুযায়ী, কিন্তু মোতির মাও যখন সেই একই ভঙ্গিতে কথা বলে তখন তাহা বিসদৃশ লাগে বই কি? আসল কথা, প্রত্যেকটি চরিত্রই লেখকের নিজের বুদ্ধিদীপ্ত হ্রস্ব সূত্রায়িত ভাষায় কথা বলে, নিজেদের ভাষায় নয়। কিন্তু "যোগাযোগে" সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য ইহার কাব্যময় বিবৃতি ও ভাব-গভীর চরিত্র ও ঘটনা বিশ্লেষণ। বর্ণনা এক এক জায়গায় কবিত্বের উঁচু পর্দায় ঝংকার তুলিয়াছে, এবং সে-বর্ণনা ভাব-গভীরতায়, জ্ঞানের দীপ্তিতে অতুল। ইহার দৃষ্টান্ত গ্রন্থের পাতায় পাতায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

"তিন পুরুষে" মহৎ উপন্যাসের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু মূল পরিকল্পনা পরিবর্তিত হইয়া যখন "যোগাযোগে" রূপান্তরিত হইল তখন সে সম্ভাবনা ঘুচিয়া গেল। অথচ হ্রস্বায়িত প্রেক্ষাপটে ইহার গতির মহাকাব্যীয় মন্থরতা লাগিয়াই রহিল; ঘটনা ও চরিত্রাবলী যুক্তিপরম্পরাগত চরম পরিণতি লাভ করিল না, এবং গ্রন্থারম্ভে যে-সব প্রশ্ন সূচিত হইল, যে-গল্পসীমানা পরিকল্পিত হইল, তাহার উত্তর মিলিল না, এবং সীমানার বৃত্ত সম্পূর্ণ হইল না। "যোগাযোগ" একটি মহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার অসাফল্যের স্বীকৃতি।

"শেষের কবিতা" রচিত হয় ১৩৩৫ সালের গ্রীষ্মকালে, দক্ষিণ ভারতের পথে ও প্রবাসে। বাঙ্গালোরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের বাড়িতে ১৪ই আষাঢ় বইখানির রচনা শেষ হয়, এবং সেই বৎসরই ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্যন্ত "প্রবাসী" মাসিক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

"শেষের কবিতা" নিঃসংশয়ে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি, এবং একাধিক কারণে সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি। কবি-কল্পনার অতুলনীয় ঐশ্বর্যে, epigramএর দীপ্তির চরম ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায়, হ্রস্ব অথচ অর্থগৌরবপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতে ও ভাষণে, বিষয়গত ঐক্যবোধে, সর্বোপরি দৃঢ় সংহত সমগ্রতায় "শেষের কবিতা"র মতন কাব্যোপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর রচিত হয় নাই। বৃহৎ ও মহৎ উপন্যাসের প্রসার ও পরিধি, বৃহত্তর মানব-সংসারের উত্থান-পতন ও সংগ্রাম-কোলাহলের বিচিত্র তরঙ্গলীলা, প্রবহমান কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর বৃহতের স্পর্শানুভূতির পরিচয়, মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণার আভাস অথবা বৃহৎ বস্তুপুঞ্জের অনিবার্য সবল প্রবাহের পরিচয় "শেষের কবিতা"য় কোথাও নাই, একথা সত্য; লেখক সে-প্রয়াসও করেন নাই। আর, "শেষের কবিতা"ই বা বলি কেন, এক "গোরা" ছাড়া সে পরিচয় রবীন্দ্রনাথের আর কোন উপন্যাসেই নাই। কিন্তু যে-চেষ্টা লেখক করিয়াছেন, অর্থাৎ 'লিরিক্' পরিকল্পনার মধ্যে এবং স্বল্প প্রসার ও পরিধির মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পরিবেশে নরনারীর প্রেমের স্বরূপ ও তাহার পরিণতির চিত্রণ, সেই চেষ্টা যে "শেষের কবিতা"য় সুন্দর ও সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, এ সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

"শেষের কবিতা"র বস্তুভূমি বাংলাদেশের নাগর সমাজের অবসরপুষ্ট উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর চারিটি সুশিক্ষিত মার্জিতবুদ্ধি সংস্কৃতিপরায়ণ নরনারীর প্রেম ও যৌবনের বিচিত্র লীলা ও রহস্য। গল্পের মধ্যে বিস্ময়কর উত্তেজনা কিছুই নাই, ঘটনা যাহা ঘটিতেছে তাহার পরিমাণ খুবই কম, লোকের অথবা ঘটনার ভিড় নাই বলিলেই চলে, নাটকীয় আকস্মিকতাও কিছু নাই। অথচ ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এতই প্রাণাবেগচঞ্চল যে, মনে হয় যেন সেই প্রাণাবেগ সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রকে লঘুপাখায় উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে, অমিত ও লাবণ্যের প্রেমের বিপুল গতিবেগ যেন সঞ্চারিত হইয়াছে উপন্যাসের ভাষায় ও বর্ণনায়। বসিয়া বসিয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রেমালাপও যখন চলিতেছে কবিত্বময় অথচ তীক্ষ্ণ শাণিত ভাষায় তখনও এই গতি যেন অনুভব করিতে পারা যায়। ভাষা ও বিবৃতিতে এমন প্রাণাবেগ-চঞ্চল গতিসঞ্চার রবীন্দ্রনাথের আর কোনও উপন্যাসেই নাই, এমন কাব্যময় প্রকাশও নয়। বস্তুত যে গীতিধর্ম ও কাব্যসুলভ গতিরাগ "চতুরঙ্গে" সূচিত হইয়াছিল, "শেষের কবিতা"য় আসিয়া তাহা চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। "শেষের কবিতা" চরম কাব্যোপন্যাস।

"শেষের কবিতা" পড়িতে পড়িতে বার বার মনে হয়, লেখক কি জাদুকর! চোখের পলকে দেখি, ভাষার রূপ গিয়াছে বদ্‌লাইয়া, ভঙ্গি হইয়াছে নূতন, "চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে-যোগাযোগে"র রূপ ও ভঙ্গি অপেক্ষাও নূতনতর। লঘু গতিছন্দে চলন, অথচ তাহারই মধ্যে দৃপ্ত শক্তি ও আভিজাত্যের স্পন্দন, লঘু ছন্দলয়ে আশ্চর্য কঠিন সুগভীর ভাব-গভীর বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণ! এমন বুদ্ধিসাধ্য দৃঢ় হ্রস্বতা অথচ এমন সরস কবিত্বসুষমায় মণ্ডিত! আর, এ কি সূক্ষ্ম দৃষ্টির ক্ষমতা! এমন সুতীব্র দৃষ্টির আলোকে বিংশ শতকের বাংলাদেশের নাগর-জীবনের একটি বিশেষ শিক্ষিত মার্জিত সংস্কৃতিবান মুষ্টিমেয় শ্রেণীর তরুণ-তরুণীদের অশনে বসনে চলনে বলনে গতিতে মতিতে কে কবে দেখিয়াছে, আর সেই দেখার

সাহিত্যিক প্রকাশ কি সুতীক্ষ্ণ শ্লেষ-কটাক্ষে কণ্টকিত! যে-সব সাধারণ তরুণ-তরুণী একই সঙ্গে একান্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও আবেগবিহ্বল, অথচ যাহারা তাহাদের নিজেদের মনের খবর নিজেরাই সুস্পষ্ট করিয়া জানে না, জানিলেও ভাষায় প্রকাশ করিবার পথ খুঁজিয়া পায় না, কর্মকৃতির মধ্যে রূপদান করিতে পারে না, সেই তরুণ-তরুণীকে অসাধারণত্বের বেদীতে বসাইয়া তাহাদের মনের ভাব-পর্যায়ের সূক্ষ্মতম তন্তুজালের মধ্যে এমন স্বচ্ছন্দ বিহার, এ বুঝি শুধু কবিধর্মেই সম্ভব! প্রেমের ইঙ্গিতময় অতলগর্ভ রহস্য, বিদ্যুৎশিখার দীপ্তি, সর্বব্যাপী বিস্তার, উজ্জ্বল আকস্মিক চমক, ইহার পরিপূর্ণ সার্থকতা ও সূক্ষ্ম অতৃপ্ত অভাববোধ, ইহার অবসাদ ও অন্তরায়, ইহার বিচিত্র বর্ণ সমস্তই চারিটি তরুণ-তরুণীর প্রতিদিনের জীবনের বাস্তবতার সংস্পর্শে আসিয়া এই একান্ত রূঢ় বস্তুসংসারের মধ্যেই রোম্যান্সের কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছে এবং দু'টি জগতকে মিলন-সূত্রে বাঁধিয়াছে। বাংলার বর্তমান নাগর-জীবনের বহু অমিত রায়, বহু লাবণ্য, বহু কেতকী মিত্র, বহু শোভনলাল এই বইখানির মধ্যে তাহাদের ছায়া দেখিয়া হয়ত নিজেদের চিনিতে পারিয়াছে।

অনেক অমিত রায় হয়ত বুদ্ধির বিলাসে পরের হৃদয়ের তাপে নিজেকে গলাইয়া কল্পনার মূর্তি গড়িতে ব্যস্ত, কি যে সে চায় নিজেই জানে না। অনেক লাবণ্য হয়ত প্রথম যৌবনে বিদ্যার অহংকারে, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধে যে-অঙ্কুর বড় হইতে পারিত তাহাকে চাপিয়া দেয়, বাড়িতে দেয় না, ভালবাসাকে দুর্বলতা মনে করিয়া নিজেকেই দেয় ধিক্কার; তারপর ভালবাসা তাহার শোধ নেয়, অভিমান হয় ধূলিসাৎ। অনেক কেতকী মিত্র হয়ত একজনের মুঠির চাপ হারাইয়া দশজনের মুঠির চাপে হইয়া উঠে কেটি মিটার, দশের মতন করিয়া সাজে। তাহারা সকলে এ-বইটিতে যুক্তি ও মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে কিনা জানি না, না পাইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু একথা সত্য যে, তাহারা ইহাতে নিজেদের ছায়া দেখিতে পাইয়াছে, নিজেদের ভাষা খুঁজিয়া পাইয়াছে।

একথা সত্য যে, "শেষের কবিতা" কোন বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের মুষ্টিমেয় কোনও শ্রেণী বিশেষের চিত্র; সেই বিশেষ শ্রেণীর পরিচয়ে ইহার একটা পৃথক মূল্য আছে। কিন্তু শিক্ষিত মার্জিতবুদ্ধি সকল মানুষের কাছেই ইহার একটা অবিশেষ মূল্য আছে; সে মূল্য ইহার রসের মূল্য, ইহার সাহিত্যিক মূল্য। সে কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রেমোপজীবী উপন্যাসে ইহার অন্য বিশেষ মূল্যও আছে। তাহার পরিচয় আমরা পাই, অমিত ও লাবণ্যের, কেতকী ও শোভনলালের প্রেমলীলার বিচিত্র বিকাশের অপূর্ব বিশ্লেষণের মধ্যে। এক সময় ছিল যখন মনের মোটা মোটা ভাবগুলি লইয়া সংসারের সুখ দুঃখ যথেষ্ট ছিল, সমস্যাও কিছু কম ছিল না। আজ সেগুলি সূক্ষ্ম হইয়া এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছে যে কিছুই আর সহজ নাই। বুদ্ধি যতই বাড়িতেছে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যতই সূক্ষ্ম হইতেছে, আমাদের মনন ও কল্পনা ততই আরও নূতন নূতন পথে সৃষ্টি ও প্রকাশের আনন্দ খুঁজিতেছে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগ-বিহ্বলতারও কিছু অপ্রাচুর্য নাই। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভালবাসার আদান-প্রদানের সম্বন্ধ লইয়া মনের মধ্যে ক্রমেই নানান সূক্ষ্ম অনুভূতি নূতন করিয়া আমাদের বোধ ও বুদ্ধির কাছে ধরা দিতেছে, যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল তাহারা আজ গোচর হইতেছে, তাহাদের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য যতই বাড়িতেছে, মনের মধ্যে সমস্যা ততই জটিল হইয়া উঠিতেছে। আবার বিপদও আছে। আমাদের ধর্মের, সমাজের, রাষ্ট্রের সমস্যাগুলি আমরা চোখে দেখিতে পাই, বুদ্ধিতে ধরিতে পারি, তাহা লইয়া আলোচনাও করা চলে। কিন্তু মনের জটিল সমস্যাগুলি থাকে গহন

তিমিরের তলে, যাহার সমস্যা সে নিজেই তাহার খবর জানে না। কবির, সাহিত্যিকের তীব্র দৃষ্টি যখন সেগুলিকে টানিয়া আনিয়া রূপে ও রসে অভিষিক্ত করে তখন আমরা তাহার পরিচয় পাই, তখন বুঝিতে পারি মানব-মনের জটিলতা কত সূক্ষ্ম কত বিচিত্র! অথচ এই আমাদের সংসারটা কখনই এত সূক্ষ্ম জটিলতার উপযুক্ত নয়, তাহাকে স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুতও নয়।

একথা জানা সত্ত্বেও আমরা খুঁজি সমস্যার একটা মীমাংসা। "শেষের কবিতা"র মধ্যে প্রেমের যে সূক্ষ্ম লীলা বিচিত্র ভাব-পর্যায়ে অপূর্ব ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সে-দ্বন্দ্বের, সে-সমস্যার মীমাংসা কিছু আছে কিনা, এ প্রশ্ন সাহিত্য-বিচারের অন্তর্গত নয়। হয় ত নাই! যদি থাকে, সে-মীমাংসা সকলের মীমাংসা না-ও হইতে পারে, সকলের মতের সঙ্গে না-ও মিলিতে পারে; যদি না থাকে তাহা হইলেও রসোদ্বোধনের কোন ক্ষতি হয় না। তাহা পরে আলোচনা করা যাইতে পারে। আপাতত আমাদের বিচার্য মনের যে-দ্বন্দ্ব-লীলার পরিচয় আমরা এই উপন্যাসে পাই, তাহা সার্থক রূপে ও রসে অভিষিক্ত হইয়া আমাদের উপলব্ধিতে সুস্পষ্টভাবে ধরা দিল কিনা, আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির কাছে তাহার আবেদন আসিয়া পৌঁছিল কি না, এবং ভাবের ও অনুভূতির তরঙ্গ-পর্যায়, ঘটনাবস্তুর বিন্যাস কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় নিয়মিত হইল কি না।

"শেষের কবিতা"র বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে একটু জটিলতা আছে। এ-জটিলতার জন্য কতকটা দায়ী বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম তরঙ্গলীলা; কতকটা কবির স্বেচ্ছাকৃতও বটে। তাহার কারণও আছে; প্রধান কারণ, গল্পের সমগ্র গতি ও পরিণতিকে ঘোরাল করিয়া মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের রসটুকুকে ঘন করিয়া তুলিবার সজ্ঞান চেষ্টা। কিন্তু তাহার ফলে একটু অসুবিধা হইয়াছে এই যে, প্রত্যেক চরিত্রের পরস্পরের ব্যবহারের মধ্যে তাহাদের মানসিক ভাব-পর্যায়ের মধ্যে যুক্তি-সংগতির সূত্র মাঝে মাঝে যেন হারাইয়া যাইতে চায়, ঘটনা-বিন্যাসের পারম্পর্য খুঁজিয়া পাইতে যেন একটু দেরি হয়। সেই জন্যই একটু বিস্তৃত করিয়া ঘটনা-বিন্যাসের পারম্পর্য একটু গুছাইয়া লইতে পারিলে চরিত্রগুলির ব্যবহারের মধ্যে সংগতি খুঁজিয়া পাওয়া সহজ হইয়া উঠে; তখন অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায় এই সংগতির কোথাও কিছু অভাব নাই।

"শেষের কবিতা"র গল্পবস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে অমিত ও লাবণ্যর মনের জটিল তন্তুজালকে আশ্রয় করিয়া, তাহাদের সমস্যাই সমগ্র গল্পটির সমস্যা; এই হিসাবে ইহারা দুইজনেই গল্পের প্রধান নায়ক ও নায়িকা; কিন্তু ইহাদের আড়ালে রহিয়াছে আরও দুই জন, কেতকী ও শোভনলাল। কেতকীর সঙ্গে অদৃশ্য এক বন্ধনে জড়াইয়া আছে অমিত, যে-অমিত নিজের দিক হইতে সে-বন্ধনকে একেবারে নিচে চাপিয়া দিয়াছে; আর শোভনলালের সঙ্গে হৃদয়ের এক কোণে একটি গ্রন্থি জড়াইয়া আছে লাবণ্যর, যে-লাবণ্য নিজের জ্ঞানের অহংকারে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধে নিজেকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা দুই জনই নিজেদের মূঢ়তার কাছে বন্দী, নিজেদের কাছে অপরিচিত। এমন সময় হইল ইহাদের পরিচয়, সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের সূত্রপাত। কিন্তু "আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যেবেলায় দীপ জ্বালানোর আগে সকাল বেলায় সল্‌তে পাকানো।"

শিলং-এ মোটরের ধাক্কা খাইয়া উপন্যাসের যেখানে সূত্রপাত, সেই সূত্রপাতের আগের পর্বটির অভিনয়-স্থান অক্সফোর্ড; সময় সাত বৎসর আগে। তখন সেখানে একদিন এক জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ কথা বলিয়া উঠিল, তারার ফুল কণ্ঠ বেড়িয়া মালা গাঁথিয়া

দিল, মাঠে মাঠে ফুলের বৈচিত্র্যে ধরণী তাহার ধৈর্য হারাইল, তখন নদীর ধারে বসিয়া এক বাঙালী তরুণের—অমিট্ রায়ের—ভাব-বিলাসী চিত্তও পাশে এক আঠার বৎসর বয়সের বাঙালী তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার ধৈর্য হারাইল। সমস্ত প্রকৃতি যখন প্রকাশের প্রাচুর্যে কম্পিত ও উদ্বেলিত, যখন সমস্ত চিত্ত আকাশ ও পৃথিবীর সৌন্দর্যের তরঙ্গে এক সঙ্গে নাচিয়া দুলিয়া উঠিতেছে তখন সরলা, হাস্যোজ্জ্বলা, ভাবাবেগারক্তা এক তরুণী সঙ্গিনীর—শ্রীমতী কেতকী মিত্রের—মুখের দিকে চাহিয়া এক মুহূর্তে মনে পড়িল, সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য মাধুর্য ইহার মধ্যে রূপ লইয়াছে, তখন এক মুহূর্তে তাহাব হাতখানি হাতের মধ্যে টানিয়া নিয়া একটি চাঁপার মত আঙুলে আংটি পরান অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিল, একথা তাহাকে বলা সহজ হইল, তোমাকে আমি পাইলাম, tender is the night, and haply the queen moon is on her throne। সমস্ত প্রকৃতি তখন এই দুইটি ভাবমুগ্ধ হৃদয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। কল্পনায় উদ্দীপ্ত যে-যুবক, প্রত্যেক ভাব-তরঙ্গে কম্পিত যে চিত্ত, সে-চিত্তে একবারও একথা মনে পড়ে না, এই বলার মধ্যে এই আংটি পরানব মধ্যে কোন দায় আছে, কোন বন্ধন আছে। চাঁদ যখন ডুবিল, ধরণী যখন তাহার ফুলেব সজ্জা ঘুচাইল, চিত্তেব মধ্যে ভাবের তরঙ্গ যখন বিলীন হইয়া গেল, তখন আর মনেও রহিল না, কোন্ এক ভাবোদ্বেলিত মুহূর্তে কে কবে কাহার হাতে আংটি পরাইয়া দিয়াছিল। কারণ, যে আংটি পরাইয়াছিল সেই অমিতর কাছে এই মুহূর্তটাই সত্য, আংটি পরানর ব্যাপারটা একান্তই সাধারণ।

কিন্তু আঠার বছর বয়সের শ্রীমতী কেতকী মিত্র লিলি গাঙ্গুলী নয়। যে-মুহূর্তে অমিত তাহার আঙুলে আংটি পরাইয়াছিল, সেই মুহূর্তটি তাহাব জীবনে অনন্তকালের জন্য বাঁচিয়া রহিল। অমিতকে সে চিনিতে পারে নাই, সেই জন্যই তাহার পরান আংটি এক মুহূর্তের জন্য খুলিতে পারিল না, তাহার দেহের সঙ্গে তাহা এক হইয়া গেল। তখন সে বেশি কথা বলিতে শেখে নাই, কিন্তু সেই জ্যোৎস্না রাত্রিতে নদীর ধারে বসিয়া অমিতের আংটি পরানব মধ্যে সে ভবিষ্যৎ মিলনের সূচনা দেখিয়াছিল। সেই মুহূর্তটিকে সে অনন্ত জীবনেব মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া ধরিয়া রাখিবে, ইহাই ছিল তাহাব মনের কথা। কিন্তু দু'দিন পরে অমিতর কাছে সেই মুহূর্তটি খসিয়া পড়িয়া গেল সমুদ্রের জলে, তাহার কোন হিসাবও রহিল না। তখন কেতকী মিত্রের উপর তাহার মুঠি আল্‌গা হইল, সঙ্গে সঙ্গে দশের মুঠির চাপ আসিয়া পড়িল তাহার উপর, তাহার হৃদয় গেল মরিয়া, কাজেই মূর্তির বদল হইতে দেরি হইল না। তখন "দাদারই কায়দা কারখানার বকযন্ত্রপরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই করা বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স" গায়ে মাখিয়া শ্রীমতী কেতকী মিত্র হইয়া উঠিল কেটি মিটার। কিন্তু একথা বুঝিতে পারা শক্ত নয় যে, এই অত্যুগ্র বিলিতি কৌলীন্য কেতকী মিত্রের সহজাত সংস্কার বা প্রবৃত্তি নয়, তাহার বিফল কামনা-প্রসূত একটা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসারই রূপান্তর। অমিতের ব্যবহারে তাহার মনের ক্ষোভ ও বেদনা, মানুষের উপর, সহজ বিশ্বাসের উপর এই নিষ্ঠুর আঘাত তাহার মনকে এমনই করিয়া মুচড়াইয়া মুষড়াইয়া দিল! কেটি মিটার কেতকী মিত্রের কৃচ্ছ্র-সাধনের রূপ, নিষ্ঠুর বেদনার রূপ, জীবনকে ব্যঙ্গ করিবার রূপ।

আর এক সলিতার জটের পাক লাগিয়া রহিল লাবণ্যর মনে। প্রথম যৌবনে তাহার মনের নরম জমিটুকু "গণিতে ইতিহাসে সিমেণ্ট করে গাঁথা হয়েচে—খুব পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে—বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়ে না।" তাহারই সহপাঠী

সুকুমার মুখচোরা শোভনলাল মনের এক প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর অগোচরে লাবণ্যর মূর্তি পূজা করিত। কিন্তু লাবণ্যর দিক হইতে সে-ভালবাসা স্বীকারে বাধা ছিল; সে-বাধা তাহার প্রচ্ছন্ন অহংকার, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। শোভনের আত্মপ্রকাশের সংকোচ তাহার কাছে দীনতারই নামান্তর; এই দীনতার কাছে লাবণ্য কিছুতেই নিজেকে বড় মনে না করিয়া পারে না; কাজেই তাহার কাছে তিরস্কৃত হইয়া শোভনলাল চলিয়া গেল দূরে। তাহার প্রতি একটা অন্ধ বিদ্বেষে লাবণ্যর মন ভরিয়া উঠিল।

তারপরের পর্বেই অমিত ও লাবণ্যর পরিচয়—শিলং পাহাড়ে। পরিচয়ে ক্রমে জমিয়া উঠিল আলাপ। লাবণ্যর হৃদয়ের তাপ লাগিল অমিতর মনে ও হৃদয়ে; বরফ গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে শুরু হইল, এক নূতন অভিজ্ঞতার মুখে কথার উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিল। প্রকৃতির সকল সৃষ্টি তাহার কাছে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল; সে স্পষ্ট করিয়া জানিতে পারিল যে, পাখি আছে, এমন কি তাহারা গানও গায়। একথা শুনিয়া লাবণ্য একটু হাসিয়াছিল; তাহার উত্তরে অমিত বলিয়াছিল, "এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নূতন করে জানচি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না।" তারপর দ্রুত তাহার মন ও আবেগ লাবণ্যকে ঘিরিয়া ফেলিল, অমিত নিজেকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল, তাহার মনের কথাটি বাহির হইয়া পড়িল, for God's sake hold your tounge and and let me love! তারপর একদিন যোগমায়া দেবীর কাছে লাবণ্যকে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বসিল।

অমিতের আহ্বানে লাবণ্যর মন জাগিয়া উঠিল। বুদ্ধির অহংকারের আচ্ছন্নতা হইতে, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ হইতে সে মুক্তিলাভ করিল; কিন্তু সে-আহ্বানে এত সহজে সাড়া দিতে সে সাহস পাইল না। অমিতকে সে চিনিতে পারিয়াছিল। ঠিক কি যে অমিত তাহার কাছে চায়, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু এটুকু সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে অমিত তাহার বুদ্ধি, তাহার রুচিটাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে, সেই বুদ্ধি ও রুচিটাকেই সে চাহিয়াছে। সে যেই তাহার মনকে স্পর্শ করিয়াছে অমনই তাহার মন অবিরাম অজস্র কথা বলিয়া উঠিয়াছে। সেই কথা দিয়াই অমিত লাবণ্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে; সেই হেতুই, যে-লাবণ্যকে সে ভালবাসিয়াছে সে-লাবণ্য অমিতেরই এক মনগড়া মূর্তি। যে-লাবণ্য সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, সে লাবণ্যকে অমিত দেখিতে পায় নাই। সেইজন্য লাবণ্যর ভয়, একদিন এই বুদ্ধি ও রুচির মধ্যে যে-রস অমিত ভোগ করিয়াছে, সে-রস যখন নিঃশেষ হইয়া যাইবে, মন যখন ক্লান্ত হইবে, তখন সেই প্রতিদিনের সহজ জীবন-স্রোতের মধ্যে ধরা পড়িবে, নিতান্ত সাধারণ মেয়ে এই লাবণ্য; সে-লাবণ্য অমিতের নিজের সৃষ্টি নয়। এই সাধারণত্ব অমিতের সহ্য হইবে না, তাহার স্বভাবই তাহা নয়। একদিন অমিতের রুচি অমিতের বুদ্ধির বিলাস লাবণ্যকে ছাড়াইয়া যাইবে, অমিত ফিরিয়াও লাবণ্যকে ডাকিবে না, এই ভয় লাবণ্যকে পীড়িত করিয়া তুলিল। একথা মনে করিয়া সে দুঃখ পাইল, অমিত জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাইতেই ব্যস্ত, কিন্তু সে চায় জীবনের তাপ জীবনের কাজে লাগাইতে। অমিত তাহা পারে না; সে তাহার জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয়ে জীবনকে শুধু রসাইয়া লয়, বুদ্ধি ও রুচির তৃষ্ণাকে মিটাইয়া লয়, গভীরভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। অমিত-চরিত্রের বিশ্লেষণ লাবণ্যর চেয়ে ভাল করিয়া করা বুঝি আর সম্ভব নয়! লাবণ্য তাহার প্রখর বুদ্ধির আলোকে সমস্তই খুব স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইল; সেই জন্যই যখন ধরা পড়িবার সময় আসিল তখন মনটা

যেন কেমন মোচড় দিয়া উঠিল। তবু তাহাকে বলিতেই হইল,—"মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েচ। আজ তোমাকে যা বলচি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জানো। মানতে চাওনা পাছে যে-রস এখন ভোগ করচো তাতে একটুও খটকা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্ত ফেরো, সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্তেই এসেচো"। একথা বলিতে লাবণ্যর ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল। অমিতের তৃষ্ণার তাপে তাহার হৃদয়ে প্রেমের পদ্মটি ফুটিয়াছে, সে-ও যে ভালবাসিতে পারে এ-সন্ধান সে পাইয়াছে। অমিত কত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল, শুনিয়া "লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এলো। তবু এ-কথা মনে না করে থাকতে পারলে না যে, অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটেই ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ।" যোগমায়া অনেক করিয়া লাবণ্যকে বুঝাইলেন; কিন্তু লাবণ্য কিছুতেই একথা মনের মধ্যে স্বীকার করিতে পারিল না যে, অমিত তাহাকে বিবাহ করিয়া ঘর পাতিয়া সংসারী হইয়া সুখী হইতে পারিবে। এইটুকুমাত্র সে স্বীকার করিয়া লইল, "যতটুকু আমি তার কাছে পেলেম, ততটুকুই আমার পরম লাভ।" সে যোগমায়াকে বলিল—"যতদিন পারি, না হয় ওঁর সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিলিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকবো। আর স্বপ্নই বা তাকে বলবো কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েচে।" আর সেইটুকু দেখা দিয়াছে বলিয়াই ত লাবণ্য নিজেকে নূতন করিয়া জানিবার সুযোগ পাইল, জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে। সেই জন্যই যোগমায়া বলিলেন; "আজ আমার বোধ হচ্ছে কোনকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভাল হোত", তখন লাবণ্য কিছুতেই সে-কথা স্বীকার করিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল—"না, না, তা বলোনা। যা হয়েছে তা ছাড়া আর কিছু যে হতে পারতো এ আমি মনেও করতে পারিনে। এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুকনো —কেবল বই পড়বো, আর পাস করবো, এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলেম, আমিও ভালবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হোল এই আমার ঢের হয়েচে, মনে হয় এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েচি। এর চেয়ে আর কি চাই।"

অমিত আশা ছাড়িল না; দ্বিতীয়বার তাহার সাধনা শুরু হইল। যোগমায়া তাহাতে অমিতের সহায় হইলেন। কথায় কবিতায় লাবণ্যর অন্তরবেদী ছাইয়া গেল। এ নিবেদনের তরঙ্গ লাবণ্য ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। একদিন যোগমায়া "লাবণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিতের ডান হাতের উপর রাখলেন। লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দু'জনের হাত বেঁধে বললেন, তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক।" সেইদিন অমিত লাবণ্যর হাতে আংটি পরাইয়া দিয়া বলিল, তোমাকে আমি পাইলাম। ঠিক হইয়া গেল দু'জনের বিবাহ হইবে। তারপর লাবণ্যকে নিয়া অমিত কত সোনার জালই বুনিল, কত কল্পনার মালা গাঁথিল। কিন্তু লাবণ্যর মনে একটা সন্দেহ জাগিয়াই রহিল, পরমক্ষণে শুভদৃষ্টি ত ঘটিল, ইহার পর বাসরঘর কি আছে?

এমন সময় কেটি তাহার পূর্বদাবি লইয়া অমিতর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, মূর্তিমান ব্যাঘাতের মতো! তারপর প্রত্যাবর্তন, the Great Return.

অমিতকে ফিরিতে হইল কেটির কাছে, সুদীর্ঘ সাতবৎসর যে-কেটি অমিতর জন্য

কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছে, যে-কেটি অমিতকে সাত বৎসরেও ভুলিতে পারে নাই। অমিতর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে বলিতে কেটি মিত্তিরের গলা ভার হইয়া আসিল, অনেক কষ্টে সে চোখের জল সামলাইয়া লইল ; তারপর আংটিটা টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় 'এনামেল করা' মুখের উপর দিয়া দরদর করিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তখন এক মুহূর্তে আমরা কেটি মিত্তিরকে চিনিতে পারিলাম, বুঝিতে পারিলাম তাহার মধ্যে কেতকী মিত্র সাত বৎসর পরেও বাঁচিয়া আছে। একটিমাত্র তুলির রেখায় কেতকীর সত্যকার পরিচয় একমুহূর্তে পাইলাম। অমিতের জীবনে লাবণ্যকে প্রয়োজন ছিল ; সেই প্রয়োজন শেষ করিয়া দিয়া লাবণ্য সরিয়া পড়িল, তাহার সঙ্গে অমিতের অন্তরের যে-সম্বন্ধ তাহার লেশমাত্র দায় অমিতকে বহন করিতে দিতে রাজী হইল না, কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পর্যন্ত চাহিল না। তারপর দেখি, অমিত ফিরিল কেটির কাছে। কেতকীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া অমিত মনের মতন কাজ পাইল। "এতদিনে অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ।"

লাবণ্যকে ফিরিতে হইল শোভনলালের কাছে, যে-শোভনলাল প্রথম যৌবনে একদিন তাহার কাঁকন-পরা হাতে ধাক্কা খাইয়া ঘর হইতে পথের মধ্যে ছিটকাইয়া পড়িয়া কাপিশ হইতে কুমায়ুন, কাশ্মীর হইতে কামরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়াও তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, যে-শোভনলাল তাহার কাছ হইতে শাস্তি পাইয়াছে বিস্তর, অথচ কি অপরাধ সে করিয়াছে, কোনওদিন তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। ফিরিবার পথে লাবণ্যর মনে হইল, "যে-অঙ্কুরটা বড় হয়ে উঠতে পারতো, সেটা সে অযথা একদিন চেপে দিয়েছিল, বাড়তে দেয়নি। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারতো। সেদিন নিজের ছিল জ্ঞানের গর্ব, বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালবাসাকে দুর্বলতা মনে করে ধিক্কার দিয়েছে। ভালবাসা আজ তার শোধ নিলো, অভিমান হলো ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হতে পারতো নিঃশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা কঠিন হয়ে উঠলো,—সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। * * * তারপরে কতদিন গেচে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালবাসা এতোদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইলো? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।" সেই মাহাত্ম্যের কাছে নত না হইয়া লাবণ্য থাকিতে পারিল না। সুদীর্ঘ বৎসর উৎকণ্ঠিত চিত্তে যে তাহার প্রতীক্ষা করিয়াছে, কৃষ্ণপক্ষ রাত্রে যে রজনীগন্ধার বৃন্ত দিয়া অর্ঘ্যের থালি সাজাইয়াছে, যে ভালমন্দ সকল মিলাইয়া অসীম ক্ষমায় তাহাকে দেখে, তাহারই পূজায় সে নিজেকে উৎসর্গ করিতে গেল।

তারপর যাহা আছে তাহা শুধু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহারের কৈফিয়ৎ। সে ব্যাখ্যা, সে কৈফিয়ৎ একান্তই তাহাদের নিজেদের, আর কাহারও নয়। সাহিত্যরসিকের কাছে তাহা অবান্তর। বোধ হয় গল্পের পূর্ণতার জন্যও এ-ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না। সর্বশেষের সুন্দর কবিতাটিতে লাবণ্যর যে-কথাটি আছে, লাবণ্য অমিতের সঙ্গে তাহার ব্যবহারে প্রাণ দিয়া সেই কথাটিকেই ব্যক্ত করিয়াছে। অমিতের বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে গিয়া তাহার সমস্ত অন্তর কাঁদিয়া মরিয়াছে, তবু সে তাহার প্রতিদিনের সঙ্গিনী হইতে পারে নাই। এই একান্ত বেদনার মধ্যে এই কথাটিই প্রকাশ পাইয়াছে ; এবং এই বেদনার মধ্যেই সে শোভনলালের সন্ধানও জানিয়াছে। অমিতকে অথবা আমাদিগকে নূতন করিয়া এ কথা বলিবার কিছু অপেক্ষা ছিল না। তবু এ-কথা স্বীকার

করিতেই হয় যে, একথাগুলি লাবণ্যর সমস্ত অন্তর মন্থন করিয়া উৎসারিত ; এর সঙ্গে লাবণ্যর আগাগোড়া একটা সংগতি রহিয়াছে। কিন্তু অমিতের নিজের ব্যাখ্যায় আমি কিছুতেই সেই সংগতি খুঁজিয়া পাইতেছি না। অমিত বলিল, "একদিন আমি সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ,—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেচি। কিন্তু আমার আকাশও রইলো।" এই কথারই টীকা করিতে হইল রূপক দিয়া, "কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালবাসারই কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবে, প্রতিদিন ব্যবহার করবে। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালবাসা সে রইলো দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" বলিতে ইচ্ছা হয়, এ-ব্যাখ্যায় এ-কৈফিয়তে যতটুকু সত্য আছে, সে শুধু ঐ বলার মধ্যেই ; আরও সুস্পষ্ট করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, এ যেন রবীন্দ্রনাথের কথা, অমিতের কথা নয়। তাহার কারণ খুঁজিতেও বেশি দূরে যাইতে হয় না। লাবণ্য যে শোভনলালের কাছে ফিরিয়া গেল, তাহার মধ্যে একটা যুক্তিপারম্পর্য আছে: সে একটা নিগূঢ় বেদনার মধ্যে নিজের ও শোভনলালের সত্যকার পরিচয় পাইয়াছিল, কাজেই তখন তাহার মন ও হৃদয় শোভনলালকে আশ্রয় না করিয়া পারে নাই। তাহাদের মানসিক ভাব-পর্যায়ের বিকাশের মধ্যে সেটা এত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়াছে যে, এ সম্বন্ধেও কোন দ্বিধাই আমাদের মনে জাগে না। কিন্তু অমিত যে কেটির কাছে ফিরিয়া আসিল এর মধ্যে কোনও সংগতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কেটির জন্য তাহার মনের মধ্যে কোথাও যে কোন বেদনা জাগিয়াছিল তাহার কাছে ফিরিবার জন্য সে যে অন্তর হইতে কোন আহ্বান পাইয়াছিল, একথার পরিচয় আমরা কোথাও পাইনা, না তাহার মনে, না তাহার কাজে। কেটি যেদিন অমিতের দেওয়া আংটি আঙুল হইতে খুলিয়া ফেলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া 'এনামেল করা' মুখের উপর চোখের জল নিয়া চলিয়া গেল, সেদিনও যে তাহার মনে বেদনার কোন আহ্বান জাগিয়াছিল তাহার খবর আমরা পাই না। অনেকেই হয়ত বলিবেন, লাবণ্য তাহার চোখ ফুটাইয়াছিল, তখন সে তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু এই ভুল বুঝিতে পারিবার পরিচয় কোথায়? বলিতে ইচ্ছা হয়, অমিত স্বেচ্ছায় অন্তরের আহ্বানে কেটির কাছে ফিরে নাই, এমন কি বুদ্ধির প্রেরণাতেও নয় ; রবীন্দ্রনাথ অমিতকে কেটির দিকে ফিরাইয়াছেন, এবং তাহার প্রধান কারণ কেটির প্রতি সুবিচার করিবার একটা চেষ্টা। এ-প্রত্যাবর্তন উপন্যাসের কোন প্রয়োজনে নয়, অন্য কোন কিছুর প্রয়োজনে।

"শেষের কবিতা"র চরিত্র চিত্রণ নিখুঁত। প্রত্যেকটি চরিত্র সুস্পষ্ট রেখায় আঁকা, অপূর্ব সেই রেখার লীলা! কি প্রখর সুতীক্ষ্ণ সেই দৃষ্টি! ভিতরের ও বাইরের ভাব ও ভঙ্গি লেখনীর মুখে চিত্রকরের তুলির চাইতে সজীব হইয়া ফুটিয়াছে। অমিতের মনের পরিচয় আমরা পাই তাহার প্রত্যেক কথায়, চলনে বলনে, প্রত্যেক বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে, তাহার বেশে ভূষায়। এমন সুস্পষ্ট করিয়া একটি অসাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় বাংলা সাহিত্যে কমই দেখা যায়। অমিত রায়—বিকল্পে 'অমিট রায়ে'—বাংলা দেশের কোন বিশেষ শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত মার্জিত তারুণ্যের একটা টাইপ, সে-টাইপের মধ্যে অস্পষ্টতা কোথাও নাই। "মেয়েদের প্রতি ব্যবহারে সে উদাসীন নয়, বিশেষভাবে কারো প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোথাও মধুর রসের অভাব ঘটে না। এক কথায় বলতে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে।" এরকম অনেক কথার মধ্যে এই একটি! কিন্তু এই একটি কথায় অমিতের

চরিত্রের একদিকের সমস্ত পরিচয়টুকু আছে। তারপর লিলি গাঙ্গুলীর একটি কথার মধ্যে লাবণ্যর বিশ্লেষণের মধ্যে অমিতের যে পরিচয় আছে, সে-পরিচয় বহু কথা বলিয়াও জানাইবার সুবিধা ছিল না। অমিতের আর একদিকের পরিচয় লিলি গাঙ্গুলীর একটি কথায় আছে, "তারপরে সোনার মুহূর্তটি অন্য মনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কতো মুহূর্ত খসে পড়ে গেচে; ভুলে গেচো বলে তার হিসেব নেই।" লাবণ্য, যোগমায়া, কেতকী, শোভনলাল প্রত্যেকেই আপনাপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল! শোভনলালের সঙ্গে দেখা আমাদের খুব বেশি নয়; তাহার সম্বন্ধে খুব বেশি কথাও কিছু নাই। কিন্তু লাবণ্য যেদিন দুপুর বেলা নির্জন লাইব্রেরি ঘরে আসিয়া শোভনলালকে তিরস্কার করিল, তখন শোভনলাল চোখ নিচু করিয়া শুধু বলিল, "আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনই যাচ্চি;" আর কিছু বলিল না, ধীরে ধীরে খাতাপত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া লইল; "হাত তার থর থর করে কাঁপচে; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজরগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস্তা পায় না", সেই মুহূর্তে আমরা শোভনলালের সমস্ত পরিচয়টুকু পাইলাম। এরপর, যখন শোভনের কাছ হইতে একটি ছোট্ট চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল লাবণ্যর হাতে, সেই চিঠির দু'টি কথায় তাহার ভিতর ও বাইরের কিছু আর জানিতে বাকি রহিল না। সবাপেক্ষা নৈপুণ্য ফুটিয়াছে কেতকীর চিত্রণে। তাহার দেখা ত মাত্র দু'টি জায়গায় পাইলাম; কিন্তু অক্সফোর্ডে নদীর ধারে ত কোন পরিচয় নয়, কেটি মিটারের রূপও তাহার সত্যিকারের পরিচয় নয়, সে-পরিচয় যখন পাই তখন একটা ঘৃণায় আমাদের মন তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে, অথচ সেই যে আংটির বাজি হারিয়া অমিতকে দায়ী করিতে গিয়া কেটির গলা ভার হইয়া আসিল, অনেক কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল; তারপর আংটি খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল, 'এনামেল-করা মুখের উপর দিয়া দর্‌দর্‌ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো'—এই একটি মাত্র রেখায় কেতকীর সাত বৎসরের পরিচয় আমরা এক মুহূর্তে পাই। তাহা ছাড়া অদ্ভুত চরিত্রবর্ণনার পরিচয় পাই, অপূর্ব সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাই যোগমায়া, লাবণ্য, লিসি, নরেন, মিত্তির, কেটি মিত্তিরের চরিত্রেখা অঙ্কনে। বর্ণনার এমন অদ্ভুত নৈপুণ্য এমন সজীব সত্য পরিচয়-কৌশলের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি আছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। ইহাতে শুধু তাহাদের বাইরের বেশভূষা চালচলনের পরিচয় আমরা পাই না, তাহাদের মনের, তাহাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের পরিচয়ও পাই। সিসি, লিসি, নরেন মিত্তিরের প্রয়োজন হইয়াছে অমিত ও লাবণ্যকেই বিশেষ করিয়া ফুটাইবার জন্য, কেটিকেই ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য। ইহারা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে, যে-আবেষ্টনের পরিচয় না পাইলে বিভিন্ন চরিত্রের ভাব-পর্যায়ের ও সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্বের সমস্যাটিকে একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধটিকে বুঝিতে পারা কিছুতেই সম্ভব হইত না। যাহার যাহা সত্যকার পরিচয় তাহা প্রত্যেকের কথার মধ্যে, ভঙ্গির মধ্যে এমন সুস্পষ্ট, মনে হয় প্রত্যেকের জীবনের ব্যাখ্যা ও পরিচয় যেন তাঁহারা নিজেরাই রাখিয়া যাইতেছে তাহাদের প্রতি মুহূর্তের পদক্ষেপে। তাহার উপর আর টীকার দরকার করে না।

"শেষের কবিতা"কে বলা হইয়াছে satire বা ব্যঙ্গ সাহিত্য। একথা স্বীকার করিয়া লওয়া কঠিন। অমিতর বর্ণনায়, সিসি, লিসি, কেটি, নরেনের বেশভূষা ও চলন-বলনের বর্ণনায়, তাহাদের প্রতি সুতীব্র শ্লেষ ও বক্র কটাক্ষে, রবিঠাকুরকে লইয়া নিবারণ

চক্রবর্তীর বক্র ঈর্ষার খেলায়, অমিতের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গবহুল কথাবার্তায়, তাহার মিলন-লীলার স্বপ্ন-কল্পনার আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয়। মনে হয়, কোন শ্রেণীবিশেষের ফ্যাসনগ্রস্ত যুবক-যুবতীদের বিলিতি উৎকট ফ্যাশনপ্রীতিকে, তাহাদের শৌখিন প্রেমবিলাসকে বিদ্রূপ করিবার জন্য, সুতীব্র শ্লেষকটাক্ষের কষাঘাতে বিপর্যস্ত করিবার জন্যই বুঝি "শেষের কবিতা"র সৃষ্টি। হয়ত এই শ্লেষ ও কটাক্ষের, সুতীব্র কষাঘাতের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু "শেষের কবিতা"র সাহিত্য-বিচারে এইরূপ পরিচয় আমার সত্য মনে হয় না। আমার একান্ত বিশ্বাস এই শ্লেষ, এই বিদ্রূপ কটাক্ষ "শেষের কবিতা"র অত্যন্ত স্বল্প পরিচয়; শুধু এই পরিচয়ের জন্যই "শেষের কবিতা" রচিত হয় নাই। বইটির সমস্ত শ্লেষ-কটাক্ষের আবরণের ভিতর রহিয়াছে মানব-মনের একটি জটিল সুগভীর সমস্যা, সে-সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে অমিত-লাবণ্য-কেতকী-শোভনলালের মর্মভেদ করিয়া। মানব-মনের বিচিত্র ভাব-পর্যায়ের জটিল উৎস হইতে "শেষের কবিতা" উৎসারিত হইয়াছে এবং তাহা আশ্রয় করিয়াছে কয়েকটি বিশেষ মনের বিশেষ ধারাকে। তাহাদের মনকে আশ্রয় করিয়াই তাহাদের জীবনের জটিল সমস্যা লইয়াই রবীন্দ্রনাথ একটি গল্পের তন্তুজাল রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে মানব-মনের এই বিচিত্র অথচ জটিল সুগভীর প্রেম-সমস্যার লীলা; এই লীলাই তাঁহাকে "শেষের কবিতা"-রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আধুনিক উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের নগরজীবী, নিম্নস্তরের ইঙ্গবঙ্গ আবহাওয়া-পুষ্ট, ফ্যাসনবিলাসী শ্রেণীবিশেষের নর-নারীর চালচলন, জীবনযাত্রা অথবা প্রেম-বিলাস রবীন্দ্রনাথকে এ গল্পের সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করে নাই, একথা কতকটা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। এমন কি নিজেকে লইয়া যে-কৌতুক তিনি করিয়াছেন, তাহাও একটা অবান্তর কৌতুক বই আর কিছুই নয়, উপন্যাসের সঙ্গে এ কৌতুকের কোন সম্বন্ধ নাই। আর যে শ্লেষ ও কটাক্ষ শ্রেণীবিশেষের তরুণ তরুণীর প্রতি তিনি করিয়াছেন, তাহার দরকার হইয়াছে শুধু শ্রেণী-বিশেষের আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সৃষ্টি করা গল্পের খাতিরে প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই।

"শেষের কবিতা" যতবার পড়িয়াছি, ততবারই সকলের শেষে একটি কথা মনে হইয়াছে। আমি আগেই বলিয়াছি, "শেষের কবিতা" বাংলা দেশের একান্ত সাম্প্রতিক-কালের কোন শ্রেণীবিশেষের নর-নারীর জটিল প্রেমলীলার এক অপূর্ব কাব্য। যে-বয়সের তরুণ-তরুণীর মানসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে রূপে রসে ফুটাইয়া তুলিলেন, সে-বয়স হইতে তিনি অনেক দূরে; বহুদিন তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন; যে-যুগে তিনি যুবক ছিলেন এবং যুবক-মনের দ্বন্দ্ব তাঁহার জানা সহজ ছিল সে-যুগে এসব সমস্যা ছিল না, সে-যুগের আবহাওয়া, আবেষ্টন এরকম ছিল না। কিন্তু "শেষের কবিতা" পড়িয়া মনে হয়, এ কি অদ্ভুত প্রতিভা, কি অপূর্ব বুদ্ধি ও কল্পনার ঐশ্বর্য, কি সূক্ষ্ম দৃষ্টির ক্ষমতা, যাহার বলে তিনি এক দুস্তর কালসমুদ্র পার হইয়া এই একান্ত আধুনিক বর্তমানের এই অতি আধুনিক, শিক্ষিত, মার্জিত, উচ্চমধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীর মন ও হৃদয়ের মধ্যে নিজের বাসা লইয়াছেন, এবং সেখানে প্রত্যেক অলিগলির সন্ধান ও তাঁহার কাছে এত সহজ হইয়া উঠিয়াছে! এ কি চোখের ও বুদ্ধির দীপ্তি যাহার ফলে অতি সূক্ষ্মতম বৈশিষ্ট্যও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, অতি তীক্ষ্ণতম বাক্যও তার অর্থ হারায় নাই! আমরা যে-সব তরুণ-তরুণী বর্তমানে এই অতি-আধুনিক যুগে বাস করি, এমন করিয়া আমরাও দেখি না, বুঝি না, জানি না, যতটুকু দেখি, বুঝি বা জানি ততটুকুও এমন করিয়া

বলিতে পারি না। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ কি আমাদের তরুণ-তরুণীদের চাইওতে অধিকতর তরুণ? সত্যই তাই, "শেষের কবিতা"র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে, বুদ্ধি ও কল্পনায়, সর্বোপরি প্রেম-লীলার বোধ ও অনুভূতিতে এবং তাহার প্রকাশ-ক্ষমতায় তরুণদের মধ্যে তরুণতম, আধুনিকদের মধ্যে আধুনিকতম।

তবু, "শেষের কবিতা" কিছু মহৎ উপন্যাস নয়, মহৎ সাহিত্যসৃষ্টিও নয়। কেন নয়, সে কারণ আগেই একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি; "চতুরঙ্গ" আলোচনা-প্রসঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তৃত ব্যাখ্যাও করিয়াছি। "শেষের কবিতা" যে একসময় মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, রোম্যান্টিক ভাববিলাসী বাঙালী পাঠকের মন লুটিয়া লইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ ইহার অপূর্ব মধুর কাব্যরস, ইহার বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত বাকভঙ্গি, ভাষার উজ্জ্বল ও তির্যক গতি, ইহার অপূর্ব বর্ণবিলাসময় ভাব-পরিবেশ। কিন্তু "শেষের কবিতা"র কাব্যরস জীবনের গভীরতম অভিজ্ঞতা হইতে উৎসারিত নয়, এই কাব্যরস মর্মোদ্ভিন্ন জীবনরস নয়। ইহার দীপ্ত শাণিত বাকভঙ্গির আবেদন যতটা বুদ্ধির দুয়ারে, গভীর মর্মাবেগের দুয়ারে ততটা নয়; ইহার ভাষা বহুজনের বহুমনের ভাষা নয়, শিক্ষিত মার্জিত বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরজনের চমক লাগান সংস্কৃত ভাষা, প্রাকৃত জনের প্রাকৃত ভাষা নয়। সর্বোপরি "শেষের কবিতা"র উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী এবং তাহার বস্তুচেতনা বাংলা দেশের নাগর জীবনের সংকীর্ণতম একটি শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; অবসরপুষ্ট অপেক্ষাকৃত সচ্ছল কাল্‌চার-বিলাসী সমাজের বাহিরে তাহাদের স্থান আর কোথাও নাই।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের সকল উপন্যাসই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত, মার্জিত-বুদ্ধি, সংস্কৃতি-সম্পন্ন ভদ্রলোকের সমতল সংকীর্ণ নিস্তরঙ্গ স্বল্লায়তন জীবনযাত্রা লইয়া রচিত। এই জীবনযাত্রায় প্রেমই একমাত্র বস্তু যাহা কিছু তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সেই প্রেমই রবীন্দ্র-উপন্যাসের উপজীব্য। মধ্যবিত্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ও পরিণতি, ইহাই রবীন্দ্র-উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তুর সাহিত্যিক প্রকাশের মধ্যে ঘটনা অথবা চরিত্রের ভিড় সর্বত্রই কম। এক "গোরা" ছাড়া বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে এই বিষয়বস্তুর যোগ অন্যত্র বিশেষ কিছু আবিষ্কার করাও কঠিন। এই কারণেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের বস্তুপটভূমির প্রসার ও পরিধি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আমাদের সমতল স্বল্লায়তন সমাজ ও পরিবারিক জীবনও ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

"গোরা"-পরবর্তী উপন্যাসগুলির সামাজিক পটভূমিও একটু লক্ষ্য করা যাইতে পারে। "গোরা" ও আগেকার উপন্যাসগুলির, অবশ্য "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" ও 'রাজর্ষি" বাদে, সামাজিক আশ্রয় সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসগুলির বিশেষভাবে "ঘরে বাইরে", "যোগাযোগ" ও "শেষের কবিতার"র আশ্রয় অবসরপুষ্ট নগর-নির্ভর উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী। বাংলার শহরগুলিতে এবং কলিকাতায় ইতিমধ্যে এই উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে; এই শ্রেণী একদিকে ক্ষীয়মাণ অভিজাত শ্রেণী ও অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পন্নতর সমৃদ্ধতর ব্যক্তিদের দ্বারা পুষ্ট। এই মুষ্টিমেয় শ্রেণীই শেষের দিককার উপন্যাসগুলির সামাজিক আশ্রয়। তাহাদের ধ্যান-ধারণা, তাহাদের জীবনযাত্রা অবলম্বনেই এই উপন্যাসগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে।

আট

দুই বোন (১৩৩৯)
মালঞ্চ (১৩৪০)
চার অধ্যায় (১৩৪১)

"শেষের কবিতা"র চারি বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ আবার উপন্যাস-রচনায় লেখনী নিয়োগ করিলেন এবং পর পর তিন বৎসর তিনটি ছোট উপন্যাস রচনা করিলেন। এই তিনটি রচনাও "শেষের কবিতা"র মতনই 'নভেল'-ধর্মী, ইহাদেরও, বিশেষভাবে প্রথম দুইটি রচনার, আশ্রয় একান্তই নগরনির্ভর, অবসরপুষ্ট শিক্ষিত ও মার্জিত বুদ্ধি উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ, এবং সেই সমাজের নর-নারীর জটিল প্রেম রহস্য, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, প্রেমকেন্দ্রিক জীবনের বিচিত্র চিত্তদ্বন্দ্ব। "চার অধ্যায়ে"র বিষয়বস্তু একটু স্বতন্ত্র, "ঘরে বাইরে"র মত ইহারও সামাজিক আশ্রয় বাংলার রাষ্ট্র আন্দোলনের একটি রহস্যময় অধ্যায়—বাংলার বিপ্লববাদ; কিন্তু সেখানেও বিপ্লবের দাবি প্রেম ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দাবি ও আদর্শকে কিভাবে পীড়িত ও সংকুচিত করে, তাহারই পরিচয় লেখকের বস্তুভূমি। তবু, একথা স্বীকার করিতেই হয়, "দুই বোন মালঞ্চে"র তুলনায় "চার অধ্যায়ে"র জীবন-পটভূমি প্রশস্ততর, দেশকালধৃত মানব-জীবনের পরিচয় বিস্তৃততর।

"শেষের কবিতা"র মতনই এই বই তিনটিরও ভাষার অপূর্ব জাদু চিত্তে যেন মোহের সৃষ্টি করে। এই বুদ্ধিদীপ্ত, শাণিত, এপিগ্রাম-উজ্জ্বল বাক্‌ভঙ্গি, নূতন শব্দ সৃষ্টি, পুরাতন শব্দের নূতন অর্থব্যঞ্জনা, চাকচিক্যময় তির্যক ভাষার গতি সমস্তই এই বই তিনটিতেও উপস্থিত। এক একটি বাক্যের ও বাক্‌ভঙ্গির কাব্যময় অর্থগভীর ইঙ্গিত, রৌদ্র-দীপ্ত হাস্যরস, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গরস এক এক সময় বুদ্ধিকে প্রায় সম্মোহিত করে, অবশ্য, "শেষের কবিতা" বা "যোগাযোগে" ভাষা-ব্যবহারের যে অপূর্ব শক্তি ও কলাকৌশল একান্তই স্বপ্রকাশ ও স্বতঃস্ফূর্ত, এ বই তিনটিতে সে-শক্তি ও কলাকৌশল অনেকটা স্তিমিত ও শিথিল, কোথাও একটু প্রয়াস-প্রয়োগও নাই, এমন বলা চলে না, তবু, মোটামুটিভাবে বলা চলে শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গি, এককথায় ভাষা লইয়া পরীক্ষা চলিয়াছে এই বই তিনটিতেও,—শুধু তাই কেন, এ-পরীক্ষা চলিয়াছে একেবারে "তিন সঙ্গী" পর্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা যায় "যোগা-যোগ-শেষের কবিতা"য় যে-পরীক্ষা কবি আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই জের টানিয়া চলিয়াছেন শেষ পর্যায়ের গল্প-উপন্যাসগুলিতেও।

এই ভাষা, সংলাপ ও বাক্‌ভঙ্গি একান্তভাবে নাগরজীবন-জাত, এবং সেই নাগর-জীবনেরও একটি সংকীর্ণ, বুদ্ধিজীবী, অবসরপুষ্ট, বাক্যবিলাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, যে-সম্প্রদায়ের মূল সমাজের খুব গভীরে বিস্তৃত নয়। এই হিসাবেই, অন্যত্র "শেষের কবিতা" আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি, এই ভাষা বিদগ্ধমনের সংস্কৃতজনের সংস্কৃত ও অলংকৃত ভাষা; প্রাকৃত মনের সহজ প্রাকৃত ভাষা নয়, বহুজনের বহুমনের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠতা নাই! এই ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি 'courtly', এবং ভাল হউক, মন্দ হউক, যে-কারণেই হউক, এই courtlinessকেই বিদগ্ধ নাগর জীবনের সংস্কৃতির মাপকাঠি বলিয়া আমরা ধরিয়া লইয়াছি। এই courtly ভাষার কলাকৌশল কি আশ্চর্য নিপুণতা লাভ করিতে পারে তাহা ত সংস্কৃত সাহিত্যে, ভারতচন্দ্রে আমরা বারংবার দেখিয়াছি। আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এবং তাঁহাদের পর অনেক সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যেও courtly

ভাষার কলাকৌশলের নানা পরিচয় নানাভাবে পাওয়া যাইতেছে; তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, এ-ভাষা কোনও দিনই বহুজনের প্রাকৃত ভাষা হইবে কি না; যত দীপ্ত, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম কলাকৌশলই থাকুক না ভাষার, যত তির্যক, শাণিত ও চতুর হউক না বাক্‌ভঙ্গি, কখনও তাহা সহজ ও অকৃত্রিম প্রাণমনের সরল অকৃত্রিম প্রকাশকে অতিক্রম করিতে পারিবে কি?

তাহা ছাড়া, আমার মনে হয়, এই শেষ তিনটি উপন্যাসে, বিশেষ ভাবে "দুইবোন-মালঞ্চে", ভাষা বিষয়বস্তুর সঙ্গে ঠিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে নাই। "শেষের কবিতা"য় অমিত-লাবণ্য-কিটি-সিসি-লিসি যে-জগতে বিচরণ করে, সে-জগতে এই ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গি কিছু অস্বাভাবিক নয়; দীপ্ত, তির্যক, শাণিত ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গিই সেই জগতের পরিবেশটিকে সুস্পষ্ট করিয়া আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরে। কিন্তু "দুই বোন—মালঞ্চ—চার অধ্যায়ে"র জগত ত ঠিক সেই জগত নয়, কিংবা এই তিনটির মানুষগুলিও—দুই একজন ছাড়া—কেউই সেই জগতে বিচরণ করে না। জীবনধর্মের যে স্বভাব-নিষ্ঠুর প্রকাশ "দুই বোন—মালঞ্চ"র বিষয়বস্তু, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের আবেষ্টনের মধ্যে প্রেমের যে বেদনাময় প্রকাশ "চার অধ্যায়ে"র বিষয়বস্তু, সেখানে ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির এই শাণিত দীপ্তি, এই বক্র, তির্যক ও ঝলকিত গতির স্থান আছে কি? আমি এই সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নয়। তবে "চার অধ্যায়ে"র ভাষা অনেকটা সহজ ও অকৃত্রিম, এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য ঘনিষ্ঠতর একথা স্বীকার করিতেই হয়।

"দুইবোন" ১৩৩৯ সালের রচনা; "বিচিত্রা" মাসিকপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয় ধারাবাহিক ভাবে (অগ্রহায়ণ—ফাল্গুন)। পরের বৎসর শ্রাবণ মাসে "দুই বোন" সম্বন্ধে একটি পত্র "বিচিত্রা"তেই মুদ্রিত হইয়াছিল; গ্রন্থটির মর্মব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ আভাস আছে ঐ পত্রটিতে।

""দুই বোন" গল্পটি সম্বন্ধে আমার নিজের ব্যাখ্যা কিছু শুনতে চেয়েছ। গল্পের ভূমিকাতেই ভিতরের কথাটা ফাঁস করে দিয়েছি। সাধারণত মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে কেউ বা মা, কেউ বা প্রিয়া, কেউ বা দুইয়ের মিশোল। বাংলা দেশে অনেক পুরুষ আছে যারা বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত মাতৃঅঙ্কের আবহাওয়ায় সুরক্ষিত। তারা স্ত্রীর কাছে মায়ের লালনটাই উপভোগ্য বলে জানে। * * * অল্প স্ত্রীই অমন সুযোগ পায় যাতে নিজের স্বতন্ত্র রীতিতেই স্বামীর পূর্ণতা সাধন করতে পারে, সংসারকে সম্পূর্ণ আপন প্রতিভায় নূতন করে তোলে।

"আবার এমন পুরুষও নিশ্চয়ই আছে যারা আর্দ্র আদরের আবেশে আপদমস্তক আচ্ছন্ন থাকতে ভালোই বাসে না। তারা চায় যুগলের অনুষঙ্গ। তারা জানে যেখানে যথার্থ স্ত্রী, পুরুষ সেখানেই যথার্থ পৌরুষের অবকাশ পায়। * * *

"শশাঙ্ক স্ত্রীর মধ্যে নিত্য স্নেহ-সতর্ক মাকে পেয়েছিল। তাই তার অন্তর ছিল অপরিতৃপ্ত। এমন অবস্থায় ঊর্মি তার কক্ষপথে এসে পড়াতে সংঘাত লাগল, ট্র্যাজেডি ঘটলো। অপর পক্ষে অতি নির্ভর-লোলুপ মেয়ে সংসারে অনেক আছে। তারা এমন পুরুষকে চায় যারা হবে তাদের প্রাণযাত্রার মোটররথের শোফার। তারা চায় পতিগুরুকে, পদধূলির কাঙালিনী তারা। কিন্তু তার বিপরীত জাতীয় মেয়েও নিশ্চয়ই আছে যারা অতিলালন-অসহিষ্ণু পুরুষকেই চায়, যাকে পেলে তার নারীত্ব পরিপূর্ণ হয়। দৈবক্রমে ঊর্মি সেই জাতের। শুরুতেই চালককে নিয়ে গুরুকে নিয়ে তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়ে এমন এক পুরুষকে পেলে যার চিত্ত অজ্ঞাতসারে খুঁজছিল স্ত্রীকেই, যার সঙ্গে তার লীলা সম্ভব আপন জীবনের সমভূমিতেই—যে যথার্থ তার জুড়ি।

"ভাগ্যের অঘটন শোধরাতে গিয়ে সামাজিক অঘটন দারুণ হয়ে উঠলো। এই হচ্ছে ব্যাপারটা। * * *"

"রবীন্দ্র-রচনাবলী" ২১শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় ৫১৪-১৫)।

কিন্তু গল্প পড়া যখন শেষ হইল তখন মন একথা স্বীকার করিতে চাহিল না যে, শর্মিলা-শশাঙ্ক-উর্মির ত্রিকোণ প্রেমলীলা একান্তই ভাগ্যের অঘটন। যে-সমস্যা লেখক নিজের হাতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই সমস্যা তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় যে-ভাবে এই প্রণয়ত্রয়ীকে নাচাইয়াছেন তাহাকে কেবল ভাগ্যের অঘটন বলিয়া নিঃসংশয় হওয়া একটু কঠিন। তাহা ছাড়া গ্রন্থারম্ভেই লেখক নারীত্বের দুই রূপ—মাতৃরূপ ও প্রিয়ারূপ—সম্বন্ধে যে-ধারণা স্থাপন করিয়াছেন তাহাও "দুই বোন" গল্পবস্তুর সার্থক ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয় না। নারীত্বের এই দুই রূপ রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় প্রত্যয়-কল্পনা। বিভিন্ন কবিতায়, চিঠিপত্র ও নিবন্ধে তিনি এই দুই রূপের কল্পনা বিস্তারিত করিয়াছেন—প্রিয়ারূপিনী উর্বশী ও মাতৃরূপিনী লক্ষ্মী কল্যাণী। কিন্তু নারীত্বের এই দুই রূপই কি শর্মিলা ও উর্মি-চরিত্রের এবং দুই চরিত্রকে ঘিরিয়া যে 'সামাজিক অঘটন দারুণ' এবং নিষ্করুণ হইয়া দেখা দিল তাহা ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট?

গল্পবস্তুটি সোজাসুজি একটি ত্রিভুজ প্রণয়ের, যে ত্রিভুজ প্রণয় প্রাচীনতম কাল হইতে আজিকার কাল পর্যন্ত কবি ও লেখকের কল্পনাকে বারবার উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বারবার প্রণয়ত্রয়ীর জীবন সংঘাত লইয়া গল্পরচনা করিয়াছেন, এবং মোটামুটি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একজন নায়ক বা নায়িকা উদ্বাহবন্ধনবদ্ধ। 'নষ্টনীড়', "চোখের বালি" ও "ঘরে বাইরে" তাহার প্রমাণ। 'নষ্টনীড়ে' প্রবৃত্তির তাড়না সক্রিয় ভূপতির অবহেলিতা স্ত্রী চারুর চরিত্রে, "চোখের বালি"তে সে-তাড়না রূপ পাইয়াছে বিধবা বিনোদিনী চরিত্রে এবং কতকাংশে বিবাহিত মহেন্দ্র-চরিত্রেও, "ঘরে বাইরে"তে অবিবাহিত সন্দীপ ও বিবাহিতা বিমলা-চরিত্রে। "দুই বোনে"কামনায় উন্মত্ত চরিত্র শশাঙ্ক। পূর্বোক্ত গল্প তিনটিতে যাহাদের স্খলনে সামাজিক অঘটন মহতী বিনষ্টি ঘটাইতে পারিত, তাহাদের সকলেই নারী—চারু, বিনোদিনী ও বিমলা। সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মানসকন্যাদের এবং গল্পোক্ত সামাজিক পরিস্থিতিকে শেষ পর্যন্ত মহতী বিনষ্টির গহ্বর হইতে বাঁচাইয়াছেন; "দুই বোনে"ও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে স্খলনোন্মুখ চরিত্রটি পুরুষ, এবং সে-পুরুষ সংসারাভিজ্ঞ বয়স্ক পুরুষ। যৌবনোন্মেষের প্রেম-বাসনার উচ্ছৃঙ্খল উদ্দামতায় স্বাস্থ্যের লীলা স্বপ্রকাশ; তাহার মন্থনে যে আনন্দ, সৌন্দর্য ও বেদনা সৃষ্টিলাভ করে তাহার মধ্যে একটা রসের মাধুর্য আছে, তাহার বিচিত্র লীলা বিস্তারের মধ্যে সর্বনাশের ইঙ্গিত সত্ত্বেও পাঠকচিত্ত একটা বাসনামুক্তির আনন্দ লাভ করে। 'নষ্টনীড়ে', "চোখের বালি"তে এবং কতকাংশে "ঘরে-বাইরে"তে তাহা স্বতঃস্ফূর্ত: "দুই বোনে" এই আনন্দ, এই রসমাধুর্য অনুপস্থিত। বয়স্ক, সংসারাভিজ্ঞ শশাঙ্কের কামনামুক্তির মধ্যে যৌবনসুলভ স্বাস্থ্যের আনন্দোল্লাস নাই, কামনার অস্বাস্থ্যকর উন্মাদনার মধ্যে কোনও প্রকার কল্যাণবুদ্ধির সঞ্চার নাই। হয়ত না থাকাই স্বাভাবিক; তাহা লইয়া নালিশ করা চলে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে ঘটনা-বিস্তৃতি এবং হৃদয়াবেগের বিশুদ্ধ উত্তাপ প্রবৃত্তির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতাকে পাঠকচিত্তে স্বীকৃতি দান করে তাহাও যেন শশাঙ্কচরিত্রে অনুপস্থিত। তাহা ছাড়া, যে দারুণ অঘটন মহতী বিনষ্টিতে বিবর্তিত হইলে শর্মিলার সর্বনাশ হইয়া যাইত, তাহার জন্য শর্মিলার এতটুকু দায়িত্বও নাই। বলা যাইতে পারে, সংসারে ত সচরাচর তাহাই হইয়া থাকে; নিরপরাধ, নির্দায়িত্ব হইলেই ভাগ্যের অঘটন এড়ান যায় না। কিন্তু সংসারে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, সাহিত্যে তাহা ঘটান সর্বত্র সহজ নয়; যে অভাগা সমাজে সংসারে সুবিচার পায় না, কবির কাছে সুবিচার পাইবার দাবি ত

তাহারই সবচেয়ে বেশি। শর্মিলার এই দাবি "দুই বোনে" উপেক্ষিত। অবশ্য একথা সত্য, শশাঙ্ককে শর্মিলার কাছে ফিরাইয়া দিয়া লেখক শেষরক্ষা করিয়াছেন; হয়ত, ইহাই modern comedyর স্বরূপ, কিন্তু সে-স্বরূপ যাহাই হউক তাহার একটা পূর্বাপর যুক্তি চাই। যত অসাধারণই হউক শর্মিলা, সেই অসাধারণত্বের আকর্ষণে শশাঙ্ক তাহার কাছে ফিরিয়া আসে নাই; এবং তাহার চেয়েও বড় কথা, শশাঙ্কের উন্মত্ত নেশা তাহার কামনার পাত্রীর অথবা অন্য কাহারও হাতে আহত, শাসিত বা প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিজের কেন্দ্রে ফেরে নাই। এই শাসন, আঘাত বা প্রত্যাখ্যানটাই হইত যুক্তি। সেই যুক্তি অনুপস্থিত বা দুর্বল বলিয়া শশাঙ্ক যখন শর্মিলার কাছে ফিরিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবো এই রইল কথা, শুনে রাখো", তখন শর্মিলা বিশ্বাস করিল কিনা জানি না, কিন্তু পাঠকচিত্তে বিশ্বাস সঞ্চারিত হইল না। এই উক্তির পশ্চাতে দুঃখ-বেদনার কোনও অভিজ্ঞতা নাই, সত্যের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি নাই। ইহা মিলন নয়, মেলান। উর্মি তাহার শেষ পত্রে শশাঙ্ককে লিখিয়াছে "তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করে গেলুম ইতিমধ্যে কালের হাতে তা আপনিই জোড়া লাগবে।" হয়ত তাহাই লাগে, হয়ত লাগে না, তাহাতে মানুষের কোনও হাত নাই। সে যাহাই হউক, একথা বিস্তৃত যুক্তির অপেক্ষা রাখে না যে, নারীর দুই রূপ এই গল্পের প্রতিপাদ্য বস্তু নয়, এবং তাহাদ্বারা গল্পের ব্যাখ্যাও করা যায় না। 'ভাগ্যের অঘটন শোধরাইতে গিয়া সামাজিক অঘটন কি দারুণ হইয়া ওঠে' তাহা দেখানও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একান্তই একটি ত্রিভুজ প্রণয়ের গল্প রচনা করিয়াছেন এবং এই গল্পে বিবাহিত বয়স্ক পুরুষের প্রবৃত্তির উন্মাদনা নিজের জীবনে, পরিবারে ও কতক পরিমাণে সমাজেও কি আবর্ত ঘনাইয়া তোলে, আত্মবিস্মৃতি কত বিপরীত হইতে পারে, বিবাহোত্তর প্রণয়লীলা কত দুরন্ত ও নিষ্ঠুর হইতে পারে, তাহাই দেখিবার এবং দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই দেখিবার ও দেখাইবার ভঙ্গিটা সামাজিক ততটা নয়, যতটা ব্যক্তিগত। বিবাহবন্ধনোত্তর প্রণয় দাম্পত্য জীবনকে যেভাবে আঘাত করে সে-আঘাতের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গভীর, তাহার দুঃখ ও দ্বন্দ্ব অত্যন্ত জটিল, তাহার ঢেউ বহুদূরপ্রসারী; এবং তাহা ব্যক্তির জীবনকে অতিক্রম করিয়া পরিবারের সকলকে মথিত পর্যুদস্ত করিয়া সমাজের তটরেখা পর্যন্ত গিয়া স্পর্শ করে। এই ধরনের ঘটনার গভীরতর তাৎপর্য যথার্থত সামাজিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "দুইবোন" গল্পে, এবং কয়েক মাস পরে লেখা "মালঞ্চে"ও, এই বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্যের দিক হইতে এই বহুদ্বন্দ্ববিজড়িত সমস্যাটিকে দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। গল্পোক্ত ঘটনা ও চরিত্রগুলি ছোট্ট একটি পরিবারকে ঘিরিয়া কেন্দ্রীকৃত এবং সে-পরিবারও, মনে হয় যেন, কলিকাতার সম্পন্ন পল্লীর একটি সম্পন্ন পরিবার, যাহার সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের কোনও সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। পরিবারটির আত্মীয়-বন্ধু কেউ যেন কোথাও নাই, সামাজিক পরিবেশের আভাস ত দূরের কথা। এমন কি যে-দম্পতি এই গল্পের নায়ক ও নায়িকা তাহারা নিঃসন্তান; কাজেই সন্তান এই গল্পোক্ত সমস্যার মধ্যে যেটুকু জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারিত তাহাও অনুপস্থিত। যাহা একটু জটিলতা তাহার সৃষ্টি করিয়াছে নীরদ; সেই নীরদই একমাত্র পরিবার-বহির্ভূত ব্যক্তি। স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ এই সুকঠিন সমস্যাটিকে তাহার পূর্ণস্বরূপে দেখিবার ও দেখাইবার প্রয়াস করেন নাই। Modern comedyর প্রকৃতি হয়ত তাঁহার কাছে ধরা দিয়াছে, কিন্তু comedy কোন্ দিক দিয়া কি উপায়ে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করে, এবং বৃহত্তর সামাজিক জীবনের টানা-

পোড়েনের ভিতর দিয়া কিভাবে তাহা বিবর্তিত হয়, তাহা তিনি উদ্‌ঘাটিত করেন নাই। অথচ এই উদ্‌ঘাটনের উপরই নির্ভর করে পাঠকচিত্তের স্বীকৃতি।

"দুই বোন" গল্পের পরিসর অতি সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত। প্রেমের মনস্তত্ত্ব, তাহার জটিল মানসিক দ্বন্দ্বলীলাই যে-গল্পের উপজীব্য সে-গল্প আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাহা না হওয়াতে গল্পের ঘটনা ও বিবরণ অনেক জায়গায়ই অসংলগ্ন ও আকস্মিক বলিয়া মনে হয়; ইহাদের মধ্যে যুক্তি-পারম্পর্যও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই ধরনের আকস্মিকতা ও কতকাংশে অসংলগ্নতার সূত্রপাত "শেষের কবিতা"য়,কিন্তু "দুই বোনে" তাহা অত্যন্ত শিথিল এবং পীড়াদায়ক। রোগশয্যাবিলগ্ন দিদির সেবা এবং তাহার সংসারের হাল ধরিতে আসিয়াছিল ছোট বোন ঊর্মিমালা। তাহার সুযোগে শশাঙ্কর সঙ্গে ঊর্মির প্রেম জমিয়া উঠিয়াছে এত সহজে, এত আকস্মিকভাবে যে পাঠকের ধারণা ও বিশ্বাস তাহাতে পীড়িত হয়। পীড়িত বিস্ময় জাগে এই ভাবিয়া যে, শশাঙ্ক বা ঊর্মির বিবেক বলিয়া কি কিছুই ছিল না! স্বামীমাত্রধ্যানপরায়ণা, রোগশয্যাবিলগ্না স্ত্রী সম্বন্ধে শশাঙ্কর চিত্তে এতটুকু দ্বন্দ্বও কি কোথাও ছিল না! পরিবার ও সমাজ-ভাবনার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, নিজেরই চিত্তদ্বন্দ্বে সে কি এতটুকু বিচলিত কখনও হয় নাই! কি নিরুদ্বেগ নির্দ্বন্দ্ব এবং নির্দায়িত্ব সরলতায় স্বামীধ্যাননিমগ্না স্ত্রীকে দেবীর আসনে বসাইয়া শশাঙ্ক তাহার শ্যালিকা ঊর্মিকে ভালবাসা নিবেদন করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে, "তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করিনে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে"; ইহা শুধু যুক্তি ও পারম্পর্য-বিহীন নয়, ইহা নিষ্ঠুর। নার্সের হাতে মৃত্যুপথযাত্রিনী স্ত্রীকে সমর্পণ করিয়া ঊর্মিকে লইয়া মোটরে-স্টীমারে ভ্রমণ-বিলাস আত্মবিস্মৃতির চরম সন্দেহ নাই, এবং তাহা স্বীকারেও বাধা ছিল না; কিন্তু তাহা স্ত্রী-দেবীর প্রতি এতটা ভক্তির পাশে কতকটা অস্বাভাবিক বই কি, এবং আসিয়া পড়িয়াছে একটু আকস্মিক ভাবেই! এ রকম অবস্থায় মানুষের জীবনে যে আত্মবিরোধ ও বিভ্রান্তি দেখা দেয় তাহার যথেষ্ট আভাস গল্পে কোথাও নাই।

একথা স্বীকার করিতেই হয়, ঊর্মির সঙ্গে শশাঙ্কর যে-ভালবাসার বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ক্ষেত্র লেখক আগে হইতে প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই ক্ষেত্রের একদিকে শশাঙ্কর আত্ম-আবিষ্কার, আর একদিকে ঊর্মির প্রেমোন্মুখ চিত্তের স্ফুরণ। এই দুইদিকই লেখক নৈপুণ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন সন্দেহ নাই। শশাঙ্ক ছিল আত্ম-অচেতন চাকুরির আরামের মধ্যে, তাহার পৌরুষ ছিল অনাবিষ্কৃত, স্ত্রীর অতি লালনের ফলে তাহার প্রেম-বাসনা ছিল নিদ্রিত সেই স্ত্রী-ই যখন তাহাকে চাকুরির আরামের খুঁটি হইতে ছাড়াইয়া আনিল এবং কলিকাতায় আসিয়া সে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল তখন জীবনে সে প্রথম নিজেকে আবিষ্কার করিল; ব্যবসায়ে দ্রুত সাফল্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্কর পৌরুষও জাগিয়া উঠিল। এই নবজাগ্রত পৌরুষের উৎসাহ ও উদ্দীপনার মুখে আসিয়া পড়িল ঊর্মির উন্মুখ যৌবন। নীরদের সঙ্গে ঊর্মির প্রেমের বন্ধন কোথাও ছিল না; তাহাকে সে ভালবাসে নাই, কিন্তু ভালবাসার ইচ্ছাটা নীরদকে আশ্রয় করিয়া বসন্তের হাওয়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। শ্যালিকা-ভগ্নীপতির মধ্যে একটা সহজ হাস্যপরিহাসের সম্বন্ধ ত আমাদের সমাজে আছেই; তার উপর শশাঙ্ক-ঊর্মির মধ্যে একটা সহজ মিল ও অনুরাগের সম্বন্ধও ছিল। এমনাবস্থায় ঊর্মি যখন শর্মিলার ঘরে আসিয়া সংসারের হাল ধরিল তখন ঊর্মির প্রেমোন্মুখ চিত্ত এবং অন্যদিকে সদ্যসচেতন শশাঙ্কর পৌরুষ এবং স্ত্রীর অতিলালনমুক্ত

সদ্যজাত প্রেমবাসনা এ-দুয়ের মধ্যে একটা সংযোগ ঘটিতে দেখি হইল না। এ পর্যন্ত গল্পের বিবর্তন সুন্দর, কিন্তু তাহার পরেই মুশকিল। আগেই বলিয়াছি, শশাঙ্কর অন্তর্বিরোধ ও বিভ্রান্তির এতটুকু আভাস কোথাও লেখক দেন নাই। ইহা নিতান্তই আকস্মিক নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক, এবং ইহার ফলে গল্পটির রস খুব গাঢ় হইতে পারে নাই। উর্মির ক্ষেত্রেও একথা সত্য। উর্মিও শশাঙ্কর মতই বিবেকহীনা। শর্মিলা ত তাহারই দিদি, এবং সেই দিদিই মারাত্মক পীড়ায় শয্যাগত, অথচ তাহারই রোগশয্যার আড়ালে শশাঙ্কর সঙ্গে তাহার নির্দয় দুরন্ত প্রণয়লীলা চলিয়াছে অবাধে। ইহা লইয়া একবারও কি উর্মির মনে খট্‌কা কোথাও কখনও লাগে নাই? একথা যেন কিছুতেই মনের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করিতে চায় না। এইখানেই মনে হয় "দুই বোন" গল্পের দুর্বলতা।

যাহাই হউক গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে নীরদ গল্প হইতে খসিয়া পড়িল, শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহ করিয়া সে উর্মিকে মুক্তি দিল। কিন্তু এ ধরণের পরিণতি না ঘটিলেও উর্মির মুক্তির পথে নীরদের মত "প্রীগ্" বেশিদিন বাধা হইয়া থাকিতে পারিত না। গোড়ার দিকে নীরদ গল্পে একটু জটিলতা আনিয়াছে বটে, কিন্তু সে গল্পের পক্ষে অবাস্তব না হইলেও একেবারে অনিবার্য নয়, তবু স্বীকার করিতেই হয় চরিত্র হিসাবে সে স্পষ্ট, এবং তাহাকে লইয়া লেখকের পরিহাস তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল।

শশাঙ্কর প্রতি লেখকের কোনও অনুকম্পা নাই অনুরাগও নাই। সে সত্যই ভিতরে ভিতরে দুর্বল, মেরুদণ্ডবিহীন, এবং লেখকও সেই ভাবেই তাহাকে দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন। প্রচ্ছন্ন হাস্যে এবং সূক্ষ্ম ব্যঙ্গে তিনি তাহাকে স্থানে স্থানে বিদ্ধ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাহা না হইলে যখন শশাঙ্ক জানিয়া ও বুঝিয়া গিয়াছে, উর্মিকে বিবাহ করা সম্বন্ধে শর্মিলার মনে বিশেষ কোনও বাধা নাই, এমন কি তাহার আনন্দেই শর্মিলারও আনন্দ তখন সে যে পুরাতন পোর্টফোলিও ঘাটিয়া স্ত্রীর ছবি বাহির করিয়া বিলাতি দোকানে দামী ফ্যাশনে বাঁধাইয়া দেয়ালে ঝুলাইয়া নিত্য ফুলের অর্ঘ্যদান আরম্ভ করিল, এমন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গাত্মক ব্যাপার সম্ভব হইত কি?

"দুই বোন" গল্পের উজ্জ্বলতম চরিত্র শর্মিলা। রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার বলিয়াছেন, সে 'অসাধারণ', সে 'পৃথিবীর মানুষ নয়, আমাদের অনেক উপরে'। সত্যই, শর্মিলা এত 'অসাধারণ' যে বিশ্বাসের সীমা প্রায় অতিক্রম করিয়া যায়, এইখানেই শর্মিলাচরিত্রের দুর্বলতাও। শশাঙ্ক যখন দুরন্ত প্রেমের উন্মাদনায় আত্মবিস্মৃত, তখন তাহার ব্যবসায়ের কাজে নিরন্তর অবহেলা ঘটিতে আরম্ভ হইল, ভিতরে ভিতরে দুর্বল শশাঙ্কর ক্ষণস্থায়ী পৌরুষে ভাঙন ধরিল, উর্মির প্রেমে সে শক্তিমান হইতে পারিল না। প্রথম দিকে শশাঙ্কর এই উন্মাদনা শর্মিলাকে বিচলিত করিয়াছিল, কিন্তু তাহা কিছু ছোট বোনের প্রতি হিংসায় নয়, কিংবা নিজের অধিকার হারাইবার আশঙ্কায়ও ততটা নয়, বরং শশাঙ্কর কাজের ক্ষতি হইতেছে, এই ভয়ে ও ভাবনায়। উর্মিকে ডাকিয়া সে তাই তিরস্কার করিল, কিন্তু যখন দেখিল উর্মি শশাঙ্কর কাছ হইতে দূরে দূরে থাকিলে কাজের ক্ষতি আরও বেশি হয়, তখন আরও বেশি করিয়া উর্মিকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করিল। আর যাহাই হউক, উর্মি তাহার স্বামীর জীবনে যে আনন্দ আনিয়াছে সে নিজেও তাহা পারে নাই, এই ভাবনার মধ্যে শর্মিলা শান্তি না পাইলেও নিজের চিত্তের আশ্রয় খুঁজিতে চেষ্টা করিল। রোগশয্যায় এপাশ ওপাশ ফিরিতে ফিরিতে নিজেকে সে বারবার বলিতেছে, 'মরবার আগে ঐ কথাটুকু বুঝে গেলুম, আর সবই করেচি, কেবল খুশি করতে পারিনি। ভেবেছিলুম উর্মিলার মধ্যে

নিজেকেই দেখতে পাব, কিন্তু ও তো আমি নয়, ও যে সম্পূর্ণ আর এক মেয়ে।' জানালার বাহিরের দিকে তাকাইয়া সে ভাবিতেছে, 'আমার জায়গা ও নেয়নি, ওর জায়গা আমি নিতে পারবো না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।' বেদনায় সকরুণ এই উক্তি, তবু একে স্বীকার করিতে বাধে না। এর পরেও নিদারুণ দুঃখ বহন করিয়াও সে বারবার যেমন করিয়া অপার ধৈর্য ও ক্ষমায়, স্নেহ ও ভালবাসায় স্বামীর নিষ্ঠুর উন্মাদনাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, ঊর্মিকে অন্তরের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছে তাহা কিছুতেই পাঠকের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ না করিয়া পারে না! তাহা ছাড়া তাহার শুভবুদ্ধির স্থৈর্য ও কল্যাণময় নির্মলতাও খুব প্রশংসনীয়; বারবার সে তাহার প্রমাণ দিয়াছে। তাহার মহত্ত্ব এবং হৃদয়ের ঔদার্য খুব বিরল হইলেও অবিশ্বাস্য কিছু নয়। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও শশাঙ্কর ব্যবসার ভরাডুবি সে ঠেকাইতে পারিল না। এদিকে তাহার অসুখ বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং পাশে পাশেই সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্কর নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য। ব্যথায় নিষ্পেষিত অন্তর বারবার বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে, মিথ্যে, কী হবে এই খেলায়", ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ঠাকুর তুমি মিথ্যে"! এপর্যন্ত পরিষ্কার। কিন্তু তারপর মুমূর্ষু মুহূর্তে সে যখন স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "* * * ঊর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। সে আমার আপন বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরো অনেক বেশি পাবে যা আমার মধ্যে পাওনি। * * * মরবার কালেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হলো তোমাকে সুখী করতে পারলুম", তখন শর্মিলার অসাধারণত্ব প্রায় যেন বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিতে চায়। পরেও দৈবক্রমে শর্মিলা যখন বাঁচিয়া উঠিল, এবং ঊর্মি এতদিন পরে নিজের ভুল দেখিয়া শর্মিলার সংসারের পালা শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিতে চাহিল তখন,

> "দিদি এসে বললে, 'তুই যেতে পারবিনে।'
> 'সে কী কথা?'
> 'হিন্দু সমাজে বোন-সতীনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনোদিন করেনি?'
> 'ছিঃ!'
> 'লোকনিন্দা! বিধির বিধানের চেয়ে বড়ো হবে লোকের মুখের কথা!'
> শশাঙ্ককে ডাকিয়ে বললে, 'চলো আমরা যাই নেপালে। সেখানে রাজ-দরবারে তোমার কাজ পাবার কথা হয়েছিল—চেষ্টা করলেই পাবে। সে দেশে কোনো কথা উঠবে না।' "

তখন প্রশ্ন জাগে মনে, শর্মিলা কি সত্যই এত অসাধারণ, আমাদের এত উপরে! অবিশ্বাস্য আমি বলিতে চাই না, তবু মনে হয় শর্মিলা যেন আমাদের প্রতিদিনের মানব-সংসারের ধূলামাটির কেহ নয়; যে-পরিবেশের মধ্যে তাহার অধিষ্ঠান সেই পরিবেশে সে যেন অত্যন্ত বেশি অসাধারণ, এত বেশি অসাধারণ, এত বেশি যে সে সহজ বিশ্বাসকে আঘাত করে। তবু, এই গল্পে শর্মিলাই একমাত্র চরিত্র যাহা নিষ্কম্প দীপশিখার মত নির্মল ও উজ্জ্বল, স্পষ্ট ও জীবন্ত এবং যাহার প্রতি লেখক নিজে শ্রদ্ধান্বিত; "দুই বোনে" শর্মিলাই একমাত্র আকর্ষণের বস্তু। অপার করুণা, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির তুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রত্যেকটি রেখা টানিয়াছেন। শর্মিলাই শেষ পর্যন্ত পাঠকচিত্তকে গল্পের মধ্যে টানিয়া রাখে। শর্মিলার কল্যাণময় স্থির বুদ্ধিই শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ককেও স্বকেন্দ্রে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

"দুই বোনে"র কয়েকমাস পরই "মালঞ্চ" রচনা এবং একই মাসিকপত্র "বিচিত্রা"য় তাহার প্রকাশ। গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৪০'র চৈত্র মাসে। "মালঞ্চ" সম্বন্ধে বিশেষ কিছু

বলিবার নাই। ভাব ও বিষয়বস্তু উভয় দিক হইতেই "মালঞ্চ" "দুই বোনের" সগোত্রীয়, এমন কি "দুই বোনে"র পৃথক সংস্করণও বলা যাইতে পারে। দু'টিরই গল্পাংশ প্রায় এক; বিষয় যৌবনোত্তীর্ণ বয়স্ক পুরুষের চিত্তে বিবাহ-বহির্ভূত সবল প্রণয়লীলা এবং তাহারই বিচিত্র উন্মাদনা। আদিত্যর স্ত্রী নীরজা শর্মিলার মতই সন্তানহীনা এবং কঠিন রোগে শয্যা-বিলগ্না। তাহারই সুযোগে ও আড়ালে স্বামী আদিত্য যাহার সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রণয়লীলায় মাতিয়াছে সেই সরলা আদিত্যরই দূর সম্পর্কের বোন। সরলা নীরজার সংসারে আসিয়াছে উর্মিলার মতই বৌদির সেবা করিতে এবং তাহার চেয়েও বেশি, আদিত্যর বাগানের পরিচর্যা করিতে। তবে, "দুই বোনে" রবীন্দ্রনাথ শেষরক্ষা করিয়াছেন: দৈবের সাহায্যে শর্মিলাকে বাঁচাইয়াছেন, শেষ পর্যন্ত স্বামী শশাঙ্ককে স্বকেন্দ্রে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, এবং উর্মিলাকেও আত্মস্থ করিয়া দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন বিলাতে তাহার নিজের আদর্শের সেবায়। "মালঞ্চ" কিন্তু modern comedy নয়, নিষ্করুণ ট্র্যাজেডি এবং সেই ট্র্যাজেডিতে গভীর ট্র্যাজিক্ মহিমার স্পর্শ পর্যন্ত নাই, একেবারে শুষ্ক, নিষ্ঠুর, বীভৎস। তাহা ছাড়া, যদি বলি, সমাপ্তিটা একটু melodramatic তাহা হইলে খুব অন্যায় হয় কি? "মালঞ্চ" "দুই বোন" অপেক্ষা অনেক বেশি নিষ্ঠুর, নির্মম। মনে হয়, যে-কথা লেখক "দুই বোনে" বলিতে চাহিয়াছিলেন, একটা বিশেষ পরিকল্পনার মধ্যে বয়স্ক বিবাহিত পুরুষের নবীন প্রণয়োদ্‌গমে ত্রিভুজপ্রেমের সমস্যাটিকে যে-ভাবে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই গল্পে তাহা নিঃশেষে দেখা এবং দেখান হয় নাই। বোধ হয় সেই জন্যই অল্পকাল পরেই "মালঞ্চ" রচনার এবং একই ভাব ও বিষয়বস্তুকে আরও সুস্পষ্ট করিয়া নিষ্ঠুরতম, নির্মমতম শেষ পরিণতি পর্যন্ত অনুসরণ করা প্রয়োজন হইল। "দুই বোনে"র কমেডি সেই জন্য মালঞ্চের ট্র্যাজেডিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সমালোচকের পক্ষে বলা কঠিন, তবে, মনে হয়, "মালঞ্চ" বিশুদ্ধ নাটক হিসাবে রচিত হইলে হয়ত ভাল হইত; ইহার যথার্থ ট্র্যাজিক রস রূপ গ্রহণ করিতে পারিত। "মালঞ্চ" বড় গল্প বা উপন্যাস হিসাবে রচিত হওয়া সত্ত্বেও চরিত্র ও ঘটনার প্রতি লেখকের যে-অনাসক্তি নাটকের প্রাণ সেই অনাসক্তি এবং দ্রুত ঘটনা-সঞ্চরণ, গল্পোক্ত চরিত্রগুলির মুখ দিয়াই প্রায় সব কথা বলান, লেখকের নিজের ব্যাখ্যার প্রায় অনুপস্থিতি ইত্যাদি সমস্ত নাটকীয় লক্ষণ এই উপন্যাসে বর্তমান। অবশ্য, উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ "মালঞ্চ"কে নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, এবং তাহার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি এখনও বর্তমান।

"দুই বোন" আলোচনা প্রসঙ্গে যে কয়টি আপত্তির কথা আগে বলিয়াছি, "মালঞ্চ" সম্বন্ধেও আমার সে কয়টি আপত্তি সমভাবে প্রয়োজ্য। এবং বোধ হয় তাহার চেয়েও বেশি। "দুই বোনে" রবীন্দ্রনাথ শর্মিলাকে ভালবাসিয়াছেন, তাহার প্রতি তাঁহার দরদ ও শ্রদ্ধা অনস্বীকার্য, এবং ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই শর্মিলা আমাদেরও দরদ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। "মালঞ্চে" রবীন্দ্রনাথ নীরজাকে ভালবাসিতে পারেন নাই, তাহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ত নাই-ই, দয়াও নাই, অনুকম্পাও নাই; অথচ, নীরজা নিরপরাধা। যে-ঈর্ষা নীরজার চিত্তে, এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও যে-ঈর্ষা শেষ পর্যন্তও সে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, সে-ঈর্ষা নীরজার কিছু অপরাধ নয়; তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং শুধু ক্ষমা নয়, দয়া এবং অনুকম্পারও যোগ্য! সহজ মানবিক করুণার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ নীরজাকে দেখেন নাই। নীরজাকে তিনি ভাল না বাসিতে পারেন, কিন্তু নিরপেক্ষ সহজ মানবিক দৃষ্টিতে কেন তিনি তাহাকে দেখিতে ও দেখাইতে পারিলেন না,

এ দুঃখ মনকে পীড়িত করে। নীরজার বঞ্চিত জীবনকে ঘিরিয়া একটি গভীর দুঃখ সঞ্চরমাণ; সেই গভীর দুঃখের মহিমা রবীন্দ্রনাথ তাহার চরিত্রে লাগিতে দিলেন না! যে বিশুদ্ধ গভীর দুঃখ, যে মহিমাময় ট্র্যাজিক্ পরিণতি নীরজাকে আমাদের হৃদয়ের নিকটতর করিতে পারিত, রবীন্দ্রনাথ সেই নীরজাকে একটি প্রমত্তা প্রেতিনীর মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া, আমাদের চিত্তে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার সঞ্চার করিয়া তাহার উপর শেষ যবনিকা টানিয়া দিলেন, হৃদয়বান কবির হাতে বঞ্চিতা, নিরপরাধা, অনুকম্পনীয়া একটি নারীর প্রতি এই নির্মম অবিচার চিত্তে ক্ষোভের সঞ্চার না করিয়া পারে না।

দশ বৎসরের পরিপূর্ণ ও সংশয়লেশহীন সুখের ও আনন্দের দাম্পত্য জীবন কাটাইবার পর সন্তান প্রসব করিয়া নীরজা শুধু মাতৃত্ব নয়, স্বাস্থ্য ও শক্তি হইতেও বঞ্চিত হইল, সেইক্ষণ হইতে সে রোগশয্যাবিলগ্না মৃত্যুপথযাত্রিনী নারী। তাহার সেবা এবং নীরজা-আদিত্য উভয়ের বড় সাধের বাগানের কাজে সাহায্য করিবার জন্য আসিল সরলা। সরলার সঙ্গে আদিত্যর আশৈশব বন্ধুর সম্বন্ধ, ভাইবোনের সম্বন্ধ। সেই সরলা আসিল আদিত্যর আশ্রয়ে দশ বসৎর পর! একদিকে দীর্ঘ রোগভোগের প্রতিদিনের কর্মনর্মসঙ্গ হইতে দূরে নীরজা শয্যাসীমায় আবদ্ধ; অন্যদিকে সংসারের, বিশেষভাবে বাগানের কাজ উপলক্ষে সরলার সঙ্গে আদিত্যর অবাধ মেলামেশার সুযোগ। এই সুযোগে ধীরে ধীরে উভয়ের পুরাতন বন্ধুত্ব গাঢ়তর হইয়া উঠিল, এবং ক্রমশ নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। বিছনায় শুইয়া শুইয়াও নীরজার হৃৎপদ্মের ডাঁটায় যেন টান পড়িল, তাহার "মনের মধ্যে যে-রস ছিল মিষ্ট আজ কেন সে হয়ে গেল কটু; যেমন আজকালকার দুর্বল শরীরটা ওর অপরিচিত, তেমনি এখানকার তীব্র নীরস স্বভাবটাও ওর চেনা স্বভাব নয়; সে-স্বভাবে কোনো দাক্ষিণ্য নেই। এক একবার এই দারিদ্র্য ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লজ্জা জাগে মনে, তবু কোনো মতে সামলাতে পারে না।" কি করিয়াই বা পারিবে? দশ বৎসর ধরিয়া স্বামীকে অজস্র অপরিমিত ভালবাসা সে দিয়াছে এবং স্বামীর কাছ হইতে পাইয়াছে। আজ দশ বৎসর পর সেই স্বামীর ক্রমবর্ধমান ঔদাসীন্য এবং নিজের আসনে অন্যের অভিষেকের চেষ্টা—এই ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যময় ভবিষ্যতের আভাসে নীরজার চিত্তে দাক্ষিণ্যের স্রোত শুকাইয়া নীরস হইয়া যাওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। আজ তাহার সব কিছুতেই ভয়, সেদিন আর নাই, মনে সে আর জোর পায় না। সরলা সম্বন্ধে তাহার বর্ধমান ঈর্ষা সে আদিত্যর কাছেও গোপন করিল না, সরলার কাছেও নয়; নানা সূত্রে তাহার মনের দুর্বলতা উভয়ের কাছেই প্রকাশ পাইয়া গেল। যে-কথা ছিল চেতনার গভীরে নীরজার ভাষায় ও ভঙ্গিতে তাহা ব্যক্ত হইবামাত্র আদিত্য ও সরলা সে-সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আবিষ্কার করিল, দু'জন দু'জনার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, আর ফিরিবার পথ নাই। তবু, অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত কেহই এড়াইতে পারিল না। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সরলার ক্ষেত্রে যদিও খানিকটা বিবেকদংশনজাত, আদিত্যর ক্ষেত্রে সে-রকম কিছু প্রায় অনুপস্থিত। সরলার মধ্যে একটা পশ্চাদাকর্ষণের আভাস প্রথম দিকে একটু আছে, কিন্তু আদিত্যর বিচার-বিবেচনা যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তটাই একান্ত সাংসারিক, অপায়-উপায়বুদ্ধিজাত। অথচ অন্যদিকে, দূর সম্পর্কীয় দেবর রমেনের অবতারণা করা হইয়াছে গল্পের মধ্যে নীরজাকে শান্ত করাইবার জন্য, তাহার মনের গ্রন্থি আলগা করাইবার জন্য, এবং পরে সরলার জেলে যাইবার সুবিধার জন্য। আভাস আছে গল্পে যে, এই রমেন সরলার পাণিপ্রার্থী, কিন্তু আভাস মাত্রই; কারণ, আগাগোড়া রমেনের

আচারে-ব্যবহারে কোথাও তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। সরলার সঙ্গে এবং তাহার সম্বন্ধে রমেনের কথাবার্তা আগাগোড়াই একটা হালকা সুরে বাঁধা। বিশেষত, সরলা সম্বন্ধে আদিত্যর মোহকে সে যেভাবে প্রশ্রয় দিয়াছে এবং বারবার নীরজাকে অকৃপণ দাক্ষিণ্যের উপদেশ দিয়াছে তাহা একান্তই পাণিপ্রার্থীর আচরণের বিপরীত। বস্তুত "মালঞ্চ"-গল্পে রমেন অত্যন্ত অস্পষ্ট চরিত্র, সে গ্রন্থি আল্‌গা করিবার যন্ত্র মাত্র। তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব সর্বত্রই অপরিস্ফুট; প্রসঙ্গান্তর হইলেও বলিয়া রাখা চলে যে, ক্ষুদ্র চরিত্রগুলির মধ্যে হলা মালি ও রোশনির চরিত্র দুইটি স্পষ্ট ও জীবন্ত।

রমেনের উপদেশেই হউক অথবা অন্তরের জ্বালা হইতে মুক্তি কামনায়ই হউক, নীরজা একাধিকবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে অকৃপণ হইবার জন্য, দাক্ষিণ্যে মুক্তহস্ত হইয়া সরলাকে স্বীকার করিবার জন্য। তাহার জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত মর্মান্তিক। প্রথমবারে যখন সে অকৃতকার্য হইল তখন পর্যন্ত আদিত্য ও সরলার আচরণের মর্ম বিশ্লেষণও স্পষ্ট। কিন্তু তাহার পর, যাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, প্রায় অমানুষিক বলিলেই চলে, তাহা এই দুইজনের এবং রমেনের পরবর্তী আচরণ। দুঃসহ ও অমানুষিক মনে হয় রমেন যখন শয্যাবিলগ্না নীরজাকে বড় বড় উপদেশ দেয় দাক্ষিণ্যের মহিমা সম্বন্ধে, যখন সে বলে, "যা নিজে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পারো না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? * * * মিনতি করে বলছি তোমার সারাজীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষ মুহূর্তে কৃপণ করে যেয়ো না।" ভাবিলে অবাক হইতে হয়, নীরজাকে রমেন এমন দাক্ষিণ্যে উৎসাহিত করিতেছে যে-দাক্ষিণ্যের ফল সবটা না হউক, অধিকাংশই ভোগ করিবে স্বামী আদিত্য নয়, সরলা; এবং বলিতেছে এমন লোককে যে তাহার সুদীর্ঘ দশ বৎসরের ভালবাসার সঙ্গী স্বামীর জীবন হইতে নির্বাসিত হইতে চলিয়াছে। আদিত্য নিজেও থাকিয়া থাকিয়া নীরজাকে ইঙ্গিত করিতেছে তাহার হৃদয়ের কৃপণতা এবং অনৌদার্যের প্রতি! যেন অপরাধ যাহা কিছু সবই নীরজার, অথচ এদিকে যে নীরজার অন্তর খরদাহে তপ্তবালুকাময় মরুভূমির মত পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, কেহ তাহার জন্য দয়া ও অনুকম্পা বোধ করিতেছে না। সকলে মিলিয়া তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া বসিয়া আছে। গল্প যতই আগাইয়া চলিয়াছে এই তিনজনের নিষ্ঠুর অমানুষিক আচরণ ততই আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার জানাইয়া দিয়াছেন নীরজার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে, বেশিদিন সে আর পৃথিবীর আলো দেখিবে না। স্থিরবুদ্ধি দক্ষ হিসাবীর মেজাজে সরলা অস্থির আদিত্যকে বুঝাইতেছে। "* * * শুনেইছ ডাক্তার বলেছেন বেশিদিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর জন্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিও না ওঁর জীবনে। * * * আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ ক'টা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে আমি এসেছিলাম ওঁর সৌভাগ্যের ভরাঘট ভেঙে দেবার জন্যে।" এ কি দয়া না নিষ্ঠুরতার চরম? এর চেয়ে মানবিক হইত সরলা যদি জোর করিয়া নীরজার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নামিয়া পড়িত! অন্যদিকে রমেন একটু আগেই আদিত্যকে বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছে "* * * বৌদিদির যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর ক'টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি করো না। বৌদি যা বলতে চান শোনো, তার উপরে তোমারো যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।" অর্থাৎ, তুমি আর ক'টা দিন ধৈর্য

ধরিয়া থাক, তারপরই তুমি বন্ধন হইতে মুক্ত! গল্পের শেষ দৃশ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম আচরণ আদিত্যর নিজের। অন্তিম শয্যায় শুইয়া নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে নীরজা আদিত্যর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল

"একেবারেই থাকব না, কিছুই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি ত অনেক বই পড়েছ, বলো না আমাকে সত্যি করে।"

"যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর! যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি, আর এগোয়নি।"

"বলো না তুমি কী মনে করো! একটুও থাকব না? এতটুকুও না?"

"এখন আছি এটাই যদি সম্ভব হয়, তখন থাকব সেও সম্ভব।"

কি শুষ্ক, নীরস, শীতল, নির্মল, উত্তাপলেশহীন, মনুষ্যধর্মবোধহীন আদিত্যর কণ্ঠস্বর, কথা বলিবার ভঙ্গি! বলা যাইতে পারে, আদিত্যর মনে নীরজার সম্বন্ধে ভালবাসার লেশমাত্র অবশিষ্ট নাই; কাজেই সে যে আচরণ করিয়াছে, যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কথা বলিয়াছে তাহাই সত্যাচরণের ভাষা ও ভঙ্গি। কিন্তু এই সত্যাচরণ মনুষ্যধর্মবোধবহির্ভূত আচরণ, এবং সেই হেতু মিথ্যা; মৃত্যুর দুয়ারে বসিয়া এই নিষ্ঠুর নির্মম আচরণ একান্তই অমানুষিক! তবু, অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার আগে নীরজা একবার প্রাণপণ শেষ চেষ্টা করিল অকৃপণ হইতে, তাহার সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেউলিয়া হইতে 'সরলাকে না দেখে যেতে পারবো না! ভালো হবে না তাতে। আশীর্বাদ করবো তাকে। শেষ আশীর্বাদ। * * * কৃপণের মতো মরবো না। * * * দেবো দেবো, সব দেবো।' কিন্তু পারিল না। সরলা আসিয়া পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল!

"পা দ্রুত আপনি গেল সরে। ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।' বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে—চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল, বললে 'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব থাকব।' হঠাৎ ঢিলে সেমিজপরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, 'পালা পালা পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত!' বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।"

এ কি বীভৎস হৃদয়হীন নির্মম পরিণতি নিরপরাধ নীরজার! কিন্তু সে-কথা ত "মালঞ্চ"-আলোচনার প্রারম্ভেই বলিয়াছি; পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। অন্যদিকে আদিত্য এবং সরলার প্রতিও পাঠকের মন প্রসন্ন হয় না। তাহা ছাড়া শেষদৃশ্যের আগের দৃশ্যে সরলার রাজনৈতিক অপরাধে জেলে যাওয়ার প্রসঙ্গটাও অবান্তর। কিছুটা কাল সরলার অনুপস্থিতি গল্পের দাবিতে প্রয়োজন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা জেলে পাঠাইয়া কেন? সরলার রাষ্ট্রীয় কর্মে কোন রুচি ও উৎসাহ ছিল, এমন কোনও আভাস ত আগে লেখক আমাদের দেন নাই। পাঠকের মন ত তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ একটা পড়িয়া পাওয়া সুযোগের কথা সরলার মনে হইবে কেন? কিন্তু সকল বিচার-বিবেচনা ছাড়াইয়া উঠে নীরজার প্রতি লেখকের অবিচার; এ অবিচার বড় নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক! এক একবার প্রশ্ন উঠে মনে, রবীন্দ্রনাথ নীরজার ক্ষেত্রে কি আপন প্রকৃতির বিরুদ্ধেই লেখনী চালনা করেন নাই; নিজের প্রকৃতি যাহা চাহিয়াছে তাহাকে সবলে দুইপাশে ঠেলিয়া রাখিবেন এই পণ করিয়াই নির্মম হস্তে আদিত্য-সরলার নিষ্করুণ মোহের নির্মম স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন নাই?

"চার অধ্যায়" রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস, রচনাকাল ১৩৪১'র জ্যৈষ্ঠমাস, প্রথম

প্রকাশিত হয় ঐ বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে। বাংলাদেশে তখন বৈপ্লবিক বিভীষিকাপন্থার তৃতীয় পর্ব চলিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে সরকারী দমননীতির পরিপূর্ণ প্রতাপ। একদিকে দেশব্যাপী বৈপ্লবিক উন্মন্থন, সমগ্র দেশে একটা ভয়ত্রাসকম্পিত রাত্রির সঞ্চরণ ও অন্যদিকে অসংখ্য নিষ্কাম নির্ভীক প্রাণের আত্ম-বলিদান অথবা সুদীর্ঘ কারাযন্ত্রণা। এই সব প্রাণের প্রতি দেশের সচেতন জনসাধারণের একটা সুগভীর ও শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তাহাদের কর্মপন্থায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসের নির্ভরতা নাই। সরকারের হাতে তাহাদের পীড়ন ও লাঞ্ছনায় শিক্ষিত সচেতন দেশবাসী ক্ষুব্ধ, কিন্তু প্রকাশ্য রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাহাদের কর্মপন্থা নিন্দিত। ব্যক্তি হিসাবে তাহাদের প্রতি যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা দেশবাসীর চিত্তে আছে তাহা কোথাও মুখর হইয়া উঠিবার উপায় ত নাই-ই, বরং তাহার সঙ্গে সর্বত্র গভীর দুঃখ, বিস্ময় ও ক্ষোভ মিশ্রিত হইয়া সচেতন দেশমানসে একটা মূঢ় ও নিষ্ফল উত্তাপের সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছে। চিত্তের এই পীড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর নূতন কিছু অভিজ্ঞতা নয়, ১৩১০-১২ সাল হইতেই এই ধরনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার পরিচয়, এবং ১৩৮০-৪২ পর্যন্তও এই পীড়া হইতে সে আপনাকে একেবারে নিঃশেষে মুক্ত করিতে পারে নাই। বাঙালীর এই মানসিক পটভূমিকার সম্মুখে "চার অধ্যায়ে"র স্থাপনা।

বৈপ্লবিক বিভীষিকাপন্থীদের কর্মপন্থা সম্বন্ধে শিক্ষিত জনসাধারণের জ্ঞান স্বল্প, মানস এবং আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান স্বল্পতর। সরকারী রিপোর্ট, কর্মীদের রচিত স্বল্প কয়েকটি গ্রন্থ এবং কর্মীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলাপ-আলোচনা এই জ্ঞান বিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নানা কারণে কি সরকার, কি মুষ্টিমেয় কর্মী উভয়েই এ সম্বন্ধে স্বল্পবাক্ থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন। জ্ঞান যেখানে স্বল্প এবং কর্মপন্থা গোপন সেখানে কর্ম ও কর্মীদের আশ্রয় করিয়া সচেতন মানসে একটা রোম্যান্টিক অর্ধবাস্তব ও অর্ধকল্পনার রাজ্য গড়িয়া উঠা কিছু বিচিত্র নয়। এই অবস্থাতেই বাস্তব ও কল্পনার অতিভাষণ মুখর হইয়া উঠে, কর্মীদের মানস সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট কুয়াশা চিত্তে বিস্তৃতি লাভ করে, একদিকে অত্যুক্তি অন্যদিকে অবিচারের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। বৈপ্লবিক বিভীষিকাপন্থা বাংলা-সাহিত্যের যে দুই চারিটি গল্প-উপন্যাসের আশ্রয় তাহার প্রত্যেকটিতেই ইহার আভাস কম বেশি পরিমাণে উপস্থিত। সেই হেতু "চার অধ্যায়ে"র আলোচনায় এ-প্রসঙ্গের উত্থাপন অনিবার্য।

বিভীষিকাপন্থায় যে উপপ্লবের তৃতীয় পর্ব "চার অধ্যায়" গল্পের আশ্রয় তাহারই প্রথম পর্বের অন্যতম নায়ক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ উপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত 'আভাস' যোজনা করিয়াছিলেন; সেই 'আভাসে'র মধ্যে গ্রন্থ-লেখকের মনের একটা ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িয়াছিল, এবং গল্পের মধ্যেও সেই ইঙ্গিতের খানিকটা ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইয়াছিল। উপাধ্যায় মহাশয় যখন Twentieth Century মাসিকের সম্পাদক তখন "নৈবেদ্য"-গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে কবির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়।

"তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক,—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।"

পরে বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে

"সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠলো তারি মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন! স্বয়ং বের করলেন সন্ধ্যা কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার

সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এত বড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল। • • • নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগলো! সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোর তেতালার ঘরে একলা বসেছিলাম, হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাট পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।' এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।

এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা।
উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।"

পাঠকের তরফ হইতে এই 'আভাস' সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা সাময়িক পত্রস্থ হইয়াছিল, এবং কিছু কিছু ব্যক্তিগতভাবেও কবির গোচর করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল, উপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গত; কি অর্থে তিনি তাঁহার অর্থপূর্ণ উক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, আজ তাহা জানিবার উপায় নাই। সেই হেতু, উপন্যাস-প্রসঙ্গে উপাধ্যায়-প্রসঙ্গের 'আভাস' যোজনা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তাহা ছাড়া, বৈপ্লবিক বিভীষিকাপন্থায় তিনি কতটুকু অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কতটুকু কোন্ উপায়ে ছিল তাঁহার সমর্থন, তাহা আজও সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই, কোনও দিন যাইবে কিনা তাহাও যুক্তিতর্কের বিষয়। কাজেই, এভাবে তাঁহার নামকে এই পন্থার সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া জড়ান, তাহাও খুব সমীচীন হয় নাই। দ্বিতীয়ত, অনেক বিভীষিকাপন্থী মনে করিয়াছিলেন, 'আভাসে' উল্লিখিত 'পতনে'র ইঙ্গিতের মধ্যে এবং অতীন চরিত্রের ব্যঞ্জনার মধ্যে কর্মীদেরও পতন ও স্বভাবধর্ম হইতে স্খলনের ইঙ্গিত নিহিত আছে। অনেকের তাহা রুচিকর হয় নাই; তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন এই ইঙ্গিত তাঁহাদের প্রতি অবিচার। এইসব আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কিছু মন্তব্য করিয়াছিলেন। মন্তব্যের মর্ম এই যে, উপাধ্যায়-প্রসঙ্গের সঙ্গে উপন্যাস-প্রসঙ্গের কোন অনিবার্য যোগ মনের পশ্চাতে রাখিয়া কবি "চার অধ্যায়" রচনা করেন নাই; উপাধ্যায়-প্রসঙ্গের উল্লেখ গ্রন্থের অনুলেখ হিসাবে। স্ব-ভাবের এবং স্ব-ধর্মের প্রতিকূল আচরণের মধ্যে গ্লানি ও দুঃখের বীজ নিহিত থাকে, স্ব-ধর্মের পীড়নে মানুষের গভীরতর চিত্ত পীড়িত হয়, ট্র্যাজেডি অনিবার্য হইয়া উঠে, এই অর্থেই উপাধ্যায় মহাশয়ের 'পতন' বোধগোচর এবং তাহারই ইঙ্গিত "চার অধ্যায়" উপন্যাসে। এই ইঙ্গিতটুকু দিবার জন্যই লেখক বৈপ্লবিক বিভীষিকা পন্থা ও তাহার কর্মীদের গল্পের আশ্রয় বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহারা উপলক্ষ মাত্র। পথ বা সেই পথের কর্মীদের ভাল কি মন্দ সমালোচনা "চার অধ্যায়ের" উদ্দেশ্য নয়, এবং সেই হিসাবে গ্রন্থটি বিচার্যও নয়। বিভীষিকাপন্থায় বিপ্লবের দাবি প্রেম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবি ও আদর্শকে কি ভাবে পীড়িত ও সংকুচিত করে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে কি করিয়া স্ব-ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ভয়াবহ পরধর্মের দারুণ দুঃখ ও দুর্গতির মধ্যে টানিয়া উভয় ধর্মেরই পরাজয় ঘটায়, "চার অধ্যায়ে" তাহারই স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং এই হিসাবেই উপন্যাসটি বিচার্য। এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সংস্করণে 'আভাস'টি গ্রন্থ হইতে বাদ দিয়া দিলেন, এবং এখন কোনও সংস্করণে আর তাহা দেখা যায় না।

'আভাস'টি গ্রন্থ হইতে বাদ দেওয়া ভালই হইয়াছে। নানা কারণে উপাধ্যায়-প্রসঙ্গটি প্রথম হইতেই গ্রন্থে উল্লিখিত না হইলেই বোধ হয় ভাল হইত! অবশ্য উপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিলিপির নিজস্ব মূল্য আছে, কিন্তু তাহার স্থান এই গ্রন্থ নয়, এবং তাহা

সাহিত্যিক কারণেই নয়। দলের নায়ক ইন্দ্রনাথ হইলেও এই গল্পের নায়ক অতীন, এবং এই অতীন-চরিত্রের বিবর্তনে একথা স্পষ্ট যে, সে স্ব-ভাব ভ্রষ্ট, স্ব-ধর্ম বিচ্যুত, সে মনে করে তাহার আত্মা নিঃসংশয়ে পরাভব স্বীকার করিয়াছে পরধর্মের কাছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অতীন যে-পথে নামিয়াছিল সে-পথ হইতে ফিরিতে পারে নাই, কারণ তখন 'কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না'। উপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। কিন্তু অতীন-চরিত্রের পশ্চাতে লেখকের যে-যুক্তি, পাঠকের দাবি সর্বদাই এই যে, সেই যুক্তি আপন সমর্থন অনিবার্যভাবে আপনই বহন করিবে গল্পের ধারা বাহিয়া, গল্পের বাহির হইতে অন্যতর ব্যক্তি বা ঘটনার সমর্থনের প্রয়োজন হইবে কেন? প্রয়োজন হইবে কেন উপাধ্যায়-প্রসঙ্গের উল্লেখ এবং উল্লেখ শেষে বলা, "উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখ-যোগ্য"? এই সাহিত্যিক কারণেই প্রসঙ্গটি অবাস্তব। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, লেখক অতীন চরিত্রের যুক্তির মধ্যে আপন মনের যুক্তি ও সমর্থন অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং মনে হয়, পাছে পাঠকচিত্তে এই যুক্তি ও সমর্থন স্বীকৃত না হয় এই আশঙ্কায় অতি নিকটবর্তী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে উপাধ্যায় মহাশয়ের নজির উদ্ধার করিয়াছেন। এই কৌশল দুর্বল এবং অকারণ।

নায়ক অতীনের চরিত্র লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। লেখকের কাছে পাঠকের একটা মৌলিক দাবি এই যে, যে-বস্তুভূমির উপর তাঁহার গল্পের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় সেই বস্তুভূমিকে লেখক তাহার যথার্থ স্বরূপে, তাহার সামগ্রিক রূপে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। "চার অধ্যায়ে" এই বস্তুভূমির যথার্থ বাস্তব রূপ যেমন উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, আমার মনে হয়, তেমনই দেখান হয় নাই তাহার সামগ্রিক রূপ। বৈপ্লবিক বিভীষিকাপন্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও অপরিপূর্ণতাই বোধ হয় তাহার কারণ, এবং তাহা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। অতীন আগুন লইয়া খেলিতে নামিয়াছিল আগুনের টানে নয়, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তি কামনায়ও নয়, এলালতার চোখের আহ্বানে, দুর্নিবার প্রাণের আকর্ষণে। তারপর এলালতা নিজের হাতে লইল অতীনকে মানুষ করিবার মহৎ দায়িত্ব, যে এলালতা আগেই ইন্দ্রনাথকে আশ্রয় করিয়া বৈপ্লবিক বিভীষিকাপন্থার রুদ্র গম্ভীর আহ্বানে ঘরছাড়া হইয়াছে। এলার চোখের টানে প্রাণের আহ্বানে ধীরে ধীরে অতীনের গভীর পরিচয় হইল এই পথের সঙ্গে; ইহার মহত্ত্বের দিক সৌন্দর্যের দিক ত্যাগের দিক সে যেমন দেখিল সঙ্গে সঙ্গে তেমনই দেখিবার সুযোগ ঘটিল ইহার ভিতরকার নীচতা ও মিথ্যাচরণ, চক্রান্ত ও চরবৃত্তি, অবিশ্বাস ও অন্তরের দুর্গতি। একদিন ধীরে ধীরে ধরা পড়িল, তাহার স্বভাবের সঙ্গে স্ব-ধর্মের সঙ্গে ঘোরতর গভীরতর বিরোধ তাহার পথের, আবিষ্কার করিল পরাভবের শেষ সীমায় সে প্রায় আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে। "পরাভবেরও মূল্য আছে, কিন্তু আত্মার পরাভবের নয়, যে-পরাভব টেনে আনলো গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই, অন্ত নেই * * * এই গর্তর ভিতরকার কুশ্রী জগতটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারবোনা যাতে পৃথিবীতে কোনো বড় কাজ করতে পারা যায় *** দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশব গর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে উঠছে—এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুরঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ উদ্ধার চেষ্টার চেয়ে সেটা হোতো চিরকালের বড়ো কথা।" বেশ বুঝা যায়, অতীনের মুখ

দিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথেরই কথা শুনিতেছি। তবু, অতীন চরিত্রের বিবর্তন যেভাবে তিনি দেখাইয়াছেন, ঘটনার ধারা ও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া তাহা কিছু অসম্ভব নয়, তাহা লইয়া আপত্তিরও কিছু নাই। অতীনের যুক্তি ক্ষীণপ্রাণ দুর্বলের যুক্তিও নয়, রুদ্রপথের বিভীষিকা এড়াইবার যুক্তিও নয়; কারণ মোহমুক্তির পর এলার অনুরোধেও সে তাহার আচরিত পথ পরিত্যাগ করে নাই, বলিয়াছে, "আর কি ছাড়তে পারি? তখন যে শাস্তির নিষ্ঠুর জাল সম্পূর্ণ জড়িয়ে এসেছে ওদের চারিদিকে। ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্মান্তিক বেদনা, সেই জন্যেই রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারিনে; * * সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে * * কিন্তু অন্তত আমাদের ক'জনের জন্যে এ-যাত্রায় সে-ক্ষেত্রের পথ বন্ধ। * * * অজায়গায় যদি এসে পড়ে থাকি, সেখানকারও দায়িত্ব আছে শেষ পর্যন্ত।" এইখানেই অতীনের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার যুক্তির সত্যতা যে মনুষ্যত্বের পরীক্ষায় সে যাচাই করিয়া লইয়াছে তাহার প্রমাণও দিয়াছে। এলা কিন্তু এই মনুষ্যত্বের পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাহার জীবনের স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্মের পরিচয় পায় নাই। তাহার মোহমুক্তি ঘটিয়াছে, দৃষ্টি খুলিয়াছে অতীনের প্রেমের আলোকে, অতীনের বুক নিংড়ান সত্যের যুক্তির স্পর্শে। পরধর্মের বেদনায় অতীনের মুখে যে স্বচ্ছ বাণী সত্যের রূপ ধরিয়া প্রেমের রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই আলোকে সে বুঝিয়াছে, যে-পথে তাহার দুর্গম যাত্রা সে-পথ অতীনের পথ যেমন নয়, তেমনই তাহার নিজের পথও নয়। আহত কণ্ঠে বলিয়াছে, "ফিরে এসো অন্ত। এত বছর ধরে যে বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম তার ভিত তুমি ভেঙে দিয়েছ। আজ আছি ভেসে-চলা ভাঙা নৌকা আঁকড়িয়ে। আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাও।" বারবার যখন এলা সঙ্গিনী হইতে চাহিয়াছে, অতীন বলিয়াছে, "লোভ দেখিয়োনা, এলা। অনেকবার বলেছি আমার পথ তোমার নয়।" এলা জবাব দিয়াছে, "তবে সে পথ তোমারো নয়, ফিরে এসো, ফিরে এসো।" এলার এই জানা তাহার স্ব-ধর্মকে জানার পরিচয় নয়, অতীনের প্রতি তাহার প্রেমের পরিচয়। কিন্তু সে যাহাই হউক, অতীন-চরিত্রের বিবর্তনের মত এলা-চরিত্রের বিবর্তনও স্বাভাবিক, এবং মনস্তত্ত্বের দিক হইতে সম্পূর্ণ যুক্তিবহ, যদিও এলার ক্ষেত্রে পথের মোহমুক্তিটা একটু যেন আকস্মিক। যে-বিশ্বাসের মধ্যে সে বহু বৎসর বাসা বাঁধিয়াছিল তাহার ভিত যখন ভাঙ্গিল, ভাঙ্গিল যেন অত্যন্ত সহসা, তৃতীয় অধ্যায়ে একঘণ্টা অতীনের সঙ্গে কথাবার্তায়। এই পরিণতির গতিটা আর একটু স্তিমিত তালে হইলে বোধ হয় ভাল হইত।

এই অতীন-এলা সংবাদে অতীনের যুক্তি সত্য কি মিথ্যা সে-প্রশ্ন সাহিত্য-বিচারের অন্তর্গত নয়; কিন্তু যে-বস্তুভূমির উপর এলা-অতীনের প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি, সেই ভূমি ও পরিবেশে তাহাদের সত্যরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে কিনা, এ-প্রশ্ন এড়ান যায় না। আমার মনে হয় তাহা হয় নাই। অতীন একবার এলাকে বলিয়াছিল, 'দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে তুমি রোম্যান্টিক'। একথা অতীন সম্বন্ধেও সমান প্রয়োজ্য, সে-ও দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে কম রোম্যান্টিক নয়, বরং বলা যাইতে পারে যে একেবারে জন্ম-রোম্যান্টিক। এলার প্রাণের টানে বৈপ্লবিক অঘোরপন্থার সত্য বস্তুঘনিষ্ঠ পরিচয় লইবার সুযোগই প্রথম দিকটায় তাহার ঘটে নাই; রোম্যান্টিক মন লইয়াই সে এই জীবনপথকে দেখিয়াছিল। সে যখন এলাকে বলিয়াছিল, "দেশের সাধনা আর তোমার সাধনা এক হয়েছে বলেই দেশ এর মধ্যে আছে", তখন সে তাহার একান্ত রোম্যান্টিক মনেরই পরিচয় দিয়াছে। এই

জন্মেই বৈপ্লবিক অঘোরপন্থার সত্য পরিচয়ও সে লইতে পারে নাই। পরে অবশ্য এবিষয়ে তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ ঘটিয়াছিল, এবং সে-অভিজ্ঞতাই তাহাকে বলিয়াছিল, স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্ম হইতে তাহার বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। কিন্তু সে-দায়িত্ব বা অপরাধ ত তাহার নিজের, এবং তাহার শাস্তিও সে নিজেই লইয়াছে। এই পন্থার যাহারা যথার্থ পথিক তাহারা কিন্তু অতীনের জীবন-দৃষ্টিতে এই পথকে দেখে নাই; অন্যতর দৃষ্টিতে তাহারা দেখিয়াছে, অন্যতর যুক্তিতে তাহাদের কর্ম ও চিন্তার সমর্থন খুঁজিয়াছে। গীতার নিরাসক্ত কর্মযোগের পাঠ তাহারা লইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারা নিজেরা নিরাসক্ত কর্মযোগী ছিল না। দেশের স্বাধীনতা ছিল তাহাদের সবচেয়ে বড় কামনা, এবং সেই কামনার আসক্তি তাহাদের অন্য সকল আসক্তিকে খর্ব করিয়াছিল, কর্মই ছিল তাহাদের যোগ কিন্তু সে-কর্ম নিরাসক্ত নয়। তাহাদের পন্থা এবং পন্থার সঙ্গে উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ লইয়া বিতর্কের অবকাশ ছিল, আজও আছে, তাহাদের যুক্তিও হয়ত অবৈজ্ঞানিক এবং সেইহেতু মিথ্যা; কিন্তু অতীন যে-যুক্তি দিয়াছে তাহা অতীনের ক্ষেত্রে সত্য হইলেও সাধারণের হয়ত নয়, স্ব-ধর্মী অঘোরপন্থীর ক্ষেত্রে ত নয়ই। অর্থাৎ, অতীনের দেওয়া পরিচয় কিংবা এলার ভিতর দিয়া পাওয়া পরিচয় অঘোরপন্থীর যথার্থ পরিচয় নয়। এলার মনেও ত সংশয়ের দোলা লাগিয়াছিল, কিন্তু লাগিবার পূর্বেই অতীনের প্রতি আকর্ষণে তাহার চিত্তের ভাঁটায় টান পড়িয়াছিল, দৃষ্টি আর স্বচ্ছ থাকে নাই। ইন্দ্রনাথেরও একটা পরিচয় আছে ঘটনাস্রোতের মধ্যে, কিন্তু সে-পরিচয় যেন কতকটা রোম্যান্টিক। যে নির্মম নিরাসক্ত ইন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরিচয় ঘটাইয়াছেন সে ইন্দ্রনাথে যেন অনেকটা অতিমানবতার স্পর্শ লাগিয়াছে—সমস্ত সমস্যারই শেষ যেন সে দেখিয়া রাখিয়াছে, যুক্তিতে সে কাহারও কাছে হার মানে না, কোনও প্রশ্ন কোনও জিজ্ঞাসা নাই তাহার মনে, দুঃখ নাই, রাগ নাই, মোহ নাই, হারজিতের ভাবনা নাই। যতবড় অঘোর-পন্থীই হউক, সে কি এত বড় মানুষ! এক মুহূর্তের দুর্বলতা কি তাহার থাকিতে নাই? ইন্দ্রনাথ বলিয়াছে গীতার কথা, 'কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন'। আগাগোড়া সে 'ইম্‌পার্সোন্যাল'। কানাইকে সে বলিয়াছে,

* * * "আমার মনে কোনো অন্ধ বিশ্বাস নেই কানাই। হারজিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। প্রকাণ্ড কর্মের ক্ষেত্রে আমি কর্তা, এইখানেই আমাকে মানায় বলেই আমি আছি,—এখানে হারও বড়ো, জিতও বড়ো। * * * মায়া দিয়ে ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে ডাকিনি কাউকে। ডাক দিই অসাধ্যের মধ্যে, ফলের জন্যে নয়, বীর্যপ্রমাণের জন্যে। আমার স্বভাবটা ইম্‌পার্সোন্যাল। যা অনিবার্য তা অক্ষুব্ধ মনে স্বীকার করে নিতে পারি। * * * বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ মন নিয়ে মেনে নিই যার মরণদশা সে মরবেই। * * * দেশের চরম আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না, আমি তারও অনেক ঊর্ধ্বে—আত্মার অবসাদ ঘটতে দেব না মরবার সমস্ত লক্ষণ দেখেও।"

এই ইন্দ্রনাথও রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে দেখা ইন্দ্রনাথ। রাষ্ট্রবিপ্লবী অঘোরপন্থী নায়ক যত বড় নায়কই হউন না কেন তাহাদের কাহারও উপরই 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতধী মুনি'র অতিমানবতা আরোপ করা করা চলে না। বস্তুত আমাদের দেশের অঘোরপন্থীর ইতিহাসে সে-পরিচয় নাই। ইন্দ্রনাথের এই অতি-মানবতার পরিচয়ও সেইজন্য অঘোরপন্থার বস্তুঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়।

বস্তুনিষ্ঠতার অভাবের পরিচয় "চার অধ্যায়ে"র অন্যত্রও আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে গঙ্গার ধারে জঙ্গলের মধ্যে পোড়াবাড়িতে এলা যে-ভাবে আসিয়া অতীনের বুকের উপর

ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, মনস্তত্ত্বের দিক হইতে তাহা কিছু অসম্ভব নয়, কিন্তু বস্তুভূমির সত্য পরিচয়ের দিক হইতে ঘটনার এই সন্নিবেশ খুবই রোম্যান্টিক, এবং অঘোরপন্থার নিয়ম কানুনে প্রায় অসম্ভব। তাহা ছাড়া, এই অধ্যায়েরই শেষদৃশ্যে একবার এবং চতুর্থ অধ্যায়ে যবনিকা পতনের পূর্বমুহূর্তে আর একবার হুইসিলের শব্দের প্রবর্তন অনেকটা যেন খেলনার বন্দুকের আওয়াজের মতনই শোনায়। হুইসিলের বিপদসংকেতের সঙ্গে যে ত্রস্ত অনিশ্চিত আশঙ্কা ঘটনা-মুহূর্তকে স্পন্দিত চমকিত করিয়া দেয়, গল্পবর্ণিত মুহূর্তে সেই শঙ্কা ও স্পন্দনের আভাস মাত্র নাই এবং তাহা না থাকাতে গল্পের সেই অংশে বাস্তবানুভূতির অভাব ঘটিয়াছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সর্বত্রই ত একটা আসন্ন বিপদের কালো ছায়া সর্বদা সঞ্চরমাণ, অথচ তাহারই মধ্যে বসিয়া এলা ও অতীন যেভাবে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ভিতর পরস্পরের পরিচয় লইয়াছে এবং আত্মবিনিময় করিয়াছে, তাহাতে মনেই হয় না যে, তাহারা প্রতি মুহূর্তে একটা ভীষণ দুর্যোগের সম্মুখীন হইতেছে। এই অবস্থার মধ্যে বসিয়া ভয়কম্পহীন শিহরণশূন্য চিত্তে পুরাতন স্মৃতির রোমন্থন এবং পরস্পরের আত্মবিনিময়, এ যেন বাস্তবানুভূতিকে বড় বেশি পীড়িত করে।

"চার অধ্যায়ে" সবচেয়ে বস্তুঘনিষ্ঠ চরিত্র কানাই এবং বটু, আর সবচেয়ে মধুর চরিত্র অখিল যে-অখিল এলার মধ্যে সুপ্ত মাতা ও দিদির চিত্তকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহার পরিচয় পূর্ণতর করিয়াছে। দু'টিমাত্র দৃশ্যে স্বল্পক্ষণের জন্য অখিলের সঙ্গে আমাদের দেখা, কিন্তু সে-দেখা সম্পূর্ণ দেখা, সমগ্রভাবে দেখা। অখিল অনিবার্যভাবে "ঘরে বাইরে"-গ্রন্থের অমূল্যর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কানাই গুপ্ত দলের 'রসদ-যোগানদারদের সামান্য একজন'; সমস্ত গল্পে দুইবার তাহার সঙ্গে পরিচয়, একবার তাহার চায়ের দোকানে ইন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে, আর একবার গঙ্গার ধারের পোড়া বাড়িতে অতীনের গোপন আশ্রয়ে। কিন্তু তাহারই মধ্যে এই মানুষটির পরিচয় সম্পূর্ণ এবং সে-পরিচয় কোথাও সহজ বিশ্বাসকে আঘাত করে না, বস্তুর যথার্থ পরিচয়কে বোধ ও বুদ্ধির আড়াল করে না। স্থূল, মাংসল স্বভাবের বটু দলের মধ্যে থাকিয়াও পুলিশের হইয়া দলের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে; সেও খুব সজীব ও বাস্তব চরিত্র, এবং তাহার পরিচয় যতটুকু পাই ততটুকুতেই সে সম্পূর্ণ এবং পরিবেশের যথার্থ পরিবাহী।

কিন্তু, এলা-অতীন সংবাদ যতই রোম্যান্টিক হউক না কেন, "চার অধ্যায়ে" এই এলা-অতীন সংবাদই গ্রন্থেরই প্রথমতম এবং প্রবলতম আকর্ষণ। তাহাদের পূর্বাপর প্রেম-কাহিনী, অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ও গভীর অর্থবহ সংলাপ এবং তাহাদের প্রেমের সর্বশেষ ট্র্যাজিক্ পরিণতিই শেষপর্যন্ত পাঠকচিত্তকে গল্পের মধ্যে টানিয়া রাখে। আগেই বলিয়াছি, মনস্তত্ত্বের দিক হইতে তাহাদের প্রেমের সূচনা, বিবর্তন ও পরিণতি একান্ত গ্রাহ্য, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এবং যেভাবে উভয়ের কথাবার্তা ও ঘটনার ভিতর দিয়া সেই প্রেম আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহা অনবদ্য। এই প্রেমের বিশ্লেষণও কোনও ভাষ্যের অপেক্ষা রাখে না; এলা-অতীন, বিশেষভাবে অতীন সে-ভাষ্য নিজেই রাখিয়া গিয়াছে তাহার বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যময় অপূর্ব ভাষণের মধ্যে। বস্তুত "চার অধ্যায়" উপন্যাসের একমাত্র বৈশিষ্ট্যই এলা-অন্তুর ভালবাসা, এলা-অন্তুর জীবনের কাহিনী। নর-নারীর উন্মুক্ত প্রেমাভিব্যক্তি, 'বর্বর ভালবাসা'র অভিব্যক্তি রবীন্দ্ররচনাবলীর যে স্বল্প দুই চারিটি স্থানে দৃষ্টি ও স্পর্শগোচর, "চার অধ্যায়ে"র এই প্রসঙ্গটি তাহাদের মধ্যে অন্যতম; জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়া রবীন্দ্রনাথ, এলা-অন্তুর ভালবাসা আশ্রয় করিয়া আবিষ্কার

করিলেন 'ভালবাসা বর্বর'—এই বর্বর ভালবাসার উন্মুক্ত অকুণ্ঠিত পরিচয়ই "চার অধ্যায়ের" আকর্ষণ।

"চার অধ্যায়ের" সুর গীতিকাব্যের—তীব্র লিরিকের ধ্বনি ও মোহ, উত্তাপ ও আবেগ, সুর ও ব্যঞ্জনা ইহার আত্মার প্রতি তন্তুতে। গল্পটি পাঠ করিতে করিতে পাঠকের বস্তুধ্যান যে বারবার আক্রান্ত ও পীড়িত হয় তাহার কারণ ইহার লিরিক আত্মা, যে-আত্মা বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুকে কল্পনার রসে গলাইয়া এমনরূপে রূপান্তরিত করে যে, তাহাকে আর চেনাই যায় না, বাস্তবতার অস্তিত্বই যেন আর থাকে না। অথচ আকৃতিতে ও বাহ্যরূপে "চার অধ্যায়ের" গড়ন নাটকের। ইহার চারিটি অধ্যায় চারিটি নাটকীয় অঙ্ক; প্রথম অধ্যায় 'দৃশ্য চায়ের দোকান' বলিয়া আরম্ভ। সমস্ত বইটিতে দৃশ্যবর্ণনাগুলি বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহা আগাগোড়াই ব্যক্ত হইয়াছে নাটকীয় চরিত্রের সংলাপের ভিতর দিয়া; ঘটনার সংঘাত, চরিত্রের অভিব্যক্তি, ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের দ্বন্দ্ব, চরিত্রগুলির পরিচয় ও ব্যঞ্জনা সমস্তই প্রকাশিত হইয়াছে কথার ভিতর দিয়া, অনর্গল অবিশ্রান্ত মুখের কথায়। তাহা ছাড়া মেলোড্রামার স্পর্শও ত সুস্পষ্ট। কবিকল্পিত চায়ের দোকানের অবাস্তব পরিবেশে তৃতীয় অধ্যায়ে হুইসিলের শব্দ, ইলেক্‌ট্রিক টর্চ, ঝুরি নামা বটগাছের অন্ধকার তলায় হঠাৎ ট্যাক্সির আবির্ভাব, শেষ অধ্যায়ে ক্লোরোফরমের ইঙ্গিত এবং আবার হুইসিলের শব্দ ইত্যাদি সমস্তই মেলোড্রামার লক্ষণাক্রান্ত। আখ্যানবস্তুতেও রোম্যান্টিক নাটকীয় উপাদান প্রচুর। কিন্তু, লিরিক প্রকৃতি ও নাটকীয় আকৃতি এ দুয়ের দ্বন্দ্বে "চার অধ্যায়ের" সাহিত্যরস ব্যাহত হইয়াছে। লিরিকে অবান্তরতার স্থান নাই, অথচ নাটকীয় গল্পের খাতিরে অনেক অবান্তর বস্তু গল্পের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে থাকিয়া থাকিয়া লিরিকের মোহময় উন্মাদনার সুর কাটিয়া কাটিয়া গিয়াছে। বয়সের পক্ষে অতবেশি ছেলেমানুষ অখিল গল্পের পক্ষে অবান্তর; সে বেসুরো, তালকাটা। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রায় সমস্তটাতেই প্রকৃতি ও আকৃতির দ্বন্দ্বে একটা বেসুরের স্পর্শ লাগিয়াছে। অতীন্দ্রের অজ্ঞাতবাসের বর্ণনাটিতে লেখক বস্তুচেতনা সঞ্চারের ত্রুটি করেন নাই, যতদূর সম্ভব বাস্তবানুগ বর্ণনা তিনি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু উন্মাদক লিরিক-কল্পনা সমস্ত বস্তু-চেতনাকে স্বপ্নলোকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহাতেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সমস্ত লিরিক আবেশ একমুহূর্তে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গুঁড়া হইয়া যায় পর পর মেলোড্রামাটিক ঘটনার সংস্পর্শে আসিয়া। হয়ত ইহা লেখকের ইচ্ছাকৃত; কিন্তু প্রকৃতি ও আকৃতির এই দ্বন্দ্ব গল্পটি উপভোগের পথে বাধার সৃষ্টি করে, সন্দেহ নাই। "চার অধ্যায়ে"র গীতিকাব্যিক বৈশিষ্ট্য কবির অজানা থাকিবার কথা নয়, অথচ ইহাকে কেন যে তিনি নাটকীয় উপন্যাসের আকৃতি দান করিলেন বলা কঠিন। আর দিলেনই যদি তাহা হইল এলা-অন্তুর প্রথম পরিচয় কাহিনী, প্রেমোন্মেষ কাহিনীটি সোজাসুজি আখ্যান হিসাবে না বলিয়া পরস্পর সংলাপের মতন করিয়া তিনি বলিলেন কেন, আর সেই কাহিনীটিকে দুইটি অধ্যায়ে বিচ্ছিন্ন করিয়াই বা কেন বলিলেন। আর সেই বলাও এত অলংকৃত বিস্তারিত রূপে ও ভাষায় কেন? স্মৃতি-অবগাহনের মধুরতাও নষ্ট হইল, বস্তুস্পর্শও লাগিল না, আর সমগ্র রচনাটিও অসংলগ্ন হইয়া রহিল; ঘটনার সঙ্গে ঘটনার বর্ণনা জোড়া লাগিল না, দ্বিরুক্তিও রহিয়া গেল! সবচেয়ে আঘাত দেয় চতুর্থ বা শেষ অধ্যায়টি। প্রতি মুহূর্তে অগ্রসরমান আসন্ন সর্বনাশের মুখে, প্রেমের চরমতম গভীরতম মুহূর্তে অন্তু এলাকে তিন বৎসরের পুরাতন জন্মদিন-

উৎসবের বৃত্তান্ত শুনাইতেছে—বলার স্বর ও ভঙ্গির মধ্যে কোনও উন্মাদনা নাই, আবেগ নাই, গভীর গম্ভীর চিত্তস্পর্শ নাই; সে যেন এলাকে অন্য কাহারও গল্প শুনাইতেছে, সবিস্তারে, এবং অন্তু নামের ইতিহাস সহ। এই বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যেও স্মৃতি-স্নানের মাধুর্য নাই, আসন্ন সর্বনাশের আতঙ্কস্পর্শ নাই, প্রেমের চরমতম মুহূর্তের বুক নিংড়ান পাঁজর ভাঙা চরম দুঃখময় পরম আনন্দের অভিব্যক্তি নাই! এই দৃশ্যের মান তবু রাখিয়াছে এলা, একেবারে শেষের দিকে। এলার একান্ত মানবিক স্পর্শই এলা-অন্তুর প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ তিনটি উপন্যাস আয়তনে ক্ষুদ্র, ইহাদের বস্তুভূমির পরিধি সংকীর্ণ এবং ভাবসমৃদ্ধিতেও ইহারা দরিদ্র। একমাত্র "চার অধ্যায়ে"ই বরং কতকটা ভাবগভীরতার পরিচয় আছে এবং একটি সমস্যাকে বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়া গভীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা আছে। "দুই বোন-মালঞ্চে" তাহার অভাব পাঠকচিত্তকে পীড়িত করে। আমাদের বহুমুখী, সুখদুঃখময় আনন্দবেদনাময় জীবনের বিস্তৃত পরিচয় ইহাদের একটিতেও নাই। এই অধ্যায়েই অন্যত্র বলিয়াছি, রবীন্দ্রোপন্যাসের, বিশেষভাবে "গোরা"-পরবর্তী রবীন্দ্রোপন্যাসের প্রধান উপজীব্য নরনারীর প্রেমলীলা, এবং সেই প্রেমও অপেক্ষাকৃত অবসরপুষ্ট জীবনধনদীন সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ বিভিন্ন অবস্থা, ঘটনাবর্ত ও পরিবেশের মধ্যে সেই প্রেমের বিচিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করাই রবীন্দ্রোপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য; কিন্তু "চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে-শেষের কবিতা"র পরিধি যত সংকীর্ণই হউক, লক্ষ্য যত সীমাবদ্ধই হউক, ভাবগভীরতার দৈন্যচিহ্ন কোথাও তাহাদের মধ্যে নাই। শেষের উপন্যাসগুলিতে এই দৈন্যই বিশেষভাবে ধরা পড়ে। তাহা ছাড়া, হৃদয়ের যে সরস সহানুভূতি, বুদ্ধির যে দীপ্তিতে "চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে শেষের কবিতা" দীপ্ত ও সঞ্জীবিত, তাহারও অভাব পাঠকচিত্তে ধরা না পড়িয়া পারে না। একথা সত্য, "গোরা"র পর হইতেই রবীন্দ্রোপন্যাসের বস্তুপরিধি এবং উপন্যাসে জীবনের সামগ্রিক দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু ভাবগভীরতা ও অপূর্ব কাব্যানুভূতি সেই ক্ষতিকে কখনও একান্ত হইয়া উঠিতে দেয় নাই। বরং "তিন পুরুষে" একবার তিনি চেষ্টাও করিয়াছিলেন বৃহত্তর বস্তুপরিধি ও জীবনের সামগ্রিক দৃষ্টির সঙ্গে ভাব-গভীরতা ও কাব্যানুভূতিকে মিলাইতে। কিন্তু "যোগাযোগে" তাহা সার্থক হইতে পারে নাই। তবু, "চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে-শেষের কবিতা" তাহাদের স্বকীয় দীপ্তিতেই উজ্জ্বল; কিন্তু যে-পথ বাহিয়া ইহাদের গতি, অর্থাৎ যে কাব্যানুভূতি, যে ভাবগভীরতা ইহাদের আশ্রয়, যে চতুর, শাণিত epigram-দীপ্ত ভাষা ও তির্যক বাক্‌ভঙ্গি ইহাদের নির্ভর সেই আশ্রয় ও নির্ভর শেষের উপন্যাসগুলিকে বাঁচাইতে পারিল না, তাহাদের ক্ষেত্রে সেই আশ্রয় ও নির্ভর কার্যকরী হইল না। বস্তুত, "চোখের বালি গোরা চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে-শেষের কবিতা"র লেখক রবীন্দ্রনাথ যে "দুই বোন-মালঞ্চ-চার অধ্যায়ে"রও রচয়িতা একথা সহজ আনন্দে স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। ভাষার সেই অপরূপ জাদু, বাক্‌ভঙ্গির সেই অপূর্ব দীপ্তি ও গতি তাহাও যেন এই গ্রন্থগুলিতে দুর্বল ও স্তিমিত, শুধু যেন তাহাদের বাহিরের রূপ ও কাঠামোটা বজায় আছে, এরই মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া যে বিদ্যুৎদীপ্তি চমকিয়া উঠে তাহাতে ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির পূর্ব পরিচয় যেন সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাও ক্ষণিক দীপ্তিমাত্রই।

অথচ এই একই সময়ে রবীন্দ্র-কাব্যে নূতন জীবনের স্পন্দন, নূতন ছন্দের পরীক্ষা,

নূতন ভাবৈশ্বর্যের সমারোহ দেখা দিতেছে। কাব্যলক্ষ্মীর নবতর দাক্ষিণ্যে কবির দুই অঞ্জলি একেবারে যেন ভরিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর দশদিক হইতে আলোকের ধারা জীবনের ধারা আবার যেন কূল ভাঙ্গিয়া কবির চিত্ততটে আসিয়া আঘাত করিতেছে। বস্তুত কবিজীবনের শেষ দশ বৎসরের কি অপরূপ সমারোহ, কত তাহার শক্তি, কত তাহার বৈচিত্র্য! শুধু কাব্যেই বা কেন? নিবন্ধ-প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও ভাষার কি দুর্জয় শক্তি, অম্বরের কি অপরিমেয় তেজ! কিন্তু, গল্প-উপন্যাসের ভূমি একই সময়ে এত বন্ধ্যা, এত নিষ্ফলা কেন, সেখানে শক্তির এত কার্পণ্য কেন, ভাবের ও কল্পনার এত দৈন্য কেন?

নাম সূচী